দরসুল ফিকহ

দ্বিতীয় খণ্ড

গবেষণামূলক ফিকহী প্রবন্ধ-সংকলন

তত্ত্বাবধান

ফাতওয়া বিভাগ

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

দরসুল ফিকহ

দ্বিতীয় খণ্ড

গবেষণামূলক ফিকহী প্রবন্ধ সংকলন

তত্ত্বাবধান

ফাতওয়া বিভাগ

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

দরসুল ফিকহ (২য় খণ্ড)
গবেষণামূলক ফিকহী প্রবন্ধ সংকলন

পৃষ্ঠপোষক: শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা.বা.
মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

তত্ত্বাবধান: ফাতওয়া বিভাগ
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

প্রধান সম্পাদক: মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ

সহ-সম্পাদক: মুহাম্মদ তাকি বিন রহিমুদ্দীন
তাওহীদ বিন মোস্তফা, পাবনা
আবদুর রউফ বিন গুলজার আলী, রাজশাহী
আনাছ বিন ওয়াহিদ, সন্দ্বীপ
আশরাফ আলী, নেত্রকোনা

সংকলন ও প্রকাশনা: কিসমুত-তাখাসসুস ফিল ফিকহিল ইসলামী
(সমাপনী বর্ষের ছাত্রবৃন্দ-১৪৩৯ হিজরী)

প্রকাশকাল: শাবান, ১৪৩৯ হিজরী
বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
এপ্রিল, ২০১৮ ঈসায়ী

শব্দবিন্যাস: আব্দুল্লাহ মাসউদ, রংপুর

ক্যালিগ্রাফি ও প্রচ্ছদ: বশির মিছবাহ

হাদিয়া: ৬০০/- (ছয়শত) টাকা মাত্র।

দু'আ ও অভিমত

শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি সাহেব দা.বা.

[শাইখুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহ.-এর সুযোগ্য খলীফা; আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মহাপরিচালক ও শাইখুল হাদীস; আল-হাইআতুল উলয়া লিল-জামি'আতিল কওমিয়া এবং বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান]

الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

দারুল উলূম হাটহাজারীর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সমসাময়িক মাসাইল ও সমস্যাবলীর সমাধানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কখনো এককভাবে, আবার কখনো সম্মিলিতভাবে এসব মাসাইল নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রদের তামরীনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও নিত্য নতুন সমস্যার সমাধানকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় ১৪৩৫ হিজরীর ইফতা ২য় বর্ষের ছাত্ররা সমসাময়িক কিছু বিষয়ে ফিকহী প্রবন্ধ রচনা করে এবং আসাতিযায়ে কেরামের সত্যায়নসহ গ্রন্থটি "দরসুল ফিকহ" নামে দারুল ইফতা থেকে প্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে তা অল্প সময়ে ব্যাপক সমাদর লাভ করে এবং অতি দ্রুত ফুরিয়ে যায়। ব্যাপক চাহিদা থাকার পরও এখনও পর্যন্ত তা পুনর্মুদ্রণের সুযোগ হয়নি। এ ধরনের তাহকীকী কাজকে আরো ব্যাপক করার লক্ষ্যে ১৪৩৯ হিজরীর ইফতা ২য় বর্ষের ছাত্রদের দ্বারাও সমসাময়িক কিছু বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করানো হয়। আসাতিযায়ে কেরামের দিক-নির্দেশনা এবং সম্পাদনা পরিষদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রবন্ধগুলো মানোত্তীর্ণ হয়। বান্দার পুরো কিতাব শোনার সুযোগ না হলেও কিতাবের বিশেষ কিছু অংশ শোনার সুযোগ হয়েছে। তাহকীকের আন্দায ও উসলূব ভালোই মনে হয়েছে। প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডের শুরুতেও 'আলফিকহুল মুদাল্লাল' সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভূমিকাতে লেখকের দরদ, পাণ্ডিত্য ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট। আশা করি, ভূমিকাটি তালিবে ইলম ভাইদের পথ দেখাবে এবং ফিকহের সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বস্তরের ব্যক্তিদের জন্য উপকারী হবে।

আমি এখানে বিশেষ করে আসাতিযায়ে কেরামের শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁরা নিজেদের মূল্যবান সময় দিয়ে ছাত্রদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য মেহনত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবাইকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন। ইলম, আমল ও হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন। সর্বদা দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

এছাড়াও যে সকল তালিবে ইলম ভাই প্রবন্ধগুলো প্রস্তুত করার জন্য মেহনত করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের খেদমত বেশি বেশি করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা.
মহাপরিচালক
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
২১ রজব, ১৪৩৯ হিজরী

বাণী ও দু'আ

আল্লামা মুফতী নূর আহমদ সাহেব দা. বা.

[মুফতীয়ে আ'যম হযরত মুফতী ফয়জুল্লাহ রাহ.-এর খলীফা; দারুল উলূম হাটহাজারীর রঈসে দারুল ইফতা ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস]

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত একমাত্র দ্বীন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামকে সারা পৃথিবীর মানুষ ও জ্বীনের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী দ্বীন, শরী'আত ও জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ দ্বীনের প্রধান উৎসগ্রন্থ আল কুরআন। দ্বিতীয় উৎসগ্রন্থ হাদীসে নববী।

কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা ও বিস্তারণ হলো আল ফিকহুল ইসলামী। যুগে যুগে নতুন নতুন যেসব সমস্যা ও মাসআলা উত্থাপিত হচ্ছে, ফুকাহায়ে কেরাম তার সমাধান কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবা-তাবেঈনের আসার এবং উসূলে শরী'আতের আলোকে দিয়ে আসছেন। আজ অবধি ফিকহে ইসলামীর চর্চা এ ধারায় হয়ে আসছে।

আলহামদুলিল্লাহ! দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানুষের নিত্যদিনের মাসাইল ও দ্বীনী সমস্যাসমূহের সমাধান দিয়ে আসছে। এ বিভাগ থেকে শুধু ব্যক্তি ও সমাজের নিত্য জিজ্ঞাসা ও সমস্যাসমূহের নিয়মিত উত্তর প্রদান করা হচ্ছে যে তা নয়; সমকালীন মাসাইলের উপর গবেষণা, তাহকীক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশের ধারাও আল্লাহর ফযল ও করমে চলে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ফাতওয়া বিভাগের ১৪৩৫ হিজরীর ২য় বর্ষের ছাত্ররা সমসাময়িক কিছু বিষয়ের উপর ৪৫টি ফিকহী প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে 'দরসুল ফিকহ' নামে বের করেছিলো। আলহামদুলিল্লাহ! কিতাবটি সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপক সমাদর লাভ করে। বিভিন্ন মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতেও কিতাবটি স্থান পায়।

ইত্যবসরে ১৪৩৯ হিজরীর ফাতওয়া বিভাগের ২য় বর্ষের তালিবে ইলমরাও আসাতিযায়ে কেরামের নির্দেশনা অনুযায়ী 'দরসুল ফিকহ- দ্বিতীয় খণ্ড' সংকলন ও প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিছুদিন যাবৎ অসুস্থতা বেশি হওয়ার কারণে যদিও পুরো কিতাব শোনার সুযোগ হয়নি; তবে বেশ কিছু প্রবন্ধ শুনেছি ও প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছি। প্রবন্ধগুলোর ইলমী আন্দায, ফিকহী উসলূব ও সার্বিক মান আমাকে বেশ আনন্দিত করেছে। আমি মনে করি, কিতাবটি ছাত্র-উস্তায ও সর্বসাধারণের জন্য উপকারী হবে।

আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবকে কবুল করুন এবং যারা এর পিছনে শ্রম দিয়েছেন, মেহনত করেছেন, আল্লাহ তা'আলা সবাইকে কবুল করুন এবং তাদের হায়াত ও ইলমে বরকত দান করুন। আমীন॥

আল্লামা মুফতী নূর আহমদ দা. বা.
মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
২৪ রবিউল আখের, ১৪৩৯ হি.

বাণী ও অভিমত

আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ

[সাবেক প্রধান মুফতী, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামীয়া বিন্নুরী টাউন করাচী, পাকিস্তান; মুফতী আ'যম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী]

"দারুল উলূম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগের কিছু সাথী 'দরসুল ফিকহ' দ্বিতীয় খণ্ড (গবেষণামূলক ফিকহী প্রবন্ধ সংকলন) প্রকাশ করতে ইচ্ছুক। আমি গ্রন্থটিতে সংকলিত প্রবন্ধসমূহ থেকে কিছু প্রবন্ধ তাখাসুসস ফিল ফিকহের (২য় বর্ষের) কিছু তালিবে ইলম থেকে শুনেছি। এসব প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিতে সঠিক এবং এগুলোতে আমার দস্তখত রয়েছে। তবে তারা (সময় স্বল্পতার কারণে) কিছু প্রবন্ধ আমাকে শুনাতে সক্ষম হয়নি। সেগুলোতে আমার দস্তখতও নেই। সুতরাং যেসব প্রবন্ধে আমার দস্তখত রয়েছে তা আমার মতে সঠিক। ওয়াসসালাম!"

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আ'যম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী
২৫ রজব ১৪৩৯ হি.

দু'আ ও অভিমত

আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব দা. বা.

[প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ এবং বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ; সহযোগী পরিচালক ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:
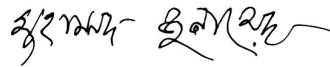
কুরআন-হাদীস নিঃসৃত বিধি-বিধান সংক্রান্ত সঠিক বুঝকেই ফিকহ বলা হয়। ইসলামে ইলমে ফিকহের গুরুত্ব অপরিসীম। এক কথায় বলতে গেলে ইলমে ফিকহ হলো ইসলামের সাংবিধানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। মানবজীবনের প্রতিটি শাখা, এমনকি প্রতিটি কর্ম ফিকহে ইসলামীর আওতায় আসে। ব্যক্তিজীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই ফিকহে ইসলামীর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান।

জীবন, সমাজ ও কাল গতিময় এবং পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন ও আবর্তনের এই ধারায় সৃষ্টি হয়ে থাকে নিত্য নতুন সমস্যা ও মাসাইল। মুফতিয়ানে কেরাম ও ফিকহবিদগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এসব নবঘটিত মাসাইলের সমাধান ও নিষ্পত্তি করে থাকেন।

ফিকহে ইসলামীর খেদমতে দারুল উলূম হাটহাজারীর রয়েছে অনন্য অবদান। মুফতী আ'যম হযতর মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ রাহ.-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে প্রথম নিয়মতান্ত্রিক 'দারুল ইফতা' এখানেই খোলা হয়। মুফতী আ'যম রাহ. এবং তাঁর শাগরিদগণ ফিকহ ও ফাতওয়ার ক্ষেত্রে কালজয়ী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। দারুল উলূম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগ সর্বস্তরের মুসলমানদের দ্বীনী সমস্যার সমাধানে ব্যাপক অবদান রেখেছে এবং রাখছে। ফিকহ ও ফাতওয়ার ক্ষেত্রে বহুমুখী খেদমত ও প্রয়াস এখানে আঞ্জাম পাচ্ছে। ফাতওয়া বিভাগ থেকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বই-পত্র ও ফাতওয়া সংকলন ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় ফাতওয়া বিভাগের ছাত্রদের লিখিত একটি গবেষণামূলক ফিকহী প্রবন্ধ সংকলন 'দরসুল ফিকহ' নামে কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়। সর্বস্তরের মুসলমান ভাইদের নিকট সংকলনটি ব্যাপক সমাদর লাভ করে। এই বছর ফাতওয়া বিভাগের সমাপনী বর্ষের ছাত্র ভাইয়েরা আসাতিযায়ে কেরামের পরামর্শে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে 'দরসুল ফিকহ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ করেছে। এখন আলহামদুলিল্লাহ, তা প্রকাশের পথে। আমি আশা করি, 'দরসুল ফিকহ'-এর এই খণ্ড পূর্বের খণ্ডের চেয়ে আরো ব্যাপক পরিসরে উম্মাহকে ফায়েদা পৌঁছাবে।

আল্লাহ তা'আলা এই গ্রন্থের ফায়েদা আম এবং তাম করুন। গ্রন্থের লেখক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন॥

আল্লামা হাফেজ জুনায়েদ বাবুনগরী দা. বা.
সহযোগী পরিচালক ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
২৮ রজব, ১৪৩৯ হি.

অভিমত ও দু'আ
হযরত মাওলানা মুফতী জসীমুদ্দীন দা.বা.

[বিশিষ্ট উস্তায, তাফসীর, হাদীস ও ইফতা বিভাগ, দারুল উলূম হাটহাজারী; মুফতিয়ে আ'যম হযরত আহমদুল হক রাহ.-এর খলীফা]

حامدا ومصليا ومسلما، أما بعد: قال الله تعالى: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

"আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে এটা প্রতিটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয় এবং মুসলিমদের জন্য হয় হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ" (সূরা নাহল: ৮৯)

দীর্ঘ এক শতাব্দীকালের বেশি সময় ধরে উম্মুল মাদারিস দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছে। বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানের সব ধরনের দ্বীনি চাহিদা পূরণে সূচনালগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টগণ নিবেদিতপ্রাণ। তারই অংশ হিসেবে এখানে ইফতা বিভাগের কার্যক্রম চালু রয়েছে। এই বিভাগের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষ তাদের দ্বীনি সমস্যাগুলোর উপস্থিত ও সর্বাঙ্গীন সমাধান জানতে পারে।

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে ইসলামের অনুপম দিক-নির্দেশনা। মানবজীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও মহিমান্বিত করতে জীবনের সবক্ষেত্রেই ইসলাম এঁকে দিয়েছে তার আলোকিত পথরেখা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো ইরশাদ করেন-

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍ

"আমি কিতাবে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিনি।" (সূরা আনআম: ৩৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

وَكُلَّ شَىْءٍ فَصَّلْنَـٰهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

"আমি সবকিছু পৃথক পৃথকভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছি।" (সূরা ইসরা: ১২)

তবে কুরআন-সুন্নাহে এসব বিধিবিধান মূলনীতি আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বযুগের ফুকাহায়ে কেরাম তাদের সময়ে ঘটমান নতুন বিষয়ের ব্যাপারে এসব মূলনীতি ও ব্যাপক বিধানের আলোকে শর'য়ী সিদ্ধান্ত দিয়ে এসেছেন এবং দিয়ে আসছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ সিলসিলা জারী থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামের বিধি-বিধানকে প্রত্যেক যামানার উপযোগী করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা যেমন আজীমুশশান কাজ, তেমনি একটি দুরূহ বিষয়ও বটে। আল্লাহর রহমতে বর্তমানেও মুফতিয়ানে কেরাম ও ফিকহবিদগণ এক্ষেত্রে বিনিদ্র সাধনা ও কাজ করে যাচ্ছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ফিকহ একাডেমী ও দারুল ইফতা সম্মিলিতভাবে নবঘটিত মাসাইলের সমাধানের প্রয়াস চালাচ্ছে। তাদের গবেষণালব্ধ আলোচনা মানুষের উপকারার্থে কিতাব আকারে বাজারে আসছে। আরবী-উর্দুতে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিতাবাদি থাকলেও বাংলাতে এর অপ্রতুলতা বরাবরই চোখে পড়ার মতো ছিলো। এরই প্রেক্ষিতে দারুল উলূম হাটহাজারীর ইফতা বিভাগের ছাত্রদের মাধ্যমে বিস্তারিত ফিকহী প্রবন্ধ প্রস্তুত করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! প্রিয় তালিবে ইলমগণ নির্বাচিত কিছু আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসাতিযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে কিছু প্রবন্ধ তৈরী করেছে। তালিবে ইলম ভাইদের সাথে বান্দাও কিছু

সহযোগিতা এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দানের চেষ্টা করেছি।

প্রিয় পাঠকের নিকট আবেদন করবো, যদি কোনো ভুল বা অসংলগ্ন বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে ফাতওয়া বিভাগের ঠিকানায় যোগাযোগ করে জানিয়ে দিবেন। আমরা অবশ্যই তা বিবেচনা করবো।

আল্লাহ তা'আলা এই কিতাবের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনতকে কবুল করে নিন। বিশেষ করে যে সকল ভাই প্রবন্ধগুলো পুনঃপ্রস্তুতকরণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খাইর দান করুন এবং দ্বীন ও ইলমের খিদমতে নিয়োজিত রাখুন। আমীন॥

মুফতী জসীমুদ্দীন দা.বা.
মুফতী ও মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
২৮ রজব, ১৪৩৯ হি.

অভিমত

মাওলানা মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ

[বিশিষ্ট মুফতী ও উস্তায, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

দ্বীন-ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন-সুন্নাহর সঠিক বুঝকে বলা হয় ফিকহ। অপরভাষায় বলা যায়, কুরআন-সুন্নাহর প্রায়োগিক রূপ হলো ফিকহে ইসলামী।

এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বাভাবিক বিষয় যে, কুরআন-সুন্নাহর সকল আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান এক পর্যায়ের নয়। কিছু আদেশ-নিষেধ সুস্পষ্ট এবং সহজেই বোধগম্য। সর্বস্তরের মানুষ তা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে অনুধাবন করতে পারে। তবে কুরআন-সুন্নাহর বিধি-নিষেধের একটি বড় অংশ জটিল ও নিগুঢ়। মূলত এসব বিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে কেন্দ্র করে ফিকহে ইসলামীর বটবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। এখানেই ফিকহে ইসলামীর অনন্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত।

ফিকহে ইসলামীর প্রসারতা ও বিশালতা কল্পনাতীত। মানব সভ্যতা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এখন একাবিংশ শতাব্দীতে উপস্থিত। আজও ফিকহে ইসলামী শুধু যে স্বমহিমায় ভাস্বর তা নয়; বরং দিন দিন তার ব্যাপ্তি ও প্রসারতা বেড়েই চলেছে। অথচ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশেও জোরপূর্বক ফিকহে ইসলামীকে আইন-আদালতের জায়গা থেকে উৎখাত করা হয়েছে।

দুনিয়ার অন্যান্য আইনের তুলনায় ফিকহে ইসলামীর ব্যাপ্তি, প্রয়োগযোগ্যতা এবং সার্বজনীনতা অনেক বেশি। এর কারণ স্পষ্ট-

এক. ফিকহে ইসলামী তো মূলত কুরআন-সুন্নাহর প্রায়োগিক রূপ। আর কুরআন-সুন্নাহ আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ শরী'আতের উৎস। কেয়ামত পর্যন্তের জন্য সকল মানব সমস্যার সমাধান সহকারে এ শরী'আত নাযিল করা হয়েছে। সর্বযুগের সব পরিস্থিতিতে সর্বশেষ সমাধান ইসলামী শরী'আতই কেবল দিতে পারে। মুসলমানদের শত পরাজয়ের পরও এ বাস্তবতা এখনও দুনিয়াবাসীর সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ।

দুই. ইসলাম প্রকৃতিগতভাবেই ব্যাপক ও সর্বাঙ্গীন, চিরসজীব ও প্রাণময়। এটি ইসলামের মু'জিযা। ইসলামের এই ম'জিযা তার মূল উৎস কোরআন-হাদীসে যেমন দীপ্তিমান, তেমনি কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা ফিকহে ইসলামী-সহ অন্যান্য উলূমে ইসলামীয়্যাহ-এর ক্ষেত্রেও এটিই বাস্তবতা।

এজন্য স্বয়ং ফিকহে ইসলামীরও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে তা সদা প্রাণবন্ত ও প্রয়োগযোগ্য হয়েই টিকে থাকে। ফিকহের দু'টি এমন বৈশিষ্ট্য উদাহরণস্বরূপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো, যার কারণে ফিকহে ইসলামীর বিশালতার আশেপাশেও প্রাচীন ও আধুনিক আইনের সম্ভার ভিড়তে পারবে না।

১. ফিকহে ইসলামীর একাধিক প্রতিষ্ঠিত মানহাজ ও মাযহাব

কুরআন-সুন্নাহর অনেক বিষয়ে উম্মতের জন্য আমলের সহজার্থে একাধিক ব্যাখ্যার সুযোগ রাখা হয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিকে ইজতিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার

ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে, তাও ফিকহে ইসলামীকে প্রচুর গতিশীল করেছে।

২. মাসাইল ও ইস্তিখরাজের ব্যাপ্তি

ফুকাহায়ে কেরাম ফিকহী আহকামের ইস্তিখরাজ ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিসরে কাজ করেছেন। তাঁরা শুধু তাদের যুগে যেসব মাসাইল তাদের সামনে এসেছিলো তার সমাধান দিয়ে যাননি; বরং তাঁরা একে তো সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের মূলনীতিগুলো বেশ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, সম্ভাব্য সকল মাসাইল ও ঘটনাকে তারা চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছেন এবং তা এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, তা থেকে যেকোনো নবঘটিত মাসআলার বিধান বের করা সম্ভব।

এভাবেই দিন দিন ফিকহে ইসলামীর ডালপালা বিস্তৃত হয়ে চলেছে। নিত্য নতুন আবিষ্কার আর উদ্ভাবনগুলো ফিকহের এই বিশালতার সামনে যেন বড়ই ম্রিয়মান।
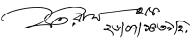
ফিকহে ইসলামীর গবেষণা ও প্রসারের ক্ষেত্রে দারুল উলূম হাটহাজারীর অবদান অনস্বীকার্য। দারুল উলূম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগ যুগ যুগ ধরে সাধারণ মুসলমানদেরকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও সমাধান দিয়ে আসছে। দারুল উলূম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগের এ ধরনের একটি প্রশংসাযোগ্য প্রয়াস 'দরসুল ফিকহ'। ইতিপূর্বে এ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিলো এবং ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিলো।

এখন আল্লাহর ফযল ও করমে 'দরসুল ফিকহ'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায়। বক্ষ্যমাণ খণ্ডের প্রায় সকল প্রবন্ধই আমি দেখেছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছি।

খুশির বিষয় হলো, এসব প্রবন্ধে শুধু ফিকহী মাসাইল বর্ণনা করা হয়নি; বরং প্রতিটি মাসআলার দলীল ও মূল উৎস সম্পর্কে সরল ভাষায় ধারণা দেয়া হয়েছে। এখান থেকে একজন তালিবে ইলম যেমন ফিকহে মুদাল্লাল-এর প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে, তেমনি সাধারণ মুসলমানও ফিকহে ইসলামীর সাথে সামগ্রিকভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে। বলা বাহুল্য, ফিকহের দালীলীক আলোচনা পাঠকের মাসাইলের জ্ঞানকেই শুধু সমৃদ্ধ করবে না; বরং তার দ্বীনের সাধারণ বুঝকেও সমৃদ্ধ ও গভীর করবে। তবে দ্বীনের সকল বিষয়ে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা সবার জন্য জরুরী।

বাংলা ভাষায় এ ধরনের ইলমী ও শাস্ত্রীয় রচনা অপ্রতুল। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য এই সংকলন বেশ উপকারী হবে বলে মনে করি।
আল্লাহ তা'আলা লেখক, সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বইটিকে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!

ফরিদুল হক
খাদেমে তলাবা,
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
২৬ রজব, ১৪৩৯ হি.

অভিমত

মাওলানা মুফতী আবু সাঈদ দা. বা.

[উস্তায, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী]

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فقد قال الله تعالى: ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ : [سورة المائدة: ٣]

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" এ আয়াত থেকে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। মানবজাতির সকল দ্বীনি সমস্যার সমাধান এতে রয়েছে।

দ্বীনে ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন ও হাদীস। কুরআনের আয়াতসংখ্যা সীমিত। হাদীসও তদ্রুপ। অপরদিকের মানুষের সমস্যার কোনো অন্ত নেই। কেয়ামত পর্যন্ত আরো কত সমস্যার উদ্ভব হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. (৫৯৩ হি.) তাঁর অসাধারণ রচনা আল হিদায়ার ভূমিকায় বলেন-

أن الحوادث متعاقبة الوقوع، والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع. (الهداية ١/١)

সুতরাং কুরআন-হাদীসে মানুষের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান সুস্পষ্টভাবে না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাহলে এসব সমস্যার সমাধান কীভাবে করা হবে? এ প্রশ্নের জবাব বুঝতে হলে আমাদেরকে কুরআন-হাদীসের সমাধান-পদ্ধতি বুঝতে হবে। কুরআন-হাদীসে মানবসমস্যার সমাধান দু'পদ্ধতিতে করা হয়েছে- এক. সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে। দুই. ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিকে আমরা শাস্ত্রীয় ভাষায় এভাবে বলি যে, কুরআন-হাদীসে অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাসআলা উল্লেখ না করে উসূল ও মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যা ঘটমান ও আগত সব সমস্যার সমাধান দেওয়ার সক্ষমতা রাখে। এই মূলনীতিগুলোর আলোকে যুগে যুগে বিজ্ঞ ফকীহগণ (যারা কুরআন-হাদীস এবং উসূলে শরী'আতের পারদর্শী) মানবজাতির নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান দিয়ে আসছেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত দিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।

এসব সূক্ষ্ম নবসৃষ্ট সমস্যাগুলোকে পরিভাষায় নাওয়াযিল (النوازل) বলা হয়। শরী'আতের মৌলিক নীতিমালার আলোকে এগুলোর সমাধান জানা, আলোচনা ও চর্চা করাকে 'ফিকহুন নাওয়াযিল' বলা হয়।

ফিকহ শাস্ত্রের অনেক শাখা রয়েছে। সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম; কিন্তু এর মধ্যে فقه النوازل -এর শাখাটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। فقه النوازل -এর চর্চার জন্য বিশাল যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী রাহ. (১৮৯ হি.) বলেন-

من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما استحسن فقهاء المسلمين، وسعه أن يجتهد رأيه فيما ابتلي به ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهي عنه، فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل، وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به. [جامع بيان العلم وفضله: ٣٢٣]

ইমাম শাফেয়ী রাহ. (২০৪ হি.) এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে চুম্বক অংশ
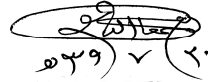
উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন-

ولا يقيس إلا من جمع الآلةَ التي له القياسُ بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله: فرضِه، وأدبِه، وناسخِه، ومنسوخِه، وعامِّه، وخاصِّه، وإرشاده... ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب. ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرِّق بين المشتبه، ولا يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت. (الرسالة للشافعي: ٥٠٩/١)

বিশেষ করে ফিকহুন নাওয়াযিলের ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণা অতীব প্রয়োজন। হযরত আলী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন-

وعن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرني؟ قال: شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة. (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون من أهل الصحيح. كما في مجمع الزوائد ١٧٨/١)

সাহাবায়ে কেরাম বিশেষত হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি. এবং তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের কর্মপদ্ধতি এমনই ছিলো। ইমাম আবু হানিফা রাহ. চল্লিশজনের একটি ফিকহী বোর্ড কায়েম করেছিলেন। পরবর্তী আইম্মা ও ফুকাহায়ে কেরামও এ ধারায় কাজ করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় মাদরে ইলমী দারুল উলূম হাটহাজারীর বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম ও ফাতওয়া বিভাগ উম্মতের এই খেদমাত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। দারুল উলূমের মুফতিয়ানে কেরাম ও ফাতওয়া বিভাগ থেকে ফাতাওয়ায়ে ফয়জিয়া, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম, আশরাফুল ফাতাওয়া, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, দরসুল ফিকহ-প্রথম খণ্ড-সহ আরো অনেক ফিকহ ও ফাতওয়ার কিতাব প্রকাশিত হয়েছে।

খুশির বিষয় যে, ১৪৩৯ হিজরীর ইফতা সমাপনী বর্ষের ছাত্ররা এ ধারাবাহিকতা রক্ষায় আসাতিযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে 'দরসুল ফিকহ-২য় খণ্ড' বের করার উদ্যোগ নিয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন তাদের এ খেদমত কবুল করেন। তাদেরকে দ্বীনের খিদমাত বেশি বেশি করার তাওফীক দান করেন এবং এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ কৃপায় দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বদলা দান করেন। আমীন॥

মুফতী আবু সাঈদ দা.বা.
উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
২১ রজব, ১৪৩৯ হি.

অভিমত

মাওলানা মুফতী রাশেদুল ইসলাম দা. বা.

[উস্তায, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী]
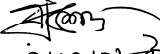
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

জামেয়ার ফাতওয়া বিভাগের সমাপনী বর্ষের ছাত্রদের (১৪৩৯ হি.) উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত ফিকহী প্রবন্ধ সংকলন 'দরসুল ফিকহ'-২য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি বান্দার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মাশাআল্লাহ! বিষয়বস্তুর আধুনিকতা, গবেষণা ও প্রমাণ-পদ্ধতির যথার্থতা, সরল উপস্থাপনাসহ বিভিন্ন দিক থেকে ভালোই মনে হয়েছে।

বিশেষত ফিকহী বিষয়ের উপস্থাপনার দিকটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। একটি উদাহরণ এখন আমার সামনে রয়েছে। হুরমাতে মুসাহারাতের মানাত সংক্রান্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে এমন আন্দাযে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পাঠক মোটেও ধারণা করতে পারবে না, এটি একটি জটিল বিষয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফিকহ ও উসূলের কিতাব মুতালাআ করে তারপর প্রবন্ধের আলোচনাটি পড়লে তালিবে ইলম ভাইদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

আমি আশা করি, আমাদের প্রিয় ছাত্রবৃন্দ সামনেও এ ধরনের মেহনত জারী রাখবে। এজন্য তাদের যেমন বুলন্দ হিম্মতের চর্চা করতে হবে, তেমনি আসাতিযায়ে কেরামের নির্দেশনা অনুসরণ এবং ইলমী ও তাহকীকী কাজের উসূল ও যাওয়াবেতের পাবন্দী করাও তাদের জন্য জরুরী।

আল্লাহ তা'আলা কিতাবের সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন॥

০৯|০৪|১৮ ইং

মুফতী রাশেদুল ইসলাম
উস্তায
দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম
০৯ এপ্রিল, ২০১৮ ইং

সংক্ষিপ্ত সূচি

বিস্তারিত সূচি

হারাম অর্থ-সম্পদ : মালিকানা ও ব্যবহারবিধি ১৭৫

ফরেক্স ট্রেডিং : পরিচিতি ও শর'য়ী দৃষ্টিকোণ ২১৪

ভূমিকা

আলফিকহুল মুদাল্লাল : কিছু আবেদন ও নিবেদন

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وبعد:

আলহামদু লিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী ও আসাতিযায়ে কেরামের নেক দু'আর বদৌলতে 'দরসুল ফিকহ প্রথম খণ্ড' ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। মাদরাসার ছাত্র, উস্তায ও বিভিন্ন ফাতওয়া বিভাগের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের নিকট ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। 'ফায়েদামন্দ' হওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন অনেকেই। একই সাথে প্রথম খণ্ডের ভূমিকা "ফিকহুন নাওয়াযিল : কিছু মৌলিক কথা" তলাবা, উলামা, বিশেষ করে ফাতওয়া বিভাগের তলাবা ও আসাতিযায়ে কেরামের মাঝে সমাদৃত হয়েছে। উলূমুল ফিকহের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক ভাই জানতে চেয়েছেন, আমরা ফিকহুন নাওয়াযিলের স্তর পর্যন্ত পৌঁছব কীভাবে? ফিকহুন নাওয়াযিলের প্রস্তুতিমূলক অধ্যয়নের পথ ও পন্থা সম্পর্কেও অনেকে জানতে চেয়েছেন।

মূলত ফিকহুন নাওয়াযিলের জন্য প্রস্তুতিমূলক পড়া-শুনা ও অধ্যয়নপদ্ধতি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। বলা বাহুল্য, ফিকহের এ স্তরে পৌঁছতে কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক। ফন্নী উস্তাযের কাছে তামরীন করাও জরুরী। এসব ক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য আবশ্যক সঠিক দিক-নির্দেশনা অবলম্বন। সব বিষয়ে এখানে আলোচনা করার সুযোগ নেই। তবে নাওয়াযিল বিষয়ে সঠিক সমাধানে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আলফিকহুল মুদাল্লাল-এ দক্ষতা অর্জন।[১] তাই এখানে শুধু 'আলফিকহুল মুদাল্লাল'-এ দক্ষতা অর্জন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আবেদন ও নিবেদন পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

ফিকহে ইসলামীর স্তরবিন্যাস

ফিকহে ইসলামীকে বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস করা হয়ে থাকে। তবে সফল অধ্যয়ন বা প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়নের শিক্ষাক্রম (Curriculum)-এর নীতি অনুযায়ী এটিকে তিনটি স্তরে বিন্যাস করা যায়-

এক. আলফিকহুল মুজাররাদ

সহজে বলা যেতে পারে, আলফিকহুল মুজাররাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দলীলের আলোচনা ব্যতীত শুধু ফিকহী মাসাইলের চর্চা করা। এ ধরনের মাসাইল শিক্ষা-শিখন এবং সংকলন সবই

---

[১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবঘটিত মাসআলার সমাধান কীভাবে দেয়া হবে সে বিষয়ে হযরত আলী রাযি. কে দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, تشاورون الفقهاء والعابدين। (আলমু'জামুল আউসাত-তাবারানী [১৬১৮], মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৪২৮, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত) এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুকাহায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতে বলেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, এ বিষয়ে তাঁরাই যোগ্য হবেন। আর বলা বাহুল্য, তৎকালীন সময়ে ফকীহ মানেই ফিকহে মুদাল্লালে দক্ষ ও বিজ্ঞ ফকীহ। এছাড়াও সাধারণ জ্ঞান থেকেই বোঝা যায় যে, এমন মাসআলা যার সমাধান ইতিপূর্বে দেয়া হয়নি, তার সমাধান এমন ফকীহই দিতে পারবেন যিনি ফিকহে মুদাল্লালে পারদর্শী হবেন।

আলফিকহুল মুজাররাদ-এর আওতাধীন। যেমন, আমরা ফিকহের প্রথম কিতাব পড়েছি তালীমুল ইসলাম বা বেহেশতি যেওর। এ কিতাবগুলোর মাঝে যে ফিকহ পেশ করা হয়েছে তাই 'আলফিকহুল মুজাররাদ'।[২]

ফিকহে মুজাররাদ হলো ফিকহ চর্চা ও অধ্যয়নের প্রথম স্তর। এ স্তরটিও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। একজন ফিকহের তালিবে ইলমের জন্য এই স্তরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ফিকহের বিভিন্ন ধারা বা মানহাজ ও মাযহাব রয়েছে।[৩] সুন্দর ও সঠিকভাবে জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন, যে কোনো একটি মানহাজ অনুসরণ করে চলার পথ সুনির্দিষ্ট করা। আর এই স্তরেই তালিবে ইলম ফিকহ শাস্ত্রে নিজের চলার পথ জানতে পারে এবং তার চিন্তায় সুন্দর ও সুবিন্যস্ত একটি নকশা গেঁথে যায়। এই নকশা যে যত সুন্দর করে নিজের মধ্যে স্থাপন করতে পারবে, তার জন্য ফিকহের পরবর্তী জগতে বিচরণ ততো সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত হবে।

তাই প্রথমে ফিকহে মুজাররাদের স্তর ইতকানের সাথে অধ্যয়ন করে নিজের পথ জেনে নিতে হবে। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে মুদাল্লাল ও মুকারান ফিকহ নির্মাণ করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি নিজের পথ ও মাযহাব এবং অনুসরণীয় ব্যাখ্যা জানা না থাকে, তাহলে পরবর্তীতে চিন্তার বিশৃঙ্খলার শিকার হওয়া নিশ্চিত।

এ কারণেই আমাদের সালাফ শিক্ষার পর্যায়ক্রম সম্পর্কে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁরা ছোটদেরকে প্রথমে ছোট ছোট মাসাইল শিক্ষা দিতেন। এরপর যোগ্যতা অনুসারে পরবর্তী স্তরের মাসাইল দলীলসহ শিক্ষা দিতেন। ইমাম শাতেবী রাহ. (৭৯০ হি.)[৪] শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বলেন-

أن لا يذكر للمبتدىء من العلم ما هو حظ المنتهي، بل يربّي بصغار العلم قبل كباره.[৫]

তিনি বিজ্ঞ আলেম ও শিক্ষকদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

ويسمى صاحب هذه الرتبة: الرباني، والحكيم، والراسخ في العلم، والعالم، والفقيه، والعاقل، لأنه يربّي بصغار

---

[২] অনেকে আলফিকহুল মুজাররাদের ভুল ব্যাখ্যা করে বলে, যে ফিকহের পিছনে দলীল নেই, তাকে ফিকহে মুজাররাদ বলা হয়। তাদের এই দাবি ফিকহের বাস্তবতা এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতারই প্রমাণ বহণ করে। সাধারণ জ্ঞানেও তো বোঝা যায় যে, দলীল উল্লেখ না করা আর দলীল না থাকা এক বিষয় নয়। এখানে 'মুজাররাদ' শব্দটি দলীল উল্লেখ না করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, না থাকার অর্থে নয়।

[৩] আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ফিকহ ও মাযহাব হলো কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা। ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহর জটিল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছেন, যা একপর্যায়ে মাযহাবের রূপ নিয়েছে। সুতরাং যে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ বোঝার যোগ্যতা রাখে না তার জন্য মাযহাব বা ইমামের ব্যাখ্যা অনুসরণ করা আবশ্যক। এটাকেই মাযহাবের তাকলীদ বলা হয়। আর অযোগ্যদের জন্য যোগ্য ব্যক্তির অনুসরণের মাঝে হিদায়াত নিহিত রয়েছে। হযরত উমর রাযি. (২৩ হি.) বলেন:

وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. [الفقيه والمتفقه ١٥٨/٢، جامع بيان العلم لابن عبد البر، رقم الحديث: ١٠٥٥-١٠٥٦ وإسناده حسن]

[৪] আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মুসা ইবনে মুহাম্মাদ আললাখমী, আলগারনাতী, আশশাতিবী। তিনি আন্দালুস (স্পেন)-এর শাতিবাহ শহরের বাসিন্দা ছিলেন। ৭৯০ হিজরীর শাওয়াল মাসে নিজ শহরে ইন্তেকাল করেন। তাফসীর, হাদীস, উসূলে ফিকহ সহ বিভিন্ন শাস্ত্রের দৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'আল মুওয়াফাকাত' এবং 'আল ই'তেছাম' তাঁরই কালজয়ী রচনা। (মু'জামুল বুলদান: ৩/৩০৯)

[৫] আল মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শরীআহ: ৪/২৩২

العلم قبل كباره، ويوفّي كل أحد حقه حسبما يليق به.[৬]

এই শিক্ষাক্রম স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে অনুসৃত। সালাফে সালেহীনও এভাবেই শিক্ষা দিতেন। শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ সালাফের প্রাথমিক শিক্ষানীতি সম্পর্কে বলেন-

أنهم كانوا يدرِّجون طلابهم الصغار في العلم تدريجا، ويربونهم على صغار مسائل العلم قبل كبارها، وينظرون إليهم نظرة الأم الرؤوم إلى وليدها الجديد، كيف تتدرج معه في نموه وغذائه وحركاته، وكما أنه لايجوز لها أن تطعم وليدها الصغير لأيام، ما تطعم ولدها لسنة فأكثر، فكذلك لا يسوغ للمعلم أن يلقّن طالبه المبتدىء من مسائل العلم، وخلافياتها، وأدلتها، ما هو خاص بالمتمكن.[৭]

হিন্দুস্তানে বিভিন্ন যুগে ইসলামী শিক্ষার একাধিক শিক্ষাক্রম চালু ছিলো। প্রত্যেকটি শিক্ষাক্রমের নেসাবে (Syllabus) প্রথমে ফিকহে মুজাররাদ শিক্ষার গুরুত্ব ছিলো।

গুরুত্ব বিচার করে আমাদের দরসে নিযামীতেও এ পন্থা অনুসৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি ফনে প্রথমে একটি মুখতাসার কিতাব পড়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটি একটি সুন্দর বাস্তবধর্মী ও ফলপ্রসু ব্যবস্থা।

কিন্তু আফসোসের সাথেই বলতে হয় যে, আরব বিশ্বের কিছু শায়খ 'الاجتهاد ميسور'-এর শ্লোগান নিয়ে ময়দানে আসেন এবং সাধারণ মানুষকে পর্যন্ত তালকীন করতে থাকেন যে, দলীল ব্যতীত আমল করা যাবে না।[৮] ফিকহে মুজাররাদের স্তর পূর্ণ ও পরিপক্ক করার আগেই ছাত্রদেরকে আলফিকহুল মুদাল্লাল এমনকি আলফিকহুল মুকারানও পড়ার প্রতি উৎসাহ দিতে থাকেন। তাদের অনুসরণে ছাত্র ও শিক্ষিত মুসলিম ভাইদের কেউ কেউ ফিকহে মুদাল্লাল থেকেই পড়া-শোনা শুরু করে। ফলে নিজে বিভ্রান্ত হয়ে অন্যদেরকে ভ্রান্ত ও বাতিল ভাবতে থাকে। এর পর শুরু করে নিজের ভ্রান্ত চিন্তার প্রতিষ্ঠা এবং সেদিকে অন্যদেরকে আহ্বান। তার এ দাওয়াতে না থাকে সুন্নাহর অনুসরণ, আর না পরিলক্ষিত হয় ইসলামী আদাব।

শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা তাদের অবস্থা এভাবে ব্যক্ত করেন-

أنك تجد أول ما يمسكه الشاب المثقف المتدين من كتب العلم: سبل السلام، وفي اليوم الثاني يرتقي إلى

---

৬ আল মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শরীআহ: ৪/২৩২

৭ আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাইলিল ইলমি ওয়াদ দ্বীন: ১৫৭, দ্বিতীয় সংকরণ

৮ দলীল জেনেই আমল করতে হবে- এটি কুরআন ও সুন্নাহর কোনো নির্দেশনা নয়। সালাফের পথ ও আদর্শও নয়। মূলত এই চিন্তা জন্ম নিয়েছে মু'তাযিলা সম্প্রদায় থেকে। খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন:

حكى عن بعض المعتزلة أنه قال: لا يجوز للعامي العمل بقول العالم حتى يعرف علة الحكم، وإذا سأل العالم فإنما يسأله أن يعرفه طريق الحكم، فإذا عرفه وقف عليه وعمل به. [الفقيه والمتفقه: ٢/١٣٤، مكتبة التوعية الإسلامية]

সালাফীদের মাঝে জোরদারভাবে এই চিন্তার প্রচার করেছেন শায়খ আলবানী রাহ. (১৪২০ হি.)। অন্যরা তাঁর সাথে সঙ্গ দিয়েছেন। আর তিনি এহেন চিন্তা পেয়েছেন শায়খ রশীদ রেযার কিতাবাদি ও তার সম্পাদিত পত্রিকা আল মানার থেকে। আর তিনি তা গ্রহণ করেছেন শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহ থেকে। শায়খ আব্দুহ পেয়েছেন তাঁর প্রিয় উস্তায শায়খ জামালুদ্দীন আফগানী থেকে। শায়খ জামালুদ্দীন আফগানীর ইসলামের প্রতি অনেক অবদান থাকলেও তিনি ছিলেন আধুনিক মু'তাযিলার স্বপ্নদ্রষ্টা। এখানে যাদের নাম উল্লেখ করা হলো, তাদের জীবনীগ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলেই বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

نيل الأوطار، وفي اليوم الثالث: إلى المحلى!!

فماذا بقي عليه من العلم وأمهات مصادره؟!. ومن أين يأتيه الأدب مع المخالفين، وما من صفحة في المحلى إلا وفيها سب الأئمة وشتمهم؟ ومن أين يتهيب الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة، أو الأربعين، وهو يقرأ تقريع الإجماع ومدعيه في نيل الأوطار؟! إلى غير ذلك من مناصرة للأقوال الشاذة في الكتب الثلاثة.[৯]

এসকল শায়খা শুরু থেকে শিশুদের মাঝে তাকলীদ, মাযহাব এবং তার প্রবক্তাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরী করে থাকেন। যদ্দরুন তাদের প্রথম শ্রেণীর একজন ছাত্র এ ধরনের ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত কথা বলতেও কুণ্ঠাবোধ করে না যে, আবু হানীফা (১৫০ হি.) যঈফ, মুরজী, তিনি অনুসরণযোগ্য নন, তাকলীদ হারাম ইত্যাদি। এভাবে তাদের কাছে ফিকহে মুজাররাদের কিতাব গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তাদের দৃষ্টিতে ফাতওয়া প্রদানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে এসব কিতাবের উদ্ধৃতি অনর্থক ও মূল্যহীন। তাদের সবাই এ রোগে আক্রান্ত না হলেও আক্রান্তের সংখ্যাও কম নয়। শায়খ আলবানী (১৪২০ হি.) মারহুম নির্দ্বিধায় যা বলেছেন তা তাদের এই নেতিবাচক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। তার বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয় যে, তাদের এ চিন্তার ভয়াবহতা কতটুকু। তিনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে একটি হাদীসের টীকায় বলেন-

هذا صريح في أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا، و يقضي بالكتاب والسنة، لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه.[১০]

একটু ভেবে দেখুন, তিনি কোন ধরনের চিন্তার বশবর্তী হয়ে হানাফী ফিকহসহ অন্যান্য ফিকহকে কুরআন-সুন্নাহর প্রতিপক্ষ হিসেবে এবং ইঞ্জিলের সাথে এক কাতারে উল্লেখ করলেন।

শায়খ আলবানী ও শায়খ আব্দুহ কর্তৃক প্রভাবিত উস্তায ও শাগরিদদের মাঝে এই চিন্তাই সক্রিয়। তাদের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক। আচরণে উচ্চারণে তারা বলতে চান:

هم رجال ونحن رجال/أنا المجتهد أنا المستنبط.

আরব বিশ্বের রক্ষণশীল উলামা, যারা এ নাযুক পরিস্থিতি স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন ও করছেন, তাদের একজন মিসরের বিখ্যাত আলেম শায়খ মাহমুদ শাকের (১৩২৭-১৪১৮ হি.)। তিনি উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রভাবিত উস্তাযদের দরসের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

بل كانت ثمرة الاستهانة أن يقف أستاذ في أيامنا هذه يعلم النحو، ويقول للطلبة الصغار، مزهوا بعلمه: كنت أحب أن يجلس سيبويه بينكم ليتعلم مني النحو!! وأساتذة آخرون يقولون للصغار من الطلبة: إنما أفسد نحوَ العربية سيبويه وابنُ عقيل وابن هشام وأضرابهم بما كتبوا وبما ألفوا!![১১]

এই অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি আমাদের সালাফ পূর্বেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা ছোটদেরকে প্রথমে ফিকহে মুজাররাদ ভালোভাবে শেখানোর প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ

---

[৯] আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাইলিল ইলমি ওয়াদ দ্বীন: ১৮১

[১০] মুখতাসারু সহীহি মুসলিম: ৫৪৮ (হাদীস নং ২০৬০)

[১১] মুকাদ্দিমাতু আসরারিল বালাগাহ: ২৮, দারুল মাদানী

তা'আলা উম্মাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

মোটকথা, আমাদেরকে প্রথমে ফিকহে মুজাররাদের স্তর অতিক্রম করতে হবে। ফিকহে মুজাররাদ অধ্যয়নেরও সঠিক মানহাজ ও তরীকা রয়েছে। পরবর্তী কোনো সুযোগে এ বিষয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।[১২]

হিন্দুস্তানে তাখাসসুস ও ফিকহে মুজাররাদ: হিন্দুস্তানে ফিকহ ও ফাতওয়ার তাখাসসুস অনেক পূর্বেই শুরু হয়েছে। শুধু শিক্ষাক্রম ও নেযামের মাঝে পরিবর্তন হয়েছে; মৌলিক কাজ পূর্ব থেকেই ছিলো।[১৩] বিশেষ করে যখন হিন্দুস্তানে ইসলামী হুকুমত ছিলো, তখন ফিকহ ও ফাতওয়ার তাখাসসুস ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিলো।

হিন্দুস্তানে দারুল ইফতা ও ফাতওয়া বিভাগগুলোতে তুলনামূলকভাবে ফিকহে মুজাররাদের চর্চাই বেশি হতো। এর পেছনে মৌলিক কারণ দু'টি বলা যায়-

এক. ইসলামী আদালত-এ কাযী বা জজের প্রয়োজনীয়তা।

বলা যায়, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই হিন্দুস্তানের বিচারব্যবস্থার সাথে হানাফী ফকীহগণ জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে দিন দিন তাদের প্রভাব বাড়তেই থাকে। তাই ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য ছিলো কাযার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এমন ব্যক্তি গড়ে তোলা। এজন্য শিক্ষা কারিকুলামে এ পদ্ধতিটি গৃহীত হয় যেন একজন ফকীহ সহজ ও সুন্দরভাবে কাযা'র দায়িত্ব আদায় করতে সক্ষম ও পারদর্শী হয়ে উঠে। এ কারণেই তখনকার ফাতওয়া বিভাগসমূহে আলফিকহুল মুজাররাদের প্রভাব বেশি ছিলো।

ড. মুহাম্মদ ইসহাক সিরাজী সপ্তম হিজরীর নেসাবে তালীমে হাদীসের কিতাব কম থাকার কারণ প্রসঙ্গে বলেন-

کیونکہ ہند میں جس نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی، اس کا مقصد بھی وہی تھی جو وسطی ایشیا کے ملکوں میں تھا یعنی طالب علم کو قاضی کے عہدے کیلئے تیار کرنا.[১৪]

---

[১২] ফিকহে মুজাররাদ অধ্যয়নের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: (الأشباه والنظائر كتابا وفنا)

[১৩] দ্রষ্টব্য: শিক্ষাবিজ্ঞান ও তাখাসসুস

[১৪] ইলমে হাদীস মেঁ বাররে আযিম পাক ও হিন্দ কা হিস্যা: ৬৮, মাজাল্লায়ে মা'আরিফ: ২২/২৫২-২৫৪, আযমগড়। তৎকালীন নেসাবে পড়া-শুনা করেই উলামায়ে কিরাম শত শত বছর যাবৎ কাযার দায়িত্ব পালন করেছেন। মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী রাহ. (১৩৭৫ হি.) বলেন,

قطع نظر اس سے کہ ہندوستان میں سوڈیڑھ سو سال نہیں بلکہ تقریبا چھ سات سو سال تک دین کا سارا کاروبار دینیات کے اسی مختصر نصاب کے پڑھنے والوں نے انجام دیا ہے، قضاء اور افتاء صدارات جیسی تمام مذہبی خدمات کو یہی لوگ قطب الدین ایبک کے زمانہ سے بہادر شاہ کے زمانہ تک بلکہ جب تک انگریزی حکومت کے محکمے مسلمان قاضیوں اور صدور کے ہاتھوں میں رہے، اس وقت تک یہی لوگ انجام دیتے رہے۔

(হিন্দুস্তান মেঁ মুসলমানু কা নিযামে তা'লীম ওয়া তারবিয়াত: ১/৩৭৪)

হিন্দুস্তানের নেসাব সমাপ্তকারী উলামাগণকে অন্য ভূখণ্ডের উলামায়ে কিরাম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। (হিন্দুস্তান মেঁ মুসলমানু কা নিযামে তালীম ওয়া তারবিয়াত: ১/৩৭৫) যেমন, আল্লামা আবু হাফস সিরাজুদ্দিন রাহ. (৭৭৩ হি.) হিন্দুস্তানে ফিকহ অর্জন করেছেন। আল্লামা ত-শকুবরী যাদা রাহ.বলেন,

تفقه ببلاده على الوجيه الرازي والسراج الثقفي والركن البدايوني وغيرهم من علماء الهند.

(মিফতাহুস সা'আদাহ সূত্রে হিন্দুস্তান মেঁ মুসলমানু কা নিযামে তা'লীম ওয়া তারবিয়াত: ১/৩৭৬)

দুই. সাধারণ মানুষের মাসআলা জানার চাহিদা।

হিন্দুস্তানের মুফতিয়ানে কেরাম জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যার শর'য়ী সমাধান প্রদানের দায়িত্ব পালন করতেন। স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের এই চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে পূর্ববর্তীদের ফাতাওয়া সংকলন ও মাসাইলের কিতাব তাদের বেশি অধ্যয়ন করতে হতো। এ কারণেও ফিকহে মুজাররাদের গুরুত্ব বেশি ছিলো।

পরবর্তীতে কাযার চাহিদা কমে গেলেও মুসলমান জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের চাহিদা স্বাভাবিকভাবে বাকি থেকে যায়। তাই ফিকহের বিশেষায়িত অধ্যয়নের মাঝে ফিকহে মুজাররাদের প্রাধান্যতা বহাল থাকে।

তবে ফিকহে মুদাল্লালের চর্চাও তখন ছিলো এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কিতাবও পড়ানো হতো। এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র হওয়ার সুবাদে নতুন নতুন ঘটনা ও সমস্যা সামনে আসতো। তার মাঝে এমন বিষয় থাকাটা খুবই স্বাভাবিক যা সম্পর্কে পূর্বের ফুকাহায়ে কেরাম স্পষ্ট কোনো সমাধান উল্লেখ করেননি। তখন সমকালীন ফকীহগণ ফিকহে মুদাল্লাল ও ফিকহে নাওয়াযিলের আলোকে সমাধান দিতেন। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

হিন্দুস্তানে ঐ পদ্ধতির প্রভাব এখনও বিদ্যমান। আমরা ফিকহ ও ফাতওয়া বিভাগে ফিকহে মুদাল্লাল অধ্যয়ন করলেও ফিকহে মুজাররাদের অধ্যয়নই বেশি করে থাকি। ফাতওয়া লেখার ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ফাতাওয়ার কিতাব থেকে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করে থাকি। এগুলো মূলত ফিকহে মুজাররাদ চর্চার অন্তর্ভুক্ত।

আমরা যারা তালিবে ইলম আছি, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মাসআলার দলীল আর হাওয়ালা এক বিষয় নয়। কোনো মাসআলা 'রদ্দুল মুহতার'-এ পাওয়া গেলে একটি হাওয়ালা পাওয়া গেলো মাত্র। হ্যাঁ, যদি ইমামগণ এ মাসআলা কোন দলীলের ভিত্তিতে বলেছেন তা খুঁজে বের করে উল্লেখ করা হয়, তাহলেই দলীল উল্লেখ করা হয়েছে বলা যাবে। তবে যেহেতু সাধারণের জন্য ফিকহী হাওয়ালাই দলীলের পর্যায়ে গণ্য হয়, তাই ফাতওয়ার সাথে নির্ভরযোগ্য কিছু হাওয়ালা উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়।

সুতরাং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, কোনো তালিবে ইলম যদি ফিকহে মুজাররাদের আলোকে ফাতওয়া লেখার যোগ্যতা অর্জন করে; কিন্তু ফিকহে মুদাল্লালে তার কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জিত না হয়, তাহলে সে নাওয়াযিল বিষয়ে সমাধান দেয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। তার উচিত হবে, বিজ্ঞ মুফতীর সমাধান ও ফাতওয়া অনুসরণ করা।

ফিকহের প্রথম স্তর তথা আলফিকহুল মুজাররাদ তুলনামূলক সহজ। পরবর্তী স্তরগুলো কঠিন এবং কষ্টসাধ্য। এজন্য ফিকহুন নাওয়াযিলের প্রথম কাজ হলো আলফিকহুল মুজাররাদের ধাপগুলো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিপূর্ণ করা এবং কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জন করা। এর পর যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে অবশ্যই ফন্নী কোনো উস্তাযের সাথে পরামর্শ করতে হবে এবং যাচাই করতে হবে যে, তালিবে ইলম পরবর্তী ধাপের মালাকা এবং যোগ্যতা রাখে কি না। শুধু আগ্রহ থাকলেই হবে না; বরং প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও থাকতে হবে। কাঙ্খিত যোগ্যতা ব্যতীত পরবর্তী

তিনি মিসরে গমন করলে সেখানকার উলামায়ে কিরাম তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-মূল্যায়ন প্রদর্শন করেছেন। এমনকি একপর্যায়ে সেখানকার কাযীর পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত করা হয়। (আদদুরারুল কামিনা-ইবনে হাজার: ৪/১৮২, দারুল মা'আরিফিল উসমানীয়া, হায়দারাবাদ)

ধাপে প্রবেশ করলে বিভিন্ন সমস্যা ও শঙ্কার সম্মুখীন হতে হবে।

লক্ষ করে দেখুন, সালাফের যামানায় মুজতাহিদ খুব কম ছিলেন। হাতেগোনা কয়েকজন; কিন্তু বর্তমানে সালাফী নামধারী ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে মুজতাহিদ। ঘরে ঘরে মতানৈক্য, ইখতিলাফ ও অনিয়ন্ত্রিত ফাতওয়া। এর অন্যতম কারণ হলো, পূর্ণযোগ্যতা ছাড়াই আলফিকহুল মুদাল্লাল ও আলফিকহুল মুকারান-এর স্তরে অনুপ্রবেশ।

দুই. আলফিকহুল মুদাল্লাল

সহজে বলা যায়, আলফিকহুল মুদাল্লাল হলো, দলীলের আলোচনাসহ মাসাইল ও ফিকহের চর্চা। আমাদের দরসে নিযামীতে সাধারণত হিদায়া কিতাব থেকে মুদাল্লাল ফিকহের চর্চা শুরু হয়। মুদাল্লাল ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হলো, 'আলফিকহুল মু'আল্লাল'।

ফিকহে মুদাল্লালের জটিলতম শাখা হলো, ফিকহুন নাওয়াযিল। ফিকহে মুদাল্লালের অন্যান্য শাখায় দক্ষতা অর্জন করা ব্যতীত ফিকহুন নাওয়াযিল চর্চা আশঙ্কাপূর্ণ ও বিপদজনক।

আলফিকহুল মুদাল্লালের স্তরসমূহে পরিপূর্ণরূপে পারদর্শী হলে উস্তাযের পরামর্শে পরবর্তী ধাপ আলফিকহুল মুকারান-এ প্রবেশ করতে পারবে।

তিন. আল ফিকহুল মুকারান

সহজে বলা যায়, আলফিকহুল মুকারান হলো দুই বা ততোধিক ইজতিহাদ বা মাযহাবের ফিকহের তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং কোনো একটিকে প্রাধান্যদান।

এটা ফিকহের সর্বশেষ স্তর। ফিকহে মুকারান সম্পর্কে দরসে নিযামীতে সুনির্দিষ্ট কিতাব না থাকলেও এর চর্চা ঠিকই হয়ে থাকে। প্রাথমিক চর্চা শুরু হয় হিদায়া কিতাব থেকে। এর পর মিশকাতসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবের দরসী আলোচনার মাধ্যমেও ফিকহে মুকারানের উল্লেখযোগ্য অংশ চর্চা হয়ে যায়।

এখানে যেহেতু শুধু ফিকহে মুদাল্লাল সম্পর্ক আলোচনা করার ইচ্ছা, তাই ফিকহে মুকারান সম্পর্কে আলোচনা দীর্ঘ করা হলো না। নিম্নে ফিকহে মুদাল্লাল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

হানাফী মাযহাবে ফিকহে মুদাল্লালের গুরুত্ব

দলীল ছাড়া ফিকহ হতে পারে না। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। প্রত্যেক মাযহাবেই দলীলের গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান ফিকহী মাযহাবগুলোর মাঝে প্রধানতম মাযহাব হলো হানাফী মাযহাব। হানাফী ফিকহেও দলীলের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে দলীলের বিচার-বিশ্লেষণ শুধু যোগ্যদের জন্য। ইমাম আবু হানীফা রাহ. খুব ভালো করেই জানতেন যে, সাধারণ মানুষ দলীল বুঝতে অক্ষম। সুতরাং তাদের জন্য তাকলীদ অবধারিত। তাই তিনি কোনো সাধারণ মানুষকে বলেননি যে, তোমাকে দলীল মেনেই আমল করতে হবে, অথবা দলীল ছাড়া আমার ফাতওয়া গ্রহণ করবে না। এমন কোনো প্রমাণ নেই; বরং তিনি তো এ কথা বলেছেন যে, প্রয়োজনে মুজতাহিদ আলেমের জন্যও তাকলীদ করার অবকাশ রয়েছে। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহ. (৩৭০ হি.) মুজতাহিদের তাকলীদের আলোচনায় বলেন-

في كتاب الحدود– وذكر ابو الحسن أنه قول أبي حنيفة رحمه الله أن له تقليده، وأن له أن يعمل برأيه.[১৫]

তবে ইমাম আবু হানীফা রাহ. (১৫০ হি.) দলীলের গুরুত্ব বিবেচনা করে মুজাতাহিদ ও বিজ্ঞ ফকীহদের বলেছেন-

لايحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.[১৬]

তিনি আরো বলেছেন-

حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي.[১৭]

ইমাম আবু হানীফা রাহ. এই কথাগুলো বলেছেন ঐ যামানার মুফতী তথা মুজতাহিদকে। সাধারণ কাউকে বলেননি। তাঁর এই উক্তিগুলোর বর্ণনাকারী সবাই যোগ্য ও বিজ্ঞ ফকীহ। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. (৭২৮ হি.) এ ধরনের উক্তিসমূহের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন-

منع الأئمة عن التقليد إنما هو في حق القادر على أخذ الأحكام عن الأدلة[১৮]

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.ও (২৪১ হি.) এই নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. সম্পর্কে বলেন-

ويأمر العامي أن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب، وينهى العلماء من أصحابه **كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي؛ وأبي بكر الأثرم وأبي زرعة؛ وأبي حاتم السجستاني ومسلم وغيرهم:** أن يقلدوا أحدا من العلماء.[১৯]

সর্বোপরি ইমাম আবু হানীফা রাহ. এই উক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞ ফকীহকে ফিকহে মুদাল্লাল চর্চার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। এছাড়া ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর প্রতিষ্ঠিত ফিকহী বোর্ডেও উন্মুক্তভাবে ফিকহে মুদাল্লাল ও ফিকহে মুকারানের চর্চা হতো।

তাঁর এ বক্তব্য ও আমল পরবর্তী ফকীহদের মাঝে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে। বিজ্ঞ ফকীহগণ নিজ যোগ্যতা ও প্রয়োজনমাফিক ফিকহে মুদাল্লাল চর্চা করেছেন।

হানাফী মাযহাবে ফিকহে মুদাল্লালের ইতিহাস সবিস্তারে লিখলে কয়েক খণ্ড কিতাবের রূপ নিবে। কিছু তালিবে ইলম ভাইয়ের ধারণা হলো, আমাদের মাযহাবে ফিকহে মুদাল্লাল বা ফিকহী মাসাআলাসমূহের হাদীস থেকে প্রমাণ বিশ্লেষণের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে হয়নি। এ ধারণা আদৌ সঠিক নয়; বরং প্রচুর পরিমাণে কাজ হয়েছে। আমাদের ইমামগণ এ বিষয়ে হাজারো কিতাব লিখেছেন। কিছু হারিয়ে গেলেও আজও শতাধিক কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা না হলে কিতাবগুলোর সূচি এবং প্রাপ্তিস্থান নিয়ে আলোচনা করা যেতো।[২০]

---

[১৫] আলফুসুল ফিল উসূল: ২/৩৭২

[১৬] আলইনতিকা ফী ফাযাইলিল আইম্মাতিস সালাসাতিল ফুকাহা: ৪৫

[১৭] আলমীযানুল কুবরা: ১/৫৫

[১৮] মাজমুউল ফাতাওয়া: ২/২০৩, আলকালামুল মুফীদ: ২৩৩ থেকে সংগৃহীত।

[১৯] মাজমুউল ফাতাওয়া: ২/২৪

[২০] আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ. (১০৫২ হি.)-এর উস্তায আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব মুত্তাকী রাহ. সুন্দরই বলেছেন:

প্রাথমিকভাবে ইমাম কাসিম ইবনে কুতলুবুগা রাহ.[২১] রচিত 'তাজুত তারাজিম' নামক কিতাব মুতালা'আ করলেই এ অমূলক ধারণার অবসান ঘটবে ইনশাআল্লাহ। এ কিতাবে তিনি ঐ সকল হানাফী ইমামদের জীবনী উল্লেখ করেছেন, যারা ফিকহের কোনো না কোনো বিষয়ে কিতাব রচনা করেছেন। কিতাবটি অধ্যয়ন করলেই স্বাভাবিকভাবে বুঝে আসে যে, আমাদের মাযহাবে ব্যাপকভাবে ফিকহে মুদাল্লালের চর্চা হয়েছে।

মোটকথা, আমাদের মাযহাবের অনেক ইমামই ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর উল্লিখিত বাণী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এখানে শুধু ইমাম কাসিম ইবনে কুতলুবুগা রাহ. (৮৭৯ হি.)-এর কথা উল্লেখ করেই আলোচনা শেষ করছি। ইমাম কাসিম ইবনে কুতলুবুগা রাহ. ইমাম আবু হানীফার ঐ উক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফিকহে মুদাল্লাল চর্চার প্রতি বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন-

هذه الرواية هي التي حملتني على شرحي للقدوري الذي ذكرت فيه من أين أخذوا علمهم.[২২]

হিন্দুস্তানে মুদাল্লাল ফিকহের চর্চা

হিন্দুস্তানে মুদাল্লাল ফিকহ চর্চার ইতিহাস বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে কয়েকটি ধাপে নিম্নে আলোচনার করা হলো।

১ম ধাপ: ইসলাম আগমনের পর থেকে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত

ইসলাম সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে হিন্দুস্তানের সিরিন্দিপ, মালদ্বীপ ও মালাবারে আগমন করে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাব ও ইসলামের সংবাদ ঐ সময় এতদঞ্চলে পৌঁছলেও ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ পৌঁছে হযরত উমর রা.-এর খেলাফতকালে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অনেক সাহাবী হিন্দুস্তানে আসেন এবং দাওয়াতি কাজ করেন। একপর্যায়ে বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের কলোনীও প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩]

স্বাভাবিকভাবেই যখন হিন্দুস্তানে ইসলাম এসেছে, তখন ইসলামের সাথে ফিকহ ও ফিকহের দলীলও এসেছে। সুতরাং ব্যাপকার্থে হিন্দুস্তানে আলফিকহুল মুদাল্লালের ইতিহাস ইসলাম

حنفی مذہب کی کتابیں جو ماوراء النہر اور ہندوستان میں رائج ہیں ۔ ان میں اکثر احکام کے ساتھ قیاس اور دلائل عقلیہ کو نقل کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایسی کتابیں تصنیف ہوتی ہیں، جن میں ہر قول حنفی کے ساتھ حدیث صحیح نقل کی گئی ہے بلکہ بعض علماء حنفیہ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ ہر ایک مطلب پر آیت اور حدیث استدلال میں پیش کی ہے، حتی کہ اس بات کے کہنے کا موقعہ مل جاتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ہی اصحاب رائے میں سے ہیں حنفی نہیں، چنانچہ اس دعوی کی تصدیق شیخ ابن ہمام کی شرح ہدایہ، شمنی کی شرح مختصر الوقایہ نیز مواہب الرحمان اور اس کی شرح سے (جو بعض علماء مصر نے تصنیف کی ہیں) بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ (انوار الباری ۲/۱۷۱)

[২১] আবুল আদল যায়নুদ্দীন কাসিম ইবনে কুতলূবুগা ইবনে আব্দুল্লাহ আস সূদূনী আলমিশরী, আলহানাফী। ৮০২ হিজরীর মুহাররম মাসে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৭৯ হিজরীতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (৮৬১ হি.), ইবনে হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) প্রমূখ তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদ। তিনি হাদীস, ফিকহসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'তাজুত তারাজীম' 'শরহু মুখতাসারিল মানার' তাঁর রচনাবলির অন্যতম। (আল আ'লাম লিযযিরিকলী: ৫/১০০, তাজুত তারাজীম: ১১-৩৮)

[২২] তাজুত তারাজিম, ইবরাহীম ইবনে মাওসিল রাহ.-এর জীবনী দ্রষ্টব্য

[২৩] তারীখে ফিরিশতা: ২/৮৮৫, আরব ও হিন্দ কে তা'আল্লুকাত: ১৭৭

আগমনের ইতিহাসের সাথেই সম্পৃক্ত।

২য় ধাপ: সিন্ধে ইসলামী খেলাফত ও হানাফী ফিকহের চর্চা

হযরত উমর রাযি. (২৩ হি.)-এর যুগ থেকে নিয়ে বিভিন্ন সময় সাহাবা ও তাবেঈগণ সিন্ধ ও হিন্দে ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করেছেন। এ অঞ্চলে তাঁরা জিহাদ করেছেন এবং কোনো কোনো এলাকা দখলও করেছেন; কিন্তু তা ছিলো অস্থায়ী এবং খণ্ডিত কিছু চিত্রের মতো।

উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের অনুমতিতে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (৯৫ হি.) ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম আস সাকাফীকে (৯৮ হি.) হিন্দুস্তানের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি সিন্ধে পৌঁছে মানুষদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন এবং সিন্ধের এলাকাগুলোতে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করে ইসলামী খেলাফতের সাথে বিজিত এলাকাসমূহকে সংযুক্ত করেন।

মুহাম্মদ ইবনে কাসেমের সাথে উলামায়ে কেরামের বিশাল জামাত ছিলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ তাদেরকে কুরআন ও অন্যান্য উলূমে ইসলামীয়া শিক্ষা দেয়ার প্রতি তাগিদ করেছিলেন। এছাড়া পরবর্তীতে মুহাম্মদ ইবনে কাসিম নিজ উদ্যোগে হাজার হাজার আলেম ও আরবকে সিন্ধে নিয়ে আসেন। তাঁরা এখানেই অবস্থান গ্রহণ করেন। ঐ সময় আরবদের সংখ্যা কী পরিমাণ ছিলো তা শুধু মুলতানে অবস্থানরত আরব সৈন্য সংখ্যা থেকেই অনুমান করা যায়। শুধু মুলতানে ৫০ হাজার আরব সৈন্য ছিলো।[২৪]

সংক্ষিপ্ত এ ইতিহাস থেকেই বুঝা যায়, সিন্ধে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এ ভূখণ্ডে বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ কাযার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেমন, মূসা ইবনে ইয়াকুব আস সাকাফী এবং ইয়াযীদ ইবনে আবী কাবশা আস সাকসাকী রাহ.-এর মত হাফেযে হাদীস ও ফকীহ তখন কাযী ছিলেন।[২৫]

১৩২ হিজরীতে সাফ্‌ফাহের মাধ্যমে আব্বাসীদের খেলাফত শুরু হয়। আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদ ১৭০ থেকে ১৯৩ হিজরী পর্যন্ত খেলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি হযরত ইমাম আবু ইউসুফকে (১৮২ হি.) প্রধান কাযীর পদে অধিষ্ঠিত করেন।

ফিকহুন নাওয়াযিল-এর ক্ষেত্রে ফিকহে হানাফীর শক্তিশালী অবস্থান এবং ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. প্রধান কাযী হওয়ার সুবাদে পরবর্তীতে অধিকাংশ কাযী হানাফীই হতেন। কোনো কোনো স্থানে অন্য মাযহাবের কাযীও ছিলেন। খুব সম্ভব ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. কাযী হওয়ার পরপরই হানাফী মাযহাব সিন্ধে এসে যায়।

আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ মাকদিসী রাহ. (৩৭৫ হি.) ইসলামী বিশ্বের একটি বড় অংশে সফর করেছেন। তিনি সিন্ধেও এসেছিলেন। তিনি নিজের সফর থেকে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে ইসলামী বিশ্বের শহর-উপশহরের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি কিতাব রচনা করেন। সেখানে তিনি সিন্ধের বিবরণ তুলে ধরেছেন। তার বিবরণ থেকে বোঝা যায়, ফিকহে হানাফী সিন্ধে অনেক পূর্বেই পৌঁছেছিলো। তিনি বলেন-

---

[২৪] ইলমে হাদীস মে বাররে আযীম কা হিস্যা: ৪১-৪২

[২৫] তারীখে ফিরিশতা: ২/৮৮৫, ইলমে হাদীস মে বাররে আজীম কা হিস্যা: ৪২-৪৬

ولا تخلو القصبات من فقهاء على مذهب أبي حنيفة رحمه الله.[২৬]

আল্লামা ইবনুন নাদীম ৩৮৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। তিনি হানাফী ফিকহের বিস্তৃতি ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন-

العلم شرقا وغربا، قربا و بعدا، برا وبحرا تدوينه (أي أبي حنيفة) رضي الله عنه.[২৭]

হিজরী ৪র্থ শতকের শেষ দিকে শিয়া ইসমাঈলীরা সিন্ধ ও মানসুরা দখল করে এবং পুরো ভূখণ্ডের পূর্বেকার ইতিহাস প্রায় মুছে ফেলে।

৩য় ধাপ: গযনবী যুগ

সুলতান মাহমুদ গযনবী (৩৬১-৪২১) প্রথম মুসলিম শাসক, যিনি সুলতান উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি ৩৯১ হিজরী থেকে হিন্দুস্তান দখল শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন এলাকা জয় করতে থাকেন এবং বিজিত এলাকাগুলোতে ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালু করেন।[২৮]

সুলতান মাহমুদ গযনবী একজন হানাফী ফকীহ ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাবের উপর সুবিশাল কিতাবও রচনা করেছেন। ইমাম মাসউদ ইবনে শায়বা রাহ. 'কিতাবুত তা'লীম'-এ বলেন-

السلطان محمود من أعيان الفقهاء فريد العصر في الفصاحة والبلاغة، وله التصانيف في الفقه والحديث والخطب والرسائل، وله شعر جيد، ومن تصانيفه «كتاب التفريد على مذهب أبي حنيفة» مشهور في بلاد غزنة وهي في غاية الجودة وكثرة المسائل ... لعله نحو ستين ألف مأة أهـ.[২৯]

সুলতান মাহমুদ গযনবী সম্পর্কে এটাই প্রসিদ্ধ ও প্রমাণিত যে, তিনি হানাফী ছিলেন। তবে ইমামুল হারামাইন আব্দুল মালিক ইবনুল জুওয়াইনী রাহ. (৪৭৮ হি.) 'মুগীছুল খলক' নামে একটি কিতাব রচনা করেছেন।[৩০] যাতে তিনি কিছু দুর্বল ও জাল দলীল ও ঘটনা উল্লেখ করে শাফেয়ী মাযহাবের বড়ত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিতাবটি সে যুগে হানাফী-শাফেয়ী দ্বন্দ্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। ঐ কিতাবে তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন যা থেকে বোঝা যায়

---

[২৬] আহসানুত তাকাসীম ফি মা'রিফাতিল আকালিম: ৪৮১ কায়রো (আরব ও হিন্দ কে তাআল্লুকাত: ২২৪)

[২৭] আল ফিহরিস্ত: ২৮২, মাকতাবা তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো।

[২৮] তারীখে ফিরিশতা: ২/১০৪

[২৯] আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ: ৩৯২

[৩০] ইমাম গাযালী রাহ.-সহ অনেক শাফেয়ীদের কিতাবে ইবনুল জুওয়াইনী রাহ.-এর প্রতি সম্বন্ধ করে 'মুগীছুল খলক'-এর নাম বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কিতাবটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তা থেকে বিভিন্ন বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। হানাফী ইমামগণ এই কিতাবের উপর ব্যাপকভাবে খণ্ডনমূলক কিতাব লিখেছেন। কিন্তু শাফেয়ীদের পক্ষ থেকে কেউ জোরালোভাবে এ দাবি করেননি যে, এ কিতাবের নিসবত প্রমাণিত নয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কিতাবটি ইবনুল জুওয়াইনীর হওয়া স্বয়ং শাফেয়ীদের নিকটই একটি প্রসিদ্ধ বিষয়। তবে কিছু আলেম দাবি করেছেন যে, এ কিতাবের নিসবত প্রমাণিত নয়। আবার কেউ বলেছেন নিসবত প্রমাণিত; তবে এর মাঝে পরবর্তীতে চক্রান্তমূলক সংযোজন করা হয়েছে। যেমন, শায়খ আব্দুল আজীম আদ-দীব বলেন-

"...زيفوا على إمام الحرمين ذلك الكتاب القبيح المسمى "مغيث الخلق في اتباع المذهب الحق" بما فيه من خزعبلات وترهات ضد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وقد تجمع لدى العبد الفقير إلى لطف مولاه دلائل كافية لدحض هذه الفرية، وإظهار براءة إمام الحرمين منها." (مقدمة التحقيق لنهاية المطلب. ص: ٣١٧)

যে, সুলতান হানাফী হলেও পরবর্তীতে শাফেয়ী হয়ে গিয়েছিলেন।[৩১] এই ঘটনাকে ভিত্তি করেই অনেকে তাকে শাফেয়ী দাবি করেছেন; কিন্তু বিভিন্ন কারণে ঐ ঘটনাটি ভিত্তিহীন। যেমন-

ক. ঘটনাটির সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ, ঐ ঘটনার মূল ব্যক্তি হলেন আবু বকর আল কাফফাল শাফেয়ী। তিনি ৪১৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আর ইমামুল হারামাইন আব্দুল মালিক ৪১৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং বোঝা গেলো, ইমামুল হারামাইন ঐ ঘটনা নিজে দেখেননি; বরং অন্যর মাধ্যমে শুনেছেন। কিন্তু তিনি কার থেকে শুনেছেন তা উল্লেখ করেননি। সুতরাং সনদ মুনকাতি'।

খ. ইবনুল জুওয়াইনী রাহ. ঘটনাটি শুরু করেছেন يحكى শব্দ দিয়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তা মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেননি; বরং শ্রুতিকথার মত একটি ঘটনা লিখেছেন। আর ইবনুল জুওয়াইনীর পূর্বে অন্য কেউ এই ঘটনা উল্লেখই করেননি। আল্লামা কাওছারী রাহ. বলেন-

لم نر مطلقا هذه الحكاية لأحد قبل الجويني.[৩২]

খুব সম্ভব তৎকালীন শিয়ারা যারা মুজতাহিদ ইমামদের বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফাকে গালি দিত, ঘটনাটি তাদের বানানো।[৩৩] আর ইবনুল জুওয়াইনী রাহ.-এর মতো কট্টর শাফেয়ী তা লুফে নিয়েছেন।

গ. অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে ভিত্তিহীন বলেছেন। আল্লামা জামালুদ্দীন ইবনে তাগরীবারদী (৮৭৪ হি.) এই ঘটনা ভিত্তিহীন হওয়ার একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

وما حكاه ابن خلكان من قصة القفال في صلاة الحنفية بين يدي ابن سبكتكين المذكور ليس لها صحة، يعرف ذلك من له أدنى ذوق من وجوه عديدة ... فهذا كله موضوع على القفال من أهل التحامل والتعصب. أهـ[৩৪]

আল্লামা যাহেদ কাউছারী রাহ. (১৩৭১ হি.) বলেন-

والحكاية كلها مختلقة، لا القفال المروزي رئيس الطريقة الخراسانية في المذهب الشافعي صلى هذه الصلاة، ولا السلطان انتقل من مذهبه بسبب ما.[৩৫]

আরো অনেক ইমাম এই ঘটনাটি ভিত্তিহীন বলেছেন এবং বিভিন্ন দলীলের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। যেমন, শামসুল আইম্মাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সাত্তার কারদারী রাহ. (৬৪২ হি.)

---

[৩১] ওয়াফায়াতুল আ'য়ান-ইবনু খল্লিকান: ৫/১৮০, দারু ছাদির বৈরুত।

[৩২] ইহকাকুল হক: ৬৩

[৩৩] ইমাম আবু হানীফা রাহ. কুফাতে আহলুস সুন্নাহর পক্ষ নেয়ায় শি'আরা তার উপর নারায ছিলো। পরবর্তীতে রাজনৈতিক কারণে তাদের বিদ্বেষ আরো বেড়ে যায়। তারা বিভিন্নভাবে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর প্রতি কালিমা লেপনের চেষ্টা করেছে এবং তার সম্পর্কে অহেতুক অনেক ঘটনা বানিয়েছে। এমনকি তাঁকে লা'নাতও করেছে। দেখুন, তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাব আল কাফী, রিজালুল কাশী সহ অন্যান্য কিতাব। এতে ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে। তাদের এই বিদ্বিষ্ট মনোভাব অব্যাহত ছিলো।

[৩৪] আন নুজুমুয যাহেরা ফী মুলুকি মিসর ওয়াল কাহিরা: ৪/২৭৪, দারুল কুতুব

[৩৫] ইহকাকুল হক: ৬৩

الرد على الطاعن المعثار والانتصار لسيد فقهاء الأمصار কিতাবে, আল্লামা মাসউদ ইবনে শায়বা রাহ. عقد الجمان في تاريخ (৮৫৫ হি.) -كتاب التعليم-এর ভূমিকায়; আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ. (৮৫৫ হি.) عقد الجمان في تاريخ الزمان কিতাবে; আল্লামা ইবনে দাকমাক রাহ. نظم الجمان في طبقات فقهاء مذهب النعمان কিতাবে। এছাড়াও আরো অনেকেই ঘটনাটিকে ভিত্তিহীন বলেছেন।

ঘ. যদি মেনে নেয়া হয় যে, 'মুগীছুল খলক' কিতাবটির নিসবতই ইমাম জুওয়াইনীর প্রতি প্রমাণিত নয় অথবা পরবর্তীতে এতে ষড়যন্ত্রমূলক সংযোজন করা হয়েছে, যেমনটি টীকায় আলোচনা করা হয়েছে, তাহলে ঘটনাটি ভিত্তিহীন হওয়ার বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায়।

সর্বোপরি সুলতান মাহমুদ হানাফী ছিলেন। আর তিনি ছিলেন খেলাফতে আব্বাসিয়ার অধীনে। যার কাযা ব্যবস্থা সাধারণত হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হতো।

সুলতান রাষ্ট্রীয়ভাবে গজনীতে একটি বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পাশে একটি সমৃদ্ধ মাকতাবাও স্থাপন করেন। মাদরাসায় পড়ানোর জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রে বিজ্ঞ আলেমদের একত্রিত করে সব ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন।[৩৬] এমনিতেই সুলতানের দরবারে উলামায়ে কেরামের ঢল থাকতো। তার সুবাদেই হিন্দুস্তানে হাজার হাজার বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম আগমন করেন এবং অবস্থান করেন। ইমাম যাহাবী রাহ. (৭৪৮হি.) উল্লেখ করেন-

كان مجلسه مورد العلماء.[৩৭]

ড. মুহাম্মদ ইসহাক সিরাজী বলেন-

مسلمانوں کی حیرت انگیز سیاسی فتوحات کے ساتھ ہی پورے شمالی ہند میں اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت ہونے لگی، فتوحات نے مسلمانوں کے لئے ہند کے دروازے کھول دئے تھے۔ ہمارا یہ مسئلہ ممالک سے مسلمان علماء، اولیاء اور مبلغین اسلام بڑی تعداد میں ہند آنے لگے تھے، جن کی ذاتی محنت و کوشش اور اثرات سے اسلام اور اسلامی علوم کی خوب اشاعت ہوئی۔[৩৮]

ঐ মাদরাসার শিক্ষাক্রম ও নেসাব কেমন ছিলো তার বিবরণ পাওয়া না গেলেও বলা যায় যে, সেখানে বাগদাদের মাদরাসার অনুসরণ করা হতো। আল্লামা আব্দুল হাই হাসানী রাহ. বলেন-

افسوس ہے کہ ہندوستان کی علمی تاریخ نہایت تاریکی میں ہے، ہم صحیح طور پر اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وقتا فوقتا نصاب درس میں کیا کیا تبدیل ہوئی ہیں تاریخ سے اسی قدر سراغ ملتا ہے کہ اس سر تبدیلی زمین فاتحان ہند کے ساتھ علم آیا تھا اور جو تبدیلیاں عراق ماوراءالنہر میں وقتا فوقتا ہوتی رہتی تھیں اس کا اثر یہاں کے نصاب میں بھی پڑتا تھا۔[৩৯]

এছাড়া ইসলামী শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ফিকহ। ফিকহ ব্যতীত ইসলামী শিক্ষা পূর্ণই

---

[৩৬] তারীখে ফিরিশতা: ১/১২৩

[৩৭] তারীখুল ইসলাম: ২৯/৪২

[৩৮] ইলমে হাদীস মেঁ বাররে আযীম কা হিস্যা: ৬৫

[৩৯] হিন্দুস্তান কা নেসাবে দরস, পৃ. ৪, হায়াতে শায়খ আব্দুল হক: ৬-৭

হতে পারে না। আল্লামা মানাযির আহসান গিলানী রাহ. বলেন-

میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر قابل ذکر اسلامی ملک میں مسلمانوں کی اعلی تعلیم میں قرآن (تفسیر)، حدیث، فقہ عقائد کی تعلیم، صحبت و بیعت کے ذریعہ سے ہوائے دل کے تازہ واردوں میں سیرت کی پختگی، کردار کی بلندی اور سب سے بڑی چیز یعنی للّٰہیت یا اخلاص باللہ میں رسوخ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہر زمانہ میں کی گئی ہے، ان پانچ چیزوں سے کسی زمانہ میں مسلمانوں کا تعلیمی نظام کبھی خالی نہیں رہا۔[৪০]

তাই স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে, গযনবী যুগেও হানাফী ফিকহের অন্যান্য শাখার সাথে সাথে মুদাল্লাল ফিকহের চর্চা হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠনিকভাবেই হয়েছে।

সুলতানের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার পর তার অনুকরণে অন্যান্য গভর্নররাও নিজ নিজ এলাকায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪১] এভাবে পুরো হিন্দুস্তানে ইসলামী প্রতিষ্ঠান এবং ফিকহ চর্চা বিস্তার লাভ করে। লামাযহাবী আলেম মাওলানা সিদ্দীক হাসান কিন্নাওজী ঠিকই বলেছেন-

خلاصہ حال ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے چونکہ اکثر لوگ بادشاہوں کے طریقہ اور مذہب کو پسند کرتے ہیں اسوقت سے آج تک لوگ حنفی مذہب پر قائم رہے اور ہیں اور اسی مذہب کے عالم اور فاضل قاضی اور مفتی اور حاکم ہوتے رہے۔[৪২]

৪র্থ ধাপ: ঘুরী ও দিল্লীর সালতানাতের যুগ (থেকে আলী মুত্তাকীর যুগ পর্যন্ত)

৫৮৭ হিজরীতে হিন্দুস্তানের শাসনক্ষমতা শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরীর হাতে আসে। তার মাধ্যমেই মূলত ঘুরীদের যুগ শুরু হয়।[৪৩]

৬০৭ হিজরীতে সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ শাসনক্ষমতা অর্জন করেন। তার মাধ্যমে দিল্লী সালতানাতের যুগ শুরু হয়।[৪৪] দিল্লির সুলতানগণ সবাই হানাফী ছিলেন এবং ইলম ও আহলে ইলমগণের কদর ও সম্মান করতেন। এই সুবাদে হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম ইরাক, ইরান ও খোরাসান থেকে দিল্লীতে হিজরত করেন। বিশেষ করে যখন চেঙ্গিস খান আব্বাসী খেলাফতকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলো, তখন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উলামায়ে কেরাম দিল্লীতে আসতে থাকেন।

দিল্লীতে তখন উলামা, ফুকাহা ও মুফতিয়ানে কেরামের এই পরিমাণ সমাগম হয় এবং এত ইলমী হালকা ও প্রতিষ্ঠান চালু হয় যে, ইলমী দিক থেকে দিল্লী তৎকালীন যুগের বলখ ও বুখারার সমপর্যায়ে চলে যায়। তাদের মাধ্যমে নতুন নতুন ইলমী হালকা ও মারকাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন বালবান ৬৬২ হিজরীতে শাসনক্ষমতা লাভ করেন। তার মাধ্যমে বালবানদের যুগ শুরু হয়। বালবানদের যুগেও প্রচুর পরিমাণ উলামা, ফুকাহা ও মুফতিয়ানে

---

[৪০] হিন্দুস্তান মেঁ মুসলমানুঁ কা নিযামে তা'লীম ওয়া তারবিয়াত: ১/১৭১

[৪১] তারিখে ফিরিশতা: ১/১২৩

[৪২] রসায়েলে আহলে হাদীস: ১০

[৪৩] ইলমে হাদীস মে বাররে আজীম কা হিস্যা: ৬৫

[৪৪] তারীখে হিন্দ: ৪৮

কেরাম হিন্দুস্তানে আগমন করেন।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও নেযামুদ্দীন আওলিয়া রাহ.-এর মুরীদ জিয়াউদ্দীন বারনী বুলন্দশহরী ১২৬৪ ঈ. থেকে ১৩৫৭ ঈ. পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানদের ইতিহাস রচনা করেছেন। তিনি হিন্দুস্তানে উলামা এবং ফুকাহায়ে কেরামের আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে বলেন-

وچندیں استادان ومفتیان وسرامدگان کہ از شاگردان وپسران علماء عہد شمسی، در گفتن سبق ونوشتن فتوی معتبر بودند۔[৪৫][৪৬]

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্তানে হানাফী মাযহাবের মুদাল্লাল ফিকহের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা অনেক আগেই শুরু হয়েছে, যেমনটি আমরা পূর্বে পড়েছি। কিন্তু তাদের নেসাবে কী কিতাব ছিলো তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তবে সপ্তম হিজরীর কিছু প্রতিষ্ঠানের নেসাবের ইতিহাস পাওয়া যায়। আল্লামা আব্দুল হাই হাসানী রাহ. (১৩৪১ হি.) সপ্তম হিজরীর নেসাবে তা'লীমের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। তাতে আলফিকহুল মুদাল্লালের অন্যতম কিতাব হিদায়ার নাম চিরভাস্বর হয়ে আছে। তিনি বলেন-

دور اول:۔ اس کا آغاز ساتویں صدی ہجری سے سمجھنا چاہئے اور انجام دسویں صدی پر اس وقت ہوا جبکہ دوسرا دور شروع ہو گیا تھا، کم وبیش دو سو برس تک مندرجہ ذیل فنون کی تحصیل معیار فضیلت سمجھی جاتی تھی؛ صرف، نحو، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، منطق، کلام ، تصوف، تفسیر، حدیث۔

نحو:۔ مصباح، کافیہ، لب الالباب مصنفہ قاضی ناصر الدین بیضاوی (چند ونوں کے بعد ارشاد مصنفہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی)

فقہ میں، ہدایہ،

اصول فقہ میں، منار اور اس کے شروح اور اصول بزدوی... [৪৭]

তখন পূর্ণ গুরুত্বের সাথেই হিদায়ার দরস হতো এবং দরস দানকারী উস্তায ফিকহে মুদাল্লালে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতেন।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সায়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে মুবারক কিরমানী মীর খোরদ (৭৭০ হি.) স্বচক্ষে দেখা ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একদিন সুলতানুল আউলিয়া ফিকহে মুদাল্লালের ইমাম নেযামুদ্দীন রাহ.-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেব রাহ. (৭২৭ হি.) হিদায়ার দরস দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় তৎকালীন আলেম মাওলানা কামালুদ্দীন সামানী (সম্ভবত শাফেয়ী) উপস্থিত হলেন। তাকে দেখেই মাওলানা ফখরুদ্দীন রাহ. হিদায়ার দরসের উপস্থাপনা পদ্ধতি পরিবর্তন

---

[৪৫] ترجمہ - اور ایسے باکمال اساتذہ اور مفتیان کرام جو عہد شمسی کے علماء کے شاگردوں اور لڑکوں میں سے پڑھانے اور فتوی دینے میں معتبر سمجھے جاتے تھے۔

[৪৬] হিন্দুস্তান মেঁ মুসলমানু কা নিযামে তা'লিম ও তারবিয়াত: ১/১৭৫

[৪৭] হিন্দুস্তান কা নেসাবে দরস: ৯

করলেন এবং-

ہدایہ کی احادیث کے تمسکات کو چھوڑ کر احادیث صحیحین سے تمسک کرنے لگے، مولانا کمال الدین نے فرمایا کہ حضرت! آپ ہدایہ کی احادیث کے تمسکات کو ترک کر کے دوسری حدیثوں سے تمسک کرتے ہیں، فرمایا اس میں اگر اپ کو موئی خدشہ ہو تو اسے بیان کیجئے، چونکہ آپ موثر اور دلکش تقریر میں نہایت مستحکم تمسکات لا رہے تھے اس لئے مولانا کمال الدین کو اعتراض کا کوئی موقع نہیں ملا، بلکہ وہ لفظ کی نہایت انصاف سے داد دیتے اور وسیع وجامع الفاظ میں تعریف و تحسین کرے جاتے تھے۔[৪৮]

এ থেকেই বোঝা যায়, মাওলানা ফখরুদ্দীন সাহেব হাদীস ও ফিকহে মুদাল্লালে কেমন পারদর্শী ছিলেন যে, কোনো প্রস্তুতি ব্যতীত এভাবে দরস শুরু করে দিয়েছিলেন। উক্ত ঘটনা থেকে এটাও বুঝে আসে যে, তখন হিদায়ার দরস কেমন হতো।

হিন্দুস্তানের ফুকাহায়ে কেরাম শুধু ফিকহে মুদাল্লাল অধ্যয়ন করতেন তা নয়; বরং ফিকহে মুদাল্লালের সমালোচনামূলক চর্চাও করতেন। খলীক আহমদ নেযামী সাহেব 'আখবারুল আখয়ার'-এর উদ্ধৃতিতে যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা থেকে বিয়ষটি স্পষ্ট।[৪৯] উদাহরণস্বরূপ তা এখানে উল্লেখ করা হলো-

مولانا احمد تھانیسری اس دور کے ایک اور جید عالم ہیں۔ وہ حضرت چراغ دہلوی کے مرید تھے، جب تیمور نے حملہ کیا تو وہ گرفتار ہو کر تیمور کے پاس پہنچے، وہاں نبیرہ شیخ الاسلام مولانا برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ سے سخت گفتگو ہوئی اور مولانا تھانیسری نے اپنے شاگردوں سے صاحب ہدایہ کی غلطیوں پر تقریر کرائی۔[৫০]

ফিকহে মুদাল্লালের কিতাব হিদায়ার শরহ ও হাশিয়া লেখার ক্ষেত্রেও হিন্দুস্তানের ফুকাহা ও মুফতিয়ানে কেরাম পিছিয়ে ছিলেন না।[৫১]

৫ম ধাপ: হযরত আলী মুত্তাকী ও ফিকহে মুদাল্লালের চর্চা

ফিকহে মুদাল্লাল চর্চার একটি দিক হলো, সুনানের কিতাবের আন্দাযে হাদীস সংকলন। সুনানের

---

[৪৮] সিয়ারুল আউলিয়া: ৩৮০-৩৮১, হিন্দুস্তান মেঁ মুসলমানু কা নিযামে তা'লীম ও তারবিয়াত: ১৮২

[৪৯] আফসোস যে, অন্যান্য ভূখণ্ডের মতো হিন্দুস্তানের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস ব্যাপকভাবে বর্ণিত হলেও ইলম, আহলে ইলমের ইতিহাস তেমন সংরক্ষিত, সংকলিত এবং প্রসিদ্ধ হয়নি। তা সত্ত্বেও যেসব ঘটনা পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে, এখানে ফিকহের চর্চা বেশ শক্তিশালী ও ব্যাপক পরিসরে হয়েছিলো। খলীক আহমদ নেযামী সাহেব বলেন:

ہندوستان میں ہمیشہ یہ دستور رہا کہ سلاطین بعض اہم فقہی مسائل پر علماء سے مشورہ کرتے تھے، کبھی کبھی محضر بھی طلب کیا جاتا تھا، جس میں دور دور سے علماء شرکت کے لئے آتے تھے، شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے متعلق ایک معاملہ پر ملک سے علماء کو طلب کیا گیا، تو ڈھائی سو علماء نے شرکت کی۔ غیاث الدین تغلق کے دربار میں شیخ نظام الدین اولیاءؒ کو علماء کے ایک جلسہ میں سماع کے متعلق اپنا نقطۂ نظر واضح کرنے کی لئے بلایا۔ فیروز شاہ نے حق شرب پر فقہی مسئلہ دریافت کرنے کے لئے علماء کو طلب کیا، صرف یہ ہی نہیں، سلاطین کو خود مسائل کی کافی معلومات تھی، محمد بن تغلق کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہدایہ نوک زبان پر تھی، دو سو فقہاء اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ (حیات شیخ عبد الحق ۴۳-۴۴)

[৫০] হায়াতে শায়খ আব্দুল হক: ২৯

[৫১] হায়াতে শায়খ আব্দুল হক: ৪৫-৪৬

কিতাবে প্রথমে ফিকহী কোনো একটি বিষয়কে বাবের শিরোনামে উল্লেখ করা হয়, তারপর এর স্বপক্ষে হাদীস উল্লেখ করা হয়। মূলত বাবের ফিকহী মাসআলা মুসান্নিফের পক্ষ থেকে একটি দাবির মতো। আর নিচে উল্লিখিত হাদীস তার দলীল ।[৫২] ইমাম হাকেম নিশাপুরী রাহ. বলেন-

فأما مصنف الأبواب فإنه يقول: ذكر ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الطهارة أو الصلاة أو غير ذلك من العبادات.[৫৩]

এ ধারায় হানাফী মাযহাবের অনেকেই কিতাব রচনা করেছেন। হিন্দুস্তানে বিশদাকারে সর্বপ্রথম আলী মুত্তাকী রাহ. এমন কাজ আঞ্জাম দেন। তিনি 'কানযুল উম্মাল' কিতাবটি ফিকহী অধ্যায়ে বিন্যাস করে ফিকহে মুদাল্লালের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখেন। পরবর্তীতে আরো অনেকেই এভাবে ফিকহে মুদাল্লালের খিদমত করেছেন। তাদের মাঝে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য আল্লামা সায়্যেদ আব্দুল্লাহ হায়দারাবাদী রাহ.। তিনি زجاجة المصابيح রচনা করে ইলমে হাদীস ও হানাফী ফিকহে মুদাল্লালের অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন।[৫৪]

এক্ষেত্রে আল্লামা যফর আহমদ থানভী রাহ.-এর অবদানও অতুলনীয়। তিনি ই'লাউস সুনান

---

[৫২] মূলত এ কারণেই একাধিক ইমাম বলেছেন, فقه البخاري في تراجمه। এ উক্তি দ্বারা পরোক্ষভাবে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, ইমাম বুখারী প্রথমে বাব লিখে তার স্বপক্ষে হাদীস উল্লেখ করার মাধ্যমে ফিকহে মুদাল্লালের খিদমত করেছেন। (হাদয়ুস সারী: ২০, মাকতাবাতুস সফা, কায়রো, কাঞ্জুল মুতাওয়ারী-ইবনে মুনাইয়্যির: ৫)

[৫৩] আল মাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলীল: ৩০, দারুদ দাওয়াহ, ইস্কান্দারিয়্যাহ।

[৫৪] দরসে নেযামীতে সাধারণত হাদীসের পাঠদান মিশকাতুল মাসাবীহ কিতাব দ্বারা শুরু হয়। মাসাবিহুস সুন্নাহ ও মিশকাতুল মাসাবীহ-এর লেখকদ্বয় শাফেয়ী মাযহাবের হওয়ায় তাঁরা তাঁদের স্বপক্ষের হাদীসগুলোই উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্নভাবে তা শক্তিশালী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। মাঝে মাঝে হানাফীদের দলীলের দুর্বলতাও প্রকাশ করেছেন। তাই হানাফী মাযহাব সম্পর্কে পূর্ব থেকে স্বচ্ছ ধারণা ব্যতীত প্রথমেই এ কিতাব অধ্যয়ন করলে শাফেয়ী মাযহাবের প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হতে পারে। আল্লামা যহীর আহসান নীমাভী রাহ. খুবই দরদমাখা ভাষায় এ আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেন-

یہ تو ظاہر ہے کہ حدیث میں پہلے بلوغ المرام یا مشکوۃ شریف پڑھائی جاتی ہے اور انکے مؤلف شافعی المذہب تھے ان کتابوں میں زیادہ تر وہی حدیثیں ہیں جو مذہب امام شافعی کے مؤید اور مذہب حنفی کے خلاف ہیں۔۔۔اکثر طلبہ یہ ابتدائی کتابیں پڑھکر مذہب حنفی سے بدعقیدہ ہو جاتے ہیں۔

(তাঁর এ মালফুজটি আসারুস সুনান ১ম খণ্ডের শেষে সংযুক্ত আছে)

অবশ্য এর প্রতিকার হিসেবে উলামায়ে দেওবন্দ শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্তন করেছেন। তাঁরা কিতাবটির দরসে হানাফীদের দলীল আলোচনা করে তার প্রাধান্য প্রমাণ করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এতে করে উল্লিখিত আশঙ্কা বাকি থাকে না।

এক্ষেত্রে গঠনমূলক কাজের দাবি ছিলো, এমন একটি কিতাব রচনা করা যা মিশকাতের অভাবকে পূরণ করবে এবং আমাদের মাযহাবের দলীলগুলো তাতে সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হবে। আর এই কাজটিই করেছেন আল্লামা আব্দুল্লাহ হায়দারাবাদী রাহ. زجاجة المصابيح কিতাবের মাধ্যমে। এই কিতাব সম্পর্কে মানযুর নোমানী রাহ. বলেন:

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصر عالی میں ایک اینٹ کی کمی تھی، الحمد للہ اس تصنیف نے اس کی تکمیل کر دی۔(تذکرہ محدث دکن از ڈاکٹر عبد الستار خان ص: ۷۹ ،ہندوستان اور علم حدیث ص: ۱۹۲)

আল্লামা আব্দুল মাজেদ দরয়াবাদী রাহ. বলেন:

احناف پر صدیوں سے جو قرض تھا، مولانا نے چکا دیا۔(تذکرہ محدث دکن از ڈاکٹر عبد الستار خان ص: ۷۹ ،ہندوستان اور علم حدیث ص: ۱۹۲)

কিতাবটির যথাযথ তাহকীক ও তাখরীজ করে নতুনভাবে প্রকাশ করা বর্তমান সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কোনো যোগ্য বান্দা যদি কাজটি করে, তাহলে উম্মতে মুসলিমার উপর বড় ইহসান হবে।

রচনা করে মুদাল্লাল ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের প্রতি বড় ইহসান করেছেন। বিভিন্ন দিক থেকে তার এ কিতাবটি অনন্য ও অনবদ্য।

এছাড়া আরো অনেক আলেম যুগে যুগে বিভিন্ন মাসআলার উপর স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। তারা ফিকহে মুদাল্লালের উসূল ও নীতির আলোকে মাসাইল প্রমাণ করেছেন। এমন কিতাবের সংখ্যা অনেক। হিন্দুস্তানের মুফতিয়ান ও উলামায়ে কেরামের জীবনী অধ্যয়ন করলেই কিছুটা ধারণা হবে ইনশাআল্লাহ।

৬ষ্ঠ ধাপ: মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী রাহ.-এর যুগে ফিকহে মুদাল্লালের নতুন ধারা

হিন্দুস্তানে মুদাল্লাল ফিকহের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা শুরু থেকেই ছিলো; তবে হিন্দুস্তানে দরসুল হাদীসে ফিকহী আলোচনা বিশেষ করে কোনো এক মাযহাবের আলোকে ছিলো বিরল, অপ্রতুল।

শায়খ আলী মুত্তাকী রাহ.-এর শাগরিদ শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব মুত্তাকী বুরহানপুরী রাহ. হানাফী (১০০১ হি.) ফিকহে মুদাল্লালের বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ফকীহ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মাজলিস ও দরসের মাঝে হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষের হাদীস নিয়ে আলোচনা করতেন।[৫৫]

তাঁরই শাগরিদ আল্লামা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ.। তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুদাল্লাল ফিকহ চর্চাকে আরো বেগবান করেন এবং হিন্দুস্তানে এ ধারা পুনরায় শুরু হয়। তিনি দরসুল হাদীসে হানাফী মাযহাবের দলীল ও মাসআলার মাঝে সমন্বয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করতেন।

হযরতের শাগরিদগণও একই পদ্ধতিতে হাদীসের দরস দিতেন। দেহলভী রাহ. ও তার ছেলে শায়খ নুরুল হক রাহ.-এর দরসের পদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানা সিদ্দীক হাসান কিন্নাওজী রাহ. বলেন-

تحديث هولاء أهل الصلاح وإن كان على طريق الفقهاء المقلدة الصراح دون المحدثين المبرزين المتبعين الأقحاح، ولكن مع ذلك لايخلو عن كثير فائدة في الدين وعظيم عائدة بالمسلمين.[৫৬]

তাঁর রচিত বিভিন্ন রিসালা এবং মেশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থেও তিনি এই ধারা অবলম্বন করেছেন। তিনি নিজেই ভূমিকাতে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আল্লামা আহমদ রেযা বিজনুরী রাহ. মেশকাতের শরহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন-

اس میں فقہ حنفی کے مسائل کی تطبیق احادیث صحیحہ سے کی گئی ہے اور نہایت گرانقدر محد ثانہ محققانہ کلام آیا ہے-[৫৭]

শাহ আব্দুল হক দেহলভী রাহ.-এর এই পদ্ধতি এতটা মাকবুল হয় যে, তা অদ্যাবধি চলমান ও অব্যাহত রয়েছে।

তবে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রাহ. হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমল করলেও দরসের মাঝে অনেক বিষয়ে শাফেয়ী মাযহাবকে প্রাধান্য দিতেন। এ দিকে ইঙ্গিত করে তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে লিখেছেন,

---

৫৫ হানাফী মাযহাবের প্রমাণাদি সম্পর্কে তাঁর কিছু মালফুজাত আল্লামা আব্দুল হক দেহলভী রাহ. উল্লেখ করেছেন। দ্র. আখবারুল আখয়ার (আনওয়ারুল বারী: ২/১৭১)

৫৬ আল হিত্তাহ ফী যিকরিস সিহাহিস সিত্তাহ: ১৪৫

৫৭ আনওয়ারুল বারী'র ভূমিকা: ২/১৮১

الحنفي عملا والحنفي والشافعي تدريسا[৫৮]

তবে তাঁর পরবর্তী শাগরিদ ও অনুসারীরা সাধারণত এই পদ্ধতি গ্রহণ করেননি; বরং শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ.-এর পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ. ও কাসিম নানুতভী রাহ. সহ অন্যান্য উলামায়ে দেওবন্দ উক্ত পদ্ধতিতে হাদীসের দরস প্রদান করতেন।[৫৯] তাদের হাদীসের দরসের মাধ্যমেই ফিকহে মুদাল্লালের চর্চা হয়ে যেতো। বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে বর্তমানে উলামায়ে দেওবন্দের মাঝে মুদাল্লাল ফিকহের চর্চা পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফিকহে মুদাল্লালের আলোকে ফাতওয়া

হিন্দুস্তানে সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ করে ফিকহে মুজাররাদের আলোকে ফাতওয়া প্রদান করা হতো; কিন্তু হিন্দুস্তানের মুফতিয়ানে কেরামের এটাই একমাত্র পদ্ধতি ছিলো না। তারা ফিকহে মুজাররাদের আলোকে ফাতওয়া প্রদানের পাশাপাশি ফিকহে মুদাল্লালের আলোকেও ফাতওয়া প্রদান করেছেন।

আল্লামা নেযামুদ্দীন আওলিয়া ও মাওলানা ফখরুদ্দীন রাহ.-এর জীবনী ও মালফুজাত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা প্রয়োজনে মুদাল্লাল আকারেও ফাতওয়া দিতেন।

হযরত আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (৯৭১-১০৩৪ হি.) রাহ.-এর মাকতুবাতের মাঝে কিছু ফিকহী আলোচনা ও ফাতওয়া এমন রয়েছে যা মুদাল্লাল ফিকহের অন্তর্ভুক্ত।

---

[৫৮] মুফতী উবাইদুল্লাহ আসআদী সাহেব বলেন:

ہمارے ملک کے مشہور کتب خانے کتب خانہ خدابخش پٹنہ میں بخاری شریف کا ایک قلمی نسخہ ہے جس کے کاتب حضرت امام کے ایک شاگرد شیخ پیر محمد بن شیخ ابوالفتح بلگرامی الہ آبادی ہیں اور حسب تصریح کاتب اس نسخہ کی تصحیح انہوں نے مکرر وسہ کرر استاذ محترم کے نگرانی میں کی ہے اور یوں یہ نسخہ حضرت امام کے حلقۂ درس میں استعمال ہوا ہے اور بعد میں شاہ عالم کے زمانے میں ۱۱۸۴ھ میں محمد ناصح نامی کسی شخص نے اس کی دوبارہ تصحیح کی ہے یہ نسخہ دو جلدوں میں اور ۸۰۸ صفحات میں سے اصل کتاب تو749 پر پوری ہو جاتی ہے اور اس صفحہ پر کاتب کے اختتامی کلمات اور تصحیح ثانی کی بھی تحریر موجود ہے۔

اس کے بعد ۷۵۰ سے ۷۵۷ تک حضرت امام کے دستخط کے ساتھ مزید اجازت حدیث مرقوم ہیں ہر ہر کتاب کی اجازت علیحدہ علیحدہ پوری سند کے ساتھ مذکور ہے۔

پھر 777 تک کچھ احادیث درج ہیں اور 777 سے 807 تک حضرت امام کا رسالہ "الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین" منقول ہے پھر حضرت کے دستخط کے ساتھ اجازت تحریر ہے اور اخیر میں حضرت کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین صاحب کی تصدیق ہے کہ یہ تحریر حضرت والد محترم کی ہے ہے۔

ص: 750 سے لے کر ۷۵۷ تک جو اجازت نامے آئے ہیں ان کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

كتبه بيده الفقير إلى رحمة الله الكريم الودود، ولى الله احمد بن عبد الرحيم وجيه الدين بن معظم..... العمرى نسبا، الدهلوى سكولة، الأشعرى عقيدة، الصوفى طريقة، الحنفى والشافعى درسا الخ "

اس تحریر میں حضرت موصوف نے خود کو باعتبار عمل حنفی اور باعتبار درس و تحقیق حنفی شافعی قرار دیا ہے۔(فقہ ولی اللہی، مفتی محمد عبید اللہ الاسعدی، ۱۲۶-۱۲۷)

[৫৯] সাওয়ানেহে কাসেমী: ২/২৪২-২৪৩, তাযকিরাতুর রশীদ: ৯১, ইদারাতুল উলূমিল ইসলামিয়া, লাহোর, করাচী।

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ.-এর একাধিক ফাতওয়া ফিকহে মুদাল্লালের আলোকে লেখা হয়েছে। পরবর্তী মুফতিয়ানে কেরামও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। মুফতিয়ানে দেওবন্দের এমন কোনো ফাতওয়া সংকলন পাওয়া যাবে না যাতে মুদাল্লাল ফিকহের আলোকে কোনো ফাতওয়া নেই।

দারুল উলূম হাটহাজারীর প্রথম মুফতী মুফতীয়ে আ'যম হযরত মুফতী ফয়যুল্লাহ রাহ. (১৩৯৬ হি.) অনেক ফাতওয়া লিখেছেন ফিকহে মুদাল্লালের আলোকে। হযরতের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত ফাতাওয়ার সংকলনে তা বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া মুহতারাম উস্তায মুফতী নূর আহমদ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ-এর আশরাফুল ফাতাওয়া এবং মুহতারাম উস্তায মুফতী আব্দুস সালাম সাহেব হাফিযাহুল্লাহ-এর জাওয়াহিরুল ফাতাওয়াতেও এ ধরনের ফাতওয়া বিদ্যমান রয়েছে।

এছাড়াও মুহতারাম উস্তায মুফতী জসীমুদ্দীন সাহেব হাফিযাহুল্লাহ বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে মুদাল্লাল ফিকহের চর্চা করেছেন। মুহতারাম উস্তায মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ আলফিকহুল মুদাল্লালের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন এবং রেখে যাচ্ছেন। তাঁর কিতাব 'পাত্র-পাত্রী নির্বাচন' মুদাল্লাল ফিকহের আলোকে ফাতওয়া চর্চার আদর্শ নমুনা।

দারুল উলূম হাটাহাজারীর মুফতিয়ানে কিরামের যৌথ প্রচেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে দারুল উলূমের ফাতওয়া সংকলন দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এতে এমন ফাতাওয়া বিদ্যমান রয়েছে যা ফিকহে মুদাল্লালের আওতায় আসে। ফাতওয়া বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত দরসুল ফিকহ'ও ফিকহে মুদাল্লাল চর্চার ক্ষেত্রে বিনম্র প্রয়াস। এছাড়াও ফাতওয়া বিভাগের দুই বছরের নেসাবে এমন অনেক কিতাব রাখা হয়েছে যা ফিকহে মুদাল্লাল-এর প্রামাণিক কিতাব হিসেবে বিবেচিত। এককথায়, ফিকহে মুদাল্লালের আলোকে ফাতাওয়ার চর্চায় দারুল উলূম হাটহাজারী পিছিয়ে নয়।

মুদাল্লাল ফিকহের চর্চা : কিছু সতর্কতা

আলফিকহুল মুদাল্লালের স্তরে কাজ করার জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যথায় পদস্খলনের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। সতর্কতা অবস্থা অনুপাতে বিভিন্ন পর্যায়ের হতে পারে। আপনি যার তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন তার থেকেই আপনার সতর্কতার দিকগুলো জেনে নিবেন। এখানে সামগ্রিকভাবে মৌলিক কিছু দিক তুলে ধরা হলো।

এক. বিজ্ঞ ফকীহের তত্ত্বাবধানে চর্চা করা। ইলমের যেকোনো শাখার জ্ঞান অর্জন এবং ইলমী কাজ করার জন্য অনস্বীকার্য শর্ত হলো, ঐ বিষয়ে বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ কোনো ব্যক্তির নিকট কাজ শেখা এবং তার তত্ত্বাবধানে কাজ করে যোগ্যতা অর্জন করা। আলফিকহুল মুদাল্লালের স্পর্শকাতরতা সর্বাধিক হওয়ায় এতে মুশরিফের গুরুত্ব ও ভূমিকা আরো বেশি।

বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে অনেকেই আলোচনা করেছেন। খতীব বাগদাদী রাহ. (৪৬৩ হি.) 'আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ' কিতাবে এ বিষয়ক একটি অধ্যায়ে বলেন-

ولا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه، ويرجع في تفسير ما أشكل إليه، ويتعرف منه طرق الاجتهاد، وما يفرق به بين الصحة والفساد.[৬০]

[৬০] আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ: ২/১৬২

তিনি একাধিক ঘটনা উল্লেখ করে এই শিরোনাম প্রমাণ করেছেন। এর মাঝে একটি ঘটনা হলো, একদা ইমাম আবু হানীফা রাহ. কে বলা হলো, মসজিদে কিছু ছাত্র ফিকহ নিয়ে গবেষণা করছে। তখন আবু হানীফা রাহ. জিজ্ঞাসা করলেন-

لهم رأس؟

তারা উত্তরে বললো, না। তখন তিনি বললেন-

لا يفقه هولاء أبداً.

সর্বোপরি উস্তাযের নেগরানি অবশ্যই থাকতে হবে। আর না হয় দলীলের গবেষণাই আপনাকে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাবে। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব রাহ. সুন্দরই বলেছেন-

لولا مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكت.[৬১]

প্রকৃতপক্ষে উস্তায ব্যতীত শুধু কিতাব পড়ে ফিকহ, ফাতওয়ার ইলম অর্জনকারী ফাতওয়া দেয়ার অধিকারই রাখে না। সালাফের যামানায় এ বিষয়ের প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়া হতো। ইমাম ছাওর ইবনে ইয়াযিদ রাহ. বলেন-

لا يفتي الناس الصحفيون.[৬২]

ইমাম আবু যুর‘আ রাহ. (২৬৪ হি.) বলেন-

لا يفتى الناس صحفي.[৬৩]

দুই. আলফিকহুল মুদাল্লাল মানেই দলীলের মান নির্ণয় ও নির্দেশনার বিভিন্ন দিক নিয়ে অধ্যয়ন করা। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে সকলের মানহাজ ও তরীকা এক নয়; ভিন্ন। আর মানহাজ ও উসূল হলো সিদ্ধান্তের সূচক। আপনি যে মানহাজ গ্রহণ করবেন, ফলাফল সে অনুযায়ী আবর্তিত হবে। আপনি যদি শাফেয়ী মানহাজ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত তাদের মতোই হবে; পক্ষান্তরে আপনি যদি হানাফী মানহাজ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত হানাফীদের মতোই হবে।

সুতরাং মানহাজের ভিন্নতা ও হানাফী ইমামগণ যে মানহাজকে গ্রহণ করেছেন তা ইতকানের সাথে অর্জন করা আপনার জন্য অপরিহার্য বিষয়।

তিন. স্বীকৃত কথা, আমরা তালিবে ইলম; মুজতাহিদ নই। কিন্তু আলফিকহুল মুদাল্লালে মুজতাহিদগণের গৃহীত দলীলের বিভিন্ন দিক নিয়েই আমাদের আলোচনা করতে হয়। এজন্য তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদির মাঝেই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

যেমন, হানাফী ইমামগণ প্রত্যেক মাসআলার জন্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছেন। তাদের পক্ষ থেকে যে আয়াত ও হাদীস পেশ করা হয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। নিজের পক্ষ থেকে কোনো আয়াত বা দলীল পেশ করা থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে বিরত থাকতে হবে।

আপনি নিজেই চিন্তা করুন, হানাফী মাযহাবের উপর ১৩ শতাব্দীকাল ধরে গবেষণা হয়ে

---

[৬১] তারিখে বাগদাদ: ১৪/৫২৪

[৬২] আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ: ২/১৯৪

[৬৩] আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কীহ: ২/১৯৪

আসছে। যুগে যুগে ইমামগণ নতুন নতুন আঙ্গিকে গবেষণা করেছেন। এর পরও যদি তাঁরা কোনো হাদীস উল্লেখ না করেন, তাহলে এ সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দাঁড়ায় যে, তাঁরাও হাদীসটি দেখেছেন; তবে কোনো ইল্লাতের কারণে গ্রহণ করেননি। সুতরাং তাঁরা উল্লেখ করেননি এমন দলীল গ্রহণ করার সময় চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে।

আলফিকহুল মুদাল্লাল : কিছু আবেদন

ফিকহে মুদাল্লালের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইতিহাস উল্লেখ করার পর এ বিষয়ে অধ্যয়নে ইচ্ছুক বা অধ্যয়নরত তালিবে ইলম ভাইদের জন্য কিছু আবেদন পেশ করছি। হতে পারে তাদের অধ্যয়নে কিছুটা হলেও সহযোগিতার কাজ দিবে ইনশাআল্লাহ।

এক. দলীলের প্রামাণিকতা, নির্দেশনা ও স্তর বোঝার চেষ্টা করুন

ছোট-বড় যে কোনো দলীলই হোক না কেন তাতে দুটি বিষয় থাকবেই। এক. ثبوت দুই. دلالة। এই দু'টি দিক ছাড়া কোনো দলীল হতে পারে না। আবার প্রত্যেকটি দিকেরই রয়েছে বিভিন্ন স্তর। [বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য-'আপনার নামায' এর ভূমিকা]

ফিকহে মুদাল্লালে ছুবুত, দালালাহ এবং উভয়টির স্তরসমূহ ভালোভাবে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে। যেহেতু এক্ষেত্রে মানহাজের ভিন্নতা রয়েছে, তাই আমাদের ইমামগণ কোন মানহাজ অবলম্বন করেছেন তা ভালোভাবে জানতে হবে।

আমরা উসূলুল ফিকহের মাধ্যমে এ বিষয়টি শুরু করতে পারি। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, উসূলুল ফিকহ হলো মূলত أصول فقه الأحكام । উসূলুল ফিকহের কিতাবগুলোতে আহকাম বোঝার উসূল কম-বেশি উল্লেখ হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে আমাদের ফিকহে মুদাল্লালের দিকে অগ্রসর হতে হবে। উসূলুল ফিকহ বলতে সাধারণ ৪টি বিষয়কে বুঝানো হয়। যথা-

১. الأحكام الشرعية ومراتبها (শর'য়ী আহকাম ও তার স্তরসমূহ)

আহকামে শর'য়ীয়্যার অধ্যায়ে মৌলিক কাজ দু'টি-

এক. আহকাম বুঝানোর জন্য যে পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা হয় যেমন, ফরয ওয়াজিব ইত্যাদি, তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আত্মস্থ করা। স্বর্তব্য, প্রতিটি মুস্তালাহ বা পরিভাষা জানার নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। তা অনুসরণ করে শর'য়ী পরিভাষার ব্যাখ্যা করলেই যথাযথ ব্যাখ্যা হবে। অন্যথায় পদস্খলন হতে পারে।

সঠিক নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করায় আমরা অনেক সময় ভুল বুঝে থাকি। একটি উদাহরণ দেখুন, যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ফরযের পরিচয় কী? অনেকেই উত্তর দিয়ে থাকেন-

ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة.

লক্ষ করে দেখুন, ফরযের এই পরিচয়টি পূর্ণ কিনা। যদি ছুবুত ও দালালাহ কাত'য়ী হলেই ফরয হয়ে যায়, তাহলে অনেক মুবাহও ফরয হয়ে যাবে। যেমন, কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [৬৪]

[৬৪] সূরা মায়েদা: ২

নসটি ছুবুত ও দালালাহ উভয়দিক থেকেই কাত'য়ী। তাহলে কি মাছ শিকার করা ফরয হয়ে যাবে? মূলত আমরা তা'রীফের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশকে বাদ দিয়েছি। তা হলো, "তলবে জাযেম"। শুধু কাত'য়ী হলেই চলবে না; বরং তলবে জাযেম থাকতে হবে। এ আয়াতে ইবাহাতের তলব রয়েছে, তাই তা মুবাহই হবে; ফরয হবে না।

এ থেকেই আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, সঠিক নিয়মে পরিভাষা না শিখলে কেমন ভুল হতে পারে। আমাদের মাযহাবে উসূলে বাযদাবীর ধারায় যে কিতাবগুলো রচনা করা হয়েছে তাতে আহকাম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না। তাই এ বিষয়ে জানার জন্য ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (৮৬১হি.)-এর আততাহরীর, ইমাম সদরুশ শরী'আহ-এর আততালবীহ এবং মুহিব্বুল্লাহ বিহারী রাহ. (১১১৯হি.)-এর মুসাল্লাম সহ অন্যান্য কিতাব অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

দুই. এখানে দ্বিতীয় কাজ হলো, আহকাম বোঝার আলামত ও পদ্ধতি জানা। যেমন, কোন কোন আলামত থাকলে আমরা বুঝবো যে, এখানে তলবে জাযেম আছে বা তলবে ইবাহাত রয়েছে, সেই আলামতগুলো মুখস্থ করে নিতে হবে। কিছু কিছু আলামত উসূলে ফিকহের কিতাবেই রয়েছে। অন্যগুলো ফিকহে মুদাল্লাল, মুকারান ও তাফসীরের কিতাব থেকে তা'লীম করে নিতে হবে।

২. أدلة الأحكام

শর'য়ী হুকুম প্রমাণিত হওয়ার জন্য যে দলীলের প্রয়োজন, তার ছুবুত, দালালাহ ও স্তর নিয়ে আলোচনাই হলো এ অধ্যায়ের মূল বিষয়। মনে রাখতে হবে, দলীলের এ তিনটি বিষয়ে আপনি যত দক্ষতা অর্জন করবেন, ফিকহে মুদাল্লালে তত বেশি অগ্রসর হতে পারবেন।

৩. قوانين دلالة النصوص وألفاظها

নসের বাক্য ও শব্দের কী নির্দেশনা তা সুনির্দিষ্টভাবে জানার জন্য ইমামগণ কিছু নিয়ম-নীতির অনুসরণ করে থাকেন। যা মূলত 'কাওয়ানীনুল লুগাহ' থেকে গৃহীত। তবে ফুকাহায়ে কেরাম এ অধ্যায়কে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। যেমন, উসূলুল ফিকহের মাঝে 'আম, খাছ, হাকীকাহ, মাজায নিয়ে আলোচনা হয়। একই বিষয়ের আলোচনা বালাগাতের কিতাবেও হয়; তবে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। যাই হোক, এসব আলোচনা নসের নির্দেশনা নির্দিষ্টভাবে বোঝার জন্য খুবই জরুরী।

৪. مقاصد الشريعة

শর'য়ী হুকুম বোঝার ক্ষেত্রে مقاصد الشريعة গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উসূলুল ফিকহের সাধারণ কিতাবে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র শিরোনাম না থাকলেও উসূলের ইমামগণ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো ইমাম স্বতন্ত্রভাবেই আলোচনা করেছেন। যেমন, ইমাম শাতেবী রাহ. উসূলে ফিকহের কিতাব রচনা করেছেন الموافقات في اصول الشريعة নামে। এতে مقاصد الشريعة সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এছাড়া অন্যরাও বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন।

উসূলুল ফিকহের বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হলো। ফিকহে মুদাল্লালের জন্য প্রত্যেকটি বিষয়ই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই যথাসম্ভব এসব ক্ষেত্রে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতে

হবে।

কিন্তু আফসোস ও পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের অনেক মেধাবী ছাত্রভাই আছেন, যারা উসূলে ফিকহের ইবারত বোঝেন; কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাবে উসূলের উপলব্ধি অর্জন না করায় হিদায়া বা অন্য কোনো মুদাল্লাল কিতাবে উসূলের তাতবীক বা প্রয়োগ করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে উসূল যথাযথভাবে না বোঝার কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। যেমন, কেউ নাহবেমীর পড়লো; কিন্তু সে আরবী ইবারত সহীহ করে পড়তে পারে না। এর কারণ এটাই যে, নাহবেমীর ভাল করে পড়া হয়নি, আবার পড়তে হবে। উসূলে ফিকহের বিষয়টিও ঠিক তেমনই ।[৬৫]

মোটকথা, ফিকহে মুদাল্লালে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে أصول الفقه সঠিক পদ্ধতিতে পড়তে হবে এবং জানতে হবে যে, দলীলের প্রামাণিকতা ও নির্দেশনা সঠিকভাবে কীভাবে বুঝতে হয়।

দুই. আসবাবে ইখতিলাফ ও আদাবে ইখতিলাফ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন

দলীলের আলোকে মাসআলা অধ্যয়ন করতে গেলেই দেখা যাবে, আমাদের ইমামদের মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে ইখতিলাফ হয়েছে। ইমামদের ইখতিলাফকে সঠিকভাবে বোঝা ও মূল্যায়ন করার জন্য জরুরী হলো আসবাবে ইখতিলাফ ও আদাবে ইখতিলাফ সম্পর্কে জানা।

এ বিষয়ে প্রখ্যাত হানাফী মুহাক্কিক শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাহ হাফিযাহুল্লাহ-এর কিতাব أثر الحديث الشريف ও أدب الاختلاف দিয়ে অধ্যয়ন শুরু করা যেতে পারে।

ইখতিলাফ বিষয়ে একটি কথা না বললেই নয়। ইখতিলাফী বিষয়ে সমাধানের যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আসাতিযায়ে কেরাম ইখতিলাফপূর্ণ বিষয়ে লম্বা আলোচনা করে থাকেন। তাই দরসে সাধারণত ইখতিলাফ নিয়ে আলোচনা বেশি হয়। কিন্তু আমরা উল্টো বুঝে বসে থাকি। আমরা মনে করি যে, প্রত্যেকটি বিষয়েই মনে হয় মতানৈক্যপূর্ণ। সুতরাং ইসলামে ইত্তিহাদের তুলনায় ইখতিলাফ বেশি। এ ধারণা পুরোটাই ভুল; বরং দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই। আর শাখাগত বিষয়েও অধিকাংশ মাসআলায় ইত্তিহাদ রয়েছে। হাতেগোনা কিছু শাখাগত বিষয়ে ইখতিলাফ হয়েছে।

শাফেয়ীদের পক্ষ থেকেও একটি ভুল চিন্তা প্রচার করা হয়। বর্তমান সালাফীরাও তাদের ঐ কথাগুলো আওড়ায়। কট্টর শাফেয়ী ইমাম আব্দুল মালিক ইবনুল জুওয়াইনী রাহ. সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। তিনি 'মুগীছুল খালক' কিতাবে অবাস্তব একটি দাবি করেছেন। তিনি বলেন-

---

[৬৫] উসূলুল ফিকহ পড়ানোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। এখানে মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী রাহ. এর একটি আলোচনা তুলে ধরছি-

اصول فقہ اور اس کی اہمیت

اور غور کیا جائے تو تعلیم کی غرض یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی آدمی خود سوچنے لگے اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کو سمجھنے لگے۔ میں جیسا کہ پہلے بیان کر آیا ہوں کہ ابتدائی صدیوں میں ہمارے نصاب میں مذکورہ بالا دو مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اگرچہ منطق کا بھی عنصر شریک تھا، لیکن زیادہ تر اس زمانہ میں علم کی حیثیت سے جس علم سے یہ کام لیا جاتا تھا وہ خود مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا علم اصول فقہ تھا، اور کتابوں کے لحاظ سے خود اصول فقہ کی مشہور کتاب بزدوی تھی، نیز فقہ کی کتاب ہدایہ اور تفسیر کی کشاف درس میں ان ہی دونوں اغراض کے لیے رکھی گئی تھیں۔

(হিন্দুস্তান মেঁ মুসলামনুঁ কা নিযামে তালীম ওয়া তারবিয়াত: ১/৪২৭)

استنكف محمد وأبو يوسف عن متابعته في ثلثي مذهبه.

বাস্তবতা হলো, এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ মুখালাফাতই প্রমাণিত নয়। সেখানে দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আল্লামা কাউছারী রাহ. বলেন-

ذكر الثلثين في هذا الموضع من أعجب ما ينطق به ذو عينين بعد أن يرى كتب الفقه لأصحابنا، وأين مخالفتهما له من الثلث فضلا عن الثلثين، وهذا هو الهذيان بعينه.[৬৬]

আল্লামা আব্দুল গণী নাবুলুসী রাহ. (১০৬২ হি.) আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আগ্রহীদের জন্য তার কিতাব-'الجواب الشريف للحضرة الشريفة في أن مذهب ابي يوسف ومحمد هو مذهب أبي حنيفة' অধ্যয়ন করার অনুরোধ রইলো।

তিন. মুখতালিফুল হাদীস ও মুশকিলুল হাদীস বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করুন

বিরোধপূর্ণ ও জটিল হাদীসের সাথে আমরা হিদায়া, মিশকাত থেকেই পরিচিত হয়ে থাকি। সেখানে মুখতালাফ ফীহ হাদীসের সমাধান পড়ে থাকি। কোনো হাদীসে আপত্তি বা প্রশ্ন থাকলে তার জবাবও দিয়ে থাকি। আমাদের এই অধ্যয়ন মূলত মুখতালিফুল হাদীস ও মুশকিলুল হাদীসের আওতায় পড়ে। এই দু'টি হাদীসের জটিলতম বিষয়। উভয়টি ফিকহে মুদাল্লালের জন্য ভিত্তিমূল। হাদীসের মতো কুরআনের মাঝেও মুখতালিফ এবং মুশকিল বিষয় রয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান ও ব্যাখ্যার জন্য নির্দিষ্ট কিছু উসূল রয়েছে যা অনুসরণ করা আবশ্যক। ইমামগণ কুরআন-হাদীসের এ অধ্যায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিতাবও রচনা করেছেন অনেক। এখানে আর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না।

চার. ফিকহুল মানাত-এর প্রতি যত্নবান হোন

ফিকহুল মানাত মূলত আলফিকহুল মু'আল্লালেরই একটি শাখা। মানাত শব্দটি এখানে কোনো মাসাআলা বা নির্দেশনার মূল কারণ বা ইল্লাতের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের অধ্যয়ন দলীল ভিত্তিক হতে তো হবেই, সাথে সাথে আমাদের প্রত্যেক মাসআলায় ঐ কারণ ও মানাত, যা মাসআলার প্রাণ এবং মূল ভিত্তি, তা খুঁজে বের করার প্রতি যত্নবান হতে হবে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যেকোনো নস ও দলীল বোঝার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে-

১. النص على مناطه

২. النص على ظاهره

النص على مناطه-এর সারকথা হলো, প্রত্যেকটি কথার পিছনে একটি সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে। যা উদ্দেশ্য করেই বক্তা কথাটি বলেছে। যেমন, আমরা উসূলুল ফিকহের কিতাবে নসের পরিচয় পড়েছি যে, নস হলো- ما سيق الكلام لأجله। নস হলে তার পিছনে একটা কারণ থাকবেই। সুতরাং বক্তা মূলত কী বলতে চায় তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা তাই হবে, যা তার মূল কারণের সাথে মিলে যাবে। ঐ কারণকে এখানে 'মানাত' বলা হয়েছে। আর ঐ কারণ বা মানাতের আলোকে বক্তব্য বোঝা ও ব্যাখ্যা করাকে النص على مناطه বলা হয়েছে।

---

[৬৬] ইহকাকুল হক: ৫০

সুতরাং কুরআনের আয়াত হোক বা রাসূল ﷺ-এর হাদীস হোক, এমনকি ফিকহী বক্তব্যগুলোর ব্যাখ্যা করতে হবে মানাতের আলোকে।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯ হি.) সহ অধিকাংশ ইমামই এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং এ পদ্ধতিটি সাহাবা এবং তাবেঈন থেকেই অনুসৃত।[৬৭]

النص على ظاهره এর সারকথা হলো, নস থেকে বাহ্যিক অর্থই নেওয়া হবে এবং সে হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী রাহ. (২০৪ হি.) এ পদ্ধতি গ্রহণ করলেও তিনি সর্বদা এ পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেননি। কিছু কিছু নসের ক্ষেত্রে তিনি النص على مناطه-এর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন।

সর্বোপরি আমাদেরকে নসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে النص على مناطه-এর পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এই পদ্ধতি যেমন কুরআন ও হাদীসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি আমাদের ইমামগণ থেকে বর্ণিত মাসাইলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে কোনো মাসআলা বা নস আপনার সামনে এলেই আপনাকে ভাবতে হবে এর মানাত কী? এই প্রশ্ন আপনার বিবেকে সর্বদা জাগ্রত থাকতে হবে।

ধরুন, আপনি একটি গাছ দেখলেন। গাছটির ডালপালা দেখে বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খল মনে হবে। আপনি চিন্তা শুরু করলেন যে, এই গাছটি বেঁচে থাকার মূল মানাতটি কী হতে পারে? প্রথমে মনে হতে পারে যে, হয়তো শিকড়ের সাহায্যে বেঁচে আছে। কিন্তু শিকড় তো অনেক? আপনি শিকড় নিয়ে চিন্তা শুরু করলেন। দেখলেন যে, কিছু শিকড় কেটে ফেললেও গাছ মারা যায় না; বেঁচেই থাকে। তাহলে যে শিকড় কেটে ফেললেও গাছ বেঁচে থাকে তা বেঁচে থাকার মূল কারণ হতে পারে না। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে আপনি উদ্ধার করলেন যে, এখানে একটি মূল শিকড় আছে, যা গাছটি বেঁচে থাকার মূল কারণ। এই মূল শিকড়টি হলো গাছ বেঁচে থাকার মানাত। এভাবে একটি গাছের বেঁচে থাকার মানাত খুঁজে পেলে হাজার হাজার গাছ বেঁচে থাকার মানাতও খুঁজে পাবেন।

একই ধারায় প্রত্যেকটি নস ও মাসআলা নিয়ে অধ্যয়ন করুন এবং মূল মানাত খুঁজে বের করুন। এক মানাতকে কেন্দ্র করে যতগুলো মাসআলা আবর্তিত হচ্ছে তা নির্ণয় করুন।

ফিকহে মুদাল্লালের কিতাবে মানাত নির্ণয় করার বিষয়টি বেশ প্রসিদ্ধ। এক্ষেত্রে সধারণত تنقيح المناط ও تخريج المناط পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

বিষয়টি সহজ করার জন্য কয়েকটি ব্যাখ্যা সম্বলিত নস পেশ করছি।

১. ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসী রাহ. (৬২০ হি.) মানাতের বিভিন্ন দিকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

تنقيح المناط:

وهو: أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه، فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن

[৬৭] আপনার নামায (হাদীসের নির্দেশনা নির্ণয়, কিছু জটিলতা : ভূমিকা)

الاعتبار، ليتسع الحكم.

ومثاله: قوله –صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم– للأعرابي الذي قال: هلكتُ يا رسول الله. قال: "مَا صَنَعتَ؟ " قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال: "أَعْتِقْ رَقَبَةً".

فنقول: كونه أعرابيًّا: لا أثر له فيلحق به "التركي" و"العجمي"، لعلمنا أن مناط الحكم: وقاع مكلف، لا وقاع الأعرابي، إذ التكاليف تعم الأشخاص، على ما مضى.

ويلحق به: من أفطر بوقاع في رمضان آخر؛ لعلمنا أن المناط: حرمة رمضان، لا حرمة ذلك الرمضان.

وكون الموطوءة منكوحة: لا أثر له، فإن الزنا أشد في هتك الحرمة.

فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم، بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه: أنه لا مدخل له في التأثير.

وقد يكون بعض الأوصاف مظنونًا، فيقع الخلاف فيه كالوقاع، إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة: كونه مفسدًا للصوم المحترم، والجماع آلة الإفساد، كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصاص، وليس هو من المناط، كذا ههنا.

ويمكن أن يقال: الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان الشهوة بمجرد وازع الدين، فيحتاج إلى كفارة وازعة، بخلاف الأكل.

والمقصود: أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص، لا بالاستنباط، وقد أقر به أكثر منكري القياس.

وأجراه أبو حنيفة في الكفارات، مع أنه لا قياس فيها عنده.

الضرب الثالث، **تخريج المناط:**

وهو: أن ينص الشارع على حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه أصلًا. كتحريمه شرب الخمر، والربا في البر.

فيستنبط المناط بالرأي والنظر، فيقول: حرّم الخمر، لكونه مسكرًا، فيقيس عليه النبيذ، وحرّم الربا في البر، لكونه مكيلًا، فيقيس عليه الأرز. [৬৮]

২. ইমাম কাশ্মীরী রাহ. (১৩৫৩হি.)[৬৯] মানাত নির্ণয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তিনি

---

[৬৮] রওযাতুন নাযির: ২/১৫০, মুআস্সাসাতুর রাইয়ান।

[৬৯] আনওয়ার শাহ ইবনে মু'আয্যম শাহ ইবনে আব্দুল কবীর ইবনে শাহ আব্দুল খালিক আন নারূরী, আল কাশ্মীরি। তিনি ১২৯২ হিজরীর ২৭ শাওয়াল মোতাবেক ১৮৭৫ ঈসায়ী সনের ১৫ ই অক্টোবর কাশ্মীরের দূদওয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৫২ হিজরী সনের ৩রা সফর মোতাবেক ১৯৩৩ ঈসায়ী সনের ২৯ মে ৬০ বছর বয়সে দেওবন্দে ইন্তেকাল করেন। শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রাহ., মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহ. প্রমুখ তাঁর উস্তাযদের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রায় এক যুগ দারুল উলূম দেওবন্দের ছদরুল মুদাররিসীন ও শাইখুল হাদীস ছিলেন। মুফতী শফী রাহ., মাওলানা মানাযির আহসান গীলানী রাহ. মাও. ইদ্রীস কান্দলভী রাহ. ইউসূফ বান্নূরী রাহ.-এর মত জগতবিখ্যাত আলেমগণ তার সৌভাগ্যবান ছাত্র। তিনি প্রখর মেধা ও অতুলনীয় স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁকে বিংশ শতাব্দির বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ হিসাবে গণ্য করা হয়। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, মানতিক, দর্শন, ইতিহাস শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য রাখতেন। তাকে 'চালতা ফিরতা কুতুবখানা (ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার) বলা হতো। 'ফয়যুল বারী আলা সহীহিল বুখারী', 'আল আরফুশ

বিভিন্নভাবে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন-

وتنقيح المناط: أن يصدر حكم من الشارع في صورة قد اجتمعت هناك أمور، واتفقت بعض تلك الأمور مناط ذلك الحكم وبعضها لا دخل لها فيه، فتعرف الأمر الذي هو العلة تنقيح المناط. مثاله ما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى رجل النبي ﷺ فقال: هلكت! قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا.» الحديث. فنقَّح أبو حنيفة ومالك مناط ذلك الحكم وجوب الكفارة كون ذلك الفعل مفطرا، كان جماعا كما في هذه الصورة أو أكلا أو شربا بعد أن يكون عمدا، فكونه جماعا في هذه الصورة أمر اتفاقي كسائر الاتفاقيات. وذهب أحمد والشافعي إلى أن المناط هو كونه جماعا، فلا يعدى الحكم إلى الأكل والشرب. واحتج بحديث آخر عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر حمله على الأكل والشرب عامدا، وقال: لم يقض عنه صيام الدهر.

وتخريج المناط: أن يصدر حكم من الشارع في صورة تجتمع هناك أمور يصلح كل واحد منها للعلية، فيرجح المجتهد أمرا من بين تلك الأمور للعلية ويجعله مناطا. مثاله: حديث النهي عن الربا في الأشياء الستة، اجتمع هناك أمور: القدر، والجنسية، والطعم، والثمنية، والاقتيات، والادخار. فذهب أبو حنيفة إلى أن مناط الحكم هو الوصف الأول، والشافعي إلى أنه الثاني، ومالك إلى أنه الثالث، على ما أدى إليه اجتهادهم. فالفرق بين تحقيق المناط وتخريجه أن في الأول اجتمعت أمور لا دخل لها مع المناط، فنقح المجتهد المناط، وفي الثاني اجتمعت أمور كل منها صالح لأن يكون مناطا، فرجح المجتهد أحدها لأن يكون مناطا. وتنقيح المناط وتخريجه وظيفة المجتهد يزاحم فيه بعضهم بعضا.

ومن الأمثلة فيه أيضا حديث: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم،» فذهب أكثر الأئمة إلى ركنية صيغة التكبير والتسليم، وخرج أبو حنيفة المناط فيه كون الأول ذكرا مشعرا بالتعظيم وكون الثاني خروجا بصنع المصلي وقال بفرضية هذين، لكن ثبتت مواظبة النبي ﷺ على صيغة التكبير وصيغة التسليم، فليكونا واجبين. وقد التزم الشيخ ابن الهمام وجوب صيغة التكبير، والمشهور أنه سنة، وقد تحقق فيهما الذكر المشعر بالتعظيم والخروج بصنع المصلي، كتحقق الكلي في الجزئي، فليكونا فرضين، وعلى هذا القياس أمثلة كثيرة.[৭০]

৩. মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী সাহেব দা.বা. বলেন-

শাযী মিন জামিইত তিরমীযি' তাঁর হাদীসের দরসের সংকলন। 'ইকফারুল মুলহিদীন', 'বাসতুল ইয়াদাইন লিনাইলিল ফারকাদাইন' তাঁর জগতবিখ্যাত রচনা। এছাড়াও তিনি একাধিক কিতাব রচনা করেছেন। (তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ: ২/২০১-২০৭, কারওয়ানে রফতা: ৪৯-৫০)

[৭০] নাফহাতুল আম্বর: ৭৪-৭৫

رہی یہ بات کہ نص میں جو علت ہے اس کا ادراک کس طرح کیا جائے؟ تو اس کے لئے 'تنقیحات ثلاثہ' سے کام لیا جاتا ہے جو مندرجۂ ذیل ہیں۔

(۱) تخریج مناط (۲) تنقیح مناط (۳) تحقیق مناط

مناط کے معنی علت و حکمت یا اس وصف کے ہیں جس پر حکم کا مدار ہوتا ہے، یا وہ وصف حکم کا باعث ہوتا ہے، فقہاء کرام نص کو سامنے رکھ کر پہلے اس میں سے امکانی اوصاف نکالتے ہیں پھر ان اوصاف کی تنقیح کرتے ہیں، کہ حقیقی سبب کیا؟ ہے جو غیر حقیقی وصف ثابت ہوتا ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور حقیقی سبب کو لے کر اس پر مسائل کی تفریع کرتے ہیں اسی تفریع مسائل کا نام یعنی علت جہاں جہاں پائی جائے وہاں حکم کو ثابت کرنے کا نام تحقیق مناط ہے بات چونکہ دقیق ہے اس لئے ایک مثال سے اس کی توضیح مناسب معلوم ہوتی ہے۔

قرآن عزیز نے نواقض وضو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ﴾[৭১] نشیبی جگہ (بیت الخلاء) میں جا کر آؤ تو وضو ٹوٹ جائیگا اور نیا وضو یا تیمم کرنا ہوگا۔ یہاں نقض وضو کے امکانی اوصاف درج ذیل ہو سکتے ہیں۔

(۱) غائط جانے کا ارادہ کرنا (۲) بالفعل چل کر جانا (۳) وہاں ٹھہرنا (مکث) (۴) ستر کھولنا (۵) سبیلین سے نجاست کا نکلنا (۶) بہنے والی نجاست کا بدن سے نکلنا وغیرہ وغیرہ۔

فقہاء کرام نے جب ان امکانی اوصاف میں غور کیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نجاست کا سبیلین سے نکلنا علّتِ حقیقی اور وصف مؤثر نظر آیا، لہذا انہوں نے اس کے علاوہ دیگر اور صاف کو اَلْغَط (بے اعتبار) کر دیا، اور تمام احکام کی تفریع اسی وصف پر کی۔ چنانچہ ان کے نزدیک سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصہ سے نجاست کا خروج ناقض وضو نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے غور فرمایا تو معلوم ہوا کہ نجاست کا بدن سے نکل کر بہہ جانا علت حقیقی اور وصف موثر ہے، اور سبیلین کو نقض وضو میں کوئی دخل نہیں ہے، امام صاحب نے اس علت حقیقی پر مسائل کی تفریع فرمائی اور دیگر اوصاف کو ترک کر دیا، چنانچہ امام صاحب کے نزدیک بدن کے کسی بھی حصہ سے اگر نجاست نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔[৭২]

আশা করি, মানাত নির্ণয় ও তার আলোকে নসের ব্যাখ্যার বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে।[৭৩]

---

[৭১] সূরা মায়েদা: ৬

[৭২] হুরমাতে মুসাহারাত: ৪২-৪৪, মাকতাবায়ে হেজায, দেওবন্দ।

[৭৩] আমরা হিদায়া কিতাব পড়েছি। এই কিতাবের দরসের মাধ্যমে আমাদের মাঝে একটি পরিভাষা প্রসিদ্ধ হয়েছে। তা হলো 'আকলী দলীল'। ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. কিন্তু 'আকলী দলীল' নাম দেননি। তিনি নাম দিয়েছেন 'দিরায়া'। ফিকহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে দিরায়া শব্দটি বেশ সুন্দর। পরবর্তীদের মাঝে উসূলিয়্যীন ও মুতাকাল্লিমীন-এর প্রভাবে 'আকলী দলীল' পরিভাষাটি প্রসিদ্ধ হয়েছে।

পাঁচ. আলফিকহুল মুদাল্লালের কিছু কিতাব বিজ্ঞ ফকীহের কাছে পড়ার চেষ্টা করুন

ফিকহে মুদাল্লালের অধ্যয়ন ও চর্চার আদর্শ পদ্ধতি ভালোভাবে বোঝার সুন্দরতম মাধ্যম হলো, মুদাল্লাল ফিকহের কোনো কিতাব বা কিতাবের অংশ নির্দিষ্ট উসূল ও তরীকার আলোকে দরস গ্রহণ করা। সাথে সাথে উস্তাযের মাধ্যমে সুন্দর ও উপযোগী একটি মানহাজ প্রস্তুত করা। এ দু'টি কাজ একসাথে সমন্বয় করতে পারলে ফিকহে মুদাল্লাল চর্চা খুবই সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ছয়. অধ্যয়নে সামগ্রিকতা বজায় রাখুন

ফিকহের প্রত্যেক বাবের মাসআলাগুলো বাহ্যিকভাবে স্বতন্ত্র মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি বাবের সকল মাসআলা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত।

সুতরাং একটি মাসআলার পূর্ণ ধারণা তখনই অর্জন হবে, যখন ঐ মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত সকল মাসাইল অধ্যয়ন করা হবে।

নিছক একটি মাসআলাকে ভিন্ন করে অধ্যয়ন করলে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ হতে পারে; কিন্তু দলীল প্রদানের ক্ষেত্রে যথার্থতা এবং ফিকহুন নাওয়াযিলের যোগ্যতা হবে না।

এক্ষেত্রে আমরা যারা তালিবে ইলম আছি, তারা খুব শিথিলতার শিকার হই। অনেকক্ষেত্রেই গাফলত ও অবহেলার বশবর্তী হয়ে কাজ করে থাকি। আমাদের ইমাম ও আকাবিরগণ যেকোনো মাসআলাকে সামগ্রিকভাবেই দেখতেন। আমরা তাঁদের সংক্ষিপ্ত ফাতওয়া দেখে হয়তো মনে করি যে, একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আর তাঁরা কিতাব থেকে মাসআলাটি খুঁজে সমাধান দিয়েছেন। এভাবেই আমরা ধোঁকায় পতিত হই। আমরা শুধু তাঁদের সংক্ষিপ্ত ফাতওয়া দেখি; কিন্তু এই ফাতওয়ার পিছনে তাঁদের মেহনত ও সামগ্রিক অধ্যয়ন আর দেখি না। অথচ তাঁরা প্রথমে মাসআলাটি পূর্ণভাবে বুঝে নিতেন এবং এর জন্য সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন করতেন। তারপর ফাতওয়া লিখতেন।

সংক্ষিপ্তভাবে নিখুঁত ফাতওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী রাহ. অনেক প্রসিদ্ধ। অথচ তিনি যখন অধ্যয়ন করতেন সামগ্রিকভাবেই করতেন। হযরতের শাগরিদ মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবারাবাদী রাহ. নিজ উস্তায সম্পর্কে বলেন-

وہ کافی غور وخوض اور تفکر وتدبر کے بعد کسی فیصلے پر پہنچتے تھے اور اس تفکر کے وقت مسئلہ کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہوتا تھا جو ان کی توجہ سے اوجھل رہ گیا ہو اور پھر ان کا فیصلہ ایسا اٹل ہوتا تھا اس کو بدلوا دینا ممکن نہ تھا۔[৭৪]

হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহ.ও এভাবেই অধ্যয়ন করতেন। হযরতের ফাতওয়া সংকলন فتاوی خلیلیہ দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। হযরত যফর আহমদ থানভী রাহ. একদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন-

---

যাই হোক, ইমাম মারগীনানী রাহ. দিরায়া-এর মাধ্যমে মূলত প্রত্যক মাসআলার মানাত উল্লেখ করতে চেয়েছেন। প্রতিটি মাসআলার মানাত উপলব্ধি করার জন্য হিদায়া একটি আদর্শ কিতাব। আপনি মানাত বোঝার উল্লিখিত পদ্ধতিতে হিদায়া কিতাবটি আবার অধ্যয়ন করার চেষ্টা করুন। ফিকহে মুদাল্লালের ক্ষেত্রে সীমাহীন সহযোগিতা পাবেন ইনশাআল্লাহ।

[৭৪] ত্রৈমাসিক 'ফিকরে ইসলামী': ফুযালায়ে দেওবন্দ কী ফিকহী খিদমাত: ২৫২-২৫৩

فقہ میں مہارت اور بصیرت حاصل ہونے کی کیا صورت ہے؟

তিনি উত্তরে বলেন-

مفتیوں کی عادت ہے کہ صرف استفتاء آنے کے وقت کتابیں دیکھتے ہیں، اس سے کام نہیں چلتا، اور جواب میں بہت غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ اس وقت جلدی میں ایک جگہ دیکھ کر جواب لکھ دیتے ہیں، حالانکہ دوسرے مقام میں اس مسئلہ کے اندر تفصیل ہوتی ہے جس سے اس وقت مسئلہ کا حکم بدل جاتا ہے۔[৭৫]

মাওলানা মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব সাহারানপুরী হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহ.-এর অধ্যয়ন সম্পর্কে লেখেন-

فقہی تحقیق اور تلاش وجستجو میں کمی نہ فرماتے اور فیصلے تک پہنچ کر ہی دم لیتے۔[৭৬]

হযরত মুফতী শফী রাহ. এক্ষেত্রে আদর্শ নমুনা ছিলেন। মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. এ বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন ঘটনা ও মালফুজাত উল্লেখ করেন। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। মুফতী তাকী উসমানী সাহেব হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

احقر نے حضرت والد صاحب قدس سرہ سے خود سنا ہے کہ فقہ کے جو ابواب مجھے جتنے زیادہ مشکل معلوم ہوئے، میں نے ان کی تحصیل میں اتنی ہی زیادہ کاوش کی، چنانچہ فرماتے تھے کہ مجھے شروع میں وقف کے مسائل سے زیادہ مناسبت نہیں تھی، اور جب کبھی وقف کا کوئی سوال آتا تو مجھے اس سے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اس کا علاج میں نے اس طرح کیا کہ وقف کے بارے میں جتنی کتابیں میسر آئیں ان کا باستیعاب مطالعہ کر لیا، فقہ کی متداول کتب کے علاوہ امام خصاف ؒ کی کتاب الوقف اور الاسعاف فی حکم الاوقاف کا بھی مطالعہ کیا، یہاں تک کہ میری عدم مناسبت انشراح میں تبدیل ہو گئی، اور اللہ تعالی نے جن ابواب سے مجھے خصوصی مناسبت عطا فرمائی ان میں وقف بھی شامل ہے۔[৭৭]

হযরত আল্লামা ইউসুফ বান্নুরী রাহ. কিবলা ও মেহরাব সম্পর্কে একটি সুন্দর রিসালা লিখেছেন। তিনি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কেমন মেহনত করেছেন তার বিবরণ নিজেই ঐ কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। আশা করি, আগ্রহী তালিবে ইলম ভাইগণ দেখে নিবেন।[৭৮]

এরকম আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যাবে যে, আমাদের আকাবির সামগ্রিক অধ্যয়ন করতেন। সংক্ষিপ্ততার কারণে উল্লেখ করা হলো না। সর্বোপরি আমাদেরকেও সামগ্রিক অধ্যয়নের চেষ্টা করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে-

إذا لم تقرأ الباب كله لم يعطك سره.

[৭৫] ফাতাওয়ায়ে খলিলিয়া'-এর ভূমিকা: ৫৩

[৭৬] ফাতাওয়ায়ে খলিলিয়া'-এর ভূমিকা: ৫১

[৭৭] মেরে ওয়ালেদ মেরে শায়খ: ৪৯-৫০

[৭৮] দেখুন: ভূমিকা, বুগয়াতুল আরীব ফী আহকামিল কিবলাতি ওয়াল মাহারীব।

সাত. বিস্তারিত তামরীন করার চেষ্টা করুন।

ফিকহ ও ফাতওয়া বিভাগে সাধারণত আমরা যে তামরীন করে থাকি তা সংক্ষিপ্তাকারে হয়ে থাকে। ইস্তিফতা অনুযায়ী মূল সমাধানকে আইনী ভাষায় পেশ করার চেষ্টা করি। এভাবে তামরীন আমাদেরকে আরো যত্নের সাথে করতে হবে। ফিকহে মুদাল্লালের কিতাব থেকে এবং কুরআন-হাদীস থেকে দু'একটা দলীল ও উল্লেখ করা যেতে পারে। পাশাপাশি ফিকহী যোগ্যতায় পরিপক্ক হওয়ার জন্য আমাদের বিস্তারিত তামরীনও করার চেষ্টা করতে হবে।

উদাহরণত স্বয়ং আপনার কাছে একটি ইস্তিফতা এলো। আপনি ফাতওয়ায়ে শামী দেখে সমাধান লিখে দিলেন।

তবে বিস্তারিত তামরীনের ক্ষেত্রে যা করতে হবে তা হলো, সমাধানটি কোন ইমাম দিয়েছেন, তিনি এ সমাধানে কীভাবে পৌঁছলেন, কতগুলো স্তর পার করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন- তা বিস্তারিতভাবে লেখা এবং শুরু থেকে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছার পদ্ধতি ও স্তরগুলো তামরীনে ফুটিয়ে তোলা।

যেমন একটি ইস্তিফতা ছিলো নিম্নরূপঃ

"আমার পিতা ২০০১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা মোট পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোন। সকলই আল্লাহর রহমতে জীবিত। কাজের সুবাদে আমি (বড় ভাই) বগুড়ায় থাকি। সবার ছোট ভাই থাকে ঢাকায়। **মাঝের তিন ভাই** শিবগঞ্জে পিতার জীবিতাবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত পিতার সকল জমি-জমা ও ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। তারা মীরাছের সঠিক বন্টন না করে পিতার রেখে যাওয়া ব্যবসা ও সম্পদ থেকে উপার্জিত মুনাফা দ্বারা নিজ নিজ নামে সম্পদ বৃদ্ধি করছে। পিতার মৃত্যুর পর থেকেই তাদেরকে মিরাছ বন্টনের কথা বলে আসছি। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করে অযথা মিরাছ বন্টনে বিলম্ব করছে।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, তারা পিতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ থেকে মুনাফা অর্জন করে নিজ নিজ নামে যে সম্পদ বৃদ্ধি করছে, সে সম্পদ কি মিরাছ বলে গণ্য হবে? সঠিক হিসাব না করে মনগড়াভাবে যেমন তেমন করে মিরাছ বন্টন করা বৈধ হবে কি?"

এ প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে উত্তর লিখা হয়েছে:

"ক. হাঁ, আপনার পিতার সাথে সম্পৃক্ত হক আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদ ও তা থেকে অর্জিত মুনাফা মিরাছ হিসেবে গণ্য হবে। প্রশ্নে উল্লিখিত আপনার তিন ভাইয়ের জন্য উক্ত সম্পদ থেকে অর্জিত মুনাফা একাই ভোগ করা জায়েয হবে না।

খ. মনগড়াভাবে মিরাছ বন্টন বৈধ হবে না। ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী মিরাছ বন্টন করতে হবে। প্রয়োজনে ওয়ারিছগণের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করে কোনো নির্ভরযোগ্য মুফতী সাহেব থেকে বন্টন পদ্ধতি জেনে নিবেন।"

কিন্তু এই সমাধানে হঠাৎ করে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন স্তর পার করে তার পরই এমন জবাব লেখা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের "যৌথ উত্তরাধিকার সম্পদে হস্তক্ষেপ : সংশ্লিষ্ট ফিকহী ইবারতের বিশ্লেষণ ও সমন্বয়" শীর্ষক প্রবন্ধ।

উলূমুল হাদীসে সাধারণত বিস্তারিত তামরীন করা হয়ে থাকে। কোনো রাবীর তামরীনে শুধু রাবী ছেকাহ লিখে কয়েকটা কিতাবের হাওয়ালা দেওয়া যথেষ্ট মনে করা হয় না; বরং দলীলের

আলোকে বিস্তারিতভাবে বুঝাতে হয় যে, তিনি কীভাবে ছেকাহ হলেন। এমনিভাবে হাদীসের তামরীনে সনদ ও মতনের পূর্ণ দিরাসাহ লিখে বুঝাতে হয় যে, হাদীসটি কেন সহীহ। শুধু সহীহ লিখে কিতাবের হাওয়ালা প্রদান যথেষ্ট মনে করা হয় না।

ফিকহী মাসআলাতেও যদি এভাবে বিস্তারিত কিছু তামরীন করা হয়, তাহলে একজন তালিবে ইলমের ফিকহী যোগ্যতা পরিপক্ক হবেই ইনশাআল্লাহ।

এখানে যা আরজ করা হলো তা মূলত আমার জন্য। যদি কোনো তালিবে ইলম ভাইয়ের উপকারে এসে যায়, তাহলে হয়তো নাজাতের উসিলা হবে। ফিকহুন নাওয়াযিল সম্পর্কে আরো কিছু নিবেদন ছিলো। পরবর্তী কোনো প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

দরসুল ফিকহ-দ্বিতীয় খণ্ড প্রসঙ্গ

আলহামদুলিল্লাহ! ১৪৩৫ হিজরীতে আসাতিযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে দরসুল ফিকহের প্রথম খণ্ডের কাজ করার সুযোগ হয়েছিলো। কিতাবটি প্রকাশের পরে আহলে ইলমগণ তা পছন্দ করেছেন এবং পরবর্তী খণ্ড প্রকাশ করার প্রতি উৎসাহ দিতে থাকেন।

এ বছরের শুরুতে দারুল ইফতার আসাতিযায়ে কেরাম অধমকে দরসুল ফিকহ দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন। তাদের দু'আ নিয়েই মূলত পথ চলা। পূর্বের মত ফাতওয়া বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের তালিবে ইলম ভাইদের থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্রহ করা হয়। এরপর শুরু হয় সম্পাদনার কাজ। সম্পাদনার কাজে অনেক ভাই নিরলস সহযোগিতা করেছেন। তাদের মাঝে যারা অক্লান্ত শ্রম-সাধনা করেছেন এবং যাদের শ্রম না থাকলে এত দ্রুত কাজ করা সম্ভব হতো না তারা হলেন, মুহাম্মদ তাকি, আবদুর রউফ, তাওহীদুল ইসলাম, আনাছ ওয়াহিদ ও আশরাফ আলী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আপন শান অনুযায়ী প্রতিদান দিন। ফিকহের প্রত্যেকটি শাখায় ইখলাস ও ইতকানের সাথে কাজ করার তাওফীক দান করুন।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে দরসুল ফিকহের প্রথম খণ্ডে যে নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তার আলোকে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য সংগৃহীত প্রবন্ধগুলো যথার্থ ছিলো না। তাই প্রবন্ধগুলোর পূর্ণ আলোচনা আমরা নতুন করে প্রস্তুত করেছি। প্রবন্ধগুলো নতুন আকারে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখার চেষ্টা করেছি।

ক. ফিকহুন নাওয়াযিলের নীতির আলোকে প্রবন্ধগুলো প্রস্তুতকরণ।

খ. ফিকহী দলীলের সাথে প্রয়োজনীয় আয়াত ও হাদীস সংযুক্তকরণ। (এক্ষেত্রে আলফিকহুল মুদাল্লাল ও আলফিকহুল মুকারান বিষয়ক কিতাবে যে হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো মূল কিতাব থেকে তাখরীজ করে প্রয়োজনে সংক্ষেপে হাদীসের মান উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে)

গ. প্রত্যেক প্রবন্ধে মাসআলার আলোচনার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা থেকে 'মানাত' উল্লেখ করে বিশ্লেষণ।

ঘ. কোনো মাসআলার নযির ও উসূল পূর্ববর্তী ইমামদের কিতাবে থাকলে তা التخريج الفقهي অনুকরণে বিশ্লেষণ।

ঙ. বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল দিক নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা।

চ. সঠিক শর'য়ী বিধানে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে বাস্তবতা এবং واقع -এর বিস্তারিত বিবরণ

উল্লেখ।

ছ. প্রত্যেকটি প্রবন্ধ পুণঃপ্রস্তুত করার সময় অভিন্ন উপস্থাপনাভঙ্গি অবলম্বন।

জ. অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদকেই প্রাধান্য দেওয়া।[৭৯]

ঝ. পাঠকের সুবিধার্থে প্রবন্ধে উল্লিখিত রিজালের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী এবং গ্রন্থপঞ্জিতে কিতাবের পূর্ণ উল্লেখ।

সাধ্যমত প্রায় সকল প্রবন্ধে উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে চূড়ান্ত বা যথাযথ হয়েছে বলার সাধ্য নেই। ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও বিনম্র প্রয়াস মাত্র। যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা এবং সময়ের স্বল্পতা পূর্ণ কার্যকর ছিলো। এভাবে প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে পুনঃপ্রস্তুত ও সম্পাদনার পর বারবার প্রুফ দেখে ছাপানোর উপযুক্ত করা হয়। অতঃপর আসাতিযায়ে কেরামের নিকট সত্যায়নের জন্য পাঠানো হয়। হযরত আসাতিযায়ে কেরাম শত ব্যস্ততার মাঝেও যথাসম্ভব প্রবন্ধগুলো দেখে ও শুনে সত্যায়ন করেন এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে দেন। আল্লাহ তা'আলা সকল আসাতিযায়ে কেরামকে দীর্ঘায়ু দান করুন। ইলম আমলে বরকত দিন। তাঁদের ইলম ও আমল দ্বারা মানুষকে আরো বেশি উপকৃত করুন। আমীন॥

বারংবার দেখার পরও ভুল থেকে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। হযরত মা'মার রাহ. বাস্তবই বলেছেন-

لو عورض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط، أو خطأ.[৮০] (جامع بيان العلم: باب في معارضة الكتاب)*

"একটা কিতাব যদি শ' বারও দেখা হয়, তবুও তাতে কোনো না কোনো ভুল থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক।"

---

[৭৯] কুরআনের আয়াতের তর্জমা 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন'-এর অনুবাদ (মাওলানা আবুল বাশার সাইফুল ইসলাম দা. বা.) থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৮০] জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী: বাবুন ফী মুআরাযাতিল কিতাব।

* وقد ورد في ذلك عن الإمام الشافعي و صاحبه المزني رحمهما الله تعالى ما يشهد لقول معمر ويصدقه، كما روى البيهقي في «مناقب الشافعي» ٣٦/٢ (تحقيق السيد أحمد صقر.) عن الربيع بن سليمان يقول: قرأت كتاب الرسالة المصرية على الشافعي نيفا وثلاثين مرة، فما من مرة إلا كان يصححه، ثم قال الشافعي في آخره: أبى الله أن يكون كتابا صحيح غير كتابه. انتهى. وذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (فصل في خطأ الثقات وكونه لا يسلم منه بشر) : قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولابد أن يوجد فيها الخطأ، إن الله تعالى يقول: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

وروى الخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٦/٢ (تحقيق المعلمي) عن المزني تلميذ الشافعي رحمه الله قال: لو عورض كتاب سبعين مرة، لوجد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه.اهـ

وليس معناه أن يغفل لأجل ذلك الكتاب طره ويهمل كله فأي كتاب ينجو من ذلك غير كتاب الله ؟! ونعم ما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي (المتوفى ٧٩٥): يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صوابه. (القواعد في الفقه الإسلامي: ٣ ط. دار الكتب العلمية، بيروت)

আহলে ইলমের কাছে আমাদের সবিনয় দরখাস্ত যে, যদি কিতাবে কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আমাদের অবগত করবেন। সঠিক বিষয় পরিষ্কার হওয়ার পর আমাদের গ্রহণ করতে কোনো কুণ্ঠা নেই। তবে ফিকহী নুসূস ও ভাষ্য থেকে মাসআলা উদ্ধার করার ক্ষেত্রে মতভিন্নতা হওয়া খুব স্বাভাবিক। যা প্রত্যেক যুগেই ছিল। এক্ষেত্রেও যদি দলীল প্রমাণের মাধ্যমে কোনো দিক সঠিক হওয়া অগ্রগণ্য হয়, তাহলে আমরা গ্রহণ করবো, ইনশাআল্লাহ।

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه.

"হে আল্লাহ! আমাদের সামনে সত্যকে সত্যরূপেই দেখান এবং এর অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আর বাতিলকে বাতিলরূপেই দেখান এবং তা থেকে দূরে থাকার তাওফীক দিন।"

আরো অনেক সাথী ভাই বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। দ্বীনের মুখলিস মুতকিন খাদেম বানান। ইলমে আমলে তারাক্কী দান করুন। কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহের খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। আমাদের 'আজেযানা' এই খেদমতটুকু কবুল করে নিন। নিজ জিম্মায় ইশা'আত ও প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করুন। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। আমীন॥

هذا، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

বিনীত
বান্দা আবদুল্লাহ নাজীব
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
১৮ রজব, ১৪৩৯ হিজরী
৪ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

তহারত ও পানি সংক্রান্ত কিছু জরুরি মূলনীতি ও আহকাম

মাওলানা সফিউল্লাহ বিন হারূন, কুমিল্লা

তহারত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হাদীস শরীফে তহারতকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে।[৮১] নামায ছাড়াও আরো কিছু ইবাদতের ক্ষেত্রে তহারত আবশ্যকীয়। আর তহারত অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হলো পানি। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ব্যবহার্য বস্তুসহ প্রায় সব বস্তুর তহারত অর্জনে পানি ব্যবহার হয়।

বর্তমান যুগে পানি সংরক্ষণ ও তহারত অর্জনের নতুন নতুন সরঞ্জাম ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ফলে তহারত অর্জন ও পাক-নাপাকের ক্ষেত্রে সামনে এসেছে নতুন কিছু জটিলতা, নতুন কিছু জিজ্ঞাসা। এ ধরনের কিছু জটিলতার সমাধান ও জিজ্ঞাসার জবাব নিয়ে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

ট্যাংকির পানির পবিত্রতা : শর'য়ী বিধান ও মূলনীতি

যেহেতু তহারত অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো পানি, তাই পানির পবিত্রতা ও তা পবিত্রকরণের ব্যাপারে শরী'আতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম রাহ. পানির ছোট-বড় পাত্র, কুয়া ও পুকুর ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ এবং শরী'আতের মূলনীতিসমূহের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর আলোকেই বর্তমান ট্যাংকি এবং হাউজের বিধান সম্পর্কে নিম্নে আমরা কিছু মৌলিক আলোচনা করবো।

স্থির পানির প্রকারভেদ, পরিমাণ ও শর'য়ী বিধান

ট্যাংকির পানিকে শরী'আতের দৃষ্টিতে স্থির পানি (الماء الراكد) বলা হয়। স্থির পানিকে ফুকাহায়ে কেরাম দুই প্রকারে ভাগ করে থাকেন-

১. স্বল্প পানি (الماء القليل)

২. অধিক পানি (الماء الكثير)

উভয় প্রকারের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে।

স্বল্প পানির ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের নাপাকি পড়লে পানি নাপাক হয়ে যাবে। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري ثم يغتسل فيه.

"তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে পেশাব না করে; কেননা সেখানেই তো সে আবার গোসল করে।"[৮২]

পক্ষান্তরে পানির পরিমাণ বেশি হলে (الماء الكثير) তা স্বাভাবিক আবস্থায় নাপাক হবে না। রাসূল ﷺ সমুদ্রের পানি সম্পর্কে বলেন-

---

[৮১] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ২২৩, সুনানে নাসাঈ: হাদীস নং ২৪৩৭, সুনানে ইবনে মাজা: হাদীস নং ২৮০

[৮২] সহীহ বুখারী: ৬, মাকতাবাতুল ফতাহ, হাদীস নং ২৩৮ (باب البول في الماء الدائم)

هو الطهور ماءه والحل ميتته.

"সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তাতে যা মৃত মাছ পাওয়া যায় তাও হালাল।"[৮৩]

এছাড়াও তিনি মদীনার বেশি পানি বিশিষ্ট একটি কূপ 'বিরে বুযা'আ' (بئر بضاعة) সম্পর্কে বলেছেন-

الماء طهور لاينجسه شيء.

"পানি পবিত্র, তাকে কোনো কিছু অপবিত্র করতে পারে না।"[৮৪]

এর ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম কম পানি ও বেশি পানির বিধান নির্ণয় করেছেন। আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আল মাওসিলী রাহ.[৮৫] বলেন-

والأصل أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه والكثير لا، لقوله – عليه الصلاة والسلام – في البحر: «هو الطهور ماؤه.

"মূলনীতি হলো- অল্প পানিতে নাপাক পড়ার সাথে সাথেই তা অপবিত্র হয়ে যায়। বেশি পানি এমন নয়। কারণ, রাসূল ﷺ সমুদ্রের পানির ব্যাপারে বলেছেন, 'তার পানি পবিত্র'।"[৮৬]

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, পানির পরিমাণ যদি বেশি হয়, তাহলে নাপাকি পড়লেও স্বাভাবিক আবস্থায় (অর্থাৎ, তাতে নাপাকি বা তার কোনো চিহ্ন দৃশ্যমান না হলে) তা নাপাক হবে না। আল্লামা আবু বকর ইবনে মাযাহ আল বুখারী রাহ. বলেন-

يجب أن يعلم أن الماء الراكد إذا كان كثيراً فهو بمنزلة الماء الجاري لا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. على هذا اتفق العلماء وبه أخذ عامة المشايخ، وإذا كان قليلاً فهو بمنزلة الحباب والأواني يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تتغير إحدى أوصافه.

"এটা জানা উচিত যে, আবদ্ধ পানির পরিমাণ বেশি হলে তার বিধান প্রবহমান পানির মতোই।

---

[৮৩] (হাদীস সহীহ) মুয়াত্তায়ে মালেক: ৮ সুনানু আবী দাউদ ১/১১, আশরাফিয়া, সহীহ ইবনে খুযাইমা: ১১১, সহীহ ইবনে হিব্বান: ১২৪৩। সনদের বিচারে হাদীসটিতে দুর্বলতা থাকলেও তালাক্কীর বিচারে হাদীসটি সহীহ। তাই একাধিক ইমাম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনে মান্দাহ, ইমাম ইবনুল মুনযির ও ইমাম বাগাবী রাহ. হাদীসটি সহীহ বলেছেন। (দ্র. আল ই'লালুল কবীর, আত তালখীসুল হাবীর: ১/৭,৮ আযওয়াউস সালাফ)

[৮৪] (হাদীস সহীহ) সুনানুত তিরমিযী: হাদীস নং ৬৬, মুসনাদে আবু ইয়ালা: হাদীস নং ২৪০৭, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২১০০। হদীসটির সনদে কিছু আপত্তি থাকলেও একাধিক সনদ ও তালাক্কীর কারণে অনেক ইমাম সহীহ বলেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ইমাম ইবনে মাঈন, ইবনে হাযম, ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। এছাড়া ইমাম আইনী রাহ. হযরত ইবনে আব্বাসের সনদে বর্ণিত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (দ্র. আল মুগনী- ইবনে কুদামা ১/৩১, আত তালখীসুল হাবীর ১/১৭, নুখাবুল আফকার ১/১২), প্রকাশ থাকে যে, হাদীসের শব্দে ব্যাপকতা থাকলেও তা উদ্দেশ্য নয়। অন্যান্য সহীহ হাদীস ও উম্মতের ইজমার কারণে ব্যাপকতার পরিবর্তে খাস অর্থেই ব্যাখ্যা করতে হবে। (দ্র. নুখাবুল আফকার)

[৮৫] আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ ইবনে মাওদুদ আলমাওসিলী, আলহানাফী। ৫৯৯ হিজরীতে ইরাকের মাওসিল (বর্তমান মসুল) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৮৩ হিজরীর মুহাররম মাসে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। ফিকহে হানাফীর (المتون الأربعة) মৌলিক চার গ্রন্থের মধ্যে 'আল মুখতার' ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আল ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার 'তাঁরই বিখ্যাত রচনা। (আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ: ১০৬)

[৮৬] আল ইখতিয়ার লি তা'লিলিল মুখতার: ১/৩৫, দারুল হাদীস

এর কোনো এক প্রান্তে নাপাকি পতিত হলে সমস্ত পানি নাপাক হয় না। তবে যদি পানির রং, স্বাদ বা ঘ্রাণ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে নাপাক হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত। মাশায়েখগণ এটাকেই গ্রহণ করেছেন।

আর যদি পানি অল্প হয়, তাহলে তাতে নাপাকি পতিত হলেই তা নাপাক হয়ে যাবে। যদিও তার কোনো গুণের মাঝে পরিবর্তন না হয়।"[৮৭]

তবে **বেশির পরিমাণ কী** তা নির্দিষ্টভাবে হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। মাযহাবের প্রধান ইমামগণও এ ব্যাপারে কোনো পরিমাপ নির্দিষ্ট করেননি। তবে তারা বিভিন্ন আলামত উল্লেখ করেছেন, যা থেকে বেশি পানির পরিমাণ সম্পর্কে মোটামুটি স্পষ্ট ধারণালাভ করা যায়। যেমন, আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আল মাওসিলী রাহ. বলেন-

واعتبرناه فوجدناه ما لا يخلص بعضه إلى بعض. فنقول: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، وهذا معنى قولهم لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشرا في عشر فقدروه بذلك تيسيرا.

"বেশির পরিমাণ সম্পর্কে গবেষণা করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বেশি পানি হলো যার একাংশ অপর অংশের মাঝে সংমিশ্রিত হয় না। সুতরাং আমরা বলবো, যে পানি এত বেশি যে, তার একাংশ অপর অংশের মাঝে সংমিশ্রিত হয় না। সুতরাং আমরা বলবো, যে পানি এত বেশি যে, তার একাংশ অপর অংশের মাঝে সংমিশ্রিত হয় না, সে পানিতে নাপাকি পড়লেও পানি নাপাক হয় না। বেশি পানির আলামতের ক্ষেত্রে অনেক ফকীহ যা বলেছেন- 'যে পানির এক প্রান্তে নাড়া দিলে তার চিহ্ন অপর প্রান্তে প্রকাশ পায় না'- এ আলামতের মূল কথাও তাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। তবে মাশায়েখগণ মানুষের বোঝার সহজার্থে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাপে নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ, ১০×১০ হাত।"[৮৮]

ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর শাগরিদ ইমাম আবু সুলাইমান জুযাজানী রাহ. নির্দিষ্টভাবেই ১০×১০ হাত (অর্থাৎ, ১০০ বর্গহাত)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আবু বকর ইবনে মাযাহ আল বুখারী রাহ. বলেন-

وأبو سليمان الجوزجاني رحمه الله كان يقول: إن كان عشراً في عشر فهو مما لا يخلص بعضه إلى بعض، وإن كان أقل من ذلك فهو مما يخلص.

"আবু সুলাইমান জুযাজানী রাহ. বলেন, যদি কূপ ১০×১০ হাত হয়, তাহলে তার এক অংশের পানি অপর অংশের সাথে মিশ্রিত হয় না (অর্থাৎ তা বেশি পানি)। আর যদি এর চেয়ে ছোট হয়, তাহলে মিশ্রিত হয়।"[৮৯]

সম্ভবত তিনি এই পরিমাপ ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর একটি বক্তব্য থেকে গ্রহণ করেছেন। আল্লামা সারাখসী রাহ. বলেন-

وأما التقدير بالمساحة فقد قال أبو عصمة: كان محمد -رحمه الله تعالى- يقدر في ذلك عشرة في

---

[৮৭] আল মুহীতুল বুরহানী: ১/৬৮, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী

[৮৮] আল ইখতিয়ার লিতা'লিলি মুখতার: ১/৩৫, দারুল হাদীস, কায়রো

[৮৯] আল মুহীতুল বুরহানী: ১/১০১, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী

عشرة.

"পরিমাপ হিসেবে (বড় হাউজের আকার) নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবু ইসমাহ রাহ. বলেন, ইমাম মুহাম্মদ রাহ. ১০×১০ (১০০ বর্গহাত) পরিমাপ করতেন।"[৯০]

তিনি আরো বলেন-

وعن محمد رحمه الله في «النوادر» أنه سئل عن هذه المسألة فقال: إن كان مثل مسجدي هذا فهو مما لا يخلص بعضه إلى بعض، فلما قام مسح مسجده فكان ثمان في ثمان في رواية، وعشراً في عشر في رواية واثني عشر في اثني عشر في رواية.

"নাওয়াদিরের কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকে বর্ণিত আছে, এই মাসআলা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, তখন তিনি উত্তরে বলছিলেন, যদি কূপ বা পানির আধার এই মসজিদের মতো হয়, তাহলে তার এক অংশের পানি অপর অংশের সাথে মিশ্রিত হয় না (অর্থাৎ, তা বেশি পানি গণ্য হবে)। অতঃপর যখন মসজিদ মাপা হলো তখন এক বর্ণনা অনুযায়ী তা ৮×৮ হাত, আরেক বর্ণনা অনুযায়ী ১০×১০ হাত, আরেক বর্ণনা অনুযায়ী ১২×১২ হাত ছিলো।"[৯১]

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকে আরো একটি মত রয়েছে, যা মাযহাবের প্রধান ইমামদের মতের অনুরূপ।[৯২] তবে পরবর্তী ইমামগণ সাধারণ মানুষের জন্য সহজকরণার্থে ইমাম আবু সুলাইমান জুযাজানী রাহ.-এর মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লামা আবু বকর ইবনে মাযাহ আল বুখারী রাহ. বলেন-

وعامة المشايخ أخذوا بقول أبي سليمان وقالوا: إذا كان عشراً في عشر فهو كبير.

"অধিকাংশ মাশায়েখ আবু সুলাইমান জুযাজানী রাহ.-এর পরিমাপ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, ১০×১০ (১০০ বর্গহাত) হলেই হাউজটি বড় বলে গণ্য হবে।"[৯৩]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. (১০৮৮ হি.) বলেন-

لكن في النهر: وأنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط ولا سيما في حق من لا رأي له من العوام، فلذا أفتى به المتأخرون الأعلام: أي في المربع بأربعين، وفي المدور بستة وثلاثين، وفي المثلث من كل جانب خمسة عشر وربعا وخمسا بذراع الكرباس،[৯৪] ولو له طول لا عرض لكنه يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيرا، ولو أعلاه

---

[৯০] আল মাবসূত: ১/৭১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[৯১] আল মাবসূত: ১/৭১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[৯২] অর্থাৎ, কোনো পরিমাপ নির্দিষ্ট না করে বাস্তবতা ও অবস্থা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হবে। যেমন, ইমাম আবু জাফর তাহাবী রাহ. বলেন: وهو: ما لايتحرك أحد أطرافه بتحريك ما سواه من أطرافه

[৯৩] আল মুহীতুল বুরহানী: ১/১০১, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী

[৯৪] এখানে ব্যাখ্যাকার আল্লামা শামী রাহ. বলেন:

(قوله: وربعا وخمسا) في بعض النسخ أو خمسا بأو لا بالواو، وهي الأصوب بناء على الاختلاف في التعبير، فإن بعضهم كنوح أفندي عبر بالربع وبعضهم كالشرنبلالي في رسالته عبر بالخمس، وهو الذي مشى عليه في السراج حيث قال: فإن كان مثلثا فإنه يعتبر أن يكون كل جانب منه خمسة عشر ذراعا وخمس ذراع حتى تبلغ مساحته مائة ذراع، بأن تضرب أحد جوانبه في نفسه، فما صح أخذت ثلثه وعشره فهو مساحته. بيانه أن تضرب خمسة عشر وخمسا في نفسه يكون مائتين وإحدى وثلاثين وجزءا من

عشرا وأسفله أقل جاز حتى يبلغ الأقل.

“...অধিক পানির পরিমাণের ক্ষেত্রে ১০×১০ (১০০ বর্গহাতের) মত গ্রহণ করাই অধিক সমীচীন, বিশেষ করে সর্বসাধারণের প্রতি লক্ষ করে। যাদের মাঝে সঠিক বিবেচনা করার যোগ্যতা নেই। এজন্যই পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম এই মতের উপর ফাতওয়া দিয়েছেন। অর্থাৎ, চতুর্ভুজাকার হাউজের ক্ষেত্রে (প্রত্যেক দিকে দশহাত করে) চল্লিশ হাত, বৃত্তাকার (গোল) হাউজের ক্ষেত্রে (পরিধি হবে) ছত্রিশ হাত, এবং ত্রিভুজাকার হাউজের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিকে কাপড় মাপার হাত হিসেবে পনের দশমিক দুই হাত করে হতে হবে। আর যদি হাউজের দৈর্ঘ্য বেশি ও প্রস্থ কম হয়; কিন্তু তার ক্ষেত্রফল ১০×১০ তথা ১০০ বর্গহাত হয় (যেমন, যদি দৈঘ্য ৫০ হাত ও প্রস্থ ২ হাত হয়), তাহলে তা দ্বারা অযু গোসল জায়েয হবে। আর যদি হাউজের উপরিভাগ (১০×১০=১০০) হয়, তবে নিম্নভাগে পৌঁছা পর্যন্ত (নাপাকি পড়লেও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা) জায়েয হবে।”[৯৫]

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২ হি.) لكنه يبلغ-এর ব্যাখ্যায় বলেন-

(قوله: لكنه يبلغ إلخ) كأن يكون طوله خمسين وعرضه ذراعين مثلا فإنه لو ربع صار عشرا في عشر.

“যেমন কোনো হাউজের দৈর্ঘ্য ৫০ হাত, আর প্রস্থ ২ হাত। এখন যদি গুণ দেয়া হয়, তাহলে ১০×১০ হাত (১০০ বর্গহাত) হবে।”[৯৬]

অতএব বোঝা গেলো, ‘দাহ দর দাহ’ (১০×১০) বা বড় কূপ বলা হবে যার ক্ষেত্রফল (মোট পরিমাণ ফল) ফুট হিসেবে ২২৫ বর্গফুট, হাত হিসেবে ১০০ বর্গহাত ও মিটার হিসেবে ২০.৯০ বর্গমিটার হয়।

তবে হাউজের চতুপার্শ্বের পরিধি (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) কতটুকু হবে তা নির্ণয় করা হবে হাউজের আকার অনুযায়ী।[৯৭]

خمسة وعشرين جزءا من ذراع، فثلثه على التقريب سبعة وسبعون ذراعا، وعشره على التقريب ثلاثة وعشرون فذلك مائة ذراع وشيء قليل لا يبلغ عشر ذراع. اهـ. أقول: وعلى التعبير بالربع يبلغ ذلك الشيء القليل نحو ربع ذراع فالتعبير بالخمس أولى كما لا يخفى فكان ينبغي للشارح الاقتصار عليه فافهم. (رد المحتار ٣٧٩/١ مكتبة الأزهر)

[৯৫] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩৭৮, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৯৬] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩৭৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৯৭] নিম্নে ফিকহের কিতাব থেকে হাউজের আকার অনুযায়ী পরিধির কিছু মৌলিক পরিমাপ তুলে ধরা হলো-

ক. হাউজ যদি চতুর্ভুজাকারের (مربع) হয় এবং বর্গক্ষেত্র হয়, অর্থাৎ, তার চারটি বাহুই পরস্পর সমান হয় এবং প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ হয় তাহলে তার চতুপার্শ্বের পরিধি হবে- হাত হিসেবে ৪০ হাত। অর্থাৎ, প্রতিটি বাহু ১০ হাত করে (১০×৪) = ৪০ হাত।

আর ফুট হিসেবে ৬০ ফুট, অর্থাৎ, প্রতিটি বাহু ১৫ ফুট করে (১৫×৪) = ৬০ ফুট।

আর মিটার হিসেবে ১৮.২৮ মিটার। অর্থাৎ, প্রতিটি বাহু ৪.৫৭ মিটার করে (৪.৫৭×৪) = ১৮.২৮ মিটার।

উল্লেখ্য, যদি চতুর্ভুজাকার হাউজের চার বাহু সমান না হয়ে ছোট-বড় হয়, তাহলে তার পরিধি দৈর্ঘ ও প্রস্থের ভিন্নতা হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন হবে। তবে ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গহাত হলেই তা বড় কূপ বিলে গণ্য হবে।

খ. হাউজ যদি ত্রিভুজাকারের (مثلث) হয়ে সমবাহু হয়, তাহলে তার প্রতিটি বাহু হাত হিসেবে ১৫.২ হাত হবে। অতএব তিন দিকের পরিধি হবে (১৫.২×৩) = ৪৫.৬ হাত।

আমাদের লক্ষ রাখতে হবে যে, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের ক্ষেত্রেই এই পরিমাপ প্রযোজ্য হবে। এতে গভীরতা বিবেচ্য নয়। সুতরাং দৈর্ঘ্য ১০×১০ না হয়ে গভীরতা অনেক বেশি হলেও তাকে الماء الكثير বা বেশি পানি বলা হবে না এবং তার ক্ষেত্রে الماء الجاري বা প্রবহমান পানির হুকুমও প্রযোজ্য হবে না। ফুকাহায়ে কেরাম ন্যূনতম গভীরতা কতটুকু বিবেচ্য হবে তা নিয়েও আলোচনা করেছেন। আল্লামা আবু বকর ইবনে মাযাহ আল বুখারী রাহ. বলেন-

جئنا إلى بيان مقدار العمق فنقول: ذكر المعلى في «كتابه»: أنه ينبغي أن يكون عمقه قدر ذراعين، وهذا على قول من يعتبر التحريك بالاغتسال لأن على قوله: ينبغي أن يكون الماء بحال يتأتى فيه الاغتسال وذلك قدر ذراعين. وقال بعضهم قالوا: اشترط أن يكون بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه لا ينحسر ولا يظهر ما تحته، وقال بعضهم: يشترط أن يكون بحال لو حُرك وجه الماء لا يتكدر ماء وجه الأرض.

وحكي عن الشيخ الإمام الزاهد أبي بكر بن حامد رحمه الله أنه قال: قدّر مشايخنا العمق بأربعة أصابع مفتوحة.

“গভীরতার পরিমাণ: আল্লামা মু‘আল্লা ইবনে মানসুর রাহ. (২১১ হি.) উল্লেখ করেন, (যারা গোসল করার মাধ্যমে নাড়া দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেন, তাদের কথা অনুযায়ী) পানির গভীরতা দুই হাত হওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেছেন, এতটুকু পানি থাকা শর্ত যাতে কেউ তার দু’হাত একত্র করে পানি উঠালে পানি কমে গিয়ে তার তলদেশ প্রকাশ পায় না। আবার কেউ কেউ বলেন, এতটুকু পানি থাকা শর্ত যাতে পানির উপরের অংশে নাড়া দেয়া হলে পানি (নিচের মাটির কারণে) ঘোলাটে না হয়ে যায়। ইমাম আবু বকর ইবনে হামেদ রাহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদের মাশায়েখগণ গভীরতা নির্ধারণ করেছেন আঙ্গুল খোলা রাখা অবস্থায় চার আঙ্গুল পরিমাণ হিসেবে।”[৯৮]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

আর ফুট হিসেবে প্রতিটি বাহু ২২.৮ ফুট হবে। অতএব মোট পরিধি হবে (২২.৮×৩) = ৬৮.৪ ফুট।

আর মিটার হিসেবে প্রতিটি বাহু হবে ৬.৯৪ মিটার । অতএব মোট পরিধি হবে (৬.৯৪×৩) = ২০.৮২ মিটার।

গ. হাউজ যদি বৃত্তাকার (مدور) হয়, তাহলে তার পরিধি হবে ৩৬ হাত। কারণ, তখন তার ব্যাস (বৃত্তের কেন্দ্রকে ভেদ করে দুই দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরল রেখা) হবে ১১.২ আর অর্ধ পরিধি তথা ১৮ কে ব্যাসার্ধ তথা ৫.৬ দিয়ে গুণ করলে গুণফল হবে (১৮×৫.৬) = ১০০.৮। এটাই হলো ক্ষেত্রফল।

ফুট হিসেবে হবে (৩৬×১.৫) = ৫৪ ফুট।

আর মিটার হিসেবে (৩৬÷৩.২৮০৮) = ১৬.৪৫ মিটার।

সুতরাং, বৃত্তাকার হাউজের ক্ষেত্রে তার পরিধি ৩৬ হাত হলে, তা ‘দাহ দর দাহ’ বা বড় কূপ হিসেবে গণ্য হবে। তবে সতর্কতা হিসেবে ৪৮ হাত, ফুট হিসেবে ৭২ ফুট ও মিটার হিসেবে ২১.৯৪ মিটার হওয়াটা উত্তম।
উল্লিখিত আকারগুলো ছাড়াও হাউজের বিভিন্ন আকার হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জ্যামিতির সূত্র প্রয়োগ করে তার ক্ষেত্রেফল বের করে নিতে হবে। ক্ষেত্রফল যদি ‘হাত’ হিসেবে ১০০ বর্গহাত, ফুট হিসেবে ২২৫ বর্গফুট ও মিটার হিসেবে ২০.৯০ বর্গমিটার হয়, তাহলে ‘দাহ দর দাহ’ বা বড় কূপ বলে গণ্য হবে। (বিস্তারিত দেখুন: রদ্দুল মুহতার: ১/৩৭৯, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়্যাহ: ৩/৩৭, আহসানুল ফাতাওয়া: ২/৪৫)

[৯৮] আল মুহীতুল বুরহানী: ১/১০২, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী

ولو له طول لا عرض لكنه يبلغ عشرا في عشر جاز تيسيرا، ولو أعلاه عشرا وأسفله أقل جاز حتى يبلغ الأقل، ولو بعكسه فوقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر.

"যদি কোনো পানির অবস্থান এমন হয় যে, তার দৈর্ঘ্য আছে; কিন্তু প্রস্থ একেবারেই অল্প; তবে তা পরিমাপ করলে ১০×১০ হাত হবে, তাহলে তা বেশি পানি গণ্য হবে।

যদি পানির উপরিভাগ ১০×১০ হয় আর নিচের অংশ কম হয়, তা বেশি পানি গণ্য হবে (কারণ, এক্ষেত্রে পানির উপরিভাগের পরিমাপই ধর্তব্য হবে)। আর যদি এর উল্টো হয় (অর্থাৎ, নিম্নভাগ বেশি এবং উপরিভাগ কম) তাহলে তা বেশি পানি হবে না।"[৯৯]

উপরোক্ত পরিমাপ অনুযায়ী কোনো হাউজ বা পুকুর যদি বড় হয় (অর্থাৎ ১০০ বর্গহাত হয়) তাহলে তাতে নাপাকি পড়লেও পানির রং, ঘ্রাণ অথবা স্বাদের মাঝে কোনো পরিবর্তন না আসলে তা নাপাক হবে না এবং তার পানি দ্বারা অযু-গোসল সবই করা যাবে।

আর বেশি পানির ক্ষেত্রে এক প্রান্তে নাপাকি পড়ার পরও অপর প্রান্তে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয আছে। কারণ, বেশি পানিতে নাপাকি পড়ার দ্বারা তা সমস্ত পানির সাথে মিশে যায় না; বরং সমস্ত পানির সাথে মিলিত হওয়ার আগেই সাধারণত তা নিঃশেষ হয়ে যায়। হ্যাঁ, তবে যদি সমস্ত পানির সাথে মিশে যায় এবং পানির উপর নাপাকি প্রাধান্য পায়, তাহলে সেই পানি সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক হয়ে যাবে এবং তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহ. বলেন-

لاخلاف بين المسلمين أن الماء الذي قد ظهرت فيه النجاسة، لايجوز استعماله للطهارة.

"এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই যে, যে পানির মধ্যে নাপাকির চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে, পাবে তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ হবে না।"[১০০]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. (৫৯৩ হি.)[১০১] বলেন-

"والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه " إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة.

"এমন বড় পুকুর যার এক প্রান্ত নাড়া দিলে অপর প্রান্ত নড়ে না, যদি তার এক প্রান্তে নাপাকি পতিত হয়, তাহলে অপর প্রান্তে অযু করা জায়েয হবে। কেননা নাপাকি অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেনি। কারণ, নাপাকির প্রভাবের তুলনায় নাড়ানোর প্রভাব দ্রুত অপর প্রান্তে পৌঁছে (যেখানে নাড়ানোর প্রভাব অপর প্রান্তে পৌঁছেনি, সেখানে নাপাকির প্রভাব না পৌঁছাটাই

---

[৯৯] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩৭৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১০০] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ১/২৪৫, মাকতাবায়ে কারীমিয়্যা

[১০১] আবুল মা'আলী বুরহানুদ্দীন মাহমুদ ইবনে সদরুস সাঈদ তাজুদ্দীন আহমাদ ইবনে সদরুল কাবীর বুরহানুদ্দীন আব্দুল আযীয ইবনে উমর ইবনে মাযাহ, আলবুখারী, আলমারগীনানী, আলহানাফী। তিনি ৫৫১ হিজরীতে মারগীনানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬১৬ হিজরীতে বুখারাতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ফিকহে হানাফীর একজন প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ইমাম ছিলেন। তাঁর রচিত 'আল মুহীতুল বুরহানী' ফিকহে হানাফীর সুবিশাল ইলমী ভান্ডার। (আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ: ২০৫-২০৭)

স্বাভাবিক)।"[১০২]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. (১০৮৮ হি.) বলেন-

(وبتغير أحد أوصافه) من لون أو طعم أو ريح (ينجس) الكثير ولو جاريا إجماعا.

"পানির কোনো একটি গুণ, অর্থাৎ রং, স্বাদ, ঘ্রাণ পরিবর্তন হলে বেশি পানিও নাপাক হয়ে যায়। যদিও তা প্রবহমান পানি হয়। এটা সর্বজনস্বীকৃত মত।"[১০৩]

ছোট-বড় ট্যাংকির বিধান

আমরা জেনেছি যে, ফিকহী পরিভাষা অনুযায়ী স্থির পানির ক্ষেত্রে স্বল্প পানি ও বেশি পানির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। বেশি পানির পরিমাণ ও পরিমাপ সম্পর্কেও আমরা সম্যক ধারণা লাভ করেছি। ট্যাংকির ক্ষেত্রেও উক্ত পরিমাপ প্রযোজ্য হবে।

বাড়ির নিচের আন্ডারগ্রাউন্ড বা রিজার্ভ ট্যাংকি অথবা ছাদের উপরের ট্যাংকি যদি ১০০ বর্গহাত হয়, তাহলে উক্ত ট্যাংকি বড় ট্যাংকি এবং তার পানিও বেশি পানি (الماء الكثير) এবং প্রবাহিত পানির (الماء الجاري)-এর হুকুমে বলে ধর্তব্য হবে।

সুতরাং ১০০ বর্গহাতের কোনো হাউজ বা ট্যাংকির কোনো এক প্রান্তে যদি জমাটবদ্ধ/শরীরবিশিষ্ট বা অন্য কোনো তরল নাপাকি পড়ে এবং এর দ্বারা পানির রং, ঘ্রাণ অথবা স্বাদের মাঝে কোনো পরিবর্তন না আসে, তাহলে ঐ পানি স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র থাকবে। হ্যাঁ, শরীরবিশিষ্ট নাপাকির ক্ষেত্রে যদি নাপাকির লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহলে যতটুকু অংশে প্রকাশ পাবে ততটুকু অংশ নাপাক বলে বিবেচিত হবে। আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

فإن وقع في الماء، فإن كان جاريا، فإن كان النجس غير مرئي كالبول والخمر ونحوهما لا ينجس، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ويتوضأ منه من أي موضع كان من الجانب الذي وقع فيه النجس أو من جانب آخر.

"যদি প্রবহমান পানিতে অদৃশ্যমান নাপাকি পড়ে, যেমন, পেশাব, মদ ইত্যাদি, তাহলে তার রং, স্বাদ, ঘ্রাণ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পানি নাপাক হবে না। নাপাকি যে প্রান্তে পতিত হয়েছে সে প্রান্তে হোক বা অন্য প্রান্তে, সর্বত্রই অযু করা যাবে।"[১০৪]

আল্লামা সদরুশ শারী'আহ্ উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহ. (৭৪৫ হি.)[105] বলেন-

فإن كانت النجاسة مرئية لايتوضأ من موضع النجاسة بل من جانب الآخر، وإن كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب.

"নাপাকি যদি দৃশ্যমান হয়, তাহলে তা পানির যে প্রান্তে পতিত হয়েছে সে প্রান্তে অযু করা যাবে না; তবে অন্য প্রান্তে অযু করা যাবে। আর যদি দৃশ্যমান না হয় তাহলে যেকোনো প্রান্তে

---

[১০২] আল হিদায়া: ১/৩৬, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া

[১০৩] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩৬৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১০৪] বাদায়েউস সানায়ে: ১/২১৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১০৫] উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে মাসউদ ইবনে তাজুশ শরী'আহ আছগর। তিনি সদরুশ শরী'আহ আছগর নামে প্রসিদ্ধ। ৭৪৭ হিজরীতে বর্তমানে উযবেকিস্তান রাষ্ট্রের অর্ন্তগত বুখারা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। 'শরহুল বেকায়া', 'আত তাওযীহ ফী হাল্লি গাওয়ামিযিত তাহকীহ', 'আননুকায়াহ মুখতাসারুল বেকায়াহ' তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলির অন্যতম। (আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ: ১০৯-১১২)

অযু করা যাবে।"[১০৬]

আর ট্যাংকি যদি ছোট হয়, অর্থাৎ, তা ১০০ বর্গহাত-এর চেয়ে ছোট হয়, তাহলে তাতে সামান্য পরিমাণ নাপাকি পড়ার দ্বারাই পানি নাপাক হয়ে যাবে। যদিও নাপাকির কোনো আলামত পানিতে প্রকাশ না পায়। আল্লামা আহমদ ইবনে ইসমাঈল আত তাহতাবী রাহ. (১২৩১ হি.)[১০৭] বলেন-

إن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره.

"অল্প পানিতে অল্প নাপাকি পতিত হলে তা নাপাক হয়ে যায়, যদিও তাতে নাপাকির কোনো চিহ্ন প্রকাশ না পায়।"[১০৮]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. (১০৮৮ হি.) বলেন-

...أما القليل فينجس وإن لم يتغير.[১০৯]

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২ হি.) বলেন-

ومعلوم أن النجاسة ولو قليلة تفسد الماء القليل.

"অল্প পানিতে নাপাকি পতিত হলে পানি নাপাক হয়ে যাবে, যদিও নাপাকি সামান্য হয়।"[১১০]

কারণ, স্থির অল্প পানিতে (الماء القليل الراكد) কোনো কিছু মিলিত হওয়ার সাথে সাথেই তা সমস্ত পানিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো পানি নাপাক হয়ে যায়। তাই এই পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না। চাই তাতে নাপাকির আলামত দৃশ্যমান হোক বা না হোক। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহ. বলেন-

وعلة التنجيس هو ما ذكرنا من حصول النجاسة فيه.

"অল্প পানি নাপাক হওয়ার কারণ হলো, তাতে নাপাকি মিশ্রিত হয়ে যাওয়া।"[১১১]

ছোট ট্যাংকিতে নাপাকি পড়লে তা পবিত্র করার পদ্ধতি

পূর্বে আমরা জেনেছি যে, 'বেশি পানি' এবং 'প্রবাহিত পানি'তে[১১২] নাপাকি পড়লেও নাপাকির চিহ্ন প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তা নাপাক হয় না। সুতরাং এ দু'প্রকার পানির ক্ষেত্রে শুধু নাপাকি বের করা সম্ভব হলে, তা বের করলেই চলবে। বাকি পানি বা পাত্রের পবিত্রতার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা নেই। তবে অল্প ও স্থির পানি[১১৩] যেহেতু নাপাকি পড়ার কারণে পুরোটাই নাপাক হয়ে

---

[১০৬] শরহে বেকায়া: ১/৮০-৮১

[১০৭] আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল তাহতাবী, আলমিশরী, আলহানাফী। মিশরের 'তাহতা' অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়রোতে ১২৩১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার পিতা রোম থেকে তাহতা অঞ্চলের বিচারক হিসাবে আগমন করেছিলেন। তিনি জামিয়াতুল আযহারে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। 'হাশিয়া আলাদ্দুররিল মুখতার', 'হাশিয়া আলা মারাকিল ফালাহ' তাঁর লিখিত টীকা গ্রন্থ। (আল আ'লাম লিয যিরিকলী: ১/২৪৫)

[১০৮] হাশিআতুত তাহতাবী আলা মারাকীল ফালাহ: ৩৬, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ

[১০৯] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩৬৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১১০] রদ্দুল মুহতার: ১/৩৬৪, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১১১] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ১/২৯৩, মাকতাবায়ে কারীমিয়্যা

[১১২] ফিকহী পরিভাষা অনুযায়ী

[১১৩] ফিকহী পরিভাষা অনুযায়ী

যায়, তাই তা পবিত্রকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
মূল আলোচনার পূর্বে জানতে হবে যে, নাপাক পানি বা পাত্র পাক করার ক্ষেত্রে শরী'আতের দৃষ্টিতে দুটি বিষয় লক্ষণীয়-

এক. নাপাকি বা নাপাক অংশকে দূর করা বা সরিয়ে ফেলা (الإزالة)। এটিই তহারতের অর্থ এবং মূল বিষয়বস্তু। তহারত সংক্রান্ত হাদীসগুলো থেকে বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝে আসে। অনেক হাদীসে রাসূল ﷺ স্পষ্টভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন। যেমন, এক হাদীসে ইরশাদ করেন-

اغسلي عنك الدم وصلّي.

"তোমার শরীর ও কাপড় থেকে রক্ত ধৌত করে নামায আদায় করো।"[১১৪]
আরেক হাদীসে ঘীয়ের পাত্রে ইঁদুর পড়ার পর তা পাক করা প্রসঙ্গে বলেন-

إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه.

"যদি ঘী জমাটবদ্ধ হয়, তাহলে তার আশ-পাশের অংশ ফেলে দাও। আর যদি তরল হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ ফেলে দাও।"[১১৫]

দুই. তহারত ও নাজাসাত দূরীকরণের সাথে সম্পৃক্ত হাদীসসমূহ ও ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে যে, নাজাসাত বা নাপাকির ইযালা বা দূর করার ধরন, পদ্ধতি ও সীমা সর্বক্ষেত্রে এক নয়। নাপাকির ধরন, ক্ষেত্র ও মানুষের অবস্থা ইত্যাদির বিবেচনায় তার পদ্ধতি বিভিন্ন হয়ে থাকে।

উপরোক্ত দুটি মৌলিক বিষয়ের আলোকেই পানির পাত্র বা কোনো আধারে নাপাকি পড়ার পর তা পাক করার পদ্ধতি বুঝতে হবে।

ছোট ট্যাংকিতে যেহেতু অল্প পানি থাকে, তাই তাতে নাপাকি পড়ার সাথে সাথেই সমস্ত পানি নাপাক হয়ে যায়। সুতরাং তা পবিত্র করার জন্য শরীরবিশিষ্ট/জমাটবদ্ধ নাপাকি পড়লে প্রথমে তা তুলে ফেলতে হবে। অতঃপর সমস্ত পানি বের করে ফেলতে হবে এবং নতুন করে পুনরায় তাতে পানি ভর্তি করতে হবে অথবা তাতে প্রবহমান পানির অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

কূপের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, সকল পানি বের করার পর কূপ ও তার সীমানা পাক হয়ে যাবে। আলাদাভাবে তা আর ধৌত করতে হবে না। হ্যাঁ, তবে সেখানে নাপাকির কোনো অস্তিত্ব দৃশ্যমান হলে বা তা বিদ্যমান থাকার দৃঢ় ধারণা হলে, তা পাক করা জরুরী। ট্যাংকির ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে।

ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন–

إذا وقع في البئر نجاسة نزحت، وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها بإجماع السلف.

"যদি কূপের মধ্যে নাপাকি পড়ে, তাহলে তার সমস্ত পানি বের করে ফেলতে হবে। সালাফের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, কূপের সমস্ত পানি বের করে ফেলার দ্বারাই তা পবিত্র হয়ে যাবে।"[১১৬]

---

[১১৪] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৩০৬, সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৩৩৩, দ্র. ফাতহুল বারী ১/৫১২, মাকতাবাতুস সাফা
[১১৫] (সহীহ) সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ৩৮৪২, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ৭৫৯১, সুনানুন নাসাঈ: হাদীস নং ৪৫৭২, সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২৩৫, ২৩৬
[১১৬] আল হিদায়া: ১/৪০, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া

আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবিরতী[১১৭] রাহ.[১১৮] বলেন-

وقوله: وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها إشارة إلى أنه يطهر بمجرد النزح من غير توقف على غسل الأحجار ونقل الأوحال.

"কূপের পানি বের করে ফেললেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। এটা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, কূপের আশ-পাশ ধৌত করা এবং কাদা-মাটি বের করার পয়োজন নেই।"[১১৯]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. (১০৮৮ হি.)

(ينزح كل مائها) الذي كان فيها وقت الوقوع.

"নাপাকি পতিত হওয়ার সময় তাতে যেই পানি ছিল তা বের করে ফেললেই চলবে।"[১২০]

ছোট ট্যাংকির পানি পাক করার আরেকটি সূরত

ছোট কূপের পানি পাক করার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম সব পানি বের করা ছাড়াও আরেকটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো- উক্ত পানিকে প্রবহমান পানিতে পরিণত করা।

আমরা জানি, প্রবহমান পানিতে (الماء الجاري) নাপাকি পড়লেও সাধারণ অবস্থায় তা নাপাক হয় না।[১২১] এমনিভাবে স্থির পানিতে নাপাকি পড়ার পর যদি তা ফিকহী পরিভাষা অনুযায়ী

---

[১১৭] البابِرْتي ، اختُلف في ضبطه إلى البابَرتي نسبة إلى (بابَرْت بفتح الباء الثانية وسكون الراء قرية من أعمال دُجَيل كما في أنساب السمعاني ٢٤٩/١ ، ومعجم ياقوت ٢٤٦/٢) و إلى البابِرتي نسبة إلى (بابِرت بكسر الباء الثانية وسكون الراء قرية كبيرة من نواحي أرْزن الروم كما في معجم ياقوت ٢٤٦/٢).

فلو صحت نسبته إلى الأول لكان بفتح الباء وإلى الثاني لكان بكسرها. ورجح الأول العلامة اللكنوي في الفوائد ورجح الثاني الزركلي في الأعلام ٤٢/٧ فقال: وعندي أن نسبة صاحب الترجمة إلى هذه البلدة أرجح لقول ابن قاضي شهبة وابن إياس إنه رومي. انتهى كلام الزركلي ونسبه إلى الروم الحافظ ابن حجر في الإنباء و ابن تغري بردي في النجوم وابن العماد في الشذرات.

والخلاصة أن المعتمد هو البابِرتي بكسر الباء الثانية.

[১১৮] আকমালুদ্দীন আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মাহমুদ ইবনে আহমদ আররুমী, আলবাবিরতী, আলহানাফী। ৭১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৮৬ হিজরীর রমযান মাসে মিশরে ইন্তেকাল করেন। আবু হায়্যান আন্দুলসী এবং আবুল হাসান জুরজানী রাহ. তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তাদ। আকায়েদ, তাফসীর, হাদীস, ফিকহ এবং উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অনেক রচনা রয়েছে। এর মাঝে 'আল ইনায়াহ শরহুল হিদায়া' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (হুসনুল মুহাযারাহ: ১/৪৭১)

[১১৯] আল ইনায়াহ: ১/১০৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ (ফাতহুল কাদীরের সাথে)

[১২০] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৪০৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

আল্লামা আব্দুল কাদের রাফী'ঈ রাহ. (১৩২৩ হি.)-এর ব্যাখ্যায় বলেন:

قال الرافعي: قوله: قول الشارح (وقت الوقوع) قال السندي الصواب أن يقال وقت اخراجه، لأن ما زاد بعد وقوعه إلى حين اخراجه نجس لمجاورة النجاسة وكأنه أراد بالوقوع مدة دوام النجاسة قي البئر قيعتبر آخر أوقاته.

[১২১] আল্লামা আবুল হুসাইন কুদুরী রাহ. বলেন:

وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها أثر لا تستقر مع جريان الماء. [مختصر القدوري: ١٣]

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন:

بخلاف الماء الجاري؛ لأنه ينقل النجاسة من موضع إلى موضع، فلم يستيقن بالنجاسة في موضع الوضوء. [بدائع الصنائع: ٧٣/١]

প্রবাহিত পানিতে পরিণত হয়, তাহলেও তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাক হয়ে যায়। তবে শর্ত হলো- তাতে নাপাকির কোনো চিহ্ন বাকি না থাকতে হবে।

ছোট ট্যাংকির পানিকে দুইভাবে প্রবহমান পানিতে পরিণত করা যায়:

১. ছোট ট্যাংকিতে যদি শরীরবিশিষ্ট/জমাটবদ্ধ নাপাকি পড়ে, তাহলে প্রথমে তা পানি থেকে তুলে ফেলতে হবে। অতঃপর রিজার্ভ ট্যাংকি হলে সাপ্লাই লাইন বা মটরের মাধ্যমে এবং ছাদের উপরের ট্যাংকি হলে রিজার্ভ ট্যাংকি থেকে পানি উঠানোর মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে ট্যাংকি থেকে পানি উপচে পড়া পর্যন্ত পানি ভর্তি করতে হবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. (১০৮৮ হি.) বলেন-

كحوض صغير يدخله الماء من جانب ويخرج من آخر يجوز التوضؤ من كل الجوانب مطلقا، به يفتى.

“ছোট হাউজ যার এক প্রান্ত দিয়ে অনবরত পানি প্রবেশ করে এবং (একই সময়ে) অপর প্রান্ত দিয়ে বের হয়, এমন হাউজের চার পাশেই অযু করা জায়েয হবে। এর উপরই ফাতওয়া।”[১২২]

২. ছোট ট্যাংকিতে যদি শরীরবিশিষ্ট নাপাকি পড়ে তাহলে প্রথমে নাপাকি পানি থেকে তুলে ফেলতে হবে। অতঃপর পানি প্রবেশ এবং বের হওয়ার সব লাইন এক সাথে চালু করতে হবে। অর্থাৎ ট্যাংকিতে পানি প্রবেশের এবং ট্যাংকি থেকে পানি ব্যবহারের লাইন (অর্থাৎ টেপ, ঝর্ণা ইত্যাদি) এক সাথে চালু করতে হবে। পানি ব্যবহারের লাইন দিয়ে সামান্য পানি বের হলেই ট্যাংকি পবিত্র হয়েছে বলে ধরা হবে এবং উক্ত ট্যাংকির পানিকে প্রবাহিত পানি গণ্য করা হবে। হাউজ পাক করার ক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতিটি ফকীহগণের মাঝে বেশ প্রসিদ্ধ। অনেক ফুকাহায়ে কেরাম এভাবেই ফাতওয়া দিয়েছেন। যেমন, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. ফাতাওয়ায়ে যহীরীয়্যা-এর উদ্ধৃতিতে বলেন-

والصحيح أنه يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه.

“সঠিক কথা হলো, হাউজ পবিত্র হয়ে যাবে। যদিও তাতে পূর্ব থেকে বিদ্যমান পানির সমপরিমাণ পানি বের না করা হয়।”[১২৩]

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২ হি.) বলেন-

وفي شرح المنية يطهر الحوض بمجرد ما يدخل الماء من الأنبوب ويفيض من الحوض هو المختار لعدم تيقن بقاء النجاسة فيه وصيرورته جاريا. اهـ.

“শরহে মুনিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি পাইপের মাধ্যমে হাউজে একদিকে পানি প্রবেশ করে এবং পানির পরিমাণ ও জোর এমন হয় যে, হাউজের পানি উপচে পড়ছে, তাহলে হাউজ পাক হয়ে যাবে। এটাই গ্রহণযোগ্য মত। কারণ, এখানে আলোচ্য পানি প্রবহমান পানিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও নাপাকি বিদ্যমান থাকার কোনো নিশ্চয়তাও বাকি নেই।”[১২৪]

তবে এখানে (ক, খ) বাহ্যত একটি আপত্তি রয়েছে। তা হলো, এখানে মূল পানির নাপাক অংশ বের না হতেই তাকে পাক ধরে নেয়া হচ্ছে। বিষয়টি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বোধগম্য নয়। তাই

---

[১২২] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩৭৪, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১২৩] রদ্দুল মুহতার: ১/৩৮২, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১২৪] রদ্দুল মুহতার: ১/৩৭৪, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন যে, নাপাক অংশ পরিমাণ পানি বের হতে হবে। তাহলেই হাউজ পাক হবে। কেউ কেউ তো এমনও বলেছেন যে, কমপক্ষে তার সমপরিমাণ পানি তিনবার বের করতে হবে। যেমন, আল্লামা ইবরাহীম হালাবী রাহ. বলেন-

قال في شرح المنية: فإن دخل الماء من جانب حوض صغير قد تنجس ماءه فخرج من جانب قال أبو بكر بن سعد الأعمش: لايطهر مالم يخرج مثل ماكان فيه ثلث مرات، فيكون ذلك غسلا له كالقصعة، حيث تغسل إذا تنجست ثلاث مرات، وقال غيره: لايطهر مالم يخرج مثل ماكان فيه مرة واحدة، وقال أبو جعفر الهندواني: يطهر بمجرد الدخول من جانب والخروج من جانب وإن لم يخرج مثل ماكان فيه، وهو أي قول الهندواني اختيار صدر الشهيد حسام الدين، لأنه حينئذ يصير جاريا، والجاري لاينجس مالم يتغير بالنجاسة والكلام في غير متغير. انتهى.

"শরহে মুনিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আল্লামা আবু বকর ইবনে সা'দ আল আ'মাশ রাহ. বলেন, যদি ছোট নাপাক হাউজের এক পাশ দিয়ে পানি প্রবেশ করে এবং অপর পাশ দিয়ে বের হয়, তাহলে হাউজ সমপরিমাণ পানি তিন বার বের না হওয়া পর্যন্ত তা পবিত্র হবে না। তিনবার বের করার দ্বারা পানি যেমন পাক হবে, তেমনি হাউজও পাক হয়ে যাবে। আলাদাভাবে হাউজকে ধৌত করতে হবে না। আর এটাই তার জন্য ধৌত করার মতো হবে। যেমন, বড় কোনো পাত্র নাপাক হলে তিনবার ধৌত করতে হয়।

অন্যরা বলেন একবার তার সমপরিমাণ পানি বের হলেই পবিত্র হয়ে যাবে। আবু জাফর হিন্দুয়ানী রাহ. বলেন, এক পাশ দিয়ে পানি প্রবেশ করতে থাকলে এবং অপর পাশ দিয়ে বের হতে থাকলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। সমপরিমাণ পানি বের হওয়ারও শর্ত নেই। সদরুশ শহীদ হুসামুদ্দীন রাহ. আবু জাফর হিন্দুয়ানী রাহ.-এর এই মতটি গ্রহণ করেছেন। কেননা এভাবে এক দিক দিয়ে প্রবেশ করে অপর দিক দিয়ে বের হবার দ্বারাই তা প্রবহমান পানি বলে বিবেচিত হবে। আর প্রবহমান পানি নাপাকির দ্বারা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নাপাক হয় না।"[১২৫]

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

(ومنها) : تطهير الحوض الصغير إذا تنجس، واختلف المشايخ فيه، فقال أبو بكر الأعمش: لا يطهر حتى يدخل الماء فيه، ويخرج منه مثل ما كان فيه ثلاث مرات فيصير ذلك بمنزلة غسله ثلاثا.

وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني: إذا دخل فيه الماء الطاهر، وخرج بعضه، يحكم بطهارته بعد أن لا تستبين فيه النجاسة؛ لأنه صار ماء جاريا، ولم يستيقن ببقاء النجس فيه، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وقيل: إذا خرج منه مقدار الماء النجس يطهر، كالبئر إذا تنجست، أنه يحكم بطهارتها بنزح ما فيها من الماء وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس.

"...ছোট হাউজ নাপাক হলে তা পবিত্রকরণের ক্ষেত্রে মাশায়েখগণের মতবিরোধ রয়েছে। আবু বকর আ'মাশ রাহ. বলেন, হাউজে পানি এক দিকে প্রবেশ করবে এবং অপর দিকে বের হবে- এভাবে তিনবার উক্ত হাউজের সমপরিমাণ পানি বের হলে তবেই পানি এবং কূপ পাক হবে। আবু জাফর হিন্দুয়ানী রাহ. বলেন, যদি একদিকে পানি প্রবেশ করে এবং অপরদিকে বেরিয়ে

---

[১২৫] শরহুল মুনয়াহ: ৯৯, দারুল কিতাব, দেওবন্দ

যায় এবং দৃশ্যমান কোনো নাপাকি না থাকে, তাহলে পানি পাক হয়ে যাবে। কারণ, তা প্রবহমান পানিতে পরিণত হয়েছে। আর কোনো নাপাকি বাকি থাকার নিশ্চয়তা নেই। এ মতটিকেই ফকীহ আবুল লাইছ রাহ. গ্রহণ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, তা থেকে নাপাক পানি পরিমাণ পানি বের হলে তবেই পবিত্র হবে। যেমন, কূপ নাপাক হলে তার সমপরিমাণ পানি বের করলেই তা পবিত্র হয়ে যায়। হাউজ বা পানির পাত্র নাপাক হলেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।”[১২৬]

সর্বোপরি প্রথম মতটি প্রসিদ্ধ হলেও সতর্কতা হলো সমপরিমাণ পানি বের করার মধ্যেই। মুফতী শফী রাহ. (১৩৯৬ হি.) বলেন-

اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ ایک طرف سے پاک پانی داخل کر کے دوسری طرف سے اتنا پانی نکال دیا جائے جتنا کہ وقوع نجاست کے وقت اس حوض یا ٹنکی میں موجود ہے، اس کے بعد حوض یا ٹنکی اور اس کے پائپ کو پاک سمجھا جائے اور اگر تھوڑا سا پانی نکلنے کے بعد بھی استعمال کر لیا جائے، تو قول مختار کے موافق گنجائش ہے۔[১২৭]

প্রচলিত ট্যাংকি সম্পর্কে আরো একটি জটিলতা দেখা যায় যে, সাধারণত ফকীহগণ হাউজ পাক করার জন্য উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করতে বলেছেন। কিন্তু বর্তমান ট্যাংকিতে সাধারণত নিচ থেকে পানি প্রবেশ করানো হয় এবং নিচ থেকেই বের করা হয়। এমতাবস্থায় নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত করলে তা জারী বা প্রবহমান পানির হুকুমে হবে কি না- এ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মুফতী শফী রাহ. বলেন-

اور علت اس مسئلہ کی وہ ہے جو علامہ شامیؒ نے اسی عبارت درمختار سے کچھ پہلے لکھی ہے ، ''لأن الاستعمال من السطح لا من العمق'' یعنی استعمال کرنے والا پانی کو حوض کے سطح اعلی سے لے کر استعمال کرتا ہے، جب وہ دَہ دردَہ سے کم ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو پانی کوناپاک سمجھا جائے گا ، اگر چہ یہ حوض عمق کی جانب سے وسیع ہو، اور دَہ دردَہ سے بھی زائد ہو ، اور اسی پر اس مسئلہ کی تفریع ہے کہ بڑے حوض کی سطح پر برف جما ہوا ہو اس کو توڑ کر کچھ حصہ پانی کا کھول لیا جائے، اگر یہ برف پانی سے متصل ہو اور اس پانی میں نجاست گر جائے تو چونکہ پانی لینے کی جگہ آبِ قلیل ہے، اس لئے اُسکو ناپاک کہا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ جو کنویں سطح کے اعتبار سے دَہ در دَہ سے کم ہیں اُن کو وقوع نجاست سے نجس کہا جاتاہے ، حالانکہ گہرائی کا اعتبار کیا جائے تو بہت سے کنوؤں کا پانی اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اگر اس کو معمولی حوض کی طرح پھلا دیا جائے تو دَہ دردَہ سے زیادہ ہوجائے۔ جن حضرات نے پانی کے جریان کا حوض کی تلی کی جانب سے اعتبار نہیں کیا معلوم ہوتاہے کہ اس کی بنیاد اسی مسئلہ پر ہے کہ ماءِ کثیر میں اعتبار اوپر کے طول و عرض کا ہے عمق کا نہیں ، تو عمق کی طرف سے جاری ہونے کا بھی اعتبار نہ ہونا چاہئے ، لیکن جب کہ علامہ شامیؒ وغیرہ کے بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عمق کا اعتبار نہ کرنا اس وجہ سے ہے کہ پانی کا استعمال عمق کی طرف سے نہیں ہو تا تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ ان حضرات کے

---

[১২৬] বাদায়েউস সানায়ে: ১/২৪৭, মাকতাবায়ে যাকরিয়া
[১২৭] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৭/৪৭৩, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

زمانہ کے حوض حمام پر آج کل کی گھریلو حوضوں اور ٹنکیوں کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان میں پانی کا استعمال حوض یا ٹنکی کے کناروں سے یا اُوپر کی سطح سے مروّج ہی نہیں ، بلکہ عرفی طور پر اُن کا پانی تلی میں لگے ہوئے پائپ ہی کے ذریعہ استعمال ہو تا ہے ، اس لئے ان حوضوں اور ٹنکیوں میں اگر تلی کی جانب پانی بذریعۂ جاری کر دیا جائے تو وہ بحکمِ آبِ جاری ہو جائے گا۔

পরিশোধিত পানির বিধান

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে নানা ধরনের পরিশোধক ব্যবহার করে পানি পরিশোধন করে আসছে। প্রাচীন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আছে পানি ফুটানো, ছাঁকন ইত্যাদি। বর্তমানে পানি বিশুদ্ধকরণের লক্ষে ঘরোয়াভাবে আমরা নানা রকম ট্যাবলেট, পটাশ, ফিটকিরি, আয়োডিন দ্রবণ ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। শহরে যে ট্যাপের পানি পাওয়া যায় তা মূলত ব্লিচিং ও ক্লোরিন দিয়ে পরিশোধন করা হয়। এছাড়াও বাজারে পাওয়া যায় নানারকম পানি পরিশোধক যন্ত্র ।

আমরা এখানে সাধারণ পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবো না; বরং নোংরা ও অপবিত্র পানিকে পরিশোধন করার প্রক্রিয়া ও তার বিধান নিয়ে আলোচনা করবো।

আমরা জানি, বর্তমানে পৃথিবীর বহু অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যাপক চাহিদা ও সংকট রয়েছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'ওয়াটার এইড'-এর চালানো সমীক্ষা থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে প্রায় ৭৪.৮ কোটি মানুষ দূষিত পানি পান করতে বাধ্য হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ২০০৭ সালের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ১.১ বিলিয়ন লোক নিরাপদ পানির সরবারহ হতে বঞ্চিত হয়। প্রতি বছর ৪ বিলিয়ন লোক ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়, যার ৮৮% লোক অনিরাপদ জল এবং অপর্যাপ্ত ও অস্বাস্থ্যকর শৌচাগার ব্যবহারের জন্য ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয় এবং এই ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর প্রায় ১.৮ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আনুমানিক হিসেব করে দেখেছে যে, নিরাপদ পানি সরবরাহের মত পরিবেশগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এইসব ডায়রিয়া রোগীর প্রায় ৯৪% দূর করা যেতে পারে।[১২৮] এ প্রেক্ষাপটে আজকাল বিশ্বের বড় বড় রাজধানীগুলোতে অব্যবহারযোগ্য ময়লা পানি পরিশোধন করে জনগণকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

পানি পরিশোধন প্রক্রিয়া

পানি পরিশোধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উইকিপিডিয়া- মুক্ত বিশ্বকোষ-এ বলা হয়:

"পানি পরিশোধন বা জল পরিশোধন হল এমন একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জল বা পানি থেকে অবাঞ্ছিত রাসায়নিক পদার্থ, জৈব সংক্রামক পদার্থ ও ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ দূর করা হয়। এই প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন কাজের জন্য বিশুদ্ধ জল বা পানি উৎপাদন করা। অধিকাংশ পানিকে মানুষের ব্যবহারের (পান করার পানি) জন্য বিশুদ্ধ করতে হয়, কিন্তু পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি মেডিকেল, ফার্মাকোলজিক্যাল, রাসায়নিক এবং ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহারসহ আরো অনেক ধরনের উদ্দেশ্যের জন্য করা হয়ে থাকে।

জল বা পানি বিশুদ্ধকরণের কয়েক ধরনের প্রক্রিয়া রয়েছে। যেমন, শারীরিক প্রক্রিয়া, জৈব

---

[১২৮] উইকিপিডিয়া- মুক্ত বিশ্বকোষ, পানি পরিশোধন

প্রক্রিয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়া ইত্যাদি। শারীরিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পরিস্রাবণ, অধঃক্ষেপণ এবং পাতন। জৈব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ধীর বালি ফিল্টার বা জৈবিকভাবে সক্রিয় কার্বন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ফ্লকিউলেশন এবং ক্লোরিনেশন এবং অতিবেগুনী রশ্মির মত তড়িৎচুম্বকীয় রশ্মির ব্যবহার।"[১২৯]

উইকিপিডিয়া-তে আরো বলা হয়:

"জল বা পানি পরিশোধনের মূল উদ্দেশ্য হল পানিতে দ্রবীভূত অবাঞ্ছিত উপাদান দূরীকরণের মাধ্যমে পানিকে খাওয়ার উপযোগী বা শিল্প কারখানা এবং মেডিকেলের বিভিন্ন কাজের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা। পানি থেকে সংক্রামক পদার্থগুলো যেমন- মাইক্রো অরগানিজম, বিভিন্ন ধরনের জৈব ও অজৈব পদার্থ দূরীকরণের অনেক ধরনের প্রযুক্তি রয়েছে। কোন ধরনের প্রযুক্তি বব্যবহার করা হবে সেটা নির্ভর করে কোন ধরনের পানি ব্যবহার করা হবে, কোথায় ব্যবহার করা হবে এবং কি পরিমাণ খরচ হবে তার উপর।

জল বা পানির বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানিতে থাকা পরজীবী, ব্যাকটেরিয়া, শেওলা, ভাইরাস, ছত্রাকসহ বিভিন্ন ধরনের বস্তুকণার ঘনত্ব কমানো যেতে পারে, সাথে সাথে বৃষ্টির কারণে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বয়ে এসে জলে মিশে যাওয়া বস্তুকণার পরিমাণও অনেকাংশে কমানো যায়।"[১৩০]

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে,[১৩১] পরিশোধন প্রক্রিয়াতে নিম্নোক্ত স্তর ও পর্যায়সমূহ অতিক্রম করা হয়:

ক. মূল পরিশোধনের পূর্বে পানির কঠিন ও শক্ত বর্জ্য মেশিনারাইজড পদ্ধতিতে পৃথক বা চূর্ণ করা হয়। এর দ্বারা ৫-১০% বর্জ্য দূরীভূত হয়ে যায়।

খ. পরিশোধনের প্রাথমিক পর্যায়ে পানির সকল বৃহৎ ও কঠিন বর্জ্যকে, (যেমন, বিভিন্ন ধাতু, বালি, কাঁচের টুকরো ইত্যাদি) পানি থেকে আলাদা করা হয়।

গ. পরবর্তী পর্যায়ে অক্সিজেন ইত্যাদির মাধ্যমে পানির বায়ুজীবি ব্যাকটেরিয়াকে জীবিত করা হয়। কারণ, এ ব্যাকটেরিয়াই পানির জৈব পদার্থসমূহকে অজৈব পদার্থে পরিণত করে। এরপর ব্যাকটেরিয়াসহ পানির (অবাঞ্ছিত) অজৈব পদার্থসমূহকে পানি থেকে সরানো হয়।

ঘ. পূর্ববর্তী পর্যায়ে থাকা পানি বড় হ্রদে সংরক্ষণ করা হয়। এখানে বাকি সূক্ষ্ম দূষিত পদার্থসমূহকে দূর করা হয়। যেমন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান। এছাড়াও আরো বিশুদ্ধকরণের লক্ষ্যে এই পানি সূর্যের তাপেই রাখা হয়।

ঙ. এরপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্লোরিন দ্বারা পানি পরিশোধন করা হয়। পানি ব্যবহারের ধরন ও উদ্দেশ্য হিসেবে বিভিন্ন মাত্রায় এই পরিশোধন হয়ে থাকে।

পান করার জন্য যে পানি পরিশোধন করা হয়, তাকে আরো গভীরভাবে আরো উন্নত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে পরিশোধন করা হয়।[১৩২]

---

[১২৯] উইকিপিডিয়া- মুক্ত বিশ্বকোষ, পানি পরিশোধন

[১৩০] উইকিপিডিয়া- মুক্ত বিশ্বকোষ, পানি পরিশোধন

[১৩১] আল মাজমউল ফিকহী, মক্কাতুল মুকাররমা-এর একদশতম অধিবেশনের ৪র্থ সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য।

[১৩২] বিস্তারিত দেখুন: Omniprocessor প্রক্রিয়ার প্রধান Janicki Bionergy-এর ওয়েবসাইট এবং Wikipedia: Water purification.

প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে পানি পরিশোধন করা হচ্ছে। অনেক ব্যয়বহুল ও কঠিন প্রক্রিয়ায় অসংখ্য ভারী প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিশোধনের একেকটি পর্ব অতিক্রম করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ার দ্বারা নোংরা পানি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং এতে সূক্ষ্মতম কোনো অবাঞ্ছিত পদার্থেরও অস্তিত্ব থাকে না। তবে পানির পুনর্ব্যবহারের ধরন হিসেবে তার পরিশোধনের মাত্রাও বেশকম হয়ে থাকে।

পরিশোধনের পূর্বে পানিতে বিভিন্ন ধরনের অপবিত্র বা অবাঞ্ছিত পদার্থ থাকতে পারে। যেমন,

১. শরীরবিশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের নাপাকি।

২. অশরীরী নাপাকি এবং শরীরবিশিষ্ট নাপাকির বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন ও লক্ষণ।

৩. বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম অণুজীব, যেমন, ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া।

৪. নাপাক পানির ঘৃণ্যতা ও অস্বাদুতা।

পরিশোধনের পর বিশেষজ্ঞদের মতে, এসকল উপাদান দূর হয়ে যায়।

পরিশোধিত পানির বিধান বোঝার জন্য প্রথমে আমাদের কিছু মৌলিক বিষয় বুঝতে হবে।

পানির মূল প্রকৃতি হলো, পবিত্রতা। স্বল্প পানিতে যদি নাপাক পড়ে বা বেশি পানির গুণসমূহ (অর্থাৎ, রং, গন্ধ ও স্বাদ) যদি কোনো নাপাক পদার্থের কারণে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে পানি নাপাক হবে। এখন প্রশ্ন হলো, এই পানিকে পুনরায় পাক করা যাবে কিনা? আমাদের মাযহাবের সকল ইমামগণ একমত যে, এমন পানিকে পুনরায় পাক করা যায়। তবে পাক করার পদ্ধতি নিয়ে তাদের মাঝে কিছুটা দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়।

কারো কারো মত হলো, এমন পানিকে পাক করতে হলে চলমান বা প্রবহমান পানি (الماء الجاري) -এর সাথে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি নেই। যেমন, আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

وإذا وصل إلى الحياض في البيوت متغيرا ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجس وإن زال تغيره بنفسه، لأن الماء النجس لا يطهر بتغيره بنفسه إلا إذا جرى بعد ذلك بماء صاف فإنه حينئذ يطهر.[১৩৩]

উক্ত মতের কারণ হয়তো এটা যে, পানিতে নাপাক পড়লে নাপাকি পানির সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। পানির প্রতিটি অণুতে এই নাপাকি বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যতই পরিশোধন করা হোক, অবশিষ্ট যে পানি থাকবে, তাতেও নাপাকি বিদ্যমান আছে বলে ধরে নেয়া হবে।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় মত হলো, এমন পানি পাক করার আরো পদ্ধতি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফিকহী নযির ও বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করলে এই মতটি অধিক শক্তিশালী বলে মনে হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.

"পানি মূলত পবিত্র। তার রং, স্বাদ, ঘ্রাণ পরিবর্তন না করা পর্যন্ত তাকে কোনো কিছু নাপাক করে না।"[১৩৪]

---

[১৩৩] রদ্দুল মুহতার: ১/৩৭৩, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৩৪] সুনানু ইবনে মাজা: ৫২১, শরহু মা'আনিল আসার, আল মুজামুল কাবীর লিল তাবরানী: ৭৫০৩। হাদীসটির প্রথমাংশের তাখরীজ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশ তথা إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه তাবেয়ী রাশেদ

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. বলেন-

أي الماء طهور لا يبقى نجساً أبداً بحيث لا يكون لطهارته سبيل، فإن هذا التعبير أقرب إلى لفظ الحديث.

"অর্থাৎ, পানি প্রকৃতিগতভাবে পবিত্র। তা কখনো কোনো কারণে নাপাক হলেও এমনভাবে নাপাক হয় না যে, তা আর পাক করা সম্ভব নয়।..."[১৩৫]

এছাড়া ফিকহের একাধিক নযির থেকে সহজেই বুঝে আসে যে, ফুকাহায়ে কেরাম অন্যান্য তরল পদার্থ পবিত্রকরণের ক্ষেত্রে শুধু এক পদ্ধতির মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেননি। যেমন, নাপাক তেল ও নাপাক মধুর ক্ষেত্রে তারা বলেছেন যে, তার সাথে পানি মিশিয়ে তা ডেকচিতে রেখে এ পরিমাণ আগুনে গরম করা হবে যে, সকল পানি জ্বলে যায় এবং শুধু তেল বা মধুর মূল পরিমাণ বাকি থাকে। এভাবে তিনবার করলেই মধু ও তেল পাক হয়ে যাবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن يغلى ثلاثا.

"দুধ, মধু, গুড় এবং তেল তিনবার টগবগ করে ফোটানোর দ্বারা পবিত্র হয়ে যাবে।"[১৩৬]

আল্লামা শামী রাহ. ব্যাখ্যায় বলেন-

لو تنجس العسل فتطهيره أن يصب فيه ماء بقدره فيغلى حتى يعود إلى مكانه، والدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء هكذا ثلاث مرات اه وهذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وهو أوسع وعليه الفتوى.

"যদি মধু নাপাক হয়ে যায়, তাহলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি হলো, তাতে মধুর সমপরিমাণ পানি ঢেলে মধুর পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তা জাল দেয়া। আর যদি তেল নাপাক হয় তাহলে তেলের মধ্যে পানি ঢেলে টগবগ করে ফোটাতে হবে এবং যখন তেল পানির উপর ভাসবে তখন কোনো কিছু দিয়ে তা উঠিয়ে নিতে হবে। এভাবে তিনবার ফোটাতে হবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মত অন্যটি। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মতটিই ব্যাপকতর এবং এটার উপরই ফাতওয়া।"[১৩৭]

কিছু কিছু তেল একদম পানির মতই তরল হয়ে থাকে। তার পরও তা পাক করার জন্য ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এ পদ্ধতি থেকে সহজেই বুঝে আসে যে, নাপাকিকে কোনোমতে দূর করতে পারলেই তা পাক হয়ে যাবে। ফুকাহায়ে কেরাম সমসাময়িক অবস্থার উপর ভিত্তি

বিন সা'আদের সূত্রে রিশদীন, বাকিয়্যা, হাফস ও ইবনে উমর (তিনজন দুর্বল) যাতে সুনান বর্ণনা করেছেন। এদের বিপরীদ আর একজন দুর্বল পর্যায়ের রবী আহওয়াস বিন হাকীম মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হাতেম রাহ. মুরসালকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (দ্র. ইলালে দারা কুতনী, ইলালে ইবনে আবী হাতেম: ৯৭, আকামেল: ৩/২৬৮)। সর্বোপরি হাদীসটির সনদে দুর্বলতা থাকলেও তা তালাক্কীর বিবেচনায় নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য। ইমাম ইবনুল মুনযির রাহ. বলেন:

أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. (الإجماع: ص ٣٣)

ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেন: وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافا. سنن بيهقي: ٢٦٠/١

[১৩৫] আল আরফুশ শাযী: ১/৯৭

[১৩৬] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩৭৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৩৭] রদ্দুল মুহতার: ১/৫৯৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

করে প্রথোমোক্ত পদ্ধতির (অর্থাৎ, প্রবাহিত পানির সাথে মিলিয়ে দেয়ার) কথা বলেছেন। মূলত এ পদ্ধতির মাঝেই নাপাক পানি পবিত্রকরণের বিষয়টি সীমাবদ্ধ নয়। উদ্দেশ্য হলো, নাপাকি বিদূরিত করা।

এখানে আমাদের আরো মনে রাখতে হবে যে, ফুকাহায়ে কেরাম নাপাকি দূর করার ক্ষেত্রে দু'টি নীতির প্রতি লক্ষ রাখেন-

১. প্রবল ধারণা অনুযায়ী দূর হলেই চলবে। ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

إلا أن يبقى من أثرها ما تشق إزالته، لأن الحرج مدفوع، وهذا يشير إلى أنه لا يشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة، وفيه كلام.

وما ليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، لأن التكرار لا بدّ منه للاستخراج، ولا يقطع بزواله، فاعتبر غالب الظن كما في أمر القبلة وإنما قدروا بالثلاث لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيرا ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية لأنه هو المستخرج.

"...আর যে নাপাকি দৃশ্যমান নয় তা ধৌত করার ক্ষেত্রে ধৌতকারীর পবিত্র হওয়ার প্রবল ধারণা হওয়া পর্যন্ত ধৌত করলেই পবিত্র হয়ে যাবে। কারণ, নাপাকি দূর করার জন্য একাধিকবার ধৌত করা ছাড়া উপায় নেই। আর নাপাকি দূর হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য নিশ্চয়তা অর্জন দুরূহ ব্যাপার। তাই প্রবল ধারণাই এক্ষেত্রে ধর্তব্য হবে। যেমনটি কিবলা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। ফুকাহায়ে কেরাম নির্দিষ্টভাবে তিনবার ধৌত করার কথা এজন্য বলেছেন যে, প্রবল ধারণা সাধারণত এর দ্বারাই অর্জিত হয়।..."[১৩৮]

২. নাপাকি সমূলে দূর হওয়া সবক্ষেত্রে আবশ্যক নয়।

আল্লামা সারাখসী রাহ. বলেন-

ثم المرئية لا بد من إزالة العين بالغسل، وبقاء الأثر بعد زوال العين لا يضر.

"দৃশ্যমান নাপাকির মূল ধৌত করার মাধ্যমে দূর করা আবশ্যক। মূল নাপাকি দূর হওয়ার পর তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই।"[১৩৯]

তিনি আরো বলেন-

ولو زالت العين وبقي الأثر، فإن كان مما يزول أثره لا يحكم بطهارته، ما لم يزل الأثر؛ لأن الأثر لون عينه، لا لون الثوب، فبقاؤه يدل على بقاء عينه وإن كانت النجاسة مما لا يزول أثره، لا يضر بقاء أثره عندنا.

"যদি মূল নাপাকি দূর হয়ে যায় এবং চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে আর তা দূর করা সম্ভব হয়, তাহলে চিহ্ন দূর না হওয়া পর্যন্ত তা পবিত্র হবে না। কেননা চিহ্নটি নাপাকির ছাপ; কাপড়ের রং নয়। সুতরাং তা অবশিষ্ট থাকাটা মূল নাপাকি বাকি থাকার প্রমাণ। আর যদি নাপাকির চিহ্ন দূর করা সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের নিকট নাপাকির চিহ্ন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কোনো বস্তু পবিত্র

[১৩৮] আল হিদায়া: ১/৭৮, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া
[১৩৯] আল মাবসূত: ১/৯৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

হতে কোনো সমস্যা নেই।”[১৪০]

এর পাশাপাশি আমাদের আরো স্মরণ রাখতে হবে যে, পাক-নাপাকের ক্ষেত্রে ‘উমূমে বালওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ফুকাহায়ে কেরাম মানুষের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে কিছুটা অবকাশ আছে বলে মত দিয়েছেন। যেমন, আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه لعموم البلوى بخلاف الغسلات الثلاث إذا استنقعت في موضع فأصابت شيئا نجسته.

“মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় গোসলদানকারীর শরীরে পানির ছিঁটা পড়ে। এ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। তাই গোসলের কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় উমূমে বালওয়ার (ব্যাপক সমস্যা)-র কারণে গোসলদানকারীর শরীর নাপাক হবে না। এর ব্যতিক্রম মৃত ব্যক্তির গোসলে ব্যবহৃত পানি। এ পানি কোনো স্থানে জমা হওয়ার পর শরীরে লাগলে শরীর নাপাক হয়ে যাবে।”[১৪১]

আল্লামা ফখরুদ্দীন যাইলাঈ রাহ. বলেন-

ووجه التخفيف عموم البلوى والضرورة وهي توجب التخفيف فيما لا نص فيه.

“যেক্ষেত্রে কোনো শর‘য়ী নস (স্পষ্ট প্রমাণ) নেই, তাতে উমূমে বালওয়া (ব্যাপক সমস্যা) এবং প্রয়োজনের কারণে সহজতা অবলম্বন আবশ্যক।”[১৪২]

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. বলেন-[১৪৩]

---

[১৪০] আল মাবসূত: ১/৮৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১৪১] আল বাহরুর রায়িক: ১/৪০৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৪২] তাবয়ীনুল হাকায়িক: ১/২০৫, এইচ, এম, সাঈদ, পাকিস্তান

[১৪৩] আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ.-এর বিস্তারিত ভাষ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

تنبيه مهم في طرح الزبل في القساطل قد اعتيد في بلادنا إلقاء زبل الدواب في مجاري الماء إلى البيوت لسد خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل، فيرسب فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة، وفي ذلك حرج عظيم إذا قلنا بالنجاسة، والحرج مدفوع بالنص.

وقد تعرض لهذه المسألة العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد واستأنس لها ببعض فروع، وبالقاعدة المشهورة من أن المشقة تجلب التيسير، وبما فرعوا عليها كما ذكره في الاشباه.

وقد أطال الكلام سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه على هذه المسألة بما حاصله أنه إذا رسب الزبل في القساطل ولم يظهر أثر فالماء طاهر، وإذا وصل إلى الحياض في البيوت متغيرا ونزل في حوض صغير أو كبير فهو نجس وإن زال تغيره بنفسه، لان الماء النجس لا يطهر بتغيره بنفسه إلا إذا جرى بعد ذلك بماء صاف فإنه حينئذ يطهر، فإذا انقطع الجريان بعد ذلك، فإن كان الحوض صغيرا والزبل راسب في أسفله تنجس، ما لم يصر الزبل حمأة وهي الطين الاسود فإنه إذا جرى بعد ذلك بماء صاف ثم انقطع لا يتنجس، وهذا كله بناء على نجاسة الزبل عندنا. (رد المحتار ٣٧٣/١ مكتبة الأزهر)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. এ বিষয়ে আল বাহর-এর টীকায় বলেন (বি. দ্র. এ টীকা তিনি রদ্দুল মুহতার-এর পরে রচনা করেছেন।)

(تنبيه) : هاهنا مسألة مهمة لا بأس بالتعرض لها، وإن كان في ذكرها طولا لاغتفاره بشدة الاحتياج إليها فنقول قال العلامة عبد الرحمن أفندي العمادي مفتي دمشق في كتابه هدية ابن العماد: مسألة: قال صاحب مجمع الفتاوى في الخزانة ماء الثلج إذا جرى على طريق فيه سرقين ونجاسة إن تغيبت النجاسة واختلطت حتى لا يرى أثرها يتوضأ منه ولو كان جميع بطن النهر نجسا،

قد اعتيد في بلادنا إلقاء زبل الدواب في مجاري الماء إلى البيوت لسد خلل تلك المجاري المسماة بالقساطل فيرسب فيها الزبل ويجري الماء فوقها فهو مثل مسألة الجيفة، وفي ذلك حرج عظيم إذا قلنا بالنجاسة، والحرج مدفوع بالنص.

"আমাদের দেশে এমন রীতি রয়েছে যে, পানির নালা, যার মাধ্যমে নদী ইত্যাদি থেকে মানুষের গৃহ অভিমুখে পানি আসে, তার নিচের মাটির গর্ত বন্ধ করার জন্য তাতে পশুমল নিক্ষেপ করা হয়। গর্তে মল জমে থাকে আর তার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়। ... এখন যদি মলের উপর দিয়ে প্রবাহিত পানিকে নাপাক বলা হয়, তাহলে অনেক জটিলতা দেখা দিবে। সংকটময় বিষয়াবলিতে সহজীকরণ শর'য়ী দলীল দ্বারা প্রমাণিত।"[১৪৪]

তিনি আরো বলেন-

فإن كان الماء كثيرا لا يرى ما تحته فهو طاهر، وإن كان يرى فهو نجس وفي الملتقط قال بعض المشايخ الماء طاهر، وإن قل إذا كان جاريا قلت وهذه المسائل يستأنس بها لما عمت به البلوى في بلادنا من اعتيادهم إجراء الماء بسرقين الدواب فلتحفظ، فإنها أقرب ما ظفرنا به

في ذلك بعد التنقيب والتنقير في الكتب المعتبرات وأن ذلك من أهم المهمات ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ما ذكر ابن نجيم وغيره في فروع القاعدة المشهورة أعني قولهم المشقة تجلب التيسير من العفو عن نجاسة المعذور وعدم الحكم بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس إلا بالانفصال وما ذكروه في الحكم بالطهارة في الاستنجاء مع أن الماء كلما لاقى النجاسة ينجس وبأن الماء لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب وكلما يعسر صونه عنه اهـ.

وقد أطال هنا سيدي العارف في شرحه ولكن أذكر منه المحتاج إليه في شرح هذا المحل فنقول السرقين هو الزبل ومعنى كون النجاسة تغيبت عدم ظهور أثرها، وهذا مبني على عدم اشتراط المدد في الماء الجاري والظاهر أن المراد بقوله لا يرى ما تحته لا ترى النجاسة التي هي في بطن النهر حتى لو كانت ترى والماء يمر عليها فهي بمنزلة الجيفة ومقتضاه نجاسة ذلك الماء وإن كان جاريا وما نقله عن الملتقط معناه إذا لم يظهر في الماء أثر النجاسة، ويكون هذا كالقول الآخر في مسألة الجيفة الناظر إلى ظهور الأثر وعدمه وحاصل الكلام على ما عمت به البلوى أنه يعتبر تغير أحد الأوصاف بنجاسة السرقين وعدم ذلك فإذا وضع السرقين في مقسم الماء إلى البيوت ونحوها المسمى بالطالع وجرى مع الماء في القساطل فالماء نجس فإذا ركد الزبل في وسط القساطل وجرى الماء صافيا كان نظير مسألة ما لو جرى ماء الثلج على النجاسة أو كان بطن النهر نجسا وجرى الماء عليه ولم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة، فإن ذلك الماء طاهر كله وكذلك هذا فإذا وصل الماء إلى الحياض في البيوت، فإن وصل متغير أحد الأوصاف بالزبل أو عين الزبل ظاهرة فيه فهو نجس من غير شك فإذا استقر في حوض دون القدر الكثير فهو نجس، وإن صفا بعد ذلك في الحوض وزال تغيره بنفسه؛ لأنه ماء نجس والماء النجس لا يطهر بزوال تغيره بنفسه لا سيما وقد ركد الزبل في أسفله، وإن استقر في حوض كبير فهو نجس أيضا ما دام متغيرا أو زال تغيره بنفسه أيضا

وأما إذا استمر الماء جاريا بعد ذلك إلى أن أتى الماء صافيا وزال تغير الحوض بذلك الماء الصافي، فإنه يطهر الماء كله سواء كان الحوض صغيرا أو كبيرا، وإن كان الزبل في أسفله راكدا ما دام الماء الصافي في ذلك الحوض يدخل من مكان ويخرج من مكان فإذا انقطع الجريان بعد ذلك، وكان الحوض صغيرا والزبل في أسفله راكدا فالحوض نجس إلى أن يصير الزبل الذي في أسفله حمأة، وهي الطين الأسود فلا يكون نجسا حينئذ، وإذا كان الحوض كبيرا فالأمر فيه يسير هذا ما نعامل به أنفسنا في هذه المسألة حيث ابتلينا بها ولم نجد فيها نقلا صريحا اهـ. كلامه قدس سره قلت ومعنى قوله فالحوض. (البحر الرائق ١/١٥٤–١٥٥ مكتبة زكريا)

[১৪৪] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩৭৩, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

وقد قال في شرح المنية: المعلوم من قواعد أئمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة كما في مسألة آبار الفلوات ونحوها اه أي كالعفو من نجاسة المعذور عن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلك.

"শরহুল মুনয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে আমাদের ইমামদের মূলনীতি থেকে বুঝে আসে যে, ব্যাপক প্রয়োজন এবং সংকটের ক্ষেত্রে সহজতা অবলম্বন করা হয়। যেমনটি মরুভূমি কূপের পানির ক্ষেত্রে আমরা জানি। এছাড়াও নাপাকি মিশ্রিত রাস্তার কাদামাটির ছিঁটা অপারগ ব্যক্তির জন্য মাফ করা হয়।"[১৪৫]

এ সকল দিক বিবেচনা করেই অনেক মুফতিয়ানে কেরাম বর্তমানে পানি শোধন করার প্রক্রিয়া সঠিক হলে তার দ্বারা পরিশোধিত পানি পাক হবে বলে মত দিয়েছেন।

আল মাজমাউল ফিকহী, মক্কাতুল মুকাররমা-এর এ সংক্রান্ত এক সিদ্ধান্তে[১৪৬] বলা হয়:

إضافة إلى أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد قرر بعد مراجعته المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربع: وهي الترسيب، والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه بالكلور، بحيث لا يبقى للنجاسة أثر في طعمه، ولونه، وريحه، وهم مسلمون عدول، موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر ما يلي:

"أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحه: صار طهورًا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر: أن الماء الكثير، الذي وقعت فيه نجاسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه... وإن المجاري معدة، في الأصل، لصرف ما يضر الناس، في الدين والبدن، طلبًا للطهارة ودفعًا لتلوث البيئة......"

ইসলামী ফিকহ একাডেমী, ইন্ডিয়া-এর ত্রয়োদশতম সেমিনারের প্রবন্ধগুলোতে এ বিষয়ে আলোচনা উঠে এসেছে। অনেকেই উপরোক্ত কারণ ও প্রেক্ষাপটে পরিশোধিত পানি পাক হয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।[১৪৭]

এছাড়াও হাইআতু কিবারিল উলামা (সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদি আরব) থেকেও এমনি ফাতওয়া দেয়া হয়েছে (দেখুন সিদ্ধান্ত নং: ৬৪, তারিখ: ২৫/১০/১৩৯৮ হি.)

ইসলামী ফিকহ একাডেমী, জিদ্দাহ-এর একাদশতম সেমিনারের এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তেও উপযুক্ত পদ্ধতিতে পরিশোধন করা হলে, পানি পবিত্র হওয়ার কথা বলা হয়েছে।[১৪৮]

উল্লিখিত শর'য়ী মূলনীতি, ফিকহী নাযাইর এবং বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, পানি যদি এ পর্যায়ের পরিশোধিত হয় যে, তাতে নাপাকির আর কোনো অস্তিত্বই বিদ্যমান

---

[১৪৫] রদ্দুল মুহতার: ১/৩৭৪, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৪৬] এতে স্বাক্ষর করেছেন শাইখ মুস্তফা আয যারকা, ড. আহমদ ফাহমী আবু সিনাহ, শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায, শাইখ মুহাম্মদ শাযিলী আন নায়ফার, শাইখ রশীদ রাগেব, ড. ইউসুফ কারযাভী, ড. বকর আবু যায়দ - সহ আরো কয়েকজন মাশায়েখে হাফিযাহুমুল্লাহু ওয়া রহিমাহুম।

[১৪৭] উদাহরণস্বরূপ দেখুন: জাদীদ ফিকহী মাবাহিছ-এর ১৮ নং খন্ডের পৃ. ১৫১, ১৫৫ (মাওলানা আখতার ইমাম আদেল-র প্রবন্ধ), ২০২ (মাওলানা ইরশাদ আহমদ আ'জমী-র প্রবন্ধ), ২২৭ (মাওলানা খালেদ হোসাইন কাসেমী-র প্রবন্ধ)।

[১৪৮] ক্বারারাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

থাকে না; বরং তা পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর হয়ে যায়, এমতাবস্থায় তা শর'য়ী দৃষ্টিতে 'পাক পানি' হিসেবে গণ্য হবে।

পূর্বে আমরা জেনেছি যে, পানি পরিশোধন প্রক্রিয়ার মধ্যে সাধারণত 'বেশি পানি' বা 'প্রবহমান পানি'র সাথে মিশ্রিত করার প্রক্রিয়াটি থাকে। আর তা না থাকলেও এত উচ্চ ও গভীর মাত্রায় পরিশোধন করা হয় যে, বিশেষজ্ঞদের মতে এতে নাপাকি বা অবাঞ্ছিত পদার্থের কোনো লেশ বা অস্তিত্বই থাকে না। পান করার জন্য যে পানি বিশুদ্ধ করা হয়, তাতে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞদের মতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরও কিছু থাকে না। প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের ফলে এভাবে পরিশোধন করা সম্ভবও। আর এ বিষয়টি এত ব্যাপক এবং অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছে যে, সাধারণ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, জানা-অজানায় বর্জ্য বা নোংরা পানি থেকে পরিশোধিত পানি ব্যবহার করতে হচ্ছে। এজন্য উপরোক্ত মূলনীতি, কারণ ও শর'য়ী ভাষ্যসমূহের আলোকে পরিশোধিত পানিকে পাক ধরা হবে।

তবে বলা বাহুল্য, সকল ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত শর্তগুলো পুরা নাও হতে পারে। যদি কোনো ক্ষেত্রে পানির নাপাকি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত না হয়, তাহলে পানি নাপাকই থাকবে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য উচিত হলো, পরিশোধনের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব প্রথম পদ্ধতি (অধিক পানির সাথে মিশ্রিত করা) ব্যবহার করা, যেহেতু তারও ব্যবস্থা আছে। আর নদী ও খালের পানি তথা যথাসম্ভব পাক পানি পরিশোধন করা। তথাপি নাপাকি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হলে পরিশোধিত পানিও পবিত্র ধর্তব্য হবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মেহেদি ও তার শর'য়ী বিধান

সীমাবদ্ধ, তাই বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিমভাবে তৈরী মেহেদির চাহিদা সবচে' বেশী।

প্রচলিত মেহেদির বিধান জানার জন্য প্রথমেই আমাদের কিছু মৌলিক বিষয় বুঝে নিতে হবে। আমাদের জানা আছে যে, ইসলামী শরী'আতে অযু ও গোসল তাহারাত অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। কুরআন ও হাদীসে অযু-গোসলের নিয়ম-কানুন উল্লেখ করা হয়েছে। অযু ও গোসলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান হলো, অযু-গোসলের নির্ধারিত স্থানে পানি পৌঁছাতে হবে। কোথাও যদি পানি না পৌঁছে, তাহলে তার অযু-গোসল সঠিক হবে না এবং তা দ্বারা নামাযও আদায় হবে না। রাসূল ﷺ এ বিষয়ে বারবার সতর্ক করেছেন।

হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত-

عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.

"পবিত্রতা ব্যতীত কোনো নামায কবুল করা হয় না এবং আত্মসাৎকৃত সম্পদ থেকে সাদকা কবুল করা হয় না।"[১৪৯]

হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك.[১৫০]

[১৪৯] (সহীহ) সুনানুত তিরমিযী: ১/৩, হাদীস নং ১ মাকতাবাতুল ফাতাহ, সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ৫৯

[১৫০] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২৯৩৭, সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ১৭৩, মুসনাদে আবী ইয়া'লা: হাদীস নং ২৯৩৭, সুনানু ইবনে মাজা: হাদীস নং ৬৬৫

হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত-

أنه رأى رجلا توضأ للصلاة، فترك موضع ظفر على ظهر قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع فتوضأ ثم صلى.[১৫১]

হযরত খালিদ রাযি. এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেন-

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.

"রাসূল ﷺ দেখলেন এক ব্যক্তি নামায আদায় করছে আর তার পায়ে দিরহাম পরিমাণ অংশ শুষ্কতার কারণে চমকাচ্ছে। অর্থাৎ, সেখানে পানি পৌঁছেনি। তখন রাসূল ﷺ তাকে অযু এবং নামায পুনরায় আদায় করতে বললেন।"[১৫২]

হযরত আয়েশা রাযি. রাসূল ﷺ-এর পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر. حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه.[১৫৩]

উক্ত হাদীসসমূহ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, অযুর অঙ্গসমূহ পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা আবশ্যক। কোনো অংশে পানি না পৌঁছলে অযু হবে না। সুতরাং অযুর পূর্বে শরীরের উপর কোনো প্রলেপ থাকলে তা তুলে ফেলতে হবে। ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

আল্লামা ফখরুদ্দীন যাইলাঈ রাহ. বলেন-

والخضاب إذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل.

"খিযাব জমে শুকিয়ে গেলে তা অযু এবং গোসলের পূর্ণতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়।"[১৫৪]

আল্লামা আহমদ ইবনে ইসমাঈল রাহ. (১২৩১ হি.) বলেন-

"زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد" لحرمة الحائل "كشمع وشحم".

"শরীরে পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক বস্তু বা বিষয় দূর করা আবশ্যক। যেমন, মোম, চর্বি ইত্যাদি। কারণ, তা পবিত্রতা অর্জনে বাঁধা দান করে।"[১৫৫]

এমনকি যদি ব্যান্ডেজ থাকে এবং তা খুললে কোনো সমস্যা না হয়, তাহলে তা খুলেই অযু করতে হবে। এমনিভাবে আংটি যদি এতো সংকীর্ণ হয় যে, তার নিচে স্বাভাবিকভাবে পানি

---

[১৫১] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ২৪৩, বাযযার: হাসীস নং ২৩১, ২৩২

[১৫২] (হাদীস সহীহ) সুনানু আবী দাউদ: ১/২৩, হাদীস নং ১৭৫ মাকতাবাতুল ফাতাহ, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৫৪৯৫, সুনানুল বাইহাকী, একজন রাবী বাকিয়্যা।

[১৫৩] সহীহ মুসলিম: ১/১৪৭ হাদীস নং ৩১৬ (باب صفة غسل الجنازة)

[১৫৪] তাবয়ীনুল হাকায়েক: ১/৬১ এইচ, এম, সাঈদ পাকিস্তান

[১৫৫] হাশিয়াতুত তাহতাবী 'আলা মারাকিল ফালাহ: ১/৬২

পৌঁছাবে না, তাহলে তা নাড়া দিতে হবে বা প্রয়োজনে তা খুলে অযু করতে হবে।[১৫৬]
আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

(ولو) كان (خاتمه ضيقا نزعه أو حركه) وجوبا (كقرط، ولو لم يكن بثقب أذنه قرط فدخل الماء فيه) أي الثقب (عند مروره) على أذنه (أجزاه كسرة وأذن دخلهما الماء وإلا) يدخل (أدخله) ولو بإصبعه.

"যদি আংটি সংকীর্ণ হয়, তাহলে তা খোলা বা নাড়া দেয়া আবশ্যক। যেমন, কানের দুল। যদি কানের ছিদ্রে দুল না থাকে এবং পানি ছিদ্রে পানি প্রবেশ করে, তাহলে যথেষ্ট হবে। আর যদি পানি প্রবেশ না করে, তাহলে তাতে আঙ্গুল ঢুকিয়ে হলেও পানি প্রবেশ করাবে।"[১৫৭]
উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে নিম্নে আমরা প্রচলিত মেহেদির বিধান সম্পর্কে জানবো।
বর্তমানে দু'ধরনের মেহেদি ব্যবহার করা হয়- ১. প্রাকৃতিক মেহেদি ও ২. কৃত্রিম মেহেদি।
বাজারে মূলত তিন প্রকার প্রাকৃতিক মেহেদি পাওয়া যায়। যথা: ১. কালো মেহেদি (Black henna)[১৫৮], ২. লাল মেহেদি (Red henna)[১৫৯], ৩. নিউট্রল মেহেদি (Neutral henna)।[১৬০]
আমরা জানি, প্রাকৃতিক মেহেদির রং শরীরের চামড়ার গভীরে পৌঁছে তা চামড়ার অংশে পরিণত হয়। মেহেদির প্রলেপ তুলে ফেলার পর চামড়ায় কোনো ধরণের আবরণ বাকি থাকে না। তাই এ মেহেদি রং অবশিষ্ট থাকলেও তা চামড়ায় পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না। তাই ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, এ সকল মেহেদির রং থাকা অবস্থায় অযু গোসলসহ যেকোনো ধরনের পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. (১০৮৮ হি.) বলেন-

(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسير وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقا) أي قرويا أو مدنيا في الأصح بخلاف نحو عجين[١٦١]

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২ হি.) বলেন-

(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها

---

[১৫৬] ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) বলেন: ১/১০ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

عن محمد -رحمه الله- أن نزع الخاتم في الوضوء ليس بشيء والحاصل أنه إن كان واسعا يدخله الماء، فلا حاجة إلى النزع والتحريك، وإن كان ضيقا لا يدخل الماء تحته، فلا بد من تحريكه، وفي التيمم لا بد من نزعه ولو لم يفعل لا تجزئه صلاته.

[১৫৭] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩১৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৫৮] ঐতিহাসিকভাবে কালো মেহেদি বলতে মেহেদির সাথে ইন্ডিগোর মিশ্রণকেই বুঝায়। চুল ও ত্বকের জন্য এই কালো মেহেদিই একসময় সবাই ব্যবহার করতো। কিন্তু ইন্ডিগোর দুস্প্রাপ্যতার কারণে মেহেদির সাথে পিপিডি বা প্যারা-ফেনিলেনডিয়ামাইন (para-pheny-lendia-mine) নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ সংমিশ্রণ করা হয়ে থাকে। সারা পৃথিবীতে কালো মেহেদি বলতে বর্তমানে এটাকেই বুঝানো হয়।

[১৫৯] লাল মেহেদি হচ্ছে সবুজ রঙের পাউডার যা থেকে খড়ের মতো গন্ধ আসে। যা মূলত লসোনিয়া ইনারমিস (lawsonia inrmis)। তবে বিশ্বব্যাপী এই মেহেদি 'হেনা মেহেদি' নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক মেহেদির ভিতরে এই লসোন নামক পদর্থটি মূলতো গাঢ় লাল বর্ণ তৈরী করে।

[১৬০] এক প্রকারের সবুজ পাউডার যা প্রকৃতিক মেহেদির সাথে মিশ্রণ করা হয় এবং তা থেকে কাটা কাঁচা ঘাসের মতো গন্ধ আসে।

[১৬১] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩১৬, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ

"...এ জাতীয় মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো- শরীরে পানি পৌঁছা।"[১৬২]

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাতে উল্লেখ আছে-

وفي الجامع الصغير سئل أبو القاسم عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن أو الذي يعمل عمل الطين أو المرأة التي صبغت أصبعها بالحناء، أو الصرام، أو الصباغ قال كل ذلك سواء يجزيهم وضوءهم إذ لا يستطاع الامتناع عنه إلا بحرج والفتوى على الجواز من غير فصل بين المدني والقروي. [১৬৩]

বর্তমানে প্রাকৃতিক মেহেদি ছাড়াও বাজারে বিভিন্নধরনের পদার্থ মিশ্রিত লিকুইড, টিউব ও নানা রঙের পেস্ট মেহেদি পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক মেহেদিতে প্রকৃত রং আসতে অনেক সময় লাগে এবং রঙের বৈচিত্রও খুব সীমাবদ্ধ বিধায় প্রাকৃতিক মেহেদিতে প্রাপ্ত উপাদান বিশ্লেষণ করে কৃত্রিমভাবে তৈরী মেহেদির চাহিদা সবচে' বেশি। যেমন, রঙিন মেহেদি, গ্লিটার মেহেদি এবং বর্তমানে বাজারে বহুল প্রচলিত গোল্ড মেহেদি ইত্যাদি। এগুলো সবই মূলত কৃত্রিম মেহেদি।

এসব মেহেদীর ক্ষেত্রে জটিল বিষয় হলো, সাধারণত এসব মেহেদির রঙের সাথে একেবারে হালকা একটি আবরণও চামড়ায় থেকে যায়। যখন উক্ত মেহেদী উঠানো হয়, তখন শরীর থেকে আলাদা আবরণের মতো উঠে আসে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত মেহেদী লাগানোর পর অযু করলে অযু হবে কিনা?

এর উত্তর নির্ভর করে উক্ত আবরণ পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধক হয় কিনা, তার উপর। যদি উক্ত আবরণ পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে তা অবশিষ্ট থাকাবস্থায় অযু-গোসল শুদ্ধ হবে না। আর যদি এই আবরণ চামড়ায় পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়, অর্থাৎ তা পানি শুষে নেয় এবং পানি চামড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, তাহলে অযু-গোসল শুদ্ধ হবে।

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

(و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف به يفتى. وقيل إن صلبا منع، وهو الأصح.

"রংকারীর নখের রঙ এবং দাঁতের মাঝে ও ভেতরে লেগে থাকা খাদ্য পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। অনেকে বলেন, যদি এসব বস্তু শক্ত হয়, তাহলে পবিত্রতার জন্য প্রতিবন্ধক হবে। আর এটিই সহীহ।"[১৬৪]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

وشرط لتصحيح الوضوء زوال ما يبعد إيصال المياه من أدران كشمع ورمص.

"যেসকল ময়লা শরীরে পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, অযু সহীহ হওয়ার জন্য তা দূর করা শর্ত। যেমন, মোম, চোখের পিঁচুটি ইত্যাদি।"[১৬৫]

তিনি আরো বলেন-

---

[১৬২] রদ্দুল মুহতার: ১/৩১৬, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৬৩] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ১/৫৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৬৪] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩১৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৬৫] আদ্দুররুল মুখতার: ১/২০৪, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

(قوله: إن صلبا) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد حلية: أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية. (قوله: وهو الأصح) صرح به في شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم. [১৬৬]

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাতে উল্লেখ আছে-

في فتاوى ما وراء النهر إن بقي من موضع الوضوء قدر رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز وإن تلطخ يده بخمير أو حناء جاز.

"...অযুর স্থানে যদি সুঁই পরিমাণ অংশে পানি না পৌঁছে, অথবা নখের মাথায় শুকনো অথবা ভেজা মাটি লেগে থাকার কারণে তাতে পানি না পৌঁছে, তাহলে অযু শুদ্ধ হবে না। হাতে খামিরা অথবা মেহেদি (প্রাকৃতিক মেহেদি) থাকলে অযু শুদ্ধ হবে (কারণ, তা পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়)।"[১৬৭]

ডায়ালাইসিস (Dialysis) ও তহারত

ডায়ালাইসিস কী?

ডায়ালাইসিস হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত পরিশোধন করার একটি কার্যকর চিকিৎসা প্রক্রিয়া। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনির অকার্যকারিতার ক্ষেত্রে ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হয়ে থাকে। ডায়ালাইসিস (Dialysis) করলে কিডনি ভালো হয় না; তবে নিয়মিত ডায়ালাইসিসের মাধ্যমে কিডনির অধিকাংশ প্রয়োজনীয় কাজ সারিয়ে নিয়ে অনেকটা ভালো থাকা যায়। এ প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম কিডনি (Artificial kidney) বা ডায়ালাইজারের সাহায্যে রক্ত থেকে শরীরের বর্জ্য পদার্থ (ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি) ও অতিরিক্ত পানি অপসারণ করা হয়। ডায়ালাইসিসের ফলে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, বাইকার্বনেটসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রোলাইটের স্বাভাবিক মাত্রা বজায় থাকে ও রক্তচাপ (Blood pressure) নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ডায়ালাইসিস সাধারণত দুইভাবে হয়ে থাকে-

১. হেমোডায়ালাইসিস।

২. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস।

হেমোডায়ালাইসিস: এর মাধ্যমে শরীর থেকে রক্ত বের করে একটি কৃত্রিম মেশিনে তা শোধন করা হয়। একটি টিউব দিয়ে রোগীকে মেশিনের সাথে লাগানো হয়, যা ক্রমাগত শরীর থেকে রক্ত টেনে বের করতে থাকে, সেটাকে শোধন করতে থাকে এবং বাড়তি পানি সরিয়ে অপর পথে রক্ত আবার শরীরে ফেরত পাঠায়। যাদের খুব খারাপ অবস্থা তাদের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ৩ দিন পর্যন্ত ডায়ালাইসিস করতে হয়। প্রত্যেকটি সেশন সাধারণত ৩/৪ ঘন্টা হয়। এটা অবশ্যই ডায়ালাইসিস সেন্টারে গিয়ে করতে হয়।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস: এটা শরীরের মধ্যেই করা হয়। এক্ষেত্রে শরীরের পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে (পেটের মুক্ত অঞ্চল, যেখানে অন্য কোনো অর্গান নেই) ডায়াসাইলেট নামক এক

---

[১৬৬] রদ্দুল মুহতার: ১/৩১৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৬৭] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ১/৫৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ধরনের রক্ত পরিষোধক ফ্লুইড ঢুকিয়ে দেয়া হয়, যা শরীরের টক্সিন এবং অতিরিক্ত পানি রক্ত থেকে সরিয়ে নেয়। কিছুক্ষণ রাখার পর সেই ফ্লুইড শরীর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। এটা হেমোডায়ালাইসিসের মতো ততোটা ইফেক্টিভ নয়।

তহারতের ক্ষেত্রে ডায়ালাইসিসের প্রভাব

অযু ভেঙ্গে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো, প্রবহমান রক্ত বের হওয়া বা বের করা। হযরত তামীমে দারী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

الوضوء من كل دم سائل.

"শরীরের কোনো স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে গড়িয়ে পড়লে অযু করতে হবে (অর্থাৎ, অযু ভেঙ্গে যায়)।"[১৬৮]

এখানে একটি শব্দ ব্যবহার হয়েছে "سائل"। এর অর্থ 'প্রবাহিত'। এমনিভাবে কুরআনুল কারীমে উল্লেখ হয়েছে "أو دما مسفوحا"। এ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, রক্ত সায়েল বা প্রবহমান হলেই অযু নষ্ট হবে, আর না হয় অযু নষ্ট হবে না।

রক্ত বের হয়ে যদি শরীরে গড়িয়ে যায়, তাহলে বিষয়টি সহজবোধ্য যে, "سائل" হওয়ার কারণে অযু ভেঙ্গে যাবে। যদি গড়িয়ে না পড়ে, তবে এতটুকু বের হয় যে, মুছে না ফেললে তা নিশ্চিত গড়িয়ে পড়তো, তাহলে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন যে, এটাও গড়িয়ে পড়ার মতো। আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

وكذا إذا افتصد وخرج دم كثير وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح، فإنه ينقض الوضوء لكونه وصل إلى ثوب أو مكان يلحقهما حكم التطهير، فتنبه لهذا فإنه يدفع كلام كثير من الشارحين؛ ولذا قال في فتح القدير: لو خرج من جرح في العين دم فسال إلى الجانب الآخر منها لا ينقض؛ لأنه لا يلحقه حكم هو وجوب التطهير أو ندبه، فقول بعضهم المراد أن يصل إلى موضع تجب طهارته محمول على أن المراد بالوجوب الثبوت، وقول الحدادي إذا نزل الدم إلى قصبة الأنف لا ينقض محمول على أنه لم يصل إلى ما يسن إيصال الماء إليه في الاستنشاق، فهو في حكم الباطن حينئذ توفيقا بين العبارات، وقول من قال إذا نزل الدم إلى ما لان من الأنف نقض لا يقتضي

---

[১৬৮] (হাদীস হাসান) আল কামেল ১/৩১৩। হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। সনদে দুর্বলতা থাকলেও তা এক প্রকারের সবুজ পাউডার যা প্রকৃতিক মেহেদির সাথে মিশ্রণ করা হয় এবং তা থেকে কাটা কাঁচা ঘাসের মতো গন্ধ আসে।

[১৬৮] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩১৬, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৬৮] রদ্দুল মুহতার: ১/৩১৬, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৬৮] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ১/৫৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৬৮] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৩১৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৬৮] আদ্দুররুল মুখতার: ১/২০৪, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৬৮] রদ্দুল মুহতার: ১/৩১৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৬৮] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ১/৫৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৬৮] মুতাবি ও শাহেদের সমন্বয়ে হাসানের মানে উত্তীর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লামা যফর আহমদ থানভী রাহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। (ই'লাউস সুনান), সুনানে দারা কুতনী: হাদীস নং ৫৮১

(باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيئ والحجامة ونحوه)

عدم النقض إذا وصل إلى ما اشتد منه إلا بالمفهوم، والصريح بخلافه، وقد أوضحه في غاية البيان، والعناية والمراد بالوصول المذكور سيلانه واختلف في حده ففي المحيط حده: أن يعلو وينحدر عن أبي يوسف وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح، وصار أكبر من رأسه نقض والصحيح الأول. [১৬৯]

এককথায়, সরাসরি শরীরের উপর গড়িয়ে না পড়লেও শরীরের বাহিরে রক্ত প্রবাহিত হলেও অযু ভেঙ্গে যাবে। যেমন, বর্তমানে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রক্ত বের করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। **ডায়ালাইসিসের ক্ষেত্রেও এমনই হয়ে থাকে। এজন্য ডায়ালাইসিসের কারণে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা এতে শরীর থেকে রক্ত বের করা হয়। আর শরীর থেকে এই পরিমাণ রক্ত বের হওয়া যা গড়িয়ে পড়ার মতো, অযু ভাঙ্গার কারণসমূহের একটি**। যেমনটি আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ.-এর বক্তব্যে পূর্বে আমরা দেখেছি।

এছাড়াও ফাতাওয়ায়ে আলমগীরিতে আছে-

القراد إذا مص عضو إنسان فامتلأ دما إن كان صغيرا لا ينقض وضوءه كما لو مصت الذباب أو البعوض وإن كان كبيرا ينقض وكذا العلقة إذا مصت عضو إنسان حتى امتلأت من دمه انتقض وضوءه.

"যদি আঁটুলি মানুষের কোনো অঙ্গে লাগে এবং রক্তে পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তা ছোট হলে অযু নষ্ট হবে না। যেমন, মশা-মাছি যদি শরীর থেকে রক্ত চুষে নেয় (এক্ষেত্রে অযু নষ্ট হয় না)। আর যদি বেশ বড় হয়, তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে। এমনিভাবে জোঁক যদি মানুষের শরীর থেকে রক্ত চুষে নিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলেও অযু ভেঙ্গে যাবে।"[১৭০]

এখন পোশাক-পরিচ্ছদের পবিত্রতা সংক্রান্ত কিছু জটিলতা ও তার শর'য়ী সমাধান নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার হুকুম

আমরা জানি, ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার জন্য মেশিনে কাপড় এবং পাউডার দিয়ে মেশিন অন করা হয়। মেশিনের ভেতরে কাপড়গুলো ঘুরতে থাকে। এভাবে কাপড় থেকে ময়লা বের হয়ে যায়। তারপর পানির লাইন খুলে দেয়া হয় এবং পানি বের হয়ে যায়।

পাক কাপড় ধৌত করার ক্ষেত্রে প্রচলিত ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধৌত করার বিষয়ে কোনো জটিলতা নেই; বরং তা হাতে ধৌত করার মতোই। আর পাউডার এবং পানির পরিমাণ ঠিকমত হলে এতে অনেক সময় হাতে ধোয়ার চেয়েও কাপড় বেশি পরিষ্কার হয়।

আর নাপাক কাপড়ের ক্ষেত্রে ধৌতকারীর নাপাকি দূর হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা (غلبة الظن) অর্জন হওয়া পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। নিশ্চয়তা অর্জন কীভাবে করবে? এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে-

১. নাপাকি যদি দৃশ্যমান হয় (অর্থাৎ এমন নাপাকি যা কাপড়ে লাগলে শুকিয়ে যাওয়ার পরও তার চিহ্ন কাপড়ে পরিলক্ষিত হয়) যেমন, পায়খানা, রক্ত ইত্যাদি, তাহলে উক্ত নাপাকি পরিপূর্ণভাবে দূর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত কাপড় ধৌত করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার শর্ত নেই।

---

[১৬৯] আল বাহরুর রায়িক: ১/৬৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৭০] ফাতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৬২, মাকতাবায়ে যাকরিয়া, দেওবন্দ

উল্লেখ্য যে, কাপড় থেকে মূল নাপাকি দূর হওয়ার পর যদি এমন কোনো চিহ্ন থেকে যায় যা দূর করার জন্য শুধু পানি যথেষ্ট নয়; বরং সাবান বা অন্য কিছুর প্রয়োজন হয়, তাহলে কাপড় পাক হওয়ার জন্য তা দূর করা জরুরী নয়। তা দূর না করলেও কাপড় পাক হয়ে যাবে।

ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

النجاسة ضربان: مرئية وغير مرئية فماكان منها مرئيا فطهارتها بزوال عينها، لأن النجاسة حلت المحل باعتبار العين فتزول بزواله إلاّ أن يبقى من أثرها مايشق ازالته، لأن الحرج مدفوع، و هذا يشير إلى أنه لايشترط الغسل بعد زوال العين وإن زال بالغسل مرة واحدة، وفيه كلام، وماليس بمرئي فطهارته أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، لأن التكرار لابد منه للإستخراج ولايقطع بزواله فاعتبر غالب الظن كما مر في أمر القبلة.

"নাপাকি দুই প্রকার: ক. দৃশ্যমান। খ. দৃশ্যমান নয়। দৃশ্যমান নাপাকির ক্ষেত্রে তার মূল দূর করার দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন হয়ে যায়। কেননা দৃশ্যমান নাপাকির ক্ষেত্রে নাপাকির মূলটিই আসলে নাপাকি। সুতরাং তা দূর করলেই নাপাকি দূর হয়ে যাবে। তবে যদি নাপাকির কোনো চিহ্ন দূর করা দুষ্কর হয় তাহলে ভিন্ন কথা।...."[১৭১]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

(قوله إلا أن يبقى من أثرها ما يشق) أي لونها أو ريحها ما يحتاج فيه إلى استعمال غير الماء كالصابون والأشنان، وعلى هذا قالوا لو صبغ ثوبه أو يده بصبغ أو حناء نجسين فغسل إلى أن صفا الماء يطهر مع قيام اللون، وقيل يغسل بعد ذلك ثلاثا.

"যদি নাপাকির চিহ্ন (অর্থাৎ রং অথবা ঘ্রাণ) দূর করা দুষ্কর হয়, অর্থাৎ, তা দূর করার জন্য পানি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন হয়, যেমন, সাবান, ক্ষার ইত্যাদি, তাহলে তা দূর করা জরুরী নয়। এর ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যদি কেউ কাপড় অথবা হাত নাপাক রং বা মেহেদি দ্বারা রঙ্গিন করে এবং এ পরিমাণ হাত ধৌত করে যে, ধোয়ার পানি একেবারে পরিষ্কার দেখা যায়, তাহলে হাতে রং বিদ্যমান থাকলেও তা পবিত্র হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, এরপরও তিন বার ধৌত করবে।"[১৭২]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

(قوله: ولو بمرة) يعني إن زال عين النجاسة بمرة واحدة تطهر، سواء كانت تلك الغسلة الواحدة في ماء جار أو راكد كثير أو بالصب أو في إجانة، أما الثلاثة الأول فظاهر، وأما الإجانة فقد نص عليها في الدرر حيث قال: غسل المرئية عن الثوب في إجانة حتى زالت طهر. اهـ.[১৭৩]

২. আর যদি নাপাকি অদৃশ্যমান হয় (অর্থাৎ যা কাপড়ে লাগলে শুকিয়ে যাওয়ার পর পরিলক্ষিত হয় না) যেমন, পেশাব ইত্যাদি, তাহলে তা কাপড়ে লাগলে কাপড় পাক হওয়ার জন্য তিনবার ধৌত করতে হবে এবং প্রত্যেকবার নিংড়াতে হবে। প্রথম দু'বার হালকাভাবে নিংড়ালেও চলবে; তবে তৃতীয় বার ভালোভাবে এতটুকু নিংড়াতে হবে যেন কাপড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়া

---

[১৭১] আল হিদায়া: ১/৭৭-৭৮, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, ঢাকা

[১৭২] ফাতহুল কাদীর: ১/২০৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৭৩] রদ্দুল মুহতার: ১/৫৮৯, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

(তৎক্ষণাৎ) বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে কাপড় ঝুলিয়ে রাখলে যদি ফোঁটা ফোঁটা পানি বের হয় তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, এর পূর্বে ফোঁটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার দ্বারাই কাপড় পাক হয়ে গেছে। নিংড়ানোর ক্ষেত্রে নিজের শক্তি অনুযায়ী নিংড়ালেই পাক হয়ে যাবে।
আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

(و) يطهر محل (غيرها) أي: غير مرئية (بغلبة ظن غاسل) لو مكلفا وإلا فمستعمل (طهارة محلها) بلا عدد به يفتى. (وقدر) ذلك لموسوس (بغسل وعصر ثلاثا) أو سبعا (فيما ينعصر) مبالغا بحيث لا يقطر.[১৭৪]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة اهـ. وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها، واقتصر عليه في الإمداد، وهو ظاهر المتون حيث صرحوا بالثلاث– والله أعلم.[১৭৫]

যদি কোনো কাপড় পাতলা ও নরম হওয়ার কারণে ভালোভাবে নিংড়ালে ফেটে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে হালকাভাবে নিংড়ালেও পাক হয়ে যাবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

ولو لم يبالغ لرقته هل يطهر؟ الأظهر نعم للضرورة.[১৭৬]

ওয়াশিং মেশিনে সাধারণত অদৃশ্যমান নাপাকিবিশিষ্ট কাপড় ধোয়া হয়ে থাকে। সুতরাং অদৃশ্যমান নাপাকি পাক করার যে পদ্ধতি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে তা অনুসরণ করলেই নাপাক কাপড় পাক হবে। সুতরাং ওয়াশিং মেশিনে নাপাক কাপড় ধৌত করলে তিনবার আলাদা পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। প্রত্যেকবার পুরাতন পানি ছেড়ে দিয়ে নতুন পানি ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যেকবার কাপড় ধোয়ার পর পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে মেশিনের বাইরে কাপড় নিংড়াতে হবে। হ্যাঁ, যদি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মেশিনের একদিকে ভালোভাবে পানি প্রবেশ করানো হয় এবং অপরদিকে পানি ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলেও কাপড় পাক হয়ে যাবে।
আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير، أو جرى عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار.

"যদি কাপড় কোনো পুকুরে ধৌত করে বা তাতে অনেক পানি ঢালে, অথবা প্রবহমান পানি দ্বারা ধৌত করা হয়, তাহলে নিংড়ানো বা শুকানো বা বারবার ধোঁয়া করা ব্যতীতই গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী তা পবিত্র হয়ে যাবে।"[১৭৭]

উল্লেখ্য, ওয়াশিং মেশিনে বা অন্য যেকোনো পাত্রে পাক-নাপাক কাপড় একসাথে ধৌত করা ঠিক নয়; কারণ, এতে পাক কাপড়ও নাপাক হয়ে যায়। তাই প্রথমে নাপাক কাপড় থেকে নাপাকি দূর করে নিতে হবে অথবা তিনবার ধৌত করে ভালোভাবে নিংড়িয়ে নিতে হবে।

---

[১৭৪] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৫৯৩-৫৯৪, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া
[১৭৫] রদ্দুল মুহতার: ১/৫৯৩-৫৯৪, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া
[১৭৬] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৫৯৪, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া
[১৭৭] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৫৪২-৫৪৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

তারপর সব কাপড় একসাথে মেশিনে দিতে হবে। অন্যথায় পাকগুলোও নাপাকগুলোর মত ধৌত করতে হবে (অর্থাৎ, নাপাকগুলোর সাথে লেগে নাপাক হয়ে যাওয়ার কারণে তাও তিনবার ধৌত করতে হবে)।

ড্রাইক্লিন বা ড্রাইওয়াশ

ড্রাইক্লিন কী?

সাধারণত উল, সিল্ক বা রেয়নের তৈরী পোশাক ড্রাইক্লিন করা হয়। কারণ, এই পোশাকগুলো বিশেষ ধরনের ফাইবার থেকে তৈরী হয়ে থাকে। সরাসরি পানি দ্বারা ধৌত করা হলে এগুলো কুঁচকে যায়, রঙ নষ্ট হয়ে যায় এবং অনেকসময় আকারও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

যদিও ড্রাইক্লিনিং অর্থ শুকনো ধৌতকরণ; তবে ড্রাইক্লিনিং প্রক্রিয়া বাস্তবেই কোনো শুষ্ক ধৌতকরণের প্রক্রিয়া নয়। ড্রাইক্লিনিং -এ পানিতে ভেজানোর বদলে বিভিন্ন ধরনের তরল বা গ্যাসীয় দ্রাবকে কাপড়কে পরিষ্কার করা হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে পারক্লোরোইথিলিন (perc.) নামক দ্রাবক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৭৮]

ড্রাইক্লিন ও কাপড়ের পবিত্রতা

আমরা পিছনে পড়ে এসেছি যে, নাপাক কাপড়ের ক্ষেত্রে মৌলিক শর্ত হলো নাপাকি যেকোনোভাবে দূর করা। কাপড়ের নাপাকি দূর করার ক্ষেত্রে দু'ধরনের পদ্ধতি রয়েছে-

এক. কাপড় থেকে নাপাকি তুলে ফেলা (حك)। হাদীসে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এ ধরনের পদ্ধতি অবলম্বনের বর্ণনা এসেছে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا....

"আমি রাসূল ﷺ-এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য তুলে কাপড় পবিত্র করতাম।"[১৭৯]

দুই. তরল পদার্থ ব্যবহার করা।

তরল পদার্থ দু'ধরনের। ১. সাধারণ পানি ২. কোনো পাক উপাদান মিশ্রিত পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থ।

কাপড়ের নাপাকি দূর করার ক্ষেত্রে দু'ধরনের পদার্থই ব্যবহার করা যায়। যদিও পানির কার্যকারিতার কারণে তাই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল্লামা ইবনু রুশদ মালেকী রাহ. বলেন-

ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من الثياب والأبدان ليست لغيره

---

[১৭৮] বিস্তারিত দেখুন: Dry cleaning: Wikipedia, the free encyclopedia. There also:
"Dry cleaning is any cleaning process for clothing and textiles using a chemical solvent other than water. It is used to clean fabrics that degrade in water, and delicate fabrics that cannot withstand the rough and tumble of a washing machine and clothes dryer. It can eliminate labor-intensive hand washing.
Unlike what its name implies, dry cleaning is not a "dry" process. Clothes are soaked in a solvent other than water. Tetrachloroethylene (perchloroethylene), which the industry calls "perc", is the most widely used solvent. Alternative solvents are trichloroethane and petroleum spirits."

[১৭৯] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ২৮৮, শরহু মা'আনিল আসার: ১/৪৯ হাদীস নং ২৭৫

ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب لكان قولا جيدا وغيره بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء.

"পানির নাপাকি এবং ময়লা দূর করা এবং কাপড় থেকে তা মুলোৎপাটনের এমন শক্তি রয়েছে, যা অন্য কিছুতে নেই। এজন্যই মানুষ শরীর এবং কাপড় পরিষ্কারের ক্ষেত্রে পানির উপর নির্ভর করে। পানির এই বিশেষত্বের কারণে শরী'আত নাপাকি ধৌত করার ক্ষেত্রে পানিকে স্বীকৃতি দিয়েছে।"[১৮০]

এছাড়াও অন্যান্য পাক তরল পদার্থ যার মাঝে নাপাকি দূর করার যোগ্যতা আছে তা দিয়ে নাপাক কাপড় পাক করা যাবে। আল্লামা আবুল হাসান আলী ইবনুল হুসাইন সুগদী রাহ. (৪৬১ হি.) বলেন-

فكل نجاسة تصيب النفس أو الثوب فازالتها تجوز بثلاثة أشياء، بالماء المطلق وبالماء المقيد وبالمائعات من الطعام والشراب مثل اللبن والخل والرب والدهن وأشباهها.

"নাপাকি শরীরে অথবা কাপড়ে লাগলে তা তিন জিনিস দ্বারা পবিত্র করা যায়। ১. সাধারণ পানি। ২. ময়লা দূরকারী কোনো পদার্থ মিশ্রিত পানি। ৩. খাদ্য জাতীয় বা পানীয় তরল পদার্থ। যেমন, দুধ, সিরকা, ফলের রস এবং সমজাতীয় অন্যান্য দ্রব্য।"[১৮১]

আল্লামা শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) বলেন-

وإزالة العين كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات، وربما يكون تأثير الخل في قلع النجاسة أكثر من تأثير الماء، فإذا زالت به عين النجاسة يبقى كما كان، بخلاف ما لا ينعصر فإنه يتشرب في الثوب فتزداد به النجاسة ولا تزول.

"নাপাকির মূল যেমন পানি দ্বারা দূর করা যায়, তেমনি অন্যান্য তরল পদার্থ দ্বারাও দূর করা যায়। কখনো কখনো পানির চেয়ে সিরকা নাপাক দূরীকরণে বেশি কার্যকর হয়। যদি এর দ্বারা নাপাকির মূল দূর হয়ে যায়, তাহলে কাপড় পূর্বের মতো পবিত্র হয়ে যাবে। তবে যেসকল বস্তু নিংড়ানো যায় না তা এর ব্যতিক্রম। কেননা এ সকল বস্তুর কাপড়ে পানি প্রবেশের দ্বারা নাপাকি বৃদ্ধি পায়, নাপাকি দূর হয় না।"[১৮২]

তিনি আরো বলেন-

يجوز في الثوب والبدن جميعا وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف -رحمه الله تعالى- وفي الرواية الأخرى فصل بين الثوب والبدن لا تزول النجاسة عنه إلا بالماء وفي الثوب تزول عنه بكل مائع طاهر ينعصر بالعصر، فأما ما لا ينعصر كالدهن والسمن لا تجوز إزالة النجاسة به.

"ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. থেকে দুই বর্ণনার একটি হলো কাপড় এবং শরীর উভয়ই-এর দ্বারা পবিত্র করা জায়েয হবে। অন্য এক বর্ণনায় তিনি কাপড় এবং শরীরের মাঝে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন, শরীরের নাপাকি পানি ব্যতীত দূর হবে না। আর কাপড় পানি জাতীয় যেকোনো

[১৮০] বিদায়াতুল মুজতাহিদ: ১/৮৩, মাকতাবাতুস সাফা

[১৮১] আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া: ২৫, এইচ, এম, সাঈদ পাকিস্তান

[১৮২] আল মাবসূত লিস্ সারাখসী: ১/৯৬, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী

পবিত্র জিনিস দ্বারা ধুলেই নাপাকি দূর হয়ে যাবে। তবে যে সমস্ত জিনিস দ্বারা নিংড়ানো যায় না (অর্থাৎ, তা পানির মতো তরল নয়) তা দ্বারা নাপাকি দূর হবে না। যেমন, তেল, ঘি ইত্যাদি।”[১৮৩]
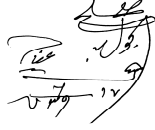
আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. (৯৭০ হি.) বলেন-

قوله (وبمائع مزيل كالخل وماء الورد) قياسا على إزالتها بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعا لتلك النجاسة والمائع قالع فهو محصل ذلك المقصود، فتحصل به الطهارة.
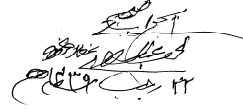
“পানির ন্যায় ময়লা দূরকারী তরল পদার্থ, যেমন, সিরকা, গোলাপের পানি দ্বারা নাপাকি দূর করা যাবে। পনি দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হওয়ার কারণ হলো তা নাপাকি দূর করে। এমনিভাবে এসব তরল পদার্থও নাপাকি দূরকারী। তাই তা দ্বারাও পবিত্রতা অর্জিত হবে।”[১৮৪]

ড্রাইক্লিনিং -এ ব্যবহৃত দ্রবণ বা পদার্থ স্বয়ং পবিত্র। আর এগুলো কাপড়কে পবিত্র করারও সক্ষমতা রাখে। সুতরাং ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে যে শর'য়ী পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে তা অনুযায়ী কাপড় পরিষ্কার করলে ড্রাইক্লিন-এর দ্বারা নাপাক কাপড়ও পাক হয়ে যাবে।
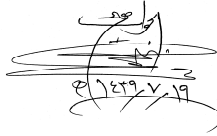
সত্যায়নে

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৭ জুমাদাল আখেরাহ ১৪৩৯ হি.

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আ'যম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২২ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১৯ রজব ১৪৩৯ হি.

[১৮৩] আল মাবসূত লিস্ সারাখসী: ১/৯৬, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী
[১৮৪] আল বাহরুর রায়িক: ১/৩৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

হজ্জে বাইতুল্লাহ : কিছু জরুরী বিষয় ও মাসআলা

মাওলানা ইলিয়াস হাসান, কুমিল্লা

হজ্ব ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর জীবনে একবার হজ্ব পালন করা ফরয। হজ্ব দৈহিক, আর্থিক ও আত্মিক ইবাদত। সফর, বিশেষ স্থান, বিশেষ সময়, বিশেষ ইন্তেজামসহ বিভিন্ন অনুষঙ্গ রয়েছে এই ইবাদতের। এজন্য অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় হজ্বের মাসাইল কিছুটা জটিল। হজ্বের বিভিন্ন মাসাইলের ক্ষেত্রে মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ও সংশয় অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। এছাড়াও বর্তমানে নতুন ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোর কারণে সৃষ্টি হয়েছে আরো কিছু নতুন জিজ্ঞাসা। নতুন প্রেক্ষাপটে অনেক পুরাতন মাসআলায়ও নতুনভাবে দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এ ধরনের বহুবিধ মাসআলার মধ্য থেকে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা বিক্ষিপ্তভাবে হজ্বের কিছু জরুরী মাসাইল ও সচরাচর ঘটে থাকে এমন কিছু ভুল নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

হজ্বের ফরযিয়্যাত সংক্রান্ত কিছু মাসাইল

হজ্ব কার উপর ফরয এবং কখন ফরয? এ বিষয়ে সমাজে বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকেই ধারণা করে যে, তার উপর হজ্ব ফরয নয়। এ ধারণার উপরই তার জীবনের বৃহৎ অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়। অথচ শরী'আতের দৃষ্টিতে তার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু মাসাইল উল্লেখ করা হলো।

হজ্ব ও আর্থিক সামর্থ্য

যার নিকট এই পরিমাণ সম্পদ আছে যার দ্বারা সে মক্কা মুকার্‌রমা গিয়ে ফিরে আসতে পারে এবং সফরকালীন যাবতীয় প্রয়োজনের স্বাভাবিকভাবে ব্যবস্থা করতে পারে যেমন, ভিসার ব্যবস্থা, নিরাপদ গমনাগমনের ব্যবস্থা ইত্যাদি এবং এই সময়ের মাঝে তার পরিবার-পরিজনের খরচ স্বাভাবিকভাবে বহন করতে পারে- তার উপর (জীবনে একবার) হজ্ব ফরয হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

"তাতে আছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি, মাকামে ইবরাহীম। যে তাতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে, তাদের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্ব করা ফরয। কেউ (এটা) অস্বীকার করলে আল্লাহ তো বিশ্ব জগতের সমস্ত মানুষ হতে বেনিয়ায।"[১৮৫]

উল্লেখ্য, হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য নেসাব[১৮৬] বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়; বরং বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়া আসা এবং প্রাসঙ্গিক খরচাদির ব্যবস্থা থাকলেই হজ্ব

---

[১৮৫] সূরা আল ইমরান: ৯৭

[১৮৬] যেমন, যাকাতের ক্ষেত্রে নেসাবের শর্ত রয়েছে।

ফরয হবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। চাই তা নেসাবের চেয়ে বেশি হোক বা কম হোক। বুগয়াতুল মানাসিকে আছে-

ولايشترط لوجوب الحج مقدار النصاب؛ بل ما يبلغه، سواء كان مقدار النصاب أو اكثر أو اقل.

"হজ্ব ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাব শর্ত নয়; বরং যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে বাইতুল্লাহ পৌঁছতে পারবে, সে পরিমাণ সম্পদ থাকলেই হজ্ব ফরয হবে। চাই তা নেসাব পরিমাণ হোক বা তার চেয়ে বেশি বা কম হোক।"[১৮৭]

মাসআলা: যদি কারো নিকট এই পরিমাণ জমি থাকে যা বিক্রয় করলে তার হজ্বের সফরের প্রয়োজনীয় সকল খরচ এবং সফরকালীন সময়ে পরিবার-পরিজনের স্বাভাবিক খরচ সংকুলান হয়ে যায়, তাহলে তার উপর হজ্ব ফরয হয়ে যাবে। গুনয়াতুল মানাসিক-এ আছে-

وإن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة يبقى بعد رجوعه من ضيعته قدر ما يعيش بغلته الباقي افترض عليه الحج.

"যদি কারো এ পরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি থাকে যার কিছু অংশ বিক্রয় করলে হজ্বে যাওয়ার যাবতীয় খরচ সংকুলান হবে এবং ফিরে আসার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির আয় দিয়ে জীবন-যাপন সম্ভবপর হবে, তাহলে তার উপর হজ্ব ফরয হবে।"[১৮৮]

বর্তমানে বিশেষত গ্রাম-গঞ্জে এমন অনেককে দেখা যায়, যারা পৈতৃকভাবে বিশাল জমির মালিক; কিন্তু তাদের হাতে নগদ টাকা না থাকায় তারা মনে করে যে, তাদের উপর হজ্ব ফরয হয়নি। এ ধরণের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

হজ্ব ও নানা প্রয়োজন

অনেক সময় হজ্ব আদায় করার মত টাকা থাকলেও বিভিন্ন প্রয়োজনে সে টাকা খরচ করতে হয়। এমতাবস্থায় হজ্ব করবে নাকি উক্ত প্রয়োজন পূরণ করবে? নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু মাসাইল উল্লেখ করা হলো।

মাসআলা: কোনো ব্যক্তির নিকট হজ্ব আদায় করার মতো টাকা রয়েছে, তবে তার বাসস্থান নেই। এমতাবস্থায় যদি হজ্বের মাস শুরু হয়,[১৮৯] তাহলে তার জন্য হজ্ব আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি হজ্বের মাস শুরু না হয়, তাহলে সে উক্ত টাকা দিয়ে বাসস্থান বানাতে পারবে। পরবর্তীতে টাকার ব্যবস্থা হলে হজ্ব আদায় করবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

وإن لم يكن له مسكن ولا شيء من ذلك، وعنده دراهم تبلغ به الحج وتبلغ ثمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج، وإن جعلها في غيره أثم ا هـ. لكن هذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب، أما قبله فيشتري به ما شاء لأنه قبل الوجوب.

"ঘরদোর কিছু নেই, তবে তার কাছে এই পরিমাণ অর্থ আছে যা দ্বারা সে হজ্ব আদায় করতে

---

[১৮৭] বুগয়াতুল মানাসিক: ২০

[১৮৮] গুনয়াতুন নাসিক: ২০

[১৮৯] বি. দ্র. ফুকাহায়ে কেরাম তাদের সময়কার পরিস্থিতি অনুযায়ী এ মাসআলা বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে হজ্বের মাস আসার বহু আগেই সফরকালীন খরচের একটি বড় অংশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হয়। এ অবস্থায় টাকা জমা দেয়ার সময় ধর্তব্য হবে, হজ্বের মৌসুম নয়।

পারবে অথবা হজ্ব আদায় না করে বাসস্থান, খাদেম, খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারবে। এমন হলে তার উপর হজ্ব করা ওয়াজিব। যদি সে উক্ত অর্থ ভিন্ন খাতে খরচ করে, তাহলে গুনাহগার হবে। তবে এ বিধান হলো যদি তার শহরের লোকজন হজ্বে বের হবার প্রাক্কালে (অর্থাৎ, হজ্বের মৌসুম) হজ্ব ও অন্যান্য প্রয়োজন একত্রিত হয়। হ্যাঁ, যদি এমন হয় যে, হজ্বের মৌসুম এখনো আসেনি। ...তাহলে সে নিজের মতো খরচ করতে পারবে। কেননা তখন হজ্ব আদায়ের সময় হয়নি।"[১৯০]

মাসআলা: কোনো অবিবাহিত যুবকের নিকট যদি হজ্ব আদায় করার মতো টাকা থাকে এবং বিবাহ করা ব্যতীত সে নিজেকে গুনাহ থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তাহলে হজ্বের মাস ছাড়া অন্য সময়ে হলে উক্ত টাকা দিয়ে বিবাহ করা জায়েয। যদি হজ্বের মাস শুরু হয়, তাহলে হজ্ব করা ওয়াজিব। আর যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তাহলে হজ্বর সময় হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় বিবাহ করতে পারবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

معه ألف وخاف العزوبة، إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج، ولو وقته لزمه الحج.....بأنه حال التوقان مقدم على الحج اتفاقا، لأن في تركه أمرين: ترك الفرض، والوقوع في الزنا. وجواب أبي حنيفة في غير حال التوقان اهـ.: أي في غير حال تحققه الزنا، لانه لو تحققه فرض التزوج، أما لوخافه فالتزوج واجب لا فرض فيقدم الحج الفرض عليه فافهم.

"কোনো অবিবাহিত ব্যক্তির নিকট এক হাজার আছে (বেশি বোঝাতে এই সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে)। এক দিকে সে অবিবাহিত অবস্থায় থাকা নিয়ে শঙ্কিত (অর্থাৎ, তার বিবাহ করা প্রয়োজন), অপরদিকে সে এখনও ফরয হজ্ব আদায় করেনি। এখন সে উক্ত টাকা কোন খাতে ব্যয় করবে- হজ্ব না বিবাহ? যদি ঐ শহরের লোকজন হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বে এমন অবস্থা হয়, তাহলে সে বিবাহ করবে। আর যদি হজ্বে বের হবার সময় হয়, তাহলে হজ্বে যাওয়াটা তার জন্য আবশ্যক।...জানা কথা, যদি এমন শাহওয়াত হয় যে, সে যিনায় পতিত হবার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে সর্বাবস্থায় (হজ্বের সময় হোক বা না হোক) সর্বসম্মতিক্রমে বিয়েকে প্রাধান্য দেয়া হবে।..."[191]

মাসআলা: কারো নিকট হজ্ব আদায় করার মতো টাকা আছে; তবে তার উপর এ পরিমাণ ঋণ আছে যা আদায় করলে হজ্ব আদায় করতে পারবে না, তাহলে তার উপর ঋণ আদায় করা আবশ্যক। পরবর্তীতে হজ্ব আদায় করার টাকা হলে হজ্ব আদায় করবে। ইমাম হাসান ইবনে মানসূর কাযীখান রাহ. বলেন-

وإن كان في ماله وفاء بالدين يقضي الدين ولايحج، ويكره الخروج إلى الغزو والحج لمن عليه الدين.

"যদি তার নিকট এ পরিমাণ অর্থ থাকে, যা দ্বারা সে ঋণ আদায় করতে পারে, তাহলে হজ্বে না গিয়ে ঋণ আদায় করবে। কাঁধে ঋণের বোঝা নিয়ে হজ্ব ও জিহাদে যাওয়া মাকরূহ।"[১৯২]

মাসআলা: যদি কোনো ব্যক্তির উপর স্ত্রীর মোহর বাকি থাকে, তাহলে সে হজ্ব বিলম্ব করে স্ত্রীর

---

[১৯০] রদ্দুল মুহতার: ৩/৫২৮, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৯১] রদ্দুল মুহতার: ৩/৫২৮-৫২৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১৯২] ফতাওয়ায়ে কাজীখান: ১/১৯১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

মোহর আদায় করবে। কেননা স্ত্রীর মোহর আগেই ওয়াজিব হয়েছে। এছাড়াও হজ্ব আল্লাহর হক আর স্ত্রীর মোহর বান্দার হক। আর উভয়টি একত্র হলে বান্দার হক আগে আদায় করতে হয়। গুনয়াতুল মানাসিক-এ আছে-

وعن قضاء ديونه حالة أو مؤجلة والمراد ديون العباد (وقوله) وأصدق نسائه ولو مؤجلة، هذا هو حد الغنى للحج في ظاهر الرواية.

"হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য স্ত্রীর মোহর এবং মানুষের পাওনা (মেয়াদী হোক বা মেয়াদহীন) আদায়ের পর পর্যাপ্ত পরিমাণ সামর্থ্য থাকা (বিস্তারিত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) শর্ত। যাহিরুর রিওয়ায়াহ অনুযায়ী এটাই হজ্ব ফরয হবার জন্য সামর্থ্যবান হবার সীমারেখা।"[১৯৩]

মীকাত ও ইহরাম : কিছু জরুরী মাসাইল

মীকাত ও ইহরাম সংক্রান্ত তিনটি বিষয় নিয়ে মূলত আমরা এখানে আলোচনা করবো-

১. আমাদের দেশ থেকে মক্কাগামীদের মীকাত ও ইহরামের স্থান।

২. যাদের নিয়মিত বিভিন্ন প্রয়োজনে মীকাতের অভ্যন্তরে আসা-যাওয়া করতে হয় তাদের জন্য ইহরামের বিধান।

৩. ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের চেহারার পর্দার বিধান।

বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার পূর্বে মীকাত ও ইহরাম প্রসঙ্গে কিছু মৌলিক কথা পেশ করা সমীচীন মনে করছি।

আল্লাহ তা'আলা বাইতুল্লাহ 'কা'বা' কে যেমন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গৃহ হিসেবে স্থির করেছেন, তেমনি তার সংলগ্ন ভূমি ও এলাকাকেও করেছেন সম্মানিত ও বরকতময়।

বাইতুল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট চার স্তরের সম্মানিত এলাকা রয়েছে।[১৯৪]

১. বাইতুল্লাহ সংলগ্ন প্রথম এবং সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ স্থান হলো 'মসজিদে হারাম'। এই মসজিদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য মসজিদের নেই। যেমন, এখানে এক নামাযের সওয়াব অন্য স্থানে এক লাখ নামাযের সমপরিমাণ। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এই মসজিদের সীমানার ভেতরেই করতে হয়। এই মসজিদের বাইরে কেউ সাতবার প্রদক্ষিণ করলেও তাওয়াফ হবে না।

২. বাইতুল্লাহ সংলগ্ন দ্বিতীয় স্তরের সম্মানিত ভূমি হলো 'মক্কা মুকার্‌রমা'। এই ভূমিরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, হারাম শরীফের মতো পুরো মক্কা শহর শরী'আতের দৃষ্টিতে নিরাপদ স্থান গণ্য হয়। কোনো পশু-পাখিকেও সেখানে হত্যা করা যায় না। তবে এটা স্পষ্ট যে, এ স্তরের ভূমির মর্যাদা প্রথমটির থেকে কিছুটা কম।

৩. বাইতুল্লাহ সংলগ্ন তৃতীয় স্তরের সম্মানিত ভূমি হলো 'হারাম এলাকা'। যার সীমারেখা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যামানা থেকে নির্ধারিত রয়েছে। এই স্থানের বৈশিষ্ট্য মক্কা মুকার্‌রমার মতোই।

৪. বাইতুল্লাহ সংলগ্ন চতুর্থ স্তরের সম্মানিত ভূমি ও সীমানা হলো 'মীকাত'। এ সীমানার ভেতর

---

[১৯৩] গুনয়াতুল মানাসিক: ২০

[১৯৪] দ্রষ্টব্য: জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৪/২১, মাকতাবায়ে দরুল উলূম করাচী

পূর্বের সব সীমানাগুলো অবস্থিত। মীকাতের ভেতরে তবে হারামের বাইরে যে এলাকা রয়েছে তাকে হিল্ল বা আল হিল্লুস সগীর (الحلّ الصغير) বলা হয়। এ এলাকার বৈশিষ্ট্য হলো, এর বাহিরের অধিবাসীরা হারাম এলাকায় যেতে চাইলে এখান থেকেই তাদের ইহরাম বাঁধতে হয়। ইহরাম বাঁধা ব্যতীত এ সীমানা অতিক্রমের অনুমতি নেই।

উল্লেখ্য, মীকাতের বাইরে সমগ্র দুনিয়াকে বলা হয় 'আফাক' বা আল হিল্লুল কাবীর (الحلّ الكبير)। এ স্তরের ভূমি তথা মীকাতই এখানে আমাদের আলোচ্যবিষয়।

মীকাতের পরিচয়

রাসূল ﷺ মক্কা নগরীর চতুর্পার্শ্বে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে কিছু স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেখানে পৌঁছে মক্কাগামীদের জন্য ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব। ইহরাম বাঁধার এই স্থানগুলোকে মীকাত বলা হয়। মীকাত মোট পাঁচটি। যথা-

১. জুল হুলাইফা। এটা মদীনা থেকে মক্কা মুকার্‌রমার দিকে যাওয়ার পথে ছয় মাইল দূরত্বে একটি স্থানের নাম। যা বর্তমানে বীরে আলী নামে প্রসিদ্ধ। মক্কা মুকার্‌রমা থেকে এর দূরুত্ব নয় মাইল। এটি মদীনা বা উত্তর দিক থেকে আগতদের জন্য মীকাত।

২. জুহফা। বর্তমান নাম রাবেগ (رابغ)। এটা শাম বা সিরিয়ার দিক অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে আগমনকারীদের মীকাত।

৩. ক্বারনুল মানাযিল। নাজদের দিক অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে আগমনকারীদের মীকাত।

৪. ইয়ালামলাম। বর্তমান নাম সা'দিয়া। এটি মূলত মক্কা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। ইয়ামানের দিক অর্থাৎ দক্ষিণ দিক থেকে আগতদের জন্য এটিই মীকাত।

৫. যাতু'ইরক। এটি একটি গ্রামের নাম। বর্তমানে গ্রামটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব না হওয়ায় তার কিছু পূর্বে আফীক নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা হয়। ইরাকের দিক অর্থাৎ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগতদের জন্য এটিই মীকাত।

প্রথমোল্লিখিত চারটি মীকাত স্বয়ং রাসূল ﷺ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.

"রাসূল ﷺ মদীনাবাসীর জন্য যুল হুলাইফা, শামবাসীর জন্য জুহফা, নাজদবাসীর জন্য ক্বারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীর জন্য ইয়ালামলামকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। এসব মীকাত, মীকাত এলাকার বাসিন্দাদের জন্য এবং যারা এসব এলাকার উপর দিয়ে হজ্ব উমরার উদ্দেশ্যে আসবে তাদের জন্য। আর যারা মীকাতের ভেতরে বসবাস করে তারা তাদের ঘর থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এমনিভাবে মক্কাবাসী মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।"[১৯৫]

দিন দিন যতই ইসলামের প্রসার হচ্ছিলো, মীকাতের নির্ধারিত স্থান থেকে মানুষের দূরত্ব ততই

---

[১৯৫] সহীহ বুখারী: ১/২০৬, হাদীস নং ১৫২৬, সহীহ মুসলিম: ১/৩৭৪, হাদীস নং ১১৮১

বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। ফলে নির্ধারিত মীকাত দিয়ে প্রবেশ করা মানুষের জন্য দুষ্কর হতে থাকে। হযরত উমর রাযি.-এর যামানায় কিছু লোক এসে আবেদন করলে তিনি উল্লিখিত স্থানের বরাবর স্থানকেও মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করেন। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.

"এই দুই শহর যখন বিজিত হলো, তখন সেখানের লোকজন হযরত উমর রাযি.-এর নিকট এসে তাঁকে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন! রাসূল ﷺ নাজদবাসীর জন্য ক্বারনুল মানাযিলকে মীকাত নির্ধারণ করেছেন; কিন্তু ক্বারনুল মানাযিলের পথ আমাদের থেকে দূরে। আমরা সে পথ ধরলে আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। হযরত উমর রাযি. বললেন, তোমরা ক্বারনুল মানাযিলের বরাবর করে তোমাদের পথে একটা সীমা নির্ধারণ করো। অতঃপর তিনি তাদের জন্য যাতু ইরককে মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করলেন।"[১৯৬]

আল্লামা মোল্লা আলী কারী রাহ. বলেন-

وأعيان هذه المواقيت ليست بشرط ولهذا يصح الاحرام قبلها؛ بل الواجب عينها أو حذوها أي محاذاتها ومقابلتها عمن سلك غير ميقات أي طريقا ليس فيه ميقات معين برا أو بحرا اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقات منها أي من المواقيت المعروفة ومن حذر الأبعد أولى. فإن الأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطريق الأبعد عن مكة حتى لا يمر بشيئ مما يقال ميقاتا غير محرم، ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز باتفاق الأربعة، وإن لم يعلم المحاذاة، فإنه لايتصور عدم المحاذاة، فعلى مرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طرف البحر.

"নির্দিষ্ট মীকাতের স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে এটা জরুরী নয় (এজন্যই তো এর আগ থেকে ইহরাম বাঁধলেও চলে) সুতরাং নির্দিষ্ট মীকাতের স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব হবে যদি মীকাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করে। কেউ ভিন্ন পথ ধরলে মীকাত বরাবর স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে, জলে হোক বা স্থলে। উপরোল্লিখিত মীকাতসমূহের যেকোনো একটি থেকে ইহরাম বাঁধলেই চলবে। তবে সতর্কতামূলক উত্তম হলো প্রথম মীকাতে ইহরাম বেঁধে ফেলা। অর্থাৎ, মক্কা থেকে সবচে' দূরবর্তী মীকাতে ইহরাম বাঁধাই উত্তম (অর্থাৎ, চার মীকাত একই দূরত্বে নয়। সুতরাং দূরের মীকাত বরাবর ইহরাম বেঁধে ফেললে অন্যান্য মীকাত বরারব স্থানগুলোও ইহরাম অবস্থায় অতিক্রম করা হয়)। যাতে কোনো মীকাত ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা না হয়। হ্যাঁ, যদি মক্কার নিকটবর্তী মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধে, তাহলে চার ইমামের ঐক্যমতে জায়েয হবে। যদি মীকাতের বরাবর কতটুকু হবে জানা না থাকে, তাহলে মক্কা থেকে দুই মারহালা আগে (যেমন, জিদ্দা থেকে) ইহরাম বাঁধবে...।"[১৯৭]

প্রারম্ভিক আলোচনার পর নিম্নে আমরা পূর্বোল্লিখিত তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

---

[১৯৬] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ১৫৩১

[১৯৭] ইরশাদুস সারী ইলা মানাসিকিল মোল্লা আলী কারী: ৫৬

১. বাংলাদেশের হাজীদের মীকাত ও ইহরাম

যে সকল হাজীরা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাভা ইত্যাদি পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ থেকে সরাসরি বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে বিমানে সফর করবে তাদের মীকাত হলো- 'কারনুল মানাযিল ও যাতু'ইরক'। সাধারণত বিমান জিদ্দায় অবতরণের আধা ঘন্টা পূর্বে মীকাত অতিক্রম করে। বাইতুল্লাহগামীদের জন্য ইহরাম বাঁধা ব্যতীত এ স্থানটি অতিক্রম করা নাজায়েয।

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

لو أراد بمجاوزة هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا محرما.

"কেউ যদি মক্কায় প্রবেশের উদ্দেশে এসব মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে ইহরাম বাঁধা ছাড়া অতিক্রম করা জায়েয হবে না।"[১৯৮]

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় দেশ থেকে সমুদ্র পথে মক্কায় গমনকারীদের মীকাত হলো 'ইয়ালামলাম'। জাহাজ মূলত ইয়ালামলাম পাহড়ের বরাবর হয়ে জিদ্দায় পৌঁছে। সুতরাং সমুদ্রপথে বাইতুল্লাহর মুসাফিরদের জন্য জাহাজ ইয়ালামলাম নামক স্থানের বরাবর আসলে অথবা তার আগেই ইহরাম বেঁধে নেয়া আবশ্যক।

২. যাদের নিয়মিত বিভিন্ন প্রয়োজনে মীকাতের অভ্যন্তরে আসা-যাওয়া করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে ইহরামের বিধান

পূর্বে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে হারাম, হিল্ল এবং আফাক-এর পরিচিতি লাভ করেছি। এখানে আমরা মূলত ঐসব আফাকীদের ইহরাম বাঁধার আবশ্যিকতা সম্পর্কে আলোচনা করবো, যাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে নিয়মিত মীকাতের অভ্যন্তরে আসা-যাওয়া করতে হয়।

প্রথমেই আমাদেরকে জেনে নিতে হবে যে, আফাকী[১৯৯] অর্থাৎ যারা মীকাতের বাইরে অবস্থান করে, তারা যদি হারামের উদ্দেশ্যে মীকাতের সীমানায় প্রবেশ করতে চায়, তাহলে তাদের জন্য হানাফী ও হাম্বলী ফিকহ অনুযায়ী সর্বাবস্থায় ইহরাম বেঁধে মীকাত অতিক্রম করা জরুরী। চাই তারা হজ্ব-উমরার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করুক অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি, সেমিনার ইত্যাদি।

একাধিক হাদীস ও আসার থেকে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

---

[১৯৮] বাদায়েউস সানায়ে: ২/৩৭১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৯৯] **হারামের নিবাসীগণ** হজ্বের জন্য হারামের অভ্যন্তরে যেকোনো স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে পারবে। তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো মীকাত বা ইহরামের স্থান নেই। তবে মসজিদে হারাম অথবা নিজ ঘর থেকে ইহরাম বাঁধাই উত্তম। আর উমরার জন্য তারা 'হিল্লে সগীর' অর্থাৎ, হারামের সীমানার বাইরে মীকাতের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় গিয়ে ইহরাম বাঁধবে। হজ্ব-উমরার নিয়ত ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনে মক্কায় প্রবেশের জন্য তাদের ইহরাম বাঁধতে হবে না।

হারাম ও মীকাতের মধ্যবর্তী এলাকা তথা হিল্লে সগীরের নিবাসী এবং মীকাত এলাকার মানুষদের জন্য ইহরামের স্থান হলো তাদের আবাসস্থল। তারা হজ্ব বা উমরার নিয়ত করে থাকলে অবশ্যই হারামে প্রবেশের পূর্বে ইহরাম বাঁধবে। হজ্ব বা উমরার নিয়ত না থাকলে মক্কায় প্রবেশের জন্য তাদের ইহরামের কোনো আবশ্যিকতা নেই। ইহরাম ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে। তবে তাদের হজ্ব-উমরার উদ্দেশ্যে না থাকলে ইহরাম ছাড়াই মক্কা-মুকাররমায় প্রবেশ করতে পারবে।

لايجاوز أحد الوقت إلّا محرم.

"কেউ যেন ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম না করে।"[২০০]

আল্লামা আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخوله مكة عليه أن يحرم، قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد.

"মীকাতের বাইরের অধিবাসীরা হজ্ব বা উমরার ইচ্ছা করুক বা না করুক যদি তারা মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা নিয়ে মীকাতে পৌঁছে, তাহলে তাদেরকে ইহরাম করতে হবে।"[২০১]

আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবিরতী রাহ. বলেন-

وتعظيمها لم يختلف بالنسبة إلى الحاج وغيره.

"মক্কার পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে হাজ্বী ও গাইরে হাজ্বীর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।"[২০২]

যদি ইহরাম বাঁধা ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে তার বিধান কী হবে- এ প্রসঙ্গে ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাতে উল্লেখ আছে-

---

[২০০] (হাসান) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৮/৭০২, হাদীস নং ১৫৭০২ ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান। সনদে একজন রাবী খুসাইফ বিন আব্দুর রাহমান আল জাযারী। এ রাবী সম্পর্কে ইমামগণ থেকে দু'ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায়। কেউ তাকে প্রমাণযোগ্য বলেছেন। আবার কেউ বলেননি। ইমাম ইবনে হিব্বান রাহ. বলেন:

تركه جماعة من أئمتنا واحتج به آخرون (المجروحين)

এই কারণে হাফেয ইবনে হাজার রাহ. তাকে মুখতালাফ ফিহী আখ্যা দিয়েছেন। (আত তালখিসুল হাবীর: ৪/১৫৫৭)

ইমাম ইবনে সা'আদ, ইমাম ইবনে মাঈন, ইমাম আবু যুর'আহ, ইমাম ইজলী, ইমাম ইয়াকুব বিন সুফিয়ানসহ আরো অনেকেই তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল)

ইমাম ইবনে আদী বলেন:

وإذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي يكنى أبا الأصبغ فإن رواياته عنه بواطيل والبلاء من عبد العزيز لا من خصيف. (الكامل)

আলোচ্য সনদে খুসাইফ থেকে বর্ণনাকারী হলেন, আব্দুস সালাম বিন হারব। তিনি একজন ছেকাহ রাবী। সুতরাং ইবনে আদীর বক্তব্য অনুসারে তার হাদীসে আর কোনো আপত্তি নেই। ইমাম আহমদ রাহ. সহ যারা খুসাইফকে দুর্বল বলেছেন, হতে পারে তারা খুসাইফের শাগরিদের কারণে যে ভুলগুলো হয়েছে তার কারণে বলেছেন। আর এখানে খুসাইফের একাধিক শাহেদ রয়েছে। সুতরাং স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার আপত্তি প্রভাবক নয়।

এছাড়া আবু হাতেম রাহ. যে ইখতিলাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তা এখনে প্রভাবক হবে না। কারণ, খুসাইফ ইন্তিকাল করেছেন মতান্তরে ১৩২/১৩৬/১৩৭/১৩৮ হিজরীতে (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা- খুসাইফ) আর তার উস্তায সাঈদের ইন্তিকাল হয়েছে ৯৫ হিজরীতে। সহজেই বোঝা যাচ্ছে, খুসাইফ ইখতিলাতের বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই হাদীস শুনেছেন।

মোটকথা, সনদ সহীহ। এ সনদে সাঈদ বিন যুবায়র রাহ. সাহাবীর নাম উল্লেখ না করলেও খুব সম্ভব তিনি ইবনে আব্বাস থেকেই বর্ণনা করেন। তিনি ইবনে আব্বাস থেকে অনেক হাদীসই মুরসাল বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রাহ. বলেন:

سمعت محمد بن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو مسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم. (سنن أبي داود: ١٣٠٢)

[২০১] আল হিদায়া: ১/২৩৫, মাকতাবাতুল ইসলামিয়া

[২০২] আল ইনায়া: ২/৪৩৩, (ফাতহুল কাদীরের সাথে), মাকতাবায়ে যাকরিয়া

إذا دخل الآفاقي مكة بغير إحرام وهو لا يريد الحج والعمرة، فعليه لدخول مكة إما حجة أو عمرة، فإن أحرم بالحج أو العمرة من غير أن يرجع إلى الميقات؛ فعليه دم لترك حق الميقات.... ولو جاوز الميقات قاصدا مكة بغير إحرام مرارا فإنه يجب عليه لكل مرة إما حجة أو عمرة.

"যদি আফাকী (দূর দিগন্তের লোকজন) হজ্ব উমরার ইচ্ছা ব্যতীত ইহরাম না করে মক্কায় প্রবেশ করে ফেলে, তাহলে বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তার উপর একটি হজ্ব অথবা উমরা আবশ্যক হবে। (এ অবস্থায় তার জন্য জরুরী হলো, মীকাতে ফিরে গিয়ে পুনরায় ইহরাম বাঁধা) যদি মীকাতে ফিরে না গিয়ে হজ্ব অথবা উমরার ইহরাম করে ফেলে, তাহলে মীকাতের হক নষ্ট করার করণে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।... যদি বারবার মক্কার উদ্দেশে ইহরামবিহীন মীকাত অতিক্রম করে, তাহলে প্রত্যেকবারের জন্য তার উপর একটি হজ্ব অথবা উমরা আবশ্যক হবে।"[২০৩]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, আফাকীদের জন্য সাধারণ অবস্থায় ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নয়। চাই তারা হজ্ব-উমরার উদ্দেশ্যে অতিক্রম করুক অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। এমনিভাবে মীকাতের ভিতরে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি যদি মীকাতের বাইরে আসে, তার ক্ষেত্রেও আফাকীর বিধান প্রযোজ্য হবে।

কিন্তু ঐ সব লোকের বিধান ব্যতিক্রম, যাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জরুরী প্রয়োজনে মীকাতের ভেতরে-বাইরে আসা-যাওয়া করতে হয়। কেননা যদি তাদের উপর বারবার ইহরাম বাঁধার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, তাহলে তাদের জন্য তা খুব কষ্টকর হয়ে যাবে।[২০৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, মীকাতের বাইরে থেকে লাকড়ি সংগ্রহকারী বা আয়-উপার্জনকারী যারা বারবার আসা-যাওয়া করে, তাদের জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করার অনুমতি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন-

لا يدخل مكة أحد بغير إحرام إلا الحطابون العجالون وأصحاب منافعها.

"(মীকাতের আশেপাশে অবস্থানকারী) লাকড়িওয়ালা (যারা মক্কাবাসীর কাছে জ্বালানি কাঠ বিক্রয় করতো) এবং যাদের স্থাবর-অস্থাবর কোনো সম্পত্তি বা উপার্জন মক্কার সাথে সংশ্লিষ্ট,

---

[২০৩] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ১/৩১৭-৩১৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[২০৪] এ ধরনের সমস্যার কারণেই মীকাত এলাকা এবং হিল্লে সগীরের বাসিন্দাদের জন্য হজ্ব-উমরা ছাড়া অন্য কোনো কারণে হারামে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ইহরাম ওয়াজিব করা হয়নি। আল্লামা আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন:

"ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته " لأنه يكثر دخوله مكة وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فصار كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لحاجتهم بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج.

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন:

ولأن مصالح أهل البستان تتعلق بمكة فيحتاجون إلى الدخول في كل وقت، فلو منعوا من الدخول إلا بإحرام لوقعوا في الحرج، وأنه منفي شرعا....ولو خرج من الحرم إلى الحل ولم يجاوز الميقات ثم أراد أن يعود إلى مكة، له أن يعود إليها من غير إحرام؛ لأن أهل مكة يحتاجون إلى الخروج إلى الحل للاحتطاب والاحتشاش والعود إليها، فلو ألزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرج.

তারা ছাড়া কেউ যেন ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ না করে।"[২০৫]
আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ. বলেন-

لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بالإحرام فإن لم يفعل أساء، ولا شيء عليه عند الشافعي وأبي ثور وعند أبي حنيفة عليه حجة أو عمرة.

وقال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار في الحطابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يأمرون بذلك لما عليهم من المشقة.

"মীকাতের ওপাশ থেকে শুরু করে দূর-দূরান্তের কারো জন্য ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ নয়। যদি ইহরাম ছাড়া প্রবেশ করে, তাহলে গুনাহগার হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী এবং আবু সাওর রাহ.-এর মতে তার উপর প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কোনো কিছু আবশ্যক হবে না। আর ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর মতে তার উপর একটি হজ্ব অথবা উমরা ওয়াজিব হবে।
আবু উমর রাহ. বলেন, আমার মতে, ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, লাকড়ি সংগ্রহকারী এবং যারা নিয়মিত মক্কায় যাতায়াত করে থাকে, তাদের উপর ইহরামের সাধারণ বিধান আরোপ করা হবে না। কারণ, এতে তাদের মারাত্মক কষ্ট হবে।"[২০৬]
আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী রাহ. বলেন-

ثم قال أبو حنيفة رحمه الله: من مرّ على الميقات مريدا مكة يجب عليه الإحرام أراد الحج أو العمرة أو لا إلا الحطابين أو الحشاشين.

"যে ব্যক্তি হজ্ব অথবা উমরার উদ্দেশ্যে মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় গমন করবে, তার উপর ইহরাম ওয়াজিব। তবে লাকড়ি অথবা ঘাস সংগ্রহকারীগণ ব্যতীত।"[২০৭]
আল্লামা যাকারিয়া কান্ধলভী রাহ. বলেন-[২০৮]

وأما المجاوزة للميقات ممن لا يريد النسك فعلى قسمين..... القسم الثاني: من يريد دخول الحرم إما إلى مكة أو غيرها، فهم على ثلاثة أضرب، أحدهما من يدخلها لقتال مباح أو خوف أو لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب وناقل الميرة، ومن كانت له صنعة يتكرر دخوله وخروجه إليها فهؤلاء لا إحرام عليهم.

"হজ্ব আদায়ের অভিপ্রায় ছাড়া মীকাত অতিক্রমকারী দুই ধরনের হতে পারে।...দ্বিতীয় প্রকার: যারা মক্কা অথবা অন্য কোনো স্থানের উদ্দেশে হারামের ভেতর প্রবেশের ইচ্ছা করেছে। এদের মধ্যে যারা সেখানে শরী'আতসম্মত যুদ্ধ বা ভয়ের কারণে প্রবেশ করে, অথবা যারা নিত্যপ্রয়োজনে বারবার প্রবেশ করে, যেমন, ঘাস কাঠ সংগ্রহকারী এবং যার কর্মস্থল সেখানে হওয়ায় বারবার যাতায়াত করতে হয়- এ ধরনের লোকদের উপর ইহরামের বিধান নেই।"[২০৯]

---

[২০৫] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৮/২২৭, হাদীস নং ১৩৬৯১, ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান, শরহু মা'আনিল আসার: ১/৪৬১ হাদীস নং ৪০৮৭, আত তালখীসুল হাবীর: ২২৪৩, হাদীস নং ১০০৮
[২০৬] উমদাতুল ক্বারী: ৭/৫৩৫, দারুল ফিকর
[২০৭] আল আরফুশ শাযী: ২/২২৯, (باب ما جاء في مواقيت الإحرام للآفاقي)
[২০৮] তিনি অন্য একস্থানে বলেন: كره الأكثر دخولها بلا إحرام ورخصوا للحطابين ومن أشبههم.
[২০৯] আওজাযুল মাসালিক: ৩/৭৩১

এসব বিষয়কে সামনে রেখে বর্তমানে মুফতিয়ানে কেরাম বলেছেন যে, যাদের (হজ্ব-উমরা ছাড়া) নিত্যপ্রয়োজনে প্রতিদিন মীকাতের ভেতরে বাইরে আসা-যাওয়া করতে হয়, তাদের জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রমের সুযোগ রয়েছে।

ইসলামিক ফিকহ একাডেমি-ইন্ডিয়ার হজ্বের মাসাইল সংক্রান্ত এক সেমিনারে বিষয়টি উত্থাপন করা হলে প্রায় সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। ইসলামিক ফিকহ একাডেমি-ইন্ডিয়ার এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়:

حدود میقات سے باہر رہنے والے ہوں یا مکہ اور حل میں رہنے والے، اگر حدود میقات کے باہر سے مکہ کی نیت کر کے میقات سے آگے بڑھیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ احرام باندھ کر ہی میقات سے آگے بڑھیں، خواہ وہ حج اور عمرہ کی نیت سے جائیں یا کسی اور مقصد سے۔

موجودہ حالات میں جبکہ تجار، دفاتر میں کام کرنے والے، ٹیکسی چلانے والے اور دیگر پیشہ وارانہ کام کرنے والے کبھی ہر روز، کبھی ہر دوسرے، تیسرے دن اور بعض لوگوں کو تو ایک دن میں ایک سے زیادہ دفعہ حرم میں داخل ہونا پڑتا ہے، ایسی حالت میں اس طرح کے لوگوں کو ہر بار احرام اور اداء عمرہ کی پابندی بے حد مشقت طلب اور دشوار ہے، اس لئے ان حضرات کے لئے بغیر احرام باندھے حدود حرم میں داخلہ کی گنجائش ہوگی۔

"হারামের এরিয়ার বাইরের বাসিন্দা হোক বা মক্কা এবং হিল্লের বাসিন্দা হোক, যদি হারামের এরিয়ার বাহির থেকে মক্কায় প্রবেশের নিয়তে মীকাত থেকে সামনে অগ্রসর হতে চায়, তাহলে তাদের জন্য অপরিহার্য হলো যে, তারা ইহরাম পরেই সামনে অগ্রসর হবে। চাই হজ্ব-উমরার উদ্দেশ্যে যাক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে। বর্তমানে ব্যবসায়ী, বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা, টেক্সি চালকসহ নানা পেশার মানুষ কখনও প্রতিদিন, কখনও দুই তিনদিন পরপর, এমন কি করো কারো তো দিনে কয়েকবার পর্যন্ত হারামে প্রবেশ করতে হয়। এমতাবস্থায় এ ধরনের লোকদের পক্ষে প্রতিবার প্রবেশের সময় ইহরামের পাবন্দি করা সীমাহীন কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য ঐ সব লোকদের জন্য ইহরাম পরা ব্যতীতই হারামে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে।"[২১০]

জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামীয়া, বিন্নুরী টাউন থেকে প্রকাশিত ফাতওয়ায় এমনই বলা হয়েছে:

واضح رہے کہ اگر کوئی عاقل بالغ مرد یا عورت جو میقات سے باہر رہنے والا ہے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، خواہ حج یا عمرہ کی نیت سے یا کسی اور غرض سے تو اس پر میقات سے احرام باندھنا لازم ہے، اور اگر بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا تو گناہ گار ہوگا اور اس کو میقات پر دوبارہ آکر احرام باندھنا واجب ہے، اگر دوبارہ میقات پر نہیں آیا تو اس پر ایک دم لازم ہوجائے گا۔ لہٰذا صورتِ مسئولہ میں جو شخص احرام کے بغیر مکہ مکرمہ چلاجائے تو اس پر حج یا عمرہ اور ایک دم لازم ہوگا اور اگر کئی بار احرام کے بغیر میقات گزر جائے تو ہر بار ایک حج یا عمرہ واجب ہوگا اور ایک دم بھی واجب ہوگا۔ البتہ ڈرائیور، تاجر، دفاتر میں کام کرنے والے اور دیگر پیشہ وارانہ کام کرنے والے جنہیں ہر دوسرے تیسرے دن، کبھی ہر روز اور بسا اوقات ایک

[২১০] জাদিদ ফিকহী মাবাহিছ: ১৩/৫৯৮, ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান

دن میں کئی بار حرم میں داخل ہونا پڑتا ہے، ایسے لوگوں پر ہربار حرم میں داخلہ کے لیے احرام کی پابندی بے حد مشکل اور دشوار ہے، اس لیے ان حضرات کے لیے احرام کے بغیر بھی حرم کے حدود میں داخل ہونے کی گنجائش ہے، دم دینا یا عمرہ کرنا لازم نہیں ہے، اگرچہ احرام باندھ کر آنا بہتر ہے۔اور جو لوگ روزانہ نہیں آتے، کبھی کبھار آتے ہیں، اُن کے لیے احرام باندھ کر آنا لازم ہے۔ احرام کے بغیر حرم میں داخل ہونے کی صورت میں ایک حج یا عمرہ واجب ہوگا اور ایک دم بھی واجب ہوگا۔ [২১১]

মাওলানা আশেকে এলাহী বুলন্দশহরী রাহ. বলেন-

لو سومح في ذلك لمن يحتاج إلى الدخول متكرراً لكسب ما يحتاج إليه من نفقة عياله كالسواقين قياسا على الحطابين لكان له وجه.

"গাড়ির ড্রাইভারসহ যাদের প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জনের তাকীদে হারামে বারবার প্রবেশ করতে হয়, তাদের জন্য ইহরামের পাবন্দির ক্ষেত্রে হারাম এলাকা থেকে লাকড়ি সংগ্রহকারীদের সাথে তুলনা করে শিথিলতা করা হলে এরও যৌক্তিকতা রয়েছে।"[২১২]

এ ধরনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিথিলতা শরী'আতের একটি স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر.

"আল্লাহ তোমাদের পক্ষে যা সহজ সেটাই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা চান না।"[২১৩]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

ماجعل عليكم في الدين من حرج.

"তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।"[২১৪]

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

لأن الضرورة سبب لتخفيف الحكم وتيسيره.

"নিশ্চয় জরুরত শর'য়ী বিধিবিধানে সহজতার কারণ হয়।"[২১৫]

এখানে উল্লেখ্য যে, আফাকীগণ হারাম শরীফে প্রবেশের উদ্দেশ্য না থাকলে ইহরাম ছাড়াই মীকাতের অভ্যন্তরে হিল্ল-এ প্রবেশ করতে পারবে। হিল্ল-এ প্রবেশের পর তাদের ইহরামের ক্ষেত্রে হিল্লবাসীদের বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, যদি হিল্ল-এ প্রবেশের পর হজ্ব-উমরার উদ্দেশ্যে হারামে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে হিল্ল-এর যেকোনো স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আর যদি হজ্ব-উমরাহ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে হারামে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে হিল্লবাসীদের মতো তাদেরও ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়।

---

[২১১] জামেয়ার ফাতওয়া বিভাগের ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য (بلااحرام باربار حرم جانے والے کاحکم)

[২১২] আত তাসহীলুয যরূরী আলা মুখতাসারিল কুদূরী (কিতাবুল হজ্ব)

[২১৩] সূরা বাকারা: ১৮৫

[২১৪] সূরা হজ্ব: ৭৮

[২১৫] বাদায়েউস সানায়ে: ২/৩৬২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة، حل له مجاوزته بلا إحرام، فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام، وهو الحيلة لمريد ذلك إلا لمأمور بالحج للمخالفة.

"আর যদি হিল্ল-এর কোনো স্থান যেমন খুলাইস, জিদ্দা ইত্যাদিতে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তাহলে তার জন্য ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়েয। সেখানে পৌঁছার পর সে সেখানকার অধিবাসী বলে গণ্য হবে। সুতরাং তখন তার জন্য ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশের অনুমতি থাকবে। এটা একটা কৌশল। তবে হজ্ব ফরয এমন ব্যক্তির জন্য এ পন্থা অবলম্বনের সুযোগ নেই।"[২১৬]

৩. ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের চেহারার পর্দার বিধান

ইহরাম অবস্থায়ও পরপুরুষের সামনে মহিলাদের চেহারার পর্দা করা জরুরী। যেহেতু নারী-পুরুষ সকলের জন্যই এ অবস্থায় চেহারায় কাপড় লাগানো নিষেধ, তাই অনেক মহিলা মনে করে যে, ইহরাম বাঁধার পর চেহারা খোলা রাখতে হবে। চেহারা পর্দা করা যবে না। ফলে পর্দানশীন মা-বোনদের অনেককেই পুরো হজ্বের সফরে ইহরাম অবস্থায় চেহারা খুলে চলাফেরা করতে দেখা যায়। অথচ এই ধারণা ঠিক নয়। মুখে কাপড় না লাগানো এবং গায়রে মাহরামের সামনে ইচ্ছা করে মুখ খোলা রাখা এক বিষয় নয়।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فاذا جاوزونا كشفناه.

"আমরা রাসূল সা. এর সাথে হজ্বের সফরে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। সওয়ারির আরোহীরা আমাদের পাশ দিয়ে চলে যেতো। তারা যখন কাছাকাছি আসতো আমরা মাথার উপর থেকে চেহারার উপর কাপড় ছেড়ে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার চেহারা খুলতাম।"[২১৭]

চেহারায় কাপড়ের স্পর্শ ছাড়াও চেহারার পর্দা করা সম্ভব। এজন্য আজকাল মাথার ক্যাপ পাওয়া যায়, যা পরিধান করলে মুখের পর্দাও হয়ে যায়, আবার মুখে কাপড় না লাগানোর উপরও আমল হয়ে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, ক্যাপের উপর দিয়ে নেকাব পরিধান করলে বাতাসে কিংবা চলাফেরার সময় অনেক ক্ষেত্রে নেকাবের কাপড় চেহারায় লেগে যায়। এতে অনেকে বিব্রত হন যে, না জানি ইহরাম পরিপন্থী কাজ হয়ে গেলো কি না। কিন্তু মাসআলা হলো, এত অল্প[২১৮] সময় লাগলে

---

[২১৬] আদ্দুররুল মুখতার: ৩/৫৫২, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[২১৭] (হাসান) সুনানু আবী দাউদ: ১/২৫৪, হাদীস নং ১৮৩৩, মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং ২৪০২১। সনদের একজন রাবী ইয়াযীদ বিন আবু যিয়াদ। তিনি নির্ভরযোগ্য। তাকে দুর্বল বলা সঠিক নয়। দ্র. আপনার নামায ৩৫৯-৩৬১, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার টিকা ৭১৩

[২১৮] হ্যাঁ, পূর্ণ এক ঘণ্টা থেকে ১২ ঘণ্টার কম সময় লেগে থাকলে পৌনে দুই কেজি গম বা তার মূল সাদকা দিতে হবে। আর ১২ ঘণ্টা লেগে থাকলে একটি দম (ছাগল বা দুম্বা জবাই করা) ওয়াজিব। (আওজাযুল মাসালিক ৬/১৯৫)

কোনো অসুবিধা হয় না। তাই এই পন্থা অবলম্বন করে হলেও চেহারার পর্দা করা জরুরী।[২১৯] যদি চেহারা থেকে কাপড় পৃথক রাখার কোনো ব্যবস্থা করা না যায় অথবা বাতাসে চেহারা থেকে কাপড় সরে যায়, তাহলে পর্দার নেকাব বা রুমাল দিয়ে চেহারা ঢেকে নিবে এবং পুরুষ সরে গেলে চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে ফেলবে। এমতাবস্থায় লাগাতার পূর্ণ এক ঘণ্টা থেকে বার ঘণ্টার কম সময় পর্যন্ত চেহারায় কাপড় লেগে থাকলে পৌনে দুই কেজি গম বা তার মূল্য সাদকা করতে হবে। তবে পর্দা করার প্রয়োজন না হলে চেহারায় কাপড় লাগাবে না।[২২০]

কা'বা চত্বরে নামাযরত ব্যক্তির সামনে চলাচল ও তাওয়াফ

নামাযরত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার একান্ত সান্নিধ্যে তাঁর সাথেই মুনাজাতরত থাকে। আল্লাহ তা'আলার ধ্যান, স্মরণ ও নিবিষ্টতা নামাযের প্রাণ। এজন্য নামাযী ব্যক্তির একেবারে সামনে দিয়ে চলাফেরা করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। হযরত আবু জুহাইম ইবনে হারিস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه» قال أبو النضر: لا أدري، أقال أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة.

"যদি নামায আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো তার কী ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ঐ মুসল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন) দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য শ্রেয় মনে করতো। রাবী আবুন নজর বলেন, আমার মনে নেই চল্লিশ কী? দিনের কথা বলেছেন, না মাসের কথা বলেছেন, না বছরের কথা।"[২২১]

ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নামাযীর সরাসরি সামনে অতিক্রমের সুযোগ না থাকার জন্য শরী'আত মুসল্লীকে তার সামনে 'সুতরা' রাখার নির্দেশ দিয়েছে।

হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه.

"তোমাদের কেউ (খোলা স্থান বা চলাচলের স্থানে) নামাযে দাঁড়ালে যেন সুতরা ব্যবহার করে এবং সুতরার কাছাকাছি দাঁড়ায় এবং কাউকে যেন তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সুযোগ না দেয়।"[২২২]

হযরত সাবরাহ ইবনে মা'বাদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم

"সামনে একটা তীর গেঁথে দিয়ে হলেও সুতরা গ্রহণ করো।"[২২৩]

এক্ষেত্রে এটি হলো সাধারণ বিধান। তবে মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে সরাসরি কা'বাকে

---

[২১৯] সুনানু আবী দাউদ: ১/৫৫৪, মুসনাদে আহমাদ: হাদীস নং: ২২৮৯৪ ও ২৩৯১১, মুয়াত্তা মালেক: পৃ. ১২৭, মুসান্নফে ইবনে আবী শাইবা: ১৪৫৩৯, ১৪৫৪০, রদ্দুল মুহতার: ২/৪৮৮,৫২৯

[২২০] (আওজাযুল মাসালিক ৬/১৯৫)

[২২১] সহীহ বুখারী: ১/৭৩ হাদীস নং ৫১০, সহীহ মুসলিম: ১/১৯৭, হাদীস নং ৫০৭

[২২২] সহীহ বুখারী: ১/৫৮২, ফাতহুল বারী, সালাফিয়্যাহ, সহীহ মুসলিম: ১/৩৬৩

[২২৩] (সহীহ) মুসনাদে আহমদ: ৩/৪০৪, আল মু'জামুল কাবীর লিত তাবরানী: ৭/১৩৪। আল্লামা নুরুদ্দীন হাইসামী রাহ. বলেন: (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/৫৮, কুদসী): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

সামনে নিয়ে নামায পড়ার ক্ষেত্রে বিধান কিছুটা ভিন্ন। সরাসরি কা'বাকে সামনে রেখে নামায পড়ার ক্ষেত্রে কা'বার সাথে মুসল্লীর এমন সম্পর্ক থাকে যে, কারো অতিক্রম করার দ্বারা তাতে ছেদ পড়ে না। আর মসজিদে হারামে সারা বিশ্বের মুসলমানদের সমাগম হয়ে থাকে। এখানে মুসল্লীদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে বাঁধা দিলে ব্যাপক সমস্যা হতে পারে। তাই কা'বা চত্বরে মুসল্লীর সামনে অতিক্রমের ব্যাপারে শরী'আতে ছাড় রাখা হয়েছে।[২২৪]

হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার চত্বরে সুতরা ছাড়াই নামায পড়েছেন। এ অবস্থায় তাঁর সামনে মানুষ যাতায়াত করছিল। হযরত মুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদা'আহ রাযি. হতে বর্ণিত আছে-

أنه رأى النبي ﷺ «يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة»

"তিনি নবী ﷺ কে দেখেছেন, তিনি বনী সাহম-এর দরজার পাশে নামাযে দাঁড়িয়েছেন, আর লোকজন তাঁর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। অথচ তিনি এবং তাদের মাঝে কোনো সুতরা নেই।"[২২৫]

বিশেষত তাওয়াফের ক্ষেত্রে এই অনুমতি থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ, হাদীসে এসেছে যে, তাওয়াফ নামাযের মতোই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.

"বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা নামাযের মতোই। তবে তাওয়াফের মাঝে কথা বলা যায়। অতএব তওয়াফকালে কেউ কথা বললে যাতে উত্তম কথাই বলে।"[২২৬]

---

[২২৪] ফিকহে ইসলামীর সংকলনে এটি একটি দুর্লভ বিধান। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহ. বলেন: (ফয়জুল বারী, হাদীস নং ৪৯৭, ২/১১০):

قال الطحاوي في مشكله إنه لا بأس بمرور الطائفين أمام المصلي عند البيت لأن الطواف بالبيت صلاة، ولا توجد تلك المسألة في المذاهب الأربعة إلا عند الطحاوي. وهذا الباب ناظر إليها إلا أن الصلاة في الحديث كانت على نحو ميل من مكة، ومسألة الطحاوي في داخل المسجد. وكانت تلك المسألة مهمة فتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى وترجم عليها.

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ.ও এ বিধানকে 'দুর্লভ মাসআলা'র শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। তিনি 'মিনহাতুল খালিক' -এ বিধানটি উদ্ধৃত করে তা বিশেষভাবে সংরক্ষণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন (রদ্দুল মুহতার ২/৫০২):

مطلب في عدم منع المار بين يدي المصلي عند الكعبة.

(تنبيه) قال العلامة قطب الدين في منسكه رأيت بخط بعض تلامذة الكمال بن الهمام في حاشية الفتح إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع المار لهذا الحديث، وهو محمول على الطائفين لأن الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين اهـ وقال ثم رأيت في البحر العميق حكى عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاوي أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز. اهـ. قلت: وهذا فرع غريب.

[২২৫] (হাদীস সহীহ) سنن أبي داود: ১/২৭৬ হাদীস নং ২০১৬, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২৭২৪১, সহীহ ইবনে খুযাইমা: হাদীস নং ৮১৫, সহীহ ইবনে হিব্বান: হাদীস নং ২৩৬৩, হাকেম সহীহ বলেছেন ১/১৫৪, যাহাবী সমর্থন করেছেন। এছাড়াও আরো অনেকে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলেছেন। সুতরাং তাবেঈর ইরহামের কারণে দুর্বল বলা যাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

[২২৬] (সহীহ) সুনানুত তিরমিযী: ১/১৯০, হাদীস নং ৯৬০, সহীহ ইবনে খুযাইমা: হাদীস নং ২৭৩৯, সহীহ ইবনে হিব্বান: হাদীস নং ৩৮৩৬

ইমাম আবু জা'ফর তহাবী রাহ. 'মুশকিলুল আসার'-এ হযরত মুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদা'আহ রাযি.-এর হাদীসটি উল্লেখ করে সুতরার সাধারণ বিধান সম্বলিত হাদীস এবং উক্ত হাদীসের মাঝে সমন্বয়মূলক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। নিম্নে সংশ্লিষ্ট অংশ উল্লেখ করা হলো। ইমাম তহাবী রাহ. বলেন-

أن هذا مما لا تضاد فيه؛ لأن ما رويناه عن المطلب مما ذكر على حكم الصلاة إلى الكعبة بمعاينتها، والآثار الأخر على الصلاة بتحري الكعبة وبالغيبة عنها، وقد وجدنا الصلاة إلى الكعبة بالمعاينة لها يصلي الناس من جوانبها فيستقبل بعضهم وجوه بعض فيكون ذلك طلقا لهم غير مكروه، ورأينا الصلاة بخلاف ذلك المكان مما لا معاينة فيه للكعبة بخلاف ذلك في كراهة استقبال وجوه الرجال بعضهم بعضا، وفي الزجر عن ذلك، والمنع منه، فعقلنا بذلك أن الكعبة مخصوصة بهذا الحكم في الصلاة إليها، وفي الإطلاق للناس استقبال وجوه المصلين معهم إليها والاستقبال لحدودهم في صلاتهم إليها، وإن كان ذلك كذلك في صلاتهم إليها اتسع لهم بذلك مرورهم بين أيديهم في صلاتهم إليها واستقبالهم إياهم في ذلك بوجوههم وبحدودهم، وعقلنا أن الصلاة في الغيبة عنها بخلاف ذلك، وأنه لما كان استقبال الناس بعضهم بعضا بوجوههم وبحدودهم فيها ممنوعا منه ضاق عليهم مرورهم بهم فيها، وضاق على المصلين إطلاق ذلك لهم فيها، فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضاد في شيء مما ذكرناه في هذا الباب، وأن كل واحد من المعنيين اللذين ذكرناهما فيه بائن بحكمه من المعنى الآخر منهما، والله نسأله التوفيق.

"এখানে কোনো স্ববিরোধিতা নেই। ... আমরা দেখতে পাই, সরাসরি কা'বাকে সামনে নিয়ে নামায পড়ার সময় মানুষ কা'বার চারপাশ থেকে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে নামায পড়ে। সেখানে এভাবে মুখোমুখি হয়ে নামাযে দাঁড়ানো মাকরূহ নয়। অথচ যেখান থেকে কা'বাকে সরাসরি দেখা যায় না, সেখানে এর ব্যতিক্রম; বরং সেখানে এ বিষয়ে ধমক দেয়া হয়েছে এবং নিষেধ করা হয়েছে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, সরাসরি কা'বার অভিমুখী হয়ে নামায পড়ার বিষয়টা একটু ভিন্ন, সাধারণ হুকুমের ব্যতিক্রম।... সে হিসেবে কা'বা চত্বরে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমের বিষয়টাতেও শিথিলতা অবলম্বন করা হয়েছে।..."[২২৭]

এখানে উল্লেখ্য যে, এ বিধান শুধু মসজিদে হারামের সাথে সম্পৃক্ত। মসজিদে নববীতে মুসল্লীর সামনে অতিক্রম করার হুকুম অন্যান্য স্থানের মতোই। তাই সেখানে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

হজ্ব: প্রচলিত ভুল ধারণা ও আমল

এমনিতেই হজ্বের আমলগুলো অন্যান্য ইবাদতের থেকে কিছুটা কঠিন। এছাড়াও উদাসীনতা ও অজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। নিম্নে হজ্ব বিষয়ক কিছু ভুল ধারণা ও আমলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছে। যাতে হাজ্বী সাহেবান এসব ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেঁচে সুষ্ঠুরূপে হজ্ব আদায় করতে সক্ষম হন।

ইহরাম সংক্রান্ত ভুল

---

[২২৭] শরহু মুশকিলিল আছার: ৭/২৮-২৯, দারুর রিসালাতিল ইলমিয়্যাহ

১. ইহরাম বাঁধার আগে দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু অনেকে এ মুস্তাহাব আমলের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে ফেলেন। এটা মারাত্মক ভুল কাজ। অথচ ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নয়। হয়তো তারা মনে করেন যে, ইহরামের নামায ছাড়া ইহরাম শুদ্ধ হবে না। অথচ এটি একটি ভুল ধারণা। সুতরাং ইহরামের আগে দুই রাকাত নামায পড়ার সুযোগ না পেলেও ইহরাম বাঁধতে বিলম্ব করা উচিত নয়।[২২৮]

২. ইহরামের নামায অনেক মানুষ খালি মাথায় আদায় করে। অথচ ইহরামের নামায ইহরামের অবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহরাম শুরু হয় নামাযের পর ইহরামের নিয়তে তালবিয়া পড়ার মাধ্যমে। এ জন্য স্বাভাবিক নিয়মে মাথায় টুপি দিয়ে নামায আদায় করা উচিত। সালাম ফিরানোর পর টুপি খুলে নিয়ত করে তালবিয়া পড়বে।

৩. অনেকে মনে করে যে, ইহরামের কাপড় পরিধান করে নামায পড়ার পর নিয়ত করলেই ইহরাম হয়ে যায়। এটা ভুল ধারণা। ইহরামের জন্য যেমন (হজ্ব বা উমরার) মনে মনে নিয়ত করা জরুরী, তেমনি মৌখিকভাবে তালবিয়া পড়াও জরুরী।[২২৯]

৪. অনেকে মনে করে, যে কাপড়ে ইহরাম বাঁধা হয়েছে সে কাপড় হালাল (ইহরাম শেষ) হওয়ার আগ পর্যন্ত তা পরিবর্তন করা যাবে না। এটা ভুল ধারণা।[২৩০]

৫. অনেক হাজী সাহেব ইহরামের শুরু থেকেই ইযতিবা (বাম কাঁধের উপর চাদর রেখে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে পরিধান করা) করে থাকেন। এ হালতে তারা নামাযও পড়েন। অথচ এভাবে নামায পড়লে নামায মাকরূহ হবে।[২৩১] আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইযতিবা শুধু ঐ তাওয়াফের মধ্যে সুন্নাত যার পরে সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করতে হয়।

৬. বাইতুল্লাহর দেয়ালে ও গিলাফে নিচ থেকে প্রায় ৭/৮ ফুট পরিমাণ চতুর্দিকেই সুগন্ধি লাগানো থাকে, তাই যে কোনো অংশে হাত লাগানোর দ্বারা হাতে সুগন্ধি লেগে যায়, যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। তাই ইহরাম অবস্থায় গিলাফে বা কা'বা ঘরে হাত দিবে না। এ সময় আবেগের বশবর্তী না হয়ে হুঁশকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। একটু সতর্ক হলেই এ বড় ভুল থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।[২৩২]

৭. অনেক মানুষ ইহরামের কাপড় নাভির নিচে বাঁধে; অথচ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর হওয়ায় তা সর্বাবস্থায় ঢেকে রাখা ওয়াজিব এবং তা খুলে রাখা হারাম ও কবিরা গুনাহ। এ ব্যাপারে অনেক হাজ্বী ভাইদের মাঝে অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

৮. কেউ কেউ ইহরামের কাপড় না পরে বিমানে উঠে যায়। বিমানের মধ্যে যেহেতু পরিধানের কাপড় বদলিয়ে ইহরামের কাপড় পরা কষ্টকর হয় কিংবা কাপড় লাগেজে থেকে যায়, তাই তারা সেলাইবিহীন কাপড় পরতে না পারার কারণে ইহরাম বিলম্বিত করতে থাকে। এমনকি ইহরাম ছাড়াই মীকাত অতিক্রম করে ফেলে। ফলে দম ওয়াজিব হয়ে যায়। অথচ মীকাত অতিক্রমের

---

[২২৮] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাঃ হাদীস নং ১২৯০০, মানাসিকে মোল্লা আলী কারী, পৃ. ৯৮, রদ্দুল মুহতারঃ ১/৪৮১-৪৮২

[২২৯] সুনানুত তিরমিযীঃ ১/১০২, মানাসিকে মোল্লা আলী কারী, পৃ. ৮৯

[২৩০] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাঃ হাদীস নং ১৫০১০-১৫০১১, মানাসিকে মোল্লা আলী কারী, পৃ. ৭১

[২৩১] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাঃ ১/২২৫, মানাসিকে মোল্লা আলী কারী, পৃ. ১২৯

[২৩২] সহীহ মুসলিমঃ ১/৩৭৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়্যাঃ ১/১২৪, আল মুগনী ইবনে কুদামাঃ ৫/১৪০, আদ্দুররুল মুখতারঃ ২/৪৮৭, আল কাউসার, নভেম্বর ২০০৯

আগে সেলাইযুক্ত কাপড়ের অবস্থায়ই যদি ইহরাম বেঁধে নিত এবং গাড়ি বা বিমান থেকে অবতরণের পরই ইহরামের কাপড় পরে নিত তবে তার অন্যায়টা দম ওয়াজিব হওয়ার মতো বড় হত না। ইহরাম অবস্থায় এ কয়েক ঘণ্টা (১২ ঘণ্টার কম) সেলাই করা কাপড় পরে থাকার কারণে একটি পূর্ণ সাদকা ফিতর আদায় করে দিলেই চলত।[২৩৩]

৯. অনেকের ধারণা যে, ইহরাম অবস্থায় হজ্বের কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগ পর্যন্ত মীকাত থেকে বের হওয়া যায় না। এটা ভুল ধারণা। ইহরাম অবস্থায়ও মীকাত থেকে বের হওয়া যায়। এতে ইহরামের কোনো ক্ষতি হয় না। তবে হ্যাঁ, বিনা প্রয়োজনে মীকাতের বাইরে যাওয়া ঠিক নয়।[২৩৪]

তাওয়াফ সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি

১০. অনেক হাজী সাহেব অযু ছাড়াই তাওয়াফ করে। অথচ কোনো তাওয়াফই অযু ছাড়া করা জায়েয নয়। অযু ছাড়া তাওয়াফ করলে ক্ষেত্র অনুযায়ী দম বা ফিতরা আসবে। তবে পুনরায় তাওয়াফ করলে দম বা ফিতরা দিতে হবে না।

১১. আমরা জানি, হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করা ওয়াজিব। তবে অনেকে হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মাঝে দাঁড়িয়ে তাওয়াফ শুরু করে। এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। তাওয়াফ করার জন্য তাওয়াফকারী হাজরে আসওয়াদের বরাবর এমনভাবে দাঁড়াবে যেন ডান কাঁধ হাজরে আসওয়াদের বাম কোণের বরাবর হয়।[২৩৫]

১২. হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়ার জন্য পুরুষ-মহিলা এক সাথে ভিড় করে থকে। অথচ হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া সহজে সম্ভব হলে সুন্নাত। আর ভিড়ের মাঝে পুরুষ-মহিলা মাখামাখি করা হারাম। সুতরাং প্রচন্ড ভিড়ের মাঝে উক্ত সুন্নাত অর্জনের জন্য হারাম কাজ করা একেবারেই অনুচিত।

১৩. এমনিভাবে অনেক মহিলা ভিড়ের মাঝে মাকামে ইব্রাহীমে নামায আদায় করে। যার কারণে পুরুষ-মহিলার মাঝে ধাক্কা-ধাক্কি হয়। এমতাবস্থায় মহিলার নামাযের অবস্থাও বাকি থাকে না। সুতরাং মহিলাদের এরকম পরিস্থিতি থেকে বিরত থাকা উচিত।[২৩৬]

১৪. অনেক মু'আল্লিম তাওয়াফকারীদেরকে দেখানোর জন্য তাদের সামনে সামনে উল্টো হয়ে তাওয়াফ করেন। এভাবে উল্টো চলে তাওয়াফ করা নাজায়েয। এ থেকে বিরত থাকা জরুরী।[২৩৭]

১৫. অনেকে তাওয়াফের সাত চক্করেই রমল করে থাকে। আবার অনেকে নফল তাওয়াফেও রমল করে। এটা ভুল আমল। রমল করবে শুধু প্রথম চার চক্করে। তাও ঐ তাওয়াফের ক্ষেত্রে যার পরে সায়ী আছে। তাছাড়া রমল হলো সুন্নাত। রমল ছাড়াও তাওয়াফ আদায় হয়ে যায়। তাই প্রচণ্ড ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দিয়ে রমল করা মোটেও উচিত নয়।

১৬. রমল শুধু পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য নয়। কিন্তু অনেক মহিলাকে দেখা যায়, তারাও

---

[২৩৩] সুনানুত তিরমিযীঃ ১/১৭১, মানাসিক মোল্লা আলী কারী, পৃ. ৩০০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাঃ ১/২৪২, রদ্দুল মুহতার ২/৫৪৭, আল কাউসার, নভেম্বর ২০০৯

[২৩৪] আনওয়ারে মানাসিক, পৃ. ৬০৬

[২৩৫] মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ, পৃ. ৩৪৮

[২৩৬] আনওয়ারে মানাসিকঃ ৬০৪

[২৩৭] আনওয়ারে মানাসিকঃ ৬০৪

রমল করে থাকে।[২৩৮]

১৭. অনেককে দেখা যায় তাওয়াফের সময় হাতে বিভিন্ন লিফলেট বা পুস্তিকা নিয়ে তাওয়াফ করে এবং তাতে প্রতি চক্করের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যেসব দু'আ লিখিত আছে তা পড়তে থাকে। তাদের ধারণা মতে তাওয়াফের প্রতি চক্করে এসব দু'আ পড়া জরুরী। এ ধারণা ঠিক নয়। বিভিন্ন পুস্তিকা বা লিফলেটে তাওয়াফের প্রতি চক্করের জন্য যে দু'আ লিখা আছে তা পড়া সুন্নাত বা মুস্তাহাব কিছুই নয়। তাওয়াফের সময় পড়ার জন্য যে কয়েকটি দু'আ হাদীসে এসেছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। যেমন- رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ। সুতরাং এই দু'আটিই বেশি বেশি পড়া উচিত।

দেখে দেখে পড়ার কারণে ঠেলাঠেলি, ধাক্কা-ধাক্কি এবং ভিড় বেশি হয়। এজন্যও তা পরিহার করা উচিত।

১৮. মসজিদে হারামের উপর তলায় বা ছাদে বহু হাজী একসাথে তাওয়াফ করে থাকেন। অনেকে এ ব্যাপারে সংশয়ে ভোগে। কারণ, এমতাবস্থায় সরাসরি কা'বা শরীফের প্রদক্ষিণ হয় না; বরং কা'বার শূন্যকে প্রদক্ষিণ করা হয়। এটা ভুল ধারণা। কা'বা শরীফের ভূমি ও তার শূন্যের হুকুম একই।[২৩৯]

১৯. বর্তমানে অনেক হাজ্বী সাহেব হজ্বের আমলসমূহের স্তরভিন্নতা (ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার কারণে সবগুলোর ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব প্রদান করেন। অনেক হাজ্বীই সামান্য ভিড় বা অসুস্থতার কারণে প্রতিনিধির মাধ্যমে তাওয়াফে যিয়ারত করান। এটা মারাত্মক ভুল। হজ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয এবং রুকন হলো তাওয়াফে যিয়ারত। এতে প্রতিনিধিত্ব চলে না। অসুস্থ ব্যক্তি অন্যের সহযোগিতায় নিজেই তাওয়াফ করবে। এমনকি ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যদি ইহরাম বাঁধার পর হাজী বেহুঁশও হয়ে যায়, তাহলে তার সঙ্গীগণ তাকে বহন করে তাওয়াফে যিয়ারত করাবে।[240]

---

[২৩৮] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ১৩১১০, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ১/১৩৫

[২৩৯] মোল্লা আলী কারী রাহ. বলেন: (ইরশাদুস সারী ইলা মানাসিকিল মোল্লা আলী কারী ১৬৫, মাকতাবায়ে দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ):

ولو طاف على سطح المسجد ولو مرتفعا عن البيت جاز لأن حقيقة البيت هو القضاء الشامل لمافوق البناء من الهوى، ولذا صحت الصلاة فوق جبل أبي قيس اجماعا حتى لو انهدم البيت نعوذ بالله جاز الصلاة إلى البقعة.

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন: (আল হিদায়া ১/১৬৫):

لأن الكعبة هي العرصة والهواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء؛ لأنه ينقل، ألا ترى أنه لو صلى على جبل أبي قبيس جاز، ولا بناء بين يديه

অনুরূপভাবে শর'য়ী মসজিদের সম্পর্কে মাজমাউল আনহুর গ্রন্থে উল্লেখ করেন (মাজমাউল আনহুর ১/১৯০, মাকতাবাতুল মানার):

وكره الوطي فوق المسجد لأن المسجد إلى عنان السماء.

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. যফর আহমাদ উসমানী রাহ. এর একটি ফাতওয়ার শেষে লিখেন (ইমদাদুল আহকাম ১/৬৩৫):

احقر اشرف علی قیاسا علی کون هواء الکعبۃ فی حکمہا وکون هواء المسجد فی حکمہ صحت کو راجح سمجھتا ہے لیکن جزم نہیں کرتا.

[২৪০] মোল্লা আলী কারী রাহ. তাওয়াফে যিয়ারতের শর্ত উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন (ইরশাদুস সারী ইলা মানাসিকিল মোল্লা আলী কারী ২৫৭, মাকতাবায়ে দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ):

সায়ীর ভুল-ভ্রান্তি

২০. সায়ীর সময় অনেক মানুষ পাহাড়ের অনেক উপরে আরোহণ করে থাকে। অথচ এর কোনো জরুরত নেই। পাহাড়ের এতটুকু উপরে উঠাই যথেষ্ট যেখান থেকে বাইতুল্লাহ দেখা যায়।[২৪১]

২১. তাওয়াফের মতো এখানেও কিছু নির্দিষ্ট দু'আকে জরুরী মনে করা হয়। ফলে জামাতবদ্ধ হয়ে একজন বলতে থাকে আর বাকিরা তার সঙ্গে সমস্বরে পড়তে থাকে। এতে ঠিক তাওয়াফের মতোই খারাবীগুলোর সম্মুখীন হতে হয়। অথচ এখানেও নির্দিষ্ট দু'আ পড়া জরুরী নয়। কুরআন-হাদীসের দু'আ বা ভালো অর্থবোধক যেকোনো দু'আই পড়া যেতে পাবে।[২৪২]

২২. সায়ীর সময় সাফা-মারওয়ার উপর স্বাভাবিক দু'আর মতো হাত উঠিয়ে দু'আ করা সুন্নাত। অনেক মানুষ তাকবীরে তাহরীমার মতো কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে থাকে। এটা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ।[২৪৩]

২৩. অনেক মানুষ সায়ীর সময়ও ইযতিবা করে থাকে। অথচ ইযতিবা শুধু ঐ তাওয়াফের সুন্নাত যার পরে সায়ী করতে হয়।

মীনায় অবস্থান সংক্রান্ত একটি ভুল

২৪. বর্তমানে হাজীদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় এবং মিনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা না থাকায় মিনার তাবুগুলোর বিরাট অংশ মুযদালিফায় ছড়িয়ে পড়ে। উপমহাদেশের অনেক হাজীদের সেসব তাবুতেই অবস্থান করতে হয়। অনেকে এ কারণে মক্কায় চলে যায় যে, মীনায় না থাকার কারণে ফযীলত তো পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে বিশেষ উযর ছাড়া মক্কায় চলে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, এখানে ব্যক্তিগতভাবে মূল মীনাতে অবস্থানের জন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাই আশা করা যায়, মীনার সঙ্গে যুক্ত মযদালিফার তাবুতে অবস্থান করলেও ফযীলত অর্জন হবে। আর সক্ষম পুরুষরা মিনার রাতগুলোর বড় অংশ মসজিদে খাইফ ও তার আশেপাশে অবস্থান করেও মীনার ফযীলত হাসিল করতে পারেন।[২৪৪]

আরাফার ভুল

২৫. মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় মানুষ দলে দলে চলতে থাকে, অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু খুব কমই সশব্দে তালবিয়া পড়তে শোনা যায়।[২৪৫] অথচ ইহরাম বাঁধার পর থেকে ১০ তারিখ

وكونه بنفسه ولو محمولا، فلاتجوز النيابة إلاّ للمغمى عليه قبل الإحرام.

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন:

وقيد بكونه أغمي عليه قبل الإحرام إذ لو أغمي عليه بعد الإحرام فلا بد من أن يشهد به الرفيق المناسك عند أصحابنا جميعا على ما ذكره فخر الإسلام؛ لأنه هو الفاعل. وقد سبقت النية منه، ويشترط نيتهم الطواف إذا حملوه كما يشترط نيته. (البحر الرائق ٦٢٠/٢ مكتبة زكريا)

[২৪১] আনওয়ারে মানাসিক: ৬০৫

[২৪২] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ১৪৭১২, গুনয়াতুন নাসিক: ১২৯

[২৪৩] আনওয়ারে মানাসিক: ৬০৫

[২৪৪] আল কাউসার, নভেম্বর: ২০০৮ ইং

[২৪৫] আল কাউসার, নভেম্বর: ২০০৯

পাথর মারার আগ পর্যন্ত সশব্দে তালবিয়া পড়া গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এ সময় অন্যান্য যিকিরের তুলনায় এটিই অধিক পরিমাণে করতে বলা হয়েছে।[২৪৬]

২৬. আরাফার ময়দানে অনেকে গুরুত্বসহকারে জাবালে রহমতে আরোহণ করে থাকে। অথচ শরী'আতে এর কোনো ভিত্তি নেই।[২৪৭]

২৭. আরাফার ময়দানে যোহর-আসর একসাথে আদায় করার পর অনেকে রাস্তায় বাজারে ঘোরাঘুরি করে। এটা ঠিক নয়; মাহরূমির কারণই বটে। এ সময় কোনো একস্থানে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা উচিত।

২৮. মসজিদে নামিরার মেহরাবসহ সামনের কিছু অংশ উকুফের জায়গা নয়। কিন্তু অনেক হাজী সাহেবকে আরাফার পুরো সময়ই সেখানে অবস্থান করতে দেখা যায়। আবার অনেক হাজী সাহেব আরাফার বাইরেও অবস্থান করে থাকে। আরাফায় অবস্থান করা ফরয। এটা ছাড়া হজ্জ আদায় হবে না। তাই এ ব্যাপারে সচেতন থাকা জরুরী।[২৪৮]

মুযদালিফার ভুলসমূহ

২৯. অনেকে মুযদালিফা থেকে সুবহে সাদিকের পূর্বে প্রস্থান করে। অথচ মুযদালিফায় অবস্থানের সময় সুবহে সাদিকের পরে শুরু হয় এবং সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। এইসময় সেখানে অল্পক্ষণের জন্য হলেও অবস্থান করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, ইশার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাত।[২৪৯]

৩০. মাগরিব ও ইশা মুযদালিফায় গিয়ে একত্রে পড়া জরুরী। এটা তো ঠিক আছে। কিন্তু কখনো ভিড়ের কারণে গাড়ি ফজরের আগে মুযদালিফায় পৌঁছতে পারে না। তখন অনেকে মুযদালিফায় পড়ার আশায় এ দুই ওয়াক্ত নামায কাযা করে ফেলে। অথচ মাসআলা হলো, ইশার সময়ের মধ্যে মুযদালিফায় পৌঁছার ব্যাপারে আশঙ্কা থাকলে পথেই মাগরিব-ইশা পড়ে নেওয়া জরুরী। অন্যথায় এ দুই ওয়াক্ত কাযা করার গুনাহ হবে।[২৫০]

৩১. কোনো কোনো হাজী সাহেবকে মুযদালিফার বাইরে অবস্থান করতে দেখা যায়। অথচ মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং সুবহে সাদিকের পর কিছু সময় উকুফ করা ওয়াজিব। তাই মুযদালিফার সীমানা ভালোভাবে দেখে তার ভেতরেই অবস্থান করা জরুরী।[২৫১]

রমীর ভুলসমূহ

৩২. অনেক লোক রমীর ক্ষেত্রে খুঁটিকেই আসল জামরাহ (রমীর স্থান) মনে করে। অথচ মূলত জামরাহ হলো খুঁটি এবং দেওয়ালের গোড়া থেকে নিয়ে আশে পাশে তিন হাত পর্যন্ত ভূমি।

---

[২৪৬] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ১৪১৭৮, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ১/১২২৩

[২৪৭] আনওয়ারে মানাসিক: ৬০৬

[২৪৮] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ১৪০৬৩, ১৪০৬৮, আদ্দুরুল মুখতার: ২/৫০৬

[২৪৯] আনওয়ারে মানাসিক: ৬০৮

[২৫০] মানাসিকে মোল্লা আলী কারী: ২২০, আদ্দুররুল মুখতার: ২/৫১১

[২৫১] মানাসিকে মোল্লা আলী কারী: ২২০, রদ্দুল মুহতার: ২/৫১১

যদি পাথর খুঁটিতে না লেগে এই তিন হাতের মধ্যে পড়ে তাহলেও রমী শুদ্ধ হবে।[252]

৩৩. অনেকে শয়তানকে মারার জন্য বড় বড় পাথর সংগ্রহ করে। অথচ রমীর পাথর বুটের দানা পরিমাণ হওয়া উত্তম। আবার অনেকে নিজের জুতা, সেন্ডেল ইত্যাদি খুলে নিক্ষেপ করে। এটাও নাজায়েয।[২৫৩]

৩৪. রমীর প্রথম দিনের সাতটি কংকর মুযদালিফা থেকে নেয়া মুস্তাহাব। অনেক হাজী সাহের তিন দিনের সকল পাথর মুযদালিফা থেকে সংগ্রহ করাকে জরুরী মনে করে। ফলে মুযদালিফায় পৌঁছতে দেরি হয়ে গেলে অনেককে সুবহে সাদিকের পরও পাথর কুড়াতে দেখা যায়। সকালে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অনেকে পাথর সংগ্রহ করতে থাকে। অথচ এটিই উকুফে মুযদালিফার প্রধান সময়। এ সময়ে যিকির-আযকারে মগ্ন থাকা সুন্নাত।

পাথর নেয়ার উত্তম সময় হলো মুযদালিফা থেকে মিনায় যাওয়ার পথে কিংবা মুযদালিফায় রাতে পৌঁছে গেলে তখনও কুড়িয়ে নেয়া যেতে পারে।[২৫৪]

৩৫. অনেকে সাতের অধিক পাথর নিক্ষেপ করে থাকে। এটি শরী'আত পরিপন্থী কাজ। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।[২৫৫]

কুরবানীর ভুলসমূহ

৩৬. রমী করার পর হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে কিরান পালনকারীদের জন্য প্রথমে কুরবানী করে তারপর হলক করা ওয়াজিব। অথচ অনেক হাজ্জী সাহেব এ তারতীবের প্রতি গুরুত্ব দেন না।[২৫৬]

৩৭. সউদী সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানীর ব্যবস্থা রয়েছে। হানাফী মাযহাবে কুরবানী এবং হলকের মাঝে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। এ আমলগুলোর ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হলে দম দিতে হবে। ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করানোর দ্বারা অধিকাংশ সময় উক্ত তারতীব রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাই পারতপক্ষে ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করা উচিত নয়। স্বউদ্যোগে কুরবানী করার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ আছে। এজন্য একটু ফিকির করলেই হয়। যদি কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করতেই হয়, তাহলে সতর্কতামূলক ব্যাংকের দেয়া সময় থেকে একবেলা বা ৬ ঘন্টা সময় দেরি করে হলক করা উচিত।[২৫৭]

৩৮. কেউ কেউ একটি উমরা করে পরবর্তী আরো একটি উমরা করবে বলে অর্ধেক মাথা হলক করে বাকি অর্ধেক রেখে দেয়। এটি ঠিক নয়; বরং প্রথম বারেই পুরো মাথা হলক করবে। পরে উমরা করলে ঐ হলকের উপর খুর বা ব্লেড ঘুরিয়ে নিলেই চলবে।[২৫৮]

দু'টি বড় ভুল

৩৯. অনেকে হজ্বে যাওয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে হজ্ব করতে দেরি করে। এটা মোটেও উচিত নয়। এভাবে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীতে যদি হজ্ব করা ছাড়া মারা যায় বা

[২৫২] আনওয়ারে মানাসিক: ৬০৮
[২৫৩] আনওয়ারে মানাসিক: ৬০৮
[২৫৪] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ১৩৬২২, রদ্দুল মুহতার: ২/৫১৫
[২৫৫] রদ্দুল মুহতার: ২/৫১৩, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ১/২৭৫
[২৫৬] আনওয়ারে মানাসিক: ৬০৮
[২৫৭] আল কাউসার, নভেম্বর ২০০৮
[২৫৮] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ১৩৭৯৯, রদ্দুল মুহতার: ২/৫১৬
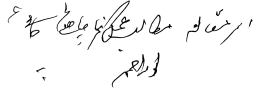
হজ্বের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে, তাহলে তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে মারাত্মক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য সামর্থ্য থাকলে হজ্ব করতে দেরি করা মোটেও উচিত নয়।
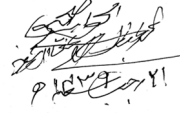
৪০. হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই এই সফরের সময়টুকু বেশি বেশি আল্লাহর যিকির-আযকার করে কাটানো উচিত। অনেক হাজ্বী সাহেবকে দেখা যায় যে, অহেতুক কথা-বার্তা, গল্প-গুজব করে এই সময়গুলো অতিবাহিত করে। এটা হজ্বের জন্য অনেক ক্ষতিকর। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আ'যম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২১ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৮ রজব ১৪৩৯ হি.

প্রযুক্তির সাহায্যে বিবাহ : শর‘য়ী পর্যালোচনা

মাওলানা তাওহীদ বিন মোস্তফা, পাবনা

বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সব ধরনের পারস্পরিক চুক্তি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষ প্রযুক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর চুক্তিও মুহূর্তের মাঝে সংঘটিত হচ্ছে প্রযুক্তির মাধ্যমে। প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য নতুন, সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যা।

তবে ইসলাম একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সর্বযুগের সব ধরনের সমস্যার সুষ্ঠু ও সঠিক সমাধান এতে রয়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে দূরবর্তী দুই ব্যক্তির মাঝে অডিও-ভিডিও কল এবং অন্যান্য মাধ্যমে সংঘটিত বিবাহের ক্ষেত্রে শর‘য়ী দৃষ্টিকোণ ও তার ব্যাখ্যা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার প্রয়াস পাবো। মূল আলোচনার পূর্বে বিবাহ সম্পর্কে শর‘য়ী দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত কিছু মৌলিক কথা পেশ করা হলো।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের গুরুত্ব ও স্পর্শকাতরতা

বিবাহ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মানুষ পরস্পরে যে সকল চুক্তি করে থাকে তার মধ্যে উদ্দেশ্য, ফলাফল ও সংবেদনশীলতার দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিবাহ-চুক্তি। বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মাঝে বন্ধন গড়ে উঠে। আর এর মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে মানব জীবন। এ পৃথিবীকে মহান রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্যই। আর মানববংশ টিকে থাকার একমাত্র সুষ্ঠু উপায় হলো বৈধ ও শরী‘আতসম্মত বিবাহ। মানুষের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদার নিবৃত্তি ও সুস্থ সমাজ গঠনের জন্যও বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য শরী‘আতে বিবাহকে দেয়া হয়েছে ইবাদতের মর্যাদা। কুরআন-হাদীসে বিভিন্নভাবে বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে অবৈধ যৌনাচার থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧

“যারা নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে। কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী।”[২৫৯]

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ

[২৫৯] সূরা মু‘মিনুন: ৫-৭

أَخْدَانٍ

"সুতরাং সেই দাসীদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ করবে এবং তাদেরকে ন্যায়ানুগভাবে তাদের মোহর প্রদান করবে এই শর্তে যে, (বিবাহের মাধ্যমে) তাদের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা হবে, তারা কেবল কাম-চরিতার্থকারিনী হবে না এবং গুপ্ত প্রণয়ী গ্রহণকারিনী ও নয়।"[২৬০]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"এবং ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা ও বিপথগামিতা।"[২৬১]

আরো ইরশাদ হচ্ছে-

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত চাবুক মারবে। তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখো, তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি করুণাবোধ যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[২৬২]

তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিবাহ-চুক্তি বা বন্ধন যতটাই না গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়, তার চেয়েও বেশি স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল। এটি একটি স্বাভাবিক বোধগম্য বিষয় যে, বিবাহ-চুক্তি অন্য আর দশটি চুক্তির মতো নয়, যা বিভিন্ন বস্তুকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। বিবাহ-বন্ধন হয় সরাসরি দু'জন নর-নারীর মাঝে। দু'জনের মনন ও জীবনে ফেলে সুগভীর প্রভাব ও স্থায়ী ছাপ। আর একে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে পরিবার ও সমাজ। এছাড়াও এর সাথে জাড়িত থাকে ব্যক্তি ও পরিবারের ইজ্জত ও সম্ভ্রমের বিষয়।

স্বাভাবিকভাবেই এমন বন্ধন যত নিশ্চিত, মজবুত ও নির্ভেজাল হবে ততই মঙ্গলজনক। আর এর ব্যাপারে যতটাই অসতর্কতা বা অবহেলা করা হবে অথবা সংশয় ও ভেজালের অবকাশ রাখা হবে, ততটাই খারাপ প্রভাব পড়বে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের উপর। এজন্য ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে পদে পদে বিভিন্ন শর্ত ও সীমারেখা আরোপ করেছে।

নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে শরী'আতের সাধারণ বিধান হলো, তা মূলত হারাম ও অবৈধ। তবে সকল শর'য়ী শর্ত পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া গেলে শরী'আতসম্মত বিবাহের মাধ্যমে তা বৈধ হতে পারে। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন-

---

[২৬০] সূরা নিসা : ২৪
[২৬১] সূরা ইসরা: ৩২
[২৬২] সূরা নূর: ২

الأصل في الأبضاع الحرمة.

"নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো, তা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।"[২৬৩]

তাই প্রত্যেকটি বিধানের মাঝে ন্যূনতম শর্তের অনুপস্থিতি নাজায়েয ও হারাম হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য লেনদেন ও বস্তুর ব্যাপারে মূলনীতি হলো, তা মূল অবস্থায় বৈধ ও হালাল। যাকে ফুকাহায়ে কেরাম এ ভাষায় ব্যক্ত করে থাকেন-

الأصل في الأشياء الإباحة.

"সকল বস্তুর ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হলো বৈধতা।"[২৬৪]

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এসব লেনদেনের ক্ষেত্রে হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ বা দলীল পাওয়া যাবে না ততক্ষণ তা হালাল ও মুবাহ গণ্য হবে।

আশা করি, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বিবাহের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও বিবাহের ক্ষেত্রে শরী'আতের বিশেষ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়েছে। এজন্য শরী'আত বিবাহ-চুক্তি সম্পাদনের জন্য কিছু বিশেষ শর্ত ও হুকুম আরোপ করেছে, যা অন্যান্য সাধারণ চুক্তিতে করেনি। নিম্নে এ ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে।

বিবাহ-চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ শর'য়ী শর্তসমূহ

এখানে আমরা বিবাহের ইজাব-কবুল তথা বিবাহ-চুক্তি সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব বিশেষ শর্ত ও আহকাম রয়েছে, তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। বিবাহের জন্য স্বতন্ত্র ইজাব-কবুল শর্ত (বিস্তারিত সামনে আসছে), তাই ইজাব-কবুলের সাধারণ বিধি-বিধান ও শর্তসমূহ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বিবাহ যেহেতু সাধারণ কোনো লেনদেন চুক্তি নয়, তাই বিবাহের ইজাব-কবুলের ক্ষেত্রে শরী'আতে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এজন্য বিবাহের ইজাব-কবুলে যুক্ত করা হয়েছে আরো কিছু বিধি-বিধান।

বিবাহের ইজাব ও কবুলের সার্বিক বৈশিষ্ট্য

বিবাহের ইজাব-কবুলের মাঝে মৌলিক শর্ত হলো, তা সব ধরনের সংশয় থেকে মুক্ত হতে হবে। যেহেতু বিবাহের সাথে দুটি জীবন জড়িত আর এর ভিত্তি হলো ইজাব ও কবুল, তাই যথাসম্ভব এই ভিত্তি মজবুত ও দৃঢ় হতে হবে। কোনো পক্ষ সন্দেহপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনিভাবে কোনো এক পক্ষের আওয়াজ যদি সন্দেহপূর্ণ হয়, তাহলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সর্বোপরি বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য ইজাব-কবুলের নিয়মতান্ত্রিক স্বাক্ষ্যগ্রহণ জরুরী। বলা বাহুল্য, আধুনিক দুরালাপনি ও যোগাযোগ-মাধ্যমে এই ধরনের নিশ্চয়তা অর্জন করা সম্ভব নয়। বর্তমানে ফোন নাম্বারসহ যেকোনো আইডি হ্যাক করা যায়। যেকোনো ব্যক্তির ফটো, ভিডিও তার উপস্থিতি ছাড়াও বানানো যায়। এমনিভাবে ইচ্ছেমতো ভয়েসও চেঞ্জ করা যায়। সুতরাং অডিও-ভিডিও কলের মাধ্যমে ইজাব ও কবুলে সন্দেহ বিদ্যমান থাকে, যা শরী'আতে গ্রহণযোগ্য নয়। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। নিম্নে বিবাহের

---

[২৬৩] ফাতহুল কাদীর: ৮/২২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/২১০, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, ঢাকা

[২৬৪] আল মাবসূত: ২৪/৭৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

ইজাব-কবুলের শর'য়ী বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ শর্তসমূহ বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

১. নিয়মতান্ত্রিক ও শাব্দিক ইজাব-কবুল

ইজাব অর্থ প্রস্তাব। কবুল অর্থ সম্মতি। যে কোনো চুক্তির জন্য প্রস্তাব ও সম্মতি অপরিহার্য বিষয়। প্রস্তাব-সম্মতির জন্য একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু ইসলাম বিবাহের ক্ষেত্রে শাব্দিক ও মৌখিক ইজাব-কবুল ব্যতীত অন্য সব পদ্ধতি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অর্থাৎ, বিবাহের চুক্তিতে উভয়পক্ষের মাঝে শাব্দিকভাবে প্রস্তাব ও সম্মতি উত্থাপন হওয়া জরুরী।

অন্য কোনো সম্মতিজ্ঞাপক কর্ম, ইশারা বা কথা দ্বারা বিবাহ-চুক্তি সম্পাদিত হবে না। সাধারণত ক্রয়-বিক্রয় বা সমজাতীয় অন্যান্য চুক্তিগুলোতে উপস্থিত আদান-প্রদান বা এ জাতীয় কর্ম দ্বারা চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যায়; কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ভাষা, মৌন সমর্থন বা কোনো কর্মের দ্বারা বিবাহের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করলে বিবাহ হবে না। পূর্বে এর কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. (১০৮৮ হি.) বলেন-

(فلا ينعقد بقبول بالفعل كقبض مهر، ولابتعاط، ولا بكتابة حاضر، بل غائب بشرط إعلام الشهود (لا) يصح (بلفظ إجارة وإعارة ووصية ورهن ووديعة ونحوها مما لا يفيد الملك، لكن تثبت به الشبهة فلا يحد، ولها الاقل من المسمى ومهر المثل، كذا تثبت بكل لفظ لا ينعقد به النكاح فليحفظ.(وألفاظ مصحفة كتجوزت) لصدوره، لا عن قصد صحيح، بل عن تحريف وتصحيف، فلم تكن حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة بل غلطا، فلا اعتبار به أصلا. (ولا بتعاط) احتراما للفرج أي لخطر أمرها وشدة حرمتها، فلا يصح العقد عليها إلا بلفظ صريح أو كناية.

"ইজাব-কবুল ব্যতীত কোনো কর্ম যেমন, স্ত্রী কর্তৃক মোহর গ্রহণ, মৌন সমর্থন বা উপস্থিত ব্যক্তির পত্রলিখনের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। তবে অনুপস্থিত ব্যক্তির লিখিত পত্রের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে। এক্ষেত্রে শর্ত হলো, সাক্ষীদেরকে পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত করাতে হবে।...

মৌন সমর্থনের দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ না হওয়ার কারণ হলো, নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করা। কারণ, নারীর সম্ভ্রমের বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর।"[২৬৫]

আল্লামা শিহাবুদ্দীন ইবনুশ শিলবী রাহ. (১০২১ হি.)[২৬৬] বলেন-

(قوله: وركنه الإيجاب والقبول) أي حتى لا ينعقد بالتعاطي اهـ قال في العمادية: حتى لو قالت امرأة لرجل: زوجتك نفسي منك بدينار فدفع الدينار إليها في المجلس، ولم يقل بلسانه شيئا لا ينعقد النكاح، وإن كان بحضرة الشهود اهـ قال في التتارخانية نقلا عن السغناقي: وهذا العقد لا ينعقد بالتعاطي مبالغة في صيانة

---

[২৬৫] আদ্দুররুল মুখতার: ৪/৮৩, ৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[২৬৬] আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে ইউনুস ইবনে ইসমাঈল ইবনে মাহমুদ আসসা'উদী, আশশিলবী। তিনি ১০২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 'তাবয়ীনুল হাকায়েক ফী শরহে কানযুদ্দাকায়েক'-এর টীকা তাঁরই রচিত। (হাদিয়াতুল আরেফীন: ৫/১৫৩, আল আ'লাম লিযযিরিকলী: ১/২৩৬)

الأبضاع من الهتك.

"বিবাহের রুকন হলো শাব্দিক ইজাব-কবুল। মৌন সমর্থনের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় না। 'ইমাদিয়্যাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি কোনো মহিলা কোনো পুরুষকে বলে, আমি এক দিনার মোহরের বিনিময়ে নিজেকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম। অতঃপর পুরুষ মুখে কিছু না বলে উপস্থিত মজলিসেই মহিলাকে এক দিনার দিয়ে দেয়, তাহলে বিবাহ সংঘটিত হবে না। যদিও এটা সাক্ষীদের উপস্থিতিতেই হোক না কেন।

নারীর সম্ভ্রম সংরক্ষণে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করণার্থে বিবাহ-চুক্তি মৌন সমর্থনের দ্বারা সংঘটিত হয় না।"[২৬৭]

২. পাত্র-পাত্রী বা তাদের প্রতিনিধির ইজাব-কবুলের শব্দ শ্রবণ করা ও বোঝা

পাত্র-পাত্রী বা তাদের প্রতিনিধি কর্তৃক একে অপরের ইজাব-কবুলের শব্দ শোনা জরুরী। প্রথম পক্ষ ইজাব করার পর দ্বিতীয় পক্ষ কবুল করলেই হবে না; বরং তার কবুলের শব্দ প্রথম পক্ষকে শুনতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. (৮৬১ হি.) বলেন-

ويسمع كل من المتعاقدين كلام صاحبه، والكلامان هما الإيجاب والقبول.

"উভয় চুক্তিকারীর পরস্পরে একে অপরের বাক্য শ্রবণ করা জরুরী। বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইজাব-কবুল।"[২৬৮]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. (৯৭০ হি.) বিবাহের ইজাব-কবুলের শর্তসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

ومنها سماع كل منهما كلام صاحبه، لأن عدم سماع أحدهما كلام صاحبه بمنزلة غيبته كما في الوقاية، وقيد المصنف انعقاده باللفظ لأنه لا ينعقد بالكتابة من الحاضرين فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد.

"(বিবাহের শর্তসমূহের মধ্য হতে একটা হলো) দুইজন চুক্তিকারীর প্রত্যেকের একে অপরের বাক্য শ্রবণ করা। কেননা এক পক্ষ অপর পক্ষের বাক্য শ্রবণ না করাটা অনুপস্থিতির মতোই। বেকায়া গ্রন্থে এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। বেকায়া গ্রন্থকার বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি উচ্চারণের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। কারণ, উপস্থিত দুই জনের লিখিত ইজাব-কবুলের দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হয় না। সুতরাং যদি পুরুষ লিখে, 'আমি তোমাকে বিবাহ করলাম', তারপর মহিলা লিখে, 'আমি গ্রহণ করলাম', তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।"[২৬৯]

বলাই বাহুল্য, সাধারণ লেনদেনের চুক্তি এর ব্যতিক্রম। কারণ, সেখানে ইজাব-কবুলের শব্দ শোনা আবশ্যক নয়; মোটামুটি বুঝলেই হবে। এমনকি ইজাব-কবুল উচ্চারণ করাও জরুরী নয়; বরং মৌন সমর্থন বা কার্যত আদান-প্রদানের দ্বারাও চুক্তি সম্পাদন হয়ে যায়।

৩. সাক্ষীর উপস্থিতি ও তাদের ইজাব-কবুল শ্রবণ করা ও বোঝা

বিবাহের গুরুত্ব, সংবেদনশীলতা ও অবৈধ সম্পর্ক থেকে তাকে আলাদা করার লক্ষ্যে ইসলামে

---

[২৬৭] হাশিয়াতু তাবয়ীনিল হাকাইক: ২/৯৫, এইচ, এম, সাঈদ, পাকিস্তান

[২৬৮] ফাতহুল কাদীর: ৩/১৮২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[২৬৯] আল বাহরুর রায়িক: ৩/১৪৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

প্রকাশ্যে ও আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে বিভিন্নভাবে বিবাহের ই'লান করতে বলেছেন। হাদীসে বিবাহের পর ওলিমার ব্যবস্থা করার প্রতিও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, যাতে এর দ্বারাও এলানের উদ্দেশ্য অর্জন হয়। হাফেয ইবনে হাজার রাহ. উল্লেখ করেন-

كان عمر لا يجيز نكاح السر ويوجب الحد على فاعله.

"হযতর উমর রাযি. গোপন বিবাহকে অনুমোদন দিতেন না; বরং তার সম্পন্নকারীকে হদ লাগাতেন।"[২৭০]

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

أعلنوا النكاح.

"বিবাহের সংবাদ প্রচার করো।"[২৭১]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনভাবে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।"[২৭২]

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، وآخا رسول الله ﷺ بينه وبين سعد بن الربيع....فقال: "أولم ولو بشاة".

"হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে আগমন করলেন.... রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, একটি ছাগল দ্বারা হলেও ওলিমার ব্যবস্থা করো।"[২৭৩]

একই ধারাবাহিকতায় বিবাহ-চুক্তি সম্পাদনের জন্য 'শর'য়ী শাহাদাহ' বা সাক্ষ্যের শর্ত করা হয়েছে। হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وماكان من نكاح على غير ذلك فهو باطل.

"অভিভাবকের উপস্থিতি ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না। যে বিবাহ সাক্ষী ও অভিভাবকের উপস্থিতি ব্যতীত হবে তা বাতিল।"[২৭৪]

'শর'য়ী শাহাদাহ' বিবাহের ইজাব-কবুলেরই একটি অপরিহার্য অংশ। তা ব্যতীত বিবাহের ইজাব-কবুল শুদ্ধ হয় না। আর ইজাব-কবুল ব্যতীত আকদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। আল্লামা

---

[২৭০] আল তালখীসুল হাবীর: ৬/২৭৬৪

[২৭১] (হাদীস হাসান) সুনানে তিরমিযী: ১০৮৯, মাকতাবাতুল ফাতহ, মুসনাদে আহমাদ: ১৬১৩০, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪০৬৬, মুসতাদরাকে হাকেম: ২/১৮৩, হাকেম সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী সমর্থন করেছেন।

[২৭২] আল মুজামুল আওসাত লিত্ তাবরানী: ৬৮৭৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[২৭৩] সহীহ বুখারী: ৩৭৮১

[২৭৪] (হাদীস সহীহ) সহীহে ইবনে হিব্বান: ৪০৭৫, দারুল মা'রেফা, সুনানে বাইহাকী: ৭/১২৪-১২৫। হাদীসটি যুহরী থেকে সুলাইমান ইবনে মূসা বর্ণনা করেছেন। এই সুলাইমান সম্পর্কে ইমাম যুহরী বলেছেন:

إن مكحولا يأتينا وسليمان بن موسى، وأيم الله إن سليمان لأحفظ الرجلين.

বিস্তারিত জানার জন্য, দ্র. সহীহ ইবনে হিব্বান ও শায়েখ শু'আইবের টীকা।

বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. (৫৯৩ হি.) বলেন-

ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف. قال رضي الله عنه: اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام [لا نكاح إلا بشهود].

"মুসলমানের বিবাহ শুদ্ধ হবে দু'জন স্বাধীন, বিবেকবান, মুসলমান পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষীর উপস্থিতিতে। সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ হোক বা না হোক। এমনকি যিনার মিথ্যা অপবাদ দেয়ার কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। গ্রন্থকার বলেন, বিবাহের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষ্য শর্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- 'সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ নয়'।"[২৭৫]

মূলত দুই মানবের বন্ধন সুদৃঢ় ও মজবুত করার লক্ষ্যে এবং ইজাব ও কবুলকে নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত করার জন্যই শাহাদাহ-এর শর্তারোপ করা হয়েছে। ইমাম সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) শাহাদাহ-এর শর্তারোপের কারণ উল্লেখ করে বলেন-

ولأن الشرط لما كان هو الإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا، وذلك شهادة الشاهدين فإنه مع شهادتهما لا يبقى سرا لأن اشتراط زيادة شيء في هذا العقد؛ لإظهار خطر البضع.

"বিবাহের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, বিবাহ প্রকাশ্যে হওয়া। সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রে শরী'আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য 'প্রকাশমাধ্যম' অবলম্বন করতে হবে। আর তা হলো, দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য। কারণ, তাদের সাক্ষ্যের পর বিবাহ আর গোপন থাকে না। বিবাহের ক্ষেত্রে মূল চুক্তির মাঝে অতিরিক্ত সাক্ষ্যের শর্তারোপ করার উদ্দেশ্য হলো নারীর সম্ভ্রমের স্পর্শকাতরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো।"[২৭৬]

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. (৫৭৮ হি.) বলেন-

أن الشهادة في باب النكاح للحاجة إلى صيانته عن الجحود والإنكار.

"বিবাহের পর বিবাহ-চুক্তিকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তাতে সাক্ষ্যের শর্তারোপ করা হয়েছে।"[২৭৭]

আমরা জানি, শর'য়ী শাহাদাহ বা সাক্ষ্যের বিশেষ কিছু মূলনীতি রয়েছে। বিশেষত যেসব বিষয় অপরের হকের সাথে জড়িত, তাতে শাহাদাহ-এর জন্য নিজ কানে শোনা এবং সরেজমিনে উপস্থিত থাকা জরুরী। বিবাহের ক্ষেত্রেও এসব শর্ত প্রযোজ্য হবে। যথা-

১. বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষীগণের স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া এবং ইজাব ও কবুল উভয়টি একই মজলিসে সন্দেহাতীতভাবে শোনা এবং সুস্পষ্টভাবে বুঝা জরুরী। কারণ, এটিই শর'য়ী শাহাদাহ-এর প্রধান অঙ্গ।

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

---

২৭৫ আল হিদায়াঃ ২/৩০৬, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

২৭৬ আল মাবসূতঃ ৫/৩১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

২৭৭ বাদায়েউস সানায়েঃ ৩/৪০৫, দারুল হাদীস, কায়রো

لأن سماع الشهود كلام المتعاقدين شرط لجواز النكاح.

"সাক্ষী কর্তৃক দু'জন চুক্তিকারীর বাক্য শ্রবণ করা বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত।"[২৭৮]

তিনি আরো বলেন-

وحقيقة المعنى أن هذا السماع شهادة....

"প্রকৃত অর্থে শ্রবণ করাই হলো সাক্ষ্য।"[২৭৯]

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

لأن الشهاد أعني حضور الشهود شرط ركن العقد وركن العقد هو الإيجاب والقبول فما لم يسمعا كلاهما لا تتحقق الشهادة عن الركن فلا يوجد شرط الركن.

"সাক্ষীর উপস্থিতি বিবাহ-চুক্তির রুকন তথা মূল কাঠামো (অর্থাৎ, ইজাব-কবুল) শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। সাক্ষীদ্বয় যতক্ষণ ইজাব-কবুলকারীর কথা শ্রবণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ হবে না। সুতরাং রুকনের শর্তও পাওয়া যাবে না।"[২৮০]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

ونص القدوري وغيره على اشتراط السماع ولأنه المقصود بالحضور فلا يجوز بالأصمين على ما هو الأصح .

ثم الشرط أن يسمعا معا كلامهما مع الفهم. أما الأول فذكر في روضة العلماء أنه الأصح، قال وبه أخذ عامة العلماء اهـ. إذ لو سمع أحد الشهود ثم أعيد على الآخر فسمعه وحده لم يكن الثابت على كل عقد سوى شاهد واحد، وعن أبي يوسف: إن اتحد المجلس جاز استحسانا وإلا فلا، وعنه: لا بد من سماعهما معا. وأما الثاني فعن محمد: لو تزوجها بحضرة هنديين لم يفهما لم يجز.

"ইমাম কুদুরী রাহ.-সহ আরো অনেকে লিখেছেন, (সাক্ষীদ্বয় কর্তৃক ইজাব-কবুল) শ্রবণ করা শর্ত। আর সাক্ষীদের উপস্থিতির উদ্দেশ্যও এটাই। সুতরাং বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী দু'জন বধিরের সাক্ষীর দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না....।"[২৮১]

তাহলে ইজাব বা কবুল শোনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সন্দেহ থাকলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, আমরা দেখলাম বধিরের সাক্ষ্য এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না; কারণ সে শুনতে পায় না। এমনিভাবে পর্দার আড়াল থেকে কথা শুনলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

"ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد، ولو فسر للقاضي لا يقبله "لأن النغمة تشبه النغمة فلم يحصل العلم" إلا إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه، ثم جلس على الباب وليس في البيت

---

[২৭৮] আল মাবসূত: ৫/১৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন
[২৭৯] আল মাবসূত: ৫/৩৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন
[২৮০] বাদায়েউস সানায়ে: ৩/৪০৩, দারুল হাদীস, কায়রো
[২৮১] ফাতহুল ক্বাদীর: ৩/১৯৪-১৯৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه له أن يشهد، لأنه حصل العلم في هذه الصورة.

"যদি পর্দার অপর প্রান্ত হতে শ্রবণ করে, তাহলে তার জন্য সাক্ষ্য দেয়া বৈধ নয়। যদি সে বিচারকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করে, তাও বিচারক তা গ্রহণ করবে না। কেননা একজনের আওয়াজ অন্যজনের আওয়াজের সাথে মিলে যায়। সুতরাং এর দ্বারা কোনো বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না....।"[২৮২]

শুধু শুনলেই হবে না; ইজাব-কবুল পূর্ণরূপে বোঝাও জরুরী। আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

ثم الشرط أن يسمعا معا كلامهما مع الفهم.... فعن محمد: لو تزوجها بحضرة هنديين لم يفهما لم يجز.

"বিবাহের সাক্ষীর ক্ষেত্রে শর্ত হলো উভয় সাক্ষীই পাত্র-পাত্রির কথা শোনা এবং বোঝা।... ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকে বর্ণিত আছে, যদি দুইজন অনারব সাক্ষী (আরবীদের মজলিসে) উপস্থিত থাকে, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।"[২৮৩]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শাহাদাহ-এর ক্ষেত্রে সাধারণ নিশ্চয়তা বা অনুমান যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য অকাট্য নিশ্চয়তার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, বর্তমানে অডিও-ভিডিও কলের মাঝে এ ধরনের অকাট্য নিশ্চয়তা অনুপস্থিত; বরং এতে বিভিন্ন দিক থেকে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

২. যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হবে, তার পরিচিতি সম্পর্কে সাক্ষীর পূর্ণ অবগত থাকা এবং এ ব্যাপারে কোনো অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা বা সন্দেহ-সংশয় না থাকা জরুরী। বিবাহের শাহাদাহ -র ক্ষেত্রেও এ শর্ত প্রযোজ্য হবে। আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

ولو قال زوجت بنتي فلانة من ابنك، فقبل وليس لهما إلا ابن واحد وبنت صح، وإن كان لهما ابنتان أو ابنان لا، إلا أن يسميا البنت والابن.

"যদি পাত্রীর পিতা বলে, 'আমার অমুক মেয়েকে তোমার ছেলের সাথে বিবাহ দিলাম' এবং পাত্রের পিতা তার পক্ষ হতে কবুল করে নেয়, এমতাবস্থায় যদি তাদের দু'জনের শুধু একটি ছেলে ও একটি মেয়েই থাকে, তাহলে উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হবে। আর যদি তাদের দু'জন মেয়ে অথবা দু'জন ছেলে থাকে, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।"[২৮৪]

এমনিভাবে আল্লামা তাহতাবী রাহ. বলেন-

ولابد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة، ثم لايخلو إما أن تكون حاضرة مرئية بشخصها وإما أن تكون مسموعة الكلام غير مرئية الشخص وإما أن تكون غائبة عن المجلس فإن كانت حاضرة متنقبة كفى الإشارة إليها.

"সাক্ষীদ্বয়ের নিকট পাত্রী নির্দিষ্ট থাকতে হবে। কারণ, তার ব্যাপারে অজ্ঞতা না থাকা জরুরী।... যদি সে নিকাব পড়ে বিবাহের মজলিসে উপস্থিত হয়, তাহলে তার দিকে ইশারা করলেই যথেষ্ট

[২৮২] আল হিদায়া: ৩/১৫৮, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা
[২৮৩] ফাতহুল ক্বাদীর: ৩/১৯৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[২৮৪] ফাতহুল কাদীর: ৩/১৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

হবে।”[২৮৫]

অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত চুক্তি সম্পাদনের জন্য শাহাদাহ-এর শর্ত থাকে না। হ্যাঁ, চুক্তিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে সমস্যা হলে তখন শাহাদাহ-এর প্রয়োজন পড়ে এবং এক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত শর্তসমূহের উপস্থিতিও জরুরী হয়ে থাকে। কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য নয়, সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য এবং চুক্তি সম্পাদনের জন্যই শাহাদাহ-এর উল্লিখিত শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকা জরুরী। আল্লামা শিহাবুদ্দীন ইবনুশ শিলবী রাহ. (১০২১ হি.) বলেন-

والخاص الإشهاد؛ إذ الإشهاد ليس بشرط اه قال الشيخ باكير –رحمه الله–: وشرطه الخاص: حضور شاهدين لا ينعقد إلا به بخلاف بقية الأحكام، فإن الشهادة فيها للظهور عند الحاكم لا للانعقاد اه[২৮৬]

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহের মধ্যে দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতির শর্ত মূলত সাক্ষীর ন্যূনতম সংখ্যা হিসাবে করা হয়েছে। অন্যথায় সুন্নত হলো, যতটুকু সম্ভব প্রকাশ্যে বিবাহ করা, যেমনটি উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

فالتحقيق أنه لا خلاف في اشتراط الإعلان، وإنما الخلاف بعد ذلك في أن الإعلان المشترط هل يحصل بالإشهاد حتى لا يضر بعده توصيته للشهود بالكتمان إذ لا يضر بعد الإعلان التوصية بالكتمان أو لا يحصل بمجرد الإشهاد حتى يضر، فقلنا نعم وقالوا لا. ولو أعلن بدون الإشهاد لا يصح لتخلف شرط آخر وهو الإشهاد وعنده يصح. فالحاصل أن شرط الإشهاد يحصل في ضمنه الشرط الآخر، فكل إشهاد إعلان ولا ينعكس، كما لو أعلنوا بحضرة صبيان أو عبيد

“বাস্তবতা হলো, বিবাহের সংবাদ প্রচার করা বিবাহ-চুক্তির ক্ষেত্রে শর্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। মতবিরোধ হলো, সাক্ষী বানানোর দ্বারা ই‘লান বা প্রচারের শর্ত অর্জিত হয় কিনা-সে ব্যাপারে। আমাদের (হানাফীদের) মত হলো, সাক্ষী বানানোর দ্বারাই ই‘লান হয়ে যাবে। এমনকি যদি সাক্ষীদেরকে গোপন রাখতে বলে, তাও কোনো সমস্যা নেই। কারণ, সাক্ষ্যের দ্বারাই তো উদ্দিষ্ট ই‘লান হাসিল হয়ে গেছে। (অন্য ফকীহদের মতে এর বিপরীত। অর্থাৎ, শুধু সাক্ষ্যের দ্বারাই ই‘লান সম্পন্ন হবে না)

যদি সাক্ষী বানানো ব্যতীত এমনে ই‘লান করে, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে সাক্ষী বানানোর শর্ত পূরণ হয়নি। কোনো কোনো ফকীহের নিকট শুদ্ধ হবে।

সারকথা, সাক্ষী বানানোর শর্তের মাঝে ই‘লানের শর্তও বিদ্যমান আছে। তবে ই‘লান করার মধ্যে সাক্ষী বানানো বিদ্যমান নয়। যেমন, শিশু বা গোলামের উপস্থিতিতে ই‘লান করা (এতে ই‘লান পাওয়া গেলেও সাক্ষ্যের শর্ত পাওয়া যাচ্ছে না)।”[২৮৭]

৪. ‘ইত্তিহাদু মাজলিসিল আকদ’ তথা এক ও অভিন্ন মজলিসে ইজাব ও কবুল পাওয়া যাওয়া

যেকোনো চুক্তি বৈধ হওয়ার জন্য কুরআন ও সুন্নাহে ‘তারাযি’কে (পারস্পরিক সম্মতি) শর্ত

---

[২৮৫] হাশিয়াতুত তাহতাবী: ২/১০, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, ঢাকা

[২৮৬] হাশিয়াতু তাবয়ীনিল হাকাইক ২/৪৪৫, এইচ, এম, সাঈদ, পাকিস্তান

[২৮৭] ফাতহুল কাদীর: ৩/১৯২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

করা হয়েছে। ইজাব ও কবুলের সময় তারাযি বিদ্যমান আছে কিনা তা সহজে বোঝার জন্য শর্ত করা হয়েছে 'ইত্তিহাদুল মাজলিস'কে।

'ইত্তিহাদুল মাজলিস'-এর শাব্দিক অর্থ হলো, বৈঠক এক হওয়া। তবে ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় এর অর্থ আরো ব্যাপক। সারকথা হলো, ইজাব ও কবুল একসাথে পাওয়া যাওয়া, যাতে কবুল'টি ইজাবের দিকে সম্বন্ধিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ, ইত্তিহাদে যামানী-ই ইত্তিহাদে মাজলিস-এর মূল রুকন।

ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় ইত্তিহাদুল মাজলিসের মূল মানাত বা কেন্দ্রীয় বিষয় হলো, ইজাব ও কবুলের মাঝে সংযোগ ও সম্বন্ধ সৃষ্টি হওয়া। বাস্তবেই বৈঠকের অবস্থা (هيئة الجلوس) বিদ্যমান থাকা, স্থানগত একতা (اتحاد المكان), উপস্থিতি (الحضور) ইত্যাদি কোনোটাই এর মূল মানাত নয়। তবে এগুলো মূল মানাত প্রকাশের নিশ্চিত মাধ্যম।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

وصورة اختلاف المجلس أن يوجب أحدهما فيقوم الآخر قبل القبول أو يكون قد اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس، ثم قيل لا ينعقد لأن الانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالآخر وباختلاف المجلس يتفرقان حقيقة وحكما، فلو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز، وإن كانا في سفينة سائرة جاز، وستعرف الفرق في البيع إن شاء الله تعالى.

"ইখতিলাফে মাজলিস (বৈঠক পরিবর্তন হওয়া)-এর উদাহরণ হলো, এক পক্ষ ইজাব করার পর অপর পক্ষের কবুল করার পূর্বেই দাঁড়িয়ে যাওয়া অথবা এমন কোনো কাজে লিপ্ত হওয়া যার কারণে মাজলিস ভিন্ন হয়ে যায় (সুতরাং একস্থানে থাকার পরও 'ইখতিলাফে মাজলিস' হতে পারে)। কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, ইখতিলাফে মাজলিসের ক্ষেত্রে বিবাহ-চুক্তি সংঘটিত না হওয়ার কারণ হলো, এক্ষেত্রে ইজাব-কবুলের মাঝে গ্রহণযোগ্য সংযোগ ও সম্পর্ক পাওয়া যায় না। আর এ সংযোগ ও সম্পর্কই চুক্তির মূল বিষয়। আর ইখতিলাফে মাজলিসের দ্বারা ইজাব ও কবুল বস্তুত ও কার্যত ভিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং যদি দু'জন ব্যক্তি হাঁটা অবস্থায় বা সওয়ারির উপর আরোহণ করা অবস্থায় চুক্তি করে, তাহলে তা বৈধ হবে না। আর যদি তারা দু'জন চলন্ত নৌকায় থাকে, তাহলে তাদের চুক্তি বৈধ হবে। উভয় সূরতের মাঝে পার্থক্য ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে জানতে পারবেন (এখানে লক্ষণীয় যে, উভয় অবস্থায় স্থান এক। কিন্তু হুকুম দুই অবস্থায় ভিন্ন। সুতরাং স্থানগত একতা মূল মানাত নয়; বরং উভয়ের কথার মাঝে সংযোগটাই বিবেচ্য বিষয়)।"[২৮৮]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

(قوله: اتحاد المجلس) قال في البحر: فلو اختلف المجلس لم ينعقد، فلو أوجب أحدهما فقام الآخر أو اشتغل بعمل آخر بطل الإيجاب؛ لأن شرط الارتباط اتحاد الزمان، فجعل المجلس جامعا تيسيرا، وأما الفور فليس من شرطه، ولو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا يجوز، وإن كان على سفينة سائرة جاز اهـ.

---

[২৮৮] ফাতহুল কাদীর: ৩/১৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

أي: لأن السفينة في حكم مكان واحد. (قوله: لو حاضرين) احترز به عن كتابة الغائب لما في البحر عن المحيط: الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبلت في مجلس آخر لم يجز وفي الكتاب يجوز؛ لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر. فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر، وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب بالقبول فصح اهـ. ومقتضاه أن قراءة الكتاب في مجلس آخر لا بد منها ليحصل الاتصال بين الإيجاب والقبول، وإنما الفرق هو الكتاب، وإمكان قراءته ثانيا، فلو حذف قوله حاضرين كالنهر لكان أولى والظاهر أنه لو كان مكان الكتاب رسول بالإيجاب فلم تقبل المرأة ثم أعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخر فقبلت لم يصح؛ لأن رسالته انتهت أولا بخلاف الكتابة؛ لبقائها أفاده الرحمتي.

"আল বাহরুর রায়িক-এ উল্লেখ রয়েছে- যদি মজলিস ভিন্ন হয়, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। যদি একজন ইজাব করার পর অন্যজন উঠে দাঁড়িয়ে যায় বা অন্য কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। ইজাব-কবুলের মাঝে সংযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মৌলিক শর্ত হলো উভয়টার যামানা এক হওয়া। এক মজলিসকে এ শর্তের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ইজাব-কবুলের মাঝে সমন্বয়কারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে ইজাবের পর তাৎক্ষণিকভাবে কবুল পাওয়া যাওয়াটা শর্ত নয়।

যদি দু'জন ব্যক্তি হাঁটা অবস্থায় বা সওয়ারির উপর আরোহণ করা অবস্থায় চুক্তি করে, তাহলে তা বৈধ হবে না। আর যদি তারা দু'জন চলন্ত নৌকায় থাকে, তাহলে তাদের চুক্তি বৈধ হবে, কেননা বিধানগত দিক থেকে একটি নৌকা এক স্থান (মূলত নৌকার ক্ষেত্রে উভয়ের কথার মাঝে সংযোগটা সর্বদিক থেকে নিশ্চিত; কিন্তু উভয়ে হাঁটাবস্থায় বিষয়টি এমন নয়)।.....

অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে ইজাবপত্র পাঠ করা উপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে সম্বোধন করার ন্যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে ইজাব কবুলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বিবাহ শুদ্ধ হবে। তবে কবুলের মজলিসে ইজাব-পত্র পাঠ করা জরুরী, যেন ইজাব-কবুলের মাঝে সংযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং পত্র লিখনের সূরতেও ইত্তিহাদে মাজলিস জরুরী (লক্ষণীয় যে, স্থানগত একতা না থাকা সত্ত্বেও ইজাব-কবুলের মাঝে সংযোগকেই 'ইত্তিহাদে মাজলিস' বলে অভিহিত করা হচ্ছে)।...."[২৮৯]

আল্লামা মারগীনানী রাহ. বলেন-

وإنما يمتد إلى آخر المجلس لأن المجلس جامع للمتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب.

"ইজাব মজলিসের শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে। কারণ, মজলিসের ভেতর যা কিছু হয়, মাজলিস তার মাঝে সমন্বয় করে দেয়। মানুষের জন্য সহজতার প্রতি লক্ষ করে এক মজলিসের পুরো সময়কে এক সময় সাব্যস্ত করা হয়। পত্র প্রেরণ এক্ষেত্রে (বিধানগতভাবে) সরাসরি সম্বোধনের মতো। এমনিভাবে দূত প্রেরণও। উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন ইজাব-কবুলের মজলিস ধর্তব্য

[২৮৯] রদ্দুল মুহতার: ৪/৮৬-৮৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

হয়, তেমনি পত্র বা দূতের ক্ষেত্রে পত্র বা দূত পৌঁছার মজলিস ধর্তব্য হবে।"[২৯০]

ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেকোনো চুক্তির ক্ষেত্রে দুইজন কাছাকাছি বা পাশাপাশি অবস্থান করা মৌলিক শর্ত নয়। তারা বিভিন্ন উদাহরণ দেখিয়ে একথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। সাধারণ চুক্তির মাঝে বাহ্যত ফুকাহায়ে কেরাম যে ইত্তিহাদে মাকানীর শর্ত করেছেন, তা তাদের সমসাময়িক অবস্থার উপর ভিত্তি করেই করেছেন। তখন যেকোনো চুক্তি সাধারণত দুইভাবে হতোঃ

এক. উপস্থিত দুইজনের মাঝে।

দুই. অনুপস্থিত দুইজনের মাঝে।

তখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে দূরে অবস্থানরত দুইজনকে এক মজলিসে নিয়ে আসার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না। হয়তো এটা তাদের কল্পনাতেও ছিলো না। তাই তারা উপস্থিত দুইজনের মাঝে চুক্তির সম্ভাব্য সূরতগুলো উল্লেখ করেছেন। যেমন, একই স্থানে হওয়া, দুই নৌকায় বা ঘোড়ায় হওয়া বা বাহনে হওয়া বা দুই পাহাড়ে হওয়া ইত্যাদি।

ইত্তিহাদুল মাজলিসের ক্ষেত্রে সকল চুক্তিই কি এক রকম, না কোনো কোনো চুক্তি এর ব্যতিক্রম রয়েছে- এ বিষয়টি এখানে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ফুকাহায়ে কেরামের সার্বিক আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ চুক্তি এক জায়গায় বসে করা শর্ত নয়। দুই জায়গা থেকেও ইত্তিহাদে মাজলিস হতে পারে। এটা সাধারণ চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে বিশেষ কিছু চুক্তির ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থেই ইত্তিহাদে মাকানি শর্ত। যেমন, বাইয়ে সরফ (স্বর্ণ-রূপার পারস্পরিক লেনদেন) যাতে তাকাবুয (উভয়পক্ষের কবযা বা হস্তগত করা) শর্ত। এটি ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি হলেও তাকাবুযের শর্তের কারণে এতে ইত্তেহাদে মাকানি জরুরী। যেহেতু তাকাবুয বাইয়ে সরফের বিশেষ শর্ত, যা প্রকৃত অর্থেই ইত্তিহাদে মাকানি না হলে সম্ভব নয়, তাই ফুকাহায়ে কেরাম এখানে প্রকৃত অর্থেই ইত্তিহাদে মাকানি শর্ত করেছেন। এমনিভাবে বাইয়ে সালামের ক্ষেত্রে যেহেতু মূল্য উপস্থিত চুক্তিস্থলে প্রদান করা জরুরী, তাই এতেও ইত্তিহাদে মাকানি শর্ত।

পূর্বের আলোচনা মনে থাকলে সহজেই বোঝা যায় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে যেহেতু ইজাব ও কবুল এবং শাহাদাহ আবশ্যক, তাই এতে প্রকৃত অর্থেই ইত্তিহাদে মাকানি শর্ত। কেউ কেউ এ শর্তের ব্যাপারে কিছুটা শৈথিল্য প্রকাশ করলেও বিবাহের ইজাব-কবুল এবং শাহাদাহ'র শর্তের বিষয়ে সকল দলীল ও মানাত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত অর্থেই বিবাহের ক্ষেত্রে ইত্তিহাদে মাকানি জরুরী। অথচ এই শর্ত সরাসরি অডিও-ভিডিও কলে বা চ্যাটিং-এর মাধ্যমে বিবাহের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। সামনে এ ব্যাপারে মুফতিয়ানে কেরামের কিছু ফাতাওয়া উল্লেখ করা হবে।

অডিও-ভিডিও কল ও ম্যাসেজিং-এর মাধ্যমে বিবাহ-চুক্তি সম্পাদনের শর'য়ী বিধান

বিবাহ-চুক্তির ক্ষেত্রে শর'য়ী মূলনীতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশেষ শর্ত ও বিধান সম্পর্কে কিছু মৌলিক ধারণা আমরা লাভ করেছি। এর আলোকে এখানে আমরা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বিবাহ-

---

[২৯০] আল হিদায়াঃ ৩/১৯, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

চুক্তি সম্পাদনের বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করবো। প্রযুক্তির সাহায্যে বিবাহ-চুক্তি সম্পাদনের তিনটি রূপ হতে পারে-

১. ভিডিও কল: সরাসরি ভিডিও কল বা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ইজাব-কবুল। যাতে এক পক্ষ অপর পক্ষকে সরাসরি দেখতে পায় এবং তার কথা শুনতে পায়। যেমন, স্কাইপ, ইমো বা অন্য যেকোনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে ভিডিও কল।

২. অডিও বা ভয়েস কল: সরাসরি ভয়েস কলের মাধ্যমে ইজাব-কবুল, যাতে এক পক্ষ অপর পক্ষের কথা শুনতে পেলেও সরাসরি একে অপরকে দেখতে পায় না।

৩. লিখিত চ্যাটিং: ই-মেইল বা এস এম এস এর মাধ্যমে লিখিত আকারে ম্যাসেজিং বা চ্যাটিং এর মাধ্যমে ইজাব-কবুল।

আমরা পিছনে পড়ে এসেছি যে, বিবাহের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এক. নিশ্চিতরূপে ইজাব ও কবুল বিদ্যমান থাকা।

দুই. সাক্ষীর উপস্থিতি ও শ্রবণ। (এ শর্ত বাস্তবায়নের জন্য শর্ত করা হয়েছে ইত্তিহাদে মাজলিস তথা বিবাহের মজলিস কায়েম করে সামনা-সামনি ইজাব-কবুল করা)

এখন আমরা দেখবো, অডিও-ভিডিও কলের মাধ্যমে সরাসরি বিবাহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় দু'টি পাওয়া যায় কিনা?

প্রথমত: মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলশ্রুতিতে প্রতিটি বিষয়ে সর্বত্র অনিশ্চয়তার সয়লাব বিরাজ করছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে সকল ক্ষেত্রে যেমন সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে, তেমনি নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থা ডিঙ্গিয়ে স্বার্থ হাসিলের নানা ধরনের অবৈধ পথও খুলে গেছে। প্রযুক্তির কল্যাণে জটিলতাপূর্ণ বিভিন্ন কাজও হয়ে গেছে পানির মতো সহজ। আর বর্তমানে সামাজিক বন্ধনহ্রাস পাওয়ায় লাভ ম্যারেজ ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। ধোঁকা ও প্রতারণার অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বিবাহ ও নারী ।

এ প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তির ব্যবহারে রয়েছে বাড়তি ঝুঁকি। কারণ, মানুষ এতে সহজেই বিভিন্নভাবে বিকৃতি ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে। অডিও-ভিডিও কলে আওয়ায বিভ্রাট ও প্রতারণার কিছু বহুল প্রচলিত রূপ ও প্রক্রিয়া নিম্নে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. হ্যাকিং: হ্যাকিং-এর বিষয়টি আমাদের নিকট অজানা নয়। যেকোনো সফটওয়্যারের (যেমন, ফেসবুক, স্কাইপ, ইমো ও অন্যান্য) আইডি বা ফোন নাম্বার হ্যাক করা যায়। হ্যাক করার দ্বারা হ্যাকার সে আইডি বা নাম্বারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে। আসল মালিক স্বাধীনভাবে আর তা ব্যবহার করতে পারে না। হ্যাকার সে আইডি ব্যবহার করে আসল মালিকের রূপ ধারণ করে অনয়াসেই নিজের যেকোনো কার্যসিদ্ধি করতে পারে।

২. ক্লোনিং: হ্যাকিং- এর চেয়ে আরো মারাত্মক জালিয়াতির পদ্ধতি হলো ক্লোনিং। প্রায় সব ধরনের ফোন নাম্বার ও আইডি ক্লোন করা যায়। হ্যাকিং-এর মতো ক্লোনিং-এর ক্ষেত্রে আইডি বা নাম্বার ক্লোনার নিয়ন্ত্রণ করে না; বরং তা পূর্বের মতো মালিকের নিয়ন্ত্রণেই থাকে। তবে ক্লোনার একই নাম্বার ও আইডি কপি করে নিজেও ব্যবহার করে। অর্থাৎ, সে নাম্বার বা আইডির দ্বিতীয় আরেকটি জাল সংস্করণ ক্লোনারের হাতে থাকে। আসল মালিক বা আইডিধারী জানতেই

পারে না যে, তার নাম্বার বা আইডি অপর এক ব্যক্তিও ব্যবহার করছে।[২৯১,২৯২]

৩. ভয়েস চেঞ্জিং: বর্তমানে ভয়েস চেঞ্জিং বা আওয়াজ/স্বর পরিবর্তনের এ্যাপস ও সফটওয়্যারের কোনো অভাব নেই। এসব সফটওয়্যার দ্বারা নারী কণ্ঠকে পুরুষ কণ্ঠ, পুরুষ কণ্ঠকে নারী কণ্ঠ বা বয়স্কের কণ্ঠকে শিশুর কণ্ঠে রূপান্তরিত করা খুবই সহজ। যেকোনো ধরনের স্বর পরিবর্তন, পরিশীলন ও বিকৃতি এর মাধ্যমে করা যায়।

৪. এডিটিং: পূর্বে ধারণকৃত অডিও-ভিডিও ক্লিপকে এডিট, কাটিং বা ডাবিং করে নতুন রূপদান করে তা সরাসরি সম্প্রচারিত ভিডিও (Live video) আকারে পেশ করা সম্ভব, যা যে কেউ শুনে বা দেখে অনায়াসে মনে করে নিবে যে, অপর প্রান্ত হতে কেউ সরাসরি কথা বলছে অথবা ইজাব-কবুল করছে।

৫. অন্যান্য সমস্যা: কখনো কখনো নেটওয়ার্কের গোলযোগের কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন, আওয়ায আটকে যাওয়া, বিকৃত হওয়া, অস্পষ্ট হওয়া, বন্ধ হয়ে যাওয়া, একই আওয়াজ বারবার উচ্চারিত হওয়া ইত্যাদি।

তাছাড়া ফোনের মাধ্যমে সবার আওয়ায সব সময় তার প্রকৃত স্বরে আসে না। তাই কখনো কখনো একেবারে পরিচিত কণ্ঠস্বরও ফোনে শনাক্ত করা কঠিন হয়ে যায়।

এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ জালিয়াতি ও অনিশ্চয়তার কয়েকটি ধরন ও রূপ উল্লেখ করেছি, যা সাধারণ মানুষের নাগালেই রয়েছে। এছাড়াও আরো অনেকভাবে প্রযুক্তিকে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে।

এজন্যই এর মাধ্যমে গ্রহণকৃত বা প্রদানকৃত ইজাব-কবুল গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিবাহের ইজাব-কবুলের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের নিশ্চয়তা হাসিল হওয়া শর্ত, যা এখানে অনুপস্থিত।

দ্বিতীয়ত: দূরবর্তী দুই ব্যক্তির মাঝে অডিও-ভিডিও অথবা ই-মেইল বা ম্যাসেজের মাধ্যমে সরাসরি বিবাহের ক্ষেত্রে আরেকটি মৌলিক শর'য়ী সমস্যা হলো, এতে শর'য়ী শাহাদাহ সম্ভব নয়। কারণ, শাহাদাহ একমাত্র সম্ভব একই স্থানে পাত্র-পাত্রী বা তাদের প্রতিনিধি একত্রিত হলে। কারণ, সাক্ষীর জন্য উভয় পক্ষের সঙ্গে একসাথে অবস্থান করা এবং তাদের কথা এক মজলিসে শ্রবণ করা জরুরী, যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাহাদাহ-এর শর্ত ও বিবাহ-চুক্তির গুরুত্বের কারণে বিবাহের ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থেই এক মজলিসে ইজাব-কবুল হওয়া জরুরী। এ শর্তটিও এখানে অনুপস্থিত। সুতরাং এ সূরতে বিবাহ-চুক্তি অনুষ্ঠিত হবে না। আর বৈধ তো হবেই না।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাহাদাহ বা সাক্ষ্য সর্বদা উপস্থিত ও চাক্ষুষ ব্যাপারেই হতে পারে। ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা আর সাক্ষ্যের নিশ্চয়তার মাঝে তফাৎ আছে। এতে অকাট্য নিশ্চয়তা শর্ত। কারণ, এ সাক্ষ্যের মাধ্যমে অন্যের হক্বের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হয়।

এজন্য টেলিফোন, রেডিও, টিভি বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে (যদিও তা লাইভ বা সরাসরিই

---

[২৯১] The difference between getting 'hacked' and getting 'cloned' on Facebook, RicksDailyTips Newsletter (weekly), Jan 14, 2017.

[২৯২] দেখুন: এ বইয়ের 'শরী'আতের দৃষ্টিতে হ্যাকিং' শীর্ষক প্রবন্ধ।

হয়) কখনো সাক্ষ্য গ্রহণ বা প্রদান শুদ্ধ নয়। সাক্ষ্যের এ পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি স্পষ্ট ও সর্বজনস্বীকৃত। ইসলামী আইন ছাড়া অন্যান্য আইনেও বিষয়টি স্বীকৃত।

অডিও-ভিডিও কল-এর মাধ্যমে সরাসরি বিবাহের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর'য়ী শর্তগুলো পাওয়া না যাওয়ার কারণে তা শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে অশুদ্ধ ও অবৈধ।এ ব্যাপারে বিভিন্ন দারুল ইফতা, ফাতওয়া বোর্ড এবং মুফতিয়ানে কেরামের কিছু ফাতাওয়া ও সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো (তাঁরা বিকল্প শরী'আতসম্মত পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করেছেন। সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে)।

এ সংক্রান্ত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর একটি সিদ্ধান্তের ভাষ্য নিম্নরূপ:

القرار رقم (٦/٣/٥٤) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي ... قرر:

١- إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.

٢- إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

٣- إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابًا محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

٤- **إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال**.....

"বিবাহের মাঝে শাহাদাহ-এর শর্ত থাকার কারণে অন্যান্য লেনদেনের বিপরীতে বিবাহের ক্ষেত্রে টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে আকদ বা চুক্তি শুদ্ধ হবে না...।"

ইসলামিক ফিকহ একাডেমী, ইন্ডিয়া'র সিদ্ধান্ত-

(۱) "مجلس" سے مراد وہ حالت ہے جس میں عاقدین کسی معاملہ کو طے کرنے میں مشغول ہوں۔ "اتحاد مجلس" کا مقصد ایک ہی وقت میں ایجاب کا قبول سے مربوط ہونا ہے۔ اور "اختلاف مجلس" سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں ایجاب وقبول میں ارتباط کا تحقیق نہ ہو سکے۔

(۲) الف- فون اور وڈیو کانفرنسگ کے ذریعہ بیع میں ایجاب و قبول معتبر ہو گا، انٹرنیٹ پر بھی اگر بیک وقت عاقدین موجود ہوں اور ایجاب کے بعد فورا دوسرے کی طرف سے قبول ظاہر ہو جائے تو بیع منعقد ہو جائے گی، اور ان صورتوں میں

عاقدین کو متحد المجلس تصویر کیا جائے گا۔.............

(۴) نکاح کا معاملہ بہ مقابلہ عقد بیع کے زیادہ نازک ہے، اس میں عبادت کا بھی پہلو ہے، اور گواہان کی شرط بھی ہے اس لیے انٹرنیٹ ویڈیو کانفرنسنگ اور فون پر براہ راست نکاح کا ایجاب وقبول معتبر نہیں، البتہ اگر ان ذرائع ابلاغ پر نکاح کا وکیل بنایا جائے اور وہ گواہان کے سامنے اپنے مؤکل کی طرف سے ایجاب وقبول کر لے تو نکاح درست ہو جائے گا، اس صورت میں یہ بات ضروری ہو گی کہ گواہان وکیل بنانے والے غائب شخص سے واقف ہوں یا ایجاب وقبول کے وقت اس کا نام مع ولدیت ذکر کیا جائے۔

"... (৪) বিবাহের বিষয়টি ব্যবসা-বাণিজ্যের তুলনায় অধিক নাযুক। বিবাহের মধ্যে ইবাদতের অংশ রয়েছে এবং সাক্ষীর শর্তও রয়েছে। এজন্য ইন্টারনেট, ভিডিও কনফারেন্স বা ফোনে সরাসরি বিবাহের ইজাব-কবুল গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যদি এসব যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে কাউকে বিবাহের ওয়াকীল বানানো হয় এবং সে দু'জন সাক্ষীর সামনে নিজের মুয়াক্কিলের পক্ষ হতে ইজাব-কবুল করে নেয়, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে এ সূরতে এটা জরুরী যে, সাক্ষীদ্বয় অনুপস্থিত মুয়াক্কিলের ব্যাপারে অবগত থাকতে হবে অথবা ইজাব-কবুলের সময় তার ও তার পিতার নামসহ পরিচয় তুলে ধরতে হবে।"[২৯৩]

আল-লাজনাতুদ্দাইমা লিল ইফতা, সৌদি আরব-এর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ-

"نظرا إلى ما كثر في هذه الأيام من التغرير والخداع ، والمهارة في تقليد بعض الناس بعضا في الكلام وإحكام محاكاة غيرهم في الأصوات حتى إن أحدهم يقوى على أن يمثل جماعة من الذكور والإناث صغارا وكبارا، ويحاكيهم في أصواتهم وفي لغاتهم المختلفة محاكاة تلقي في نفس السامع أن المتكلمين أشخاص، وما هو إلا شخص واحد، ونظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بحفظ الفروج والأعراض، والاحتياط لذلك أكثر من الاحتياط لغيرها من عقود المعاملات- رأت اللجنة أنه ينبغي ألا يعتمد في عقود النكاح في الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات التليفونية؛ تحقيقا لمقاصد الشريعة، ومزيد عناية في حفظ الفروج والأعراض حتى لا يعبث أهل الأهواء ومن تحدثهم أنفسهم بالغش والخداع. وبالله التوفيق"

"নারীর সম্ভ্রম ও ইজ্জতের হেফাযত, বিবাহের গুরুত্ব, ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে নিরাপত্তা এবং ইসলামী শরীআ'তের মাকাসিদের (লক্ষোদ্দেশ্যের) প্রতি লক্ষ করে ফাতওয়া বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বিবাহের ইজাব-কবুল ও প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ফোনের কথোপকথনের উপর নির্ভর করা উচিত নয়।"[২৯৪]

হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

جواب: نکاح میں چونکہ یہ ضروری ہے کہ **دو گواہ مجلس نکاح میں حاضر ہوں اور ایجاب وقبول دونوں سنیں**، اس لئے ٹیلی فون پر نکاح درست نہیں ہوتا، اگر دوسرے شہر یا ملک میں نکاح کرنا ہو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس شہر میں کسی شخص

---

[২৯৩] জাদিদ ফিকহী মাবাহিছ: ২১/২১৭, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, পাকিস্তান
[২৯৪] ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দাইমা: ১৮/৯০

کو اپنے نکاح کا وکیل مقرر کر دیں، وکیل اس کی طرف سے دوسرے فریق کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرے، اس طرح نکاح صحیح ہو جائے گا۔[২৯৫]

“বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরি হলো দু’জন সাক্ষী বিবাহের মজলিসে উপস্থিত হবে এবং উভয়ে ইজাব-কবুল শ্রবণ করবে। সরাসরি ফোনের সাহায্যে সম্পাদিত বিবাহের মাঝে এটা সম্ভব নয়। তাই সরাসরি ফোনের সাহায্যে সম্পাদিত বিবাহ শুদ্ধ নয়। তবে যদি দূরবর্তী কোন শহরে বা দেশের কাউকে বিবাহ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সেখানকার কাউকে নিজের উকিল বানাবে। উকিল তার পক্ষ থেকে অপর পক্ষের সাথে দু’জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল করবে। এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে বিবাহ শুদ্ধ হবে।”

দারুল ইফতা, দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত একটি ফাতওয়া নিম্নরূপ:

نکاح کے وقت عاقدین اور گواہوں کا مجلس نکاح میں ہونا ضروری ہے، اور یہ ٹیلیفون پر ممکن نہیں اس لیے ٹیلیفون پر نکاح جائز نہیں۔ در مختار میں ہے: ومن شرائط الإیجاب والقبول اتحاد المجلس لو حاضرین وإن طال کمخیرۃ۔ (الدر المختار مع الشامي: ۴/ ۷۶، ط زکریا دیوبند) البتہ اگر وہ شخص ٹیلیفون پر کسی کو اپنا وکیل بنادے کہ وہ اس کی طرف سے فلاں لڑکی کے نکاح کو قبول کرلے پھر یہاں مجلس نکاح منعقد کی جائے اور قاضی صاحب یا لڑکی کے والد وغیرہ جو بھی نکاح پڑھائیں وہ کہیں کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح فلاں شخص سے کیا اور وکیل کہے کہ میں نے اس لڑکی کو فلاں کے نکاح میں قبول کیا، پس اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا۔[২৯৬]

জামেআতুল উলূমিল ইসলামীয়্যাহ, বিন্নুরী টাউন-এর একটি ফাতওয়ায় উল্লেখ করা হয়:

نکاح منعقد ہونے کے لئے شرعا یہ ضروری ہے کہ **مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کرنے والے دو مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی اس طور پر ایجاب و قبول کرے کہ یہی دو گواہان ان کی ایجاب و قبول کو سن لیں**۔ چونکہ ٹیلی فون پر مجلس ایک نہیں ہوتی ہے اگرچہ تصویر آرہی ہو اس لئے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔[২৯৭]

হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী রাহ.[২৯৮] বলেন-

ج... نکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول مجلسِ عقد میں **گواہوں کے سامنے** ہو اور ٹیلیفون پر یہ بات **ممکن نہیں**، اس

---

[২৯৫] ফাতাওয়ায়ে উসমানী: ২/৩০৬, কুতুবখানায়ে নাঈমিয়্যা, দেওবন্দ

[২৯৬] দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহিত, ফতওয়া নং ৯২৩, প্রকাশকাল-১০ জুলাই/২০১৭

[২৯৭] জামে‘আতুল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, বিন্নুরী টাউন-এর ফাতওয়া বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহিত

[২৯৮] মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী বিন আলহাজ্ব চৌধুরী। তিনি ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা জেলায় ১৩৫১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০০ ঈসায়ীর মে মাসে করাচীতে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার উস্তাদ ছিলেন। শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রাহ. ও ডা. আব্দুল হাই রাহ.-এর খলিফা ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ‘ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকিম’, ‘আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল’ তাঁর রচিত কিতাবসমূহের অন্যতম। (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল-এর ভূমিকা: ১২-১৬)

لئے ٹیلیفون پر نکاح نہیں ہوتا۔ اور اگر ایسی ضرورت ہو تو ٹیلیفون پر یا خط کے ذریعہ لڑکا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنادے اور وہ وکیل لڑکے کی طرف سے ایجاب وقبول کرلے۔ چونکہ آپ کی تحریر کردہ صورت میں نکاح نہیں ہوا اس لئے اب رُخصتی سے پہلے ایجاب وقبول گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ کرالیا جائے۔[২৯৯]

বিকল্প শরী'আতসম্মত পদ্ধতি

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, সরাসরি অডিও-ভিডিও কলের মাধ্যমে বিবাহ কোনো নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। কারণ, শরী'আত এমন কিছু বিকল্প পদ্ধতি রেখেছে যা অতি সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত। সুতরাং প্রয়োজনের অজুহাত দিয়ে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করার সুযোগ নেই। নিম্নে দূরবর্তী দুইজনের মাঝে বিবাহের শরী'আতসম্মত কিছু পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো-

১. ওয়াকালাত

অনুপস্থিত বা ভিন্নস্থানে অবস্থানরত পাত্র-পাত্রীর মাঝে ওয়াকালাতের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন। এ ব্যাপারে পূর্বে একাধিক ফাতাওয়া ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি, ওয়াকালাত অর্থ হলো, মুয়াক্কিল কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে তার পক্ষ থেকে কোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্য নিয়োগ করা। ওয়াকীল বানানোর জন্য মুয়াক্কিল 'আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে ওয়াকীল বানালাম' বা 'তুমি আমার পক্ষ থেকে (বিবাহের ইজাব) কবুল করবে' এ জাতীয় ভাষায় প্রস্তাব পেশ করলে এবং অপর পক্ষ (ওয়াকীল) সম্মতিসূচক যেকোনো শব্দ দ্বারা ওয়াকালাতের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিলেই চলবে।

টেলিফোন, মোবাইল, অনলাইন-অফলাইন যেকোনো প্রকার চ্যাটিং-এর সাহায্যে এভাবে ওয়াকালাত বা অপরকে দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করা যাবে। এতে অন্যান্য শর'য়ী শর্তসমূহ পালন করা হলে) শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা নেই।

উপরোক্ত দুই সূরতে মূলত প্রযুক্তির মাধ্যমে সরাসরি বিবাহ করা হচ্ছে না। শুধু 'তাওকীল' (ওয়াকীল বানানো) হচ্ছে। এজন্য ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এ সূরতটি একেবারেই নির্ঝঞ্ঝাট।

বিবাহের ওয়াকালাতের ক্ষেত্রে শরী'আত কিছুটা বাড়তি ছাড় রেখেছে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে শুধু তৃতীয় ব্যক্তিকেই ওয়াকীল বানানো জরুরী নয়; বরং পাত্র-পাত্রীদের যেকোনো একজন অপরের পক্ষ থেকেও ওয়াকীল হতে পারে। তখন সে একাধারে দু'পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করবে। নিজের পক্ষে 'আসীল' বা মূল চুক্তিকারী হিসেবে। অপর পক্ষের ওয়াকীল বা প্রতিনিধি হিসেবে। ফিকহের সাধারণ নীতি অনুসারে এক ব্যক্তির একইসাথে 'আসীল' ও 'ওয়াকীল' হওয়া বা দু'পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার অবকাশ নেই; কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে তার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

أن قوله: زوجيني نفسك تفويض للعقد إليها، وكلام الواحد في باب النكاح يصلح لإتمام العقد إذا كان الأمر مفوضا إليه من الجانبين فيمكن أن يجعل قولها زوجت نفسي عقدا تاما، وفي باب البيع كلام الواحد لا

---

[২৯৯] আপকে মাসাইল আওর উনকা হল: ৫/২৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

يصلح لإتمام العقد من الجانبين، وإن كان مفوضا إليه من الجانبين فكان قوله بعت منك شطر العقد، فلا بد من أن ينضم إليه الشطر الثاني ليصح.........

(قال) : ويجوز للواحد أن ينفرد بالعقد عند الشهود على الاثنين **إذا كان وليا لهما أو وكيلا عنهما**.

"পুরুষের বক্তব্য- 'আমাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও' মহিলাকে পুরুষের পক্ষ হতে বিবাহ-চুক্তি সম্পাদন করার দায়িত্ব প্রদান করা বোঝায়। আর যখন উভয় পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, তখন একজন ব্যক্তির কথা বিবাহ-চুক্তি পূর্ণ করার যোগ্যতা রাখে। সুতরাং এখানে মহিলার প্রতিউত্তর 'আমি নিজেকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলাম' পূর্ণ বিবাহ-চুক্তি সংঘটনের জন্য যথেষ্ট। আর (এর বিপরীত) লেনদেনের মধ্যে একজন ব্যক্তির কথা দু'জন ব্যক্তির পক্ষ হইতে চুক্তি পূর্ণ করার যোগ্যতা রাখে না। যদিও উভয়ের পক্ষ হতে চুক্তি সম্পাদন করার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং একজনের বক্তব্য- 'আমি তোমার নিকট বিক্রয় করলাম' চুক্তির একাংশ। এর সাথে অপর অংশ মিলাতে হবে, যেন চুক্তিটি শুদ্ধ হয়।

লেখক বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি (নারী-পুরুষ) উভয়ের অভিভাবক বা ওয়াকীল হয়, তাহলে সে একাই দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল করে বিবাহকে পূর্ণ করতে পারবে।"[৩০০]

সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহের ক্ষেত্রে ওয়াকালাতের নিম্নোক্ত সূরতসমূহ হতে পারে-

ক. ভিন্নস্থানে অবস্থানরত পাত্র বা পাত্রী তৃতীয় কোনো একজন ব্যক্তিকে ওয়াকীল বানাবে। ওয়াকীল বিবাহের যেকোনো এক পক্ষের সাথে থাকবে। উক্ত পক্ষ ও ওয়াকীলের মাঝে সাক্ষীদের সামনে ইজাব-কবুল হবে।

উল্লেখ্য, ওয়াকীল বানানোর কাজটি টেলিফোনের মাধ্যমেও হতে পারে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. পাত্র-পাত্রী যেকোনো একজন অপরকে তার পক্ষ থেকে কবুলের জন্য ওয়াকীল বা প্রতিনিধি বানাবে। এক্ষেত্রে ওয়াকীল (পাত্র-পাত্রীদের একজন) 'আসীল' হিসেবে নিজের পক্ষ থেকে ইজাব বলবে, আর 'ওয়াকীল' হিসেবে অপরের পক্ষ থেকে কবুল করবে। তবে সর্বাবস্থায় শর'য়ী সাক্ষ্যের যে বিবরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বিদ্যমান থাকা জরুরী। শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. বলেন-

(قال:) وإذا كان العقد من الوكيل بشهود جاز، وإن لم يكن على التوكيل شهود؛ لأن التوكيل بالنكاح ليس بنكاح، والشهود من خصائص شرائط النكاح وإنما شرط الشهود في النكاح؛ لأنه يتملك به البضع فلإظهار خطره اختص بشهود وذلك لا يوجد في التوكيل فإن البضع لا يتملك بالتوكيل فهو بمنزلة التوكيل بسائر العقود.

"যদি সাক্ষীর উপস্থিতিতে ওয়াকীলের পক্ষ হতে বিবাহ-চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাহলে তা শুদ্ধ হবে। তবে ওয়াকীল বানানোর উপর কোনো সাক্ষী না থাকলেও চলবে। কারণ, বিবাহের ওয়াকীল বানানোটা মূলত বিবাহ নয়। আর সাক্ষীর উপস্থিতি বিবাহের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষীর শর্তারোপ করার কারণ হলো, বিবাহের মাধ্যমে শারীরিক চাহিদা মেটানোর বৈধ অধিকার অর্জন হয়। এর গুরুত্ব প্রকাশ করার লক্ষ্যে বিবাহের মধ্যে সাক্ষীর

[৩০০] আল মাবসূত: ৫/১৬-১৭ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

শর্তারোপ করা হয়েছে। আর এ বিষয়টি ওয়াকীল বানানোর ক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। কেননা ওয়াকীল বানানোর দ্বারা যৌন চাহিদা মিটানোর অধিকার অর্জিত হয় না। সুতরাং বিবাহের ওয়াকীল বানানো অন্যান্য লেনদেনের ওয়াকীল বানানোর মতোই।"[৩০১]

২. চিঠি ও দূত মারফত ইজাব-কবুল

পাত্র-পাত্রীদের মাঝে চিঠি বা দূত মারফতও আকদে নিকাহ এবং ইজাব-কবুল সংঘটিত হতে পারে। চিঠির ক্ষেত্রে তো প্রেরক চিঠিতে ইজাব লিখে দিবে এবং প্রাপক নিয়মানুযায়ী সাক্ষীদের সামনে তা পড়ে কবুল করবে। আর দূত প্রেরণের ক্ষেত্রে দূত প্রেরকের পক্ষ থেকে প্রাপককে ইজাব পৌঁছিয়ে দিবে।

ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত চিঠি ও দূতের সূরতকে একসাথে উল্লেখ করে থাকেন। কারণ, তাদের যুগে এ দু'টির সূরত প্রায় কাছাকাছিই ছিলো। পার্থক্য ছিলো সূক্ষ্ম। কারণ, চিঠির সাথে বাহকও থাকতো। তবে চিঠির বাহকের কাজ হলো, শুধু চিঠিটি পৌঁছানো। ইজাব তো চিঠিতেই আছে। আর দূত স্বয়ং প্রেরকের পক্ষ থেকে ইজাবটি পৌঁছায়। প্রাপক সাথে সাথে কবুল না করলে আর কবুলের সুযোগ থাকে না। পক্ষান্তরে চিঠির ইজাব চিঠিতে বাকি থেকে যায়। এজন্য কবুলকারী ভিন্ন মজলিসেও (শাহাদাহ ও অন্যান্য শর্তসাপেক্ষ) কবুল করতে পারে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

আধুনিক যোগাযোগ-মাধ্যমে লিখিত ইজাব-কবুল চিঠির ইজাব-কবুলের সাথেই সামঞ্জস্যশীল, যেমনটি বিস্তারিত সামনে আসছে। সমকালীন ফকীহগণও তাই বলেছেন। তাই সামনে আমরা চিঠির মাধ্যমে ইজাব-কবুলের শর'য়ী পদ্ধতি উল্লেখ করে তার আলোকে ম্যাসেজিং বা চ্যাটিং-এর মাধ্যমে বিবাহের শর'য়ী বিধান ও রূপরেখা বর্ণনা করবো।

যেহেতু বিবাহের ইজাব-কবুল শুদ্ধ হবার জন্য শাহাদাহ শর্ত এবং সাক্ষীদেরও ইজাব-কবুল একই সঙ্গে একই মজলিসে শ্রবণ করা জরুরী, তাই চিঠির মাধ্যমে এক পক্ষ ইজাব প্রেরণ করলে, আর অপর পক্ষ সরাসরি কবুল প্রেরণ করলে বিবাহ সংঘটিত হবে না।

চিঠির মাধ্যমে বিবাহের শরী'আতসম্মত পদ্ধতি হলো, এক পক্ষ (নির্দিষ্ট ভাষায়) ইজাব বা প্রস্তাব প্রেরণ করবে। আর অপর পক্ষ বা তার প্রতিনিধি সে ইজাব শর'য়ী সাক্ষীদের সামনে পড়ে শুনাবে এবং নিজের কবুল ব্যক্ত করবে। সাক্ষীগণ নিয়মতান্ত্রিক ইজাব-কবুলের (উপস্থিত দু'ব্যক্তির মাঝে যা হয়ে থাকে) মতো ইজাব ও কবুল একই মজলিসে শুনবে এবং বুঝবে। আরো অন্যান্য শর্তও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যেমন, পাত্র-পাত্রীর একে অপরের পরিচিতি সম্পর্কে অবগত থাকা এবং সাক্ষীদেরও তাদের পরিচিতি জানা থাকা ইত্যাদি। ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

---

[৩০১] ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন: (আল মাবসূত ৫/২১-২২)

(قال) : وإذا أرسل إلى المرأة رسولا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا فهو سواء؛ لأن الرسالة تبليغ عبارة المرسل إلى المرسل إليه ولكل واحد من هؤلاء عبارة مفهومة فيصلح أن يكون رسولا ألا ترى أن سليمان – عليه السلام – جعل الهدهد رسولا في تبليغ كتابه إلى بلقيس فالآدمي المميز أولى أن يصلح لذلك فإذا بلغ الرسالة فقال: إن فلانا سألك أن تزوجيه نفسك فأشهدت أنها قد تزوجته كان ذلك جائزا. (المبسوط ٥/٢١–٢٢)

لو كانت حين بلغها الكتاب قرأته على الشهود وقالت: إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه فهذا صحيح؛ لأنهم سمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم إما بقراءة الكتاب أو العبارة عنه وسمعوا كلامها حيث أوجبت العقد بين أيديهم فلهذا تم النكاح.

যদি পুরুষের চিঠি মহিলার নিকট পৌঁছার পর মহিলা সাক্ষীদের সামনে তা পাঠ করে এবং বলে 'অমুক ব্যক্তি আমাকে বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেছে, তোমরা সাক্ষী থাকো- আমি নিজেকে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম', তাহলে এ বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা সাক্ষীগণ প্রস্তাব প্রেরণকারীর কথা মহিলা কর্তৃক তার চিঠি পাঠ করার দ্বারা অথবা তার পক্ষ হতে মহিলা নিজে ব্যক্ত করার দ্বারা শুনেছে সুতরাং তারা ইজাবকারীর কথা শুনেছে)। এমনিভাবে তারা মহিলার কবুলও শ্রবণ করেছে। এই কারণেই উক্ত বিবাহ পূর্ণ হয়েছে।..."[৩০২]

আল্লামা আবু বকর কাসানী রাহ. বলেন-

ولو أرسل إليها رسولا وكتب إليها بذلك كتابا فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب، **جاز ذلك؛ لاتحاد المجلس من حيث المعنى؛ لأن كلام الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل**، وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب، فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب معنى. وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب لا يجوز عندهما وعند أبي يوسف إذا قالت زوجت نفسي يجوز وإن لم يسمعا.

"যদি কোনো পুরুষ মহিলার নিকট দূত বা পত্র মারফত বিবাহের প্রস্তাব পাঠায় এবং মহিলা দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে কবুল করে নেয়, যারা ঐ প্রতিনিধির কথা ও পত্র শুনেছে, তাহলে এমন বিবাহ শুদ্ধ হবে।......."[৩০৩]

ম্যাসেজিং বা চ্যাটিং-এর মাধ্যমে বিবাহের শরী'আতসম্মত পদ্ধতি

ম্যাসেজিং বা অনলাইন-অফলাইন যেকোনো চ্যাটিং- এর ব্যাপারেও উপরোক্ত বিধানই প্রযোজ্য হবে। প্রত্যেকটি ম্যাসেজ বা 'টক' একটি চিঠির মতো। সুতরাং চিঠির ক্ষেত্রে যে বিধান ফুকাহায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন, এখানেও তাই প্রযোজ্য হবে। তবে আইডি হ্যাক হওয়া বা অন্য কোনোভাবে ন্যূনতম সন্দেহ থাকলেই ইজাব বা কবুল শুদ্ধ হবে না।

উল্লেখ্য, ফিকহের মুতুনের কিতাবে এ মাসআলাই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিঠি যে মজলিসে পৌঁছবে, উপস্থিত সেখানেই কবুল করে নিতে হবে। পরে কবুল করলে হবে না। ইমাম আবু বকর মারগীনানী রাহ. বলেন-

وإنما يمتد إلى آخر المجلس لأن المجلس جامع المتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر والكتاب كالخطاب وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب.

"ইজাব মজলিসের শেষ পর্যন্ত বহাল থাকবে। কারণ, মজলিসের ভেতর যা কিছু হয়, মাজলিস তার মাঝে সমন্বয় করে দেয়। মানুষের জন্য সহজতার প্রতি লক্ষ করে এক মজলিসের পুরো

---

[৩০২] আল মাবসূত: ৫/১৫-১৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[৩০৩] বাদায়েউস সানায়ে: ৩/৩৪৫, দারুল হাদীস, কায়রো

সময়কে এক সময় সাব্যস্ত করা হয়। পত্র প্রেরণ এক্ষেত্রে (বিধানগতভাবে) সরাসরি সম্বোধনের মতো। এমনিভাবে দূত প্রেরণও। উপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন ইজাব-কবুলের মজলিস ধর্তব্য হয়, তেমনি পত্র বা দূতের ক্ষেত্রে পত্র বা দূত পৌঁছার মজলিস ধর্তব্য হবে।"[৩০৪]

তবে পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ শর্তকে কিছুটা শিথিল করেছেন। ইমাম খুয়াহারযাদাহ্ রাহ. তাঁর 'আল মুহীত' গ্রন্থে চিঠির মাধ্যমে ইজাব-কবুল ও মৌখিক ইজাব-কবুলের মাঝে পার্থক্য করেছেন। আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

وفي المحيط الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال قبلت في مجلس آخر لم يجز، وفي الكتاب يجوز؛ لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر، فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب بالقبول فصح. اهـ.

"সরাসরি বিয়ের ইজাব সম্বোধন ও পত্রের মাধ্যমে ইজাব প্রেরণের মধ্যে পার্থক্য করা রয়েছে। সরাসরি ইজাব পেশ করার পর যদি অপর পক্ষ অন্য মজলিসে কবুল করে, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। এর বিপরীত পত্রের মাধ্যমে ইজাব প্রেরণের পর এমনটি করলে বিবাহ শুদ্ধ হবে। কেননা কথা অস্তিত্বের পরক্ষণেই বিলীন হয়ে যায়। সুতরাং এক মজলিসে পেশকৃত ইজাব অন্য মজলিসে গ্রহণকৃত কবুলের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবে না। তবে পত্রের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা পত্র অন্য মজলিসেও বিদ্যমান থাকে। অন্য মজলিসে ইজাবপত্র পাঠ করা সেই মাজলিসে উপস্থিত কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইজাব পেশ করার নামান্তর। সুতরাং এ সূরতে ইজাব কবুলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বিবাহ শুদ্ধ হবে।"[৩০৫]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

(قوله: لو حاضرين) احترز به عن كتابة الغائب لما في البحر عن المحيط الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبلت في مجلس آخر لم يجز وفي الكتاب يجوز؛ لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر، وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب بالقبول فصح. اهـ. ومقتضاه أن قراءة الكتاب في مجلس آخر لا بد منها ليحصل الاتصال بين الإيجاب والقبول، **وحينئذ فاتحاد المجلس شرط في الكتاب أيضا**، وإنما الفرق هو قيام الكتاب، وإمكان قراءته ثانيا، فلو حذف قوله حاضرين كالنهر لكان أولى والظاهر أنه لو كان مكان الكتاب رسول بالإيجاب فلم تقبل المرأة ثم أعاد الرسول الإيجاب في مجلس آخر فقبلت لم يصح؛ لأن رسالته انتهت أولا بخلاف الكتابة؛ لبقائها أفاده الرحمتي.[৩০৬]

হানাফী ফকীহগণ ইমাম খুয়াহারযাদাহ্ রাহ. এর মতকে গ্রহণ করেছেন এবং তা অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করেছেন। আর তাঁর মতটিই প্রচলিত যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সাথে বেশি সঙ্গতি রাখে। কারণ, পূর্বে চিঠি কোনো একজন বাহক সাথে নিয়ে উপস্থিত হতো। এ অবস্থায়

---

[৩০৪] আল হিদায়া: ৩/১৯, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

[৩০৫] আল বাহরুর রায়িক: ৩/১৪৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
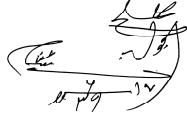
[৩০৬] রদ্দুল মুহতার: ৪/৮৬-৮৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

উপস্থিত ইজাব-কবুলের মতো উপস্থিত মজলিসের সুযোগ থাকতো। প্রয়োজনে বাহক অপেক্ষা করতো এবং প্রাপকের জন্য চিন্তা-ভাবনার সময় থাকতো।
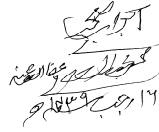
তবে বর্তমানে ম্যাসেজের অবস্থা মোটেও এমন না। যেকোনো সময়ই ম্যাসেজ আসতে পারে। নামায, খানা-পিনা বা ইস্তিঞ্জা ইত্যাদি যে কোনো সময়ে ম্যাসেজ আসতে পারে। প্রেরক প্রাপকের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়। এ অবস্থায় যদি ম্যাসেজ আসার মজলিসেই কবুল করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়, তাতে মারাত্মক ধরনের দুর্ভোগ সৃষ্টি হবে, যা এ ধরনের ক্ষেত্রে শরী'আতের মেযাজ, রুচি ও উসূলের খেলাফ।

এছাড়াও এতে মজলিস অনুষ্ঠানের যে উদ্দেশ্য ছিলো, তাও ব্যাহত হয়ে পড়বে। এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে সমকালীন ফকীহগণও এক্ষেত্রে ইমাম খুয়াহারযাদাহ্ রাহ.-এর মতের উপর ফাতওয়া প্রদান করেছেন।[৩০৭]

সত্যায়নে

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৭ জুমাদাল আখেরাহ ১৪৩৯ হি.

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আ'যম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৬ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১২ রজব ১৪৩৯ হি.

---

[৩০৭] উল্লেখ্য, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. আল্লামা খুয়াহারযাদাহ রাহ.-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চিঠি পাঠ করার যে শর্তারোপ করেছেন, তা শুধু আকদে নিকাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কারণ, আকদে নিকাহে শাহাদাহ শর্ত। আর শাহাদাহ-এর জন্য সাক্ষীদের চিঠির অভ্যন্তরে কী আছে, তা জানা জরুরী। এক্ষেত্রেও হুবহু চিঠি পড়া জরুরী না। কারণ, ইজাব তো চিঠিতেই লেখা আছে। ইজাব করার জন্য চিঠি পাঠ করা হচ্ছে এমন নয়; বরং পাঠ করার উদ্দেশ্য হলো শুধু লিখিত ইজাবটি সাক্ষীদেরকে জানানো। স্বয়ং আল্লামা খুয়াহারযাদাহ রাহ.-এর ভাষ্য এবং মাসআলার যে ইল্লাত ফুকাহায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন, তা থেকে বিষয়টি বুঝে আসে। পূর্বে শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. ও আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ.-এর যে বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, তাতেও (রেখাবিশিষ্ট অংশ দেখুন) বিষয়টি স্পষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্যবিষয়ে আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ.-এর ভাষ্য থেকেও বিষয়টি পরিষ্কার। এখানে তা আবার উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন:

ونص القدوري وغيره على اشتراط السماع ولأنه المقصود بالحضور فلا يجوز بالأصمين على ما هو الأصح، وعن اشتراط السماع ما قدمناه في التزوج بالكتابة من أنه لا بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأه المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول: إن فلانا كتب إليّ يخطبني ثم تشهدهم أنها زوجته نفسها. (فتح القدير ٣/١٩٤-١٩٥)

হুরমাতে মুসাহারাত: কিছু জটিলতা ও সমাধান

মাওলানা মাহমুদুল হাসান, বরিশাল

ইসলাম মানুষকে সম্মানিত করেছে। মানুষের রক্তকে করেছে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন। তাই রক্তের সাথে সম্পৃক্ত নিকটাত্মীয়কে বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত করেছে। রক্তের সম্পর্কের একটি দিক হলো 'মুসাহারাত' তথা স্ত্রী-কেন্দ্রিক আত্মীয়তা। এক্ষেত্রে দু'টি পরিবারের রক্তের মিলন ঘটে সন্তানের মাধ্যমে। এ কারণেই নিকটাত্মীয়ের ক্ষেত্রে হুরমাতের বিধান আরোপিত হয়। এই হুরমাতের বিষয়ে আমাদের ফকীহগণ অত্যধিক সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের এই সতর্কতার কারণে এ বিষয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে, দেখা দিয়েছে কিছু জটিলতা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ ধরনের কিছু জটিলতা ও তার সামাধান নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

হুরমাতে মুসাহারাতের পরিচিতি

হুরমাত (الحرمة) শব্দের অর্থ, সম্মান ও মর্যাদা। মুসাহারাত (المصاهرة) শব্দটির মূলধাতু হলো صهر। الصهر শব্দটি আরবী ভাষায় দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয় -১. القربة বা নৈকট্য।[308] ২. الإذابة বা গলানো (দ্রবীভূত করা)।[৩০৯]

বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার কারণে যেহেতু স্বামী স্ত্রী এবং উভয়ের পরিবার একে অপরের নিকটবর্তী হয় এবং স্বামী-স্ত্রী একে অপরের স্বত্তার মাঝে বিগলিত হয় (স্ত্রীর বাবা-মা স্বামীরও বাবা-মার মতো হয়ে যায়, অনুরূপভাবে স্বামীর বাবা-মাও স্ত্রীর বাবা- মার মতো হয়ে যায়) তাই এ সম্পর্ককে 'মুসাহারাত' বলা হয়।

আল্লামা শরফুদ্দীন তীবী রাহ. বলেন-

النسب ما رجع إلي ولادة قريبة من جهة الآباء، والصهر ما كان من خلطة نسبة القرابة يحدثها التزويج.

"নসব' হলো রক্তসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়। আর 'সিহর' হলো বৈবাহিক সম্পর্কের দরুন সৃষ্ট নৈকট্যের সম্পর্ক।"[৩১০]

তাহলে হুরমাতে মুসাহারাতের সামষ্টিক অর্থ হলো, বৈবাহিক সম্পর্কজনিত হুরমাত বা মর্যাদা, যা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ দু'টি পরিবারের মাঝে সৃষ্টি হয়। এই মর্যাদার কারণে স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের জন্য অপরের উসূল-ফুরূ (উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন) বংশধরগণকে বিবাহ করা চিরতরে হারাম হয়ে যায়।

---

[৩০৮] وفي الحديث أنه ﷺ كان يؤسس مسجد قباء، فيصهر الحجر العظيم إلى بطنه. أي يدنيه إليه. (لسان العرب: ٤٧٢/٤، تاج العروس ١١٦/٧)

[৩০৯] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ [الحج: ٢٠]

[৩১০] আল কাশেফ ফী মা'রিফাতে হাকাইকিস সুনান: হাদীস নং ২৩০৩

হুরমতে মুসাহারাতের মানাত

আমরা জানলাম, বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী-পক্ষের কিছু আত্মীয় স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়, এমনিভাবে স্বামী-পক্ষের কিছু আত্মীয় স্ত্রীর জন্য হারাম হয়ে যায়। এখানে হারাম হওয়ার মূল কারণটা কী? নিছক বিবাহকে মানাত বা মূল কারণ স্থির করলে যথাযথ হয় না। কারণ, নিছক বিবাহকে মানাত স্থির করলে অনেক বিধানের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের ফকীহগণ এক্ষেত্রে মানাত স্থির করেছেন الجزئية والبعضية তথা (স্বামী-স্ত্রীর মাঝে) পরস্পর অংশীদারিত্বকে। আর তা হয়ে থাকে বাচ্চার মধ্যস্থতায়। কারণ বাচ্চা পিতা-মাতার অংশীদারিত্বেই জন্ম নেয়। এর মাধ্যমে পিতা-মাতা ও তাদের নিকটাত্মীয়ের মাঝে রক্তের এমন সংমিশ্রণ হয় যে, তা আলাদা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বাচ্চার মাধ্যমে এই অংশীদারিত্বের সম্পর্কই হলো মূল মানাত। একে মূল মানাত স্থির করলে সংশ্লিষ্ট সকল মাসআলা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যেকোনো মানাত বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য অবশ্যই উপায় ও উপকরণের প্রয়োজন হয়। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যদি নিজ কুদরতে কিছু করেন তা ভিন্ন বিষয়। শরী'আতে বিধান আরোপ করার সময় কখনো মূল মানাতের উপর আরোপ করা হয়েছে, আবার কখনোবা মাধ্যম বা উপকরণের উপর আরোপ করা হয়েছে। আমাদের আলোচ্যবিষয় হুরমাতে মুসাহারাতের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ -এ বিধান আরোপ করা হয়েছে মাধ্যম ও উপকরণের উপর। আমরা মানাত সম্পর্কে তো জেনিছি যে, বাচ্চা বা বাচ্চার মাধ্যমে সৃষ্ট অংশীদারিত্ব। এখন আমাদের দেখতে হবে, এই মানাত, অর্থাৎ, বাচ্চা হওয়ার উপায় ও উপকারণ কী?

আমরা জানি, যেকোনো কাজ বাস্তবায়ন হওয়ার পেছনে দু'ধরনের উপকরণ কার্যকর থাকে। ক. সরাসরি উপকরণ এবং খ. দ্বিতীয় পর্যায়ের উপকরণ। আলোচ্যক্ষেত্রে মানাতের সরাসরি উপকরণ হলো সহবাস। একে ফিকহী পরিভাষায় মুবাশির পর্যায়ের উপকরণও বলা যেতে পাবে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের উপকরণ হলো বিবাহ এবং সহবাসের প্রারম্ভিক কার্যসমূহ। ফিকহী পরিভাষায় একে মুসাব্বিব পর্যায়ের উপকরণও বলা যেতে পাবে। বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

আমরা জানি, কোনো উপকরণ বা মাধ্যম তখনই বিবেচ্য হয়, যখন তা বাস্তবেই উপকরণ বা মাধ্যম প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ, তার মাধ্যমে মানাত অর্জিত হয় বা মানাত পর্যন্ত পৌঁছা যায়। এমনিভাবে আলোচ্যক্ষেত্রেও এই উপকরণগুলো (সহবাসের প্রারম্ভিক বিষয়সমূহ) তখনই বিবেচিত হবে যখন তা বাচ্চা হওয়ার মাধ্যম বলে প্রমাণিত হবে। সুতরাং মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন কোনো উপকরণ পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

لا بد أن تكون المرأة حية؛ لأنه لو وطئ الميتة فإنه لا تثبت حرمة المصاهرة كما في الخانية.

"অবশ্যই নারীটি জীবিত হতে হবে। যদি মৃত নারীর সাথে মিলন করে তাহলে এর মাধ্যমে

হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হবে না। যেমনটি খানিয়্যাহ-এ আছে।"[৩১১]

এমনিভাবে ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে বিবাহ ছাড়া অন্য উপকরণ গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লামা আব্দুল আযীয বুখারী রাহ. বলেন-

فلهذا قلنا لا تثبت الحرمة باللواطة ولا بوطء الميتة ولا بوطء الصغيرة.

"এজন্যই আমরা বলি, লিওয়াতাহ তথা পুরুষের সাথে, মৃতের সাথে এবং নাবালেগার সাথে যিনা করলে হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হবে না।"[৩১২]

এজন্য সহবাসের দ্বারা হুরমাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সহবাস মহিলার যোনিদ্বারে হবে, পায়ুপথে বা অন্য কোথাও নয়। আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

لا بد أن يكون في القبل؛ لأنه لو وطئ المرأة في الدبر فإنه لا يثبت حرمة المصاهرة وهو الأصح؛ لأنه ليس بمحل الحرث فلا يفضي إلى الولد كما في الذخيرة.

"মিলন সামনের অঙ্গে হতে হবে। নারীর পেছনের অঙ্গে মিলন করার দ্বারা হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হবে না এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা পেছনের অঙ্গ সন্তান জন্মদানের স্থান নয়। অতএব এটা সন্তান জন্মদানের দিকে ধাবিত করবে না।"[৩১৩]

মোটকথা, বিবাহ ছাড়া অন্যান্য উপকরণ এমন অবস্থায় পাওয়া যেতে হবে যা পিতৃত্বের কারণ হতে পারে।

সরাসরি উপকরণ তথা সহবাসের দ্বারা হুরমতে মুসাহারাত

সহবাস তিন প্রকার:

১. বৈধ সহবাস (الوطئ االمباح): অর্থাৎ, শুদ্ধ বিবাহের (النكاح الصحيح) মাধ্যমে স্ত্রী বা মালিকানার মাধ্যমে বাঁদীর সাথে যে সহবাস করা হয়।

২. সংশয়পূর্ণ সহবাস (الوطي بالشبهة): অর্থাৎ, অশুদ্ধ বিবাহের (نكاح فاسد) মাধ্যমে সহবাস অথবা স্ত্রী বা বাঁদী নয় এমন মহিলাকে ভুলক্রমে স্ত্রী অথবা বাঁদী মনে করে তার সাথে সহবাস। এককথায়, ঐ সহবাস যা মূলত বৈধ নয়; তবে তার ক্ষেত্রে বৈধ সহবাসের কিছু বিধানাবলি প্রযোজ্য হয়।

৩. নিরেট হারাম (الحرام المحض): অর্থাৎ, যিনা বা ব্যভিচার।

উল্লিখিত তিন প্রকার থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার দ্বারা হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে। আল্লামা আবু বকর কাসানী রাহ. (৫৮২ হি.) বলেন-

ثم حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح وتثبت بالوطء الحلال بملك اليمين حتى إن من وطئ جاريته تحرم

---

[৩১১] আল বাহরুর রায়িক: ৩/১৭৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩১২] কাশফুল আসরার: ১/৫৮০, কদিমী কুতুবখানা, করাচী

[৩১৩] আল বাহরুর রায়িক: ৩/১৭৪-১৭৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

عليه أمها وابنتها وجداتها وإن علون وبنات بناتها وإن سفلن وتحرم هي على أب الواطئ وابنه وعلى أجداد أجداد الواطئ وإن علوا، وعلى أبناء أبنائه وإن سفلوا. وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد وكذا بالوطء عن شبهة بالإجماع.

"হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হয় আকদে সহীহের মাধ্যমে এবং মিলকে ইয়ামিনের (দাসত্ব) অধীনে বৈধ মিলনের মাধ্যমে। অতএব মিলনকৃত বাঁদীর মাতা ও উর্ধ্বতন মহিলাগন এবং তার কন্যা ও অধঃস্তন কন্যাগণ তার জন্য হারাম হবে। তার সে বাঁদী মিলনকারীর উর্ধ্বতন পুরুষ এবং অধঃস্তন সন্তানদের জন্য হারাম হবে। অনুরূপভাবে নিকাহে ফাসেদের অধীনে মিলন ও সন্দেহবশত মিলনের মাধ্যমে হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হবে।"[৩১৪]

তবে যিনা বা ব্যভিচার দ্বারা হুরমাতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর মাযহাব হলো, যিনার দ্বারা হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কারণ যিনার মাধ্যমেও বাচ্চা হয়। আর বাচ্চার মাধ্যমে রক্তের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। সুতরাং যিনা হারাম হলেও রক্তের মূল্যায়ন করে হুরমাত প্রমাণিত হবে।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

(قوله ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها) أي وإن علت، فتدخل الجدات بناء على ما قدمه من أن الأم هي الأصل لغة (وابنتها) وإن سفلت، وكذا تحرم المزني بها على آباء الزاني وأجداده وإن علوا وأبنائه وإن سفلوا..... وبقولنا قال مالك في رواية وأحمد وقولنا قول عمر وابن مسعود وابن عباس في الأصح وعمران بن الحصين وجابر وأبي وعائشة وجمهور التابعين كالبصري والشعبي والنخعي والأوزاعي وطاوس وعطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وحماد والثوري وإسحاق بن راهويه.

"(গ্রন্থকার বলেন, কেউ কোন মহিলার সাথে যিনা করলে তার জন্য ঐ মহিলার মা হারাম হয়ে যাবে) অর্থাৎ, মাতার উপরে যারা আছে তারা সহ। অতএব ঐ মহিলার নানীও শামিল হবে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উম্ম শব্দটি শাব্দিকভাবে মূলকে বোঝায়। আর মূলের মাঝে নানীও অন্তর্ভুক্ত হয়।(...এবং মেয়ে, অর্থাৎ, কেউ কোনো মহিলার সাথে যিনা করলে তার জন্য ঐ মেয়েও হারাম হয়ে যাবে।) অর্থাৎ, অধঃস্তন মেয়েগণ সহ। অনুরূপভাবে ঐ মহিলা যিনাকারীর বাপ দাদা এবং সন্তানদের জন্য হারাম হয়ে যাবে...। ইমাম মালেক রাহ. (এক বর্ণনা মতে) এবং ইমাম আহমদ রাহ. আমাদের অনুরূপ মত পোষণ করেন। এই বক্তব্য বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হযরত উমর রাযি. ইবনে মাসউদ রাযি. এবং ইবনে আব্বাস রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামেরও।"[৩১৫]

আমাদের ইমামগণ নিম্নোক্ত দলীলের ভিত্তিতে যিনার ক্ষেত্রে হুরমাত সাব্যস্ত করে থাকেন।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

[৩১৪] বাদায়েউস সানায়ে: ২/৫৩৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩১৫] ফাতহুল কাদীর: ৩/২১০, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"যে নারীদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা (কখনও) বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। তবে পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। এটা অত্যন্ত অশ্লীল ও ঘৃণ্য কর্ম এবং নিকৃষ্ট আচরণ।"[৩১৬]

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. আলোচ্য মাসআলায় উক্ত আয়াত থেকে দলীল উপস্থাপন করে বলেন-

وحجتنا في ذلك قوله تعالى { وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم } [النساء: ٢٢] ، وقد بينا أن النكاح للوطء حقيقة فتكون الآية نصا في تحريم موطوءة الأب على الابن فالتقييد بكون الوطء حلالا زيادة. ولا تثبت هذه الزيادة بخبر الواحد، ولا بالقياس.

"এক্ষেত্রে আমাদের দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ- "তোমাদের পিতাগণ যাদের সাথে নিকাহ করেছে তোমরা তাদের সাথে নিকাহ করো না।" আমরা ইতিমধ্যে স্পষ্ট করেছি যে, নিকাহ হাকীকী অর্থে সহবাস বোঝায়। সুতরাং বাবার সহবাসকৃত মহিলা সন্তানের জন্য হারাম হওয়া আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত। এখানে বৈধ সহবাসের শর্ত করা যিয়াদাহ বা বৃদ্ধি। কিয়াস বা খবরে ওয়াহেদের ভিত্তিতে কুরআনের নসের উপর এ ধরনের যিয়াদাহ-এর অবকাশ নেই।"[৩১৭]

২. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: «هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة» ، قالت: فلم ير سودة قط.

"হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যামআহ রাযি. একটি ছেলে সন্তানের ব্যাপারে মুকদ্দমা নিয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে হাজির হলেন। সা'দ বললেন, হে রাসূলুল্লাহ! এটা আমার ভাই ওতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাসের ছেলে। সে আমাকে বলে গিয়েছে এটা তার ছেলে। দেখুন তার সাথে এর কেমন মিল রয়েছে! আব্দুল্লাহ ইবনে যামআহ বললেন, হে রাসূলুল্লাহ! এই ছেলে আমার ভাই। বাঁদী থেকে আমার বাবার বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদৃশ্যের বিষয়টা দেখলেন। (তবে) ফয়সালা করলেন, আব্দুল্লাহ এই ছেলে তুমি নিয়ে যাও। সন্তান হবে বিছানার অধিকারীর। ব্যাভিচারকারী বঞ্চিত হবে। হে সাওদা বিনতে যামআহ! তুমি তার থেকে পর্দা করবে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, সে কোন দিন

[৩১৬] সূরা নিসা: ২২

[৩১৭] আল মাবসূত: ৪/২০০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

সাওদা'কে দেখেনি।"[৩১৮]

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম খাত্তাবী[৩১৯] রাহ. বলেন-

حجة لمن ذهب إلى أن من فجر بامرأة حرمت على أولاده، واليه ذهب أهل الرأي وسفيان الثوري والأوزاعى وأحمد لأنه لما رأى الشبه بعتبة علم أنه من مائه فأجراه في التحريم مجرى النسب وأمرها بالاحتجاب منه.

"কোনো নারীর সাথে অবৈধ মিলন করলে সে মহিলার জন্য ঐ পুরুষের পুত্রগণ হারাম হয়ে যাবে-এই মত যারা পোষণ করেন তাদের জন্য এই হাদীসটি হুজ্জত বা প্রমাণ। আহলুর রাই, সুফিয়ান সাওরী এবং আহমদ রাহ. এই মতই গ্রহণ করেছেন। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ উতবার সাথে বালকের মিল দেখে বুঝলেন, সে উতবার পানি থেকে সৃষ্ট। ফলে সন্তান হলে যে হুরমাত সাব্যস্ত হয় সেটাকে বিবেচনায় রাখলেন এবং সাওদা বিনতে যামআহ রাযি. কে তার সাথে পর্দা করতে বললেন।"[৩২০]

হালাল সহবাস দ্বারা হুরমাত সাব্যস্ত হওয়ার মূল কারণ হলো, جزئيت وبعضيت। এই কারণটি হালাল সহবাসের মধ্যে যেভাবে পাওয়া যায়, হারাম সহবাস তথা- যিনার মধ্যেও পাওয়া যায়। সুতরাং যিনার দ্বারাও হুরমাত সাব্যস্ত হবে। এককথায়, যিনার মাঝে হুরমাত প্রমাণিত হওয়ার মানাত বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

أن ثبوت الحرمة بسبب هذا الوطء في الملك ليس لعين الملك بل لمعنى البعضية؛ لأن الولد الذي يتخلق من الماءين يكون بعضا لكل واحد منهما فتتعدى شبهة البعضية إلى أمهاتها وبناتها وإلى آبائه وأبنائه والشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة، وهذا المعنى لا يختلف بالملك وعدم الملك؛ لأن سبب البعضية حسي، وإنما تكون هذه البعضية موجبة حرمة الموطوءة؛ لأن البعضية الحكمية عملها كعمل حقيقة البعضية وحقيقة البعضية توجب الحرمة في غير موضع الضرورة.

"সহবাসের কারণে হুরমাত সাব্যস্ত হওয়াটা আকদে নিকাহ বা মালিকানার অধিকারের জন্য নয়; বরং সহবাসের মাধ্যমে সম্ভাব্য সন্তানের মাধ্যমে উভয়ে একে অপরের অংশ হয়ে যাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে হুরমাত সাব্যস্ত হয়। এই অংশীদারিত্বের রেশ স্ত্রীর মাতাগণ ও মেয়েগণ এবং স্বামীর পিতাগণ ও ছেলেগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। আর হুরমতের ক্ষেত্রে রেশ বা শুবাহ কে হাকীকতের অর্থে ধরা হয়। এই অর্থ মালিকানা থাকা না থাকার সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা অংশীদারিত্বের বিষয়টি অনুভবযোগ্য এবং এই অংশীদারিত্ব সহবাসকৃত নারীর হুরমাতকে সাবিত করে। কেননা হুকমি অংশীদারিত্ব বা অংশীদারিত্বের রেশ হাকীকী অংশীদারিত্বের মতো।

---

[৩১৮] সহীহ মুসলিম: ১/৪৭০

[৩১৯] আবু সুলায়মান হামদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহিম ইবনে খাত্তাব আলবুসতী আলখাত্তাবী আশশাফে'য়ী। তিনি খাত্তাবী নামে প্রসিদ্ধ। ৩১৯ হিজরীতে আফগানিস্তানের বুস্ত শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৮৮ হিজরীর ৭ই রবিউল আখের নিজ শহরেই ইন্তেকাল করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। রচনা জগতে 'মা'আলিমুস সুনান' ও 'আ'লামুস সুনান' তাঁর অমর কীর্তি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৭/২৩-২৮)

[৩২০] মা'আলিমুস সুনান: ৩/১৮২

আর হাকীকী অংশীদারিত্ব জরুরতের স্থান ছাড়া হুরমাতকে আবশ্যক করে।"[৩২১]

মুসাব্বিব বা দ্বিতীয় পর্যায়ের মাধ্যম ও উপকরণ

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মানাত বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য যে উপকরণগুলো কার্যকর থাকে তার মাঝে এক প্রকার হলো মুসাব্বিব পর্যায়ের উপকরণ।

এই ধরনের মাধ্যম দু'প্রকার: ১. বিবাহ, ২. সহবাসের প্রারম্ভিক কার্যসমূহ।

১. বিবাহের দ্বারা হুরমতে মুসাহারাত: বিবাহ হলেই বাচ্চা হওয়া আবশ্যক নয়; বাচ্চা হওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মিলন হতে হবে। সুতরাং বিবাহ মানাত বাস্তবায়নের জন্য মুসাব্বিব পর্যায়ের উপকরণ। এরপরও শরী'আত এই উপকরণকে মূল্যায়ন করেছে এবং এর উপর হুরামাতের বিধান আরোপ করেছে। এ বিষয়ে একাধিক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিধান থেকে আরো প্রমাণিত হলো যে, হুরমাত প্রমাণিত হওয়ার জন্য মুবাশির পর্যায়ের উপকরণ থাকা আবশ্যক নয়; বরং মুসাব্বিব পর্যায়ের উপকরণ থাকলেও হবে। চার ফিকহী মাযহাবের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, 'বিবাহ' হুরমাতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে সৎ মেয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। কারণ, তার ক্ষেত্রে হুরমাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কুরআনে কারীমে دخول তথা সহবাসের শর্তারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"যারা তোমাদের এমন স্ত্রীদের গর্ভজাত, যাদের সাথে তোমরা নিভৃতে মিলিত হয়েছো। তোমরা যদি তাদের সাথে নিভৃত-মিলন না করে থাকো (এবং তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও বা তাদের মৃত্যু হয়ে যায়), তবে (তাদের কন্যাদের বিবাহ করাতে) তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।"[৩২২]

২. সহবাসের প্রারম্ভিক কার্য (دواعي الوطي) দ্বারা হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হওয়া

মুসাব্বিব পর্যায়ের আরেক ধরনের উপকরণ হলো 'دواعي الوطي' তথা সহবাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং তার দিকে ঠেলে দেয় এমন কার্যকলাপ। মৌলিকভাবে এগুলো দু'প্রকার-

ক. কামভাব সহকারে স্পর্শ (চুমো ইত্যাদিও এর অর্ন্তভুক্ত)।

খ. যোনি অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত।

এসব কার্যাবলী যেকোনোভাবে পাওয়া গেলেই হুরমাত প্রমাণিত হবে না; বরং ফুকাহায়ে কেরাম এক্ষেত্রে এমন কিছু শর্ত যুক্ত করেছেন যা এক দিক থেকে মানাতের সঠিক ও উপযোগী উপকরণের জন্য আবশ্যক, অন্য দিকে মানুষ জটিল অবস্থায় না পড়ার জন্যও জরুরী।

মৌলিকভাবে সকল ক্ষেত্রে শর্ত হলো, উভয়জনই বালেগ তথা বাচ্চা প্রজননের উপযোগী হতে হবে, সহবাসের মনোভাব জাগ্রত থাকতে হবে এবং সহবাসের পূর্বে বীর্যপাত না হতে হবে।

---

[৩২১] আল মাবসূত: ৪/২০১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[৩২২] সূরা নিসা: ২৩

এছাড়াও প্রত্যেক প্রকারের ক্ষেত্রে আরো কিছু বিশেষ শর্ত রয়েছে। নিম্নে উভয় প্রকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হলো।

ক. কামভাব নিয়ে নারীকে স্পর্শ করা

স্পর্শের ক্ষেত্রে হুরমাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত হলো-

এক. উভয়জনই বালেগ তথা বাচ্চা প্রজননের উপযোগী হতে হবে।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

ويشترط كونها مشتهاة حالا أو ماضيا، فلو مس عجوزا بشهوة أو جامعها تثبت الحرمة، وكذا إذا كانت صغيرة تشتهى، قال ابن الفضل: بنت تسع سنين مشتهاة من غير تفصيل، وبنت خمس سنين فما دونها لا بلا تفصيل، وبنت ثمان أو سبع أو ست إن كانت عبلة كانت مشتهاة وإلا فلا. وكذا يشترط في الذكر حتى لو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه لا تثبت به حرمة المصاهرة.

"শর্ত হলো নারীটি বর্তমানে বা অতীতে শাহওয়াতযোগ্য হতে হবে। অতএব শাহওয়াত নিয়ে কোন বৃদ্ধাকে স্পর্শ অথবা সহবাস করলে হুরমাত সাব্যস্ত হবে (কারণ, বৃদ্ধা অতীতে মুশতাহাত (শাহওয়াতযোগ্য) ছিলো। যদি ছোট মেয়ে শাহওয়াত উদ্রেককারী হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রেও একই বিধান। ইবনুল ফজল বলেন, নয় বছরের শাহওয়াত উদ্রেককারীনীর ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় হুরমাত সাব্যস্ত হবে। আর পাঁচ বছর বা তারও কম হলে যদি দৈহিক বৃদ্ধি বেশী হয় এবং শাহওয়াত উদ্রেককারীনী হয়, তাহলে হবে আর না হয় নয়। পুরুষের ক্ষেত্রেও এ ধরনের শর্ত প্রযোজ্য। অতএব চার বছরের বালক তার পিতার স্ত্রীর সাথে মিলন করলে হুরমাতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হবে না।"[৩২৩]

দুই. স্পর্শের সময় সহবাসের মনোভাব তথা উত্তেজনা জাগ্রত থাকতে হবে। এমনি স্বাভাবিকভাবে স্পর্শ করলে ক্ষেত্রে হুরমাত প্রমাণিত হবে না। এমনিভাবে স্পর্শ করার পর (স্পর্শের সময় নয়) মনোভাব জাগ্রত হয়েছে বা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে- এমন হলেও হবে না; বরং স্পর্শ করার সময় সহবাসের মনোভাব জাগ্রত থাকতে হবে। পুরুষের ক্ষেত্রে এর আলামত হলো পুরুষাঙ্গে নাড়াচাড়া সৃষ্টি হওয়া এবং তা শক্ত ও স্ফীত হয়ে যাওয়া। আর যদি পূর্ব থেকেই এ অবস্থা থাকে, তাহলে তা বৃদ্ধি পাওয়া।[৩২৪]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قبله أو زيادته وفي الجوهرة: لا يشترط في النظر لفرج تحريك آلته به يفتى هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به يفتي

[৩২৩] ফাতহুল কাদীর: ৩/২১৩, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[৩২৪] মহিলা, পুরুষত্বহীন পুরুষ এবং এমন বৃদ্ধ, যার বার্ধক্যের কারণে উক্ত অবস্থা হয় না, তাদের ক্ষেত্রে অন্তরে সহবাসের মনোভাব জাগ্রত হওয়া বা জাগ্রত থাকলে তা বৃদ্ধি পাওয়াই ধর্তব্য হবে। কারণ, তাদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক আলামত পাওয়া যায় না।

"স্পর্শ ও দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে ঠিক ঐ সময় শাহওয়াত থাকতে হবে। পরবর্তীতে হলে হবে না। শাহওয়াতের সীমা হলো, লজ্জাস্থান প্রসারিত হওয়া, পূর্ব থেকেই প্রসারিত থাকলে সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পাওয়া। এর উপরই ফাতওয়া। নারী ও বৃদ্ধ পুরুষের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো হৃদকম্পন হওয়া, পূর্ব থেকে থাকলে তা বৃদ্ধি পাওয়া। 'জাওহারা' গ্রন্থে আছে- যোনির দিকে দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে অঙ্গ সম্প্রসারণ শর্ত নয়। এটাই সিদ্ধান্ত। এসব কথা হচ্ছে যদি বীর্যপাত না ঘটায়। বীর্যপাত ঘটিয়ে ফেললে দৃষ্টিপাত ও স্পর্শের কারণে হুরমাত সাব্যস্ত হবে না। এটাই ফাতওয়া।"[৩২৫]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

والعبرة لوجود الشهوة عند المس والنظر حتى لو وجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به حرمة.

"দৃষ্টিপাত ও স্পর্শের সময় কামভাব থকলেই তা হুরমাতের কারণ হবে। কামভাবহীন দৃষ্টিপাত ও স্পর্শের পর কামভাব আসলেও এর সাথে হুরমাত যুক্ত হবে না।"[৩২৬]

তিন. বীর্যপাত না হতে হবে।

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به يفتي، (قوله: فلا حرمة) لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء هداية.

"হুরমাত সাব্যস্ত হবে যদি বীর্যপাত না ঘটায়। আর না হয় দৃষ্টিপাত ও স্পর্শের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটিয়ে ফেললে হুরমাত সাব্যস্ত হবে না। এটার উপরই ফাতওয়া। এর কারণ হলো, বীর্যপাতের দ্বারা এটা স্থির হয়ে গেল যে, এই দৃষ্টি বা স্পর্শ সহবাসের দিকে ধাবিতকারী নয়।"[৩২৭]

চার. শরীরের উষ্ণতা অনুভব হতে হবে। আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

لا بد أن يكون بغير حائل يمنع وصول الحرارة فلو جامعها بخرقة على ذكره لا تثبت الحرمة كما في الخلاصة.

"স্পর্শের ক্ষেত্রে উষ্ণতা প্রতিবন্ধক কোন বাধা বা আড়াল থাকতে পারবে না। অতএব কেউ লজ্জাস্থানে কাপড় পেঁচিয়ে সহবাস করলে হুরমাত সাব্যস্ত হবে না।"[৩২৮]

উল্লেখ্য, যদি স্পর্শ চুলে হয়, তাহলে শর্ত হলো ঐ চুল স্পর্শ করা, যা মাথার সাথে লেগে থাকে। যদি ঐ চুল স্পর্শ করে যা মাথা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, তাহলে হুরমাত সাব্যস্ত হবে না। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

(قوله: ولو لشعر على الرأس) خرج به المسترسل، وظاهر ما في الخانية ترجيح أن مس الشعر غير محرم وجزم في المحيط بخلافه ورجحه في البحر، وفصل في الخلاصة فخص التحريم بما على الرأس دون المسترسل وجزم به في الجوهرة وجعله في النهر محمل القولين وهو ظاهر فلذا جزم به في الشارح.

"'খুলাসাহ'-এ বলা হয়েছে- মাথার সাথে লাগানো চুল স্পর্শ করলে হুরমাত সাব্যস্ত হবে; ঝুলন্ত

---

[৩২৫] আদ্দুররুল মুখতার: ৪/১১৫, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা
[৩২৬] আল বাহরুর রায়িক: ৩/১৭৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৩২৭] আদ্দুররুল মুখতার ৪/১১৫-১১৬, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা
[৩২৮] আল বাহরুর রায়িক: ৩/১৭৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

চুল স্পর্শ করলে হবে না।"[৩২৯]

খ. যোনি অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত

এক্ষেত্রে হুরমাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য উভয়জনই বালেগ তথা বাচ্চা প্রজননের উপযোগী হতে হবে, দৃষ্টিপাতকারীর সহবাসের মনোভাব জাগ্রত থাকতে হবে এবং সহবাসের পূর্বে বীর্যপাত না হতে হবে।

এছাড়াও এক্ষেত্রে শর্ত হলো লজ্জাস্থানের ভিতরাংশ (মূল যোনি) দেখতে হবে। বলা বাহুল্য, স্বাভাবিক অবস্থায় এটা সম্ভব নয়; বরং এটা তখনই সম্ভব যখন মহিলা হেলান দিয়ে বসে থাকে বা হেলান দিয়ে বসার সদৃশ অন্য কোনো অবস্থায় থাকে। আল্লামা মারগীনানী রাহ. বলেন-

والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها.

"দৃষ্টির ক্ষেত্রে ধর্তব্য হলো যোনি-অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করা। আর সেটা তখনই সম্ভব যখন নারী হেলান দিয়ে বসবে।"[৩৩০]

এক্ষেত্রে আরো শর্ত হলো, হুবহু যোনি অভ্যন্তর দেখতে হবে। যদি যোনি অভ্যন্তরের প্রতিচ্ছবি আয়নায় বা পানিতে দেখে, তাহলে হুরমাত সাব্যস্ত হবে না। হ্যাঁ, যদি হুবহু যোনী অভ্যন্তর গ্লাসের মাধ্যমে দেখে, তাহলে হুরমাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

النظر من وراء الزجاج إلى الفرج محرم، بخلاف النظر في المرآة. ولو كانت في الماء فنظر فيه فرأى فرجها فيه ثبتت الحرمة، ولو كانت على الشط فنظر في الماء فرأى فرجها لا يحرم، كأن العلة والله أعلم أن المرئي في المرآة مثاله لا هو.

"গ্লাসের আড়াল থেকে যোনির দিকে তাকালে হুরমাত হবে। আয়নার মধ্যে দেখলে হবে না। এমনিভাবে মহিলা পানির অভ্যন্তরে থাকলে এবং পানির ভেতরেই তার যোনি দেখলে হুরমাত হবে। যদি সে কিনারায় বসা থাকে আর পানিতে তার প্রতিচ্ছবি দেখে, তাহলে হুরমাত হবে না। সম্ভবত পার্থক্যের কারণ এটা যে, আয়না এবং প্রতিচ্ছবির ক্ষেত্রে সরাসরি ওটা দেখা হয় না; বরং ওটার প্রতিচ্ছবি দেখা হয়।"[৩৩১]

আর যদি দৃষ্টিপাতকারী মহিলা হয়, তাহলে পুরুষাঙ্গ দেখার দ্বারা হুরমাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

হানাফী ফকীহগণের নিকট উত্তেজনার সাথে হারাম স্পর্শ ও মহিলার যোনির ভিতরাংশ দেখা অথবা মহিলা কর্তৃক পুরুষের যৌনাঙ্গ দেখার দ্বারা হুরমাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। চাই তা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। উত্তেজনা একপক্ষ থেকে হোক বা উভয়পক্ষ থেকে।

হযরত আবু হানী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولابنتها.

---

৩২৯ রদ্দুল মুহতার: ৪/১১৪, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

৩৩০ আল হিদায়া: ২/৩০৯, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া

৩৩১ ফাতহুল কাদীর: ৩/২১৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

"যে ব্যক্তি কোন মহিলার যোনিপথের দিকে দৃষ্টিপাত করলো তার জন্য ওই মহিলার কন্যা ও মাতা হারাম হয়ে যাবে।"[৩৩২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها.[৩৩৩]

ইবরহীম নাখয়ী রাহ.-এর বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিধানের উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা রয়েছে। তিনি বলেন-

وكانوا يقولون إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا يحل له ، أو لمسها لشهوة فقد حرمتا عليه جميعا.[৩৩৪]

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহ. বলেন-

وكان القياس أن لا يقع تحريم بالنظر إلى غيره من سائر البدن إلا أنهم تركوا القياس فيه للأثر واتفاق السلف ولم يوجبوه بالنظر إلى غير الفرج وإن كان لشهوة على ما يقتضيه القياس ألا ترى أن النظر لا يتعلق به حكم في سائر الأصول ألا ترى أنه لو نظر وهو محرم أو صائم فأمنى لا يفسد صومه ولو كان الإنزال عن لمس فسد صومه ولزمه دم لإحرامه فعلمت أن النظر من غير لمس لا يتعلق به حكم فلذلك قلنا إن القياس لا يحرم النظر شيئا إلا أنهم تركوا القياس في النظر إلى الفرج خاصة لما ذكرنا.

"শরীরের অন্যান্য অঙ্গের বিবেচনায় কিয়াসের দাবি হলো, যোনিপথের দিকে দৃষ্টিপাতের কারণেও হুরমাত সাব্যস্ত না হওয়া। কিন্তু এখানে আসার ও সালাফের ঐক্যমতের কিয়াসের খেলাফ গ্রহণ করা হয়েছে। লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী হুরমাত সাবিত করা হয় না। যদিও তা শাহওয়াত সহকারে হয়। একটু চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই, কোন মূলনীতি বা উসূলের ভিত্তিতে দৃষ্টির সাথে হুকুম সম্পৃক্ত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইহরাম অথবা রোজা অবস্থায় দৃষ্টিপাত করে বীর্যপাত ঘটালে কোন কিছু আবশ্যক হয় না। সেক্ষেত্রে বীর্যপাত স্পর্শের মাধ্যমে হলে ইহরামের জন্য দম আসবে এবং রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব আমরা জানতে পারলাম স্পর্শহীন দৃষ্টির সাথে শর'য়ী কোন বিধান সম্পৃক্ত নয়। এজন্য আমরা বলি কিয়াসের দাবি হলো, দৃষ্টির মাধ্যমে হুরমাত সাবিত না হওয়া। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত কারণে লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাতের বিষয়টিকে আলাদা করা হয়েছে।"[৩৩৫]

এ প্রকার উপকরণ অর্থাৎ, সহবাসের প্রারম্ভিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়

এক. এ উপকরণের দ্বারা হারাম প্রমাণিত হওয়ার জন্য যে পর্যায়ের নস থাকা আবশ্যক তা বিদ্যমান নেই; তবে অন্যান্য দলীল রয়েছে।

---

[৩৩২] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৯/৯৯, হাদীস নং ১৬৪৯০

[৩৩৩] (হাদীস হাসান) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৯/৯৮-৯৯, হাদীস নং ১৬৪৮৯। সনদে লাইছ বিন আবী সুলাইম রয়েছে।

[৩৩৪] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ১৬৪৯১

[৩৩৫] আহকামুল কুরআন: ২/১৫৩

ফুকাহায়ে কেরাম কাওয়ায়েদে আম্মাহ (ব্যাপক মূলনীতিসমূহ)-এর আলোকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কোনো কোনো ফকীহ এটাকে 'ইহতিয়াত' (সতর্কতা) শব্দ দ্বারাও প্রকাশ করেছেন। যেমন, ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا مختلف فيه بين العلماء وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول كثير من الفقهاء، لا يرون اللمس والتقبيل موجبا للحرمة وليس في اثبات الحرمة نص ظاهر، بل نوع احتياط أخذنا به من حيث اقامة السبب الداعي إلى الوطئ مقام الوطئ.

"যিনার মাধ্যমে হুরমতে মুসাহারাত সাব্যস্ত হওয়া নিয়ে আবু হানিফা রাহ. ও অপরাপর ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। বহুসংখ্যক ফুকাহা স্পর্শ ও চুমু-কে হুরমাত সাব্যস্তকারী মনে করেন না। এছাড়াও এ ব্যাপারে পরিষ্কার কোন নস বা শর'য়ী দলীলও নেই। মূলত সতর্কতাবশত সহবাসের দিকে ধাবিতকারী বিষয় হিসেবে স্পর্শ বা চুমু-কে আমরা সহবাসের অনুরূপ হুকুম দিয়ে হুরমাত সাব্যস্ত করে থাকি।"[৩৩৬]

এছাড়া ফিকহী কিয়াসের দাবিও এমন। পূর্বে আমরা দেখেছি যে, বিবাহের কারণে হুরমাত প্রমাণিত হয়েছে। অথচ বিবাহের কারণেই রক্তের সম্পর্ক হয় না; বরং সহবাসের দ্বারা হয়। কিন্তু যেহেতু বিবাহ সহবাসের মাধ্যম তাই বিবাহকেই হুরমাতের কারণ বলা হয়েছে। এমনিভাবে কামভাব নিয়ে নারীর শরীর স্পর্শ করাও সহবাসের কারণ হয়ে থাকে; তাই পূর্বের নিয়মে স্পর্শকেই হুরমাতের কারণ বলা হয়েছে। আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

ولأن الحرمة إنما تثبت بالنكاح لكونه سببا داعيا إلى الجماع إقامة للسبب مقام المسبب في موضع الاحتياط كما أقيم النوم المفضي إلى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطا لأمر الصلاة، والقبلة والمباشرة في التسبب والدعوة أبلغ من النكاح فكان أولى بإثبات الحرمة.

"নিকাহ দ্বারা হুরমাত সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, তা সহবাসের কারণ ও মাধ্যম হয়ে থাকে। সতর্কতাবশত কারণ বা মাধ্যমকে মূল কাজের বিধান দেয়ার উসূলের ভিত্তিতেই এই বিধান। যেভাবে নামাজের ক্ষেত্রে সতর্কতাবশত ঘুমকে অযু ভাঙার ক্ষেত্রে হাদসের হুকুমে রাখা হয়েছে। আর চুমু ও স্পর্শ সহবাসের আবেদন সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আকদে নিকাহের চেয়ে জোরালো ভূমিকা রাখে। সুতারাং এসবের দ্বারা হুরমাত সাবিত হওয়াটা অধিক যুক্তিযুক্ত।"[৩৩৭]

দুই. যেহেতু এ হুরমাতের পেছনে সরাসরি উপযুক্ত নস নেই; বরং কাওয়ায়েদে আম্মাহ বা ইহতিয়াত রয়েছে, তাই দ্বারা প্রমাণিত হুরমাতের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ কঠোরতা রয়েছে, তা এখানে না থাকাটাই স্বাভাবিক।

دواعي الوطي **দ্বারা হুরমাত সাব্যস্ত হওয়ার কিছু কিছু সূরত ও উমূমুল বালওয়া**

মানুষ আজ বিভিন্নভাবে দ্বীনি অবক্ষয়ের শিকার। অনৈসলামিক পরিবেশে না ইসলাম পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, না নিজেকে আক্রান্ত হওয়া থেকে নিরাপদ রাখা যায়।

[৩৩৬] আল মাবসূত: ৯/১১৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন
[৩৩৭] বাদায়েউস সানায়ে: ২/৫৩৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

দাওয়াইল ওতী-র প্রথম প্রকার তথা স্পর্শের ক্ষেত্রে বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ জটিলতার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

সফরের অবস্থায় বা জ্যামের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে নারীর শরীরের সাথে স্পর্শ হয়ে যায়। আপনি বাসের সিটে বসেছেন। পাশের সিটে কোনো এক মহিলা বসে পড়লো। সিট বা বাহন সংকীর্ণ হওয়ায় শরীরের সাথে শরীর লেগেই যায়। এ অবস্থায় গাড়ি চলতে থাকে এবং ধাক্কাও লাগে। অনেক সময় নিজের শাশুড়ী বা মেয়ের সাথেও এমন হয়ে থাকে।

এমনিভাবে অসুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে শাশুড়ী জামাতার এবং স্ত্রী শশুরের সেবা করে থাকে। এ অবস্থায় সাধারণত কিছু স্পর্শ পাওয়াই যায়। এছাড়া আরো অনেক পরিস্থিতির মুখামুখি হতে হয় যেখানে স্পর্শ থেকে বিরত থাকা প্রায় অসম্ভব। আর এক্ষেত্রে হুরমাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে, তাও অনেকক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এ সকল পরিস্থিতিতে যদি বলা হয় যে, হুরমাত প্রমাণিত হবে, তাহলে মানুষ খুবই জটিলতার মাঝে পড়ে যাবে। বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে হুরমাত সাব্যস্ত হওয়ার কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো জরুরি হয়ে পড়ে।

এই জটিলতা ও সংকীর্ণ অবস্থা প্রায় সব মুফতিয়ানে কেরাম উপলব্ধি করেন। তবে এর কারণে এ বিধানের মাঝে পরিবর্তন আনা হবে কিনা তা নিয়ে দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়।

সঠিক বিবেচনা করে কোনো কোনো মুফতী সাহেব প্রস্তাব দিয়েছেন যে, যেহেতু উমূমে বালওয়া পাওয়া যাচ্ছে এবং অন্যান্য মাযহাবে ছাড় রয়েছে, তাই সাধারণ মুসলমানকে বাঁচানোর জন্য এই বিধানে অন্যর মাযহাব অনুযায়ী ফাতওয়া দেওয়া হোক।

অন্যান্য মুফতিয়ানে কেরাম বিবাহের নাযুকতা এবং হুরামাত প্রমাণিত হওয়ার জন্য কঠিন থেকে কঠিন শর্ত থাকায় এক্ষেত্রে অন্য মাযহাব অনুযায়ী ব্যাপক ফাতওয়া প্রদান করার পক্ষে নন।

তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সকল দারুল ইফতা একমত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সার্বিক অবস্থা ও দলীল বিবেচনা করে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে যে, লিখিত ফাতওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত অনুসারেই ফাতওয়া দেওয়া হবে। তবে কারো যদি বাস্তবেই 'জরুরত' পর্যায়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাহলে বিজ্ঞ মুফতী সাহেব বিস্তারিত অবস্থা শুনে যদি মনে করেন যে, তার জন্য ভিন্নমত অনুযায়ী আমল করার সুযোগ আছে, তাহলে মৌখিকভাবে অনুমতি দিবেন।

হযরত মাওলানা মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. এমন পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আলোচ্য বিধান সংক্রান্ত এক চিঠির উত্তরে লেখেন-

خاص طور پر دواعی بعد ا نکاح کی بعض صورتوں میں خاندان بھر کے لئے شدید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔

لیکن اس بنیاد پر عدمِ حرمت کا عام فتویٰ دینے کی ابھی تک ہمت نہیں ہوتی، الا یہ کہ اہل افتاء کی ایک بڑی جماعت اس پر متفق ہو جائے، جیسا کہ مفقود وغیرہ کے مسئلہ میں متفق ہوئی تھی (آپ نے اچھا کیا کہ دوسرے مفتی حضرات سے ان کی آراء معلوم کیں، لیکن جن حضرات نے حرمت ہی کے فتوے پر قائم رہنے کو کہا ہے، ان کے نام مذکور نہیں ہیں) کیونکہ معاملہ حرمت و حلت نساء کا ہے۔

لہٰذا فی الحال تو بندہ کی سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ عام فتویٰ دینے کے بجائے جہاں مفتی کسی خاص واقعے میں یہ دیکھے کہ حرمت پر فتویٰ دینے کے مفاسد و فتن مذہبِ غیر اختیار کرنے سے زیادہ ہیں، وہاں مذہبِ غیر پر عمل کا مشورہ دے دے، اور وہ بھی زبانی طور پر، جیسا کہ علامہ ابنِ عابدین رحمہ اللہ نے ایسے موقع پر مرجوح قول پر عمل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عام فتویٰ دینے میں ایک تو وہ مفاسد معلوم ہوتے ہیں، جن کا ذکر بعض مفتی حضرات نے فرمایا ہے، دوسرے علماء میں اس مسئلے پر اتفاق پیدا کئے بغیر ایسا کرنے میں ایک نیا انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

মুসাহারাতের কারণে যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন হারাম

ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমতে বিবাহ- বন্ধনের দ্বারাই স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের জন্য অপরের উসূল-ফুরূ (উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন) বংশধরগণ হারাম হয়ে যায়। সুতরাং মুসাহারাতের কারণে চার প্রকারের আত্মীয়ের সাথে বিবাহ বন্ধন চিরতরে হারাম হয়ে যায়।

১. স্ত্রীর উসূল (উর্ধ্বতন নারীগণ) তথা- মা, দাদী, নানী পর্যায়ক্রমে উপর পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ

"তোমাদের স্ত্রীদের মা।"[৩৩৮]

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. সংশ্লিষ্ট বিধান বর্ণনা করেতে গিয়ে বলেন-

وإذا تزوج الرجل امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ثم مات أو طلقها فإنه لا تحل له أمها ولا أم أمها وإن بعدت، دخل بها أو لم يدخل بها.

"কোন পুরুষ কোন এক মহিলাকে বিয়ে করলো, অতঃপর সহবাসের আগে বা পরে লোকটির মৃত্যু হলো অথবা স্ত্রীকে তালাক দিল। এক্ষেত্রে লোকটির জন্য ঐ মহিলার মা এবং মায়ের মা-এভাবে যতদূর যাক, হারাম হয়ে যাবে। সহবাস করেছে কি করেনি-এটা দেখা হবে না।"[৩৩৯]

২. স্ত্রীর ফুরু (অর্ধ্বঃস্তন মহিলাগণ) তথা- মেয়ে, নাতনী (ছেলের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে) পর্যায়ক্রমে নীচ পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"তোমাদের প্রতিপালনাধীন তোমাদের সৎ কন্যা, যারা তোমাদের এমন স্ত্রীদের গর্ভজাত,

[৩৩৮] সূরা নিসা: ২৩

[৩৩৯] কিতাবুল আসল: ৪/৩৬০, দারু ইবনে হাযম

যাদের সাথে তোমরা নিভৃতে মিলিত হয়েছো। তোমরা যদি তাদের সাথে নিভৃত-মিলন না করে থাকো (এবং তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও বা তাদের মৃত্যু হয়ে যায়), তবে (তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করাতে) তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।"[৩৪০]

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন-

وأما الربيبة فهى أن يتزوج الرجل امرأة ولها ابنة من غيره ثم يدخل بامرأة فلا تحل له ابنتها ولا ابنة ابنتها وإن سفلت. فإن لم يكن دخل بها حتى ماتت أو طلقها قبل الدخول فإنه تحل له ابنتها وابنة ابنتها.

"রাবীব তথা সৎ কন্যা (স্ত্রীর আগের স্বামীর ঔরসে জন্ম নেয়া কন্যাসন্তান) এর ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি এমন মহিলার সাথে বিয়ে এবং সহবাস হয় তাহলে ওই কন্যাসন্তান এবং তার কন্যার কন্যা এভাবে যতদূর যায় তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। আর সহবাসের আগেই যদি তালাক দেয় অথবা মারা যায় তাহলে হারাম হবে না।"[৩৪১]

উপরোক্ত দ্বিতীয় আয়াতে রাবীবা (ربيبة) তথা সৎ কন্যার ক্ষেত্রে স্বামীর প্রতিপালনে থাকার কথা বলা হয়েছে। এটা মূলত সাধারণ রীতির প্রতি লক্ষ করে বলা হয়েছে। কেননা সাধারণত এটাই হয় যে, স্ত্রীর পূর্বের সন্তানাদি থাকলে তারা স্বামীর প্রতিপালনে থাকে। অন্যথায় হুরমাত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এটা কোনো জরুরী বিষয় নয়; বরং প্রতিপালনে না থাকলেও হুরমাত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. (৫৯৩ হি.) বলেন-

سواء كانت في حجره أو في حجر غيره، لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط، ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفي الدخول.

"তার কোলে (ঘরে) লালিত হোক বা অন্যের কোলে। এখানে কোলের কথা বলা হয়েছে সাধারণ অবস্থার দিকে লক্ষ করে। এটা বিধানের সাথে সম্পর্কিত কোন শর্ত নয়। এজন্য ঐ কন্যাসন্তান তার জন্য হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল মহিলার সাথে সহবাস হওয়া না হওয়ার বিবেচনা করা হবে। ঐ কন্যা তার ঘরে লালিত পালিত হয়েছে কিনা-এর কোন ই'তবার হবে না।"[৩৪২]

৩. পুত্রবধু, পৌত্রবধু (ছেলের ছেলের স্ত্রী বা মেয়ের ছেলের স্ত্রী) পর্যায়ক্রমে নীচ পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ

"তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণও (তোমাদের জন্য হারাম)।"[৩৪৩]

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন-

---

৩৪০ সূরা নিসা: ২৩

৩৪১ কিতাবুল আসল: ৪/৩৬০, দারু ইবনে হাযম

৩৪২ আল হিদায়া: ২/৩০৮, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, ঢাকা

৩৪৩ সূরা নিসা: ২৩

فإذا تزوج الرجل امرأة ثم مات عنها أو طلقها دخل بها أو لم يدخل بها لم يكن لأبيه أن يتزوجها. وكذلك لو كان ابن ابنه وإن بعد، وابن ابنته وإن سفل، لم يكن له أن يتزوجها. وكذلك الرجل إذا وطئ الأمة بنكاح أو بملك يمين لم يكن لأبيه ولا لجده أن يتزوج بها أو يطأها واحد منهم بملك يمين.

"কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিয়ে করলো, অতঃপর সহবাসের আগে মৃত্যুবরণ করলো অথবা তালাক দিলো–কোন অবস্থাতেই ঐ পুরুষের পিতার জন্য এবং তার ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে-এভাবে যত নিচের দিকে যাক, সবার জন্য ঐ মহিলাকে বিয়ে করা বৈধ হবে না। একইভাবে কেউ কোন বাঁদীর সাথে নিকাহ বা মালিকানার মাধ্যমে দৈহিক মিলন করলে তার পিতা ও দাদার জন্য ঐ বাঁদীকে বিয়ে করা অথবা মালিকানার মাধ্যমে সহবাস করা বৈধ হবেনা।"[৩৪৪]

আর ছেলের ক্ষেত্রে উরশজাত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পালক ছেলেকে আয়াতের বিধান থেকে বের করা (অর্থাৎ, পালক ছেলের স্ত্রীর সাথে বিবাহ হারাম হবে না)। স্তন্যপান সম্পর্কীয় ছেলেকে বের করা উদ্দেশ্য নয়। আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. (৫৯৩ হি.) বলেন-

وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة.

"ঔরসজাত সন্তানের কথা উল্লেখ করে দুধ-সন্তানের স্ত্রীকে বৈধ বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং তাবান্নি বা পালক সন্তানের বিষয়টিকে বাতিল সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য।"[৩৪৫]

৪. সৎ মা, সৎ দাদী, সৎ নানী ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে উপর পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

"যে নারীদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা (কখনও) বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। তবে পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে।"[৩৪৬]

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন-

فإذا تزوج الأب امرأة ثم مات عنها أو طلقها دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام على ابنه. وكذلك ابن ابنه وإن سفل، وكذلك ابن ابنته وإن سفل، لأن هؤلاء كلهم ولد. وكذلك لو وطئ أمة بملك يمين أو بنكاح فهي حرام أيضا على ولده وولد ولده وإن بعدوا. وكذلك لو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة فهي حرام.

"পিতা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার পর সহবাস করুক বা না করুক তার মৃত্যু হলে বা তিনি তালাক দিলে তার ছেলের জন্য এবং ছেলের নিচের দিকে যতদূর যাক সবার জন্য এই মহিলাকে বিয়ে করা হারাম হবে। কেননা এরা সবাই তার নসলের হওয়ার কারণে তারই

---

[৩৪৪] কিতাবুল আসল: ৪/৩৬০, দারু ইবনে হাযম
[৩৪৫] আল হিদায়া: ২/৩০৮, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া, ঢাকা
[৩৪৬] সূরা নিসা: ২২

সন্তান বলে বিবেচিত। অনুরূপ বিধান মালিকানা বা নিকাহের মাধ্যমে কোন বাঁদীর সাথে মিলন করলে...। একইভাবে এই হুকুম সাব্যস্ত হবে ওই নারীর ক্ষেত্রে যাকে কামভাবের সাথে চুমু দিয়েছে বা স্পর্শ করেছে।"[৩৪৭]

উপরোক্ত চার প্রকার আত্মীয়ের মধ্যে সৎ মেয়ে ব্যতীত বাকি তিন প্রকার শুধু শুদ্ধভাবে বিবাহ সম্পন্ন (نكاح صحيح) হওয়ার দ্বারা হারাম হয়ে যাবে। শারীরিক মিলন হোক বা না হোক। তবে সৎ মেয়ে হারাম হওয়ার জন্য তার মায়ের সাথে শুধু শুদ্ধভাবে বিবাহ সম্পন্ন হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং শারীরিক মিলন (وطي) বা শারীরিক মিলনের প্রারম্ভিক কার্যবলী (دواعي الوطي) মিলনের ভূমিকা (তথা উত্তেজনার সাথে স্পর্শ বা যোনির ভিতরাংশ দেখা) পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। সুতরাং কেউ যদি বিবাহ করার পর (وطي) শারীরিক মিলন বা প্রারম্ভিক কার্যবলীর মধ্য থেকে কিছু পাওয়া যাওয়ার পূর্বেই যদি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় বা স্ত্রী মারা যায়, তাহলে তার মেয়ে হারাম হবে না। এর প্রমাণ উপরোক্ত আয়াতের এই অংশ-

مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ

"তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে (তোমাদের প্রতিপালনাধীন তোমাদের সৎ কন্যা) যারা তোমাদের এমন স্ত্রীদের গর্ভজাত, যাদের সাথে তোমরা নিভৃতে মিলিত হয়েছো। তোমরা যদি তাদের সাথে নিভৃত-মিলন না করে থাকো (এবং তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও বা তাদের মৃত্যু হয়ে যায়), তবে (তাদের কন্যাদেরকে বিবাহ করাতে) তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।"[৩৪৮]

উক্ত আয়াতাংশে وطى তথা শারীরিক মিলনের কথা বলা হয়েছে। دواعى وطى তথা শারীরিক মিলনের প্রারম্ভিক কার্যাবলীর কথা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ সাধারণ নীতি অনুযায়ী এটাকেও (সতর্কতাবশত) শারীরিক মিলনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

وفي الكشاف واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول عند أبي حنيفة.

"তাফসীরে কাশশাফ-এ আছে-ইমাম আবু হানিফা রাহ.-এর মত অনুযায়ী স্পর্শ ইত্যাদি সহবাসের স্থলাভিষিক্ত।"[৩৪৯]

এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের আসার পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত,

إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها.

"ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে সহবাস

---
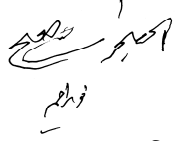
[৩৪৭] কিতাবুল আসল: ৪/৩৬০, দারু ইবনে হাযম

[৩৪৮] সূরা নিসা: ২৩

[৩৪৯] আল বাহরুর রায়িক: ৩/১৬৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

করে অথবা কামভাবে নিয়ে চুমু দেয়, স্পর্শ করে অথবা তার যোনিপথের দিকে দৃষ্টি দেয় তাহলে তার পিতাগণ (অর্থাৎ, দাদা ও উর্ধ্বতন পুরুষ) ও সন্তানগণের (অর্থাৎ, অধঃস্তন পুরুষ) জন্য ঐ মহিলা হারাম হয়ে যাবে। এছাড়াও তার জন্য ঐ মহিলার মাতাগণ ও কন্যাগণ হারাম হয়ে যাবে।"[৩৫০]

সত্যায়নে
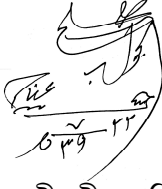
মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আ'যম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২২ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২২ রজব ১৪৩৯ হি.

---

৩৫০ আল মাবসূত: ৪/২০৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

আই.ভি.এফ (টেস্টটিউব বেবি) ও আই.ইউ.আই: শর‘য়ী দৃষ্টিকোণ

মাওলানা মানযুরুল ইসলাম, মোমেনশাহী

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো চিকিৎসা বিজ্ঞানেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক উপসর্গের কারণে রোগব্যাধির তালিকা যেমন দীর্ঘ হচ্ছে, তেমনি আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন নতুন রোগ প্রতিষেধক ও নিরাময় পদ্ধতি। অন্যান্য রোগের মতো বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও[৩৫১] ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে নানা ধরনের ঔষধ, মেডিসিন, ড্রাগস, সার্জারী ও অপারেশন পদ্ধতি। বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় আবিষ্কৃত সর্বাধুনিক ও জটিলতম দু'টি অপারেশন পদ্ধতি হলো আই.ভি.এফ (IVF) এবং আই.ইউ.আই (IUI)। এর মধ্যে আই.ভি.এফ প্রক্রিয়াটিই অধিক জটিল ও স্পর্শকাতর। এ প্রক্রিয়ার সাহয্যে জন্মলাভকারী সন্তান ‘টেস্টটিউব বেবি’ নামে পরিচিত।

গত শতকের আশি ও নব্বই-এর দশকে পদ্ধতি দু'টির আবিষ্কার ও সফল পরীক্ষা সারা বিশ্বে ব্যাপক সাড়া জাগায়। সমকালীন মুফতী ও ফিকহবিদগণ তখনই এর শর‘য়ী বিধান সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা আই.ভি.এফ (টেস্টটিউব) ও আই.ইউ.আই-এর শর‘য়ী বিধান ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করবো। মূল আলোচনার পূর্বে উভয় প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

আই.ভি.এফ ও টেস্টটিউব বেবি : সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ

আই.ভি.এফ (IVF)-এর বিস্তারিত রূপ হলো, ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (In-vitro fertilization) (ভিট্রো= কাঁচ, ইন ভিট্রো= কাঁচের ভেতর, ফার্টিলাইজেশন= নিষিক্তকরণ)। সহজ বাংলায় এর অর্থ: কাঁচের পাত্রে নিষেক।[৩৫২]

টেস্ট অর্থ পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ইত্যাদি। টিউব শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়; তবে এখানে পরীক্ষাগারের বিশেষ কাঁচের পাত্র বা বোতল উদ্দেশ্য। পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় পরীক্ষাগারের কাঁচের পাত্র।

এ প্রক্রিয়ার সারসংক্ষেপ হলো, পুরুষের শুক্রাণু ও নারীর ডিম্বাণু সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবে তার মাঝে নিষেক ঘটানো হয়। অতঃপর নিষিক্ত ভ্রূণকে নারীর গর্ভাশয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এই নিষেকের মাধ্যমে যে বাচ্চার জন্ম হয় তাকে টেস্টটিউব বেবি বলা হয়।[৩৫৩]

ওয়ার্ল্ড জার্নাল অব ফার্মেসি এ্যান্ড ফার্মেসিউটিকেল সাইন্সেস-এর ভাষ্যমতে- ‘In-vitro fertilization (IVF) is an advanced and miraculous process by which

---

[৩৫১] বিভিন্ন কারণেই বর্তমানে সারা বিশ্বে বন্ধ্যাত্বের হার বাড়ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অশ্লীলতা ও অবাধ পাপাচার।

[৩৫২] **নিষেক**-ক্ষরণ; নিঃস্রাব। বর্ষণ। সিঞ্চন; সেচন। গর্ভাধান (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী)

[৩৫৩] প্রথম টেস্টটিউব বেবির জন্ম ২৫ জুলাই ১৯৭৮ সালে লন্ডনে। এ প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক রাবার্ট জি এডওয়ার্ডস (Robert G. Edwards) তার এ অবদানের কারণে ২০১০ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাংলাদেশে প্রথম টেস্টটিউব বেবির জন্ম হয় ২০০১ সালের ২৯ মে রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে।

egg is fertilized by sperm outside the body...'
"ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন তথা আই.ভি.এফ হলো একটি অত্যাধুনিক ও বিস্ময়কর প্রক্রিয়া, যাতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুকে মাতৃগর্ভের বাইরে নিষিক্ত করা হয়"।[৩৫৪]

আই.ভি.এফ প্রক্রিয়ার উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত:[৩৫৫] আমরা জানি, বাচ্চা জন্ম নেয় স্ত্রীর ডিম্ব ও স্বামীর বীর্য থেকে। স্বামীর বীর্য স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশের পর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে বাচ্চায় পরিণত হয়।

আই.ভি.এফ-এর ক্ষেত্রে প্রজননের মূল প্রক্রিয়া ঠিকই থাকে। অর্থাৎ, বাচ্চা স্বাভাবিকভাবে মাতৃগর্ভেই প্রাণলাভ করে এবং বেড়ে উঠে। তবে এর পূর্বাপর কিছু কাজ কৃত্রিমভাবে করা হয়। যেমন, স্ত্রীর ডিম্বপাত[৩৫৬] বা ওভুলেশনের (ovulation) সময় ডিম্ব যখন পরিপক্ক হয়, তখন তা ডিম্বাশয় থেকে ল্যাপারোস্কপি (laparoscopy) নামক একধরনের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

যেসব নারীর ডিম্ব উৎপাদনে সমস্যা, তাদের ক্ষেত্রে প্রথমে ডিম্ব উৎপাদনে সহায়ক কিছু ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। ল্যাপারোস্কপি ছাড়াও যোনিপথে ছোট্ট একটি অপারেশনের মাধ্যমেও ডিম্বাণু সংগ্রহ করা যায়।

সংগ্রহের পর ডিম্ব রাখা হয় টেস্টটিউব তথা বিশেষ ধরণের একটি পাত্রে, যার নাম পেট্রিডিশ (Petri dish)। এটাকে Cell-culture dish তথা কোষ-নিষেকের পাত্রও বলা হয়।

একই সময় স্বামীর অসংখ্য শুক্রাণু সংগ্রহ করে তা থেকে ল্যাবে বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বেছে নেয়া হয় সবচেয়ে ভালো একঝাঁক শুক্রাণু। তারপর সেগুলোকে নিষিক্তকরণের লক্ষ্যে ছেড়ে দেয়া হয় ডিম্বাণুর পেট্রিডিশে। এরপর ডিশটি ইনকিউবেটরে (Incubator) রাখা হয়। ইনকিউবেটরে কৃত্রিম উপায়ে যথাযথ তাপমাত্রা ও আদ্রতায় মাতৃগর্ভের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এখানেই শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর স্বয়ংক্রিয় নিষেকের ফলে সৃষ্টি হয় মানবভ্রুণের। কখনো কখনো নিষেক নিশ্চিত করতে ইনট্রাসিটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন (Intracytoplasmic sperm injection) পদ্ধতিতে কেবল একটি উৎকৃষ্ট শুক্রাণুকে

---

[৩৫৪] wjpps-এর ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য।

[৩৫৫] সূত্র:

1. The early days of IVF (Article in Human Reproduction. Update: August 2005) https://www.researchgate.net/publication/7682530
2. IN-VITRO FERTILIZATION: STUDY MATERIAL AND GUIDELINES (A Social Document from the Lutheran Council in the U.S.A. page no: 5-6)
3. A BRIEF REVIEW ON *IN-VITRO* FERTILIZATION (IVF): AN ADVANCED AND MIRACULOUS GATEWAY FOR INFERTILITY TREATMENTS (WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES)
4. বিবিসি/উইকিপিডিয়া।

[৩৫৬] প্রতি মাসে নারীর দু'টি ডিম্বাশয়ের যে কোনো একটিতে একটি ডিম্বাণু পরিপক্ক হয়। অতঃপর তা ফেলোপিয়ান নালীতে (fallopian tube) পৌঁছায়। এই ফেলোপিয়ান নালী সেটাকে জারায়ুতে নিষেকের জন্য নিয়ে যায়। পরিপক্ক ডিম্ব ডিম্বাণু থেকে ফেলোপিয়ান নালীতে পতিত হওয়াকে ডিম্বপাত বলে।

সূত্রঃ (http://americanpregnancy.org/getting-pregnant/understanding-ovulation/)

সরাসরি ডিম্বাণুর ভেতর প্রতিস্থাপন করা হয়।

সাধারণত দুই থেকে ছয়, ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশি দিন ভ্রুণকে ইনকিউবিটরে রাখা হয়। তারপর বিশেষ নলের সাহায্যে স্ত্রীর জরায়ুতে ভ্রুণটি প্রতিস্থাপন করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে ভ্রুণকোষটি জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের আগে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কিছুদিনের জন্য হিমায়িত করে রাখার প্রয়োজন পড়ে। বিশেষতঃ যাদের ডিম্ব উৎপাদন করা হয় ওষুধের সাহায্যে বা প্রয়োজনীয় হরমোন[৩৫৭] প্রয়োগের মাধ্যমে, তাদের জরায়ুর প্রকৃতি ঐ মাসিক চক্রে স্বাভাবিক থাকার সম্ভাবনা কম থাকে। সে কারণে ভ্রুণ প্রতিস্থাপনের জন্য পরবর্তী স্বাভাবিক মাসিক চক্রের জন্য অপেক্ষা করা হয়। সূচনার এই সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টাতে শিশু একদম স্বাভাবিক গর্ভাবস্থার মতোই মাতৃগর্ভে বেড়ে ওঠে।

আই.ইউ.আই : পরিচিতি ও প্রক্রিয়া

আই.ইউ.আই IUI-এর বিস্তারিত রূপ হলো intra-uterine insemination[৩৫৮]। অর্থাৎ, জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রতিস্থাপন। এ পদ্ধতিকে AI-ও বলা হয়। অর্থাৎ, Artificial insemination বা কৃত্রিম নিষেক। আবার পূর্বেরটির মতো এটাকে আই.ভি.এফ-ও বলা হয়। অর্থাৎ, In vivo fertilization বা জরায়ুর অভ্যন্তরে প্রজনন।

আই.ভি.এফ বা টেস্টটিউব বেবির সাথে এর পার্থক্য হলো, এ পদ্ধতিতে স্ত্রীর ডিম্বাণু বের করা হয় না; বরং স্বামীর শুক্রাণু থেকে সুস্থ ও সবল শুক্রাণুগুলোকে পৃথক করে সরাসরি জারায়ুর ভেতর ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলন বা প্রয়োগ করে দেয়া হয়।[৩৫৯]

বিশেষজ্ঞদের মতে আই.ভি.এফ-এর তুলনায় আই.ইউ.আই-এর সফলতার হার অনেক বেশি।

আই.ভি.এফ ও আই.ইউ.আই-এর শর‘য়ী বিধান : কিছু মৌলিক কথা

আই.ভি.এফ ও মানব প্রজননের কৃত্রিম পন্থা অবলম্বনের শর‘য়ী বিধান ও মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনার পূর্বে কিছু মৌলিক বিষয় বিশ্লেষণ করা সমীচীন মনে হচ্ছে। আশা করি, এর দ্বারা আই.ভি.এফ ও আই.ইউ.আই-এর শর‘য়ী বিধান বুঝতে সহজ হবে।

১. ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদা ও বংশ সংরক্ষণের গুরুত্ব

আল্লাহ তা‘আলা আসমান-যমীনের অসংখ্য সৃষ্টিকুলের মাঝে মানুষকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা

---

[৩৫৭] অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত (বিভিন্ন ধরনের) রস, যা রক্তের সঙ্গে মিশে প্রাণীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে উদ্দীপ্ত করে।

[৩৫৮] ইন্ট্রা ইউটেরাইন ইনসেমিনেসান

[৩৫৯] যে মাসে আই.ইউ.আই করা হবে, সে মাসে মাসিকের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিন থেকে স্ত্রীকে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। ১২ থেকে ১৩ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করভ হয়। স্বাভাবিক মাসিকের সময় কেবল একটি ডিম বের হয়ে আসে। ওষুধ প্রয়োগের ফলে ৩ থেকে ৪টা ডিম পরিপক্ক হয়ে ডিম্বকোষ থেকে বের হয়ে শুক্রকীটের সঙ্গে মিলনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এই ডিমগুলোর কার্যক্ষমতাও বেশি থাকে। এই সময়ের মধ্যেই নানা প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে ওষুধের কার্যকারিতা দেখা হয়। ভ্রূণ বিশেষজ্ঞরা এই পরীক্ষাগুলো পর্যালোচনা করে একটা নির্দিষ্ট দিন আই.ইউ.আই করার জন্য ঠিক করে নেন। আই.ইউ.আই করার দিন স্বামীর কাছ থেকে বীর্য সংগ্রহ করে নানা প্রকার ওষুধ ও যন্ত্রের মাধ্যমে কেবল সুস্থ ও সবল শুক্রকীটগুলোকে পৃথক করে অন্য আরেকটি ওষুধের মধ্যে রেখে দেয়া হয়, যাতে শুক্রকীটগুলো আরও সুস্থ ও সবল হয়ে উঠে এবং সহজেই মার জরায়ুতে অবস্থিত ডিমের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। এরপর অত্যন্ত সূক্ষ্ম যন্ত্রের মাধ্যমে শুক্রকীটগুলো সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনে মার জরায়ুর ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়।

দান করেছেন। বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীন সর্বদিক থেকে মানুষকে দান করেছেন স্বকীয় মর্যাদা এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"বাস্তবিকপক্ষে আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদের উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমরা বহু মাখলুকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"[৩৬০]

ইসলামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে এ কথাই বের হয়ে আসে যে, মানুষ মুকাররাম ও সম্মানিত। একজন মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো এই কারামাহ বা সম্মান অটুট রাখা। মনে প্রাণে উপলব্ধি করা যে, যেকোনো লক্ষ্য ও স্বার্থের উপর এই মর্যাদার স্থান।

মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্বের নাযুকতম ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র হলো তার বংশের সংরক্ষণ এবং স্বচ্ছতা। মানব বংশ আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

"তিনিই পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাবে বংশগত ও বৈবহিক আত্মীয়তা দান করেছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।"[৩৬১]

ইসলামের মৌলিক মাকাসিদ তথা লক্ষোউদ্দেশ্যের একটি হলো মানুষের স্বচ্ছ ও সন্দেহমুক্ত নসব নিশ্চিত করা। আল্লামা তাহের ইবনে আশুর মালেকী রাহ. বলেন-

واستقراء مقصد الشريعة في النسب أفادنا أنها تقصد إلى نسب لا شك فيه، ولا محيد به عن طريقة النكاح بصفاته التي قررناها.

"নসবের ক্ষেত্রে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে আমরা বুঝতে পারি, শরী'আতের উদ্দেশ্য হলো সংশয়মুক্ত নসব। আর এর জন্য শরী'আতসম্মত বিয়ের কোনো বিকল্প নেই।"[৩৬২]

তিনি আরো বলেন-

ولا شك عندي في أن حفظ النسب الراجع إلى صدق انتساب النسل إلى أصله سائقٌ النسلَ إلى البر بأصله والأصلَ إلى الرأفة والحنو على نسله، سوقا جبليا (خفيا) وليس أمرا وهميا، فحرص الشريعة على حفظ النسب وتحقيقه ورفع الشك عنه ناظر إلى معنى نفساني عظيم من أسرار التكوين الإلهي، علاوة على ما في ظاهره من إقرار نظام العائلة، ودرء أسباب الخصومات الناشئة عن الغيرة المجبولة عليها النفوس، وعن تطرق الشك

[৩৬০] সূরা বনী ইসরাইল: ৭০
[৩৬১] সূরা ফুরকান: ৫৪
[৩৬২] মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ: ৪৪১

من الأصول في انتساب النسل إليها والعكس.

"কোনো সন্দেহ নেই, নসব (বংশ) সংরক্ষণ তথা প্রজন্মকে তার প্রকৃত মূল ও শেকড়ের সাথে সম্পৃক্ত করার দ্বারা মানুষের ভেতরের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় আপনাআপনিই সৃষ্টি হয় মূল তথা মাতা-পিতা ও তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি সদাচারণের উত্তম আবেদন এবং তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় শাখা তথা সন্তানের প্রতি মায়া-মমতার অনুপম অনুভূতি। এজ্যনই শরী'আত নসব সংরক্ষণ ও নসবকে সংশয়মুক্ত রাখতে জোর তাগিদ করেছে। এর দ্বারা একদিকে পারিবারিক সম্প্রীতি অর্জন হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসাদ ও অস্থিতিশীলতার পথ রুদ্ধ হয় (যা বংশের ক্ষেত্রে সংশয় বা মানুষের স্বভাবজাত আত্মমর্যদাবোধ নষ্ট হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে)। অপরদিকে এর দ্বারা ঐ মহান উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়, যার বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (অর্থাৎ, বংশের মূল ও শাখার মাঝে গভীর সম্পর্ক)। যা রাব্বুল আলামীনের তাকভীন (সৃজন নির্দেশনা)-এর একটি গুঢ় বিষয়।"[৩৬৩]

বংশ ও বংশ পরিচয়কে নিষ্কলুষ ও নির্দাগ রাখতে শরী'আতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যেসব কার্যকলাপ নসব তথা বংশকে সন্দেহপূর্ণ বা কলুষিত করতে পারে ইসলাম তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। যিনাকে হারাম করা হয়েছে এবং এর সমস্ত পথ পরিপূর্ণরূপে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده، وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين.

"যে নারী কোনো সম্প্রাদায়ে বাইরের কাউকে প্রবেশ করালো (অর্থাৎ, অবৈধ সন্তান পেটে ধারণ করলো) আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজের সন্তানের দিকে চেয়ে চেয়ে তাকে অস্বীকার করলো (তার একটুও বুক কাঁপলো না) আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি এতটুকু অসন্তুষ্ট হন যে, ঐ ব্যক্তি ও তাঁর (মহান সত্ত্বার) মাঝে পর্দা টেনে দেন। আর পূর্বাপর সকল মানুষের সামনে কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছিত করবেন।"[৩৬৪]

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছি-

من ادّعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام.

"যে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবি করে, তার জন্য জান্নাত হারাম।"[৩৬৫]

বংশের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্যই এ বিধান রাখা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ

---

[৩৬৩] মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহঃ ৪৪২

[৩৬৪] (হাসান) সুনানু আবী দাউদঃ হাদীস নং ২২৬৩, সুনানুন নাসাঈঃ হাদীস নং ৩৪৮১, সুনানুদ দারেমীঃ হাদীস নং ২২৮৪, সহীহ ইবনে হিব্বানঃ হাদীস নং ৪১০৮

[৩৬৫] সহীহ বুখারীঃ হাদীস নং ৬৭৬৬-৬৭৬৭, সহীহ মুসলিমঃ হাদীস নং ১১৫

করেন-

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ

"যে নারীদের তালাক দেওয়া হয়েছে, তারা তিন বার হায়েয আসা পর্যন্ত নিজেদেরকে প্রতীক্ষায় রাখবে।"[৩৬৬]

এজন্য অবৈধ পিতার পিতৃত্বকেই অস্বীকার করা হয়েছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা রাযি. কর্তৃক বর্ণিত এক প্রসিদ্ধ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

الولد للفراش وللعاهر الحجر.

"(মানব সন্তানের পবিত্র) নসব বৈধ স্বামী বা মনিব থেকেই সাব্যস্ত হবে। পাপী বেহায়ার জন্যে কেবল মাহরুমী।"[৩৬৭]

এ থেকে সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এমন কোনো পরিকল্পিত নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ ইসলামে অনুমোদিত হতে পারে না যা সংশয়পূর্ণ বংশের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়।

২. মানব প্রজননের বৈধ ও প্রাকৃতিক উপায়

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ শরী'আত নাযিল করেছেন। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেননি। মানুষের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে সীমারেখা স্থির করে দিয়েছেন। আবশ্যকীয় করেছেন আল্লাহর ফিতরাতের অনুসরণ।

মানব প্রজননের জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রকৃতিতেই সুনির্দিষ্ট পন্থা ও পদ্ধতি দান করেছেন। স্বামী-স্ত্রী অথবা মনিব ও ক্রীতদাসীর মাঝে মিলনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপায়ে মানব প্রজনন হয়ে থাকে। এটা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"হে লোক সকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তারাই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার অছিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়দের (অীধকার খর্ব করা)-কে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।"[৩৬৮]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

---

[৩৬৬] সূরা বাকারা: ২২৮

[৩৬৭] সহীহ বুখারী: ৬৭৪৯ (باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة), সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৪৫৪

[৩৬৮] সূরা নিসা: ১

"যারা যাকাত সম্পাদানকারী, যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে।"[৩৬৯]

এটাই মানব প্রজননের চিরাচরিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিই মানব প্রজননের প্রাকৃতিক পদ্ধতি হওয়াটা একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, বৈধ স্বামী-স্ত্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে মৌলিকভাবে দু'টি কারণে-

এক. বৈধ পন্থায় স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য। কুরআন-হাদীসে বৈধ পন্থা ব্যতীত অন্য যেকোনো পন্থা ও মাধ্যম পরিহার করার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সর্তক করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতেও অবৈধ কোনো উপায়ে চাহিদা পূরণ না করার জন্য পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।

দুই. বৈধ প্রজননের উদ্দেশ্যে। একজন নারীর জন্য সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো একটি সন্তান উপহার দেয়া। কুরআনে বৈধ স্ত্রী বোঝানোর জন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে "حرثكم"। হারছ-এর শাব্দিক অর্থ হলো শস্যক্ষেত্র। এখানে উদ্দেশ্য প্রজননস্থল।[৩৭০] সুতরাং প্রত্যেককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমরা তোমাদের প্রজননস্থলে আসো। অন্য প্রজননস্থলে যেও না। অতএব প্রজনন করতে হলে বৈধ স্ত্রীর মাধ্যমেই করতে হবে। নিজ প্রজননস্থল ব্যতীত অন্য কোনো প্রজননস্থল গ্রহণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.

"আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে এমন ব্যক্তির জন্য কখনো বৈধ হবে না অন্যের ক্ষেতে নিজের পানি সিঞ্চন করা।"[৩৭১]

উপরোল্লিখিত শর'য়ী দলীল থেকে স্পষ্ট যে, একজন পুরুষের জন্য যেমন নিজের নুতফা (বীর্য) পরনারীর প্রজননস্থলে রাখা বা প্রবেশ করানো নিষেধ, ঠিক তেমনি একজন নারীর জন্যও পরপুরুষের প্রজননস্থল হওয়া নিষেধ।

৩ . শর'য়ী সতর ও তার গুরুত্ব

ইসলামের মৌলিক মাকাসিদের মাঝে অন্যতম হলো মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্ভ্রম সংরক্ষণ। মানুষের মর্যাদা ও আত্মসম্ভ্রমের একটি অংশ হলো তার সতরের অংশগুলো।[৩৭২] তাই ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে যে, অন্যের সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

---

[৩৬৯] সূরা মুমিনুন: ৫,৬,৭

[৩৭০] হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি আয়াতে উল্লিখিত حرث শব্দের অর্থ করেছেন: "منبت الولد"।

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن عكرمة، عن ابن عباس:" فأتوا حرثكم"، قال: منبت الولد. [تفسير الطبري: ٣٩٧/٤]

[৩৭১] (হাদীস সহীহ) সুনানু আবী দাউদ: ২১৫৯ (باب في وطء السبايا), মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৬৯৯০

[৩৭২] এছাড়াও সতর ঢাকা ও পোশাক পরিধান মানুষের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অন্যতম প্রতীক। যিনা-ব্যাভিচারের পথ বন্ধ করা ছাড়াও সতর ঢাকা একটি স্বকীয় বিধান। সতরকে আওরাত বলে। কেননা স্বভাবজাতভাবে এসব অঙ্গপ্রকাশে মানুষ লজ্জাবোধ করে।

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য শুদ্ধতর। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া।"[৩৭৩]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.

"এক পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না। এক মহিলা অপর মহিলার সতরের দিকে তাকাবে না। এক কাপড়ের নিচে দুই পুরুষ (গায়ে গা লাগিয়ে) অবস্থান করবে না। অনুরূপ এক কাপড়ের নিচে দুই নারী (গায়ে গা লাগিয়ে) অবস্থান করবে না।"[৩৭৪]

হযরত বাহ্য ইবনে হাকীম রাহ. তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: والرجل يكون خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه.

"আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের সতর কে কতটুকু দেখতে পারবে? তিনি বললেন, তোমার স্ত্রী ও বাঁদী ছাড়া সবার থেকে তোমার সতরকে হেফাজত করো। আমি বললাম, বিভিন্ন সময় একান্ত মুহূর্তে (যেমন, গোসল, কাযায়ে হাজত সফর ইত্যাদিতে) এক পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে থাকার প্রয়োজন পড়ে, (তৎকালীন সময়ে খোলা স্থানে প্রয়োজন সারতে হতো)- তখন? তিনি বললেন, যথাসাধ্য চেষ্টা করো তোমার সতর যাতে কেউ না দেখে। আমি বললাম, আর ব্যক্তি যদি একাকী হয় (তখন কি সতর খুলতে পারবে)? তিনি বললেন, তখন কি আল্লাহর ব্যাপারে শরমিন্দা হওয়া উচিত নয়?"[৩৭৫]

এ সকল আয়াত ও হাদীস থেকে ফুকাহায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, শর'য়ী প্রয়োজন ব্যতীত কারো জন্য অন্যের সতর দেখা বা স্পর্শ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।

উল্লেখ্য যে, সতরের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। মৌলিকভাবে দু'স্তর বলা যেতে পারে-

এক. আওরাতে খফীফাহ। অর্থাৎ, শরীরের ঐ অংশ যা পর নারী-পুরুষ দেখতে না পরলেও পুরুষেরটা অন্য পুরুষ এবং নারীরটা অন্য নারী দেখতে পারবে।

---

[৩৭৩] সূরা নূর: ৩০,৩১

[৩৭৪] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৩৩৮

[৩৭৫] সুনানুত তিরমিযী: হাদীস নং ২৭৬৯, ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন: هذا حديث حسن

দুই. আওরাতে গলীযা। অর্থাৎ, ঐ অংশ যা পর নারী-পুরুষ তো দেখতেই পারবে না; এমনকি এক পুরুষ অন্য পুরুষেরটা দেখতে পারবে না এবং এক নারী অন্য নারীরটা দেখতে পারবে না। একমাত্র স্বামী-স্ত্রীই দেখতে পারবে। যেমন, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ, বিশেষ করে যৌনাঙ্গ।

এখানে উল্লেখ্য যে, সতরের অঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত সকল জিনিসই সতরের আওতায় আসবে। এ কারণেই নাভির নিচের লোম কেটে অন্য কাউকে দেখানো নিষেধ; বরং তা গোপন স্থানে পুঁতে রাখতে হবে। সুতরাং গোপনাঙ্গ যেমন সতর, তেমনি তা থেকে নির্গত পদার্থও সতর। শর'য়ী প্রয়োজন ব্যতীত অন্যকে তা দেখানো জায়েয নয়।

হ্যাঁ, শর'য়ী জরুরতের ক্ষেত্রে জরুরতের সীমা অনুযায়ী সতর খোলা বা দেখার অবকাশ রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম এক্ষেত্রে الضرورات تبيح المحظورات এবং অন্যান্য শর'য়ী মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

وأما النظر إلى العورة حرام لما روي ... ولكن مع هذا إذا جاء العذر فلا بأس بالنظر إلى العورة لأجل الضرورة.

"সতরের দিকে তাকানো হারাম...। কিন্তু অপারগতার কারণে তাকানোর অবকাশ আছে।"[৩৭৬]

তবে এক্ষেত্রে শর'য়ী জরুরতের সীমারেখা মেনে চলতে হবে। হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহ. শর'য়ী পরিভাষার জরুরতের সীমা এবং জরুরতের কারণে কোনো হারাম কাজ বা বস্তু বৈধ হওয়ার শর্ত প্রসঙ্গে বলেন-

خلاصہ یہ ہے کہ کسی حرام چیز کا حلال ہونا تین شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔

اول. یہ کہ حالت اضطراری ہو کہ حرام کے استعمال نہ کرنے میں جان کا خطرہ ہے۔

دوسرے. یہ خطرہ محض موہوم نہ ہو بلکہ کسی معتمد حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے کی بناء پر عادۃ یقینی جیسا ہو۔

تیسرے. یہ کہ اس حرام کے استعمال سے جان بچ جانا بھی کسی معتمد حکیم یا ڈاکٹر کی تجویز سے عادۃ یقینی ہو۔ یہ سب شرائط قران کریم کے ارشادات سے مستفاد ہیں۔

ان تینوں شرطوں کے ساتھ باتفاق فقہائے امت استعمال حرام جائز ہو جاتا ہے۔

"সারকথা, কোনো হারাম বস্তুর ব্যবহার বৈধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে:

১. এমন অপারগ অবস্থার সম্মুখীন হওয়া যে, হারাম বস্তু ব্যবহার না করলে প্রাণনাশের আশংকা থাকে।

২. এ আশংকা শুধু সম্ভাবনা পর্যায়ের না হওয়া; বরং কোনো নির্ভরযোগ্য হাকীম বা চিকিৎসকের কথার ভিত্তিতে তা স্বাভাবিক নিশ্চিত পর্যায়ের হওয়া।

৩. উক্ত হারাম বস্তুর ব্যবহারের দ্বারা প্রাণ বেঁচে যাওয়াটা কোনো নির্ভরযোগ্য হাকীম বা চিকিৎসকের কথার ভিত্তিতে নিশ্চিত পর্যায়ের হওয়া।

এসব শর্ত কুরআনে কারীমের ইরশাদাত থেকে সংগৃহীত।

---

[৩৭৬] আল মাবসূত: ১০/১৫৫-১৫৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

এসব শর্তসাপেক্ষে উম্মতের ফকীহগণের ঐক্যমতে হারাম বস্তুর ব্যবহার জায়েয হয়ে যায়।"[৩৭৭]

তাহলে প্রয়োজনের কারণে যার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রয়োজনের পরিমাণের অতিরিক্ত সব কিছু হারাম বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং চিকিৎসাজনিত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যদি মহিলার মাধ্যমে মহিলার চিকিৎসা সম্ভব হয়, তাহলে পুরুষের মাধ্যমে চিকিৎসা করানো জায়েয হবে না। আল্লামা মাজদুদ্দীন মাওসিলী রাহ. বলেন-

وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة مداواتها، لأن نظر المرأة إلى المرأة أخف من نظر الرجل إليها لأنها أبعد من الفتنة، فإذا لم يكن منه بد فليغض بصره ما استطاع تحرزا عن النظر بقدر الإمكان.

"ডাক্তারের জন্য উচিত হলো তার (মহিলার) চিকিৎসা কোনো মহিলাকে শিখিয়ে দিবে। কারণ, পুরুষের তুলনায় মহিলার প্রতি মহিলার দৃষ্টিপাত করা শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক হালকা। কারণ, এক্ষেত্রে ফেৎনার আশংকা অনেক কম। তবে যদি পুরুষ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করানো ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তার যথাসম্ভব দৃষ্টিকে নত রেখে সতর্কতার সাথে চিকিৎসা করবে।"[৩৭৮]

এছাড়াও আরো কিছু সীমারেখা ফুকাহায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা উত্থাপন করা হলো না।

এখন প্রশ্ন হলো সন্তান প্রজনন কি জরুরত? বস্তুত জরুরত একটি ফিকহী পরিভাষা। সুতরাং ফিকহের দৃষ্টিতে জরুরত প্রমাণিত না হলে কারো আওরাত বা সতর দেখা বা দেখানো বৈধ হবে না।

জরুরতের সহজ ব্যাখ্যা হলো, যা না হলেই নয়। যা না হলে শারীরিক বা আর্থিকভাবে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

সন্তান প্রজনন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিকহী পরিভাষায় জরুরতের আওতায় আসে না। সন্তান না হলে শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা নেই। সাধারণত মানসিক ক্ষতিও ঐ পর্যায়ে পৌঁছে না, যা নিতান্ত অসহনীয়। অনেকে সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কা দেখান। প্রকৃতপক্ষে এটা জরুরত নয়; এটা মূলত সংকীর্ণতা বা হিংসার বহিঃপ্রকাশ। সম্পদের দেখাশোনা নির্দিষ্ট ওয়ারিছ করবে। এছাড়া আরো অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে যা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সন্তান প্রজনন জরুরত বলা সম্ভব নয়।

মূলত বাচ্চা প্রজনন হলো মানুষের একটি মানসিক চাহিদা, যাকে ফিকহী পরিভাষায় মানফাআত (منفعت) বা তাহসীনিয়ত (تحسينيت) বলা যেতে পারে।[৩৭৯] এর কারণে কোনো হারাম কাজকে মুবাহ বলা যায় না। যেমন ধরুন, কেউ যদি সহবাসের ক্ষমতা না রাখে, তাহলে কি তার জন্য এমন চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয হবে যা হারাম বা যার কারণে নিজের সতর অন্য কাউকে দেখাতে হয়? ফুকাহায়ে কেরাম এক্ষেত্রে চিকিৎসার অনুমতি দেননি। তার একটি নযির নিম্নরূপ-

ইমাম ইবনে মাজাহ আল বুখারী রাহ. বলেন-

---

[৩৭৭] জাওয়াহিরুল ফিকহ ৭/৩৭

[৩৭৮] আল ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার: ৪/১৫৪, দারুল হাদীস, কায়রো

[৩৭৯] অর্থাৎ, সাধারণ উপকারী বা ফায়েদাজনক কাজ; নিতান্ত আবশ্যকীয় নয়।

وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم أن الحقنة إنما تجوز عند الضرورة، وإذا لم يكن ثمة ضرورة، ولكن فيها منفعة ظاهرة بأن كان يتقوى بسببها على الجماع لا يحل عندنا، وإن كان به هزال، فإن كان هزالاً يخشى منه التلف يحل، وما لا فلا.

“শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রাহ. কিতাবুস সওমের ব্যাখায় উল্লেখ করেছেন যে, হুকনা (মলদ্বারে প্রয়োগ করার ঔষধ বিশেষ) দ্বারা চিকিৎসা করা জরুরতের ক্ষেত্রে জায়েয হবে। আর যখন জরুরত থাকবে না কিন্তু ভালো কোনো উপকারিতা থাকবে যেমন, তা ব্যবহারের দ্বারা সহবাসের শক্তি অর্জন হবে- তখন তা আমাদের নিকট জায়েয হবে না। আর যদি কেউ ক্ষীণকায় হয়, সেক্ষেত্রে যদি ক্ষীণতা এত বেশি হয় যে, প্রাণনাশের আশংকা থাকে, তাহলে হালাল হবে। অন্যথায় হালাল হবে না।”[৩৮০]

আই.ভি.এফ এবং আই.ইউ.আই-এর ক্ষেত্রে সতর খোলা ছাড়াও আরো অনেক আপত্তিকর বিষয় ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এ সবদিক বিবেচনা করলে এক্ষেত্রে জটিলতা আরো বেড়ে যায়। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

এছাড়াও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, জরুরত মেনে নিলেও আলোচ্যপদ্ধতি অবলম্বন জায়েয হবে না। কারণ, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জরুরতের কারণে ঐ হারাম চিকিৎসা গ্রহণ করা যাবে, যা নিশ্চিতভাবে নিরাময়কারী। অর্থাৎ, ঐ ঔষধ বা চিকিৎসার মাঝে আল্লাহ তা‘আলা এমন উপাদান রেখেছেন যা দ্বারা নিরাময় হওয়ার প্রবল ধারণা করা যায়; কিন্তু এই শর্ত আলোচ্যবিষয়ে অনুপস্থিত। কারণ, যে সন্তানের আশায় এমন নাজায়েয পদ্ধতি গ্রহণ করা হলো ঐ সন্তানের রূহ আসা তো আল্লাহর হাতে। এছাড়াও কৃত্রিম গর্ভ নষ্ট হওয়া তো একটি সাধারণ ব্যাপার। আর সামনে আসছে যে, আই.ভি.এফ-এর সাফল্যের হার নিতান্তই কম। সর্বোপরি নিশ্চিত বা প্রবল ধারণা অনুযায়ী বাচ্চা জন্ম নেয়ার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং জরুরত মেনে নিলেও এই পদ্ধতি অবলম্বন জায়েয হবে না।

আই.ভি.এফ ও আই.ইউ.আই-এর বিভিন্ন অবস্থা ও তার শর‘য়ী বিধান

আই.ভি.এফ ও আই.ইউ.আই-এর সংজ্ঞা ও উভয়ের মাঝে পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা জেনেছি। পূর্বে আমরা জেনেছি যে, উভয়টিকে একসাথে আই.ভি.এফও বলা হয়। নিম্নে উভয়টির বিভিন্ন অবস্থা ও পদ্ধতি উল্লেখপূর্বক শর‘য়ী বিধান উল্লেখের প্রয়াস পাবো।

শর‘য়ী হুকুম বর্ণনার সুবিধার্থে আই.ভি.এফ-কে মৌলিকভাবে তিন অবস্থায় বিভক্ত করা যায়-

১. পর নারী-পুরুষের মাঝে নিষেক প্রক্রিয়া

যেসব অবস্থায় পর নারী-পুরুষের উপাদানের (শুক্র ও ডিম্বের) মাঝে মিশ্রণ ঘটানো হয় বা পরনারীর গর্ভের সাহায্য নেয়া হয়, তা এর অন্তর্ভুক্ত।

আই.ইউ.আই বা অভ্যন্তরীণ নিষেক:

-স্বামীর বন্ধ্যাত্ব বা অন্য কোনো কারণে পরপুরুষের বীর্য তথা শুক্রকীট স্ত্রীর রেহেম তথা জরায়ুতে প্রবেশ করানো।

---

[৩৮০] আল মুহীতুল বুরহানী: ৬/৭০, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী

- স্বামীর বীর্য অন্য মহিলার রেহেমে প্রবেশ করানো।[৩৮১]

আই.ভি.এফ বা বাহ্যিক নিষেক:[৩৮২]

- স্বামীর শুক্র ও অন্য মহিলার ডিম্বের মাঝে নিষেক ঘটানো, অতঃপর তা স্ত্রীর রেহেমে স্থাপন করা।[৩৮৩]

- অন্য পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর ডিম্বের মাঝে নিষেক ঘটানোর পর তা স্ত্রীর রেহেমে রাখা।

- পর নারী-পুরুষের ডিম্ব ও শুক্রের মাঝে নিষেক ঘটানোর পর তা স্ত্রীর রেহেমে রাখা।[৩৮৪]

- স্বামী স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মাঝে নিষেক ঘটানোর পর তা অন্য মহিলার রেহেমে প্রবেশ করানো।

শর'য়ী বিধান:

উপরোল্লিখিত অবস্থাগুলো হারাম ও নাজায়েয হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো উপাদান বা অন্যের গর্ভে স্বামী-স্ত্রীর উপাদান সংরক্ষণ করে সন্তান জন্মদানের বিষয়টি অন্যের প্রজননস্থল ব্যবহার করার আওতায় আসে। পূর্বে আলোচনা করেছি যে, তা বৈধ নয়। এছাড়াও এটি একজনের ক্ষেত্রে অন্যের শষ্য রোপন বা পানি সিঞ্চনের নামান্তর। যা একটি অভিশাপযোগ্য কবীরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.

"আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস রাখে এমন কারো জন্য অপরের ক্ষেতে স্বীয় পানি সিঞ্চন হালাল হবে না।"[৩৮৫]

এছাড়াও এর সাথে জড়িত আছে আরো অনেক আপত্তিকর বিষয়। যেমন, সতর খোলা, সতরের সাথে সম্পৃক্ত উপাদান প্রদর্শন করা, বংশের ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা সৃষ্টির আশংকা ইত্যাদি (বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে)। মূলত বুদ্ধির বিকৃতি ছাড়া কোনো সুস্থ চিন্তা, রুচি ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ এ ধরনের প্রক্রিয়া অবলম্বনে সম্মত হতে পারে না।

২. স্বামী-স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিষিক্ত করে স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভে স্থাপন করা

স্বামী স্ত্রীর শুক্র ও ডিম্বের মাঝে নিষেক ঘটানোর পর তা স্বামীর অন্য স্ত্রী তথা সতীনের গর্ভে স্থাপন করা।

শর'য়ী বিধান:

এক্ষেত্রে নিজ স্বামীর বীর্য সে ধারণ করতে পারলেও অন্য নারীর ডিম্বাণু ধারণ করা জায়েয নয়। কারণ এটাও সতরের অংশ। এছাড়াও অন্যান্য আপত্তিকর দিক তো আছেই। যেমন, অপরের সামনে সতর খোলা, গর্ভধারণ পর্যবেক্ষণ করানো, সতরের সাথে সম্পৃক্ত উপাদান

---

[৩৮১] পরবর্তীতে বাচ্চা স্বামীর স্ত্রী'র হয় আর ঐ মহিলাকে সন্তান ধারণের বিনিময়ে অর্থ প্রদান করা হয়।

[৩৮২] এখানে প্রথম তিন অবস্থায় পরপুরুষের শুক্র বা পরনারীর ডিম্ব ব্যবহার করা হয়। আর চতুর্থ অবস্থায় শুক্র ও ডিম্ব স্বামী-স্ত্রীর; কিন্তু তা অন্য মহিলার গর্ভে স্থাপন করা হয়।

[৩৮৩] এটা করা হয় যখন স্ত্রীর রেহেম সুস্থ থাকে; কিন্তু উপযুক্ত ডিম্ব উৎপাদনে অক্ষম হয়।

[৩৮৪] এটা করা হয় যখন স্ত্রী সন্তান ধারনে ইচ্ছুক; কিন্তু তার ডিম্ব ও স্বামীর শুক্র কোনোটাই সন্তান উৎপাদনে সক্ষম নয় তবে স্ত্রীর রেহেম সুস্থ থাকে।

[৩৮৫] (হাদীস সহীহ) সুনানু আবী দাউদ: ২১৫৯ (باب في وطء السبايا), মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৬৯৯০

দেখানো এবং অপ্রাকৃতিক পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রীর উপাদানের মাঝে মিলন ঘটানো ইত্যাদি। এছাড়া সন্তান কার হবে- এ ব্যাপারে পদে পদে বিভিন্ন ধরনের ঝগড়া-বিবাদ ও সংশয়ের সম্ভাবনা তো আছেই।[৩৮৬]

৩. শুধু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নিষেক

স্বামীর শুক্রাণু সংগ্রহ করে স্ত্রীর গর্ভে আই.ইউ.আই করা[৩৮৭] অথবা স্বামীর শুক্রাণু ও স্ত্রীর ডিম্বাণু আই.ভি.এফ করে নিষিক্ত ভ্রুণ স্ত্রীর গর্ভে স্থাপন করা।[৩৮৮]

শর'য়ী বিধানঃ

এই সূরতে উপরোল্লিখিত দুই সূরতের বিশেষ সমস্যাগুলো না থাকলেও আরো বহুবিধ সমস্যা পাওয়া যায়। যা থেকে আই.ভি.এফ-এর কোনো প্রকারই মুক্ত নয়। যেমন-

(১) চিকিৎসক/চিকিৎসকগণ ও তাদের সহকারীগণ কর্তৃক মহিলার সতর দেখা

আমরা জানি, শরী'আতে পুরুষ-মহিলা কারো জন্য (স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত) অপর কোনো পুরুষ বা নারীর সামনে সতর খোলা বা দেখা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। আর পরপুরুষ বা পরনারীর মাঝে তো পর্দা ফরয। সেখানে ডিম্বাণু সংগ্রহ, টিউব স্থাপন, বারবার চেকআপ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য অন্য কোনো পুরুষের তাতে দৃষ্টি দেওয়া বা ছোঁয়া (যা অন্য মহিলার জন্যও জায়েয নয়) কত মারাত্মক ব্যাপার তা সামান্য চিন্তা করলেই বুঝে আসে।

আই.ভি.এফ এবং আই.ইউ.আই প্রক্রিয়া দু'টি বেশ জটিল। এগুলোর জন্য মহিলার বেশ কয়েকবার দীর্ঘ সময়ের জন্য সতর খোলা ছাড়া উপায় থাকে না। এটাতো গেলো মূল অপারেশনের কথা। এছাড়াও অপারেশনের আগে পরে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন ধরনের চেকআপ করা হয়ে থাকে। উদাহরণত, ওভ্যুলেশন পর্যবেক্ষণের জন্য আই.ভি.এফ-এর পূর্বে বেশ কয়েকবার পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এসব চেক-আপের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাহ্যিক সতর না খোলার সুযোগ থাকলেও ভিতরকার শরীর বারবার পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, শর'য়ী জরুরতের কারণে সতর খোলা বৈধ হলেও সাধারণত এসব ক্ষেত্রে শর'য়ী জরুরতের শর্ত পাওয়া যায় না। বর্তমানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যেই আই.ভি.এফ ও আই.ইউ.আই করা হয়ে থাকে। যেমন, সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ, স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্মদান করা ইত্যাদি। এসব উদ্দেশ্যের কোনো কোনোটি[৩৮৯] فضول-এর পর্যায়ে গণ্য হয়, আর কিছু নিছক[390] منفعت গণ্য হয়। বলা বাহুল্য, অসংখ্যা সমস্যাপূর্ণ এ ধরণের একটি প্রক্রিয়াকে নিছক منفعت বা فضول-এর ভিত্তিতে বৈধ করার কোনো সুযোগ শরী'আতে নেই। উপরোল্লিখিত

---

[৩৮৬] উল্লেখ্য, আল মাজমাউল ফিকহী মক্কাতুল মুকাররমা-ভিত্তিক আই.ভি.এফ ও আই.ইউ.আই পরপর বেশ কিছু ফিকহী সেমিনার আয়োজন করেছে। একটি সেমিনারে মাজমা'-এর পক্ষ থেকে এ সূরতের বৈধতার সিদ্ধান্ত প্রদত্ত হলেও পরবর্তী সেমিনারে নতুন তথ্যের ভিত্তিতে অবৈধ হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

[৩৮৭] এটা করা হয় যখন কোনো কারণে বীর্য বাচ্চাদানি বা রেহেম পর্যন্ত প্রাকৃতিক ভাবে পৌঁছতে অক্ষম হয়।

[৩৮৮] এটা করা হয় যখন বন্ধ্যাত্বের অন্য কোনো কারণ পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও স্বামীর শুক্রানু, স্ত্রীর ডিম্বনু ও বাচ্চাদানি সুস্থ ও সক্ষম থাকে। উল্লেখ্য, উপরোক্ত তিন অবস্থায় স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য মহিলার গর্ভেও স্থাপন হতে হরে।

[৩৮৯] অনর্থক বিষয় বা কাজ।

[৩৯০] উপকারী বা লাভজনক বিষয় বা কাজ।

উপকারিতা বা প্রয়োজন শর'য়ী দৃষ্টিতে[৩৯১] حاجت-এর স্তরেও পৌঁছে না; অথচ পূর্বে আমরা ফুকাহায়ে কেরামের নুসূসে দেখেছি যে, তাঁরা পরপুরুষ ডাক্তারের সামনে সতর খোলার জন্য[৩৯২] ضرورت-এর স্তর বিদ্যমান থাকার শর্তারোপ করেছেন।

আর ضرورت-এর হালতে হারাম পদ্ধতি গ্রহণ বৈধ হওয়ার জন্য ফুকাহায়ে কেরাম আরেকটি শর্ত কুরআনের আলোকে উল্লেখ করেছেন। তা হলো, উক্ত হারাম বা অবৈধ পন্থা অবলম্বনের দ্বারা জরুরত বা মারাত্মক সমস্য লাঘব বা দূর হওয়ার প্রবল ধারণা থাকা। আই.ভি.এফ এবং আই.ইউ.আই-এ সাধারণত এ শর্তটিও পাওয়া যায় না। কারণ, আই.ভি.এফ-এর সাফল্যের হার খুবই কম। সাপ্তাহিক লানসেট (The Lancet)[৩৯৩]-এর একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উন্নত থেকে উন্নত মেডিক্যাল, ল্যাব ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায়ও আই.ভি.এফ-এর সাফল্যের হার মাত্র ১০%-১৫%।[৩৯৪]

সম্প্রতি[৩৯৫] আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক দীর্ঘ প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের উন্নততম ব্যবস্থাপনায়ও আই.ভি.এফ-এর সাফল্যের হার সর্বোচ্চ ২০%। এ প্রতিবেদনে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে কতোটা ঝুঁকি আছে এই প্রযুক্তিতে।

আর বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার আরো অনেক প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতি রয়েছে। কোনো পদ্ধতিই কাজে না আসার অবস্থাটি সাধারণত কমই হয়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের রোগীর আই.ভি.এফও সফল হয় না। সুতরাং এখানে শর'য়ী জরুরতের আরেকটি উপাদান উমূমুল বালওয়াও অনুপস্থিত। সুতরাং এ অবস্থায় একজন মুসলিমের জন্য তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয় কি?

আর বিভিন্ন পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, সাধারণত ৯৫% সন্তানহীন দম্পতি এ পদ্ধতি গ্রহণে ইচ্ছুক থাকে না। এটা পশ্চিমা দেশের হিসাব।[৩৯৬] আমাদের দেশের মতো মুসলিম দেশ (দ্বিতীয়ত উন্নয়নশীল) দেশে এ হার যে আরো বেশি হবে তাতে সন্দেহ নেই।

(২) পুরুষ চিকিৎকের সাথে একান্তে অবস্থান

উক্ত চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন মহিলাকে পুরুষ চিকিৎকের সাথে একান্তে অবস্থান করতে হয়। এটিও একটি স্বতন্ত্র নাজায়েয ও হারাম কাজ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى رحم محرم.[৩৯৭]

---

[৩৯১] সাধারণ প্রয়োজন।

[৩৯২] মারাত্মক প্রয়োজন বা সমস্যা।

[৩৯৩] ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত প্রাচীনতম মেডিক্যল ম্যগাজিন।

[৩৯৪] ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫, পৃ. ২৫৫-২৬৬ (মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী দ্বিতীয় সংখ্যা- প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৭৫ থেকে সংগৃহীত)

[৩৯৫] ৪ মার্চ, ২০১৪, ওয়েব সংস্করণ

[৩৯৬] Infertility and IVF, www.webmd.com

[৩৯৭] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫২৩৩

(৩) উপাদানের সংমিশ্রণের আশংকা

ভুলক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে একজনের উপাদানের সাথে অন্যের উপাদান মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শত শত ডিশ এবং টিউবের মাঝে হঠাৎ হলেও এমন হয়ে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

ভুলক্রমে কোনো মহিলার ডিম্বাণু অন্য পুরুষের শুক্রাণুর সাথে অথবা এক স্বামীর শুক্রাণু অন্য মহিলার ডিম্বাণুর সাথে মিলিয়ে ফেলার আশঙ্কা রয়েছে। এমনিভাবে টেস্টটিউব অনেকগুলো হওয়ার ক্ষেত্রে একজনেরটি অন্যজনের দেহে প্রতিস্থাপনের আশঙ্কা রয়েছে।

আর বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীনদারী ও আমানতদারীর অভাব বিদ্যমান। বিভিন্ন কারণেই এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে, ডাক্তার অনৈতিকভাবে অন্য কারো উপাদান বা ভ্রূণ ব্যবহার করবে। যেমন, বিশাল অঙ্কের ফিসের লোভ, দম্পতির সন্তানের আগ্রহ নিবারণ বা নিজের সাফল্য জাহির করার লক্ষ্যে সে এমনটি করতে পারে। বিশেষত যেখানে কোনো কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টার কর্তৃক একের রক্তের বা প্রস্রাবের রিপোর্ট অন্যের নামে দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ নেহাত কম নয়, সেখানে বিষয়টি চিন্তার কারণ বটেই।

এককথায় বিভিন্ন স্তরেই এতে বংশ মিশ্রণের মতো স্পর্শকাতর বিষয় আর সংরক্ষিত থাকে না। বংশের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ সৃষ্টি হয়। যা শরী'আতের মৌলিক নীতি, বিধান ও মাকসিদের পরিপন্থী হওয়ার কারণে মোটেও অনুমোদনযোগ্য নয়।[৩৯৮]

(৪) ব্যাপকভাবে বিভিন্ন সমস্যার দুয়ার খুলে যাওয়ার আশঙ্কা

এখানে আই.ভি.এফ-এর সাথে সম্পৃক্ত আরো কিছু শঙ্কা ও বাস্তবতার বিষয়ে আলোচনা করা সমীচীন মনে হচ্ছে। আই.ভি.এফ-এর ব্যবহার আধুনিক দুনিয়ার মানুষেরা কীভাবে করছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উল্লেখ না করলে শর'য়ী সিদ্ধান্তের সবদিক সামনে আসবে না। এ চিত্র থেকে আমাদের সামনে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, উক্ত প্রক্রিয়ার লাগামহীন ব্যবহারে বর্তমানে কী কী সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং আরো কী কী সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও আমরা জানতে পারবো, এ প্রক্রিয়াটির প্রকৃতিগত স্পর্শকাতরতার পাশাপাশি এর বাস্তবতাকেন্দ্রিক স্পর্শকাতরতাও অনেক। এজন্য এ প্রক্রিয়াতে শর'য়ী সমস্যাসমূহ থেকে বাঁচার শতচেষ্টা করলেও বিভিন্ন সমস্যায় পতিত হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। আর এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে নানা ধরনের অবৈধ ও অনৈতিক কর্মকান্ড প্রচলিত হতে পারে।

নিম্নে বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো-

* ব্যাপকভাবে পরনারী পুরুষের উপাদান ব্যবহার

আই.ভি.এফ-এর জগতে বর্তমানে স্বামী স্ত্রীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণু ব্যবহারের আবশ্যিকতা বলতে তেমন কিছু নেই। বড় বড় ক্লিনিকগুলোতে স্পার্ম (বীর্য) ব্যাংক এবং এগ (ডিম্বাণু) ব্যাংক

---

[৩৯৮] নিইজউইক (১৮/৩/১৯৮৫ ইং)-এর উদ্ধৃতিতে ইসলামিক ফিকহ একাডেমী জার্নালে একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে যে, আড়াইলক্ষ শিশু অপরিচিত বীর্যদানকারী বা গর্ভ ভাড়া দানকারীনির মাধ্যমে জন্মলাভ করেছে। (মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী... পৃ. ২৯১) এ সংবাদটি ১৯৮৫ সালে, অর্থাৎ, টেস্টটিউব বেবির সূচনাকালে প্রকাশিত হয়েছে।
ডি এন এ এর সাহায্যেও এ ধরনের ব্যাপক সমস্যার নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়।

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা গেছে[৩৯৯] যে, পাশ্ববর্তী কলকাতায় শুধু এ কারণে বহু বাংলাদেশি দম্পতি ভিড় জমাচ্ছে যে, তাদের শুক্রাণুর পরিমাণ কম বা এ জাতীয় অন্য কোনো ঘাটতি আছে, যা পূরণের জন্য তাদের আরো উন্নত প্রযুক্তি বা শুক্র ও ডিম্ব ব্যাংকের সাহায্যের প্রয়োজন। আমরা জানি, এগ ব্যাংক বা স্পার্ম ব্যাংক মানেই পর নারী-পুরুষের উপাদান গ্রহণ। যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যিনার প্রতিরূপ।

* Surrogacy ও গর্ভভাড়ার প্রচলন

পাশ্চাত্যে বা অমুসলিম দেশগুলোতে এটা কোনো ধরনের রাখঢাক ছাড়াই হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে আমাদের দেশেও কিছুটা গোপনীয়তার সাথে এ ধরনের কার্যকলাপ হচ্ছে।[৪০০]

* মানব ভ্রুণের বিপণন ও ব্যবসা

আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা মানব ভ্রুণের ব্যাংক মানেই হলো এসবের বিপণন ও ব্যবসার কেন্দ্র। এভাবে মানব ভ্রুণকে পণ্যের কাতারে ফেলে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন মনে করছি না।

* হিমায়িত মানবভ্রুণ ও খেল তামাশা

ভ্রুণ ব্যাংকে লক্ষ লক্ষ মানবভ্রুণ হিমায়িত অবস্থায় থাকে। নিঃসন্দেহে এটা সম্মানিত মানবাত্মার সাথে বেমানান। গবেষণাগার কখনো মানব জীবনের বিকাশকেন্দ্র হতে পারে না। এছাড়াও প্রয়োজনের অনেক বেশী ভ্রুণ তৈরী করা, যার প্রতিটিতেই প্রাণ বিকাশের সম্ভবনা থাকে।

* কদাকার মানব প্রজনন

নিউজউইকের উদ্ধৃতিতে ইসলামিক ফিকহ একাডেমী, জিদ্দাহ-জার্নালে[৪০১] উল্লেখ করা হয় যে, সাধারণত এক পুরুষের শুক্র দ্বারা ১০০ জন মহিলার নিষেক ঘটানো হয়ে থাকে। এক কথায় সম্পূর্ণ পশু প্রজননের মতোই। এছাড়াও এর কারণে মানব প্রজননে পশু প্রজননের মতো বিভিন্ন জাত, উন্নত-অনুন্নত শুক্রাণু ও ডিম্বাণু বাছাই এবং শখ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্তান ধারণের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এগুলোর প্রচলন বাড়ছে।

---

[৩৯৯] উদাহরণস্বরূপ দেখুন: এই সময়, কলকাতা- শহরে ভিড় জমেছে আই.ভি.এফ সচেতন বাংলাদেশীদের, ১৭ জুন, ২০১৭

[৪০০] www.dw.com-এর একটি প্রতিবেদনের চুম্বক অংশ নিম্নরূপ-

গোপনে হলেও বাংলাদেশে গর্ভ ভাড়া নিয়ে সন্তানের বাবা-মা হওয়ার ঘটনা ঘটছে। এখানে বিষয়টি আইনগত বৈধ না হওয়ায় কেউ তা প্রকাশ করছেন না। আবার কেউ কেউ ঝামেলা এড়াতে বিদেশে, বিশেষ করে ভারতে গিয়ে গর্ভ ভাড়া নিচ্ছেন। ফিরছেন সন্তান নিয়ে।

এক চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডয়চে ভেলেকে বলেন, "ঢাকার গাইনি চিকিৎসক এবং গাইনি ক্লিনিকগুলো গোপনে ঢাকায় গর্ভ ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেয়। নিঃসন্তান দম্পতিদের ক্লিনিকের কোনো কোনোটি গর্ভ ভাড়া দেয়ার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন। তবে পুরো ব্যাপারটিই হয় গোপনে। বাংলাদেশে গর্ভ ভাড়া নিতে কমপক্ষে পাঁচ লাখ টাকা লাগে।"

গর্ভ ভাড়া দেয়া নারী (সারোগেট মাদার) এখানে কীভাবে পাওয়া যায়? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "এটা ক্লিনিক বা চিকিৎসকরাই যোগাড় করে দেন। চেইন গড়ে উঠছে। তবে গর্ভ ভাড়া নেয়ার বিষয়টি প্রধানত উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্য বিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।"

[৪০১] মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, দ্বিতীয় সংখ্যা- প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯০

* বিবাহের পথ রুদ্ধ ও যিনার চর্চা

স্পার্ম ও এগ ব্যাংকের ব্যবহারের মাধ্যমেই বর্তমানে সন্তান গ্রহণ করা যাচ্ছে। ক্লিনিকে শুক্রাণু-ডিম্বাণু যেমন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি পাওয়া যাচ্ছে ভাড়াটে সন্তান জন্মদানকারিনী। অনেক পুরুষ বা নারী বিবাহের পরিবর্তে এই প্রক্রিয়ায় সন্তান নিচ্ছে। স্বাভাবিক ব্যভিচারের সন্তানকে তো সমাজে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়; কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সন্তানকে তেমন খারাপভাবে দেখা হয় না। এভাবেই যিনার প্রতিরূপ একটি প্রক্রিয়া দিন দিন প্রসার লাভ করছে।

এসব পরিস্থিতির কারণে শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আই.ভি.এফ-এর সকল পদ্ধতি ও সূরত নিষিদ্ধ।

একান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে

তবে যদি কোনো ক্ষেত্রে শর'য়ী জরুরত পাওয়া যায়, তাহলে বিজ্ঞ মুফতী অবস্থার বিবেচনায় মৌখিকভাবে শেষোক্ত সূরতের, অর্থাৎ, শুধু স্বামী-স্ত্রীর উপাদান গ্রহণ করে আই.ভি.এফ বা আই.ইউ.আই করার অনুমতি দিতে পারেন। শর্ত হলো, এক্ষেত্রে অন্যান্য শর'য়ী সমস্যা না থাকাটা নিশ্চিত হতে হবে। জরুরতের কারণে সতর খোলা ও দেখার বৈধতার ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি।

এক্ষেত্রে অবশ্যই নিম্নোক্ত শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। যথা-

১. একান্ত জরুরতের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে। অর্থাৎ, যদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান না হয় এবং শর'য়ী সমস্যাযুক্ত অন্য কোনো চিকিৎসার মাধ্যমেও না হয়, আর সন্তান না হওয়ার কারণে স্বামী বা স্ত্রী অসহনীয় কোনো সমস্যায় ভোগে এবং এ প্রক্রিয়া ছাড়া তা লাঘবের আর পথ না থাকে- তাহলেই আই.ভি.এফ বা আই.ইউ.আই করা যাবে।

২. জরুরতের সীমার বাইরে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ বৈধ হবে না। সুতরাং:

ক. যেসব ক্ষেত্রে সতর খোলা ছাড়া উপায় থাকবে না, শুধু সে ক্ষেত্রে সতর খোলা যাবে। নিছক কোনো ফায়েদার জন্য বিভিন্ন চেকআপ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সতর খোলা যাবে না।

খ. মহিলা চিকিৎসক ব্যতীত কারো সামনে মহিলার সতর খোলা যাবে না। অনন্যোপায় হলে সাথে স্বামী থাকতে হবে বা ডাক্তারের কোনো মাহরাম মহিলা থাকতে হবে।

গ. পুরো প্রক্রিয়াটিতে চিকিৎসক শুধু এতটুকু কাজেই অংশগ্রহণ করবে যা স্বামী-স্ত্রীর নিজ হাতে করা সম্ভব নয়।

ঘ. রোগিনীর শরীরের নিম্নাঙ্গের এতটুকুতেই শুধু দৃষ্টি দেয়া যাবে যতটুকু দেখা তার জন্য খুবই জরুরী।

৩. পুরুষের শুক্র ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় স্ত্রীর সাথে আযলের মাধ্যমে সংগ্রহ করবে। হস্তমৈথুন বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে নয়।[৪০২]

৪. উপাদানের সংমিশ্রণের কোনো ধরনের সম্ভাবনা না থাকতে হবে।

এখানে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, শর্তসাপেক্ষে এ অবকাশ রাখা হয়েছে শুধু স্বামী-স্ত্রীর

---

[৪০২] তবে স্ত্রীর মাধ্যমে হলে তার বিধান ভিন্ন। আল্লামা শামী রাহ. বলেন:

يجوز أن يستمني بيد زوجته أو خادمته. (رد المحتار ٦/٤٤)

উপাদান ব্যবহার করে আই.ভি.এফ বা আই.ইউ.আই করার ক্ষেত্রে। অন্য কোনো সূরত কোনো অবস্থায় বৈধ হওয়ার অবকাশ নেই।

জন্ম নেয়া সন্তান কার?

আই.ভি.এফ এবং আই.ইউ.আই সম্পর্কে তো আমরা জেনেছি যে, এর কোনো প্রক্রিয়া বা অবস্থাই শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধতার আওতায় আসে না।

তবে এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা হলো, যদি এ পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম হয়, তাহলে তার নসব কার থেকে সাব্যস্ত হবে?

নিম্নে এ সংক্রান্ত শর'য়ী মূলনীতি খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। এর আলোকে আমরা আই.ভি.এফ এবং আই.ইউ.আই-এর সকল সূরতের বিধান জানতে পারবো।

সন্তানের মা কে হবে?

কুরআন ও হাদীসের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মা হওয়ার মূলভিত্তি হলো গর্ভধারণ করে প্রসব করা এবং বাচ্চার লালন-পালন করন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো-

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ

"তাদের মা তো তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে।"[৪০৩]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

"তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন...।"[৪০৪]

সুতরাং মা সেই হবে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে। অর্থাৎ, যার রেহেমে সন্তান জন্মলাভ করেছে এবং বেড়ে উঠেছে। ডিম্বদানকারীনি মহিলা নয়।

সন্তানের বাবা কে হবে?

সন্তানের জন্য বাবার নসব প্রমাণিত হতে হলে- **প্রথম শর্ত** হলো, সন্তানের মা পিতার বৈধ স্ত্রী বা বাঁদী হতে হবে। **দ্বিতীয় শর্ত** হলো, সন্তানের মার উপর ঐ সন্তানের ব্যাপারে যিনার অপবাদ সাব্যস্ত না হতে হবে।

আলোচ্যবিষয়ে শুক্রাণুদাতা যদি সন্তানের মার বৈধ স্বামী হয়, তাহলে সন্তান পিতার নসব দাবি করতে পারবে।

আর যদি বৈধ স্বামী না হয়, তাহলে সে পিতা হবে না। এমনিভাবে যদি প্রমাণিত হয় যে, নিজের স্ত্রীর রেহেমে অন্যের শুক্রাণু আছে এবং তা থেকেই বাচ্চা হয়েছে, তাহলে বৈধ স্বামী ঐ সন্তানের পিতা হবে না।

---

[৪০৩] সূরা মুজাদালাহ: ২

[৪০৪] সূরা যুমার: ৬

الولد للفراش -এর মূলনীতি তখনি প্রযোজ্য, যখন যিনা তথা অন্যের শুক্রাণু স্ত্রীর রেহেমে বিদ্যমান থাকা প্রমাণিত না হবে। এ কারণেই তো যদি প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী যিনা করেছে এবং সেই যিনা থেকেই এই বাচ্চা, তাহলে স্বামী বাচ্চাকে পরিত্যাগ করার অধিকার রাখে।

উল্লেখ্য যে, নসব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য প্রজননের প্রাকৃতিক পদ্ধতি অবলম্বন জরুরী নয়। কৃত্রিম পদ্ধতিতে পুরুষের বীর্য মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করানোর দ্বারা সন্তান জন্মলাভ করলেও নসব স্বাভাবিকভাবেই সাব্যস্ত হবে। ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরনের সূরত উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

البحر عن المحيط ما نصه: إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته في فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولد ولده.

"কোনো ব্যক্তি যদি তার দাসীর লজ্জাস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে সহবাস করে এবং তার বীর্যপাত ঘটে, আর দাসী তার বীর্য সংগ্রহ করে নিজের জরায়ুতে প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং ফলত সে গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে সে বাচ্চা তার মনিবের বাচ্চা বলে গণ্য হবে।"[৪০৫]

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

وما قيل: لا يلزم من ثبوت النسب منه وطؤه لأن الحبل قد يكون بإدخال الماء الفرج دون جماع فنادر، والوجه الظاهر هو المعتاد.[৪০৬]

ইমাম হাসান ইবনে মানসূর কাযীখান রাহ. বলেন-

رجل عالج جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته في فرجها فعلقت عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أن الولد ولده وتصير الجارية أم ولد له.[৪০৭]

সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আ'যম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৮ রজব ১৪৩৯ হি.

---

৪০৫ রদ্দুল মুহতার ৫/২১৩, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা
৪০৬ ফাতহুল কাদীর ৪/৩১৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
৪০৭ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ ৪/১১৮, মাকতাবায়ে যাকরিয়া, কিতাবুদ দা'ওয়া

হারাম অর্থ-সম্পদঃ মালিকানা ও ব্যবহারবিধি

মাওলানা মাহিদুল ইসলাম বিন নুরুন্নবী, কুড়িগ্রাম

মুসলমানদের ঈমানের পূর্ণতা এবং সুস্থ ও স্থিতিশীল সমাজের জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করা। কুরআন-হাদীসে বারবার হালাল উপার্জন ও ভোগ-ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ﴿٥١﴾

"হে রাসূলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত।"[৪০৮]

আর হারাম সম্পদ উপার্জন ও তা ভোগ করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।"[৪০৯]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴿٢٩﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমারা পরস্পরে সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করো তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।"[৪১০]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে শুনে অবৈধ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না।"[৪১১]

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা হারাম ও অবৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থ-সম্পদের মালিকানা, ব্যবহার ও

---

[৪০৮] সূরা মুমিনুনঃ ৫১
[৪০৯] সূরা আলে ইমরানঃ ১৩০
[৪১০] সূরা নিসাঃ ২৯
[৪১১] সূরা বাকারাঃ ১৮৮

তার ব্যয়ক্ষেত্র সম্পর্কে শর'য়ী নীতিমালা ও আহকাম নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

হারাম সম্পদের প্রকারভেদ

'হারাম' শব্দটি একটি শর'য়ী পরিভাষা। এখানে তা ব্যাপকার্থে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ সম্পদকেই এখানে 'হারাম সম্পদ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সকল হারাম সম্পদ বা বস্তু ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে এক নয়। ইসলামী শরী'আত কিছু বস্তুকে সত্তাগতভাবে হারাম সাব্যস্ত করেছে। আর কিছু বস্তু এমন রয়েছে যা বস্তুগতভাবে হালাল; তবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ পন্থায় আহরণের কারণে ইসলাম তাকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে।

ফুকাহায়ে কেরাম হারাম সম্পদের প্রকারভেদ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাদের বক্তব্যের আলোকে নিম্নে হারাম সম্পদের মৌলিক প্রকারসমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে।

মৌলিকভাবে হারাম সম্পদ তিন প্রকার:

১. বস্তুগতভাবে হারাম: এমন হারাম সম্পদ, যা প্রকৃতিগতভাবে বা বৈশিষ্ট্যগতভাবে হারাম। নিছক ভুল পদ্ধতিতে অর্জনের কারণে তাতে হুরমাত আসেনি। যেমন, মদ বা অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য।

২. অর্জনের পদ্ধতিগত কারণে হারাম: ঐ সম্পদ যা মূলত হালাল, তবে তা শরী'আত কর্তৃক নিষিদ্ধ পন্থায় অর্জনের কারণে হারাম হয়েছে। যেমন, বাইয়ে ফাসিদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ।

৩. বিশেষ শ্রেণীর জন্য হারাম। কোনো কোনো সম্পদ শরী'আতে মূলত হালাল। এসব সম্পদে প্রকৃতিগতভাবে বা বৈশিষ্ট্যগতভাবে কোনো শর'য়ী সমস্যা নেই। তবে বিশেষ শ্রেণীর জন্য শরী'আত তা হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। যেমন, রেশমী কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ, ওয়াজিব সাদকা গ্রহণ করা ধনী এবং হাশেমী বংশধরদের জন্য নিষিদ্ধ।

এসব প্রকারের রয়েছে আরো কিছু শাখা-প্রশাখা। নিম্নে প্রথম দু'প্রকার নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১. বস্তুগত হারাম (حرام لذاته)

বস্তুগত হারাম বলতে ঐ হারাম বস্তুকে বুঝানো হয়েছে, যার প্রকৃতির মাঝে মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা অনুপযুক্ত উপাদান বিদ্যমান থাকায় শরী'আত তা হারাম করেছে। বস্তুর প্রকৃতির মাঝে এমন উপাদান সৃষ্টিগতও হতে পারে অথবা পরবর্তীতে সংযুক্ত হয়েছে এমনও হতে পারে। এই দিক বিবেচনা করে ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরনের হারাম সম্পদকে দু'প্রকারে ভাগ করেছেন। যথা-

ক. সৃষ্টিগত হারাম: অর্থাৎ, যে হারাম বস্তু সত্তা এবং গুণ (বা বৈশিষ্ট্য) উভয়দিক থেকে হারাম। নিষিদ্ধতা ও অবৈধতা তার অস্তিত্ব ও গুণাবলির সাথে সৃষ্টিগতভাবে মিশে আছে। এসকল হারাম বস্তুর হুরমাত স্থায়ী; তা কখনো দূর হয় না। যেমন, শুকর, মদ ইত্যাদি।

প্রাসঙ্গিক হিসেবে আমাদের জানা উচিত যে, মৌলিকভাবে দুই কারণে শরী'আত এসকল বস্তুকে স্থায়ীভাবে হারাম করেছে। যথা-

(১) বস্তুটি প্রকৃতিগতভাবে সম্মানিত হওয়ার কারণে শরী'আত একে বিনিময় ও লেনদেনের পণ্য বানাতে নিষেধ করেছে। যেমন, মানবাঙ্গ। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

(قوله ولا يجوز بيع شعر الإنسان) مع قولنا بطهارته (والانتفاع به ؛ لأن الآدمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا ومبتذلا) وفي بيعه إهانة، وكذا في امتهانه بالانتفاع.

"মানুষের চুল পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও তা বিক্রয় করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। কারণ, মানুষ বিশেষ সম্মানের অধিকারী। মানুষের শরীরের কোনো অংশের সম্মানহানি বা নিম্নস্তরের ব্যবহার জায়েয নয়। মানবাঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহারের দ্বারা মানুষের অসম্মানি হয়। তাই এটা অবৈধ ও নাজায়েয।"[৪১২]

উপরোক্ত কারণে এ ধরনের বস্তুর লেনদেন হারাম। কেউ এসকল বস্তুর লেনদেন করলে তার ক্ষেত্রে হারাম মালের বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

(২) বস্তুটি নাপাক, দূষিত ও অনিষ্টকর হওয়ার কারণে তাকে হারাম করা হয়েছে। যেমন, রক্ত, শুকরের গোশত, মৃত প্রাণী ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয় জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক তীরের লটারী খেলা শয়তানের অপবিত্র কার্যকলাপ। কাজেই এসব এড়িয়ে চলো, যেন তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৪১৩]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করবে ও নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করবে"[৪১৪]

খ. মিশ্রিত গুণের কারণে হারাম:[৪১৫] অর্থাৎ, ঐ সকল হারাম বস্তু, যার হুরমাত স্বয়ং তার মঝেই নিহিত রয়েছে, তবে তার হুরমাত (পূর্বের প্রকারের মতো) সৃষ্টিগত এবং স্থায়ী নয়; বরং বিশেষ গুণ বা উপাদানের সংমিশ্রণ ও উপস্থিতিতে তা হারাম হয়েছে। যেমন, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি নেশা দ্রব্য, যা হারাম করা হয়েছে মানুষের চেতনা শক্তিহীন করে দেয়ার কারণে। যদি এসব বস্তুতে উক্ত বৈশিষ্ট্য না থাকে, তাহলে তা হালাল হবে। এ ধরনের আরো অনেক বস্তু রয়েছে, যা বিশেষ গুণের উপস্থিতিতে হারাম হয়, আর সে গুণ বিদ্যমান না থাকলে একই বস্তু হালাল হয়ে যায়।

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. বলেন-

البنج ونحوه من الجامدات إنما يحرم إذا أراد به السكر وهو الكثير منه، دون القليل المراد به التداوي ونحوه

[৪১২] ফাতহুল কাদীর: ৬/৩৯০-৩৯১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[৪১৩] সূরা মায়েদা: ৯০

[৪১৪] সূরা আ'রাফ: ১৫৭

[৪১৫] দেখুন: ইতরে হিদায়া, হুরমাতে ওয়াসফি

كالتطيب بالعنبر وجوزة الطيب، ونظير ذلك ما كان سميا قتالا كالمحمودة وهي السقمونيا ونحوها من الأدوية السمية فإن استعمال القليل منها جائز، بخلاف القدر المضر فإنه يحرم، فافهم واغتنم هذا التحرير.

“আফিম এবং এর মত অন্যান্য কঠিন পদার্থসমূহ বেশি পরিমাণে সেবন করা (যা সাধারণত নেশার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে) হারাম। তবে অল্প পরিমাণে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সেবন করা (যা সাধারণত নেশা সৃষ্টি করেনা) বৈধ। এমনিভাবে আম্বর ও আখরোটের ব্যবহার। এর আরেকটি উপমা হলো আত্মহননকারী বিষাক্ত পদার্থ যেমন, মাহমূদাহ। অর্থাৎ, সুকমুনিয়া ও এ জাতীয় বিষাক্ত ঔষধ। এগুলো অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা বৈধ। এমন মাত্রায় ব্যবহার করা হারাম, যা ক্ষতিসাধন করে ।”[৪১৬]

২. অর্জনের পদ্ধতিগত কারণে হারাম (حرام لكسبه)

একে ‘হারাম লিগাইরিহি’ বা ‘হারাম লি-কাসবিহী’ বলেও আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ, ঐ সকল হারাম বা অবৈধ সম্পদ, যা বস্তুগতভাবে হারাম নয়; বরং অবৈধ পন্থায় সঞ্চয় করার কারণে বা লেনদেনের পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে হারাম বা অবৈধ হয়েছে।

এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, শরী‘আতে অর্থ উপার্জনের নিষিদ্ধ পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কিছু পদ্ধতি এতটাই খারাপ ও অবৈধ যে, তার মাধ্যমে কোনো সম্পদ হস্তগত হলেও হস্তগতকারী তার মালিক হয় না। অপরদিকে কিছু অবৈধ পদ্ধতি রয়েছে, যা দ্বারা সম্পদ হস্তগত হলে তাতে হস্তগতকারীর এক পর্যায়ের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যাকে ফিকহের পরিভাষায় ‘الملك الخبيث’ বা ‘অবৈধ মালিকানা’ বলা হয়।[৪১৭] এজন্য ফকীহগণ রাহ. حرام لكسبه বা অর্জনের পদ্ধতিগত কারণে হারাম সম্পদকে (হুকুম ও ফলাফলের দিক থেকে) দুই প্রকারে ভাগ করেছেন। যথা-

এক. অমালিকানাধীন হারাম সম্পদ

দুই. মালিকানাধীন হারাম সম্পদ

অমালিকানাধীন হারাম সম্পদ

অর্থাৎ, ঐ হারাম সম্পদ যা হস্তগত হলেও তাতে অর্জনকারীর কোনো ধরনের মালিকানা হাসিল হয় না। পূর্বের প্রকৃত মালিকই ঐ সম্পদের মালিক হিসেবে বহাল থাকে।

এ প্রকার সম্পদ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা-

ক. অন্যের হক আত্মসাতের কারণে হারাম

অন্যের সম্পদ নিজের মালিকানায় আনার জন্য শরী‘আত যে মৌলিক শর্ত আরোপ করেছে তা হলো, তাতে শর‘য়ী নীতি অনুযায়ী মালিকের রিযা বা সন্তুষ্টি থাকতে হবে। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه.

---

৪১৬ রদ্দুল মুহতার: ৬/৬৭, (হুদুদ অধ্যায়), মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

৪১৭ বিস্তারিত দেখুন: প্রবন্ধের শেষে ‘মালিকানাধীন হারাম সম্পদের বিধান’

"কোনো মুসলমানের সম্পদ তার মনতুষ্টি ব্যতীত অপরের জন্য হালাল নয়।"[৪১৮]

সুতরাং শর'য়ী রিযা ব্যতীত যে সম্পদ অর্জিত হবে তাতে সম্পদ অর্জনকারীর মালিকানা আসবে না; বরং পূর্বের মালিক তথা মূল মালিকই তার মালিক বিবেচিত হবে। অর্জনকারী অধিকারহীন জবরদখলকারী বলে গণ্য হবে।

এ প্রকারের হারাম সম্পদ বিভিন্ন ধরনের হকের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। যথা-

(ক) আল্লাহ তা'আলার হকের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, যাকাত, উশর, মান্নত অথবা মসজিদের সম্পদ, যা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

(খ) মানুষের ব্যক্তিগত হকের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোনোভাবে মালিকের সম্মতি ছাড়া হরণকৃত সম্পদ।

(গ) সর্বসাধারণের হক্বের সাথে সম্পর্কিত। যেমন, আত্মসাৎকৃত ওয়াক্ফ, মাদরাসা বা রাষ্ট্রের সম্পদ।

খ. শরী'আতের অসম্মতির দরুন হারাম

এ প্রকার সম্পদ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যথা-

(ক) শরী'আতের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য সম্পদ নয় এমন বস্তু বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ। যেমন, মৃত প্রাণী বা অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রয়ের মাধ্যমে লব্ধ সম্পদ।

ইসলামী শরী'আতে সম্পদের নির্দিষ্ট পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেকোনো বস্তুই শরী'আতের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য সম্পদ হওয়া জরুরী নয়। শরী'আতের দৃষ্টিতে যে বস্তু বিনিময়যোগ্য নয়, তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করলে গৃহীত সম্পদ শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম হবে।

(খ) গুনাহ বা হারাম কর্মের বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ। যেমন, নৃত্য-গীতি, পতিতাবৃত্তি, জ্যোতিষবৃত্তি ও অন্যান্য হারাম কাজের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ।

হযরত আবু মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিনীর উপার্জন এবং জ্যোতিষীর পারিশ্রমিক থেকে নিষেধ করেছেন।"[৪১৯]

মালিকানাধীন অবৈধ সম্পদ

এমন হারাম সম্পদ, যাতে সম্পদ অর্জনের মৌলিক শর্ত বিদ্যমান আছে; তবে শাখাগত কোনো ত্রুটির করণে তার প্রতি শরী'আতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ ধরনের সম্পদ আহরণকারীর মালিকানায় এলেও তা অবৈধ সম্পদ বলেই বিবেচিত হবে। যেমন, জাহালাতে ফাহিশা বা চরম অজ্ঞতাপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ। এ ধরনের চুক্তি শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ। তবে যেহেতু এই চুক্তির মৌল উপাদান তথা বিনিময়কৃত সম্পদে কোনো মৌলিক শর'য়ী সমস্যা নেই; চুক্তির মাঝে হুরমাত বা অবৈধতা এসেছে প্রাসঙ্গিক কারণে, তাই চুক্তির

---

[৪১৮] আস সুনানু লিদ দারাকুতনী: হাদীস নং ২০৬৯৫, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২০৬৯৫। হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সপক্ষে শাহেদও রয়েছে। সর্বোসমন্বয়ে সহীহ মানে উত্তীর্ণ বলা যেতে পারে।

[৪১৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১৮৫, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা

মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে গ্রহণকারীর অবৈধ মালিকানা চলে আসবে। এক্ষেত্রে চুক্তিকারীদের জন্য উচিত হবে তাদের ত্রুটিযুক্ত চুক্তি প্রত্যাহার করা এবং পুনরায় বৈধ পন্থায় লেনদেন করা।

হারাম মালের সকল প্রকার নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে শুধু 'হারাম লিগাইরিহি' সম্পর্কে কিছু মৌলিক আলোচনার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ। প্রাসঙ্গিকভাবে হারাম লিযাতিহি'র বিধান সংক্রান্ত কিছু বিষয়ও আসতে পারে।

হারাম মালের (হারাম লিগাইরিহি বা লিকাসবিহী) শর'য়ী বিধান: কিছু মৌলিক বিষয়

হারাম মালের মালিকানা ও ব্যবহারের বিস্তারিত বিধান আলোচনার পূর্বে মৌলিক কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

১. হারাম ও হুরমাতের প্রামাণিকতার ক্ষেত্রে স্তরভিন্নতা

আমরা জানি, শরী'আতের আহকাম ও বিধানাবলীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। ফিকহে ইসলামীতে এটি একটি সর্বস্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আমরা পূর্বের আলোচনাতেও দেখেছি যে, হারাম মাল বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। হারাম মালের বিধানের ক্ষেত্রেও ঐ স্তরভিন্নতা লক্ষণীয় থাকবে।

হারাম মালের হুরমাত ও তা প্রমাণিত হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যেমন-

ক. অকাট্যভাবে প্রমাণিত হুরমাত (الحرمة الثابتة بالقطع)

সম্পদের মাঝে বিদ্যমান হুরমাত অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলে, তা হবে সর্বোচ্চ স্তরের হুরমাত। যেমন, আপনি স্বচক্ষে দেখলেন যে, একজন চুরি করলো। এখানে তার চোরাই মালের হুরমাত আপনার কাছে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কোনো অমালিকানাধীন সম্পদের হুরমাত কারো কাছে এভাবে প্রমাণিত হলে তার জন্য কোনোভাবেই তা ব্যবহার করার সুযোগ নেই। ঐ সম্পদ প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে আর তা সম্ভব না হলে সঠিক মাসরিফে ব্যয় করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

খ. প্রবল ধারণা দ্বারা প্রমাণিত হুরমাত (الحرمة الثابتة بغلبة الظن)

এর পরবর্তী স্তর হলো, প্রবল ধারণা দ্বারা প্রমাণিত হুরমাত। হুকুমের দিক থেকে এটিও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হুরমাতের মতো। কারণ, শরী'আতের বেশিরভাগ আহকামই এ স্তরের।[৪২০]

গ. সংশয়পূর্ণ হুরমাত (الحرمة الموهومة أو المشكوكة فيها)

এখানে সংশয় শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সংশয়ের একটি শাখা হলো, যাকে মানতিকী[৪২১] পরিভাষায় 'وهم' বলা হয়। আরেকটি শাখা হলো, যাকে মানতিকী পরিভাষায় 'شك' বলা হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, লেনদেনের ক্ষেত্রে وهم বা নিছক সন্দেহের কোনো মূল্য নেই। এর উপর ভিত্তি করে বিধানের মাঝে কোনো তারতম্য হবে না। সুতরাং নিছক সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি বা তার সম্পদের ব্যাপারে হারামের অপবাদ

---

৪২০ ইতরে হিদায়া:

৪২১ মানতিক: তর্ক-শাস্ত্র, Logic

দেয়ার সুযোগ নেই।

কোনো দলীল প্রমাণ ছাড়াই লোকমুখে প্রচলিত বিষয়াবলি এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ ধরনের প্রচলিত কথার ভিত্তিতে কোনো বস্তু বা দ্রব্যকে হারাম বলা যাবে না।

সংশয়ের দ্বিতীয় শাখা হলো, شك বা দোদুল্যমান ধারণা। অর্থাৎ, বস্তুটি হালাল-হারাম দু'দিকের সাথেই সাদৃশ্য রাখে; তবে কোনো দিককেই প্রাধান্য দেয়া যাচ্ছে না। এ ধরনের সম্পদকে المال المشتبه বলা হয়।

মালে মুশতাবিহের ক্ষেত্রে শরী'আতের নির্দেশনা হলো, প্রয়োজন ছাড়া তা ব্যবহার না করা। হাদীসে এ ধরনের সম্পদ থেকে দূরে থাকার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে। হযরত নু'মান ইবনে বশীর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه.

"হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। উভয়ের মাঝে বহু অস্পষ্ট বা সন্দেহপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি এসব (গুনাহের) সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ করে, সে স্পষ্ট ও সরাসরি গুনাহের কাজের অধিক পরিত্যাগকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (গুনাহের) সন্দেহযুক্ত কাজ করার দুঃসাহস করে, সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট ও সরাসরি গুনাহের কাজে পতিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। গুনাহসমূহের উপমা হলো, তা যেন মহান আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা (যে গুনাহের আশেপাশে সন্দেহজনক বিষয়গুলোতে লিপ্ত হয়, সে যেন উক্ত সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে বিচরণ করছে)। আর যে সংরক্ষিত এলাকার চারপাশে বিচরণ করবে, সে যেকোনোভাবে তাতে প্রবেশ করার খুব সম্ভাবনা রয়েছে।"[৪২২]

তবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম হওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের সম্পদ ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কাফেরদের সাথে লেনদেন করেছেন এবং তাদের থেকে কাপড় ক্রয় করে ব্যবহার করেছেন। অথচ এটা জানা কথা যে, কাফেররা পাক-নাপাক ও হালাল-হারামের কোনো বাছবিচার করে না।

এছাড়া বর্তমান বাজারে এ ধরনের মালের পরিমাণ এতো বেশি যে, তা গ্রহণ না করে উপায় থাকে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে শরী'আতে কিছুটা ছাড় ও শিথিলতা রয়েছে। আল্লামা ফাত্হ মুহাম্মদ লাখনভী রাহ. (১৩৭২ হি.) এ প্রসঙ্গে ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত সংক্ষেপে এভাবে উপস্থাপন করেছেন-

مشتبہ مال کے متعلق متاخرین کی رائے:

مگر اسی کے ساتھ مصلحت شناس علماء کرام اور صوفیاء عظام کی یہ بھی کوشش رہی ہے کہ شریعت مطہرہ میں جہاں تک

[৪২২] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ১৯৪৬ (কিতাবুল বুয়ূ), সুনানুত তিরমিযী: হাদীস নং ১২০৫, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা

گنجائش ہو احکام میں گنجائش دی جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مایوس ہو کر ہمت ہار بیٹھیں اور حرام و مشتبہات سے بچنے کی فکر ہی چھوڑ دیں۔

چنانچہ احکام فقہیہ پر مرتب کتابوں پر نظر کرنے والے جانتے ہیں کہ ترک مشتبہات کے مسئلہ میں ہر صدی کے بعد کچھ سہولت ضرور ہوتی ہے۔ اس بارے میں امام غزالیؒ کی تصانیف ملاحظہ ہوں۔

عالمگیر رحمہ اللہ جو ایک حامی شریعت محی سنت عادل و متقی بادشاہ تھے انہی کے حکم سے فتاوی عالمگیریہ تیار ہوا۔ فتاوی عالمگیری کے مصنفین کا قول یہ ہے کہ ہمارے زمانہ میں مشتبہات سے احتراز کرنا مشکل ہے تو جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ بعینہ یہی مال حرام ہے تو اس مال کے ترک کرنا واجب نہیں ہے۔

صاحب اشباہ علامہ ابن نجیمؒ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔

تو ہمارا زمانہ جو فضولیات ولغویات سے بھرا ہوا ہے جس کی فضول کارروائیوں اور آزادیوں سے نہ حکومت محفوظ ہے نہ تجارتیں بچ سکیں نہ ملازمتیں اس سے پاک ہیں نہ اجارہ کا معاملہ صحیح ہے نہ زراعتیں سود اور رشوت سے پاک ہیں۔ اسی طرح بیوع فاسدہ کے علاوہ ایک دو نہیں ہزاروں بلائیں ہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ ترک مشتبہات پر زور دیا جائے۔[৪২৩]

২. হুরমাতের হস্তান্তর

অমালিকানাধীন হারাম মাল যদি অন্যের কাছে হস্তান্তর করা হয়, তাহলে মালের সাথে হুরমাতও কি হস্তান্তর হবে? অর্থাৎ, প্রথম জনের জন্য যেভাবে ঐ সম্পদ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিলো, তেমনিভাবে দ্বিতীয় জনের জন্যও কি তা নিষিদ্ধ থাকবে?

শরী'আতের নুসূস ও ফিকহের উসূল ও দলীল থেকে প্রতিপাদন হয় যে, অমালিকানাধীন হারাম মাল যতই হস্তান্তর করা হোক না কেন তা হালাল হবে না; বরং মালের সাথে হুরমাতও হস্তান্তর হতে থাকবে। সুতরাং জেনে বুঝে কোনো পক্ষের জন্য এমন মাল ভোগ করার সুযোগ নেই। একাধিক হাদীস ও আসার থেকে বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال: أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه.

"হযরত আবু বকর রাযি.-এর একটি গোলাম ছিল। সে উপার্জন করে হযরত আবু বকর রাযি.-কে দিতো। হযরত আবু বকর রাযি. তা গ্রহণ করতেন এবং তা থেকে আহার করতেন। একদিন সেই গোলাম কিছু খাদ্যদ্রব্য এনে হযরত আবু বকর রাযি.-কে দিলো। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন। তখন গোলামটি বললো, আপনি কি জানেন, আমি কীভাবে এই বস্তু উপার্জন করেছি?

[৪২৩] ইতরে হিদায়া: ৫৯-৬০

তিনি বললেন, না, আমি জানি না, তুমি বলো। সে বললো, আমি জাহেলি যুগে একজন ব্যক্তির (কোনো বিষয়ে) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। আসলে ভবিষ্যদ্বানী করার ক্ষেত্রে আমার কোনো দক্ষতা ছিলো না। বাস্তবে আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। আজ তার সাথে সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে উক্ত ভবিষ্যদ্বানীর বিনিময় প্রদান করে। আপনি যা আহার করেছেন তা হলো সেই ভবিষ্যদ্বাণীর বিনিময়। তখন হযরত আবু বকর রাযি. মুখে হাত ঢুকিয়ে পেটের মধ্যে যা ছিলো বমি করে বের করে দিলেন।"[৪২৪]

হযরত কুলাইব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি এক আনসারী সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة فرأيت رسول الله ﷺ وهو على القبر يوصى الحافر «أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه». فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله ﷺ يلوك لقمة فى فمه ثم قال «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها». فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إنى أرسلت إلى البقيع يشترى لى شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بها. فقال رسول الله ﷺ «أطعميه الأسارى».[৪২৫]

শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. বলেন-

الغاصب إذا باع المغصوب، وسلمه، ثم باعه المشتري من غيره حتى تناسخته بيوع، ثم أجاز المالك بيعا من تلك البيوع، فإنه ينفذ ما أجازه خاصة؛ لأن الغصب لا يزيل ملكه، فكل بيع من هذه البيوع يوقف على إجازته لمصادفته ملكه، فتكون إجازته لأحد البيوع تمليكا للعين من المشتري بحكم ذلك البيع فلا ينفذ ما سواه.

"আত্মসাৎকারী যদি আত্মসাৎকৃত বস্তু কারো নিকট বিক্রয় করে এবং (ক্রেতার নিকট) হস্তান্তর করে দেয়, অতঃপর ক্রেতা উক্ত বস্তুটি অন্য একজনের নিকট বিক্রয় করে দেয়, এভাবে ধারাবাহিকভাবে কয়েকবার বিক্রয় হয়, অতঃপর মূল মালিক উক্ত বিক্রয়সমূহের মধ্য থেকে একটি বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করে, তাহলে মালিক যে বিক্রয় চুক্তিটি অনুমতি প্রদান করেছে শুধু তা বৈধতা লাভ করবে। (পরবর্তী অন্য বিক্রয় চুক্তিগুলো বৈধ হবে না) কেননা আত্মসাতের কারণে মূল মালিকের মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। সুতরাং তার মালিকানা বহাল থাকার কারণে সংঘঠিত প্রত্যেকটি বিক্রয়চুক্তি তার অনুমতির উপর মওকুফ থাকবে। সুতরাং বিক্রয়চুক্তিসমূহের মধ্যে হতে যেটির ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করবে শুধু সেটির ক্রেতা উক্ত বস্তুর মালিক হবে। এছাড়া অন্য বিক্রয়চুক্তিগুলো শুদ্ধই হবে না।"[৪২৬]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. এ বিষয়টিকে একটি মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

---

[৪২৪] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৩৬২৯

[৪২৫] (হাদীস সহীহ) সুনানে আবী দাউদ: হাদীস নং ৩৩৩২, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা, কিতাবুল আছার (৮৮০), মুসনাদে আহমদ (২২৫০৯), (২৩৪৬৫)

[৪২৬] আল মাবসূত: ২৪/৯৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها ...

"হারাম সম্পদ হস্তান্তর করা হলে তার হুরমাতও হস্তান্তর হতে থাকে। তবে এটা হলো হারাম জেনে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে।...."[৪২৭]

হ্যাঁ, যদি মূল মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া হয় বা তার অনুমতি নেয়া হয়, তাহলে হুরমাত শেষ হয়ে যাবে। এমনিভাবে মূল মালিককে ফেরত দেওয়া সম্ভব না হলে যদি তা (নিজের সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত) কোনো ফকিরকে সাদকা করা হয়, তাহলেও তার হুরমাত শেষ হয়ে যাবে। কারণ, এক্ষেত্রে এটাই শরী'আত নির্দেশিত পন্থা। ফকিরের জন্য ঐ সম্পদে সব ধরনের হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে। কোনো ধনী ব্যক্তি তার থেকে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে তা গ্রহণ করলে তার জন্যও তা হালাল হবে।

তবে লক্ষণীয় যে, এ হুকুম শুধু মালিককে ফেরত দেয়া সম্ভব না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ফকিরকে সাদকা করার সাথে সম্পৃক্ত। যদি মালিককে দেয়ার সামর্থ্য থাকাবস্থায় কোনো ফকিরকে দেয়া হয়, তাহলে ফকিরের জন্যও তা হারাম জেনে গ্রহণ করা এবং তাতে কোনো ধরনের তাসাররুফ করা বৈধ হবে না। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ -এ আছে-

فقيل له: لو أن فقيرا يأخذ جائزة السلطان مع علمه أن السلطان يأخذها غصبا أيحل له؟ قال: إن خلط ذلك بدراهم أخرى، فإنه لا بأس به، وإن دفع عين المغصوب من غير خلط لم يجز.

"তাকে প্রশ্ন করা হলো, যদি কোনো ফকীর উপঢৌকন হিসেবে বাদশাহর নিকট থেকে কিছু

---

[৪২৭] আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের: ২/৪৬২, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, ঢাকা

উল্লেখ্য, এখানে আশবাহ প্রণেতার পূর্ণ ভাষ্য হলো-

الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها، إلا في حق الوارث فإن مال مورثه حلال له وإن علم بحرمته منه، من الخانية، وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموالمن قبل يد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم وشرف، كذا في مكفرات الظهيرية.

কিন্তু অগ্রগণ্য মতানুসারে মীরাছের সম্পদও সকল ক্ষেত্রে উক্ত মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন:

وعلى هذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته كما بسطه الزيلعي، وفي الاشباه: الحرمة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه.قلت: ومر في البيع الفاسد، لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حلال، ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقا على الورثة، فتنبه.

আল্লামা শামী রাহ. অন্যত্র বলেন:

بخلاف ما تركه ميراثا فإنه عين المال الحرام وإن ملكه بالقبض والخلط عند الإمام فإنه لا يحل له التصرف فيه أداء ضمانه ، وكذا لوارثه.

সুতরাং মৃত ব্যক্তির অর্জিত অমালিকানাধীন হারাম অর্থ-সম্পদ তার ওয়ারিছদের জন্য কোনোভাবেই হালাল হবে না। ঐ সম্পদ মৃত ব্যক্তির জন্য যেমন হারাম ছিলো, তেমনিভাবে তার ওয়ারিছদের জন্যও হারাম থাকবে। সুতরাং ওয়ারিছদের জন্য এ ধরনের সম্পদ ভাগ-বন্টন করা বা কোনোভাবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

এছাড়াও মীরাছ শুধু ঐ সকল সম্পদের উপর জারী হয় যাতে মৃতব্যক্তির বৈধ মালিকানা ছিলো। যেহেতু জীবদ্দশায় মৃতব্যক্তি উক্ত হারাম সম্পদের মালিক ছিলো না, তাই তার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পদে মীরাছ জারী হবে না।

এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির যা কর্তব্য ছিলো, ওয়ারিছগণের কর্তব্যও হবে তাই। অর্থাৎ, উক্ত সম্পদকে প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। আর তা সম্ভব না হলে সাদকা করতে হবে। বিস্তারিত সামনে আসছে।

দিরহাম গ্রহণ করে, যার ব্যাপারে সে জ্ঞাত থাকে যে, বাদশাহ এগুলো আত্মসাৎ করেছে, তাহলে কি উক্ত উপঢৌকন তার জন্য হালাল হবে? তিনি উত্তর দিলেন, যদি এমন হয় যে, বাদশাহ উক্ত দিরহামগুলো অন্য দিরহামের সাথে মিশ্রিত করে ফেলেছে, তাহলে ফকীরের জন্য হালাল হবে। আর যদি হুবহু আত্মসাৎকৃত দিরহামগুলোই দিয়ে থাকে, তাহলে ফকীরের জন্য তা হালাল হবে না।"[৪২৮]

আল্লামা শিহাবুদ্দীন হামাবী রাহ. (১০৯৮ হি.) আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ.-এর পূর্বোক্ত বক্তব্যের টীকায় বলেন-

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني – رحمه الله – في كتاب المنن: وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشبلي فقال: هذا محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما من رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام (انتهى).

"....শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রাহ. কিতাবুল মিনান-এ বলেন, কোনো কোনো হানাফী ফকীহ থেকে বর্ণিত আছে যে, "হারাম সম্পদের হস্তান্তর হলে হুরমাতের হস্তান্তর হয় না; বরং হুরমাত দূরীভূত হয়ে যায়।" আমি এ বিষয়ে শিহাব ইবনুশ শিলবী রাহ.-কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলন, এ বিধানটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি হুরমাতের ব্যাপারে অবগত থাকবে না। তবে যদি কেউ সরাসরি কোনো আত্মসাৎকারী বা জালিম টাকা উসূলকারীকে কারো থেকে ট্যাক্স বা অর্থ আদায় করতে এবং তা পরবর্তীতে অন্য ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে দেখে, তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি (যে মূল আত্মসাৎকারী থেকে নিয়েছে) থেকেও তা নেয়া বৈধ হবে না।"[৪২৯]

এর ব্যতিক্রম মালিকানাধীন হারাম মাল, যা বাই'য়ে ফাসিদের মাধ্যমে অর্জিত হয়।[৪৩০] বাইয়ে ফাসিদের ক্ষেত্রে যেহেতু হুরমাতটা প্রাসঙ্গিক ও দুর্বল, তাই মাল হস্তান্তর করলে বিধানের মাঝে ভিন্নতা এসে যাবে। ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরনের মালের ক্ষেত্রে বলেছেন-

الحُرْمة لا تتعدَّى إلى ذِمَّتين.

"মালের সাথে সাথে হুরমাত হাতবদল হয় না (বরং হাতবদলের দ্বারা হুরমাত দূরীভূত হয়ে যায়)।"[৪৩১]

এমনিভাবে অমালিকানাধীন হারাম অর্থসম্পদের ক্ষেত্রেও যদি না জেনে কেউ তা গ্রহণ করে বা ক্রয় করে ফেলে, তাহলে তার উপর কোনো দায় থাকবে না।[৪৩২] এক্ষেত্রেও الحرمة لا تتعدى إلى ذمتين.-এর মূলনীতি প্রযোজ্য হবে।

---

[৪২৮] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ: ৫/২৪২ (الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات)

[৪২৯] গামযু 'উয়ূনিল বাসায়ের: ২/৪৬২ (আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের এর সাথে), মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, ঢাকা

[৪৩০] বিস্তারিত দেখুন: প্রবন্ধের শেষে 'মালিকানাধীন হারাম সম্পদের বিধান'।

[৪৩১] গামযু 'উয়ূনিল বাসায়ের ২/৪৬২, ফিকহুল বুয়ূ': পৃ. ১০০৭

[৪৩২] না জানার কারণে হুরমাত যে একেবারে দূরীভূত হয়ে যাবে তা নয়; বরং চুক্তির পর জিনিসটি বাকী থাকাবস্থায় জানলেও আবার হুরমাত ফিরে আসবে। তবে সে যেহেতু অপারগ, তাই তার গুনাহ হবে না।

গ. উমূমে বালওয়া

আমরা জানি, উমূমে বালওয়া বা ব্যাপক প্রয়োজন ও সমস্যার কারণে শর‘য়ী বিধানের ক্ষেত্রে সহজতা ও ছাড় থাকে। তবে এর নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি, ক্ষেত্র ও সীমারেখা রয়েছে। মালে হারামের ক্ষেত্রেও উমূমে বালওয়া'র কারণে বিধানের মাঝে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ নীতির তুলনায় কিছুটা ভিন্নতা আসে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করে দু'টি সাধারণ মূলনীতি উল্লেখ করা হলো।

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

والضرورات تبيح المحظورات.

"অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ জিনিসসমূহ বৈধ হয়ে যায়।"[৪৩৩]

ইমাম আবু বকর কাসানী রাহ. বলেন-

الحرج مدفوع شرعا.

"শরী‘আতের বিধান হলো, সমস্যা বা সংকট দূর করা।"[৪৩৪]

হারাম সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহারবিধি

আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা হারাম লিগাইরিহি বা লিকাসবিহী নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা পূর্বে জেনে এসেছি যে, এ ধরনের হারাম সম্পদ বিধানের দিক থেকে দু'প্রকার-

১. অমালিকানাধীন হারাম সম্পদ

২. মালিকানাধীন হারাম সম্পদ

প্রথমে আমরা **'অমালিকানাধীন হারাম সম্পদের'** বিধান সম্পর্কে আলোচনা করবো। উপরোক্ত অর্থে হারাম সম্পদের আলোচনা শেষ হওয়ার পর প্রবন্ধের একেবারে শেষে **'মালিকানাধীন হারাম সম্পদ'** নিয়েও কিছু মৌলিক আলোচনা থাকবে ইনশাআল্লাহ।

অমালিকানাধীন হারাম অর্থ-সম্পদের বিধান

এ ধরনের হারাম অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে আমরা জেনেছি যে, তা হস্তগত হলেও হস্তগতকারী তার মালিক হয় না; বরং পূর্বের মালিক তথা প্রকৃত মালিকই তার মালিক হিসেবে বহাল থাকবে। যেমন, কেউ যদি সুদ বা ঘুষ হিসেবে কারো থেকে টাকা নেয়, তাহলে সে ঐ টাকার মালিক হবে না; বরং যার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, সেই মালিক থেকে যাবে।

এ ধরনের সম্পদের মৌলিক বিধান হলো, তা মূল মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া। হাদীস শরীফে বিভিন্নভাবে এর প্রতি নির্দেশ এসেছে।

হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন-

"على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".

"যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ অবৈধ পন্থায় নিয়েছে তার জন্য জরুরী হলো তা মালিকের নিকট

[৪৩৩] আল মাবসূত: ১০/১৫৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[৪৩৪] বাদায়েউস সানায়ে: ১/৫৬১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

পৌঁছে দেয়া।"[৪৩৫]

হযরত ইয়াযিদ রাযি. বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনেছেন-

«لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا، ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها.

"কোনো ব্যক্তির জন্য কৌতুকের ছলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের সম্পদ নেয়া সমীচীন নয়। যে ব্যক্তি অপরের একটি লাঠিও তার অনুমতি ব্যতীত নেয়, সে যেন তা ফেরত দেয়।"[৪৩৬]

এসব দলীলাদি বিবেচনা করে ফকীহগণ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সম্ভব হলে প্রকৃত মালিককেই ফেরত দিতে হবে। মালিক মারা গেলে তার ওয়ারিশকে দিতে হবে।

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) বলেন-

والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك، والواجب على الغاصب ضمان القيمة عند تعذر رد العين عندنا، وإن كان المغصوب من العدديات المتقاربة كالجوز، والبيض، والفلوس فعليه ضمان المثل عندنا.

"কোনো বস্তু আত্মসাৎ করলে তার প্রকৃত বিধান হলো, হুবহু আত্মসাৎকৃত বস্তুটিই মালিককে ফেরত দিবে। আর যদি তা অসম্ভব হয়, তাহলে জরিমানা হিসেবে ঐ বস্তুটির মূল্য আদায় করবে। এটাই আমাদের মাযহাব। আর আত্মসাৎকৃত বস্তুটি যদি এমন গননাযোগ্য (যা একটি, দু'টি-এভাবে সংখ্যা হিসেবে আদান-প্রদান করা হয়; ওজন বা মাপ দিয়ে নয়) জিনিস হয়, যার বিভিন্নটির মাঝে তেমন পার্থক্য নেই, যেমন আখরোট, ডিম, পয়সা, তাহলে আমাদের মাযহাব হলো আত্মসাৎকারী আত্মসাৎকৃত বস্তুর সমশ্রেণীর বস্তু দিয়ে জরিমানা আদায় করবে।"[৪৩৭]

আর যদি মালিক বা তার ওয়ারিশকে ফেরত দেয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সাদকা করে দিতে হবে। হারাম সম্পদ সাদকা করার বিধানটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. বলেন-

لما نزلت: ﴿ الٓمٓ ۝١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۝٢ فِيٓ أَدۡنَى ٱلۡأَرۡضِ وَهُم مِّنۢ بَعۡدِ غَلَبِهِمۡ سَيَغۡلِبُونَ ۝٣ ﴾ ، قال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس. قال: صدق صاحبي. قالوا: هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينه وبينهم أجلا فحل الأجل قبل أن تغلب الرومُ فارسَ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فساءه ذلك وكرهه، وقال لأبي بكر: "ما دعاك إلى هذا؟" قال: تصديقًا لله ولرسوله. فقال: "تَعَرَّض لهم وأعظم الخَطَرَ واجعله إلى بضع سنين". فأتاهم أبو بكر فقال لهم: هل لكم في العود، فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم. [قال] فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارسَ، وربطوا خيولهم بالمدائن، وبنوا

---

[৪৩৫] (হাদীস সহীহ) সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ৩৫৬১, সুনানুত তিরমিযী: হাদীস নং ১২৬৬, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা। সনদের রাবী সবাই ছেকাহ। ইমাম তিরমিযী রাহ. হাসান বলেছেন। আর হাসান বসরী সম্পর্কে দ্র. আপনার নামায, পৃ. ৩১৮

[৪৩৬] (সহীহ) সুনানু আবী দাউদ: ৫/২৭৩, সুনানুত তিরমিযী: ৪/৪৬২, সনদের রাবী সকলেই ছেকাহ। ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন: حديث حسن

[৪৩৭] আল মাবসূত: ১১/৪৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

الرومية، فجاء به أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا السحت، قال: " تصدق به".

"যখন الم.غُلِبَتِ الرُّومُ الخ অবতীর্ণ হলো, মুশরিকরা হযরত আবু বকর রাযি. -কে বললো, তোমার সঙ্গী (মুহাম্মদ ﷺ) কি বলে শুনেছ? তাঁর (মুহাম্মদ ﷺ) ধারণা, রোম নাকি পারস্যের উপর বিজয় লাভ করবে!

হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, আমার সঙ্গী (মুহাম্মদ ﷺ) সঠিক বলেছেন। মুশরিকরা বলল, তুমি কি এ বিষয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে রাজি আছ? হযরত আবু বকর রাযি. রাজি হলেন এবং একটি মেয়াদ নির্ধারণ করলেন যে, এর ভেতরই রোমকগণ পারস্যবাসীর উপর বিজয়লাভ করবে।.... এমনকি রোমকগণ পারস্যবাসীর উপর বিজয় লাভ করলো। হযরত আবু বকর রাযি. মুশরিকদের থেকে চুক্তি অনুযায়ী অর্থ গ্রহণ করলেন এবং তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন। রাসূল ﷺ বললেন- এটা হারাম। সুতরাং সাদকা করে দাও।"[৪৩৮]

তবে সাদকার ক্ষেত্রে নিজের জন্য সওয়াবের নিয়ত করবে না। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর আমল ছিলো নিম্নরূপ-

أن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم فإما غاب صاحبها وإما تركها، فنشده حولا فلم يجده فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يقبض ويعطي ويقول اللهم عن صاحبها فإن أتى فمني وعلي الغرم.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. একবার সাতশ দিরহামের বিনিময়ে একটি বাঁদী খরিদ করেন। এরপর হয়তো বিক্রেতা চলে গিয়েছে অথবা সে বিনিময় গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলো না। ইবনে মাসউদ রাযি. তাকে এক বছর যাবৎ খুঁজেও পেলেন না। অতঃপর তিনি উক্ত অর্থ মিসকিনদেরকে সাদকা করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ, এই বাঁদীর মালিকের পক্ষ হতে এই সাদকা কবুল করুন।..."[৪৩৯]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه.

"হারাম সম্পদকে তার মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়া সম্ভব না হলে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পন্থা হলো তা সাদকা করা।"[৪৪০]

মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী রাহ. বলেন-

---

[৪৩৮] তাফসিরে ইবনে কাছীর: ৩/৫৩৫, দারুল আকীদাহ

[৪৩৯] আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: হাদীস নং ১০৮২৯, সুনানু সাঈদ ইবনে মানসুর। হাফেয ইবনে হাজার রাহ. হাদীসটির সনদকে জায়্যিদ বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৩৪০) এখানে লক্ষণীয় যে, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. বাঁদীর মালিকের পক্ষ থেকে নিজে সাদকা করেছেন। সুতরাং এর সওয়াব মালিকই পাবে। সাদকাকারী সাদকার সওয়াব পাবে না; শুধু তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে।
সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত সাদকা করতে হবে-এর অর্থ হলো, সাদকাকারী নিজের জন্য সওয়াবের নিয়ত করতে পারবে না। তবে সে প্রকৃত মালিকের জন্য সওয়াবের নিয়ত করতে পারবে। বিষয়টি সহজ হলেও এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া সমীচীন মনে হলো।

[৪৪০] রদ্দুল মুহতার: ৭/৩০৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

ويتصدق بلا نية الثواب، إنما ينوي به براءة الذمة.

"হারাম সম্পদ সাদকা করার সময় দায় মুক্তির নিয়ত করবে। সওয়াবের নিয়ত করবে না।"[৪৪১]

অমালিকানাধীন হারাম পণ্যের লেনদেন

যেহেতু এ ধরনের হারাম পণ্যে সঞ্চয়কারীর কোনো ধরনের মালিকানা থাকে না, তাই সে এতে মালিকানাসুলভ কোনো লেনদেন করতে পারবে না।[৪৪২] যদি সে তা বিক্রয় করে তাহলে তার এ চুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তা মূল মালিকের অনুমতির উপর নির্ভর করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মূল মালিকের অনুমতি পাওয়া যাবে না, ততক্ষণ বিক্রয় শুদ্ধ হবে না। এক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য জরুরী হলো প্রকৃত মালিককে সম্পদ ফেরত দেয়া। আর বিক্রেতার জন্য আবশ্যক হলো ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দেয়া।

হ্যাঁ, যদি মালিক পরবর্তীতে হলেও অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে বিক্রয়টি শুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইমাম আলাউদ্দিন কাসানী রাহ. বলেন-

إذا باع الغاصب المغصوب من رجل، وأجاز المالك بيعه صحت الإجازة؛ إذا استجمعت الإجازة شرائطها، وهي قيام البائع، والمشتري والمعقود عليه...

"যদি আত্মসাৎকারী আত্মসাৎকৃত বস্তুকে অন্যের নিকট বিক্রয় করার পর মালিক তার বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করে, তাহলে মালিকের অনুমতি কার্যকর হবে (অর্থাৎ, বিক্রয়টি শুদ্ধ হবে)। যদি অনুমতি প্রদানের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ, বিক্রেতা, ক্রেতা এবং বিক্রীত বস্তুর অস্তিত্ব থাকে।...."[৪৪৩]

আর যদি মালিক আত্মসাৎকৃত পণ্যের দাবি ছেড়ে দেয় এবং ক্ষতিপূরণ নিতে রাজী হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ আদায়ের পর বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। ইমাম আবু বকর কাসানী রাহ. বলেন-

إذا باع الغاصب المغصوب ثم أدى الضمان أنه ينفذ بيعه لان هناك باعه لنفسه لا لغيره وهو المالك لأنه

---

[৪৪১] কাওয়া'ইদুল ফিকহ: ১১৫

[৪৪২] হারাম সম্পদ ও যাকাত প্রসঙ্গ:

যদি কারো হারাম সম্পদ নেসাব পরিমাণ হয় বা হালাল-হারাম মিলে নেসাব পূর্ণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। কেননা যাকাত ফরয হয় মালিকানাধীন হালাল সম্পদে। যেহেতু উপার্জনকারী ব্যক্তি এ ধরনের হরাম সম্পদের মালিকই নয়, তাই উক্ত সম্পদে যাকাত আসবে না। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন:

مطلب في التصدق من المال الحرام (قوله : وفي شرح الوهبانية إلخ) فيه دفع لما عسى يورد على قول المتن فتجب الزكاة فيه من أنه مال خبيث فكيف يزكى منه ، لكن علمت أنه لا تجب زكاته إلا إذا استبرأ من صاحبه أو صالح عنه فيزول خبثه .

এমনিভাবে হারাম সম্পদ যাকাত হিসাবে প্রদান করাও বৈধ নয়। কেননা যাকাত যেমন মালিকানাধীন হালাল সম্পদের উপর ফরয হয়, তেমনি তা আদায়ও করতে হবে মালিকানাধীন হালাল সম্পদ দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ [سورة البقرة: ٢٦٧]

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেন: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

[৪৪৩] বাদায়েউস সানায়ে: ১০/৬৯

ملكه باداء الضمان.

"যদি আত্মসাৎকারী আত্মসাৎকৃত বস্তু বিক্রয় করার পর জরিমানা আদায় করে, তাহলে তার বিক্রয় কার্যকর ও শুদ্ধ হবে। কেননা জরিমানা আদায় করে দেয়ার কারণে সে উক্ত বস্তুর মালিক হয়ে গেছে। তাই বিক্রয়টি তার পক্ষ থেকেই হয়েছে, মূল মালিকের পক্ষ থেকে নয়।"[৪৪৪]

উপরোক্ত বিধান অমালিকানাধীন হারাম সম্পদের (পূর্বোল্লিখিত) সকল প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং শরী'আতের দৃষ্টিতে বাতিল চুক্তির মাধ্যমে সংগৃহীত সম্পদ, যা মালিকের সম্মতিতেই গ্রহণ করা হয়েছে তার হুকুমও পূর্বের ন্যায়। করণ, এক্ষেত্রে মালিকের সম্মতি থাকলেও তার এই সম্মতি শরী'আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য গ্রহণকৃত সম্পদ মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর তা সম্ভব না হলে সাদকা করে দিবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. আল-মুনতাকা এর উদ্ধৃতিতে বলেন-

امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالا ردته على أربابه إن علموا وإلا تتصدق به.

"কারো মৃত্যুতে ক্রন্দন করে অর্থ উপার্জনকারী মহিলা অথবা তবলা বা বাঁশিওয়ালা যে অর্থ উপার্জন করেছে, তা মালিক জানা থাকলে তাকে ফেরত দিবে নতুবা সাদকা করবে।"[৪৪৫]

উপরোক্ত আলোচনা অমালিকানাধীন পণ্য ও মুদ্রা উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। মুদ্রার বিষয়ে বিশদ আলোচনা সামনে আসছে।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, অমালিকানাধীন হারাম মাল হস্তান্তরের দ্বারা হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত হারাম সম্পদ ক্রয়, উপহার বা অন্য কোনোভাবে জেনে শুনে গ্রহণ করলে সেও তার মালিক হবে না এবং তার জন্য ঐ সম্পদে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না। এক কথায়, পূর্বের বিধান এক্ষেত্রে হুবহু বলবৎ থাকবে। হারাম পণ্য ও মুদ্রা উভয়ের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে।

অমালিকানাধীন হারাম মুদ্রার ব্যবহার ও লেনদেন

আমরা জানি, শরী'আতে লেনদেনের ক্ষেত্রে পণ্য ও মুদ্রার বিধান সর্বক্ষেত্রে এক নয়। এর একটি কারণ হলো, পণ্যের বস্তুগত স্বকীয়তা আছে। তা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মুদ্রার প্রকৃতিই এমন যে, তার কোনো বস্তুগত নির্দিষ্টতা বা স্বকীয়তা নেই। এজন্য সাধারণত চুক্তির মাঝে নির্দিষ্ট কোনো মুদ্রা দ্বারা পরিশোধের কথা বললেও ভিন্ন মুদ্রা দ্বারা আদায়ের অবকাশ থাকে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম। যেমন, গসব (আত্মসাৎ-এর) স্পর্শকাতরতার কারণে গসবের ক্ষেত্রে মুদ্রা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে গসবকৃত মুদ্রার হুকুম পণ্যের মতো। পণ্যের মতো নির্দিষ্ট মুদ্রার সাথেই গসবের হুরমাত সংযুক্ত থাকে। গসবকৃত মুদ্রা হুবহু মালিককে ফেরত দেওয়া জরুরী। পারতপক্ষে অন্য কোনো মুদ্রা দ্বারা পরিশোধের অবকাশ নেই। আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. মুদ্রার নির্দিষ্টতা এবং অনির্দিষ্টতা সম্পর্কে বলেন-

ومن حكم النقود أنها لا تتعين، ولو عينت في عقود المعاوضات وفسوخها في حق الاستحقاق فلا يستحق عينها فللمشتري إمساكها ودفع مثلها قدرا ووصفا ويتعينان في الغصوب والأمانات والوكالات على تفصيل

---

[৪৪৪] বাদায়েউস সানায়ে: ৬/২০৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৪৫] রদ্দুল মুহতার ৯/৯৩, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

فيها، وكذا في كل عقد ليس معاوضة ولا يتعين في المهر قبل الطلاق وبعده قبل الدخول وفي تعيينها في المعاوضات الفاسدة روايتان...

"মুদ্রার একটি বিধান হলো তা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। চুক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু মুদ্রা আদায়ের কথা বলা হলেও তা আদায় করা জরুরী নয়; বরং ক্রেতা সে নির্দিষ্টকৃত মুদ্রা বাদ দিয়ে তার পরিমাণ অন্য মুদ্রা পরিশোধ করতে পারবে। তবে গসব (আত্মসাৎ), আমানত, ওয়াকালাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে (ব্যাখ্যাসাপেক্ষে) মুদ্রা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এমনিভাবে প্রত্যেক ঐ চুক্তি যাতে উভয়পক্ষে বিনিময় নেই, তাতেও মুদ্রা নির্দিষ্ট হয়। তবে মোহরের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্কের পূর্বে (তালাক প্রদানের পূর্বে হোক বা পরে হোক) মুদ্রা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। আর ফাসিদ বিনিময় চুক্তিসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হওয়া-না হওয়ার ব্যাপারে দু'ধরনের মতামত রয়েছে। ..."[৪৪৬]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

فإن النقود تتعين في الغصوب فإذن حكمها حكم الأعيان.[৪৪৭]

"গসব (আত্মসাৎ)-এর ক্ষেত্রে মুদ্রা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং গসবের ক্ষেত্রে মুদ্রা আর পণ্যের মাঝে পার্থক্য নেই।"

শুধু গসবকৃত মুদ্রা নয়; অন্যান্য অমালিকানাধীন মুদ্রার ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। এজন্য অমালিকানাধীন হারাম পণ্যের মতো হারাম মুদ্রাও কোনোভাবে **ব্যবহার** করা বৈধ হবে না; বরং তা হুবহু মালিককে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। এমনিভাবে উক্ত মুদ্রা দ্বারা কোনো ধরনের **লেনদেন** জায়েয হবে না। ঐ মুদ্রা দ্বারা কোনো কিছু ক্রয় করলে ক্রয়কৃত সম্পদ কোনোভাবে ব্যবহার করা বা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না।[৪৪৮] আর বিক্রেতা, যে বিনিময়ে ঐ হারাম মুদ্রা গ্রহণ করেছে, সে উক্ত মুদ্রার মালিক হবে না। কারণ, অমালিকানাধীন হারাম সম্পদ (চাই তা পণ্য হোক বা মুদ্রা) যতই হাতবদল হোক, তা অমালিকানাধীন হারামই থেকে যায়।

এখানে উল্লেখ্য যে, হারাম মুদ্রা দ্বারা কোনো কিছু ক্রয় করার মৌলিকভাবে দুই অবস্থা হতে পারে। যথা-

১. নির্দিষ্টভাবে উক্ত হারাম মুদ্রাকেই (কথা বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে) বিনিময় হিসেবে স্থির করে ক্রয় করল। এক্ষেত্রে ক্রয়কৃত সম্পদে ক্রেতার অবৈধ মালিকানা এসে যাবে। ঐ সম্পদ কোনোভাবে ব্যবহার, ভোগ বা বিনিয়োগ করা তার জন্য বৈধ হবে না। এক্ষেত্রে করণীয় হলো, উক্ত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রহিত করে গৃহীত মুদ্রা তার মালিককে ফেরত দেয়া, যেমনটি পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

---

[৪৪৬] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৪৬৩-৪৬৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৪৭] মিনহাতুল খালেক হাশিয়াতুল বাহরির রায়িক: ৬/৩৬৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৪৮] তবে এক্ষেত্রে ক্রয়কৃত সম্পদে ক্রেতার ملك خبيث বা অবৈধ মালিকানা আসবে। তবে এই ملك خبيث সাধারণ 'আকদে ফাসিদের মাধ্যমে অর্জিত মালিকানাধীন সম্পদের মতো নয়। 'আকদে ফাসিদের দ্বারা অর্জিত সম্পদ তো হাতবদল ও হস্তান্তরের দ্বারা হালাল হয়ে যায়; কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে উল্লিখিত خباثت বা অবৈধতা মালিকের সম্মতি, ক্ষতিপূরণ আদায় অথবা সাদকা করা ছাড়া দূর হবে না।

২. লেনদেনের সময় হারাম মুদ্রাকে নির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে ক্রয় করলো বা অন্য কোনো মুদ্রাকে নির্দিষ্ট করে তার বিনিময়ে ক্রয় করলো, তবে আদায়ের সময় আত্মসাৎকৃত অবৈধ মুদ্রা দ্বারাই পরিশোধ করলো।

এ অবস্থার হুকুম অগ্রগণ্য মতানুযায়ী[৪৪৯] পূর্বের অবস্থার মতোই। অর্থাৎ, তা দ্বারা কোনোভাবেই জেনে বুঝে উপকৃত হতে পারবে না। কুরআন, হাদীস ও ফিকহের উসূলের দাবি অনুসারে এই মতটি অধিক শক্তিশালী। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুদ খাওয়াকে হারাম করেছেন। যেমন, ইরশাদ হয়েছে-

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ

"যারা সুদ খায়, (কিয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মতো উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে।"[৪৫০]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পারো।"[৪৫১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به.

"হারাম সম্পদ দ্বারা গঠিত শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জাহান্নামই সে শরীরের জন্য উপযুক্ত স্থান।"[৪৫২]

বলাবাহুল্য, টাকা সরাসরি খাওয়ার উপযোগী নয়। তা খেতে হলে তা দ্বারা কোনো কিছু ক্রয় করে খেতে হবে। সুতরাং হারাম অর্থ খাওয়ার জন্য অবশ্যই তার লেনদেন ও বিনিময় করতে হবে। চাই মুদ্রা নির্দিষ্ট করা হোক বা না হোক। আমরা দেখেছি যে, আয়াতে কারীমাতে ব্যাপকভাবেই নিষেধ করা হয়েছে।

সাধারণভাবে (অর্থাৎ, অনির্দিষ্টভাবে) ক্রয় করে সুদের টাকা দিয়ে পরিশোধ করলে যদি ক্রয়কৃত বস্তু হালাল হয়ে যায়, তাহলে সুদ গ্রহণ করার দরজা একদম খুলে যাবে। সবাই সুদ নিবে আর অনির্দিষ্টভাবে ক্রয় করে সুদের টাকা দিয়ে পরিশোধ করবে। বিষয়টি আরো জটিল হয়ে যায় এ কারণে যে, বর্তমানে সাধারণত ক্রয়-বিক্রয়ের সময় টাকা নির্দিষ্ট করা হয় না। অনির্দিষ্টভাবে

---

[৪৪৯] এটিই ফিকহে হানাফীর যাহিরুর রিওয়ায়াহ-এর দাবি। ইমাম আবু বকর ইসকাফ রাহ., ইমাম আলী মারগীনানী রাহ., ইমাম আবু বকর কাসানী রাহ. এবং ইমাম ফখরুদ্দীন যইলা'ঈ রাহ. প্রমুখগণ এ মতকে তারজীহ দিয়েছেন। দ্রষ্টব্য: ফিকহুল বুয়ূ', পৃ. ১০১১।

[৪৫০] সূরা বাকারা: ২৭৫

[৪৫১] সূরা আলে ইমরান: ১৩০

[৪৫২] মুসনাদে আহমদ: ১৪৪৪১, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৪৫১৫, মুসতাদরাকে হাকেম: ৪/৪২২। তিনি বলেন: صحيح الاسناد ইমাম যাহাবী রাহ. তা সমর্থন করেছেন।

ক্রয় করে সুদের টাকা দ্বারা পরিশোধ করলে যদি ক্রয়কৃত বস্তু হালাল হয়ে যায়, তাহলে বর্তমানে সুদখোররা হালাল খাচ্ছে বলে ধরে নিতে হবে। অথচ এমনটি মনে করা হয় না। এজন্য দলীলের দাবি এটাই যে, উল্লিখিত কোনো সুরতেই হারাম সম্পদ দ্বারা ক্রয়কৃত মাল ব্যবহার করা যাবে না এবং উক্ত সম্পদ থেকে অর্জিত মুনাফাও হালাল হবে না (মুনাফার ব্যাপারে বিস্তারিত সামনে আসছে)।

অনির্দিষ্টভাবে হারাম মুদ্রা দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পদ ও তার মুনাফার বিধান প্রসঙ্গে ইমাম আবুল হাসান কারখী রাহ. সহ দু'একজন ইমামের ভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইমাম কারখী রাহ.-এর মতটিই বেশি প্রসিদ্ধ। আসলে ইমাম কারখী রাহ.-এর বক্তব্য ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মালের যামান (ক্ষতিপূরণ) পরিশোধ করার শর্ত ও ক্বয়দ এতে উল্লেখ করা হয়নি। এই ব্যাপকতা থেকে অনেকে মনে করেছেন যে, ইমাম কারখী রাহ.-এর মতানুযায়ী অনির্দিষ্টভাবে ক্রয় করে গসবকৃত মুদ্রা প্রদান করলে ক্রয়কৃত সম্পদ হালাল হবে। সে হিসেবে ফাতওয়াও দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ এই শর্ত উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, যদি ইমাম কারখী রাহ.-এর বক্তব্য ব্যাপক হিসেবেই গ্রহণ করা হয়, তাহলে সুদের দরজা খুলে যায়, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি যামান পরিশোধের শর্ত যুক্ত করা হয়, অর্থাৎ, হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, মূল মালিককে যামান পরিশোধ করতে হবে- তাহলে সকল ইমামের বক্তব্য একরকম হয়ে যায়। কোনো ইখতিলাফ বাকী থাকে না। এমনিভাবে কুরআন-সুন্নাহ ও উসূলে শরী'আতের সাথেও কোনো বৈপরীত্য থাকে না। ফিকহের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কারো কাছে অজানা নয় যে, এ ধরনের ক্বয়দ ফিকহী ইবারত (ভাষ্য)-এ প্রয়োজনে উহ্য মানতে হয়। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য- বক্ষ্যমাণ কিতাবের 'যৌথ উত্তরাধিকার সম্পদে হস্তক্ষেপ' শীর্ষক প্রবন্ধ।

এ সকল দিক বিবেচনা করে আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

ثم قد يخطر ببالي والله سبحانه أعلم_ أن قول الكرخي وأبي نصر والفقيه أبي الليث رحمهم الله تعالى متعلق بطيب ربح المغصوب بعد أداء الضمان، لا قبله، وإن كان مذكورا في الكتب بدون هذا القيد. ومرادهم أن الغاصب إن اشترى بالنقود المغصوبة ثوبا مثلا بمائة، ثم باع هذا الثوب بمائة وعشرة قبل أداء ضمان النقود المغصوبة، فربح فيها عشرة، ثم أدى ضمان النقود المغصوبة إلى الغاصب، فمذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يطيب هذا الربح بأداء الضمان فيما بعد، لأنه ربحه قبل أداء الضمان، وكان ملكه في ذلك الوقت خبيثا، كما سيأتي في القسم الرابع. أما الكرخي رحمه الله تعالى، فيقول: ينقلب هذا الربح طيبا بأداء الضمان إن كان اشترى الثوب بالصور الثلاثة الأخيرة، ولا ينقلب طيبا في الصورة الأولى والثانية، لأن الشراء بالنقود المغصوبة متعين فيهما. ويقول أبو نصر والفقيه أبو الليث إنه ينقلب طيبا في الصور الأربعة الأخيرة، ولا ينقلب في الصورة الأولى. فيحتمل أن كلام هؤلاء المشايخ تفسير لقول الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وحمل له على الصورة الأولى عند أبي نصر وعليها وعلى الصورة الثانية عند الكرخي رحمهم الله تعالى.

"আমার মনে হয় (আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত) ইমাম কারখী, ইমাম আবু নছর এবং ফকীহ

আবুল লাইছ রাহ.-এর বক্তব্য, আত্মসাৎকৃত বস্তুর যামান আদায়ের পরে তা থেকে অর্জিত মুনাফা হালাল হওয়া না হওয়ার প্রসঙ্গে। যদিও কিতাবাদিতে এই শর্ত (যামান আদায়) উল্লেখ নেই। তাদের উদ্দেশ্য হলো, যদি উদাহরণস্বরূপ গাসিব (আত্মসাৎকারী) গসবকৃত একশত টাকা দিয়ে একটি কাপড় খরিদ করে এবং (গসবকৃত মুদ্রার) যামান আদায় করার পূর্বে একশত দশ টাকা মূল্যে তা বিক্রয় করে (অর্থাৎ, দশ টাকা লাভ করে), অতঃপর মুনাফা অর্জনের পর যামান আদায় করে দেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মত অনুযায়ী এই মুনাফা বৈধ হবে না। কেননা সে যামান আদায়ের পূর্বে মুনাফা অর্জন করেছে এবং সে সময় উক্ত মুদ্রার উপর তার মালিকানা ছিল অবৈধ। তবে ইমাম কারখী রাহ. বলেন, যামান আদায়ের পূর্বের মুনাফা যামান আদায়ের মাধ্যমে বৈধ হয়ে যাবে।......”[৪৫৩]

বিষয়টি এখান থেকেও স্পষ্ট বুঝে আসে যে,[৪৫৪] ফিকহের কিতাবে ইমাম কারখী রাহ-এর সাথে অন্যদের ইখতিলাফ উল্লেখ করা হয়েছে হারাম মুদ্রা দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পদ থেকে অর্জিত মুনাফার ব্যাপারে, মূল হারাম সম্পদের ব্যাপারে নয়। আর ইবারত থেকে এটাও বোঝা যায় যে, এই ইখতিলাফ যামান আদায়ের পর মুনাফা বৈধ হওয়া না হওয়ার প্রসঙ্গে। অর্থাৎ, যামান আদায়ের পর তার পূর্বে অর্জিত মুনাফাও অগ্রগণ্য মতানুসারে হারাম। তবে ইমাম কারখী রাহ.-এর মতে, যামান আদায়ের পর তার পূর্বে অর্জিত মুনাফা (অনির্দিষ্টভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) হালাল হয়ে যাবে।

আল জামিউস সগীর-এর যে মাসআলায় ইমাম কারখী রাহ. ও অন্যদের মাঝে ইখতিলাফ উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো-

من غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح، وهذا عندهما.

“যদি কেউ একশত দিরহাম গসব করে তা দ্বারা একটি বাঁদী ক্রয় করে সেটা দুইশত দিরহামে বিক্রয় করে। অতঃপর দুইশত দিরহাম দ্বারা একটি বাঁদী ক্রয় করে তিনশত দিরহামে বিক্রয় করে, তাহলে সমুদয় মুনাফা (দুইশত দিরহাম) সাদকা করতে হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর অভিমত।”[৪৫৫]

এ ভাষ্য উল্লেখ করে হিদায়া প্রণেতা ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেন-

وقال مشايخنا: لا يطيب له قبل أن يضمن، وكذا بعد الضمان بكل حال، وهو المختار لاطلاق الجواب في الجامعين والمبسوط.

“আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, গসবকারীর জন্য যামান আদায়ের পূর্বে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই গসবকৃত বস্তু থেকে অর্জিত মুনাফা বৈধ হবে না। এটাই গ্রহণযোগ্য অভিমত।....”[৪৫৬]

---

[৪৫৩] ফিকহুল বুয়ু: ১০১২-১০১৩

[৪৫৪] ফিকহুল বুয়ু: ১০১২-১০১৩

[৪৫৫] আল হিদায়া: ৩/৩৭৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৪৫৬] আল হিদায়া: ৩/৩৭৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

উল্লেখ্য, যামান আদায়ের পর হালাল হওয়া না হওয়ার বিষয়ে ইখতিলাফ হয়েছে মুনাফার ক্ষেত্রে। ক্রয়কৃত মূল সম্পদ যে যামান আদায়ের পর হালাল হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ নেই।

যাই হোক, হেদায়ার উপরোক্ত ইবারত থেকে আমরা জেনেছি যে, ফিকহে হানাফীর যাহিরুর রিওয়ায়াহ থেকে এটাই বুঝে আসে যে, হারাম মুদ্রা নির্দিষ্ট করা হোক বা না করা হোক, উভয় অবস্থায়ই যামান আদায়ের পূর্বে অর্জিত মুনাফা যামান আদায়ের পরও হারাম হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা **'হারাম সম্পদ থেকে অর্জিত সম্পদ ও মুনাফার বিধান'** শিরোনামের অধীনে আসছে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু বকর কাসানী রাহ. ইমাম কারখী রাহ.-এর মত উল্লেখ করলেও প্রথমোক্ত মতকেই অধিক সতর্কতামূলক বলেছেন। ইমাম কাসানী রাহ. বলেন-

وجواب الكتب أقرب إلى التنزه والاحتياط، والله تعالى أعلم ولأن دراهم الغصب مستحقة الرد على صاحبها، وعند الاستحقاق ينفسخ العقد من الأصل، فتبين أن المشترى كان مقبوضا بعقد فاسد، فلم يحل الانتفاع به.

"যামান আদায়ের পূর্বের মুনাফা হালাল না হওয়াই সতর্কতার অধিক নিকটবর্তী। কেননা গসবকৃত দিরহামগুলো মালিকের নিকট ফেরতযোগ্য আর মালিক তার দাবিদার। আর আমরা জানি, প্রকৃত দাবিদার বের হলে অমালিকানাধীন বস্তুর চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ক্রীত বস্তুটি এখানে একটি অবৈধ চুক্তির মাধ্যমে হস্তগত হয়েছে। তাই তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ হবে না।"[৪৫৭]

এমনিভাবে ইমাম আবু বকর ইসকাফ রাহ., ইমাম ফখরুদ্দীন যায়লা'ঈ রাহ.[৪৫৮] সহ আরো অনেকে এ মতকে তারজীহ দিয়েছেন।

তবে মুতাআখখিরীনের মাঝে অনেকে হারামের ব্যাপক ছড়াছড়ি ও বহুল সমস্যার কারণে ইমাম কারখী রাহ.-এর মতের উপর ফাতওয়া প্রদানের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্বোল্লিখিত ইমাম কারখী রাহ.-এর মতের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

وذكر كثير من المتأخرين أن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "وعلى هذا مشى المصنف (يعنى صاحب الدر المختار) في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها."[৪৫৯] وقد أفتى به جماعة من مشايخنا.

فلو أخذ قول الكرخي رحمه الله تعالى ما فسرناه، فرجحانه مسلم. أما إذا أخذ مبيحا لما اشترى بالنقود

---

[৪৫৭] বাদায়েউস সানায়ে: ১/১৫০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৫৮] আবু মুহাম্মাদ ফখরুদ্দিন উসমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ আযযায়লায়ী, আলহানাফী। তিনি ৭৪৩ হিজরীর রমজান মাসে মিশরের কুরাফা শহরে ইন্তেকাল করেন। রচনা জগতে 'তাবয়ীনুল হাকায়েক আলা শরহে কানযুদ্দাকায়েক' তাঁর অমর কীর্তি। (হাদিয়াতুল আরেফীন ৫/৬৫৫)

[৪৫৯] রদ্দুল মুহতার: ৭/৫১৮, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

المغصوبة وربحه، فالذى يميل إليه القلب أن ما رجحه صاحب الهداية والكاساني بناء على قول الإمام أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، هو الأولى بالترجيح، وهو الاحتياط. وإن كان كثير من الفقهاء المتأخرين أفتوا بذلك لعموم البلوى. ولذا فمن ابتلى بمثل هذا، يرجى أن يسوغ له الأخذ بهذا القول عند حاجة شديدة، والتنزه أولى. ولم يذكر عن الكرخي حكم البائع الذى أخذ من المشترى النقود المغصوبة، هل يسوغ له استعمال تلك النقود؟ وقد أفتى كثير من علماءنا أنه يجوز له ذلك أيضا.[৪৬০] والله سبحانه وتعالى أعلم.

"অনেক পরবর্তী ফুকাহা ও মুফতিয়ানে কেরাম উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমান যামানায় মানুষের সংকট লাঘবের জন্য ইমাম কারখী রাহ.-এর মত অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করা হবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন, আদ্দুররুল মুখতার গ্রন্থের লেখক আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. 'দুরার' ও অন্যান্য কিতাবের অনুসরণ করে গসব-এর পরিচ্ছেদে এই মতটিই গ্রহণ করেছেন এই মতামত অনুযায়ী আমাদের অনেক মাশায়েখও ফাতওয়া প্রদান করেছেন। ইমাম কারখী রাহ.-এর মতের যে ব্যাখ্যা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, তা অনুযায়ী বর্তমানে উপরোক্ত কারণে কারখী রাহ.-এর মতের উপর ফাতওয়া প্রদান করাটা যুক্তিযুক্ত। তবে যদি কারখী রাহ.-এর মতের ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়, যা অনুযায়ী হারাম মুদ্রা দ্বারা ক্রয়কৃত বস্তু ও অর্জিত মুনাফা হালাল- তাহলে এর বিপরীত মতটিই অগ্রগণ্য এবং সতর্কতার দাবিও তাই।..."[৪৬১]

অমালিকানাধীন হারাম সম্পদে পরিবর্তন সাধন করলে তার বিধান

যদি আত্মসাৎকারী হারাম সম্পদে এমন কোনো পরিবর্তন সাধন করে যার কারণে তার প্রকৃতি ও উপযোগই ভিন্ন হয়ে যায়, যেমন, একটি ছাগল চুরি করে তা জবেহ করে ভুনে ফেললো, তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু এটা আর পূর্বের বস্তু রয়নি; বরং ভিন্ন একটি বস্তুতে পরিণত হয়েছে, তাই এতে আত্মসাৎকারীর 'অবৈধ মালিকানা' (الملك الخبيث) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কারণ, এটা গসবকৃত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মতো। আর এতে গসবকারীর হকও সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। তাই এ অবস্থায় আত্মসাৎকৃত বস্তুটি ফেরত দেয়ার বাধ্যবাধকতা আর বাকি থাকেনি; বরং এক্ষেত্রে মূল মালিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। ক্ষতিপূরণ আদায় করা ব্যতীত ঐ বস্তু থেকে কোনোভাবে উপকৃত হওয়া বৈধ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. কিতাবুল আসারে আসেম ইবনে কুলাইব রাযি. হতে বর্ণনা করেন, তিনি এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

صنع رجل من أصحاب محمد طعاماً فدعاه، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فلما وضع الطعام تناول النبي صلى الله عليه وسلم منه وتناولنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بضعة من ذلك اللحم فلاكها في فيه طويلاً، فجعل لا يستطيع أن يأكلها، فألقاها من فيه وأمسك عن الطعام، فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد صنع ذلك أمسكنا عنه أيضاً، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الطعام، فقال:

[৪৬০] ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ: ১৪/৩৯৩-৩৯৬

[৪৬১] ফিকহুল বুয়ু:

((أخبرني عن لحمك هذا من أين هو))؟ قال: يا رسول الله! شاة كانت لصاحب لنا، فلم يكن عندنا فنشتريها منه، وعجلنا بها فذبحناها فصنعناها لك حتى يجيء فنعطيه ثمنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الطعام، وأمر به أن نطعمها الأسرى.

"একজন সাহাবী খানার ব্যবস্থা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমরাও দাওয়াতে অংশগ্রহণ করার জন্য রওনা হলাম। যখন খাবার পরিবেশন করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আমরা আহার শুরু করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক টুকরো গোশত দীর্ঘ সময় ধরে চিবিয়ে গিলতে অক্ষম হলেন। তিনি সেটা মুখ থেকে ফেলে দিলেন এবং খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই অবস্থা দেখে আমরাও আহার করা থেকে বিরত থাকলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মেযবানকে ডেকে বললেন, এই গোশত কোথা থেকে সংগ্রহ করেছ? সে উত্তর দিলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই বকরীটি আমাদের প্রতিবেশীর। সে বাড়িতে উপস্থিত ছিল না যে, তার থেকে খরিদ করবো, আর আমাদের দ্রুত প্রয়োজন ছিলো। তাই বকরীটি খরীদ করা ব্যতীতই জবেহ করে ভুনিয়ে আপনার জন্য এনেছি। পরে বকরীর মালিক উপস্থিত হলে তাকে বকরীর মূল্য পরিশোধ করে দিবো এই খেয়ালে। তখন রাসূল ﷺ খাবারগুলো তুলে নিতে বললেন এবং তা বন্দীদের দিয়ে দিতে আদেশ দিলেন।"[৪৬২]

হাদীসটি বর্ণনার পর ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন-

وبه نأخذ. ولو كان اللّحمُ على حاله الأوّل، لما أمر النّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُطعمه الأساري، ولكنّه رآه قد خرج عن مِلك الأوّل، وكره أكلَه، لأنّه لم يضمن قيمتَه لصاحبه الّذي أُخذت شاتُه. ومن ضمن شيئاً فصار له من وجه غصب، فأحبُّ إلينا أن يتصدق به، و لا يأكلَه، وكذلك ربحه. والأسارى عندنا أهل السِّجن المحتاجون. وهذا كلّه قياسُ قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

"এটাই আমাদের মত (অর্থাৎ, হারাম বস্তুতে পরিবর্তন সাধনের পর তাতে অর্জনকারীর অবৈধ মালিকানা চলে আসে)। যদি (উপরোক্ত হাদীসে) গোশত পূর্বের অবস্থায় বিদ্যমান থাকত (অর্থাৎ, ছাগলটি বহাল তবিয়তে থাকত), তাহলে রাসূল ﷺ তা বন্দীদেরকে খাওয়ানোর আদেশ দিতেন না (বরং মালিককে ফেরত দিতে বলতেন)। কিন্তু এখানে তিনি এটা সাব্যস্ত করেছেন যে, এই গোশত (উপযুক্ত তাসাররুফের কারণে) মূল মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে (এবং এতে পরিবর্তনকারীর অবৈধ মালিকানা চলে আসে)। তবে তিনি নিজে তা খেতে অপছন্দ করেছেন। কারণ, সে বকরীর মালিককে তখনও পর্যন্ত যামান পরিশোধ করেনি। যদি কারো উপর কোনো বস্তুর যামান থাকে (অর্থাৎ, উক্ত বস্তু বা তার ক্ষতিপূরণ মালিককে আদায় করা জরুরী হয়) এমতাবস্থায় সে যদি যামানযোগ্য বস্তু থেকে কোনো আয় করে, তাহলে আমাদের নিকট উত্তম হলো তা সাদকা করে দেওয়া এবং তা থেকে ভক্ষণ না করা। এমনিভাবে তা থেকে অর্জিত মুনাফারও একই বিধান। হাদীসে উল্লিখিত বন্দী দ্বারা ফকীর বন্দীগণ উদ্দেশ্য।

[৪৬২] কিতাবুল আসার: ২০০ (বাবুদ দা'ওয়াহ) (سبق تخريجه)

উপরোল্লিখিত সকল বিধান ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মতের অনুরূপ।"[৪৬৩]

ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها، ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها.

"যদি গসবকৃত বস্তু গাসেবের কোনো কর্মের দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন নামের বস্তু হয়ে যায় এবং ঐ বস্তুর মৌলিক উপকারিতাও পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলে উক্ত বস্তু থেকে মূল মালিকের মালিকানা দূর হয়ে যায় এবং গাসিব তার মালিক হয়। তবে উক্ত বস্তুর যামান আদায়ের পূর্বে গাসেবের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ নয়।"[৪৬৪]

হালাল-হারাম বা বিভিন্ন জনের হারাম সম্পদের সমষ্টিগত অর্থসম্পদের বিধান

পূর্বে আমরা নিরেট অমালিকানাধীন হারাম অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন আমরা হালাল-হারাম দু'ধরনের সম্পদ দ্বারাই গঠিত বা বিভিন্ন জনের হারাম সম্পদ দ্বারা গঠিত অর্থ-সম্পদ নিয়ে আলোচনা করবো। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা মৌলিকভাবে এ ধরনের সম্পদকে দুই প্রকারে ভাগ করতে পারি-

১. অমিশ্রিত হালাল-হারাম সম্পদ

২. বিভিন্ন জনের হারাম বা হালাল-হারাম মিশ্রিত সম্পদ

নিম্নে উভয় প্রকারের বিধান উল্লেখ করা হলো-

১. অমিশ্রিত হালাল-হারাম দ্বারা গঠিত সম্পদের বিধান

অর্থাৎ, এমন অর্থ-সম্পদ যাতে হালাল এবং হারাম উভয়ই রয়েছে, তবে হালাল ও হারাম এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায়নি যে, পৃথকভাবে কোনটি হালাল এবং কোনটি হারাম চেনা যায় না। এ ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যদি নির্দিষ্টভাবে হারাম সম্পদ চেনা যায়, তাহলে তার ব্যাপারে পূর্বে নিরেট হারামের যেসব বিধান উল্লেখ করা হয়েছিলো, তা প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না এবং তা পারতপক্ষে মালিককে ফেরত দেওয়া জরুরী।

আর যদি কোনো কারণে নির্দিষ্টভাবে কোনটি হারাম তা চেনা না যায়, তাহলে হালাল-হারামের আধিক্যের ভিত্তিতে হুকুম স্থির হবে। যদি হারাম বেশি হয়, তাহলে পুরো সম্পদের উপর নিরেট হারামের বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি হালাল বেশি হয়, তাহলে তার উপর মুবাহের বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন, উল্লিখিত হারাম অর্থসম্পদের আহরণকারী যদি জানে যে, এই সম্পদের অধিকাংশ হালাল, তাহলে যতক্ষণ নির্দিষ্টভাবে কোনো সম্পদের ব্যাপারে হারাম হওয়ার ধারণা না করবে, ততক্ষণ সে তা ব্যবহার বা লেনদেন করতে পারবে।

ঐ ব্যক্তির সাথে যারা লেনদেন করবে তারাও এ মূলনীতি অনুযায়ী লেনদেন করতে পারবে। যদি তার অধিকাংশ সম্পদ হারাম হয়, তাহলে তার হাদিয়া বা উপঢৌকন গ্রহণ করা, তার দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করা বা তার সাথে উক্ত সম্পদের মাধ্যমে অন্যান্য লেনদেন করা জায়েয

---

[৪৬৩] কিতাবুল আসার, বাবুদ দা'ওয়াহ পৃ. ২০০

[৪৬৪] আল হিদায়া ৩/৩৭৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

হবে না। তবে যদি সে নিশ্চিত করে যে, সে তার হালাল সম্পদ থেকে হাদিয়া বা উপহার দিচ্ছে বা দাওয়াতের ব্যবস্থাপনা করছে বা লেনদেন করছে তাহলে জায়েয হবে।

আর যদি তার অধিকাংশ সম্পদ হালাল হয়, তাহলে তার হাদিয়া গ্রহণ করা ও তার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা বা তার সাথে অন্যান্য লেনদেন করা জায়েয হবে। তবে যদি নিশ্চিতভাবে জানা থাকে যে, সে তার হারাম সম্পদ থেকে হাদিয়া দিচ্ছে বা দাওয়াতের ব্যবস্থাপনা করেছে বা অন্যান্য লেনদেন করছে তখন তার সাথে লেনদেন করা জায়েয হবে না।

আল্লামা ফখরুদ্দিন হাসান ইবনে মানসুর ঊযাজান্দি রাহ. বলেন-

قال الناطفي رحمه الله تعالى: اذا أهدي الرجل إلى إنسان أو أضافه، إن كان غالب مال المهدي من الحرام ينبغي له أن لا يقبل الهدية ولا يأكل من طعامه ماله ما لم يخبر أنه حلال، وإن كان غالب مال المهدي من الحلال لابأس بأن يقبل الهديه ويأكل ما لم يتبين عنده أنه حرام، لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فيعتبر الغالب.

"আল্লামা নাতিফী রাহ. বলেন, যে ব্যক্তির অধিকাংশ উপার্জন হারাম সে যদি হাদিয়া দেয় বা আপ্যায়ন করে, তাহলে তার হাদিয়া বা দাওয়াত গ্রহণ করা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত না করবে যে, তার হাদিয়ার বস্তু ও খাবার হালাল। আর যদি তার অধিকাংশ সম্পদ হালাল হয় তাহলে তার হাদিয়া এবং দাওয়াত গ্রহণ করা সাধারণ অবস্থায় বৈধ। হ্যাঁ, যদি নির্দিষ্টভাবে জানা যায় যে, তার হাদিয়া বা দাওয়াতের বস্তু হারাম পন্থায় উপার্জিত, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। কারণ, মানুষের সম্পদে যৎসামান্য হারাম সাধারণত থাকে; তাই লেনদেন ও গ্রহণ-বর্জন হবে অধিকাংশের ভিত্তিতে। (কারণ, যৎসামান্য হারামের ভয়ে সব লেনদেন বন্ধ রাখা হলে মানুষের জীবন বাধাগ্রস্ত হবে)"[৪৬৫]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

إذا كان غالب مال المهدي حلالا، فلا بأس بقبول هديته، وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه.

"যদি হাদিয়াদাতার অধিকাংশ সম্পদ হালাল হয়, তাহলে তার হদিয়া গ্রহণ এবং তার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া যাবে যে, তার হাদিয়া বা খাবার হারাম ছিলো। আর যদি তার অধিকাংশ সম্পদ হারাম হয়, তাহলে তার হাদিয়া গ্রহণ করা বা দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে যদি সে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর ব্যাপারে বলে যে, তা হালাল, অর্থাৎ, সে তা উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেছে বা কারো থেকে ঋণ নিয়েছে, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে।"[৪৬৬]

আল্লামা ফরিদুদ্দিন ইবনুল 'আলা দেহলভী রাহ. বলেন-

وحاصل المذهب فيه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال وإن كان صاحب تجارة وزرع وأكثر ماله من ذلك، فلا بأس بقبول الجائزة منه ما لم يعلم أن

---

[৪৬৫] ফাতাওয়ায়ে কাযীখান: ৯/২৮৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৬৬] আল আশবাহু ওয়ান নাযায়ের: ১/৩০৯ ইদারাতুল কুরআন, করাচী

ذلك من وجه الحرام وفي قبول رسول الله ﷺ الهدية من بعض المشركين دليل على ما قلنا.

হারাম উপার্জনকারীর হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারে ফাতওয়ার সার হলো- যদি তার অধিকাংশ সম্পদ ঘুষ বা হারাম হয় তাহলে সাধারণ অবস্থায় তার উপহার গ্রহণ করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, যদি কোনো সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, তা হালাল, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ। আর যদি সে ব্যবসায়ী বা কৃষক হয় এবং তার অধিকাংশ উপার্জন তার ব্যবসা বা কৃষি কাজ থেকে আসে তাহলে তার উপহার গ্রহণ করা বৈধ যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হবে যে, এই উপহার সে হারাম পন্থায় উপার্জন করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক কোনো কোনো মুশরিকের হাদিয়া গ্রহণ করা উপরোক্ত বিধানের স্বপক্ষে দলীল।"[৪৬৭]

এখানে মনে রাখতে হবে যে, এটা ঐ অবস্থার ক্ষেত্রে যেখানে হালাল-হারাম সম্পদ সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হয়ে যায়নি। যদি কোনো সম্পদে হালাল এবং হারাম উভয়টি সম্পূর্ণভাবে মিশে যায়, তাহলে তার বিধান ভিন্ন, যার আলোচনা সামনে আসছে। প্রায়সময় মানুষ দু'টি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলে।

২. মিশ্রিত হারাম বা হালাল-হারাম সম্পদের বিধান

পূর্বে আমরা জেনেছি যে, হারাম সম্পদে কোনো ধরনের তাসাররুফ বা হস্তক্ষেপের অধিকার আহরণকারীর নেই। হারাম সম্পদকে অন্য হালাল বা হারাম সম্পদের সাথে এমনভাবে মেশানো যে, তা আর পৃথক করা সম্ভব হয় না- এটাও এক প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ। কারণ, এর দ্বারা সম্পদের নির্দিষ্টতা ও পৃথক স্বকীয়তা বিলীন হয়ে যায়।

তবে এ ধরনের হস্তক্ষেপ তার জন্য অবৈধ হলেও এর কারণে ঐ সম্পদের হুকুম কিছু দিক থেকে নিরেট হারাম সম্পদ থেকে ভিন্ন হয়ে যায়।

এ জাতীয় মিশ্রিত হারাম সম্পদ দু'ধরনের হতে পারে:

ক. হালাল-হারাম মিশ্রিত সম্পদ

যদি অমালিকানাধীন হারাম অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়কারী স্বেচ্ছায় উক্ত সম্পদ তার মালিকানাধীন বৈধ সম্পদের সাথে সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত করে ফেলে, তাহলে তাতে তার অবৈধ মালিকানা (الملك الخبيث) প্রতিষ্ঠিত হবে। এমতাবস্থায় তার বিধান হারাম সম্পদ নষ্ট করে দেয়া বা তার প্রকৃতি পরিবর্তন করার মতই। এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় তার জন্য আবশ্যকীয় হলো, মালিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

ولو خلط الغاصب دراهم الغصب بدراهم نفسه خلطا لا يتميز ضمن مثلها وملك المخلوط ؛ لأنه أتلفها

---

[৪৬৭] ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়্যাহ: ১৮/১৫৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ। আল্লামা আবুল ফযল মাজদুদ্দীন মাওসিলী রাহ. বলেন:

(ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور) لأن الغالب في مالهم الحرمة. قال: (إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال) بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به، لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام والمعتبر الغالب، وكذلك أكل طعامهم. (الاختيار لتعليل المختار ٤/٥٠، كتاب الكراهية، باب الكسب)

بالخلط.

"যদি গাসিব গসবকৃত মুদ্রা নিজস্ব মুদ্রার সাথে এমনভাবে মিশ্রিত করে যে, তা পৃথক করা সম্ভব নয়, তাহলে গসবকৃত দিরহামে তার অবৈধ মালিকানা চলে আসবে এবং উক্ত অর্থের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ তার উপর আবশ্যক হবে। কারণ, সে গসবকৃত মুদ্রাকে অন্য মুদ্রার সাথে মিশ্রিত করার মাধ্যমে এক প্রকার ধ্বংস করে দিয়েছে।"[৪৬৮]

এ ধরণের হালাল-হারাম মিশ্রিত সম্পদের বিধান হলো, যদি তার কতটুকু অংশ হালাল বা কতটুকু হারাম তা জানা থাকে, তাহলে হালালের অংশ পরিমাণ সম্পদ বৈধ সম্পদের ন্যায় ব্যবহার করা যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন-

غصب عشرة دنانير، فألقي فيها ديناراً، ثم أعطي منه رجلا ديناراً جاز، ثم ديناراً آخر، لا.

"যদি কেউ দশ দিনার গসব করে এবং গসবকৃত দিনারের মাঝে তার নিজস্ব একটি দিনার ফেলে দেয় অতঃপর কাউকে সেখান থেকে এক দিনার দেয় তাহলে তা জায়েয (এবং ঐ ব্যক্তিও তা গ্রহণ করতে পারবে); তবে এরপর যদি আরেক দিনার দেয় তাহলে তা জায়েয হবে না।"[৪৬৯]

আর যদি উক্ত হারাম সম্পদ গসবকারীর অনিচ্ছায় অন্য কোনোভাবে তার বৈধ সম্পদের সাথে মিশে যায়, তাহলে এক্ষেত্রে গসবকারী উক্ত সম্পদের হারাম অংশের মালিক হবে না; বরং এক্ষেত্রে তা (গসবকারী ও হারাম সম্পদের মালিকের মাঝে) শরীকী সম্পদে পরিণত হবে।

আল্লামা আবু বকর কাসানী রাহ. বলেন-

ولو اختلطت دراهم الغصب بدراهم نفسه بغير صنعه، فلا يضمن وهو شريك للمغصوب منه؛ لأن الاختلاط من غير صنعه هلاك، وليس بإهلاك، فصار كما لو تلفت بنفسها وصارا شريكين لاختلاط الملكين على وجه لا يتميز.

"যদি গসবকৃত মুদ্রা গাসিবের কোনো হস্তক্ষেপ ব্যতীত তার অন্য দিরহামের সাথে মিশে যায়, তাহলে ইচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপের মত সব মুদ্রার মালিক গসবকারী হবে না (সেক্ষেত্রে তার কর্তব্য হলো, ক্ষতিপূরণ আদায় করা) কিন্তু এখানে মিশ্রিত মুদ্রা গসবকারী এবং যার থেকে গসব করা হয়েছে, উভয়ের মাঝে শরীকী সম্পদে পরিণত হবে এবং (অন্য মুদ্রা দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করলে চলবে না; বরং হুবহু ঐ (মিশ্রিত শরীকী) মুদ্রা থেকেই তার অংশ পরিমাণ ফিরিয়ে দিতে হবে। এখানে উক্ত মিশ্রিত মুদ্রা শরীকী হয়ে যাওয়ার কারণ হলো, এখানে দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন মুদ্রা এমনভাবে মিশ্রিত হয়েছে যে, তা পৃথক করা সম্ভব নয়। মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার কারণে গসবকৃত মুদ্রা ফেরত দেয়ার কোনো উপায় নেই। কারণ, তা এক প্রকার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আবার সে নিজ থেকে মিশ্রণ ঘটায়নি বা ধ্বংস করেনি। এজন্য অবৈধ মালিকানা এবং যামান-এর বিধানও প্রযোজ্য হবে না। কেননা কারো কোনো হস্তক্ষেপ ব্যতীত দিরহামগুলো অন্র দিরহামের সাথে মিশ্রণ হওয়াটা নিজে নিজেই ধ্বংস হওয়ার নামান্তর। এটাকে ধ্বংস করে দেওয়া বলা যাবে না। সুতরাং তা নিজেই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ন্যায়। আর মালিক

---

[৪৬৮] বাদায়েউস সানায়ে: ১০/৬৬, দারুল হাদীস, কায়রো

[৪৬৯] ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ: ১৬/৫০৯, (গসবের অধ্যায়, নবম পরিচ্ছেদ)

ও গসবকারী উভয়ে উক্ত দিরহামের মাঝে শরীক হবে। কেননা তাদের উভয়ের মালিকানা বস্তু এমনভাবে মিশ্রিত হয়েছে যে, পার্থক্য করা সম্ভব নয়।"[৪৭০]

খ. বিভিন্ন জন থেকে গৃহীত মিশ্রিত হারাম সম্পদ

পূর্বে আমরা হালাল-হারাম মিশ্রিত সম্পদের ব্যাপারে জেনেছি যে, তা থেকে হালাল অংশের পরিমাণ ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু যদি গসবকারী একাধিক জন থেকে আত্মসাৎকৃত অর্থ একসাথে মিশ্রিত করে ফেলে, তাহলে তার বিধান ভিন্ন। কারণ, এখানে পুরোটাই অমালিকানাধীন হারাম সম্পদ। তাই এর উপর হারাম সম্পদের বিধানই প্রযোজ্য হবে।

অমিশ্রিত হারাম সম্পদের মতোই আত্মসাৎকারী বা অন্য কারো জন্য তা ব্যবহার করা বা তা থেকে কোনোভাবে উপকৃত হওয়া অথবা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে না। তবে অমিশ্রিত হারাম সম্পদের সাথে এর পার্থক্য হলো, মিশ্রণের কারণে আলোচ্য ক্ষেত্রে হারাম সম্পদে অর্জনকারীর অবৈধ মালিকানা চলে আসে, যেমনটি পূর্বে আমরা হারাম সম্পদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছিলাম।

আলোচ্য বিষয়ে এটি ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মত। পরবর্তী অনেক মাশাইখ এ মত অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করেছেন। যেমন, ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনুল ফাযল রাহ. এবং ফকীহ আবুল লাইস রাহ.।

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ-এ 'আল হাভী লিল ফাতাওয়া'-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে-

وسئل أبو بكر عن الذي لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن يقبل جائزة السلطان ويفرقها على من يحل له أو لا يقبل، قال لا يقبل؛ لأنه يشبه أخذ الصدقة قيل: أليس إن أبا نصير أخذ جائزة إسحاق بن أحمد وإسماعيل؟ قال كانت لهما أموال ورثاها عن أبيهما فقيل: له لو أن فقيرا يأخذ جائزة السلطان مع علمه أن السلطان يأخذها غصبا أيحل له؟ قال إن خلط ذلك بدراهم أخرى، فإنه لا بأس به، وإن دفع عين المغصوب من غير خلط لم يجز قال الفقيه – رحمه الله تعالى – هذا الجواب خرج على قياس قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – لأن من أصله أن الدراهم المغصوبة من أناس متى خلط البعض بالبعض، فقد ملكها الغاصب ووجب عليه مثل ما غصب وقالا لا يملك تلك الدراهم وهي على ملك صاحبها فلا يحل له الأخذ، كذا في الحاوي للفتاوى.

"ইমাম আবু বকর রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যদি কোনো ফকীর বাদশাহ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে, অথচ সে জানে যে, বাদশাহ এসব সম্পদ মানুষ থেকে আত্মসাৎ করেছে, তাহলে তা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে কি? তিনি উত্তর দিলেন, যদি বাদশাহ অবৈধভাবে অর্জিত দিরহামগুলো তার বৈধ দিরহামের সাথে মিশ্রিত করে ফেলে, তাহলে ফকীরের জন্য বাদশাহর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ হবে। আর যদি বাদশাহ হুবহু গসবকৃত দিরহামগুলোই ফকীরকে দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

ফকীহ রাহ. বলেন, উপরোল্লিখিত জবাব ইমাম আবু হানীফার মতের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে। কেননা গসবকৃত সম্পদের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মূলনীতি হলো,

---

[৪৭০] বাদায়েউস সানায়ে: ৬/১৬৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

গসবকৃত দিরহাম অন্য দিরহামের সাথে মিশ্রিত করলে গসবকারী তার মালিক হয়ে যায় এবং তার উপর গসবকৃত দিরহামের সমশ্রেণীর মুদ্রা দ্বারা যামান (ক্ষতিপূরণ) আদায় করা আবশ্যক হয়।

আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন, গসবকারী গসবকৃত দিরহামগুলোর মালিক হবে না; বরং প্রকৃত মালিকই উক্ত দিরহামগুলোর মালিক থাকবে। সুতরাং ফকীরের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না।"[৪৭১]

আল্লামা তাহের ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুর রশীদ বুখারী রাহ. বলেন-

.... وأن لم يكن من موروث، لكن من غصب غصبه إن كان لم يخلطه بدراهم أخرى لا يحل، وإن خلط لابأس به لأنه صار ملكا له بالخلط عند أبي حنيفة ؒ، **وقوله أرفق للناس، إذا أمواله لا يخلو عن غصب،**

"...... গসবকৃত দিরহাম অন্য দিরহামের সাথে মিশ্রিত করলে গসবকারী তার মালিক হয়ে যায় (যদিও এটা তার জন্য অবৈধ)। এটাই ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর অভিমত। এ মতটি মানুষের জন্য বেশি সহজ। কারণ, মানুষের সম্পদ সাধারণত কিঞ্চিত গসব থেকে মুক্ত থাকে না।"[৪৭২]

তবে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ., ইমাম মুহাম্মদ রাহ. ও বাকি তিন ইমাম রাহ.-এর মতে আলোচ্য মাসআলার বিধানও নিরেট হারাম মালের মতো। অর্থাৎ, এতে আত্মসাৎকারীর কোনো ধরনের মালিকানা আসবে না। তবে যাদের সম্পদের মাঝে মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে, তাদের মাঝে শরীকী সম্পদে পরিণত হবে।

শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. বলেন-

فإن غصب من واحد حنطة، ومن آخر شعيرا فخلطهما ضمن لكل واحد منهما ما غصب منه؛ لأنه تعذر على كل واحد منهما الوصول إلى عين ملكه، فإن تمييز الحنطة من الشعير متعسر، والمتعسر كالمتعذر، والمتعذر كالممتنع، ولم يبين في الكتاب حكم المخلوط، فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - المخلوط يصير ملكا للخالط سواء خلط الحنطة بالحنطة أو بالشعير، وعلى قول أبي يوسف ومحمد لهما الخيار إن شاء أخذا المخلوط فكان مشتركا بينهما بقدر ملكهما، وإن شاء تركا المخلوط، وضمن كل واحد منهما الخالط مثل ماله.

"যদি কোনো ব্যক্তি একজন থেকে গম এবং অন্যজন থেকে যব গসব করে মিশ্রণ করে ফেলে, তাহলে যার নিকট হতে যে বস্তু গসব করেছে তাকে সেই বস্তুর যামান দিবে। কেননা এক্ষেত্রে তাদের জন্য সরাসরি গসবকৃত বস্তু উসূল করা সম্ভব নয়। কারণ, গমকে যব থেকে ভিন্ন করা কষ্টকর। আর কষ্টকর কাজ বিধানের দিক থেকে অসাধ্য কাজের ন্যায়।

একাধিক জন থেকে গসব করার পর তাদের সম্পদ মিশ্রিত করা হলে, ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর মতে, তা গসবকারীর (অবৈধ) মালিকানায় চলে আসে।....

[৪৭১] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ: ৫/৩৯৬, (কিতাবুল কারাহিয়া ১২নং অধ্যায়)

[৪৭২] খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ১/২৪৫, (যাকাত অধ্যায়, নবম পরিচ্ছেদ)

তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মতে মিশ্রিত বস্তু যাদের থেকে গসব করা হয়েছে, তাদের মাঝে অংশীদারি সম্পদে পরিণত হবে। তারা ইচ্ছা করলে তা হুবহু মিশ্রিত অবস্থায় ফেরত নিয়ে নিতে পারে, অথবা যামান বা ক্ষতিপূরণও নিতে পারে।"[৪৭৩]

যদি নির্দিষ্টভাবে জানা না যায়

পূর্বে আমরা দেখেছি যে, কোনো ব্যক্তির অর্থসম্পদে হালাল-হারাম উভয়টি থাকলে, সেক্ষেত্রে মিশ্রিত এবং অমিশ্রিত অবস্থার মাঝে বিধানগত পার্থক্য রয়েছে। এছাড়াও মিশ্রিত হলে তা অন্য হারামের সাথে মিশ্রিত নাকি তার বৈধ সম্পদের সাথে মিশ্রিত, এর ভিত্তিতেও বিধানের মাঝে ভিন্নতা আছে। আমরা আরো জেনেছি যে, উপরোল্লিখিত বিধান হারাম মালের অধিকারীর জন্য যেমন প্রযোজ্য হবে, তেমনিভাবে তার সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্যদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

আমরা জানি, কখনো কখনো হারাম মালের অধিকারীর অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না যে, তা মিশ্রিত নাকি অমিশ্রিত, তাতে হালাল অধিক না হারাম অধিক। এক্ষেত্রে তার সাথে বৈধতার মূলনীতির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে এবং তার হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে। কারণ, লেনদেনের ক্ষেত্রে শরী'আতের মূলনীতি হলো, হারাম প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত হালাল বা বৈধতা ধর্তব্য হবে।

হযরত যুর ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণনা করেন-

جاء إليه رجل فقال إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني فقال مهنأه لك وإثمه عليه قال سفيان فإن عرفته بعينه فلا تصبه.

"এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর নিকট এসে বলল, আমার একজন সুদখোর প্রতিবেশী আছে। সে সর্বদা আমাকে দাওয়াত দেয় (আমি কি তার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করবো)? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বললেন, তার দাওয়াত বা হাদিয়া তোমার জন্য গ্রহণ করা বৈধ। হাদিয়াকৃত বস্তু অবৈধ হলে এর গুনাহ বর্তাবে তার উপর।

হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহ. বলেন, যদি জানা যায় যে, এটা সরাসরি গসবকৃত দিরহাম, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ নয়।"[৪৭৪]

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. কিতাবুল আসার-এ বর্ণনা করেন-

أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا محمد بن قيس أن أبا العوجاء العشار كان صديقا لمسروق، فكان يدعو، فيأكل من طعامه ويشرب من شرابه، ولايسأله.

قال محمد: وبه نأخذ، ولا بأس بذلك ما لم يعرف خبيثا بعينه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

"ইমাম আবু হানীফা রাহ. বর্ণনা করেন, আবুল আওজা আশশার মাসরুক রাহ.-এর বন্ধু ছিলো। আবুল আওজা তাঁকে দাওয়াত দিতো। মাসরুক রাহ. তার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতেন এবং তার খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করতেন। এমনকি মাসরুক রাহ. তাকে তার উপার্জনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করতেন না।

[৪৭৩] আল মাবসূত: ১১/৯১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[৪৭৪] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক: ১৪৬৭৫

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন, আমাদের মত এটাই। অর্থাৎ, যদি দাওয়াতদাতা সরাসরি হারাম সম্পদ দ্বারা দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছে বলে নিশ্চিতভাবে জানা না যায়, তাহলে তার দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। এটাই ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর অভিমত।"[৪৭৫]

হ্যাঁ, যদি লেনদেনকারী জানে যে, তার কাছে হালাল-হারাম সম্পদ সম্পূর্ণ মিশ্রিতভাবে রয়েছে, তাহলে হালাল অংশ পরিমাণ লেনদেন করবে। হাদিয়া গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয় থাকবে।

আর যদি জানে যে, তা অমিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে, তাহলে আধিক্যের ভিত্তিতে লেনদেন করবে, যেমনটি বিস্তারিত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর কোনো সম্পদ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে যদি জানে যে, এটা হারাম, তাহলে তো তা গ্রহণ করা কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়।

হারাম সম্পদ থেকে অর্জিত সম্পদ ও মুনাফার বিধান

আমরা জেনেছি যে, অমালিকানাধীন হারাম সম্পদে আহরণকারীর কোনো ধরনের বৈধ অধিকার ও মালিকানা নেই। তাই যদি সে তা ভাড়া দিয়ে বা বিক্রয় করে অথবা অন্য কোনো পন্থায় মুনাফা অর্জন করে, তাহলে ঐ মুনাফা কোনোভাবে ভোগ বা ব্যবহার করা তার জন্য বৈধ হবে না। সুতরাং সে হয়তো তা মালিককে দিয়ে দিবে অথবা সাদকা করবে।

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ-এ উল্লেখ আছে-

كالغاصب إذا آجر وقبض الأجر يتصدق أو يرده على المغصوب منه.

"যেমন, গসবকারী যদি গসবকৃত বস্তু ভাড়া দিয়ে ভাড়ার বিনিময় গ্রহণ করে, তাহলে তা সাদকা করবে বা মালিকের নিকট ফেরত দিবে।"[৪৭৬]

এটা হলো যামান আদায়ের পূর্বে। আর যদি যামান বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পর লাভ অর্জন হয়, তাহলে তো তা ফকীহগণের ঐকমত্যে তার জন্য বৈধ। কারণ, যামান আদায়ের পর গসবকৃত সম্পদ তার মালিকানাধীন সম্পদে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সে এই সম্পদ থেকে যেকোনোভাবে উপকৃত এবং লাভবান হতে পারে।

উপরোক্ত দুই অবস্থার মাঝে আরেকটি অবস্থা রয়েছে। তা হলো, যদি গসবকারী অমালিকানাধীন হারাম সম্পদ থেকে মুনাফা অর্জন করার পর তার যামান আদায় করে, তাহলে তার বিধান কী হবে?

এ ধরনের মুনাফার ক্ষেত্রে জটিলতা হলো, এ মুনাফা একদিকে যামান আদায়ের পূর্বের অমালিকানাধীন হারাম মাল হতে উপার্জিত মুনাফা। তাই এটা বৈধ হবার কথা নয়। আবার পরবর্তীতে যামান আদায় করা হয়েছে। আর যামান আদায়ের ব্যাপারে ফকীহগণ বলেন যে, তা আদায় করলে গসবের সময় থেকে নিয়ে গসবকারী তার মালিক বলে বিবেচিত হয়। শেষোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. বলেন যে, উক্ত হারাম মুনাফা যামান আদায়ের পর হালাল মুনাফায় পরিণত হবে।

---

[৪৭৫] কিতাবুল আসার: ১৯৯ (দাওয়াত অধ্যায়)

[৪৭৬] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ: ৫/৪২৬, মকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

আর প্রথমোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম আ'যম রাহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেছেন যে, এই মুনাফা আর তার জন্য হালাল হবে না; বরং তা প্রথম প্রকার তথা যামান আদায় না করার অবস্থার মতোই তার জন্য হারাম থেকে যাবে। কারণ, যদিও গসবকৃত সম্পদের যামান আদায়ের পর পূর্ববর্তী সময় থেকেই গাসিবের মালিকানা ধরা হয়, তবে ঐ মালিকানা বিভিন্ন দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, তা বাস্তবে গসবের সময় ছিলো না। আর মালিকানা ধরা হলেও হারাম উপায়েই এই মুনাফা নিশ্চিতভাবে অর্জিত হয়েছে। সুতরাং তার জন্য এই মুনাফা সাদকা করে দিতে হবে অথবা মালিককে ফেরত দিতে হবে।[৪৭৭] আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

ولو غصب أرضا فزرعها كرا فنقصتها الزراعة، وأخرجت ثلاثة أكرار، يغرم النقصان ويأخذ رأس المال، ويتصدق بالفضل أما ضمان النقصان فلأن الغاصب نقص الأرض بالزراعة، وذلك إتلاف منه، والعقار مضمون بالإتلاف بلا خلاف.

وأما التصدق بالفضل، فلحصوله بسبب خبيث، وهي الزراعة في أرض الغصب، وإن كان البذر ملكا له، ويطيب له قدر النقصان وقدر البذر لما ذكرنا أن النهي ورد عن الربح، وذا ليس بربح، فلم يحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وعلى هذا يخرج ما إذا غصب ألفا فاشترى جارية فباعها بألفين، ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف أنه يتصدق بجميع الربح في قولهما، وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يلزمه التصدق بشيء؛ لأنه ربح مضمون مملوك؛ لأنه عند أداء الضمان يملكه مستندا إلى وقت الغصب ومجرد الضمان يكفي للطيب، فكيف إذا اجتمع الضمان والملك وهما يقولان: الطيب كما لا يثبت بدون الضمان لا يثبت بدون الملك

من طريق الأولى، وفي هذا الملك شبهة العدم على ما بينا فيما تقدم، فلا يفيد الطيب.

"যদি কেউ কোনো জমি জবরদখল করে তাতে এক কুর পরিমাণ কোনো শস্যচাষ করে যার ফলে জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জমি থেকে তিন কুর পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়, তাহলে গসবকারী জমির ক্ষতি পরিমাণ জরিমানা আদায় করবে এবং তার মূল সম্পদ (এক কুর পরিমাণ শস্য) নিয়ে অতিরিক্ত (দুই কুর পরিমাণ শস্য) সাদকা করবে।

জরিমানা আদায় করার কারণ হলো গাসিব জমি চাষের দ্বারা জমিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এটা তার পক্ষ হতে ইতলাফ বা অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে নষ্ট বা ধ্বংস করার মতো। আর জমিকে নষ্ট করলে সর্বসম্মতিক্রমে তার জরিমানা আদায় করতে হয়।

আর অতিরিক্ত উৎপাদিত ফসল সাদকা করার কারণ হলো, তা খবীস (অবৈধ) পন্থায় অর্থাৎ, মালিকের অনুমতি ব্যতীত চাষাবাদের দ্বারা অর্জিত হয়েছে। যদি গসবকারী বীজের মালিক হয়, তাহলে যে পরিমাণ জরিমানা আদায় করেছে তা এবং বীজ হালাল হবে। কারণ, গসবকারীর জন্য গসবকৃত মুনাফা ভোগ করা হারাম; কিন্তু এখানে মূল বীজ এবং জরিমানা পরিমাণ শস্য

---

[৪৭৭] তবে মূল সম্পদ যামান আদায়ের পর সকলের ঐকমত্যে বৈধ হয়ে যাবে। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মুনাফার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তা হারাম হবে না।

এই মাসআলার আলোকে আরেকটি মাসআলা বের হয়ে আসে। তা হলো- কেউ এক হাজার দিরহাম আত্মসাৎ করলো এবং তা দ্বারা একটি বাঁদী ক্রয় করলো। অতঃপর তা দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলো এবং ঐ দুই হাজার দিরহাম দ্বারা আরেকটি বাঁদী ক্রয় করলো। তারপর সে শেষোক্ত বাঁদীকে তিন হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলো। এ অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা রাহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মতানুযায়ী তাকে অর্জিত সকল মুনাফা সাদকা করে দিতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মতে পরবর্তীতে যামান আদায় করে দিলে কোনো মুনাফা সাদকা করতে হবে না। কারণ, এই মুনাফার প্রায়শ্চিত্ত দেয়া হয়েছে এবং সে বর্তমানে এর মালিক। কারণ, যামান আদায়ের ক্ষেত্রে গসবের সময় থেকে নিয়েই যে বস্তুর যামান আদায় করা হয়েছে তা আদায়কারীর মালিকানাধীন বিবেচিত হয়। হালাল হওয়ার জন্য শুধু যামানই যথেষ্ট। আর এখানে তো এর সাথে মিলক (মালিকানা)-ও পাওয়া যাচ্ছে (কারণ, তাকে পূর্বে থেকেই মালিক ধরা হচ্ছে)।

তবে ইমাম আ'যম রাহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন, যামান ছাড়া যেমন কোনো বস্তু হালাল হয় না, তেমনি মিলক (মালিকানা) ছাড়াও হালাল হয় না। এখানে যে মিলকের বিবেচনা করা হচ্ছে তা এক হিসেবে না থাকার মতোই (কারণ, এই বিবেচনা করা হচ্ছে আলোচ্য অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর)। পূর্বে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে (শস্যের ক্ষেত্রে মুনাফা সাদকা করার প্রসঙ্গে)। সুতরাং এ মুনাফা হালাল হবে না।"[৪৭৮]

মুনাফা সম্পর্কে আরো কিছু বিষয় পূর্বে হারাম পণ্য ও মুদ্রার লেনদেনের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

হারাম মাল ও তা থেকে অর্জিত মুনাফার সঠিক মাসরিফ (ব্যয়খাত)

অমালিকানাধীন হারাম মাল ও তা থেকে অর্জিত মুনাফা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পড়ে এসেছি। এখন যদি কারো কাছে এমন হারাম মাল এসে যায় এবং সে তা ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করে, তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? পূর্বে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা বিষয়টি আরো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

প্রথমেই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, হারাম মাল গ্রহীতা দু'ধরনের হতে পারে:

ক. ধনী ব্যক্তি, যার যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে।

খ. গরীব ব্যক্তি।

আলোচ্য হারাম মালও দু'ধরনের হতে পারে:

ক. মূল হারাম মাল;

খ. মূল হারাম মাল থেকে অর্জিত মুনাফা।

আমরা পূর্বে পড়ে এসেছি যে, মূল অমালিকানাধীন হারাম সম্পদের ক্ষেত্রে করণীয় হলো, তা প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়া। কোনো কারণে মালিককে ফেরত দেওয়া সম্ভব না হলে তা সাদকা করা জরুরী। আর অমালিকানাধীন সম্পদ থেকে অর্জিত মুনাফার ব্যাপারে আমরা

---

[৪৭৮] বাদায়েউস সানায়ে: ১০/৩৮, দারুল হাদীস, কায়রো

জেনেছি যে, তা মূল সম্পদের মালিককে ফেরত দেওয়া বা সাদকা করার মাঝে এখতিয়ার রয়েছে।[৪৭৯] অমালিকানাধীন হারাম সম্পদ সাদকা করার শর'য়ী দলীল সম্পর্কেও আমরা অবগত হয়েছি।

মূলত হারাম মালের প্রকৃত মালিক খুঁজে না পাওয়া গেলে বা তা মালিকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব না হলে তা লুকাতা বা কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের হুকুমে চলে যায়। আর লুকাতার মালের ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত বিধান হলো তা (মালিককে ফেরত দেয়া সম্ভব না হলে) সাদকা করতে হবে।

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. এক্ষেত্রে হারাম মালের সাথে লুকাতার মালের তুলনা করে বলেন-

حق الفقراء في هذا المال بمنزلة حقهم في اللقطة

"যে কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের মালিক খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, তাতে যেমন দরিদ্রেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি হারাম সম্পদ যা মালিকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব নয়, তাতেও দরিদ্রদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।"[৪৮০]

এ প্রসঙ্গে ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ-এ উল্লেখ আছে-

وإنما طاب للمساكين على قياس اللقطة، قال: وهذا الربح لا يطيب لهذا المشتري، وإن كان فقيرا لأنه يكتسبه بمعصية ويطيب للمساكين وهو أطيب لهم من اللقطة، وإن لم يتصدق بالربح حتى عمل الثمن وربح ربحا وبيعت فيها بيوع كلها ربح قال يتصدق بالفضل في جميع ذلك ولو غصب مالا أو عمل بوديعة أو مضاربة وخالف فيها وربح يتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى –[৪৮১]

লুকাতার মতো এখানেও সাদকার ক্ষেত্রে যাকাত বা অন্যান্য ওয়াজিব সাদকার যারা মাসরিফ রয়েছে, তারাই এ মালের মাসরিফ (ব্যয়ক্ষেত্র) হবে। সুতরাং উক্ত হারাম মাল হস্তগতকারীর কর্তব্য হলো, তা সঠিক মাসরিফ তথা গরীব-মিসকিনদের নিকট পৌঁছে দেয়া। তবে (লুকাতার মতো) যদি হারাম অর্জনকারী নিজেই মাসরিফ হয়, অর্থাৎ, সে যদি এতটাই গরীব হয় যে, যাকাত গ্রহণের হক রাখে, তাহলে সে নিজের কাছে উক্ত সম্পদ রেখে দিতে পারবে।

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. পূর্বোক্ত আলোচনার পর বলেন-

ثم الملتقط إذا كان محتاجا فله أن يصرف اللقطة إلى حاجة نفسه بخلاف ما إذا كان غنيا فكذلك حكم هذه الغلة.

"গরীব ব্যক্তি কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে (অর্থাৎ, যদি মালিককে ফেরত দেয়া সম্ভব না হয়)। ধনীর জন্য এই সুযোগ নেই। একই বিধান হারাম সম্পদ থেকে অর্জিত মুনাফারও।"[৪৮২]

আল্লামা মাজদুদ্দীন মাওসিলী রাহ.বলেন-

---

[৪৭৯] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ-এ উল্লেখ আছে- كالغاصب إذا آجر وقبض الأجر يتصدق أو يرده على المغصوب منه.

[৪৮০] আল মাবসূত: ১১/৭৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[৪৮১] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাহ: ৩/৯৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৮২] আল মাবসূত: ১১/৭৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

ولهما أنه حصل بسبب خبيث، وهو التصرف في ملك الغير، والفرع يحصل على صفة الأصل، والملك الخبيث سبيله التصدق به، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز. ثم إن كان غنيا تصدق بمثله، وإن كان فقيرا لا يتصدق.

"আর অবৈধ সম্পদের ক্ষেত্রে করণীয় হলো, তা সাদকা করা। যদি ধনী ব্যক্তি এ ধরনের সম্পদ নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে ফেলে, তাহলে সে পরিমাণ সম্পদ সাদকা করতে হবে। আর যদি সে গরীব হয়, তাহলে সাদকা করার প্রয়োজন নেই।"[৪৮৩]

ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

إلا إذا كان لا يجد غيره؛ لأنه محتاج إليه، فله أن يصرفه إلى حاجة نفسه، فلو أصاب مالا يتصدق بمثله إن كان غنيا وقت الاستعمال، وإن كان فقيرا فلا شيء عليه لما ذكرنا.

"যদি তার কাছে ঐ সম্পদ ব্যতীত আর কোনো কিছুই না থাকে, তাহলে সে তা ব্যবহার করতে পারবে। কারণ, সে মুহতাজ ব্যক্তি। সুতরাং তার জন্য নিজ হাজত বা প্রয়োজনে তা খরচ করার অবকাশ রয়েছে। পরবর্তীতে তার হাতে মাল আসলে বিধান হলো- যদি (কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর মতো) ব্যবহারের সময় সে ধনী থাকে, তাহলে যে পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করেছে তা সাদকা করবে। আর যদি গরীব হয়, তাহলে সাদকা করতে হবে না।"[৪৮৪]

লুকাতা-এর ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, লুকাতা'র সংগ্রহকারী যদি ধনী হয়, তাহলে সে উক্ত সাদকাযোগ্য কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ সাময়িকভাবে কাযীর অনুমতি সাপেক্ষে কর্জ হিসেবে[৪৮৫] ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে তা ফকীরদেরকে সাদকা হিসেবে দিয়ে দিতে হবে। পূর্বে আমরা আল্লামা মারগীনানী রাহ. এবং আল্লামা মাওসিলী রাহ.-এর ভাষ্যে দেখেছি যে, তারা আলোচ্য মাসআলার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান বর্ণনা করেছেন।

বর্তমানে প্রায়ই এমন হয় যে, কোনো ব্যক্তি দীর্ঘসময় ধরে হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে। পরিশেষে সে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা-ইস্তিগফার করে। তবে তার পক্ষে উক্ত সম্পদ মালিককে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হয় না। এ ধরনের ব্যক্তির যদি এমন অবস্থা হয় যে, তার কাছে তার নিজের এবং পরিবারের খরচ মেটানোর মতো হালাল অর্থই নেই, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে শর'য়ী পরিভাষায় ফকীর গণ্য করার সুযোগ আছে। কারণ, তার উপার্জিত সকল সম্পদই হারাম এবং অমালিকানাধীন। বাস্তবে তার নিজস্ব কোনো সম্পদই নেই।

ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবে এর কিছু নযির পাওয়া যায়। যেমন, ঐ জালিম শাসক, যার সকল অর্জিত সম্পদ হারাম, অথবা তার নিকট হালাল মাল থাকলে পূর্বে অর্জিত হারাম মালের সাদকা করতে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে- এ ধরনের শাসকের ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, তাদেরকে যাকাতের মাল দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ, তারাও এক ধরনের ফকীর।

---

[৪৮৩] আল ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার: ৩/৮৩, দারুল হাদীস, কায়রো

[৪৮৪] আল হিদায়া: ৩/৩৭৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৪৮৫] রদ্দুল মুহতার, লুকাতা'র অধ্যায়। কাযীর অনুমতিতে করণীয় প্রসঙ্গে দেখুন, এই বইয়ের 'ওয়াক্‌ফ: কিছু মৌলিক ও জরুরী আহকাম' প্রবন্ধের 'শর'য়ী প্রয়োজনে ওয়াক্‌ফকৃত জমি বিক্রয় ও বদলানো' শীর্ষক আলোচনা।

ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

والأصح أنه يسقط ذلك عن جميع أرباب الأموال إذا نووا بالدفع التصدق عليهم لأن ما في أيديهم من أموال المسلمين وما عليهم من التبعات فوق مالهم فلو ردوا ما عليهم لم يبق في أيديهم شيء فهم بمنزلة الفقراء حتى قال محمد بن سلمة يجوز أخذ الصدقة لعلي بن عيسى بن يونس بن ماهان وإلي خراسان وكان أميرا ببلخ وجب عليه كفارة يمين فسأل عنها الفقهاء.

"বিশুদ্ধতর অভিমত হলো, এক্ষেত্রে সাদকা তথা যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। (কারণ, এ ধরনের জালেম শাসক এক প্রকার ফকীর) কারণ, তাদের ঘাড়ে মুসলমানদের থেকে আত্মসাৎকৃত এ পরিমাণ সম্পদ আছে যে, তা আদায় করতে গেলে তাদের নিজস্ব সম্পদ কিছুই থাকবে না। এজন্য তারাও এক প্রকার ফকীর।....."[৪৮৬]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه وكذا ما دفع إلى كل جائر لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء والأول أحوط.

"তাদেরকে সাদকার নিয়তে দিলে সাদকা আদায় হয়ে যাবে। (এ ধরনের) অন্য জালেম শাসকদের ক্ষেত্রেও একই বিধান। কারণ, তাদের ঘাড়ে মানুষের প্রচুর দায় থাকায় তারাও ফকীর। তবে সতর্কতা হলো এর উপর নির্ভর না করা (বরং যাকাত পুনরায় আদায় করা)।"[৪৮৭]

সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তির জন্য উপরোক্ত অবস্থায় নেসাব পরিমাণ সম্পদ অর্জনের আগ পর্যন্ত উক্ত হারাম মাল থেকে তার প্রয়োজন পরিমাণ খরচ ও ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে। তবে তার জন্য নিতান্ত আবশ্যক হলো, এ ধরনের সম্পদের উপর নির্ভর না করা। প্রয়োজন পরিমাণ নিলেও তাকে হালাল সম্পদ উপার্জন করার জন্যই সচেষ্ট থাকতে হবে। হালাল সম্পদ অর্জনের পর তার জন্য খরচকৃত হারাম সম্পদের পরিমাণ সাদকা করাও পছন্দনীয়।

এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, উপরোক্ত অবকাশের বিধান প্রযোজ্য হবে সাদকাযোগ্য মালে হারামের ক্ষেত্রে। যে সম্পদ মালিককে ফেরত দেয়া আবশ্যক, তা কোনো অবস্থায়ই নিজের কাছে রেখে দেয়া যাবে না। বিষয়টি পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট।

অমালিকানাধীন হারাম মালের বিধান সম্পর্কে আমরা জানলাম। স্মরণ রাখার সুবিধার্থে নিম্নে হারাম মাল সম্পর্কে কী করণীয়- তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

হারাম মাল থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করতে হবে। আর তওবার পূর্ণতা হলো, যদি মালিকের সম্মতি ব্যতীত গ্রহণ করে থাকে তাহলে-

ক. মালিক বা তার ওয়ারিশদেরকে তা হুবহু ফিরিয়ে দিতে হবে।

খ. হুবহু ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না হলে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

গ. অথবা মালিক থেকে ক্ষমা গ্রহণ করতে হবে।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন-

---

[৪৮৬] আল মাবসূত: ২/১৮০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[৪৮৭] আল হিদায়া: ২/১৯৩, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্য কোনো ভাইয়ের সম্মান বা সম্পদ হরণ করেছে, সে যেন আজই অপরের অধিকারের দায়ভার থেকে মুক্ত হয়ে যায় (অর্থাৎ, তার থেকে মাফ চেয়ে নেয় অথবা তাকে তার প্রাপ্য সম্পদ ফেরত দেয়)। ঐ দিন আসার পূর্বেই যেদিন সে কোনো দীনার-দিরহামের মালিক থাকবে না।

(যদি সে অপরের অধিকারের দায় থেকে দুনিয়াতে মুক্ত না হয়) তাহলে (আখেরাতে) তার নেক আমল থেকে তার জুলুম পরিমাণ নিয়ে মজলুমকে দেয়া হবে। আর যদি তার নেক আমল না থাকে, তাহলে মজলুমের গুনাহগুলো তার আমলনামায় স্থানান্তর করা হবে।"[৪৮৮]

ঘ. আর তা সম্ভব না হলে মালিকের হক আদায়ের নিয়তে তার পক্ষ হতে সাদকা করতে হবে। যেন মালিক তার সম্পদের দ্বারা সরাসরি উপকৃত হতে না পারলেও ঐ সম্পদের সওয়াব অর্জনের মাধ্যমে হলেও উপকৃত হতে পারে।

মালিকানাধীন হারাম সম্পদের বিধান

পূর্বে আমরা পড়ে এসেছি যে, ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে বাই'য়ে ফাসিদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ **মালিকানাধীন** হারাম বিবেচিত হয়। এ ধরনের চুক্তির মাধ্যমে কোনো ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হলে উভয় পক্ষ মালিক হবে ঠিক; কিন্তু তাদের এই মালিকানা হবে অবৈধ ও ভেজালযুক্ত। এজন্য বাই'য়ে ফাসিদের মাধ্যমে ক্রয়কৃত সম্পদ ব্যবহার করা বৈধ নয়। আল্লামা আবু বকর কাসানী রাহ. এ ধরনের সম্পদ ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন-

(وأما) التصرف الذي فيه انتفاع بعين المملوك كأكل الطعام ولبس الثوب وركوب الدابة وسكنى الدار والاستمتاع بالجارية فالصحيح أنه لا يحل ؛ لأن الثابت بهذا البيع ملك خبيث والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع ؛ لأنه واجب الرفع وفي الانتفاع به تقرر له وفيه تقرير الفساد ، ولهذا لم يفد الملك قبل القبض تحرزا عن تقرير الفساد بالتسليم.

"ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত মালিকানাধীন বস্তু থেকে সরাসরি উপকৃত হওয়া, যেমন, ক্রয়কৃত বস্তু খাদ্য হলে তা ভক্ষণ করা, কাপড় হলে পরিধান করা, সওয়ারি হলে আরোহণ করা, বাড়ি হলে অবস্থান করা, বাঁদী হলে উপভোগ করা- বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী বৈধ নয়। কেননা ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অবৈধ মালিকানা অর্জন হয়। আর অবৈধ মালিকানার দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। এজন্য ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়কে রহিত করা ওয়াজিব।

আর এ ধরনের চুক্তির দ্বারা অর্জিত বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার অবকাশ রাখা হলে ফাসাদ (ত্রুটি) আরো স্থায়ী হয়ে যায়। এজন্যই কবযা করার পূর্বে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা অর্জিত বস্তুতে মালিকানা আসে না। যেন উক্ত ফাসাদ হস্তান্তরের দ্বারা স্থায়ী হওয়ার সুযোগ না হয়।"[৪৮৯]

বাই'য়ে ফাসিদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ব্যবহার করা যেমন অবৈধ, তেমনিভাবে উক্ত সম্পদ

---

[৪৮৮] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২৩৮৫, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা

[৪৮৯] বাদায়েউস সানায়ে: ৪/৫৯০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

দ্বারা কোনো ধরনের লেনদেন করাও অবৈধ। বরং এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, উক্ত অবৈধ চুক্তি প্রত্যাহার করে পুনরায় বৈধ পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদন করা। সুতরাং ক্রেতার জন্য উচিত হলো, ক্রীত বস্তু ফিরিয়ে দেয়া, আর বিক্রেতার কর্তব্য হলো, গৃহীত মুদ্রা ফেরত দেয়া।

তবে যেহেতু বাই'য়ে ফাসিদের দ্বারা মালিকানা (যদিও তা অবৈধ) অর্জিত হয়, তাই অর্জিত বস্তু বা মুদ্রা দ্বারা কোনো লেনদেন করে তা কার্যকর হবে। আর পুনর্বার লেনদেনের কারণে এক্ষেত্রে অপরের হক সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এজন্য প্রথমোক্ত ফাসিদ চুক্তি রহিত করার বাধ্যবাধকতা আর বাকি থাকে না।

ইমাম আবুল হাসান কুদুরী রাহ. বলেন-

وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه فإن باعه المشتري نفذ بيعه.

"বাই'য়ে ফাসিদের ক্ষেত্রে যদি পণ্য ও মূল্য উভয়টি (শরী'আতের দৃষ্টিতে) সম্পদ হয় এবং ক্রেতা বিক্রেতার অনুমতিতে পণ্য হস্তগত করে, তাহলে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যাবে। তবে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য চুক্তিটি রহিত করার অধিকার থাকবে। এমতাবস্থায় যদি ক্রেতা উক্ত পণ্য বিক্রয় করে, তাহলে তার বিক্রয় শুদ্ধ হবে।"[৪৯০]

সুতরাং **বাই'য়ে ফাসিদের ক্রেতা** যদি ক্রীত বস্তু বিক্রয় করে দেয়, তাহলে (যদিও তার জন্য এভাবে বিক্রয় করা নাজায়েয) বিক্রয় শুদ্ধ হবে এবং এর বিনিময়ে অর্জিত অর্থ তার জন্য বৈধ হবে। তবে **লাভ হলে তা সাদকা করা জরুরী**।

এখানে লক্ষণীয় যে, দ্বিতীয় ক্রেতা উক্ত বস্তুর পরিপূর্ণ মালিক হয়ে যাবে। কারণ, পূর্বে আমরা জেনেছি যে, এ ধরনের অবৈধ সম্পদ (লেনদেনের মাধ্যমে) হস্তান্তরের দ্বারা হালাল হয়ে যায়।

এমনিভাবে **বাই'য়ে ফাসিদের বিক্রেতা** যদি অর্জিত মুদ্রা দ্বারা কোনো কিছু ক্রয় করে, তাহলে সে ক্রীত বস্তুর মালিক হবে এবং উক্ত বস্তু ব্যবহার করতে পারবে। আর যদি সে এই বস্তু পুনর্বার বিক্রয় করে লাভও করে, তাহলেও ঐ **লাভ গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ হবে**।

আমরা এখানে বাই'য়ে ফাসিদের মাধ্যমে অর্জিত পণ্য ও মুদ্রা উভয়টির লেনদেনের বিধান সম্পর্কে জানলাম। আমরা আরো জানলাম যে, মুনাফার ক্ষেত্রে পণ্য ও মুদ্রার বিধানের মাঝে পার্থক্য রয়েছে।[৪৯১] এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন-

رجل اشترى جارية شراء فاسدا وتقابضا فباع الجارية وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن

---

[৪৯০] মুখতাসারুল কুদুরী: ১২৪-১২৫, মাকতাবাতুদ দা'ওয়া

[৪৯১] আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন:

والحاصل أن الحنث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب كما إذا ربح في المغصوب والأمانة، ولا فرق بين المتعين وغيره، **وإن كان لفساد الملك طاب فيما لا يتعين لا فيما يتعين**، ذكره الزيلعي في باب البيع الفاسد قال الأسيوطي: خرجت عن هذا الأصل مسألة وهي ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها ولو جنى جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه. وقد يجيء مثله في بعض العصابات يعقل ولا يرث. انتهى [الأشباه والنظاير: ١٧٦، مكتبة زكريا]

وكذلك رجل ادعى على آخر مالا فقضاه اياه وتصادقا انه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم رجل اشترى جارية في عنقها طوق قيمته الف مثقال وقيمة الجارية .
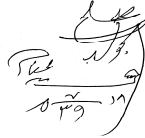
"কোনো ব্যক্তি ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে একটি বাঁদী ক্রয় করলো এবং উভয়পক্ষ (ক্রেতা-বিক্রেতা) পণ্য (বাঁদী) ও মূল্য হস্তগত করলো। এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি উক্ত বাঁদী বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে, তাহলে ঐ মুনাফা সাদকা করে দিতে হবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি আয়কৃত মুদ্রা দ্বারা (কোনো কিছু ক্রয় করার মাধ্যমে) মুনাফা অর্জন করে, তাহলে ঐ মুনাফা তার জন্য বৈধ।"[৪৯২]

ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. উক্ত মাসআলার ব্যাখ্যায় বলেন-

الفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح، والدراهم والدنانير لا يتعينان على العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق.
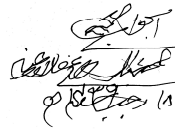
"বর্ণিত মাসআলা দু'টির বিধানগতভাবে পার্থক্যের কারণ হলো- বাঁদী এমন বস্তু যা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। তাই ফাসিদ চুক্তিটি নির্দিষ্টভাবে উক্ত বাঁদীর সাথেই সম্পৃক্ত হবে। এজন্য চুক্তির ফাসাদ বা অবৈধতা উক্ত বাঁদীর মাঝে শক্তভাবে সংক্রমণ করবে। পক্ষান্তরে দীনার-দিরহাম চুক্তির মধ্যে নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। তাই দ্বিতীয় চুক্তি প্রথম চুক্তির দীনার-দিরহামের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। তাই চুক্তির খুবস (খারাবী) দীনার-দিরহামের মাঝে সংক্রমণ করবে না। এজন্য অর্জিত মুনাফা সাদকা করা জরুরী নয়।"[৪৯৩]

সত্যায়নে

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৮ জুমাদাল আখেরাহ ১৪৩৯ হি.

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আ'যম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৮ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১৮ রজব ১৪৩৯ হি.

---

[৪৯২] আল জামেউস সগীর: ৩৩৩, ইদারাতুল কুরআন করাচী, পাকিস্তান
[৪৯৩] আল হিদায়া ৩/৬৬, আশরাফিয়া

ফরেক্স ট্রেডিং : পরিচিতি ও শর‘য়ী দৃষ্টিকোণ

মুহাম্মদ তাকি বিন রহিমুদ্দীন

বিশ্বায়নের এ যুগে পুরো পৃথিবী একটি ছোট মহল্লায় পরিণত হয়েছে। ইন্টারনেটের কল্যাণে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সকল প্রকার লেনদেন ও ব্যবসা করা যাচ্ছে অনায়াসেই। উদ্ভাবিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের স্বয়ংক্রিয় লেনদেন ও ব্যবসা পদ্ধতি। মুহূর্তের মধ্যে সম্পাদন করা যাচ্ছে শতকোটি ডলারের লেনদেন।

প্রযুক্তির এ উৎকর্ষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কারেন্সি ব্যবসার আন্তর্জাতিক বাজার। বিভিন্ন ধারা, বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে হচ্ছে কারেন্সির ব্যবসা। নিম্নে আমরা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত একটি অভিনব পদ্ধতির কারেন্সি ব্যবসা ‘ফরেক্স’ নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পাবো।

ফরেক্স কী?

ইংরেজী Forex শব্দটি **For**eign ও **Ex**change শব্দ দু’টি থেকে গৃহিত। Foreign অর্থ বৈদেশিক এবং Exchange অর্থ বিনিময়। শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী ব্যাপকভাবে যেকোনো ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ও লেনদেনের প্রক্রিয়াকে ফরেন এক্সচেঞ্জ (Foreign Exchange) বা ফরেক্স বলা হয়।

তবে বর্তমানে প্রচলিত পরিভাষায়[৪৯৪] ফরেক্স (Forex) বলতে বিশেষ ধরনের **কারেন্সি ব্যবসা**কে বোঝানো হয়। আমরা জানি, বিভিন্ন রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে কারেন্সির মূল্যমান প্রতিমুহূর্তে উঠানামা করতে থাকে। এই উঠানামাকে কেন্দ্র করেই ফরেক্স ব্যবসা গড়ে উঠেছে। একদেশের কারেন্সির সাথে ভিন্নদেশের কারেন্সি পুনঃপুনঃ বিনিময়ের মাধ্যমে লাভ-লস সংগ্রহ করাই এই ব্যবসার মূল বিষয়।

এ ব্যবসা পুরোপুরি অনলাইনে পরিচালিত হয়। শেয়ার বাজারের মতো এর কোনো লেনদেনকেন্দ্র নেই। তাই একে ওভার দ্যা কাউন্টার[৪৯৫] ব্যবসা বা বাজার বলা হয়।

বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী প্রকৃতিগতভাবেই এটি একটি ফটকামূলক (Speculative) ব্যবসা।[৪৯৬] অর্থাৎ, এখানে কারেন্সির বাস্তব কোনো বিনিময় হয় না; বরং (বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য

---

[৪৯৪] Investopedia ও Wikipedia

[৪৯৫] I.M.F. website: Markets: Exchange or Over-the-Counter, by Randall Dodd. Also see: Wikipedia.

[৪৯৬] স্পেকিউলেশনের শাব্দিক অর্থ: অনুমান করা, ফটকাবাজি (ইংরেজী-বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি)। উল্লেখ্য, নিছক অনুমানের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করলে শুধু তাই স্পেকিউলেশন হয় এমন না; বরং পারিভাষিকভাবে দ্রব্য বা কারেন্সির মূল্যমানের উঠানামাকে কেন্দ্র করে পুনঃপুনঃ বিনিময় করে শুধু লাভ-ক্ষতির লেনদেন করলে তাকেই স্পেকিউলেশন বলা হয়। চাই তা নিছক অনুমাননির্ভর হোক বা অ্যানালাইসিস ও স্ট্রাটেজিভিত্তিক হোক। দেখুন: Present Financial Crisis: Causes and Remedies: p. 23-24, Speculation between Proponents and Opponents (J.KAU: Islamic Econ. Vol. 20 No.1, pp. 43-52, 2007 A.D./1428 A.H.).

অনুযায়ী)[৪৯৭] নিছক 'কম্পিউটার এনট্রি' বা ইলেকট্রিক সংখ্যার বিনিময় হয়ে থাকে। কিন্তু এ ফরযী লেনদেনের উপর ভিত্তি করে বাস্তব লাভ-ক্ষতির আদান-প্রদান হয়ে থাকে।[৪৯৮] এ ব্যবসার মৌলিক ধারা, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি সহজেই প্রতীয়মান হয়। সামনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বর্তমানে মুসলমানদের দ্বীনি বিষয়ে শৈথিল্য ও ইসলামী শরী'আতের অবমূল্যায়নের সুযোগে যে কেউ শর'য়ী বিষয়ে সমাধান দিতে চায়। ফরেক্সের ক্ষেত্রেও এর সাথে জড়িত অনেকে শর'য়ী সমাধানের কোনো ধরনের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এ ব্যবসাকে জায়েয মনে করে থাকে এবং বিভিন্নভাবে ভুল ব্যাখ্যা দিতে থাকে। তাই এক্ষেত্রে প্রিয় পাঠককে সতর্ক থাকতে হবে যে, অভিজ্ঞ মুফতী ছাড়া অন্যদের ব্যাখ্যা ও শর'য়ী সমাধান কোনোক্রমেই গ্রহণ করা যাবে না।

ফরেক্স ট্রেডিং সম্পর্কে এ প্রবন্ধে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তা সবই প্রসিদ্ধ বিভিন্ন ব্রোকার কোম্পানির 'ক্লায়েন্ট-এগ্রিমেন্ট' ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য কারেন্সি মার্কেট সংক্রান্ত বই-পত্র ও ওয়েবসাইট থেকে নেয়া হয়েছে।[৪৯৯] প্রায় সকল তথ্য কারেন্সি মার্কেট ও ফরেক্স বিশেষজ্ঞদের সাথে এবং প্রসিদ্ধ ব্রোকার কোম্পানিগুলোর হেল্প ডেস্কে শেয়ার করা হয়েছে।[৫০০] সর্বশেষ আমাদের দেশের অভিজ্ঞ ব্রোকার-এজেন্ট ও ট্রেডারদের একটি টিম গঠন করে তাদের সামনে পুরো প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা প্রবন্ধে বর্ণিত ফরেক্স চিত্রের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তাদের স্বীকারোক্তি আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে।

কীভাবে এলো ফরেক্স?[৫০১]

পূর্বে মানুষ সাধারণত পণ্যের ব্যবসা করতো। কারেন্সির ব্যবসা ছিলো অতি নগণ্য। কারণ, প্রথমত, কারেন্সি প্রাকৃতিকভাবে ব্যবসাপণ্য নয়।[৫০২] দ্বিতীয়ত, কারেন্সির সংখ্যা এবং ধরনও ছিলো কম। তৃতীয়ত, কারেন্সির ব্যবসা সাধারণত স্থানীয়ভাবে করা যায় না। কারণ, এর জন্য

---

[৪৯৭] সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে। দেখুন: Investopedia: Top 7 Questions About Currency Trading Answered, By Boris Schlossberg (Updated May 3, 2017), Currency trading for DUMMIS: P. 4 (Speculating in the currency market), ফাতাওয়ায়ে উসমানী: ৩/১৫৫-১৫৮ । আরো দেখুন: পরবর্তী টীকা।

[৪৯৮] প্রাগুক্ত। আরো দেখুন: (১) Investopedia: Top 7 Questions About Currency Trading Answered, By Boris Schlossberg (Updated May 3, 2017) (২) Investopedia: Buying And Selling (Forex) (৩) Wikipedia, the free encyclopedia: Short (finance) (৪) Investopedia: Contract For Differences (CFD). (৫) Investopedia: Cash Settlement.

[৪৯৯] এসব বইপত্র ও অন্যান্য রেফারেন্সসমূহ আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।

[৫০০] তাদের সাথে যা আলোচনা হয়েছে, তার রেকর্ড আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে।

[৫০১] বিস্তারিত আলোচনা দেখুন: Foreign Exchange Markets (A book published by Pondicherry University, India)

[৫০২] Present Financial Crisis: Causes and Remedies: p, 10-22 (The nature of money), The Theory of Money And Credit, Ludwing Von Mises। আরো আলোচনা সামনে আসছে।

ভিন্ন দেশের কারেন্সি অথবা ভিন্ন কারেন্সি রেটের[৫০৩] প্রয়োজন হয়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় পূর্বে এসব ছিলো দুষ্কর। চতুর্থত, সেসময় প্রচলিত ছিলো স্বর্ণ-রূপার মতো অন্তর্নিহিত মূল্যমানসম্পন্ন কারেন্সি। এসব কারেন্সির নিজস্ব মূল্যমান থাকায় তা লাগামহীনভাবে উঠানামা করতো না।

পরবর্তীতে চালু হলো কাগুজে কারেন্সি, যার নিজস্ব বা অন্তর্নিহিত মূল্যমান নেই। এর দ্বারা কারেন্সি ব্যবসার পথ কিছুটা সুগম হলো। কিন্তু প্রথম দিকে সাধারণত কাগুজে কারেন্সির রেট সরকারীভাবে নির্দিষ্ট করা হতো। ১৯৭৩ সালের দিকে অধিকাংশ দেশের কারেন্সি থেকে সরকারী রেট তুলে নেয়া হয়।[৫০৪] ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে কারেন্সির মূল্যমান স্বাধীনভাবে উঠানামা করার সুযোগ পায়। যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি হয়। সব মিলিয়ে কারেন্সি ব্যবসা বেশ প্রসার লাভ করে।

১৯৯০ সালের দিকে ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। কারেন্সি ব্যবসা ডিজিটাল রূপ ধারণ করে এবং পূর্বের তুলনায় আরো অনেক গতিশীল হয়। ব্যাংকগুলো পরস্পরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কারেন্সি ব্যবসা শুরু করে। সাথে যোগ দেয় বড় পুঁজিপতিগণ।

পরবর্তীতে বিভিন্ন ব্রোকার বা মধ্যস্থতাকারী কোম্পানি বের হয়। তাদের মাধ্যমে একেবারে সাধারণ গ্রাহকরাও আন্তর্জাতিক কারেন্সি ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে।[৫০৫]

ফরেক্স ট্রেডিং-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বিশ্লেষণ

ব্যাপকার্থে ফরেক্স শব্দটি যেকোনো বৈদেশিক কারেন্সি লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে আমাদের আলোচ্যবিষয় হলো, প্রচলিত ফটকামূলক ফরেক্স ট্রেডিং, যা সাধারণ গ্রাহকগণ বিভিন্ন ব্রোকার বা মধ্যস্থতাকারী কোম্পানির মাধ্যমে করে থাকেন। প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডিং-এরও রয়েছে বিভিন্ন ধারা ও পদ্ধতি। আমরা এগুলোকে সামনে রেখে মোটামুটি একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

ফরেক্স ট্রেডিং-এ সাধারণত তিনটি পক্ষ[৫০৬] জড়িত থাকে-

১. ট্রেডার বা গ্রাহক বা ফরেক্স ব্যবসায়ী;

২. ব্যাংক, যাকে কেন্দ্র করে ফরেক্স ট্রেডিং হয়ে থাকে;

৩. ব্রোকার বা মধ্যস্থতাকারী কোম্পানি।

যেমনটি আমরা ফরেক্সের ইতিহাসে জেনেছি, মূলত ব্যাংকগুলোই পরস্পরের মাঝে ফরেক্স ট্রেডিং করে থাকে। বড় পুঁজিপতিরা সরাসরি কোনো একটি ব্যাংকের সাথে লেনদেন করে মূল ফরেক্স মার্কেটে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সাধারণ ট্রেডাররা তাদের ক্ষুদ্র পুঁজি নিয়ে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে পারে না। এজন্য তারা বিভিন্ন ব্রোকার কোম্পানির মধ্যস্থতায় ব্যাংক বা অন্য ট্রেডারের সাথে লেনদেন করে থাকে। তবে ব্রোকার কোম্পানি সর্বদা নিছক মধ্যস্থতার কাজ করে না; বরং অনেকক্ষেত্রেই ট্রেডারের সাথে স্বয়ং নিজেই লেনদেন সেরে

---

[৫০৩] অর্থাৎ, একই কারেন্সির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রেট।

[৫০৪] Investopedia: Floating exchange rate

[৫০৫] High-Frequency Trading in the FX Market: slideshare.net

[৫০৬] প্রাগুক্ত। Forex market structure লিখে সার্চ করলে বিস্তারিত চিত্র পাওয়া যাবে।

পরবর্তীতে অন্য পক্ষের সাথে লেনদেন করে।[৫০৭] বিস্তারিত সামনে আসছে।

আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এখানে ট্রেডিং কার্যক্রমকে তিন ধাপে উল্লেখ করবো। প্রতি ধাপের সাথে সংশ্লিষ্ট জরুরী বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হবে। শর'য়ী হুকুম বোঝা ও হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এ বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুধাবন করা জরুরী।

১ম ধাপ: ব্রোকার কোম্পানিতে একাউন্ট খোলা

প্রথমেই কোনো একটি অনলাইন ব্রোকার কোম্পানি নির্বাচন করতে হবে। ব্রোকার কোম্পানি নির্বাচনের পর তাদের ওয়েবসাইটে একাউন্ট ওপেনিং অপশনে গেলে একটি ফর্ম দেখা যাবে। নামঠিকানা ও আরো কিছু ডকুমেন্ট প্রদান করে বিভিন্ন শর্ত মেনে নিয়ে ফর্মটি পূরণ করে একাউন্ট ওপেন করা যাবে। ব্রোকারের ওয়েবসাইটে সাধারণত ক্লায়েন্ট-এগ্রিমেন্ট ও অন্যান্য সাপ্লিমেন্ট দেয়া থাকে। এতে বিভিন্ন শর্ত ও নিয়মনীতি উল্লেখ থাকে। উপরোক্ত ফর্মে এগুলো মেনে নেয়ার স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হয়।

ব্রোকার একাউন্টে লগ ইন করার মাধ্যমে গ্রাহক ও কোম্পানির মাঝে প্রাথমিক একটি সম্পর্ক স্থাপিত হলো। এ পর্যায়ে ব্রোকার এবং গ্রাহকের মাঝে যে এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হয়েছে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে তা একটি ওয়াদাচুক্তির সমার্থক।[৫০৮] এর উদ্দেশ্য হলো, ভবিষ্যতে ব্রোকার ও গ্রাহকের মাঝে কার্যত যে কোনো চুক্তি বা লেনদেন হলে তা এই এগ্রিমেন্ট বা ওয়াদাপত্রের সকল শর্ত ও ধারা অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হবে।[৫০৯]

২য় ধাপ: ডিপোজিট করা

একাউন্ট ওপেনিং এর পর ট্রেডে[৫১০] ইচ্ছুক হলে অবশ্যই ব্রোকারের ব্যাংক একাউন্টে[৫১১] নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ডিপোজিট করতে হবে।[৫১২] কোনো একটি অনলাইন পেমেন্ট পোর্টালের মাধ্যমে সহজেই এই ডিপোজিট করা যায়। ব্রোকার কোম্পানিসমূহের সাইটেই সাধারণত বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়ের[৫১৩] লিংক দেয়া থাকে।

ব্রোকার কোম্পানিগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী[৫১৪] ডিপোজিট জমা করার উদ্দেশ্য হলো, ট্রেড শুরু

---

[৫০৭] Gain Capital UK কোম্পানির হেল্প ডেস্কে যোগাযোগ করে জানা যায়।

[৫০৮] এ ব্যাপারে দেখুন: ফিকহুল বুয়ূ': ১০০-১১৩, আল মা'আঈরুশ শারইয়্যাহ: মি'য়ার নং ৪৯

[৫০৯] Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM) এবং Customar Agreement, Forex.com (Gain Capital UK)

[৫১০] ট্রেড (Trade): প্রচলিত ফরেক্সে ব্যবসায়ের একটি একককে (Unit) একটি ট্রেড বলে। অর্থাৎ, 'ক্রয়+পুনঃবিক্রয়' বা 'বিক্রয়+পুনঃক্রয়' এর পুরো কার্যকে একটি ট্রেড বলে। বিস্তারিত সামনে আসছে।

[৫১১] এই একাউন্টকে গ্রাহকের একাউন্ট বা গ্রাহক ও ব্রোকারের সম্মিলিত একাউন্ট বলা হয়। এই একাউন্ট বিভিন্ন ব্রোকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সাধারণত এটি ব্রোকারের বা ব্রোকার নিয়ন্ত্রিত গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্ট হয়ে থাকে। XM কোম্পানির সাথে সরাসরি যোগাযোগে বিষয়টি জানা যায়। আরো দেখুন: Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM) এবং Customar Agreement, Forex.com (Gain Capital UK) আরো দেখুন: Invesopedia: Margin Account এবং Brokerage Account

[৫১২] ডিপোজিট ও উইথড্র (Deposit & Withdraw): ব্রোকারপ্রদত্ত একাউন্টে অর্থ জমা করাকে বা জমাকৃত অর্থকে ডিপোজিট বলা হয়। আর 'উইথড্র' হলো, একাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলন করা।

[৫১৩] অর্থ আদান-প্রদানের অনলাইন পোর্টাল। যেমন, Alertpay, Skrill, Neteller ইত্যাদি।

[৫১৪] সামনে 'মার্জিন' সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন।

হলে তা 'সিকিউরিটি মানি' হিসেবে ব্যবহার করা।[৫১৫]

এখানে লক্ষণীয় যে, ব্রোকার বা বিশেষজ্ঞরা সরাসরি এ কথা বলে না যে, ডিপোজিট থেকে নির্দিষ্ট অর্থ (মার্জিন) ব্যবহার করে ট্রেড করা হয়; কারণ, ডিপোজিটকৃত অর্থ ব্রোকারের নিকট বহাল তবিয়তে থেকে যায়। লেনদেনে ব্যবহৃত হয় না। বাহ্যিক অবস্থা দেখে কেউ কেউ ব্যবহার হয় বলে মনে করে; কিন্তু তাদের ধারণা সঠিক নয়। ফরেক্সের মূল কাঠামো ও রহস্য বিচার করলেই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ টাকা লেনদেনে ব্যবহৃত হয় না।[৫১৬, ৫১৭] এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'মার্জিন' শিরোনামের অধীনে আসছে। ডিপোজিট সিকিউরিটি মানি হওয়ার কী ব্যাখ্যা, ব্রোকারদের ভাষ্যের আলোকে তারও আলোচনা সেখানে করা হবে।[৫১৮]

এখানে ব্রোকার ও ট্রেডারের মাঝে সম্পর্ক ও লেনদেন এবং ফরেক্স একাউন্ট ও ফরেক্স লেনদেন সংক্রান্ত কিছু জরুরী বিষয়ে আলোচনা করা হবে। অতঃপর ৩য় ধাপে ট্রেডের বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ব্রোকার ও ট্রেডারের মাঝে সম্পর্ক

ব্রোকার অর্থ, দালাল বা মধ্যস্থতাকারী। ব্রোকারের মধ্যস্থতা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।[৫১৯] মধ্যস্থতার ধরন হিসেবে প্রধানত ফরেক্স ব্রোকারদের দু'ভাগে[৫২০] ভাগ করা হয়-

---

[৫১৫] ট্রেডের (অর্থাৎ, কী পরিমাণ অর্থকে কেন্দ্র করে ট্রেড হবে) ব্রোকার কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু সাইজ আছে। সে অনুপাতে (ট্রেড করতে চাইলে) ডিপোজিট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 'সিকিউরিটি মানি' হিসেবে হোল্ড করা হয় এবং তার সাথে ব্রোকারের লোন যোগ করে মোট অঙ্ককে কেন্দ্র করে ট্রেড করা হয়।
ডিপোজিট থেকে যে পরিমাণ অর্থ নিয়ে ট্রেড করা হয় (অর্থাৎ, সিকিউরিটি মানি হিসেবে যা হোল্ড করা হয়) তাকে মার্জিন বলা হয়। আর ব্রোকারের লোনকে বলা হয় লিভারেজ। মার্জিন ব্যতীত ডিপোজিটের বাকি অংশকে 'ফ্রী মার্জিন' বলা হয়।

[৫১৬] সাধারণত ব্রোকাররা বলে থাকে যে, এটা ট্রেড মানি। অর্থাৎ, এটাকে ব্যবহার করেই ট্রেড করা হয় (যদিও বাস্তবে কোনো কিছুর আদান-প্রদান হয় না)। তবে অনেকের আলোচনা থেকে মনে হয় যে, এটা ট্রেড মানি নয়; নিছক সিকিউরিটি মানি। বিস্তারিত আলোচনা 'মার্জিন' শিরোনামের অধীনে আসছে। সেখানে মূল টেক্সট এবং টীকা দু'টোই দেখুন।

[৫১৭] ধারাবাহিকভাবে পুরো প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। সর্বশেষ বিস্তারিত '৩য় ধাপে' আলোচনা করা হয়েছে।

[৫১৮] যেহেতু মার্জিন ও লিভারেজ সম্পর্কে সামনে স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা করা হবে, তাই এখানে তার ফিকহী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তবে 'ফ্রী মার্জিন' ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে (সাধারণ ব্যাংক-একাউন্টের ডিপোজিটের মতো) কর্জ হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং এর উপর কর্জের আহকাম আরোপিত হবে। এটা সাধারণত যেকোনো সময় (সাধারণত প্রসেসিং-এর জন্য ১ দিন সময় লাগে) উত্তোলন করা যায়। (Gain Capital UK কোম্পানির হেল্প ডেস্কে সরাসরি যোগাযোগ করে জানা যায়।)
যেহেতু ট্রেড শুরু করার পূর্বে পুরো ডিপোজিটই 'ফ্রী মার্জিন'; তাই ট্রেড শুরু করার পূর্বে যেকোনো সময় ডিপোজিটকৃত অর্থ উত্তোলন করা যায়। এমনকি ট্রেড শুরু করার আগে একাউন্টও যেকোনো সময় বন্ধ করে দেয়া যায়।

[৫১৯] আসলে বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজারে ব্রোকার একটি ব্যাপকার্থবোধক পরিভাষা। সকল প্রকারের ব্যবসায়ী এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সবাই একপক্ষ থেকে সংগ্রহ করে অপর পক্ষের নিকট সরবরাহ করছে। দালাল শব্দের এ ধরনের ব্যাপকার্থবোধক ব্যবহারের প্রসঙ্গটি একটি প্রসিদ্ধ হাদীস শরীফেও এসেছে।

[৫২০] Forex Broker Types: Dealing Desk and No Dealing Desk, babypips.com. আরো দেখুনঃ Top 7 Questions About Currency Trading Answered, By Boris Schlossberg (Updated May 3, 2017), http://www.nasdaq.com/forex/education/types-of-forex-brokers.aspx

১. কোনো কোনো ব্রোকার কমিশনের বিনিময়ে নিছক দালালি (السمسرة) বা মধ্যস্থতার কাজ করে। ফরেক্সের পরিভাষায় এদেরকে 'নো ডিলিং ডেস্ক' (No Dealing Desk) ব্রোকার বলা হয়। এরা ট্রেডারের ট্রেডটি সরাসরি ব্যাংক বা অন্য ট্রেডারের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। ট্রেড মূলত ট্রেডার ও তার কাউন্টারপার্টির (প্রতিপক্ষ ক্রেতা বা বিক্রেতা) মাঝেই হয়। ব্রোকার শুধু ট্রেডের ব্যবস্থাপনার কাজ আঞ্জাম দেয়। ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের ব্রোকার সাধারণত ট্রেডার ও কাউন্টারপার্টি উভয়ের দালাল (سِمسار) ও 'আমিল (عامل) হয়ে থাকে।[৫২১]

ব্রোকার কোম্পানিগুলোর ভাষ্য[৫২২] ও 'ট্রেড এক্সিকিউশন'[৫২৩]-এর পদ্ধতি ও ধরন[৫২৪] থেকে বোঝা যায় যে, ট্রেড সাধারণত ট্রেডারই করে থাকে। ব্রোকার তার প্রতিনিধি হিসেবে ট্রেড করে না। তাই ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত ধরনের ফরেক্স ব্রোকার ওয়াকীল পরিগণিত হবে না। তবে যদি কোনো ক্ষেত্রে 'ওয়াকালাহ'-এর সূরত পাওয়া যায় (যেমনটি অনেকে বলেছেন এবং কিছু কিছু ব্রোকারের ভাষ্য থেকেও মনে হয়) তাহলে ভিন্ন কথা।

২. অনেক ব্রোকার ট্রেডারের প্রতিপক্ষ হিসেবে তার সাথেই স্বতন্ত্রভাবে ট্রেড করে। অতঃপর পরবর্তীতে ব্যাংক বা অন্য পক্ষের সাথে ট্রেড করে। অর্থাৎ, ট্রেডার থেকে যা ক্রয় করেছে তা ব্যাংক বা অন্য পক্ষের নিকট বিক্রয় করে, অথবা অন্য পক্ষ থেকে ক্রয় করে ট্রেডারের নিকট বিক্রয় করে।[৫২৫] ফরেক্সের পরিভাষায় এদেরকে 'ডিলিং ডেস্ক' (Dealing Desk) বা 'মার্কেট মেকার' (Market Maker) ব্রোকার বলা হয়।[৫২৬] ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের ব্রোকার

---

[৫২১] এক্ষেত্রে ব্রোকার ও ট্রেডের দুই পক্ষের মাঝে আকদুল জা'আলাহ (عقد الجعالة) পাওয়া যায়। আকদুল জা'আলাহ (عقد الجعالة) এবং 'আকদুল ইজারা'র মাঝে পার্থক্য হলো, 'আকদুল ইজারা'তে সাধারণত নির্দিষ্ট কাজ বা নির্দিষ্ট সময়ে কাজের উপর চুক্তি হয়ে থাকে। কিন্তু আকদুল জা'আলাহ-এ এ ধরনের নির্দিষ্ট কাজ বা সময়ের উল্লেখ থাকে না; বরং কাজের ফলাফলকে কেন্দ্র করেই চুক্তি হয়ে থাকে। যেমন, এখানে ব্রোকারের সাথে এ মর্মেই চুক্তি হয় যে, সে উপযুক্ত পক্ষ নির্বাচন করে তার সথে ট্রেডারের সংযোগ করে দিবে। এর জন্য সে কীভাবে প্রসেসিং করবে বা কতটুকু সময়ে করবে, মূলত তার কোনো হিসেব করা হয় না।
আকদুল জা'আলাহ হানাফী মাযহাবে শর্তসাপেক্ষে জায়েয। বিভিন্ন ফুরু' থেকে এটাই প্রমাণিত হয়। তবে মাযহাবের কিতাবসমূহে ইজারার অধ্যায়েই প্রাসঙ্গিকভাবে এর আলোচনা করা হয়। সাধারণত 'জা'আলাহ'র শিরোনাম ব্যবহার করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ দেখুন: আল আসল, আল মুহীতুল বুরহানী এবং অন্যান্য কিতাবের ইজারা'র অধ্যায়। আরো দেখুন: আল মুগনী: ৬/৩৫০, বাদায়েউস সানায়ে: ৬/৮, ই'লাউসসুনান: ১৩/৪০, ইসলাম আওর জাদীদ মা'আশী মাসাইল ২/১৯৮।

[৫২২] Gain Capital UK কোম্পানির সাথে সরাসরি যোগাযোগে জানা যায়। আরো দেখুন: Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM): 36.1.

[৫২৩] ট্রেড সম্পাদন করা/ ট্রেড মূল মার্কেট পর্যন্ত পৌঁছানো।

[৫২৪] Investopedia: Execution, এক ট্রেডারের বিবরণ: ফাতাওয়ায়ে উসমানী: ৩/১৫৬, Forex Broker Types: Dealing Desk and No Dealing Desk, babypips.com.

[৫২৫] কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্রোকার প্রথম প্রকারের মতো ট্রেডারের সাথে ট্রেড করে না; বরং দ্বিতীয় কোনো পক্ষের নিকট ট্রেডটি হস্তান্তর করে। বিস্তারিত দেখুন: Forex Broker Types: Dealing Desk and No Dealing Desk, babypips.com

[৫২৬] এরা নিজস্ব বিড-আস্ক প্রাইস প্রদর্শন করে। (Forex Broker Types: Dealing Desk and No Dealing Desk, babypips.com)

মূলত আকেদ। অর্থাৎ, ক্রেতা বা বিক্রেতা।[৫২৭] ফরেক্সে এ দ্বিতীয় প্রকারের ব্রোকারের সংখ্যা প্রথম প্রকারের তুলনায় অনেক বেশি।[৫২৮]

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্রোকার বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা ও ব্যবস্থাপনাগত কাজের বিনিময়ে আলাদা কমিশনও গ্রহণ করে। এ অবস্থায় তারা আকেদ হওয়ার পাশাপাশি ট্রেডারের আমিল বা আজীরও (أجير) পরিগণিত হবে।

ব্রোকার ট্রেডারকে যেসব সুবিধা দিয়ে থাকে এবং বিনিময়ে যা গ্রহণ করে

ব্রোকার ট্রেডারকে প্রধানত তিন ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকে-

১. ট্রেড সম্পাদন করা। ট্রেডার শুধু 'বাই' বা 'সেল' ক্লিক করে। বাকি কাজ ব্রোকার করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্রোকারকে কাউন্টারপার্টি নির্বাচন করা, ট্রেডটি তার নিকট হস্তান্তর করা, প্রাইস উপস্থাপন করা সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়। ব্রোকারভেদে মধ্যস্থতার ধরন যে ভিন্ন হয় তার বিবরণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এছাড়াও ব্রোকার ট্রেডারকে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রদান করে থাকে। যেমন, ট্রেডিং প্লাটফর্ম আপডেট রাখা, নিয়মিত মার্কেটের তথ্য সরবরাহ করা, বিভিন্ন ধরনের দিক-নির্দেশনার ব্যবস্থা করা, ডিপোজিট ও উইথড্রল[৫২৯] সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা করা ইত্যাদি।

৩. ব্রোকার ট্রেডারকে বিরাট অঙ্কের 'পারচেসিং পাওয়ার' বা 'ক্রয়-ক্ষমতা' প্রদান করে থাকে। এটাকে লিভারেজ (বাড়তি ক্ষমতায়ন) বলা হয়। সাধারণত এটিকে লোন হিসেবে উল্লেখ করা হয়[৫৩০] এবং এটি লোনের মতোই কাজ করে; কিন্তু বাস্তব লোনের সাথে এর বেশ তফাৎ রয়েছে। বিস্তারিত সামনে আসছে।

আর ব্রোকার ট্রেডার থেকে নিম্নোক্ত চার্জসমূহ আদায় করে থাকে-

১. ট্রেড সম্পাদন করার জন্য প্রথম প্রকার ব্রোকার (নিছক মধ্যস্থতাকারী) দালালির ফিস হিসেবে নির্দিষ্ট অঙ্কের বা শতকরা হারে কমিশন নিয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকার ব্রোকার (ক্রেতা বা বিক্রেতা) শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের লাভ বা স্প্রেড[৫৩১] নিয়ে থাকে।

---

[৫২৭] এজন্য সাধারণত বলা হয় যে, এরা ট্রেডের স্বতন্ত্র পক্ষ হওয়ায় পুনঃবিক্রয়ের পূর্বে ক্রয়কৃত এসেটের রিস্ক (ضمان) বহন করে। এ কথাটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়। বাস্তবে ফরেক্সে কোনো লেনদেন হয় না। বিস্তারিত সামনে আসছে। (দেখুন: Forex Broker Types: Dealing Desk and No Dealing Desk, babypips.com)

[৫২৮] top10forexbrokers.co/tag/market-maker-forex-brokers

[৫২৯] ডিপোজিট ও উইথড্রল: ব্রোকারপ্রদত্ত একাউন্টে অর্থ জমা করাকে বা জমাকৃত অর্থকে ডিপোজিট বলা হয়। আর 'উইথড্র' হলো, একাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলন করা।

[৫৩০] Leverage লিখে সার্চ করলেই জানা যাবে।

[৫৩১] **স্প্রেড:** সামনে আসছে যে, ফরেক্স ট্রেড দু'টি লেনদেনের সামষ্টিক প্রক্রিয়া। এখানে সাধারণত ব্রোকার থেকে ভিন্ন কারেন্সি ক্রয় করে পরবর্তীতে তা ব্রোকারের নিকট বিক্রয় করা হয়। ব্রোকার সাধারণত ট্রেডারকে বেশি রেটে বিক্রয় করে এবং কম রেটে ট্রেডার থেকে ক্রয় করে। এটাই ব্রোকারের লাভ এবং এটাকেই স্প্রেড বলা হয়। এজন্য ব্রোকার প্রত্যেকটি কারেন্সি জোড়ার সাথে দু'টি রেট প্রদর্শন করে। (সহজতার জন্য একটি সূরত উল্লেখ করা হলো। XM-এর একজন এজেন্ট সত্যায়ন করেছেন।)

অনেকক্ষেত্রেই ব্রোকারগণ স্প্রেডের নাম দিয়ে কমিশন গ্রহণ করে থাকে।[৫৩২]

২. অনেকক্ষেত্রে উভয় প্রকার ব্রোকার বাড়তি সার্ভিসের বিনিময়ে বিভিন্ন ধরনের কমিশনও নিয়ে থাকে। এই কমিশন ইজারা বা জা'আলাহ (جعالة)-এর বিনিময় হিসেবে ধর্তব্য হবে। তবে ব্রোকারদের দিকনির্দেশনামূলক সার্ভিসগুলো সাধারণত ফ্রী সার্ভিস হয়ে থাকে।[৫৩৩]

৩. ডিপোজিট, উইথড্রল, ট্যাক্স ইত্যাদি বাবদ ব্রোকারের কোনো খরচ হলে বা গ্রাহকের পক্ষ থেকে কোনো ফি আদায় করতে হলে তা গ্রাহক থেকে আদায় করা হয়।[৫৩৪]

৪. নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেড ক্লোজ না করলে অনেকক্ষেত্রে ব্রোকার অতিরিক্ত চার্জ করে।[৫৩৫]

৫. উপরোল্লিখিত চার্জগুলো উপস্থিত আদায়যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ট্রেডার কোনো ক্ষেত্রে তা আদায়ে দেরি করলে তা ঋণ হয়ে যায় এবং তার উপর সুদ আসে।[৫৩৬]

৬. ট্রেডের মেয়াদ (সাধারণত ১/২ দিন)[৫৩৭] পার হয়ে ট্রেড পরবর্তী দিনে গড়ালে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেয়াদ নবায়ন করা হয়। একে রোলওভার বলা হয়। রোলওভারের জন্য প্রায়শঃ ব্রোকার আলাদা ফি বা কমিশন নিয়ে থাকে। সামনে আসছে যে, রোলওভারের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি বিশেষ ধরনের সুদের লেনদেন (সোয়াপ) হয়ে থাকে। সাধারণত, ব্রোকার এ দৈনিক সুদের সাথে একটি বাড়তি পার্সেন্টিজ যোগ করে উপরোক্ত ফি বা কমিশন আদায় করে নেয়।[৫৩৮]

মার্জিন ও সিকিউরিটি মানি (Margin & Security Money)

প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডিং মার্জিন ট্রেডিং[৫৩৯]-এর একটি প্রকার। মার্জিন ট্রেডিং-এর সারকথা হলো, অল্প বিনিয়োগ করে বড় ব্যবসা করা।[৫৪০] মার্জিন ট্রেডিং-এ বিনিয়োগকারী কোনো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় ব্যবসা করে।[৫৪১] এক্ষেত্রে তাকে উক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একাউন্টে একটি ক্ষুদ্র পরিমাণ এমাউন্ট জমা করতে হয়। কিন্তু সে এ ক্ষুদ্র পুঁজি দিয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বড় ব্যবসা করতে পারে। অর্থাৎ, বাকি অর্থ মধ্যস্থতাকারী বা ব্রোকার প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকারীকে লোন হিসেবে প্রদান করে। বিনিয়োগকারীর পুঁজিকে 'মার্জিন' বলা হয়। আর ব্রোকারের লোনকে 'লিভারেজ' বলা হয়। ব্রোকার এ লোন বিনিয়োগকারীর হাতে দেয় না; বরং

---

[৫৩২] Babypips.com

[৫৩৩] Gain Capital UK-এর সাথে যোগাযোগে জানা যায়।

[৫৩৪] Gain Capital UK-এর সাথে যোগাযোগে জানা যায়। আরো দেখুন: Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM).

[৫৩৫] Gain Capital UK-এর সাথে যোগাযোগে জানা যায়। আরো দেখুন: Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM): Rollover & offset instructions.

[৫৩৬] Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM): 52.1

[৫৩৭] https://exploremarkets.com/rollover-policy.php. আরো দেখুন: Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM): 44.1

[৫৩৮] https://alpari.com/en/faq/trading_terms/overnight_swaps/...

[৫৩৯] মার্জিন অর্থ, কোনো কিছুর প্রান্ত বা কিনারা (ইংরেজী-বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী)। যেহেতু মার্জিন ট্রেডিং-এ বিনিয়োগকারীর পুঁজি লোনের তুলনায় বেশ ছোট হয়ে থাকে, তাই একে মার্জিন বা প্রান্তিক মানি বলা হয়।

[৫৪০] Investopedia.

[৫৪১] Investopedia.

সে নিজেই বিনিয়োগকারীর পক্ষ থেকে পুরো ব্যবসা পরিচালনা করে।

মার্জিন ট্রেডিং-এ মার্জিন ও লিভারেজ দ্বারা যা ক্রয় করা হয়, তা ব্রোকার বা মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট সিকিউরিটি হিসেবে জমা থাকে।[৫৪২] এ অর্থের উপর সাধারণত ব্রোকার ট্রেডারকে সুদ দেয়।[৫৪৩] এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়।

এখন আমরা প্রচলিত ফরেক্সের প্রসঙ্গে আসি, যা সাধারণত মার্জিন ট্রেডিং-এর ধারায় পরিচালিত হয়। এখানেও **মার্জিন** ট্রেডারের ডিপোজিটকৃত অর্থের ঐ অংশকে বলা হয়, যাকে কেন্দ্র করে (এবং যার সথে লিভারেজ যোগ করে) সে ট্রেড করে থাকে।[৫৪৪]

ব্রোকার কোম্পানিগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী, মার্জিনই তাদের কাছে 'সশরীরে'[৫৪৫] সিকিউরিটি মানি হিসেবে সংরক্ষিত থাকে।

আমরা জেনেছি যে, মার্জিন ট্রেডিং-এ ট্রেডারের ক্রয়কৃত সম্পদও ব্রোকারের নিকট সিকিউরিটি হিসেবে সংরক্ষিত থাকে। তবে ফরেক্স ট্রেডিং-এর ফটকাপ্রকৃতির কারণে যেহেতু এখানে বাস্তবে কারেন্সির কোনো আদান-প্রদান হয় না,[৫৪৬] তাই ক্রয়কৃত কারেন্সি ব্রোকার কোম্পানিতে জমা রাখারও কোনো প্রশ্ন উঠে না। এজন্য ব্রোকার কোম্পানিগুলোর ক্লায়েন্ট এগ্রিমেন্টে সাধারণত এটা নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয় না। তবে এটি সিকিউরিটি হিসেবে জমা থাকে এবং এর ভিত্তিতে ব্রোকার ও ট্রেডারের মাঝে সুদের লেনদেন হয়ে থাকে! (সামনে 'সোয়াপ' শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে)

এখন মার্জিন 'সিকিউরিটি মানি' হওয়ার কী অর্থ? এটি কি আসলে ট্রেডে ব্যবহৃত হয়?

মার্জিন সিকিউরিটি মানি হওয়ার দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে-

১. এটি আসলে ট্রেড মানি নয়। অর্থাৎ, এ টাকা দিয়ে লেনদেন হয় না; বরং বন্ধকের মতো[৫৪৭] পৃথক চুক্তির আওতায় গ্রহণকৃত সিকিউরিটি মানি। অনেক ব্রোকারের বিবরণ থেকে এটাই বুঝা যায়।[৫৪৮] এ হিসেবে ট্রেড শুধু ব্রোকারপ্রদত্ত পারচেসিং পাওয়ার বা লিভারেজকে কেন্দ্র করেই হয়ে থাকে।

২. কোনো কোনো ব্রোকারের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে, তারা মার্জিনকে ট্রেড মানি গণ্য করে। এ হিসেবে মার্জিনকে 'সিকিউরিটি মানি' বলার কারণ হলো, মোট ট্রেড মানি (মার্জিন+লিভারেজ) থেকে শুধু এটিই ট্রেডার আগাম আদায় করে থাকে। ট্রেডারের লস এটি

---

[৫৪২] Investopedia.

[৫৪৩] Investopedia.

[৫৪৪] Investopedia.

[৫৪৫] অর্থাৎ, মার্জিন ট্রেডিং-এর স্বাভাবিক ধারণানুযায়ী মার্জিনের পরিমাণটাই শুধু সিকিউরিটির ভূমিকা পালন করে যে তা নয়; বরং মার্জিনই 'সশরীরে' সিকিউরিটি মানি হিসেবে জমা থাকে।

[৫৪৬] Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM), Customar agreement, Forex.com. এ ব্যাপারে XM ও Gain capital UK এ দু'টি ব্রোকার কোম্পানির স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে। বিস্তারিত সামনে আসছে।

[৫৪৭] দেখুন, Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM), Customar agreement, Forex.com. এক ব্রোকার-এজেন্ট এটিকে 'মর্টগেজ'ও বলেছে!

[৫৪৮] প্রাগুক্ত

ছড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হলেই ট্রেড স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লোজ হয়ে যায়। যেহেতু মার্জিন এভাবে সিকিউরিটির কাজ দিচ্ছে, তাই একে সিকিউরিটি মানি বলা হয়; বন্ধক হিসেবে নয়। তবে তারা এটাও স্বীকার করেছে যে, ফরেক্সে 'ট্রেড মানি' একটি তাত্ত্বিক বিষয়। বাস্তবে এখানে কোনো মানি বা অর্থের হস্তান্তর ও সঞ্চালন হয় না।

তাহলে দু'টি ব্যাখ্যার মাঝে কার্যত কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, স্বয়ং ব্রোকারদের তথ্য অনুযায়ী[৫৪৯] মার্জিনকে ট্রেড মানি গণ্য করা হলেও কোনো ব্রোকারই তার বাস্তব আদান-প্রদান করে না। বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে সহজেই বুঝে আসে-

১. অনেক ব্রোকারের ভাষ্য অনুযায়ী মার্জিন সাধারণত ব্রোকারের মালিকানায় ট্রেডারের ঋণ হিসেবে থাকে।[৫৫০] ব্রোকার এ অর্থকে ইচ্ছেমতো বিভিন্ন খাতে ব্যবহার ও বিনিয়োগ করার অধিকার রাখে।[৫৫১] তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, সিকিউরিটি অবস্থায় থাকাকালীন ট্রেডার কখনো এটাকে নিজ অর্থ হিসেবে দাবি করতে পারবে না। (তবে কোনো কোনো ব্রোকার এটাকে ট্রেডারের মানি হিসেবে দাবি করে।[৫৫২])

২. 'শর্ট পজিশন' সংক্রান্ত ব্রোকারদের বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মার্জিন বাস্তবে 'ট্রেড মানি' না বা (নিছক ট্রেড মানি 'হিসেব' করা হলেও) ট্রেডে ব্যবহৃত হয় না।[৫৫৩]

৩. উভয় ধরনের ব্রোকারই[৫৫৪] (যারা মার্জিনকে ট্রেড মানি গণ্য করে এবং যারা করে না) ট্রেডারের এগ্রিমেন্টে এ শর্তারোপ করে যে, মার্জিনের উপর কোনো সুদ গ্রহণ করা যাবে না। এখান থেকেও বোঝা যায় যে, মার্জিন ট্রেডারের মালিকানায় থাকে না; বরং এটি ব্রোকারের জিম্মায় ট্রেডারের ঋণ হিসেবেই থাকে। কারণ, সুদ গ্রহণ করার প্রশ্ন আসেই ঋণের ক্ষেত্রে।

৪. মার্জিন সম্পর্কে ব্রোকারদের বিবরণ থেকেও এটা বুঝে আসে যে, কার্যত মার্জিনের সাথে চলমান বাস্তব ট্রেডের কোনো সম্পর্ক থাকে না।[৫৫৫]

---

[৫৪৯] Babypips.com. আরো বিস্তারিত দেখুনঃ Currency trading for DUMMIS বইটির সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

[৫৫০] Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM): 47.1. আরো দেখুনঃ Investopedia: Rollover Rate (Forex)
https://www.investopedia.com/terms/r/rollover-rate.asp#ixzz4zGpRCeNq...

[৫৫১] সাধারণ তারা এটি বিনিয়োগ করে। দেখুনঃ XM-এর ক্লায়েন্ট এগ্রিমেন্টের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় এবং Investopedia-র 'মার্জিন' সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ।
আরো দেখুনঃ Leverage and Margin Explained, babypips.com
(https://www.babypips.com/learn/forex/leverage-defined)

[৫৫২] Gain Capital UK-এর সাথে যোগাযোগে জানা যায়। Investopedia (See: Brokerage Acc.)-তে এটা স্পষ্ট লেখা আছে। তবে এ অর্থ অন্য অর্থের সাথে মিশ্রিত করে রাখা হয় কিনা এ ব্যাপারে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে। যদি মিশ্রিত করে রাখা হয়, তাহলে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কর্জই ধর্তব্য হবে। বাস্তবে এটাই হয়। (দেখুনঃ XM ক্লায়েন্ট এগ্রিমেন্টের ধারা নং 45.7, Leverage and Margin Explained, babypips.com) তবে শুধু বিনিয়োগকারীর তার 'ক্যাপিটাল গেইন' অর্জনের সুযোগ থাকে। (দেখুন Investopedia, এর পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি)।

[৫৫৩] দেখুনঃ Currency trading for DUMMIS (a book from Forex.com) P.15

[৫৫৪] XM ও forex.com-এর ক্লায়েন্ট এগ্রিমেন্ট দ্রষ্টব্য

[৫৫৫] দেখুনঃ Currency trading for DUMMIS (a book from Forex.com) P.16

আমরা জানলাম যে, মার্জিন নামের বাস্তব অর্থ বহাল তবিয়তে থেকে যায় আর ট্রেড চলে আক্ষরিক অর্থেই 'কাল্পনিকভাবে'। আপনি দেখছেন যে, মার্জিন এমন একটি অর্থ, যার উপর সুদ আসতে পারে। নইলে তার উপর সুদ না আসার শর্ত কীভাবে করা যায়? আবার ফরেক্সে এ মার্জিনের (+লিভারেজ) বিনিময়ে যে কারেন্সি ক্রয় করা হয়েছে তার উপরও সুদ আসে। যার আলোচনা সামনে 'সোয়াপ' শিরোনামে আসবে। তাহলে এখানে স্বয়ং মার্জিনের উপর (সম্ভাব্য) এবং মার্জিনের বিনিময়ের উপর (বাস্তবে) একই সাথে সুদ আসতে পারছে। এটাই হলো বাস্তবতাবিবর্জিত লেনদেনের স্বরূপ। যদিও স্বয়ং মার্জিনের উপর সুদ আরোপিত হওয়াকে শর্ত করে রোধ করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা 'ট্রেডের বাস্তবতা' শিরোনামের অধীনে দেখুন।

যদিও প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডে বাস্তবে কারেন্সির আদান-প্রদান না হওয়ার বিষয়টি অভিজ্ঞমহলের নিকট একটি স্বীকৃত বিষয়[৫৫৬], তবে মার্জিনের উপরোক্ত অবস্থা ও তা সংক্রান্ত ব্রোকারদের ভাষ্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কারণ, একটি ফান্ড একই সাথে দু'টি প্রকল্পে ব্যবহার করা মোটেও সম্ভব নয়।[৫৫৭]

লিভারেজ (Leverage)

লিভারেজ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো, কোনো কিছুকে শক্তিশালী করা বা তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।[৫৫৮] অর্থনীতির পরিভাষায়, মূলধন থেকে অতিরিক্ত ফায়েদা লাভের প্রয়াসকে লিভারেজ বলা হয়।[৫৫৯] লিভারেজকে পরিভাষায় লোন বা ধারকৃত অর্থ হিসেবে অভিহিত করা হয়।[৫৬০]

তবে ফরেক্স ব্রোকারদের ভাষ্য অনুযায়ী[৫৬১] লিভারেজ হলো মার্জিনের ক্ষমতা কতগুণ বৃদ্ধি পাবে

---

[৫৫৬] বিষয়টি যদিও কর্তৃপক্ষের নিকট স্বীকৃত; তবে অনেকে এটাকে অস্বীকার করতে চায়। এজন্য আমরা এ প্রবন্ধে বিভিন্নভাবে বিষয়টি সহজে বুঝানোর প্রয়াস পাবো।
দেখুনঃ https://exploremarkets.com/rollover-policy.php.
আরো দেখুনঃ https://www.trading-point.com/overnight-positions

[৫৫৭] ফরেক্স ট্রেডিং-এর উপরোক্ত অবস্থার আলোকে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে মার্জিন মূলত ব্যাংকের জিম্মায় কর্জ ও দাইন হিসেবে থাকে। বিভিন্ন কারণে এটাকে রাহান হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কারণ, মার্জিন হয়তো ব্রোকারের ব্যাংক একাউন্টে থাকে অথবা ব্রোকার নিয়ন্ত্রিত ট্রেডারের একাউন্টে থাকে। উভয় অবস্থায়ই এটি ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকের জিম্মায় কর্জ এবং দাইন হিসেবে থাকে। আর জুমহুর ফুকাহায়ে কেরামের নিকট দাইনকে রাহান বানানো সম্ভব না। দাইনটি মুরতাহিনের উপর হোক বা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির উপর হোক। (আহকামুল কুরআন লিল জাস্‌সাসঃ ২/২৬১ আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া- রাহান অধ্যায়) এখানে দ্বিতীয় সূরতটি পাওয়া যায়।
তবে এটাকে হাওয়ালা হিসেবে ব্যাখ্যারও অবকাশ রয়েছে। আমরা প্রয়োজন না থাকায় আপাতত এসব বিষয়কে দীর্ঘ করছি না।

[৫৫৮] Leverage, Oxford Advanced Learner's Dictionary

[৫৫৯] Leverage, Oxford Advanced Learner's Dictionary

[৫৬০] Wikipedia

[৫৬১] Gain Capital UK এবং XM কোম্পানির সাথে যোগাযোগে জানা যায়। আরো দেখুনঃ Investopedia: How Leverage Is Used In Forex Trading, Adding Leverage To Your Forex Trading, আরো দেখুনঃ Algorithmic trading with Python Tutorial, Harrison Kinsley (Understanding Leverage - Python for Finance 18) প্রবন্ধটির লেখক Harrison Kinsley (harrison@pythonprogramming.net)-এর সাথে যোগাযোগ করেও উপরোক্ত তথ্যই পাওয়া যায়।

তার অঙ্ক[৫৬২]। যেমন, ১:১০০ পরিমাণ লিভারেজ মানে হলো, ট্রেডার (উদাহরণত) ১ টাকা (মার্জিন) দিয়ে ১০০ টাকার ট্রেড পরিচালনা করতে পারবে। অর্থাৎ, ১০০ টাকার মোকাবেলায় যে পরিমাণ ভিনদেশী কারেন্সি ক্রয় করা যায় তা সে ১ টাকা দিয়েই ক্রয় করতে পারবে। সারকথা, এই ১ টাকা সর্বদিক থেকে ১০০ টাকার মতো হয়ে যাবে।

ব্রোকারদের ভাষ্য অনুযায়ী, ১ টাকাকে লিভারেজ করে ১০০ টাকায় পরিণত করার এই অঙ্কের কোনো আর্থিক ভিত্তি নেই।[৫৬৩] অর্থাৎ, এটি একটি নিছক ক্যালকুলেশন বা গণনা। প্রশ্ন হলো, কোনো ধরনের আর্থিক ভিত্তি ছাড়া আর্থিক ক্যালকুলেশন বা হিসেব কেমনে হতে পারে? এর উত্তরে ব্রোকার কোম্পানিগুলো থেকে যা বলা হয়েছে[৫৬৪], তার সারকথা হলো, লিভারেজ বলা হয়, কম কারেন্সি দ্বারা তুলনামূলক (সাধারণত, অনেক) বড় পজিশন ধরার সুবিধাকে। যেহেতু প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডে বাস্তব কোনো **লেনদেন** বা **লেনদেনচুক্তি** হয় না, শুধু কারেন্সি রেটের উঠানামাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষে **পজিশন ধরা** হয়, তাই এক্ষেত্রে বাস্তব অর্থ থাকা এবং না থাকা এক সমান। কারণ, পজিশন ধরার ক্ষেত্রে কোন পক্ষের কত কারেন্সি আছে তা বিবেচ্য নয়। কোনো এক পক্ষের বা উভয়পক্ষের কিছু না থাকলেও সমস্যা নেই। হ্যাঁ, পজিশন ক্লোজ করার পর লাভ হলে তা কাউন্টারপার্টি থেকে নিবে আর ক্ষতি হলে আদায় করবে। আর এ অর্থ আদায় নিশ্চিত করার জন্য তো মার্জিন পরিমাণ (বাস্তব) অর্থ আগেই জমা দিতে হয়। লস হলে তা মার্জিন অতিক্রম করার আগেই ট্রেড বন্ধ হয়ে যায়। তাই অন্য কোনো অর্থের প্রয়োজন পড়ে না।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ফরেক্সে লিভারেজ আসলে লোন নয়।[৫৬৫] তবে এটি হুবহু লোনের মতোই কাজ করে। এর কারণে লাভ ও ক্ষতি উভয়টি বেড়ে যায় এবং এর উপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুদও উসূল করা হয় (দেখুন, 'সোয়াপ' শিরোনামের অধীনে আলোচনা)। এজন্য বোঝার সুবিধার্থে অনেকে এটাকে 'কল্পিত লোন' বলেছেন।[৫৬৬]

উপরোক্ত প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে লিভারেজের[৫৬৭] কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না। কারণ, ব্রোকার কোম্পানিগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী এটির 'বাস্তব কোনো অস্তিত্ব' থাকা জরুরী নয়। আর যদি কোনো ক্ষেত্রে এটির বাস্তব অস্তিত্ব থাকে, তাও ফিকহী পরিভাষায় একে কর্জ বলা হবে না। কারণ, কর্জ শুদ্ধ হওয়ার জন্য তা মাক্বরুয বা ঋণগ্রস্তের হস্তগত হওয়া জরুরী।[৫৬৮] আর মার্জিন ট্রেডিং-এর সাধারণ নিয়ম হিসেবে লিভারেজ কখনো ট্রেডারকে প্রদান করা হয় না। প্রচলিত ফরেক্স লিভারেজের উপর যামানত বা কাফালাহ-এর ব্যাখ্যাও খাটে না। কারণ, এটা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরিভাষা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এছাড়াও তারা লিভারেজের উপর সরাসরি

উপরোক্ত সকল যোগাযোগের রেকর্ড আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে।

[৫৬২] প্রাগুক্ত। এ ব্যাপারে XM কোম্পানি ও Forex.com- এর এজেন্টদের ভাষ্য আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।

[৫৬৩] প্রাগুক্ত। এ ব্যাপারে XM কোম্পানি ও Forex.com-এর এজেন্টদের ভাষ্য আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।

[৫৬৪] এ ব্যাপারে XM কোম্পানি ও Forex.com-এর এজেন্টদের ভাষ্য আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।

[৫৬৫] এ ব্যাপারে কিছু ব্রোকার-এজেন্ট ও ট্রেডারদের স্বীকারোক্তি আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে।

[৫৬৬] এ ব্যাপারে Forex.com-এর এক এজেন্টের বক্তব্য আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।

[৫৬৭] প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডে। অর্থনীতিতে লিভারেজ বাস্তব লোনকে বুঝায়। দেখুন: Investopedia-এ Leverage সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ।

[৫৬৮] আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস: ৩/১৮৮

সুদও গ্রহণ করে। আর পুরো ক্রয়-বিক্রয়ই যেহেতু এখানে ভিত্তিহীন এবং কাল্পনিক, তাই তার প্রকৃতির সাথেও এ ব্যাখ্যা মিলে না। সহজ ও সোজা দৃষ্টিতে দেখলে লিভারেজ নিছক কাল্পনিক অঙ্ক ছাড়া কিছুই নয়। বাস্তব লেনদেন হলে সহজেই এটাকে 'কাফালাহ' হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিলো। কোনো কোনো ট্রেডারের বর্ণিত সূরতের ভিত্তিতে কোনো কোনো সমকালীন ফকীহ এ ধরনের সম্ভাবনাও প্রকাশ করেছেন।[৫৬৯] তবে বর্তমানে রিটেইল[৫৭০] ফরেক্সে সাধারণত ঐ সূরত পাওয়া যায় না।

রোল ওভার-সোয়াপ (Roll over-Swap)

রোল ওভার: প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডের সাধারণ মেয়াদ হলো, একটি ব্যাংকদিবস।[৫৭১] ট্রেড দ্বিতীয় দিনে গড়ালেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেয়াদ নবায়ন হয়। এটাকে 'রোল ওভার' বলা হয়। রোল ওভার হলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সোয়াপ বা বিশেষ ধরনের সুদের লেনদেন হয়ে থাকে। অনেকসময় ব্রোকার রোল ওভারের জন্য আলাদা ফি'ও গ্রহণ করে। সাধারণত, ব্রোকার দৈনিক সুদের সাথে একটি বাড়তি পার্সেন্টিজ যোগ করে উপরোক্ত ফি বা কমিশন আদায় করে নেয়।[৫৭২]

সোয়াপ: ইংরেজী সোয়াপ (Swap) শব্দের অর্থ, বিনিময়। সোয়াপ একটি বিশেষ ধরনের ফিন্যান্সিয়াল কন্ট্রাক্ট। এর বিভিন্ন ধরন ও প্রকার রয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার আলোচনা না করে আমরা ফরেক্সে যে সোয়াপ হয়ে থাকে তার ব্যাখ্যা করবো। ফরেক্স সোয়াপ নিয়ে রয়েছে অনেক বিভ্রান্তি। আমরা পারিভাষিক মারপ্যাঁচ বাদ দিয়ে ব্রোকার ও বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য অনুযায়ী শুধু সোয়াপের মূল কথাটি উল্লেখ করবো।

প্রচলিত ফরেক্স সোয়াপ: ফরেক্স-সোয়াপে দু'টি কারেন্সির ইন্টারেস্ট রেট বা সুদের হারের বিনিময় হয়ে থাকে। একেক দেশের কারেন্সির সুদের হার একেক ধরনের হয়। সাধারণত, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ হার নির্দিষ্ট করে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য ফ্যাক্টরের কারণে সুদের হার বিভিন্ন হয়ে থাকে।[৫৭৩]

ফরেক্স ট্রেডে একটি পজিশন ওপেন থাকার অর্থ হলো, আপনি যেকোনো একটি কারেন্সি ক্রয় করেছেন আর অপরটি বিক্রয় করেছেন। প্রচলিত ফরেক্সে একটি পজিশন ওপেন করলে তার সুদবিহীন মেয়াদ হলো ১ দিন।[৫৭৪] ১ দিন পর্যন্ত এ পজিশনের উপর কোনো সুদ আসবে না। পরবর্তী দিনে প্রবেশ করলেই এর উপর (বার্ষিক সুদের হারকে ভাগ করে) দৈনিক সুদের হার অনুযায়ী আগাম সুদের লেনদেন করা হবে। আর এক্ষেত্রে নিয়ম হলো, আপনার ক্রয়কৃত

---

[৫৬৯] ফাতাওয়ায়ে উসমানীঃ ৩/১৫৫-১৫৮। এ ফাতাওয়াটি ১৪২০ হিজরীতে প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রশ্নকারী লিভারেজের যে বিবরণ প্রদান করেছেন তা সাধারণত বর্তমানে পাওয়া যায় না।

[৫৭০] রিটেইল শব্দের অর্থ, খুচরা। ফরেক্স ট্রেডের একেবারে সাধারণ ক্যাটাগরিকে রিটেইল ফরেক্স বলা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মূলত এ ক্যাটাগরির ফরেক্স নিয়েই আলোচনা করছি।

[৫৭১] সাধারণত স্পট ফরেক্সের ব্যাপারে দু'দিন বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মার্জিন ট্রেডিং-এর ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। দেখুনঃ https://www.trading-point.com/overnight-positions, https://exploremarkets.com/rollover-policy.php
এখান থেকেও সাধারণ স্পট ফরেক্স এবং মার্জিন ট্রেডিং ধারার প্রচলিত ফরেক্সের মাঝে পার্থক্য বোঝা যায়।

[৫৭২] https://alpari.com/en/faq/trading_terms/overnight_swaps/

[৫৭৩] Investopedia ও Wikipedia

[৫৭৪] প্রসঙ্গত এ ব্যাপারে আরো দ্রষ্টব্যঃ Quora: Does Forex trading have an expiry date?

কারেন্সির উপর আপনি সুদ পাবেন আর বিক্রয়কৃত কারেন্সির উপর সুদ দিবেন!!

ধরুন, আপনি ইউরো বিক্রয় করে ডলার ক্রয় করলেন। ধরুন, ডলারের বাৎসরিক ইন্টারেস্ট রেট হলো ৩.৫% এবং ইউরোর বাৎসরিক ইন্টারেস্ট রেট হলো ৪.২৫%। এখন আপনি ট্রেডের বাড়তি মেয়াদে ৩.৫% হারে সুদ পাবেন এবং ৪.২৫% হারে সুদ দিবেন। তবে সরাসরি এর আদান-প্রদানের প্রয়োজন নেই। দু'টি রেটের মধ্যে পার্থক্য বের করলেই চলবে। উপরোক্ত দু'টি সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য হলো, ০.৭৫%। ধরুন, এর সাথে ০.২৫% হারে ব্রোকারের মার্ক-আপ যোগ হবে। এখন দৈনিক হার বের করার জন্য ০.৭৫% + ০.২৫% কে ৩৬০ দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং লট (Lot) সাইজের (অর্থাৎ, ট্রেডের পরিমাণ) শতাংশ বের করতে হবে। (১০০,০০০ × (০.৭৫ + ০.২৫) / ১০০) × ১.৩৫০০ / ৩৬৫ = ৩.৭০ ডলার। যেহেতু এখানে ক্রয়কৃত কারেন্সির তুলনায় বিক্রয়কৃত কারেন্সির হার বেশি, তাই দৈনিক পরিমাণে সুদ দিতে হবে। এর বিপরীত হলে সুদ পাওয়া যেতো।

কেন এবং কোন দু'পক্ষের মাঝে এ সুদের লেনদেন হয়ে থাকে?

বিশেষজ্ঞ ও ব্রোকারদের ভাষ্য থেকে বোঝা যায়,[৫৭৫] এ লেনদেন ট্রেডার ও ব্রোকার বা ব্যাংকের মাঝে হয়ে থাকে। লিভারেজ ও সিকিউরিটি মানিকে কেন্দ্র করেই এ লেনদেন হয়। ট্রেডার মূলত ব্রোকারপ্রদত্ত 'পারচেসিং পাওয়ার' বা ক্রয়ক্ষমতা ব্যবহার করে[৫৭৬] ট্রেড করে থাকে। ধরুন, ব্রোকারপ্রদত্ত ১০০ ডলারের পাওয়ার বিক্রয় করে ট্রেডার ৯০ ইউরো ক্রয় করলো। (এই ৯০ ইউরো পুনরায় ডলারের বিনিময়ে বিক্রয় করলেই ট্রেডটি বন্ধ হবে। যেহেতু পুরো ট্রেড শেষ হয়নি, তাই আপাতত) এই ৯০ ইউরো (পূর্বোক্ত মার্জিনের মতো) ব্রোকারের নিকট সিকিউরিটি মানি[৫৭৭] হিসেবে জমা থাকবে।[৫৭৮]

দেখুন, এখানে ট্রেডার ব্রোকারপ্রদত্ত পারচেসিং পাওয়ার ব্যবহার করেই ক্রয়-বিক্রয় করছে। আর ব্রোকার ট্রেডারের পারচেস্ড (ক্রয়কৃত) কারেন্সি নিজের কাছে জমা রাখছে। উভয়পক্ষ অপরপক্ষের অর্থ ব্যবহার করছে। এজন্য একটি ট্রেড একদিনের বেশি ওপেন থাকলে উভয়পক্ষের অপরপক্ষের উপর সুদ আসে। উভয়পক্ষের উপর আরোপিত সুদের যোগ-বিয়োগ করলে যেকোনো এক পক্ষ সুদ পায়, অপরপক্ষ সুদ দেয়।[৫৭৯] এটিই হলো ফরেক্স সোয়াপ।[৫৮০]

উল্লেখ্য, ব্রোকার ও বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডে কোনো বাস্তব লেনদেন হয় না। সুতরাং এখানে বাস্তবেই যে ক্রয়কৃত কারেন্সি ব্রোকারের নিকট জমা থাকে তা নয়। আর ট্রেডার যে ব্রোকারপ্রদত্ত কোনো বাস্তব কারেন্সি ব্যবহার করছে তাও না; বরং সবকিছুর

---

[৫৭৫] Currency trading for DUMMIS P.20. আরো দেখুন: Investopedia: How is rollover interest calculated? এছাড়াও আরো দেখুন: Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM): P. 46.

[৫৭৬] এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্রোকার কোম্পানির স্বীকারোক্তি আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে। বিস্তারিত দেখুন: এ প্রবন্ধের মূল সংস্করণ 'প্রচলিত কারেন্সি ব্যবসায়ের স্বরূপ ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ'।

[৫৭৭] প্রাগুক্ত।

[৫৭৮] বাস্তবে তো জমা থাকে না, তবে জমা থাকে- এই ভিত্তিতে সুদের আদান-প্রদান হয়ে থাকে! যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৫৭৯] কারণ, বিভিন্ন কারেন্সির সুদের হার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

[৫৮০] বিভিন্ন ব্রোকার কোম্পানির হেল্প ডেস্কে এ বিবরণ উপস্থাপন করা হলে তারা তা সমর্থন করেছেন।

অস্তিত্ব কেবল কম্পিউটার এনট্রিতে (নিছক ডিজিট ও সংখ্যা) সীমাবদ্ধ। কিন্তু তারপরও এসবের উপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাস্তবার্থেই সুদ এসে থাকে। যেহেতু কোনো বাস্তব লেনদেন ছাড়াই এ সুদের আদান প্রদান হয়, তাই সাধারণত তারা এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ব্রোকার কোম্পানির এজেন্টগণ তার সত্যায়ন করেছেন।[৫৮১]

আশা করি, এতক্ষণে পাঠক ফরেক্স ট্রেডের বিভিন্ন পক্ষ, তাদের মাঝে লেনদেন ও ট্রেডের আর্থিক ভিত্তির ব্যাপারে মৌলিক ধারণা লাভ করেছেন। এখন ৩য় ধাপে আমরা সরাসরি ট্রেডিং প্লাটফর্মের চিত্র সামনে রেখে কীভাবে ট্রেড করা হয় তা দেখবো এবং এর আলোকে ফরেক্স ট্রেডের বাস্তবতা সম্পর্কে সরেজমিন ধারণা লাভ করবো।

৩য় ধাপ: ট্রেড সম্পাদন

ব্রোকার কোম্পানিতে একাউন্ট খোলা এবং ডিপোজিট করার পর কোনো একটি অনলাইন ট্রেডিং প্লাটফর্মের অ্যাপ বা সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে। ব্রোকারপ্রদত্ত পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এই প্লাটফর্মে ট্রেড করা যাবে। ট্রেডিং প্লাটফর্মকে ট্রেড টার্মিনালও বলা হয়। নিম্নের চিত্রটি লক্ষ করুন:

এটি MT4 নামক একটি ট্রেডিং প্লাটফর্ম। এখানেই ট্রেড করা হয়। এখানে বামে প্রধান কারেন্সি পেয়ারসমূহের[৫৮২] চার্ট দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে যে কারেন্সি পেয়ার (জোড়া)[৫৮৩] নিয়ে আপনি ট্রেড করতে চাচ্ছেন তা নির্বাচন করতে হবে। ধরুন, আপনি EURUSD নির্বাচন করলেন।

---

[৫৮১] অবশ্যই দেখুন: Currency trading for DUMMIS P. 20। এখানে উল্লিখিত বিবরণ Forex.com-এ বারবার উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা সত্যায়ন করেছেন। আমাদের কাছে তাদের বক্তব্য সংরক্ষিত আছে।

[৫৮২] **মেজর পেয়ার্স ও ক্রস পেয়ার্স** (Major pairs & Cross pairs): ফরেক্সে চারটি (অনেকের মতে ছয় বা সাতটি) কারেন্সি পেয়ারকে মূল বা প্রধান কারেন্সি পেয়ার বলা হয়। এ পেয়ারগুলো USD পেয়ার এবং এর তারল্য সবচেয়ে বেশি। আর USD বিহীন পেয়ারগুলোকে ক্রস পেয়ার্স বলা হয়। (সূত্র: Investopedia এবং বিডিপিপস ফরেক্স স্কুল)।

[৫৮৩] **কারেন্সি পেয়ার** (Currency pairs): অর্থাৎ মুদ্রাজোড়া। যেহেতু ফরেক্সে দুটি কারেন্সিকে কেন্দ্র করেই ট্রেডিং হয়, তাই উভয় কারেন্সিকে সাধারণত জোড়া হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। যেমন, EURUSD (ইউরো/মার্কিন ডলার) একটি মুদ্রাজোড়া।

এর অর্থ হলো, আপনি ইউরো এবং মার্কিন ডলারের ট্রেড বা ক্রয়-বিক্রয় করবেন। উপরের চিত্রটিতে এই পেয়ারে একটি ট্রেড চলছে।

কারেন্সি পেয়ারে (যেমন, EURUSD) প্রথমে উল্লেখ করা হয় তুলনামূলক বেশি মূল্যমানের কারেন্সি। যেমন, এখানে ইউরো। আর পরে উল্লেখ করা হয় কম মূল্যমানের কারেন্সি। যেমন, এখানে ডলার। প্রথমটিকে বলা হয় 'বেস কারেন্সি' (Base currency), আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'কোট কারেন্সি' (Quote currency)।

কারেন্সি পেয়ারের ডানে তার প্রাইস উল্লেখ করা হয়। যেমন, EURUSD: ১.১৭৬৪৫। এর অর্থ হলো, এক ইউরো ক্রয় বা বিক্রয় করতে এত ডলারের প্রয়োজন পড়বে। অর্থাৎ, বেস কারেন্সির মূল্যমান কোট কারেন্সি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আর বাই বা সেলের অর্থও হলো বেস কারেন্সির বাই (অর্থাৎ, কোট কারেন্সির সেল) বা বেস কারেন্সির সেল (অর্থাৎ, কোট কারেন্সির বাই)।

উপরের চিত্রে লক্ষ করেছেন যে, প্রতিটি পেয়ারের সাথে দু'টি প্রাইস উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রথমটিকে বলা হয় 'বিড প্রাইস' (Bid price) আর পরেরটিকে বলা হয় 'আস্ক প্রাইস' (Ask price)। বিড প্রাইস হলো, যে প্রাইসে ব্রোকার আপনার থেকে কারেন্সি ক্রয় করতে চায়। তাহলে সেল (বিক্রয়) করলে আপনার 'বিড প্রাইস' -এই করতে হবে। আর আস্ক প্রাইস হলো, যে প্রাইসে ব্রোকার আপনার নিকট কারেন্সি বিক্রয় করতে চায়। তাহলে বাই (ক্রয়) করলে আপনার 'আস্ক প্রাইস'-এই করতে হবে।[৫৮৪] স্বাভাবিকভাবেই বিড প্রাইসের তুলনায় আস্ক প্রাইস বড় হয়। অর্থাৎ, ব্রোকার থেকে ক্রয় করলে অধিক মূল্যে করতে হবে এবং ব্রোকারের নিকট বিক্রয় করলে কম মূল্যে করতে হবে।[৫৮৫] সামনে আসছে যে, ফরেক্স ট্রেডকে দু'টি চুক্তির সামষ্টিক রূপ গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে বাই করলে পরে সেল করতে হয়। আর প্রথমে সেল করলে পরে বাই করতে হয়। এজন্য ব্রোকার দু'টি প্রাইস একসাথে প্রদর্শন করে। এ দু'টির পার্থক্য প্রথমেই নিয়ে নেয়া হয়। এটাই ব্রোকারের লাভ। এটাকে 'স্প্রেড' (দুই প্রাইসের মাঝে তফাৎ) বলা হয়।[৫৮৬]

প্লাটফর্মের ডানে ইন্ডিকেটরের[৫৮৭] ফ্রেম দেখা যাচ্ছে। ইন্ডিকেটরে আপনার নির্বাচিত কারেন্সি পেয়ারের ভ্যালুর গড় উঠানামা প্রতিমুহূর্তে শো করা হয়।

উপরোল্লিখিত চিত্রে একটি ট্রেড চলছে। নতুন একটি ট্রেড শুরু করতে চাইলে ডানে উপরের + চিহ্নে ক্লিক করতে হবে। তখন Buy, Sell ও লট সাইজ (Lot size)[৫৮৮] ইত্যাদির অপশন

---

[৫৮৪] Currency trading for DUMMIS P. 21 (Understanding Currency Quotes)

[৫৮৫] দেখুন: Investopedia এবং Currency trading for DUMMIS.

[৫৮৬] Currency trading for DUMMIS P. 21, 22

[৫৮৭] ইন্ডিকেটর (Indicator): অর্থ- সূচক। সূচক বা নির্দেশক ঐ রেখাকে বলা হয়, যার সাহায্যে বাজার ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিফলিত করা হয়। এ রেখা সমান্তরাল, উর্ধমুখী ও নিম্নমুখী বিভিন্নভাবে এগুতে থাকে। ফরেক্সে প্রতি মুহূর্তে কারেন্সির মূল্যের উর্ধ ও নিম্নগতি সূচকের সাহায্যে দেখানো হয়। এতে আরো বিভিন্ন ধরণের সিগন্যালও প্রদর্শিত হয়।

[৫৮৮] লট প্রসঙ্গে Investopedia-র বিভিন্ন প্রবন্ধ দেখুন। সোজাকথায় বলা যায়, লট হলো, ট্রেড সাইজ। অর্থাৎ, কত এমাউন্টের উপর ট্রেড হবে তার পরিমাণ।

আসবে। Buy বা Sell ক্লিক করলে একটি ট্রেড শুরু হবে। ধরুন, এখানে EURUSD বাই করলেন। তার মানে আপনি ডলার দিয়ে ইউরো কিনলেন।

সাধারণত (প্রথমেই) বাই (ক্রয়) করা হয় যদি মনে করা হয় যে, ভবিষ্যতে কোট কারেন্সির তুলনায় বেস কারেন্সি শক্তিশালী হবে। কারণ, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী কারেন্সি সেল (বিক্রয়) হলে লাভ হবে। অনুরূপভাবে সেল (বিক্রয়) করা হয় যখন মনে করা হয় যে, কোট কারেন্সির তুলনায় বেস কারেন্সি দুর্বলতার দিকে এগুচ্ছে। এককথায় ইন্ডিকেটর নিম্নগামী হলে বাই (ক্রয়) করা হয় আর ঊর্ধ্বগামী হলে সেল (বিক্রয়) করা হয়।[৫৮৯]

প্লাটফর্মের নিচে ব্যালেন্স, ইকুইটি, মার্জিন, ফ্রী মার্জিন, মার্জিন লেভেল ইত্যাদির ঘর দেখা যাচ্ছে।

ব্যালেন্স হলো, ব্রোকারের একাউন্টে আপনার মোট ডিপোজিটের পরিমাণ।[৫৯০] চিত্রে যেমনটি দেখছেন, ট্রেড শুরু হবার পর এতে কোনো পরিবর্তন হয়না। ট্রেড চলাকালীন ঊর্ধ্বহ্রাসমান প্রফিট-লসও এখানে যোগ হবে না। ট্রেড শেষ হবার পর যোগ হবে। তাহলে ব্যালেন্স মানে হলো, ট্রেড শুরু হওয়ার পূর্বে আপনার মোট একাউন্ট ব্যালেন্স।

ইকুইটি আর ব্যালান্সের মধ্যে পার্থক্য হলো, ট্রেড চলাকালীন ঊর্ধ্বহ্রাসমান প্রফিট-লসও এখানে যোগ হবে।

মার্জিনঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মার্জিন হলো, ডিপোজিট থেকে যে পরিমাণ অর্থকে কেন্দ্র করে ট্রেড করা হয়।

ফ্রী মার্জিনঃ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মার্জিন ব্যাতীত অতিরিক্ত ব্যালেন্স হলো ফ্রী মার্জিন। অর্থাৎ, ইকুইটি - মার্জিন = ফ্রী মার্জিন।

মার্জিন লেভেলঃ ইকুইটির কত পার্সেন্ট মার্জিন হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে তার হিসাব।[৫৯১]

ট্রেড ওপেনিং ও ক্লোজিং এবং অবাস্তবতার কিছু দিক

ট্রেড ওপেনিং ও ক্লোজিং: একসাথে দুই চুক্তিঃ ফরেক্স বিশেষজ্ঞ ও ব্রোকারদের বক্তব্য অনুযায়ী, ট্রেড ওপেনিং হলো, একটি বাই বা সেল সম্পাদনা করা।[৫৯২] তাহলে ট্রেড ক্লোজ করার অর্থ কী? আসলে স্পেকিউলেটিভ বা ফটকামূলক ফরেক্স ছাড়াও ফরেক্সের আরো কিছু ধারা আছে, যেখানে বাস্তব লেনদেন হয়।[৫৯৩] সেক্ষেত্রে ট্রেড ক্লোজ বলা হয় লেনদেনকৃত কারেন্সি হস্তান্তর করাকে। কিন্তু যেহেতু ফটকামূলক ফরেক্সে বাস্তব লেনদেন বা হস্তান্তর হয় না[৫৯৪], তাই এখানে,

---

[৫৮৯] Babypips.com

[৫৯০] Luckscout.com (https://www.luckscout.com/leverage-margin-balance-equity-free-margin-and-margin-level-in-forex-trading)

[৫৯১] প্রাগুক্ত।

[৫৯২] বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুনঃ এ প্রবন্ধের মূল সংস্করণ 'প্রচলিত কারেন্সি ব্যবসায়ের স্বরূপ ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ'।

[৫৯৩] এ প্রবন্ধে আমাদের বিষয়বস্তু হলো, প্রচলিত স্পেকিউলেটিভ ফরেক্স। মানিচেঞ্জাররা বিমানবন্দরে বসে যে ফরেক্স (বৈদেশিক মুদ্রাব্যবসা) করে তাও না, আবার উচ্চপর্যায়ে যেসব বাস্তব লেনদেনভিত্তিক ফরেক্স (বৈদেশিক মুদ্রাব্যবসা) হয় তাও না। প্রবন্ধের শুরুতে বিষয়টি বলা হয়েছে।

[৫৯৪] সামনে বিস্তারিত আসছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রেড ক্লোজ বলতে পুনঃক্রয়-বিক্রয় বুঝানো হয়।[৫৯৫] ধরুন, আপনি ৮ ইউরোর বিনিময়ে ১০ ডলার ক্রয় করে ট্রেড ওপেন করেছেন। এখন ট্রেড ক্লোজ করার অর্থ হলো এই ক্রয়কৃত ১০ ডলার পুনরায় বিক্রয় করে বর্তমান রেটে ইউরো ফিরিয়ে নেয়া।

অবাস্তবতার কিছু দিক: ফরেক্স ট্রেডে আসলে কতটুকু বাস্তব লেনদেন হয়ে থাকে, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যের আলোকে তার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন সামনে আসছে। উপরোক্ত ট্রেড চিত্রের আলোকে এখানেও আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি-

১. ফরেক্স ট্রেড দু'টি লেনদেনের (সামনে এ লেনদেনের স্বরূপ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে) সামষ্টিক রূপ।[৫৯৬] এই দু'টি লেনদেনের এখানে আলাদা কোনো অস্তিত্ব বিবেচনা করা হয় না;[৫৯৭] বরং সব মিলিয়ে পুরো ট্রেডকে একটি চুক্তি ধরা হয়।[৫৯৮] এটা কখনো সম্ভব না যে, একটি লেনদেন করে আপনি পিছু হটবেন; বরং দ্বিতীয় আরেকটি লেনদেন আপনাকে করতেই হবে। প্রথম লেনদেন বন্ধ বা ক্লোজ করার অর্থই হলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্বিতীয় লেনদেন করা। আপনি না চাইলেও আপনাকে ক্লোজ করতেই হবে। তা আজ করেন বা বছরখানেক পরই করেন। এজন্য দু'টি ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে তফাৎ বা স্প্রেড ব্রোকার ট্রেডের শুরুতেই নিয়ে নেয়।

২. ট্রেডের দু'টি লেনদেনের আলাদা অস্তিত্ব হিসেব না করার অর্থ কখনো এটা হয় যে, মালিকানার কোনো ধরনের হস্তান্তরের হিসাবও[৫৯৯] করা হয় না।[৬০০] আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা হয় যে, মালিকানার হস্তান্তর হচ্ছে;[৬০১] কিন্তু এতে (তাদের মতেই) পূর্ণাঙ্গ রিস্কের হস্তান্তর হয় না।[৬০২] কারণ, উপরোক্ত দু'টি লেনদেনের মাঝে কোনো কিছু হস্তগত করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ, প্রথমে যা আপনি ক্রয় করেছেন (১০ ডলার) তা আপনার কখনো হস্তগত করা সম্ভব নয়; বরং তা বিক্রয় করে দিয়ে আপনার প্রথম কারেন্সি, যা আপনি ডিপোজিট করেছিলেন (ইউরো) তা আবার ক্রয় করতে হবে। তখন আপনি তা উত্তোলন করতে পারবেন (এ কথাটি বাহ্যিক দৃষ্টির সাথে মিলিয়ে বুঝানোর জন্য বলা হচ্ছে। আসলে এখানে সাধারণত কোনো লেনদেনই হয় না, যেমনটি সামনে আসছে)। তাহলে আপনার হাতে পূর্বের ডিপোজিটকৃত কারেন্সিই ফেরত আসলো। ট্রেডের ফলাফল এতটুকু যে, লাভ হলে যোগ হবে আর লস হলে বিয়োগ হবে। উপরন্তু ট্রেড হয়ে থাকে নিছক ক্যালকুলেশন এবং কল্পিত অর্থের উপর। যেমনটি আমরা লিভারেজের ব্যাপারে পূর্বে জেনেছি।

৩. এজন্য ডিপোজিট এবং উইথড্রল সব এক কারেন্সিতেই হয়। প্রথমেই ব্রোকারের নিকট

---

[৫৯৫] বিস্তারিত দেখুন, Currency trading for DUMMIS (a book from Forex.com) P.15. আরো দেখুনঃ Investopedia-র এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

[৫৯৬] Currency trading for DUMMIS (A book from Forex.com)

[৫৯৭] আরো দেখুন: 'প্রচলিত কারেন্সি ব্যবসায়ের স্বরূপ ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ'।

[৫৯৮] প্রাগুক্ত।

[৫৯৯] প্রাগুক্ত।

[৬০০] প্রাগুক্ত।

[৬০১] যেমনটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তব স্পট ফরেক্সে হয়ে থাকে।

[৬০২] ইসলামী দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা তো সামনে আসছে। পুঁজিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও এখানে রিস্কের বাস্তব হস্তান্তর হয় না। দেখুন, Wikipedia: Delivary. হ্যাঁ, শুধু কারেন্সির রেটের উঠানামার কারণে যে লাভ-ক্ষতি হয়, তা বহনের রিস্ক দেয়া হয়। দেখুনঃ Investopedia: Capital Gaiin.

কোনো একটি কারেন্সি নির্দিষ্ট করতে হয়। তাহলে ভিন্ন কারেন্সি ক্রয়ের অর্থ কখনো এটা না যে, সে কারেন্সি কখনো তোলা যাবে; বরং যা ডিপোজিট করেছিলেন, তাই তুলবেন। ট্রেডের ফলাফল এতটুকু যে, লাভ হলে যোগ হবে আর লস হলে বিয়োগ হবে। কারেন্সি মার্কেট বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য অনুযায়ী[৬০৩] এটি ফরেক্সে বাস্তব লেনদেন না হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত।

বোঝা গেলো,[৬০৪] ডিপোজিট এবং উইথড্রলের সাথে বাস্তব ট্রেডের কোনো সম্পর্ক থাকে না। থাকার কথাও নয়। কারণ, যা ডিপোজিট করা হয়, তাই তোলা হয়। শুধু লাভ-লস যোগ হয়। কিন্তু ট্রেড ডিপোজিটকৃত কারেন্সি দ্বারাই করা জরুরী নয়।

৪. বিষয়টি এখান থেকেও বোঝা যায় যে, ট্রেড সর্বাবস্থায় ‘বাই’ বা ‘সেল’ যেকোনোটি দিয়ে শুরু করা যাবে। ধরুন, আপনার ডিপোজিট হলো ডলার। তার মানে এটা না যে, এখন (এই কারেন্সি পেয়ারে) আপনাকে ডলার বিক্রয় বা সেল করে ইউরোই কিনতে হবে। অর্থাৎ, বাই অপশন গ্রহণ করতেই হবে; বরং আপনি তা সেলও (অর্থাৎ, ইউরো বা বেস কারেন্সি বিক্রয় ও ডলার ক্রয়) করতে পারেন! Forex.com এর কয়েকজন এজেন্ট এটাকে বাস্তব লেনদেন না হওয়ার আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৫. আর স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো ধরনের ট্রান্সফার হলে তা একাউন্টে শো করে। এখানে এ ধরনের কোনো কিছু শো-ও হয় না। শুধুই লাভ-লস শো হতে থাকে আর তার উপর নির্ভর করে কতটুকু সিকিউরিটি পাওয়ার বাকী আছে, তা শো হতে থাকে। উপরের চিত্রটিতে আপনি দেখেছেন যে, এখানে EURUSD পেয়ারে Buy করা হয়েছে। তার মানে ডলার দিয়ে ইউরো কেনা হয়েছে। এই একাউন্টটি ডলার বেস্‌ড একাউন্ট। এখন ডলার প্রদান করে ইউরো নেয়ার পরও একাউন্টে কোনো পরিবর্তন নেই। পূর্বের ডলার রয়ে গেছে। তা এক মুহূর্তের জন্যও একাউন্ট থেকে বাদ পড়েনি। আর এহেন পরিস্থিতিতে ডলারের বিনিময়ে ইউরো আসার কোনো প্রশ্নও আসে না।

ট্রেডের উপরোক্ত বিষয়গুলোর মাধ্যমে ফরেক্স ট্রেডে বাস্তব কোনো লেনদেন না হওয়ার বিষয়টি আরো পরিষ্কার হলো।

ফরেক্স লেনদেনের স্বরূপ: বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য

ট্রেডের বাস্তবতার বিবেচনায় ফরেক্স ট্রেডকে দু’টি মৌলিক ধারায়[৬০৫] ভাগ করা যেতে পারে:

১. একটি ধারায় বাস্তবে কারেন্সির আদান-প্রদান হয়ে থাকে।[৬০৬] বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য অনুযায়ী বাস্তব লেনদেনভিত্তিক ফরেক্সের এ ধারাটি ফরেক্স মার্কেটের সর্বোচ্চ ১০% বা ২০% হবে।

২. দ্বিতীয় ধারাটি হলো, যেখানে বাস্তবে কারেন্সির কোনো আদান-প্রদান (Delivery) হয়

---

[৬০৩] Investopedia: Top 7 Questions About Currency Trading Answered, By Boris Schlossberg (Updated May 3, 2017). আরো দেখুন: ‘প্রচলিত কারেন্সি ব্যবসায়ের স্বরূপ ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ’।

[৬০৪] প্রাগুক্ত।

[৬০৫] বিস্তারিত দেখুন: ‘প্রচলিত কারেন্সি ব্যবসায়ের স্বরূপ ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ’

[৬০৬] তবে এতেও কিছুক্ষেত্রে ফটকার অবকাশ থাকে। বিস্তারিত দেখুন: ‘প্রচলিত কারেন্সি ব্যবসায়ের স্বরূপ ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ’

না। যেমন, প্রচলিত মার্জিন ট্রেডিং, সি.এফ.ডি এবং রুলিং স্পট ফরেক্স।

প্রচলিত ফরেক্স বলতে আমরা এই দ্বিতীয় ধারাটিকেই বুঝি। আমাদের জানা মতে, সারা বিশ্বের কারেন্সি মার্কেট বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্রোকারদের নিকট এটি একটি স্বীকৃত বাস্তবতা যে, এ ধরনের ফরেক্সে কোনো বাস্তব লেনদেন বা আদান-প্রদান হয় না।[৬০৭] সাধারণত এতে বাস্তব কোনো ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিও হয় না। ব্রোকার কোম্পানিগুলোর 'ক্লায়েন্ট এগ্রিমেন্টে' বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে।

তারপরও যেহেতু অনেকে অজ্ঞতাবশত বা পারিভাষিক সংমিশ্রণ, ধারার বিভিন্নতা, জটিল সিস্টেম ইত্যাদির কারণে বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হয় না, তাই এ প্রবন্ধে আমরা বিষয়টি বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি। প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘায়িত না করার জন্য পূর্বে আমরা সরাসরি উদ্ধৃতি উল্লেখ না করে শুধু রেফারেন্স উল্লেখ করেছি। তবে আলোচনাধীন বিষয়টির গুরুত্বের কারণে এবং এ ব্যাপারে সৃষ্ট বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে এখানে আমরা ফরেক্স ট্রেডে বাস্তব লেনদেন না হওয়ার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কিছু উদ্ধৃতিও উল্লেখ করবো।[৬০৮]

বিশেষজ্ঞদের মতে, ফরেক্স মার্কেটের মাত্র ২০% লেনদেন ও ব্যবসা বাস্তব বাণিজ্যিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। আর বাকী ৮০% লেনদেনের কোনো বাণিজ্যিক ভিত্তি তো দুরের কথা, কোনো ফিজিক্যাল অস্তিত্বই থাকে না। কারেন্সির মূল্যের প্রতিনিয়ত উঠানামাকে কেন্দ্র করে লাভ ও লস গণনাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। বাস্তবে কারেন্সির কোনো স্থানান্তর বা হস্তান্তরের কোনো প্রশ্নও এখানে উঠে না।

Investopedia-তে খ্যাতনামা কারেন্সি মার্কেট বিশেষজ্ঞ Boris Schlossberg[৬০৯] তার এক প্রবন্ধে লিখেন-

''What are you really selling or buying in the currency market?

The short answer is **"nothing"**. The retail FX market is purely a **speculative** market. **No physical exchange** of currencies ever takes place. All trades exist **simply as computer entries** and are **netted out** depending on market price. For dollar-denominated accounts, all profits or losses are **calculated** in dollars and recorded as such on the trader's account.

The primary reason the FX market exists is to facilitate the exchange of one currency into another for multinational corporations that need to trade currencies continually….. However, these day-to-day

---

[৬০৭] এ ব্যাপারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্রোকার কোম্পানির এজেন্ট ও ম্যানেজারদের সাথে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে। তাদের বক্তব্য আমাদের নিকট সংরক্ষিত আছে।

[৬০৮] বিষয়টি এমন কিছু না, যা প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে। এখানে আমরা শুধু উদাহরণস্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। আমাদের কাছে এ ধরনের আরো বহু উদ্ধৃতি সংরক্ষিত আছে। পাঠক নিজেও ব্রোকার কোম্পানিগুলোর হেল্প ডেস্কে প্রশ্ন করে বা তাদের ক্লায়েন্ট এগ্রিমেন্ট দেখে বিষয়গুলো বের করতে পারবেন।

[৬০৯] খ্যাতনামা কারেন্সি রিসার্চার। FX Stratrgy (BK Asset Management) এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কারেন্সি মার্কেট সম্পর্কে তার গবেষণাসমূহ ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

corporate needs comprise only about 20% of the market volume.[৬১০] Fully 80% of trades in the currency market are speculative in nature, put on by large financial institutions, multibillion dollar hedge funds and even individuals who want to express their opinions on the economic and geopolitical events of the day.''[৬১১]

"কারেন্সি মার্কেটে বাস্তবে আপনি কী ক্রয়-বিক্রয় করে থাকেন?

একবাক্যে এর উত্তর হলো- "কিছুই নয়"। রিটেইল ফরেক্স মার্কেট একটি খাঁটি ফটকামূলক মার্কেট। এখানে কখনো কারেন্সির ফিজিক্যাল এক্সচেঞ্জ হয় না। বাস্তবে সকল ট্রেড 'কম্পিউটারের কিছু সংখ্যা'ই হয়ে থাকে। যা কারেন্সির বাজারমূল্য হিসেবে 'গণনা' করা হয়। ডলারভিত্তিক একউন্টে লাভ-লস ডলারেই গণনা করা হয় এবং ট্রেডারের একাউন্টে সেভাবেই রেকর্ড করা হয়।

ফরেক্স মার্কেটের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর দৈনন্দিন বৈদেশিক কারেন্সি বিনিময় এবং ব্যবসার চাহিদা পূরণ।... তবে এসব বাস্তব ব্যবসায়িক লেনদেন মোট মার্কেটের (লেনদেনের) মাত্র বিশ শতাংশ হবে। ফরেক্স মার্কেটের বাকি আশি শতাংশ লেনদেন পুরোটাই প্রকৃতিগতভাবে ফটকামূলক। যা বড় ফিন্যন্সিয়াল প্রতিষ্ঠান বা হেজ ফান্ডের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে হয়ে থাকে।..."

Boris Schlossberg-এর বক্তব্য থেকে আশা করি পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। আসলে 'বাই'-'সেল' ইত্যাদি শব্দের কারণে অনেকে এ বিষয়ে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। বাস্তবে ফরেক্সে এসব পরিভাষা স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

প্রসিদ্ধ ব্রোকার কোম্পানি XM-এর 'ক্লায়েন্ট এগ্রিমেন্টে'র শুরুতেই (১১.৮ নং ধারা) বলা হয়েছে-

"Where any of the words "purchase" and/or "sale" and/or "buy" and/or "sell" appear in this agreement, unless the context otherwise requires, they will be read and construed as **technical terms only**, as this agreement does not envisage the **transfer** of title to **any financial instruments ("delivary") traded hereunder**"

"এই এগ্রিমেন্টে পারচেস-সেল বা বাই-সেল ইত্যাদি শব্দ সাধারণত (ভিন্ন কোনো অনুষঙ্গ না থাকলে) নিছক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ, এই এগ্রিমেন্টে কোনো ধরনের আর্থিক উপকরণের (যার ট্রেড এখানে হয়ে থাকে) আদান-প্রদানের পরিকল্পনা বা বিবেচনা করা হয় না।"

---

[৬১০] উচ্চপর্যায়ের ফরেক্স ট্রেডিং-এও স্পেকিউলেশনের প্রচলন আছে (মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, ১১ তম সংখ্যা); তবে রিটেইল ট্রেডিং-এর তুলনায় কম। রিটেইল ট্রেডিং প্রায় পুরোটাই স্পেকিউলেশনধর্মী হয়ে থাকে। (Forex Market Size And Liquidity: babypips.com আরো দেখুন: CFD Trading vs. Spot Forex Trading (babypips.com)

[৬১১] Investopedia: Top 7 Questions About Currency Trading Answered, By Boris Schlossberg (Updated May 3, 2017)

আরেকটি প্রসিদ্ধ ব্রোকার কোম্পানি Forex.com (Gain Capital UK)-এর 'ক্লায়েন্ট এগ্রিমেন্টে' (২১.১) বিষয়টি স্পষ্টভাবে লেখা আছে-

"With respect to Margin Transaction … you acknowledge and agree that unless otherwise agreed in a formal written instrument you will not be **entitled to delivery of, or be required to deliver**…."

"মার্জিন লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনি এটার স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, (ভিন্ন কোনো লিখিত চুক্তি না থাকলে) আপনি কোনো কিছু ডেলিভারির অধিকারী হবেন না (দাবি করতে পারবেন না) এবং আপনাকেও কোনো কিছু ডেলিভারি করতে বলা হবে না।"

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হলো যে, আসলে 'ক্রয়-বিক্রয়' ইত্যাদি ফরেক্সে নিছক পরিভাষা মাত্র। বাস্তবে কোনো লেনদেনই হয় না। এমনকি 'ক্রয়-বিক্রয়'-এর দ্বারা কোনো ধরনের মালিকানারও হস্তান্তর হয় না। মালিকানার হস্তান্তর হচ্ছে, এমনটি 'ধরা'ও হয় না। বিষয়টি Think markets নামক আরেকটি ব্রোকার কোম্পানির ওয়েবসাইটে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

The primary similarity between CFD trading and forex trading is that **neither entitles the trader to actual ownership of the underlying asset**. When one buys EURAUD, for instance, one is **not actually purchasing euros and selling Australian dollars**; rather the trader is **simply speculating on the exchange rate**. Likewise, when a trader purchases a CFD contract on the FTSE 100, the trader is not actually **owning** the stocks in the FTSE index, but rather is **speculating** on its underlying price. In many ways, forex is simply another kind of CFD.[৬১২]

"সিএফডি ও ফরেক্স-এর মাঝে প্রধান/প্রাথমিক মিল হলো, উভয়টিতেই ট্রেডার কখনো ট্রেডকৃত সম্পদের বাস্তব স্বত্ব বা অধিকার লাভ করে না। উদাহরণস্বরূপ, কেউ EURAUD বাই করলো। এখানে বাস্তবেই যে সে ইউরো ক্রয় করছে এবং অস্ট্রেলিয়ান ডলার বিক্রয় করছে এমন নয়; বরং সহজভাবে বললে, এখানে ট্রেডার মূলত এক্সচেঞ্জ রেট নিয়ে ফটকা খেলছে। এমনিভাবে সিত্রফডির ক্ষেত্রেও কোনো ট্রেডার যদি FTSA 100-এর ভিত্তিতে সিএফডি ক্রয় করে, তাহলে বাস্তবেই যে সে FTSA-এর শেয়ারগুলোর মালিক হবে এমন নয়; বরং সে এখানে শেয়ারগুলোর প্রাইস নিয়ে ফটকা খেলছে। বিভিন্ন দিক থেকেই ফরেক্স কেবল সিএফডির[৬১৩] একটি প্রকার।"

যেহেতু কোনো ধরনের লেনদেনই হয় না; তাই বাস্তবে প্রচলিত ধারার ফরেক্সে দু'পক্ষ কোনো একটি কারেন্সি পেয়ারের উপর পজিশন ধরে লাভ-লস করে থাকে। এর সাথে বেটিং এবং

---

[৬১২] https://www.thinkmarkets.com/en/learn-to-trade/beginner/cfds-explained/cfd-vs-forex/

[৬১৩] অর্থাৎ, কন্ট্রাক্ট ফর ডিফারেন্স (Contract for difference) বা নিছক লাভ-লসের চুক্তি।

জুয়ার মৌলিক কোনো তফাৎ তারা দেখাতে পারেন না।

বিষয়টি আরো ভালোভাবে বুঝার জন্য Forex.com-এর কয়েকজন এজেন্টের সাথে আমাদের প্রশ্নোত্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ[৬১৪] নিম্নে তুলে ধরা হলো-[৬১৫]

…………………………

Vincent.M
at 6:53, Oct 20:
There is not physical exchange its all done through the **platform based on price quotes**
Is there any physical delivery in Forex?
Micah.P
at 7:43, Nov 23:
No, ….
Taq
at 7:44, Nov 23:
So*, buying or selling =* ***transaction of computer entries*** *only?*
Micah.P
at 7:45, Nov 23:
…. So yes, it is all speculative.
Taq
at 7:46, Nov 23:
So, there is ***no transaction of e-curreney, but computer entries*** *only?*
Micah.P
at 7:47, Nov 23:
yes.
Micah.P
at 7:47, Nov 23:
It is all **placeholders**.
Micah.P
at 7:47, Nov 23:
and speculative.
Micah.P
at 7:47, Nov 23:
No money ever gets exchanged.

---

[৬১৪] প্রশ্নোত্তর চলাকালীন সময়ের স্ক্রিনশট আমাদের নিকট আছে। এখানে সরাসরি চ্যাট বক্স থেকে কপি করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

[৬১৫] মূল প্রশ্নোত্তর এবং অনুবাদ উভয়টিতে আমাদের প্রশ্নের বাক্যটি ইটালিক ফরম্যাটে (বাঁকা) আছে।

Taq
at 7:47, Nov 23:
what means: "placeholders" my dear?
Micah.P
at 7:50, Nov 23:
It means that it is **holding it**.
Micah.P
at 7:50, Nov 23:
It is not **actual currency** that you are trading.
Taq
at 7:50, Nov 23:
Why my dear?
Micah.P
at 7:51, Nov 23:
Because that is not what we do here.
Micah.P
at 7:51, Nov 23:
It is not a foreign exchange center.
Taq
at 7:52, Nov 23:
Do not I 'buy' or 'sell'? and buying and selling means exchange? My dear!
Micah.P
at 7:53, Nov 23:
I don't think you understand what we do here.
Micah.P
at 7:53, Nov 23:
We do not do exchanges.
Micah.P
at 7:53, Nov 23:
It is essentially betting on if a certain rate will go up and down.[৬১৬]

"- *ফরেক্সে কী কারেন্সির কোনো ফিজিক্যাল ডেলিভারি হয়ে থাকে?*

- না।

- *তাহলে বাই-সেল মানে কি শুধু কম্পিউটারের সংখ্যার লেনদেন?*

---

[৬১৬] ফরেক্স ট্রেডিং-এর জুয়াসদৃশতার বিষয়টি স্বয়ং ফরেক্স কার্যক্রমের বিবরণ দেয়ার ক্ষেত্রে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়, তা থেকেই অনুমিত হয়। ফরেক্স ট্রেডকে বলা হয় 'পজিশন'। সাধারণত ট্রেড করার ব্যাপারে Betting শব্দের ব্যবহার করা হয়। ট্রেড সাইজকে বলা হয় 'লট'। হুবহু এসব পরিভাষা জুয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় এবং জুয়ার প্রকৃতির সাথেই তা অধিক সামঞ্জস্যশীল।

- হ্যাঁ। এগুলো সব স্পেকিউলেটিভ।

- তাহলে বাস্তবে কোনো ই-কারেন্সির লেনদেন হয় না; বরং কম্পিউটার এনট্রির আদান-প্রদান হয়?

- হ্যাঁ... এরা (ট্রেডার) সবাই প্লেসহোল্ডার... এবং স্পেকিউলেটিভ। কখনো কোনো অর্থের বিনিময় হয় না।

- প্লেসহোল্ডার মানে?

- মানে তারা শুধু পজিশন হোল্ড করে। আরে! আপনি কোনো বাস্তব কারেন্সির ট্রেড করেন না।

- কেন?

- কারণ, এটা তো আমাদের কাজ নয়। এটা তো কোনো (বাস্তব) ফরেন এক্সচেঞ্জ সেন্টার নয়।

- আরে ভাই! আমি বাই-সেল তো করি। বাই সেল মানেই তো এক্সচেঞ্জ বা লেনদেন?

- আপনি আসলে আমদের কাজ বুঝতে পারছেন না। আমরা বাস্তবে এক্সচেঞ্জ কারি না। মূলত এখনে কারেন্সির রেটের উঠা-নামাকে কেন্দ্র করে 'বেটিং' হয়ে থাকে।"

উপরোক্ত বিষয়ে তাদের সাথে আমাদের আরো কিছু প্রশ্নোত্তর নিম্নরূপ-

………………

You are essentially betting 1 currency again another.

hyt

at 0:12, Nov 25:

what means betting?

hyt

at 0:13, Nov 25:

Do I not exchange?

AlDcia.C

at 0:13, Nov 25:

Betting is the act of gambling money on the outcome of a race, game, or other unpredictable event.

AlDcia.C

at 0:13, Nov 25:

We do NOT provide physical currency exchange or facilitate international money transfers.

hyt

at 0:15, Nov 25:

Is not gambling a bad thing (as I heard from some peoples)? What is the fact?

AlDcia.C

at 0:16, Nov 25:

That is **something you need to decide** on your end.[৬১৭]

---

[৬১৭] আসলে পশ্চিমাদের কাছে ব্যবসায়, ফটকা, জুয়া ইত্যাদির মাঝে পার্থক্যের ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট কোনো মানদন্ড নেই (এ ব্যাপারে দেখুন, Present Financial Crisis: Causes and Remedies)। আর তারা ফরেক্স ও জুয়ার মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে ততটা আন্তরিকও না। কারণ Gambling বা জুয়া তাদের নিকট

Speculating vs. betting*?*

AlDcia.C

at 0:29, Nov 25:

They are the same.

"-আপনি এখানে মূলত দু'টি কারেন্সি নিয়ে বেট করেন।

- বেটিং কী? আমি কী এক্সচেঞ্জ (বিনিময়) করি না?

- বেটিং হলো রেইস, গেইম বা অন্য কোনো অনির্দিষ্ট ঘটনার ফলাফলের উপর টাকার জুয়া খেলা। আমরা কোনো বাস্তব ফিজিক্যাল কারেন্সি বিনিময় করি না বা আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার করি না।

- (ফরেক্স যদি জুয়া হয়, তাহলে) জুয়া কি মন্দ নয়?

- এটা আপনি সিদ্ধান্ত নিবেন।

- স্পেকিউলেশন আর বেটিং-এর মাঝে কোনো পার্থক্য আছে?

- উভয়টি এক।"

প্রসঙ্গ: স্পেকিউলেশন (Speculation)

উপরের আলোচনায় বারবার স্পেকিউলেশনের (Speculation) প্রসঙ্গ এসেছে। স্পেকিউলেশন শব্দের শাব্দিক অর্থ: নিছক অনুমান করা। স্পেকিউলেশনের ব্যাপক অর্থানুসারে সকল ব্যবসা কার্যক্রম এর অর্ন্তভুক্ত।[৬১৮] কারণ, কোনো ব্যবসা কার্যক্রম লাভক্ষতির অনুমান ও স্বাভাবিক ঝুঁকি থেকে খালি নয়। কিন্তু শুধু এ কারণেই কোনো ব্যবসা কার্যক্রমকে স্পেকিউলেশন বলা হয় না। প্রচলিত স্পেকিউলেশন আর ব্যবসা দু'টি ভিন্ন বিষয়। আরবীতে স্পেকিউলেশনের সমার্থক শব্দ হলো المضاربة। উর্দুতে سٹہ এবং বাংলায় ফটকাবাজি। প্রচলিত অর্থে, বাস্তব লেনদেনকে ফাঁকি দিয়ে লাভ-লস তোলার প্রক্রিয়াই হলো স্পেকিউলেশন বা ফটকা। এতে না কোনো ধরনের ডেলিভারি হয়, না বাস্তবে কোনো মালিকানা বা রিস্কের হস্তান্তর হয়। শুধু একের পর এক নামসর্বস্ব ক্রয়-বিক্রয় করে লাভ-লস বরাবর করা হয়।

স্পেকিউলেশনের ব্যাপারে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। এসব ভ্রান্তি নিরসনের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট বিবরণ পেতে পাঠক (১) Present Financial Crisis: Causes and Remedies (অনুবাদ:موجودہ عالمی بحران اور اسلامی تعلیمات) এবং (২) المضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين বা Speculation between Proponents and Opponents এ দু'টি প্রবন্ধ পড়ে দেখতে পারেন।

ফরেক্স ট্রেডিং হলো স্পেকিউলেশনের আদর্শ নমুনা। উপরে ফরেক্স ট্রেডিং-এর যে বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকেই স্পেকিউলেশনের সরল রূপরেখা জানা যায়। যেহেতু স্পেকিউলেশনে বিশেষ ধরনের বাড়তি 'রিস্ক' থাকে এবং বাস্তবিক ব্যবসাকে (যা প্রফিট-লসের মূলভিত্তি) ফাঁকি দিয়ে শুধু প্রফিট-লসকে গণনা করা হয়,[৬১৯] তাই বিশেষজ্ঞদের মতে এ ধরনের

কিছুটা অসম্মানজনক হলেও একেবারে অবৈধ নয়। (উদাহরণস্বরূপ দেখুন, Wikipedia: Bookmaker (gambling)

[৬১৮] এ্যাডাম স্মিথ স্পেকিউলেশনের যে আলোচনা করেছেন, তা খাঁটি ব্যবসা সংক্রান্ত।

[৬১৯] Investopedia: What is the difference between investing and speculating?

কার্যক্রম ব্যবসার তুলনায় জুয়ার সাথে বেশি সাদৃশ্য রাখে।[৬২০] উপরে এ ব্যাপারে এক ব্রোকার-এজেন্টের স্বীকারোক্তি আমরা দেখেছি।

এজন্যই সমকালীন একজন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ Michael Greenberger জোর গলায় বলেছেন, রিটেইল ফরেক্স ট্রেডিং ১০০% জুয়া।[৬২১]

একনজরে প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডিং-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডিং-এর মৌলিক কাঠামো ও নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছি:

১. ফরেক্স ট্রেডিং -এ বাস্তব কারেন্সি ব্যবহার হয় না। বিশেষজ্ঞদের ভাষায়, শুধু কম্পিউটারের সংখ্যার লেনদেন হয়।[৬২২]

২. বাস্তবে কোনো 'ক্রয়-বিক্রয়' হয় না। ডেলিভারি তো দূরের কথা, মালিকানার হস্তান্তরও 'ধরা' হয় না।

৩. আসলে ট্রেডের ক্ষেত্রে চুক্তিটি হয় লাভ-লসের। কিন্তু শাব্দিকভাবে 'ক্রয়-বিক্রয়' ইত্যাদি শব্দ বলে রেটের উঠানামার কারণে যে লাভ বা ক্ষতি হবে, তার রিস্ক বা দায়ভার আদান-প্রদান করা হয়। যেমন, আমি এত ডলার ক্রয় করলাম: ফরেক্সে এর বাস্তব অর্থ হলো, এত ডলারের সমপরিমাণ রেটের উঠানামার রিস্ক আমি গ্রহণ করলাম। বিষয়টি উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে স্পষ্ট হওয়ায় বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই।

৪. কোনো ধরনের লেনদেন ছাড়াই শুধু রিস্ক বহনের কারবার হওয়ায় বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি নিরেট জুয়ার মতোই।

৫. কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ক্রয়-বিক্রয়ের' দ্বারা মালিকানার হস্তান্তর হচ্ছে মনে করা হলেও, তা ফটকা হয়ে থাকে।[৬২৩] অর্থাৎ, এতে এসেট (Asset) আদান-প্রদানের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, কোনো ব্যবস্থাও থাকে না। যার কারণে এটিও অনেকটা জুয়াসদৃশ চুক্তিতে পরিণত হয়।

ফরেক্স ট্রেডিং-এর শর'য়ী বিধান

পূর্বে আমরা প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডিং সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ করেছি। বলা বাহুল্য, ফরেক্স

---

[৬২০] বিস্তারিত দেখুন: পূর্বোক্ত দু'টি প্রবন্ধ। এখানে আলোচনা দীর্ঘ করা হলো না।

[৬২১] https://www.bloomberg.com/news/videos/2014-11-12/retail-forex-market-100-gambling-greenberger-says-video

[৬২২] এটা তো স্পষ্ট যে, ফিজিক্যাল এক্সচেঞ্জ না হওয়ার অর্থ এটা না যে, "এখানে ই-কারেন্সির লেনদেন হয়; কিন্তু সাধারণত ফিজিক্যাল কারেন্সিতে ক্যাশ করা হয় না"; বরং এখানে ফিজিক্যাল কারেন্সিতে ক্যাশ করা সম্ভবই না। এটাতো সবার জানা আছে যে, বর্তমানে সারাবিশ্বে ডেবিট-ক্রেডিট এবং ক্যাশলেস সিস্টেমে লেনদেন হয়; তাই বলে সব লেনদেনকেই কেউ nothing বলে না। ই-কারেন্সি দিয়ে আমরা যেকোনো কেনাকাটা ও অন্যান্য প্রয়োজন সারতে পারি এবং ইচ্ছেমতো ক্যাশ করতে পারি। কিন্তু ফরেক্সে সাধারণত আমরা যা বাই করি তার উপর আমাদের হস্তক্ষেপ থাকে না। আমরা সেই ক্রয়কৃত কারেন্সি মোটেও ব্যবহার করতে পারি না। আর যেহেতু বিশেষজ্ঞদের মতে, বাস্তবে কোনো ক্রয়-বিক্রয় হয় না, তাই বিষয়টি এমনিতেই স্পষ্ট।

[৬২৩] সাধারণত, এখানে 'শর্ট সেল' বা অমালিকানাধীন এসেটের ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। (Currency trading for DUMMIS, Present Financial Crisis: Causes and Remedies, Wikipedia: Short)

ট্রেডিং-এর বর্তমান রূপ 'ফিকহুন নাওয়াযিল' (فقه النوازل)-এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকহের ইমামগণ بيع الصرف ও ফিকহের অন্যান্য অধ্যায়ে যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করে গেছেন, তা বিশ্লেষণ করলেই প্রচলিত ফরেক্সের শর'য়ী বিধান বের হয়ে আসবে। তাদের উল্লিখিত মূলনীতি ও দলীলসমূহের আলোকে আমরা এখানে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এখানে লক্ষণীয় যে, (ব্যাপকার্থে) ফরেক্সের বিভিন্ন ধারা রয়েছে। এমনকি আমাদের জানা মতে,[৬২৪] ফরেক্সে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও স্টক মার্কেটের মতো 'এক্সচেঞ্জ'ও[৬২৫] রয়েছে। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্যবিষয় হলো প্রচলিত স্পেকিউলেটিভ (ফটকামূলক) ফরেক্স, যা সাধারণত মার্জিন ট্রেডিং-এর পদ্ধতিতে বিভিন্ন ব্রোকার কোম্পানির মধ্যস্থতায় করা হয়ে থাকে। এজন্য পরিভাষাগত ব্যাপকতা ও পদ্ধতির বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে আমাদের নিম্নোক্ত আলোচনার ক্ষেত্রবহির্ভূত প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই।

প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডিং-এ বিদ্যমান শর'য়ী সমস্যাগুলো নিম্নরূপ-

১. নিরেট জুয়াবাজি

প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডিং সাধারণত মার্জিন ট্রেডিং বা সি.এফ.ডি. ধারায়[৬২৬] হয়ে থাকে। শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের ফরেক্স ট্রেডিং সরাসরি নিষিদ্ধ ক্বিমার (قمار) বা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমরা প্রথমে সংক্ষেপে ক্বিমারের পরিচিতি তুলে ধরবো। অতঃপর উপরোল্লিখিত ফরেক্স ট্রেডিং-এ কীভাবে ক্বিমার বা জুয়া পাওয়া যাচ্ছে তা পর্যালোচনা করবো।

শরী'আতের দৃষ্টিতে দু'পক্ষের মাঝে এমন যেকোনো (বাধ্যতামূলক) চুক্তিকে ক্বিমার বা জুয়া বলা হয়, যেখানে কোনো একটি **অনিশ্চিত বিষয়কে কেন্দ্র করে** কোনো এক পক্ষ **বিনিময়হীনভাবে লাভ বা ক্ষতি** করে।[৬২৭]

অর্থাৎ, ক্বিমার বা জুয়ার ক্ষেত্রে প্রথমত, এক পক্ষ সম্পদ লাভ করার জন্য কোনো বিনিময় দেয় না এবং অপর পক্ষ সম্পদ হারানোর পরিবর্তে কোনো বিনিময় পায় না (এককথায়, বিনিময়হীন লাভ-ক্ষতি হয়ে থাকে)। দ্বিতীয়ত, এই বিনিময়হীন লাভ-ক্ষতি হয়ে থাকে কোনো একটি অনিশ্চিত বিষয়কে কেন্দ্র করে।

ইমাম আবু সুলাইমান আল খাত্তাবী (৩৮৮ হি.) রাহ. বলেন-

إنما هو —القمار— **مواضعة** بين اثنين على **مال يدور بينهما في الشقين**، فيكون كل واحد منهما **إما غانما، أو غارما**.

"ক্বিমার হলো দুই ব্যক্তির মাঝে একটি চুক্তিমূলক অবস্থান, যা অনির্দেশ্য (অনিশ্চিত) কোনো ঘটনা হওয়া না হওয়াকে কেন্দ্র করে সম্পদ লাভ করা বা না করার উপর হয়ে থাকে। ফলে

---

৬২৪ দেখুন: https://www.slideshare.net/YoshiharuJoshSato/highfrequency-trading-in-the-fx-market

৬২৫ ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান (স্টক মার্কেটের মতো) (Foreign Exchange Markets- published by Pondicherry University, India)

৬২৬ অর্থাৎ, কন্ট্রাক্ট ফর ডিফারেন্স বা নিছক লাভ-ক্ষতির চুক্তি।

৬২৭ বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মু'আসিরাহ ২/১৫৬-১৫৮

উভয়ের যে কোনো একজন লাভবান হয়, অপরজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"[৬২৮]

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস (৩৭০ হি.) রাহ. কুরআনে বর্ণিত 'মাইসির' বা 'ক্বিমার' সম্পর্কে বলেন-

وحقيقته —الميسر– تمليك المال على **المخاطرة**. وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها، إذا علقت على الأخطار، بأن يقول: (قد بعتك إذا قدم زيد) و (وهبته لك إذا خرج عمرو).

"মাইসির-এর মূলতত্ত্ব হলো, ঝুঁকির ভিত্তিতে সম্পদের মালিকানা অর্জন। ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি মৌলিক কারণ।..."[৬২৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ক্বিমার বা জুয়ার মৌলিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১. জুয়ায় কোনো বাস্তব লেনদেন বা বিনিময় ছাড়াই কোনো এক পক্ষ সম্পদের অধিকারী বনে যায়।

২. অপর পক্ষ শর্তানুরূপ সম্পদ দিতে বাধ্য থাকে।

৩. অনিশ্চিত কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে হার-জিতের বেট হয়ে থাকে। হেরে গেলে বিনিময়হীনভাবে দিতে হয়, জিতে গেলে বিনিময়হীনভাবে সম্পদ লাভ হয়।

এগুলো হলো ক্বিমার বা জুয়ার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানে জুয়ার বিধান প্রযোজ্য হবে।

ইসলামী শরী'আতে ক্বিমার বা জুয়া সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾[৬৩০]

"হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদি ও জুয়ার তীর অপবিত্র, শয়তানী কাজ। সুতরাং এসব পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করো। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের বীজই বপন করতে চায় এবং চায় তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে। সুতরাং তোমরা কি (ওসব জিনিস থেকে) নিবৃত্ত হবে?"[৬৩১]

উল্লেখ্য যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফে সালেহীন ও আইম্মায়ে কেরামের মতে আয়াতে বর্ণিত মাইসির

---

[৬২৮] মা'আলিমুস সুনান ৩/৪০০ (২৪৬৯)

[৬২৯] আহকামুল কুরআন, সূরা মায়েদা, باب تحريم الخمر

[৬৩০] সূরা মায়েদা: ৯০-৯১

[৬৩১] সূরা মায়েদা, ৯০ ও ৯১

ও ক্বিমার সমার্থক বিষয়।[৬৩২]

আশা করি, উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা ক্বিমার বা জুয়ার মৌলিক পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও শর'য়ী বিধান স্পষ্ট হয়েছে।

জুয়া বা ক্বিমারের উপরোল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য ফরেক্স ট্রেডে পুরোপুরি বিদ্যমান। কারণ-

প্রথমত, নির্ভরযোগ্য ব্রোকার কোম্পানি ও ফরেক্স বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য অনুযায়ী সাধারণত মার্জিন ট্রেডিং, 'সি. এফ. ডি' ও 'রুলিং স্পট ট্রেডিং'-এর ধারার ফরেক্স ট্রেডে কোনো ক্রয়-বিক্রয় হয় না।[৬৩৩] তাদের মতে, 'ক্রয়-বিক্রয়' ইত্যাদি পরিভাষা এক্ষেত্রে নিছক টেকনিক্যাল টার্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[৬৩৪] বাস্তবে শুধু 'লাভ-ক্ষতির চুক্তি' (Contract for difference বা عقد الفروق)[৬৩৫] হয়ে থাকে। লাভ-ক্ষতি অর্জনের নিমিত্তে দু'টি কারেন্সির রেটকে কেন্দ্র করে পজিশন খোলা হয় এবং বন্ধ করা হয়। সহজ ভাষায় বলা যায়, শুধু কারেন্সি রেটের উপর বেটিং (Betting) হয়। হারজিতের পর যে কোনো একপক্ষ লাভবান হয়। এ কারণেই ব্রোকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও এর অর্থ Gambling (জুয়া) বলে উল্লেখ করেন।[৬৩৬] ভাষা,[৬৩৭] উর্ফ ও আইনের[৬৩৮] পরিভাষায়ও সাধারণত এ ধরনের ফরেক্সকে জুয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, ফরেক্স মূলত একটি মানি গেইম। এখানে হার-জিত নির্ভর করে অনিশ্চিত পরিস্থিতির উপর।[৬৩৯]

লক্ষণীয় যে, এখানে শুধু কারেন্সি রেটের উঠানামার অনিশ্চয়তার কারণে ফরেক্স ট্রেডকে

---

[৬৩২] জামেউল বয়ান, ইবনে জারীর তাবারী রাহ. (৩১০ হি.) ২/৩৫৮, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[৬৩৩] 'ফরেক্স লেনদেনের বাস্তবতা' শিরোনামের আলোচনা দেখুন

[৬৩৪] অর্থাৎ, Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM), Customar agreement, Forex.com

[৬৩৫] ব্যাপকার্থে। শুধু পারিভাষিক C.F.D-এর ব্যাপারে বলা হচ্ছে না। দেখুন: CFD vs. Forex: Thinkmarkets.com. সাধারণত 'ক্রয়-বিক্রয়ের' কারণে এতে মালিকানার কোনো ধরনের হস্তান্তর হচ্ছে, এমন হিসেবও করা হয় না।

[৬৩৬] আমাদের নিকট তাদের স্বীকারোক্তি সংরক্ষিত আছে।

[৬৩৭] ভাষাগত দিক থেকেও: লিসানুল আরব, ৫/১১৫, তাজুল 'আরুস, ১৩/৪৬৬।

[৬৩৮] বিস্তারিত দেখুন: আল ওয়াসিত ফী শারহিল ক্বানুনিল মাদানী, পৃ. ৯৮৭, ১০৩২-১০৩৩ (খণ্ড: ৭-২), আব্দুর রায্যাক সানহুরী (১৯৭১ খৃ.)।

[৬৩৯] এখানে এ ধরনের সন্দেহেরও অবকাশ নেই যে, এখানে তো ট্রেডার নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোনো সময় ট্রেড ক্লোজ করতে পারে। কারণ, একে তো সর্বক্ষেত্রে এ সুযোগ থাকে না। দ্বিতীয়ত, মার্কেটের লিকুইডিটি কম থাকলে প্রায়ই এটা সম্ভব হয় না। অন্যান্য ঘটনা তো আছেই। আর বিশাল লিভারেজের কারণে যেকোনো সময় ট্রেড স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লোজ হওয়ার ভয় থাকে। সাধারণত হয়েও থাকে এটিই। আর বহুল প্রচলিত অপশন ফরেক্সে তো ট্রেড ক্লোজ করার সময়ও নির্দিষ্ট থাকে। সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রেই ট্রেড ক্লোজ করার সীমা নির্ধারণ করা থাকে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন: Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM): 44.1 (বিস্তারিত দেখুন: 'প্রচলিত কারেন্সি ব্যবসায়ের স্বরূপ ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ')।

যদি কোনো ক্ষেত্রে অনেক বড় পুঁজি নিয়ে পজিশন খোলা হয় (যা সাধারণত সম্ভবও হয় না) তাও এটি জুয়ার বলয় থেকে বের হতে পারবে না; কারণ, এক্ষেত্রে শুধু এতটুকু পার্থক্য হয় যে, অনিশ্চিয়তা কম থাকে। আর জুয়ার অন্যান্য উপাদান এখানে পুরোপুরিই পাওয়া যায়। অনিশ্চয়তাও থাকে।

নাজায়েয বলা হচ্ছে না। কারণ, যদি কেউ সাধারণ মানি এক্সচেঞ্জারের মাধ্যমে পুনঃপুনঃ ক্রয়-বিক্রয় (বাস্তবার্থে) করে, তাহলে তা জুয়া হবে না। কিন্তু এখানে মূলত বিনিময়হীন মানি গেইম হওয়া সহ জুয়ার অন্যান্য উপাদানগুলোও পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকায় এটি নিরেট জুয়াবাজিতে পরিণত হয়েছে।

তৃতীয়ত, আমরা জানি, ফরেক্স ট্রেডে লস হলে অপর পক্ষকে অর্থ প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

জুয়ার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে মার্জিন ট্রেডিং এবং সি.এফ.ডি ধারার ফরেক্স ট্রেডিং শরী'আতের দৃষ্টিতে নিরেট ক্বিমার বা জুয়া গণ্য হয় এবং এ কারণে তা নিঃসন্দেহে হারাম ও নাজায়েয।

যেহেতু প্রচলিত পদ্ধতির ফরেক্স ট্রেডে বাস্তবে কোনো লেনদেনই হয় না, তাই সেগুলোর ব্যাপারে অন্যান্য শর'য়ী সমস্যার বিবরণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তারপরও আলোচনার পূর্ণতার জন্য ফরেক্সে বিদ্যমান অন্যান্য শর'য়ী সমস্যা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো। এছাড়াও মার্জিন ট্রেডিং ব্যতীত ফরেক্স ট্রেড-এর আরো কিছু ধারা রয়েছে, যেমনটি পূর্বে আমরা জেনেছি। তাই নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোও উল্লেখ করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

২. অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়

আমরা জানি, শরী'আতের দৃষ্টিতে কোনো লেনদেন বা চুক্তি একমাত্র কোনো মজুদ বা অস্তিত্বশীল বস্তুর উপরই হতে পারে, কোনো মা'দুম বা অস্তিত্বহীন বস্তুর নয়।[৬৪০] যদিও তা পরবর্তীতে অস্তিত্বলাভ করার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। হাদীস শরীফে এসেছে-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية....

"রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভবতী পশুর পেটের বাচ্চা বা পরবর্তীতে ঐ বাচ্চার পেটে জন্মলাভকারী সম্ভাব্য বাচ্চা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। জাহিলিয়্যাহ-এর যুগে মানুষ এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতো।..." [৬৪১]

পূর্বোক্ত লিভারেজের বিষয়টি তো এর চেয়েও মারাত্মক; কারণ, তা সম্পূর্ণ একটি কল্পিত বিষয়। শুধু যে অস্তিত্বহীন তা নয়। পূর্বে আমরা জেনেছি যে, ব্রোকারদের ভাষ্য অনুযায়ী লিভারেজ হলো মার্জিনের (ট্রেডারের অর্থ) বাড়তি ক্ষমতা। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সাধারণ ব্যাখ্যানুযায়ী এর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব থাকে না এবং এটি নিছক একটি কল্পিত হিসাব বা ক্যালকুলেশন। (সাধারণ বোধ থেকেই এটা বোঝা যায় যে, এ ধরনের কল্পিত ক্যালকুলেশন বাস্তব লেনদেনে সম্ভব নয়।)

কল্পিত বস্তুর লেনদেন করে তার উপর লাভ-ক্ষতি অর্জন করা তো এমনিতেই 'আকলু আমওয়ালিন নাসি বিল বাতিল (أكل أموال االناس بالباطل)-এর অন্তর্ভুক্ত।[৬৪২] কারণ, এতে বিনিময়হীনভাবে অন্যের সম্পদ কেড়ে নেয়া হয়।[৬৪৩] তার উপর যদি লাভ-ক্ষতিকে এমন

---

[৬৪০] অস্তিত্বহীন বস্তু শরী'আতের দৃষ্টিতে বিনিময়যোগ্য সম্পদ নয়।

[৬৪১] সহীহ বুখারী: হাদীস নং (২০৯৬)

[৬৪২] ফুকাহায়ে কেরাম বিনিময়হীনভাবে অর্থ গ্রহণের সকল সূরতকে أكل أموال الناس بالباطل-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমনটি بيع العربون -এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়।

[৬৪৩] তাফসীরে তাবারী (সূরা নিসা: ২৯)

বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, যা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, তাহলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা হবে নিরেট ক্বিমার বা জুয়া, যেমনটি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. শর'য়ী কবযা'র অনুপস্থিতি : কারেন্সির বাকী লেনদেন ও অবাধ ফটকা

যদি মেনেও নেয়া হয় যে, আলোচ্য ফরেক্সে বাস্তব মুদ্রার লেনদেন হয়, তাহলেও তা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না; কারণ, এতে 'শর'য়ী কবযা' অনুপস্থিত। পূর্বে আমরা জেনেছি যে, ফরেক্স ট্রেডিং-এ কোনো কিছুর হস্তান্তর হয় না। ট্রেডারের ক্রয়কৃত মুদ্রা তার হস্তগত হয় না। এমনিভাবে অপর পক্ষের কাছে বিক্রয়কৃত মুদ্রা হস্তগত হয় না; বরং হস্তান্তরের পরিবর্তে পাল্টা ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। যাকে ক্যাশ সেটলমেন্ট (Cash settlement) বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো ফরেক্স ট্রেডে বাস্তবেই আদান-প্রদান এবং হস্তান্তর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ, তা ফটকামূলক নয়। পূর্বে আমরা জেনেছি যে, ফরেক্সে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও এ ধরনের কারেন্সি ব্যবসা আছে। কিন্তু সাধারণত ঐসব ফরেক্স ট্রেডেও উপস্থিত কারেন্সি হস্তগত করা হয় না; বরং এক-দু'দিন পর বা নির্দিষ্ট মেয়াদে কারেন্সি হস্তগত করা হয়। এ কারণে তাও শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়েয (বিস্তারিত সামনে আসছে)।

এখানে আমরা প্রথমে শর'য়ী কবযা'র পরিচিতি, প্রকারভেদ, শর্তসমূহ ও সংশ্লিষ্ট শর'য়ী মূলনীতি উল্লেখ করবো। এরপর সংক্ষেপে ফরেক্সে তার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করবো।

শর'য়ী কবযা : সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও গুরুত্ব

'কবযা' (القبض) অর্থ, কোনো কিছু হস্তগত করা বা গ্রহণ করা। কোনো বস্তু ক্রয় করার পর তা হস্তগত করা লেনদেনের স্বাভাবিক চাহিদা। বিভিন্ন কারণে শরী'আতে ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্ণাঙ্গতার জন্য 'কবযা'কে শর্ত করা হয়েছে। তাই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির দ্বারা মালিকানার হস্তান্তর হলেও শরী'আতের দৃষ্টিতে কবযা ব্যতীত রিস্ক বা যামান (ضمان)-এর অর্থাৎ, বস্তুর লাভক্ষতি বহনের দায়ভার হস্তান্তর হয় না। সুতরাং ক্রয়কৃত বস্তু হস্তান্তরের পূর্বেই যদি ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার দায় বিক্রেতার উপর বলে বিবেচিত হবে।

এজন্য একাধিক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কবযা বা হস্তগত করার আগে কোনো বস্তু বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وفي لفظ حتى يكتاله، وفي لفظ آخر: حتى يستوفيه. قال ابن عباس (راوي الحديث): ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وفي رواية: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

"... কোনো পণ্য ক্রয় করার পর তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করো না।"[৬৪৪]

হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রাহ. (৫৪ হি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

[৬৪৪] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২১৩৬, সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৫২৫, ১৫২৬, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৫১৬

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি ক্রয়-বিক্রয় করি। এর মাঝে আমার জন্য কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম? (অর্থাৎ, ক্রয়-বিক্রয়ের হালাল-হারাম বা বৈধ-অবৈধ পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে ধারণা দিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, যখন তুমি কোনো জিনিস ক্রয় করো, তখন তা হস্তগত করার আগে বিক্রয় করো না।"[৬৪৫]

হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাযি. (৪৫ হি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.

"রাসূল ﷺ ব্যবসায়ীদের কোনো বস্তু ক্রয় করে ঘরে তোলার আগে ক্রয়ের স্থানেই বিক্রয় করে দিতে নিষেধ করেছেন।"[৬৪৬]

সাহাবা ও তাবেইন রাযি.-এর ফুকাহায়ে কেরামও কবযা'কে রিস্ক হস্তান্তরের অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করেছেন। যেমন, বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত শা'বী রাহ. (১০৪ হি.) বর্ণনা করেন-

اشترى عمر فرسا واشترط حبسه إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما بعد، فحمل عمر عليه رجلا فعطب الفرس، فجعلا بينهما شريحا؟ فقال شريح لعمر: سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت؟ فقال عمر: قضيت بمر الحق.

"হযরত উমর রাযি. একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন এবং এই শর্তারোপ করলেন যে, তিনি ঘোড়াটিকে (কিছুদিন) নিজের কাছে রাখবেন। যদি এর মধ্যে তাঁর পছন্দ হয়, তাহলে ক্রয় চূড়ান্ত করবেন, অন্যথায় তা রহিত করবেন। ইত্যবসরে হযরত উমর রাযি. এক ব্যক্তিকে সেই ঘোড়ায় আরোহণ করান। এক পর্যায়ে ঘোড়াটি মারা যায়। (যেহেতু এখানে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত হয়নি, এ অবস্থায় বিক্রিতব্য ঘোড়া নষ্ট হয়ে যাওয়ার দায় কে বহন করবে ক্রেতা না বিক্রেতা?) এ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য হযরত উমর রাযি. কাযী শুরাইহ রাহ.-কে বিচারক বানালেন। হযরত শুরাইহ রাহ. হযরত উমর রাযি.-কে বললেন, আপনি যা ক্রয় করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকুন অথবা যা নিয়েছেন তা ফেরত দিন (অর্থাৎ, উভয় অবস্থায় তার রিস্ক আপনার বহন করতে হবে, আপনার সম্পদ নষ্ট হয়েছে বলে বিবেচিত হবে; কারণ, ঘোড়াটি আপনার কবযায় ছিলো)।"[৬৪৭]

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. (১৮৯ হি.) হযরত হাসান বসরী রাহ. (১১০ হি.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন-

عن الحسن أنه سئل عن رجل ابتاع من رجل طعاما والطعام في بيت، فأمر به أن يغلق ويدفع المفتاح إليه حتى يستوفيه، فأحرق البيت بما فيه من مال. قال – أي الحسن –: هو من صاحب الطعام، من أجل أنه لم يستوفه.

"হযরত হাসান রাহ. থেকে বর্ণিত আছে, তাঁকে এক ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যে অপর এক ব্যক্তি থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছিলো। ঐ খাদ্যদ্রব্য একটি ঘরে রাখা ছিলো।

---

[৬৪৫] (সহীহ) সুনানুত তিরমিযী: ৩/৫৩৫, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৫৩১৬, সুনানু আবী দাউদ:হাদীস নং ১৪১৫, সুনানুন নাসাঈ: হাদীস নং ৪৬০৩। ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন: حديث حسن صحيح

[৬৪৬] (সহীহ) সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ৩৪৯৯, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২১৬৬৮, সহীহ ইবনে হিব্বান: হদীস নং ৪৯৮৪

[৬৪৭] আল মুহাল্লা: ৮/৪৭০, মাকতাবায়ে তাওফিকিয়্যাহ

বিক্রেতা ঘরটি তালাবদ্ধ করে ঘরের চাবিটি ক্রেতাকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিল, যেন সে তা নিয়ে নিতে পারে। ইত্যবসরে পুরো ঘরটি মালমালসহ পুড়ে গেলো।

হাসান বসরী রাহ. বলেন, এখানে বিক্রেতার সম্পদ পুড়ে গেছে বলে বিবেচিত হবে, অর্থাৎ সেই ক্ষতির দায় বহন করবে। কারণ, ক্রেতা মাল (খাদ্যদ্রব্য) উসূল করেনি।"[৬৪৮]

এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, চুক্তি পূর্ণ হওয়ার জন্য কবযা আবশ্যক। কবযা ছাড়া যামান বা রিস্ক হস্তান্তর হয় না। দায়ভার বিক্রেতার উপরই থেকে যায়। সুতরাং কবযার পূর্বে ক্রয়কৃত বস্তু ক্রেতার মালিকানায় আসলেও ক্ষতির দায়ভার যেহেতু বিক্রেতা বহন করছে, তাই এ অবস্থায় তা বিক্রয় করা ক্রেতার জন্য জায়েয নয়। কারণ, এ অবস্থায় ক্রেতা এমন বস্তুর লাভ ভোগ করবে, যার ক্ষতি তার ভোগ করতে হয় না। আর এটা শর'য়ী মূলনীতি الغرم بالغنم এবং الخراج بالضمان-এর খেলাফ। এজন্য 'রিস্ক' বহন করা ব্যতিত কোনো বস্তুর পুনঃবিক্রয়কে শরী'আতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হযরত ইবনে উমর রাযি. (৭৩ হি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.

"বিক্রয়-চুক্তি ও কর্জ-চুক্তি একটিকে অপরটির জন্য শর্ত করা বৈধ নয়। এক চুক্তিকে অপর চুক্তির জন্য শর্ত করা বৈধ নয়। যে বস্তুর যামান (রিস্ক, ক্ষতির দায়) বহন করে না, তার মুনাফা বৈধ নয়।...."[৬৪৯]

এ হাদীস থেকে আরো পরিষ্কার হলো যে, শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কবযা ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না। পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামও বিভিন্নভাবে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) একটি মাসআলার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

... لأن البيع ينتقض من الأصل بفوات القبض المستَحق بالعقد.

"চুক্তির দাবি অনুযায়ী কবযা না পাওয়া গেলে বিক্রয় চুক্তি গোড়া থেকেই ভেঙ্গে যায়।"[৬৫০]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. (৮৬১ হি.) বলেন-

وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل العقد.

"কবযা করার পূর্বে পণ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা বিক্রয় চুক্তিকে বাতিল করে দেয়।"[৬৫১]

উল্লেখ্য, পুঁজিবাদী আইনেও 'কবযা' ব্যতীত রিস্কের হস্তান্তর হয় না। তবে পুঁজিবাদী আইনে অমালিকানাধীন বস্তু বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নয়। তাই 'কবযা'র পূর্বে কোনো কিছু বিক্রয় করাও

---

[৬৪৮] কিতাবুল হুজ্জাহ 'আলা আহলিল মাদীনাহ: ২২৭

[৬৪৯] সুনানুত তিরমিযী: হাদীস নং ১২৩৪, সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ৩৫০৪. সুনানুন নাসাঈ: হাদীস নং ৪৬৩০। ইমাম তিরমিযী রাহ. বলেন: وهذا حديث حسن صحيح। ইমাম ইবনে হিব্বান রাহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন: (موارد الظمآن ص ٢٧٤ ط السلفية)

[৬৫০] আল মাবসুত: ৩/৩০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[৬৫১] ফাতহুল কাদীর: ৭/১৪৮, (সরফের অধ্যায়) মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

তাতে নিষিদ্ধ নয়।[৬৫২] ইসলামী শরী'আত এবং জাগতিক আইনের এ পার্থক্যের কারণে লেনদেনের স্বরূপের ব্যাপারেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে বিস্তর তফাৎ পাওয়া যায়।

কবযা'র প্রকারভেদ

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, কবযার অর্থ, কোনো কিছু নির্দিষ্টভাবে হস্তগত করা। আমরা জানি, কিছু জিনিস সরাসরি নির্দিষ্টভাবে হস্তগত করা যায়, আর কিছু জিনিস সরাসরি নির্দিষ্টভাবে হস্তগত করা সম্ভব নয়। যেমন, জমি সরাসরি হাত দিয়ে ধরে কবযা করা সম্ভব নয়। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম 'কবযা'কে দু'প্রকারে ভাগ করেছেন-[৬৫৩]

(ক) 'কবযায়ে হাকীকী (القبض الحقيقي)।[৬৫৪] অর্থাৎ, স্বহস্তে গ্রহণ করা বা স্থানান্তর করা বা নিজের সংগ্রহে আনা;

(খ) 'কবযায়ে হুকমী' (القبض الحكمي) বা التخلية। অর্থাৎ, বস্তুটি প্রাপকের সংগ্রহে না দিয়ে শুধু তার আয়ত্তাধীন করা।

মাজাল্লাতুল আহকাম-এ আছে-

تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له.

"বিক্রেতা কর্তৃক আসবাবপত্র ক্রেতাকে অর্পণ করার বিভিন্ন রূপ হতে পারে। ক্রেতার হাতে দিয়ে দেওয়া, তার নিকট রেখে দেওয়া এবং তাকে তা দেখানোর পর কবয করার অনুমতি দেওয়া- এসব কবযা গণ্য হবে।"[৬৫৫]

'কবযায়ে হাকীকী'র স্বরূপ তো স্পষ্ট। শরী'আতের দৃষ্টিতে 'কবযায়ে হুকমী'র সারকথা হলো, কবযাকৃত বস্তু কাবিযের (হস্তগতকারীর) সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আসা। তাতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাঁধা না থাকা। বিষয়টি ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত 'তাখলিয়া' (التخلية) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে থাকেন। 'তাখলিয়া' বিদ্যমান আছে কিনা তা বোঝার জন্য কিছু আলামত তাঁরা স্থির করেছেন, যা পাওয়া গেলে প্রমাণিত হবে যে, তাখলিয়া এবং কবযা বিদ্যমান। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি পাওয়া গেলেই শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বস্তুর 'কবযায়ে হুকমী' পাওয়া যাবে:

১. যেকোনো সময় কবযাকৃত বস্তু স্বহস্তে সংগ্রহ করার সামর্থ্য রাখা;

২. যেকোনো ধরনের ব্যবহার ও হস্তক্ষেপের সামর্থ্য রাখা;

৩. বস্তুটি (অন্য বস্তু থেকে) সম্পূর্ণ আলাদা, নির্দিষ্ট এবং নির্ণীত হওয়া;

৪. বস্তুটির সম্পূর্ণ 'যামান' বা রিস্ক বহন করা।

ফুকাহায়ে কেরামের নিম্নোক্ত নুসূস (ভাষ্য) থেকে বিষয়গুলো পরিষ্কার বোঝা যায়:

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. (১০৮৮ হি.) বলেন-

---

[৬৫২] ফিকহুল বুয়ু': ৪১৩

[৬৫৩] লিসানুল হুককাম: ৩১১, শারহুল মাজাল্লাহ (আতাসী): ২/২০০ ও মাজাল্লাতুল আহকাম: ধারা নং ২৭২-২৭৫।

[৬৫৪] আল ইখতিয়ার লিতা'লিলিল মুখতার: ২/৮, বাদায়েউস সানায়ে: ৬/১৪১, তাবয়ীনুল হাক্বায়েক: ৫/৯২

[৬৫৫] ধারা নং: ২৭৪

ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه **يتمكن من القبض بلا مانع ولا حائل**.

"তাখলিয়া'র দ্বারাও (ক্রেতাকে) পণ্য অর্পণ করা যায়। আর তা এভাবে যে, ক্রেতা ও পণ্যের মধ্যকার সকল প্রতিবন্ধক উঠিয়ে দিবে, যেন ক্রেতা বাধাহীনভাবে তা হস্তগত করতে সক্ষম হয়।"[৬৫৬]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২ হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন-

أن التخلية قبض حكما لو مع **القدرة عليه بلا كلفة**؛ لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع، ففي نحو حنطة في بيت مثلا فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض، أي بأن يكون في البلد فيما يظهر، وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض وفي نحو ثوب فكونه بحيث لو مد يده تصل إليه قبض ، وفي نحو فرس أو طير في بيت إمكان أخذه منه بلا معين قبض.

(قوله : بلا مانع) بأن يكون **مفرزا غير مشغول بحق غيره**، فلو كان المبيع شاغلا كالحنطة في جوالق البائع لم يمنعه. بحر. وفي الملتقط: ولو باع دارا وسلمها إلى المشتري وله فيها متاع قليل أو كثير **لا يكون تسليما حتى يسلمها فارغة**، وكذا لو باع أرضا وفيها زرع. اهـ . وفي البحر عن القنية: لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح كقطن في فراش، ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية وإن كانت متصلة بملك البائع، وعن الوبري المتاع لغير البائع لا يمنع، فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده.

"তাখলিয়া অর্থাৎ, ক্রেতা ও পণ্যের মধ্যকার প্রতিবন্ধক উঠিয়ে দেওয়াটা বিধানগতভাবে কবযা গণ্য হবে, যদি ক্রেতা কোনো প্রকার বেগ পাওয়া ছাড়াই তা আয়ত্তে নিতে সক্ষম হয়। তবে পণ্যের অবস্থাভেদে তাখলিয়া'র বিভিন্ন রূপ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ গৃহস্থিত গম বা এ জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে ঘরের চাবি ক্রেতাকে অর্পণ করাটা কবযা বলে গণ্য হবে, যদি ক্রেতা কোনো প্রতিবন্ধক ছাড়াই তা খুলতে সক্ষম হয়। বাড়ির ক্ষেত্রে ... চারণভূমির গরু বা এ জাতীয় পশুর ক্ষেত্রে ... কাপড় বা এ জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে ...

প্রতিবন্ধকবিহীন হওয়ার দাবি এটাই যে, তা অন্যের অধিকার বা অধিকৃত বস্তু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং মুক্ত হবে। ...

যদি বিক্রেতা তার আসবাবপত্র সহকারে কোনো বাড়ি বিক্রয় করে এবং ক্রেতার কাছে তা অর্পণ করে, অথচ সেখানে তার (বিক্রেতার) আসবাবপত্র রয়ে গেছে, তাহলে বস্তুত তা অর্পণ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ না সে তা সম্পূর্ণ খালি করে দেয়। অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে যদি জমি বিক্রয় করে এবং ফসল সহকারে তা ক্রেতাকে অর্পণ করে। ..."[৬৫৭]

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. (১৩৫২ হি.)-এর সহীহ বুখারী'র দরসের সংকলন 'ফায়যুল বারী'তে আছে-

فاعلم أولا أن القبض في المنقولات لا يتحقق عند الشافعية إلا بالنقل والتحويل، وعندنا بالتخلية بينه وبين

---

[৬৫৬] আদ দুররুল মুখতার: ৬/৯৫, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৬৫৭] রদ্দুল মুহতার: ৬/৬৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

المشتري. أما إن التخلية ماذا هي؟ فهذا مما لا يكاد ينضبط إلا بعد النظر إلى الجزئيات شيئا. ومعناها عندي: **رفع علائق ملكه**، و**تمكينه** للمشتري على أن **يقبضه**، وذلك قد يكون بالفعل، وأخرى بالقول، وتارة بالقرائن.

"শাফেয়ী ইমামগণের নিকট অস্থাবর বস্তুর ক্ষেত্রে কবযা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য হস্তান্তর করা জরুরী। আর আমাদের (হানাফীদের) নিকট এক্ষেত্রে তাখলিয়া'ই যথেষ্ট। তাখলিয়া'র রূপ বা ধরন বিভিন্ন হতে পারে। তবে তার মূলকথা হলো, বিক্রিত বা বিক্রিতব্য বস্তু থেকে বিক্রেতার মালিকানা বা অধিকারের সকল সম্পৃক্ততা দূর করা এবং ক্রেতাকে পণ্য হস্তগত করার সুযোগ করে দেওয়া।..."[৬৫৮]

এ আলোচনা থেকে আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে, কবযার মূল বৈশিষ্ট হলো, কোনো জিনিস বাধাহীনভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে আয়ত্তে আসা। তাই যেখানে হাত দিয়ে ধরে কবযা করা সম্ভব নয় সেখানে উপরোক্ত আলামতগুলো পাওয়া গেলে কবযা সাব্যস্ত হবে। এ বিষয়টি স্মরণ রাখলে কারেন্সি বা মুদ্রার কবযার বিধান বুঝতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

কারেন্সির শর'য়ী কবযা

আমরা পড়েছি যে, কবযার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, কবযাকৃত বস্তুটি নির্দিষ্ট হওয়া।

কারেন্সির ব্যাপারে ফকীহগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো (النقود لا (تتعيَّن بالتعيين)। অর্থাৎ, কারেন্সির কোনো বিশিষ্টতা বা বস্তুগত স্বকীয়তা নেই ।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (৮৬১ হি.) বলেন-

ولا يخفى كثرة ما ذكروا في عدم تعين النقد في البيع من أنه لو أشار إلى دراهم وعينها كان له أن يحبسها ويدفع غيرها.

"বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মুদ্রা নির্দিষ্ট না হওয়ার বিষয়টি অজানা নয়। তাই যদি ক্রেতা (মূল্য আদায়ের জন্য) কিছু দিরহামের দিকে ইশারা করে, তাহলে সেগুলোই আদায় করা জরুরী নয়; বরং ক্রেতার সেগুলোর পরিবর্তে অন্য দিরহাম আদায় করার এখতিয়ার রয়েছে।"[৬৫৯]

আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ হামাভী রাহ. (১০৯৮ হি.) বলেন-

وذكر في الذخيرة أن الفلوس بمنزلة الدراهم والدنانير في أنها لا تتعين بالتعيين.

"যখীরা কিতাবে আছে যে, ধাতবমুদ্রাও নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট না হওয়ার ক্ষেত্রে দিরহাম, দিনারের অনুরূপ।"[৬৬০]

কারেন্সির এ বৈশিষ্ট্যের কারণে কারেন্সির কবযার বিধান বিভিন্ন দিক থেকে পণ্যের কবযার বিধান থেকে ভিন্ন। যেমন-

এক. কারেন্সি কোনো আলামত বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করার সুযোগ নেই। এজন্য কারেন্সির ক্ষেত্রে সাধারণত 'কবযায়ে হুকমী' সম্ভব হয় না। সরাসরি হাত দিয়ে ধরেই কবযা

---

[৬৫৮] ফায়যুল বারী: ৩/৪১৮ (২০৯৭)
[৬৫৯] ফাতহুল ক্বাদীর: ৭/১৩৩, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ
[৬৬০] গামযু উয়ুনিল বাসাইর ২/৫১, ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান

করতে হবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে কবযায়ে হাকীকী পাওয়া যেতে হবে।

দুই. যেহেতু কারেন্সি স্বহস্তে গ্রহণ করা ব্যতীত নির্দিষ্ট হয় না, তাই এর আগ পর্যন্ত তা বাকীই ধর্তব্য হয়। পণ্যের ক্ষেত্রে নগদ চুক্তি করার পর তা উপস্থিত হস্তান্তর না করলেও চুক্তিটি নগদই থাকে। কারণ, পণ্যের বস্তুগত স্বকীয়তা এবং নির্দিষ্টতা রয়েছে। এজন্য হানাফী ফকীহদের মতে সমজাতীয় কাইলী এবং ওয়াযনী দ্রব্য নির্দিষ্ট করে নিয়ে নগদ চুক্তি করলেই তা আর সুদের আওতায় আসবে না। কিন্তু কারেন্সি হস্তগত হওয়ার আগ পর্যন্ত বাকীই থেকে যায়। এজন্য তার ক্ষেত্রে স্বহস্তে কবযা করা জরুরী। শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) বলেন-

ولأن هذا العقد مبادلة الثمن بالثمن، والثمن يثبت بالعقد دينا في الذمة، والدين بالدين حرام في الشرع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، فما يحصل به التعيين وهو القبض لا بد منه في هذا العقد.

"কেননা এই চুক্তিটি ছামানের সাথে ছামানের বিনিময় চুক্তি। আর ছামান (মূল্য) চুক্তির ক্ষেত্রে দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকে (অর্থাৎ, তা যেকোনোভাবে পরিশোধ করতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর শর্ত নেই)। (যেহেতু ছামান ঋণ হিসেবে থাকে, তাই উভয়পক্ষে ছামান হওয়ার ক্ষেত্রে তা 'ঋণের বিনিময়ে ঋণ' হচ্ছে) আর ঋণের বিনিময়ে ঋণের বিক্রয় শরী'আতে হারাম। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইউল কালী বিল কালী (ঋণের বদলায় ঋণের বিক্রয়) থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যেকোনোভাবে এখানে নির্দিষ্টতা পাওয়া যাওয়া জরুরি। আর তা হতে পারে কবয করার দ্বারা।..."[৬৬১]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, কারেন্সির ক্ষেত্রে শরী'আতে কবযা বলতে স্বহস্তে কবযা বা কবযায়ে হাকীকী'ই উদ্দেশ্য। সুতরাং কোনো ক্ষেত্রে কবযায়ে হাকীকী না পাওয়া গেলেই বলা হবে- শর'য়ী কবযা পাওয়া যায়নি।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (৮৬১ হি.) এক্ষেত্রে পণ্য ও কারেন্সির মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

(ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط في) صحة بيعه (والقبض كالثوب) بالثوب والعبد بالعبد ونحو ذلك، وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو التمكن من التصرف، وذلك يترتب على **التعيين** فلا حاجة إلى اشتراط شرط آخر وهو القبض، بخلاف الصرف لأن التعيين لا يحصل فيه إلا بالقبض، فإن الدراهم والدنانير لا تتعين مملوكة بالعقد إلا بالقبض.

"(উভয়পক্ষে) নির্দিষ্ট পণ্যের বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য কবযা (হাকীকী) শর্ত নয়। যেমন, কাপড়ের বিনিময়ে কাপড়, গোলামের বিনিময়ে গোলাম ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করার ক্ষেত্রে কবযা শর্ত নয়। কারণ, কবযা'র মূল উদ্দেশ্য হলো তাসাররুফের (হস্তক্ষেপের) ক্ষমতা অর্জন হওয়া। আর তা পণ্য নির্দিষ্টকরণের দ্বারাই হয়ে যায়। সুতরাং এখানে অতিরিক্ত একটি শর্ত তথা 'হস্তান্তর'কে বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। তবে বাইয়ে সরফ এর বিপরীত; কারণ এতে কবযা ব্যতীত পণ্য নির্দিষ্টই হয় না। কেননা দিরহাম-দিনার শুধু চুক্তির মাধ্যমে মালিকানায় আসলেই

---

[৬৬১] আল মাবসূত: ১৪/৬, দারু ইহয়াউত তুরাছিল আরবী

নির্দিষ্ট হয়ে যায় না; বরং তা নির্দিষ্ট হওয়ার জন্য কবযা (সরাসরি হস্তগত করা) জরুরি।"[৬৬২]
আল্লামা আলাউদ্দিন আফেন্দী রাহ. বলেন-

إلا أن تعيين الدراهم والدنانير لا يقع إلا بالتسليم ليحصل التعيين.

"দিরহাম-দিনার হস্তান্তর করা ব্যতীত নির্দিষ্ট হয় না।"[৬৬৩]

এজন্য যেসব ক্ষেত্রে কারেন্সির নগদ 'কবযা' জরুরী, সেক্ষেত্রে উপস্থিত 'কবযা'ই জরুরী। কারণ, কারেন্সি হস্তগত হওয়ার আগ পর্যন্ত বাকীর হুকুমে থেকে যায়। যদিও চুক্তিটি নগদ হয়।[৬৬৪] কারণ, হস্তগত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার কোনো নির্দিষ্টতা পাওয়া যায় না। তাই দু'পক্ষের কারেন্সির কোনোটি হস্তান্তর করা না হলে উভয়পক্ষে বাকী ধর্তব্য হয়ে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে (যদিও চুক্তিটি নগদ হয়)। তাহলে, পণ্যের ক্ষেত্রে 'কবযা' না হলে 'নাসী'আহ' হওয়া জরুরী নয়; কিন্তু কারেন্সির ক্ষেত্রে 'কবযা' না হওয়া এবং 'নাসী'আহ' হওয়া একটি অপরটির জন্য অত্যাবশ্যক। পূর্বে উল্লিখিত ফিকহী নুসূস থেকে বিষয়টি পরিষ্কার।

ফরেক্সে কারেন্সির বাকী লেনদেন ও ফটকা

ভিনদেশী কারেন্সি লেনদেনের শর'য়ী বিধানের ক্ষেত্রে দু'টি মত প্রসিদ্ধ-

এক. বর্তমান মুদ্রাগুলোর লেনদেন بيع صرف-এর আওতাভুক্ত। তাই চুক্তিস্থলেই উভয়পক্ষের মুদ্রা কবযা করে নিতে হবে।

দুই. বর্তমান মুদ্রার লেনদেন بيع صرف-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং কমপক্ষে কোনো এক পক্ষের কবযা করতে হবে।

তাহলে উভয় মত অনুযায়ীই উপস্থিত কবযা আবশ্যক। এক পক্ষ থেকে হোক বা উভয় পক্ষ থেকে। কবযা না হলেই তা দাইন (دين) বলে বিবেচিত হবে। আর যদি কোনো পক্ষই কবযা না করে, তাহলে উভয় পক্ষের উপর দাইন হিসেবে থাকবে। এক্ষেত্রে তাদের লেনদেনটি দাইনের বিনিময়ে দাইনের লেনদেন হলো। শর'য়ী পরিভাষায় যাকে بيع الكالىء بالكالىء বা بيع الدين بالدين বলা হয়। শরী'আতে بيع الكالىء بالكالىء নিষিদ্ধ, হারাম এবং বাতিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত-

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ.

"রাসূল ﷺ ঋণের বদলায় ঋণ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"

এ হাদীসটির সনদ যঈফ[৬৬৫] হলেও এর মাযমূন জুমহুর আহলে ইলমের নিকট স্বীকৃত। এমনকি

---

[৬৬২] ফাতহুল ক্বাদীর: ৭/১৯ মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[৬৬৩] তাকমিলাতু রদ্দিল মুহতার: রাহান অধ্যায়

[৬৬৪] পণ্যের ক্ষেত্রে উভয়দিকে বাকি চুক্তি করা হলেই কেবল তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে। যদি নগদ চুক্তিতে উভয়পক্ষের পণ্য উপস্থিত হস্তগত করা নাও হয়, তাও কোনো সমস্যা নেই।

[৬৬৫] قال الزيلعي رحمه الله (٧٦٢هـ) في نصب الراية: حديث ابن عمر: رواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، والبزار في مسانيدهم من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ يعني ديناً بدين ، انتهى، ولفظ البزار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع

এর কোনো কোনো সূরতের উপর ইজমা'ও পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. (২৪১ হি.) বলেন-

ليس في هذا حديث يصح؛ لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.

“এ সম্পর্কে কোনো সহীহ হাদীস নেই; তবে এ ব্যাপারে আহলে ইলমের ইজমা রয়েছে যে, ঋণের বদলায় ঋণের বিক্রয় বৈধ হবে না।”[৬৬৬]

শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.)-এর পূর্বোক্ত নস আবার উল্লেখ করা হলো-

ولأن هذا العقد مبادلة الثمن بالثمن، والثمن يثبت بالعقد دينا في الذمة، والدين بالدين حرام في الشرع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، فما يحصل به التعيين وهو القبض لا بد منه في هذا العقد. [৬৬৭]

“কেননা এই চুক্তিটি ছামানের সাথে ছামানের বিনিময় চুক্তি। আর ছামান (মূল্য) চুক্তির ক্ষেত্রে দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকে (অর্থাৎ, তা যেকোনোভাবে পরিশোধ করতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর শর্ত নেই)। (যেহেতু ছামান ঋণ হিসেবে থাকে, তাই উভয়পক্ষে ছামান হওয়ার ক্ষেত্রে তা 'ঋণের বিনিময়ে ঋণ' হচ্ছে) আর ঋণের বিনিময়ে ঋণের বিক্রয় শরী'আতে হারাম। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইউল কালী বিল কালী (ঋণের বদলায় ঋণের বিক্রয়) থেকে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যেকোনোভাবে এখানে নির্দিষ্টতা পাওয়া যাওয়া জরুরি। আর তা হতে পারে কবয করার দ্বারা।...”[৬৬৮]

উল্লেখ্য, উভয়পক্ষে বাকি লেনদেন বা কারেন্সির ক্ষেত্রে উভয়পক্ষে হস্তগত না করা শুধু নাজায়েয এবং হারামই নয়; বরং এর কারণে কৃত চুক্তি শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বাতিল বলে বিবেচিত হয় এবং এই চুক্তির দ্বারা মালিকানার হস্তান্তর বা অন্য কোনো ফলাফল অর্জন হয় না।

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

بطل العقد؛ لأنه دين بدين، والدين بالدين لا يكون عقدا بعد الافتراق.

“এক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, এটা দাইনের বিনিময়ে দাইন হচ্ছে। আর দাইনের বিনিময়ে দাইনের চুক্তি কোনো চুক্তিই ধর্তব্য হয় না।”[৬৬৯]

عاجل بآجل، فالغرر أن تبيع ما ليس عندك، والكالئ بالكالئ دين بدين، والعاجل بالآجل أن يكون له عليك ألف درهم مؤجل، فتعجل عنها بخمسمائة، انتهى. ورواه ابن عدي في الكامل، وأعله بموسى بن عبيدة، ونقل تضعيفه عن أحمد، قال: فقيل لأحمد: إن شعبة يروى عنه، قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه، قال ابن عدي: والضعف على حديثه بين، انتهى. ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرني إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عبد اللّه بن دينار به، باللفظ الأول، وهو معلول بالأسلمي، ورواه الحاكم في المستدرك، والدارقطني في سننه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال: هو النسيئة بالنسيئة، انتهى. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، انتهى. وغلطهما البيهقي، وقال: إنما هو موسى بن عبيدة الربذي.

[৬৬৬] আত তালখীসুল হাবীর: ১১/১০৭

[৬৬৭] আল মাবসূত: ১৪/৬ দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী

[৬৬৮] আল মাবসূত: ১৪/৬, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী

[৬৬৯] আল মাবসূত: ১৪/২৫, باب البيع بالفلوس

এ মূলনীতি সামনে রেখে ফরেক্সের পর্যালোচনা করলে সহজেই শর'য়ী বিধান পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ, আমরা জানি, ফরেক্সে ভিনদেশী দু'টি কারেন্সির লেনদেন হয়ে থাকে। প্রথম মত অনুযায়ী এতে উভয়পক্ষে উপস্থিত নিজে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে স্বহস্তে কারেন্সি কবযা করা জরুরী। আর দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, যেকোনো এক পক্ষের কবযা জরুরী।

পূর্বে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভাষ্যের আলোকে ফরেক্স ট্রেডের পদ্ধতি, প্রক্রিয়া এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তার আলোকে পাঠকের নিকট নিশ্চয় স্পষ্ট যে, ফরেক্সে শর'য়ী কবযা'র কোনো উপাদান বা অনুষঙ্গই পাওয়া যায় না। কারণ, ফরেক্স মার্কেটের কমপক্ষে ৮০% লেনদেন হয়ে থাকে ফটকা বা ফটকামূলক।[৬৭০] কারেন্সি হস্তান্তরের কোনো উদ্দেশ্যও এতে থাকে না। আর মার্কেটের যে ২০%-এ কারেন্সির বাস্তব লেনদেন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তার ব্যাপারেও পূর্বে আমরা জেনেছি যে, এতে সাধারণত[৬৭১] নগদ হস্তান্তর হয় না।[৬৭২] এজন্য প্রচলিত ফরেক্সে উপস্থিত শর'য়ী কবযা না পাওয়া যাওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীত। তবুও আমরা নিম্নে বিষয়টিকে আরো খোলাসা করে বোঝার চেষ্টা করবো।

আয়কৃত মুদ্রায় কবযা না থাকার ধরন

পরিচিতি পর্বে আমরা দেখেছি, ট্রেড ওপেনের সময় ট্রেডার যে কারেন্সি ক্রয় করে, তা তার হাতে আসে না। এমনকি ব্রোকারের হাতেও আসে না। সুতরাং এতে সাধারণত কবযায়ে হাকীকী বা হুকমী কোনোটাই পাওয়া যায় না। কবযায়ে হাকীকী হতে পারে একমাত্র স্বহস্তে (নিজে বা কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে) গ্রহণ করলে। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কারেন্সির ক্ষেত্রে এটাই জরুরী। যদি এক্ষেত্রে কবযায়ে হুকমির সুযোগ থাকতো, তাও জায়েয হতো না। কারণ, কবযায়ে হুকমির পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর একটিও এখানে পাওয়া যায় না। কারণ-

ক্রয়কৃত কারেন্সি সংগ্রহ করার **সামর্থ্য** থাকে না।

আর ঐ কারেন্সিতে ট্রেডারের কোনো ধরনের **হস্তক্ষেপ** চলে না। ট্রেডার ইচ্ছে করলে এটা ভিন্ন কোনো খাতে আদায় করতে পারে না।

ঐ কারেন্সি **আলাদা** এবং **নির্দিষ্ট** হওয়ারও কোনো প্রশ্ন উঠে না। কারেন্সি স্বহস্তে কবযার পূর্বে আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট হয় না, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর **রিস্ক** বহন করা হয় শুধু পজিশন ওপেন থাকাবস্থায় সূচকের উঠানামাকে কেন্দ্র করে যে লাভ-ক্ষতি হয় তার। পুরো ট্রেড মানির রিস্ক বহনের কল্পনাও করা হয় না। যদি কোনো কারণে ঐ কারেন্সি জ্বলে বা পুড়ে যায়, তাহলে তার দায়ভার কখনো ট্রেডারের বহন করতে হয় না!

বিক্রয়কৃত মুদ্রার কবযা না হওয়ার ধরন

আমরা পরিচিতি পর্বে জেনেছি যে, ট্রেড হয় মূলত লিভারেজের উপর, যা আসলে কল্পিত মুদ্রা; বাস্তব কিছু নয়। সুতরাং তা উভয়ের কবযায় আসে না এবং তা হস্তান্তর করা সম্ভবও নয়।

---

[৬৭০] এ প্রবন্ধে আমরা মূলত এ ধরনের ফরেক্স নিয়ে আলোচনা করছি।

[৬৭১] হ্যাঁ, যেসব বাস্তব লেনদেনভিত্তিক কারেন্সি ব্যবসায়ে উপস্থিত মুদ্রা হস্তগত করা হয় এবং লেনদেন অন্যান্য শর'য়ী সমস্যা থেকেও মুক্ত হয়, তা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ।

[৬৭২] বিস্তারিত দেখুনঃ The complete guide to currency trading & investing: Jamine Burrel. আরো দেখুনঃ Wikipedia: Spot date.

লিভারেজের স্থানে যদি কোনো ক্ষেত্রে বাস্তব মুদ্রাও থাকে, তাহলেও তা উপস্থিত হস্তগত করা হয় না।[673] সুতরাং এখানে কোনো পক্ষই মুদ্রা কবযা করে না; বরং দাইনের পরিবর্তে দাইনের লেনদেন করে। আর দাইনের পরিবর্তে দাইনের লেনদেন বা بيع الكالئ بالكالئ শরী'আতের দৃষ্টিতে বাতিল ও নাজায়েয।[৬৭৪]

৪. এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তির শর্ত করা

ফরেক্স ট্রেড নাজায়েয হওয়ার আরো একটি কারণ হলো, এখানে এক চুক্তি পূর্ণ হওয়ার জন্য দ্বিতীয় আরেকটি চুক্তি করা শর্ত। ফরেক্স ট্রেডে আপনি কারেন্সি ক্রয় করলেই চুক্তি শেষ হবে না; বরং আপনাকে অবশ্যই ক্রয়কৃত কারেন্সি বিক্রয় করতে হবে। তারপর আপনার একটি চুক্তি (ট্রেড) শেষ হবে। পরিচিতি পর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শরী'আতের দৃষ্টিতে একটি চুক্তির মাঝে আরেকটি এমন চুক্তির শর্ত করা নিষিদ্ধ, যা প্রথম চুক্তিটির স্বাভাবিক চাহিদা নয় বা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. (৫৯ হি.) হতে বর্ণিত আছে-

أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة.

"নবী কারীম ﷺ এক বিক্রয়ের মাঝে দু'টি বিক্রয়-চুক্তির সম্মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছেন।"[৬৭৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. (৩২ হি.) হতে বর্ণিত,

نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة.

"রাসূল ﷺ এক চুক্তিকে আরেক চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা থেকে নিষেধ করেছেন।"[৬৭৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. (৬৩ হি.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع.

"বিক্রয়-চুক্তি ও কর্জ-চুক্তি একটিকে অপরটির জন্য শর্ত করা বৈধ নয়। এক চুক্তিকে অপর

---

[৬৭৩] Spot এবং Futures সম্পর্কে Investopedia এবং Wikipedia-তে দেখুন।

[৬৭৪] ট্রেডারের বিপরীতে ব্রোকার ট্রেড করলেও এ সমস্যা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে লিভারেজকে লোন ধরা হলেও তা ট্রেডারের হস্তগত হয় না। তাই সে তার মালিকই হয় না। উপরন্তু সে তা ব্রোকারকে বিক্রয় করে দেয়।
ট্রেড লিভারেজ ছাড়া করা হলে, উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে শর'য়ী কবযা'র শর্ত পাওয়া গেলে এবং অন্যান্য সমস্যা থেকে মুক্ত হলে তা জায়েয হতে পারতো; কিন্তু বর্তমানে এমনটি হওয়া দুস্কর ব্যাপার। পূর্বে আমরা জেনেছি যে, স্বাভাবিক ফটকাবিহীন ফরেক্সেও কারেন্সির নগদ হস্তান্তর সাধারণত হয় না।
উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফরেক্স ট্রেডিং بيع الكالئ بالكالئ তথা উভয়পক্ষে বাকী লেনদেনের সমস্যার কারণেও নাজায়েয।

[৬৭৫] সুনানুত তিরমিযী: হাদীস নং ১২৩১, সুনানুন নাসাঈ: হাদীস নং ৪৬৩২

[৬৭৬] (সহীহ) মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ৩৭৮৩, বাযযার: হাদীস নং ২০১৭, তাবারানী: হাদীস নং ১৬১০, ইবনে হিব্বান: হাদীস নং ১০৫৩, ইবনে খুযাইমা: ১৭৬, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৪/৮৭, আল্লামা হাইসামী রাহ. বলেন: رجال أحمد ثقات। আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন:

رواه البزار في مسنده عن أسود بن عامر، وأعلّ بعض طرقه، ورجّح وقفه، وبالوقف رواه أبو نعيم وأبو عبيد القاسم بن سلام. (فتح القدير: ٨١/٦)

চুক্তির জন্য শর্ত করা বৈধ নয়।"[৬৭৭, ৬৭৮]

হাদীসগুলো সামনে রেখেই ফুকাহায়ে কেরাম মূলনীতি স্থির করেছেন যে, একটি চুক্তির মাঝে আরেকটি এমন চুক্তির শর্ত করা নিষিদ্ধ, যা প্রথম চুক্তিটির স্বাভাবিক চাহিদা নয় বা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। হ্যাঁ, তবে যদি দ্বিতীয় চুক্তি বা সংযুক্ত শর্তটি মূল চুক্তির স্বাভাবিক চাহিদা বা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়। এজন্য হাদীসের নিষেধের আওতায় নিম্নোক্ত ধরনের শর্ত বা চুক্তিসমূহ আসবে না-[৬৭৯]

১. যে শর্ত মূল চুক্তির সাধারণ চাহিদা। যেমন, পণ্য হস্তান্তরের শর্ত। কারণ এ ধরনের বিষয় তো শর্ত না করলেও স্বাভাবিকভাবে মূল চুক্তির চাহিদা হিসেবে পালনীয়।

২. মূল চুক্তির সাধারণ চাহিদা না হলেও তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা তার মাধ্যমে মূল চুক্তি আরো মজবুত হয়। যেমন, রাহান বা কাফালাহ'র চুক্তি।

৩. মূল চুক্তির সাধারণ চাহিদা নয়, বা তার সাথে বিশেষ কোনো সম্পর্কও রাখে না। তবে শরী'আতে বিশেষ কারণ ও মাসলাহাতে তার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেমন, খিয়ারের শর্ত।

৪. মূল চুক্তির সাধারণ ফলাফলও নয়, বা তার সাথে বিশেষ কোনো সম্পর্কও রাখে না। তবে উরফে তার প্রচলন রয়েছে। তবে উরফটি শরী'আতের গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের হতে হবে।

আল্লামা আলাউদ্দীন সমরকন্দী রাহ. (৪৫০ হি.) বলেন-

ومنها: البيع بشرط، وهو أنواع، **إن شرطا شرطا يقتضيه العقد،** بأن اشترى شيئا بشرط أن يسلم البائع المبيع أو يسلم المشتري الثمن، أو بشرط أن يملك المبيع أو الثمن، فالبيع جائز، لأن هذا شرط مقرر موجب العقد، فإن ثبوت الملك، والتسليم والتسلم، من مقتضى المعاوضات.

وإن شرطا **شرطا لا يقتضيه العقد ولكن ورد الشرع بجوازه** كالأجل والخيار رخصة وتيسيرا، فإنه لا يفسد العقد، لأنه لما ورد الشرع به دلّ ذلك أنه من باب المصلحة دون المفسدة...

وإن شرطا **شرطا لا يقتضيه العقد ولم يرد الشرع به أيضا لكنه يلائم العقد ويوافقه،** وذلك نحو أن يشتري شيئا بشرط أن يعطي للبائع كفيلا بالثمن أو رهنا بالثمن، .... في الاستحسان يجوز، وهو قول علمائنا وهو الصحيح، لأن الرهن والكفالة بالثمن شُرعا توثيقا للثمن، فيكون بمنزلة اشتراط الجودة في الثمن، فيكون شرطا مقررا لما يقتضيه العقد معنى.

وإن شرطا **شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولأحدهما فيه منفعة إلا أنه متعارف،** بأن اشترى نعلا وشراكا على أن يحذوه البائع، جاز استحسانا...

ولو شرطا **شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ولا يتعارفه الناس وفيه منفعة لأحد العاقدين،** بأن اشترى حنطة على أن يطحنها البائع أو ثوبا على أن يخيطه البائع، أو اشترى حنطة على أن يتركها في دار البائع شهرا،

---

[৬৭৭] (সহীহ) সুনানুত তিরমিযী: হাদীস নং ১২৩৪, সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ৩৫০৪, সুনানুন নাসাঈ: হাদীস নং ৪৬১১, ৪৬৩০, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ৬৬২৮। ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৬৭৮] হাদীসের এক ব্যাখ্যা এটি।

[৬৭৯] উমদাতুল কারী: ৪/২২৬ দ্রষ্টব্য।

ونحو ذلك فالبيع فاسد. وهذا كله مذهب علمائنا... والصحيح قولنا، لأن اشتراط المنفعة الزائدة، في عقد المعاوضة، لأحد العاقدين من باب الربا، أو شبهة الربا وإنها ملحقة بحقيقة الربا في باب البيع احتياطا.

"শর্তযুক্ত বিক্রয় কয়েক প্রকার-

যদি ক্রেতা-বিক্রেতা এমন কোনো শর্ত করে, যা চুক্তির চাহিদার অনুকূল, যেমন, কোনো বস্তু এই শর্তে ক্রয় করলো যে, ক্রেতাকে পণ্য অর্পণ করতে হবে, অথবা বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে; অথবা এই শর্তে যে, ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে এবং বিক্রেতা মূল্যের মালিক হবে- তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে। কারণ, এসব বিষয় শর্ত না করলেও এমনিতেই সাব্যস্ত হয়ে যায়। কারণ, বিনিময়কৃত বস্তুতে চুক্তিকারীর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তা অর্পণ-গ্রহণ করা বিনিময় চুক্তির সাধারণ দাবি ও চাহিদা।

যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা এমন কোনো শর্ত করে যা চুক্তির অনুকূল নয় বা চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং তাতে কোনো এক পক্ষের উপকার রয়েছে, তবে মানুষের মাঝে তা ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তাহলে (প্রচলনের কারণে) তা ইস্তিহসানের ভিত্তিতে জায়েয হবে।

আর যদি এমন কোনো শর্ত করে যা চুক্তির চাহিদার অনুকূলও নয়, চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণও নয় এবং মানুষের মাঝে তার ব্যাপক প্রচলনও নেই এবং তাতে কোনো এক পক্ষের উপকার রয়েছে, তাহলে উক্ত বিক্রয় চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যাবে।

কারণ, বিনিময় চুক্তিতে কোনো এক পক্ষের জন্য অতিরিক্ত কোনো লাভের শর্ত করা (সরাসরি) সুদ বা সুদের সাদৃশ্য রাখে। আর কেনা-বেচার ক্ষেত্রে সতর্কতাবশত সুদের সাদৃশ্যও বাস্তব সুদের অন্তর্ভুক্ত।"[৬৮০]

এছাড়াও 'এক চুক্তির মাঝে আরেকটি চুক্তির শর্ত করা' তখনই নিষিদ্ধ হবে, যখন এক চুক্তির মাঝেই অপর চুক্তি উল্লেখ করা হবে। দু'টি চুক্তি আলাদাভাবে উল্লেখ করলে তা উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে না।

আল্লামা কাযী ইবনে সামাওয়াহ্ রাহ. (৮৩২ হি.) বলেন-

شرطا شرطا فاسدا قبل العقد، ثم عقدا، لم يبطل العقد، ويبطل لو مقارنا.

"ক্রেতা-বিক্রেতা চুক্তির পূর্বে কোনো ফাসিদ শর্ত করলো এবং এর পর চুক্তি করলো, তাহলে চুক্তিটি ফাসিদ হবে না। আর চুক্তির সময় শর্ত করলে ফাসিদ হয়ে যাবে।"[৬৮১]

৫. সুদী কারবার

ফরেক্স ট্রেড বিভিন্নভাবে সুদী কারবারের সাথে জড়িত। এখানে সংক্ষেপে দিকগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. সোয়াপঃ পূর্বে আমরা জেনেছি, সোয়াপের লেনদেন হয়ে থাকে (১) লিভারেজ এবং (২) ক্রয়কৃত কারেন্সিকে কেন্দ্র করে। দু'পক্ষের প্রাপ্য ইন্টারেস্টকে যোগ-বিয়োগ করে যে ফলাফল বের হয়, তাই সোয়াপ ইন্টারেস্ট।

লিভারেজের (যা তাদের দাবি অনুযায়ী লোন নয়; বরং ক্যালকুলেশন) উপর যে ইন্টারেস্ট

---

[৬৮০] তুহফাতুল ফুকাহাঃ ২/৪৯-৫০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[৬৮১] জামেউল ফুসুলাইনঃ ১/১৭১, মাকতাবায়ে আমীর হামযা খান

নেওয়া হয়, তা ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে সরাসরি সুদ না হলেও এটি 'আক্‌ল বিল বাতিল' বা বিনিময়হীনভাবে এবং কোনো শর'য়ী কারণ ব্যতীত পরসম্পদ হরণের একটি মারাত্মক সূরত। এমনিভাবে ট্রেডারের ক্রয়কৃত অর্থ যা সিকিউরিটি মানি হিসেবে রাখা হয়, তার বিধানও অনুরূপ। কারণ, সাধারণত তারও কোনো বাস্তব অস্তিত্ব থাকে না। তাই এ অর্থের উপর ইন্টারেস্টের নামে যা নেয়া হয়, তাও আক্‌ল বিল বাতিলের জঘন্যতম রূপ।

যদি কোনো ক্ষেত্রে ফরেক্সে 'বাস্তব কারেন্সি'র বাস্তব লেনদেন হয়ে থাকে এবং ব্রোকার ট্রেডারের পক্ষ থেকে লিভারেজ লোন হস্তগত করে, তাহলে শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর উপর আরোপিত ইন্টারেস্ট সরাসরি সুদ গণ্য হবে।

২. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রাহকের অনাদায়ী চার্জ বা ফি গ্রাহকের উপর ব্রোকারের প্রাপ্য ঋণ ধর্তব্য হয় এবং তার উপর সুদ আসে। সাধারণত এ অর্থ ঋণ হওয়ার আগেই ব্রোকার গ্রাহকের জমা অর্থ থেকে কেটে নেয়। যদি বাস্তবে কখনো সুদ আসে, তাহলে তো বিষয়টি স্পষ্ট। আর যদি সুদ নাও আসে তবুও এটি একটি সুদী চুক্তি। আর সুদের লেনদেনই শুধু হারাম নয়; বরং যেকোনো ধরনের সুদী চুক্তি, সুদের প্রতিশ্রুতি, সুদী শর্ত আরোপ করা বা মেনে নেয়াও হারাম।[৬৮২]

এছাড়াও সুদের সাথে সম্পৃক্ত আরো কিছু লেনদেন ফরেক্স ট্রেডে হয়ে থাকে-

- ট্রেডারের ডিপোজিট সাধারণত বিভিন্ন সুদী ব্যাংকেই রাখা হয়। আর ব্রোকার ও ব্যাংক তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সুদী কারবার করে থাকে। এতে রয়েছে সুদী কারবারে সহযোগিতার গুনাহ। যদিও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু এটি স্বতন্ত্রভাবে হারামের পর্যায়ে পৌঁছবে না।

- মার্জিনকে 'বন্ধক' বলা হলে তা ব্যবহার করাও সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, এটি কর্জের বিনিময়ে অতিরিক্ত ফায়েদা লাভের নামান্তর। মার্জিনকে কর্জ গণ্য করলেও একই সমস্যা পাওয়া যায়। কারণ, এতে কর্জের শর্তে কর্জ দেয়া হচ্ছে।

ইমাম বাইহাকী রাহ. (৪৫৮ হি.) 'আস সুনানুস সুগরা'তে বলেন-

روينا عن فضالة بن عبيد أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وروينا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن سلام، وغيرهم في معناه، وروي عن عمر، وأبي بن كعب رضي الله عنهما

"ফাযালা ইবনে উবাইদ রাহ. বলেন, কর্জের কারণে কোনো লাভ সংগ্রহ হলে তা সুদেরই একটি প্রকার।

এ ধরনের বক্তব্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি., আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., উবাই ইবনে কা'ব রাযি. এবং অন্যান্য সাহাবী থেকেও বর্ণিত আছে।"[৬৮৩]

-লিভারেজকে 'কাফালাহ' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলে রোলওভার সোয়াপের মাধ্যমে এর বিনিময় নেয়া হয়ে থাকে। অথচ 'কাফালাহ' একটি কর্জ বা ঋণসদৃশ আকদ হওয়ার কারণে নিছক এর

---

[৬৮২] কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যা ও সংকটের কারণে সুদ না আসার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে নিছক চুক্তির ক্ষেত্রে মুফতিয়ানে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু প্রচলিত ফরেক্সে এ শর্ত পাওয়া যায় না।

[৬৮৩] আস সুনানুস সুগরা: ৪/৩৫৩

বিনিময় নেয়া নাজায়েয।

আল্লামা হাফেযুদ্দীন কারদারী রাহ. (৮২৭ হি.) ‘কাফালাহ’-এর বিনিময় গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলেন-

الكفيل مقرض في حق المطلوب، فإذا شرط الجعل مع ضمان المثل فيه، شرط الزيادة على ما أقرضه، وإنه ربا.

“কাফীল যেন ঋণগ্রস্তকে কর্জ প্রদান করছে। সুতরাং যদি সে ঋণগ্রস্ত থেকে বিনিময় দাবি করে, তাহলে এটা কর্জের উপর মুনাফার দাবি করার মতো। আর কর্জের উপর মুনাফা তো সুদ।”[৬৮৪]

এ ব্যাপারে আরো আলোচনা ‘বিভিন্ন ধরনের নাজায়েয চুক্তি ও অন্যান্য সমস্যা’ শিরোনামের অধীনে আসছে।

- পূর্বোক্ত বিভিন্ন চুক্তিকে একীভূত করা এবং চুক্তির মাঝে অস্বাভাবিক বিভিন্ন শর্ত লাগানোও সুদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। এটি সরাসরি বিনিময়হীন ফায়েদা ভোগের একটি প্রকার না হলেও তার সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং তার পথ প্রশস্ত করে। স্বয়ং ফরেক্স ট্রেডিং তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. (৩২ হি.) বলেন-

الصفقتان في صفقة ربا.

“এক চুক্তি পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাতে অপর চুক্তি যুক্ত করা সুদের অন্তর্ভুক্ত।”[৬৮৫]

ফুকাহায়ে কেরামও বিভিন্ন চুক্তিকে একীভূত করা হারাম হওয়ার একটি কারণ হিসেবে ‘রিবা’র কথা উল্লেখ করেছেন। তবে যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে, এটি পারিভাষিক ‘রিবা’র আওতায় পড়ে না।

ইসলামী একাউন্ট (!) প্রসঙ্গঃ

অনেক ব্রোকার কোম্পানি সোয়াপ ফ্রী একাউন্ট খোলার সুবিধা প্রদান করে। তারা এটাকে ‘ইসলামী একাউন্ট’ বলে অভিহিত করে থাকে। এ ধরনের একাউন্টের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন ব্রোকার কোম্পানির ক্লায়েন্ট এগ্রিমেন্ট থেকে যা জানা গেছে তা হলো,[৬৮৬] এসব একাউন্টে রোল ওভারের মাধ্যমে সুদ বা ইন্টারেস্টের আদান-প্রদান করা হয় না। আমরা পূর্বে জেনেছি যে, প্রচলিত ফরেক্সে সোয়াপের লেনদেন মারাত্মক ধরনের হারাম লেনদেন হলেও তা সুদের লেনদেন নয়। হ্যাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুদের লেনদেনও হতে পারে। তবে যাই হোক, শুধু এটি পাওয়া না গেলেই ফরেক্স ট্রেড কখনো জায়েয হতে পারে না। কারণ, শুধু এটিই ফরেক্স নাজায়েয হওয়ার একমাত্র কারণ নয়; বরং আমরা পূর্বে জেনেছি যে, শর‘য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে

---

[৬৮৪] ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়্যাহঃ ৬/১৮ (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যার সাথে), (৩/১২ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ জাদিদ নুসখা)

[৬৮৫] (হাদীস হাসান) মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক: হাদীস নং ১৪৬৩৬, আল মু’জামুল কাবীর লিততাবারানী: হাদীস নং ৯৬০৯, সহীহ ইবনে খুযাইমা: হাদীস নং ১৭৬, সহীহ ইবনে হিব্বান: হাদীস নং ১০৫৩। সনদের একজন রাবী উসমান বিন আবী সফওয়ান। তার জীবনী পাওয়া না গেলেও একাধিক ইমাম তার এ হাদীসকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন এবং তার এ হাদীসের স্বপক্ষে অনেক শাহেদও রয়েছে।

[৬৮৬] উদাহরণস্বরূপ দেখুনঃ Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM)

এতে আরো অনেক মারাত্মক সমস্যা পাওয়া যায়। এছাড়াও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফরেক্স ট্রেডে আরো কিছু সুদভিত্তিক চুক্তিও পাওয়া যায়।

তাই নামসর্বস্ব এসব ইসলামী একাউন্ট খোলাও শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর আমরা প্রিয় পাঠককে পূর্বেও সতর্ক করেছি, কোনো চুক্তি বা লেনদেন ইসলামী বা অনৈসলামী হওয়ার বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম। অমুসলিম দেশের অপরিচিত ব্রোকার কোম্পানির এ ব্যাপারে ফাতওয়া প্রদানের কোনো অধিকার নেই।

৬. আরো কিছু নাজায়েয চুক্তি ও সমস্যা

শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ফরেক্স ট্রেডে আরো কিছু আপত্তিকর বিষয় পাওয়া যায়। এর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে-

ক. কাফালাহ এর বিনিময় গ্রহণ: পূর্বে আমরা লিভারেজ ও রোল ওভার-সোয়াপের সম্পর্কের বিষয়ে জেনেছি। লিভারেজকে অনেকে কাফালাহ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কাফালাহ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হলেও শর'য়ী আপত্তি থেকে যায়। কারণ, রোল ওভার সোয়াপের মাধ্যমে এর বিনিময় নেয়া হয়ে থাকে।[৬৮৭] অথচ 'কাফালাহ' একটি কর্জ বা ঋণসদৃশ আকদ। ইমাম সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) বলেন-

والكفالة والحوالة يتقاربان من حيث إن كل واحد منهما إقراض للذمة والتزام على قصد التوثّق.

"কাফালা' এবং হাওয়ালা' এদিক থেকে কাছাকাছি যে, উভয়টিই জিম্মার কর্জ প্রদান এবং ঋণ আদায় নিশ্চিত করার অঙ্গিকার।"[৬৮৮]

এজন্য নিছক 'কাফালাহ'-এর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়। চার ফিকহী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত। ইমাম ইবনুল মুনযির রাহ. (৩১৮ হি.) বলেন-

أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز.

"আহলে ইলম এ ব্যাপারে একমত যে, কাফালাহ-এর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে না।"[৬৮৯]

শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) বলেন-

ولو كفل رجل عن رجل بمال على أن يجعل له جعلاً، فالجعل باطل، هكذا روى عن إبراهيم رحمه الله. وهذا لأنه رشوة، والرشوة حرام، فإن الطالب ليس يستوجب بهذه الكفالة زيادة مال، فلا يجوز أن يجعل عليه عوض بمقابلته، ولكن الضمان جائز إذا لم يشترط الجعل، وإن كان الجعل مشروطًا فيه، فالضمان باطل أيضًا.

"যদি কোনো ব্যক্তি কারো জন্য এই শর্তে মালের কাফালাহ বা দায় গ্রহণ করে যে, সে (পাওনাদার) তাকে বিনিময় হিসেবে কিছু প্রদান করবে, তাহলে এই শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। ইব্রাহীম নাখয়ী রাহ. থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে। কারণ, মূলত এই বিনিময় ঘুষ। আর ঘুষের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। এই বিনিময় ঘুষ হওয়ার কারণ হলো, পাওনাদার কাফালাহ তথা দায় গ্রহণের দ্বারা (তার প্রাপ্য ব্যতীত) অতিরিক্ত কোনো মালের অধিকারী হয় না। সুতরাং এর

---

[৬৮৭] ফাতাওয়ায়ে উসমানী: ৩/১৫৮। প্রশ্ন ও উত্তর থেকে বিষয়টি স্পষ্ট। পূর্বেও এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার কোনো অবকাশ নেই।

[৬৮৮] আল মাবসূত: ২০/৪৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[৬৮৯] আল ইশরাফু 'আলা মাযাহিবি আহলিল 'ইল্ম ২/৫২, (দারুল ফিক্র)

বিপরীতে তার উপর কোনো বিনিময় ধার্য করা জায়েয হবে না। (উপরোক্ত ক্ষেত্রে বিনিময়ের শর্ত বাতিল হলেও) যদি মূল কাফালাহ চুক্তিতেই বিনিময়ের শর্ত না থাকে, তাহলে কাফালাহ শুদ্ধ হবে (আর বিনিময়ের শর্ত বাতিল)। আর যদি বিনিময়ের শর্ত মূল চুক্তিতে করা হয়, তাহলে কাফালাহ'ই বাতিল হয়ে যাবে।"[৬৯০]

আল্লামা তাহের ইবনে আহমদ ইবনে আবদুর রশীদ বুখারী রাহ. (৫৪২ হি.) বলেন-

كفل بمال على أن يجعل الطالب له جعلاً، فإن لم يكن مشروطًا في الكفالة فالشرط باطل، والكفالة صحيحة، وإن كان مشروطًا في الكفالة فالكفالة باطلة.

"কোনো ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মালের কাফালাহ বা দায় গ্রহণ করলো। এক্ষেত্রে যদি মূল 'কাফালাহ'-এর সাথে তা শর্ত করা না হয় (বরং আগে বা পরে করা হয়), তাহলে শর্তটি বাতিল গণ্য হবে এবং কাফালাহ শুদ্ধ থাকবে। আর যদি 'কাফালাহ'-এর মধ্যে তা শর্ত করা হয়, তাহলে কাফালাহ চুক্তিটিই বাতিল হয়ে যাবে।"[৬৯১]

নিষিদ্ধের কারণ প্রসঙ্গে আল্লামা কারদারী রাহ.-এর একটি নস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল। একইভাবে আল্লামা ইবনে কুদামাহ হাম্বলী রাহ. (৬২০ হি.) 'আল মুগনী'তে বলেন-

فإن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضًا صار القرض جارًا للمنفعة فلم يجز.

"কাফালাহ-এর কারণে কাফীলের উপর ঋণ আদায় করা জরুরি হয়ে পড়ে। যখন সে তা আদায় করে দেয়, তখন তা মাকফূল আনহু তথা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উপর তার (কাফীলের) পাওনা হিসেবে থাকে। সুতরাং এটা (কাফীলের পক্ষ থেকে মাকফুল আনহু তথা মূল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য) কর্জ সদৃশ্য হয়ে গেল। এখন যদি কাফীল তার থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করে, তাহলে তা কর্জের মাধ্যমে উপকার লাভ করার নামান্তর, যা সুদ। সুতরাং এটা জায়েয হবে না।"[৬৯২]

সুতরাং এ ব্যাখ্যানুযায়ীও রোল ওভার সোয়াপের চুক্তি শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়েয।

খ. ভবিষ্যৎ ক্রয়-বিক্রয়: ফরেক্স ট্রেডিং-এর একটি ধারা হলো 'কারেন্সি ফিউচার্স' (Currency Futures)। এতে ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের দিকে সম্বন্ধ করে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হয়ে থাকে। উক্ত তারিখ উপস্থিত হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের ভবিষ্যতের দিকে সম্বন্ধযুক্ত ক্রয়-বিক্রয় অশুদ্ধ ও নাজায়েয। আল্লামা ফখরুদ্দীন যাইলাঈ রাহ. (মৃত:৭৪৩ হি.) বলেন-

وأما الثالث، وهو ما لا تصح إضافته إلى الزمان فتسعة: البيع، وإجازته وفسخه، والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال، والإبراء من الدين؛ لأن هذه الأشياء تمليكات، فلا يجوز إضافتها إلى الزمان كما لا يجوز تعليقها بالشرط لما فيه من معنى القمار.

---

৬৯০ আল মাবসূত: ২/২৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

৬৯১ খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ৪/১৬৮, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, দেওবন্দ

৬৯২ আল মুগনী: ৪/৩৬৯, (باب القرض) দারুল কুতুবিল আরবী

"যেসব চুক্তিকে ভবিষ্যতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা শুদ্ধ নয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো বিক্রয়-চুক্তি। (এ ধরনের আরো কিছু চুক্তির কথা উল্লেখ করার পর বলেন) কারণ, এগুলো মূলত মালিকানা হস্তান্তরের চুক্তি। আর মালিকানা হস্তান্তরকে ভবিষ্যতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা বা শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা জায়েয নয়; কারণ, এতে ক্বিমার বা জুয়ার অর্থ পাওয়া যায়।"[৬৯৩]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط لما فيه من القمار.

"এগুলো নগদ মালিকানা হস্তান্তরের চুক্তি। সুতরাং এগুলোকে ভবিষ্যতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা বা শর্তযুক্ত করা যাবে না; কারণ, এতে ক্বিমার বা জুয়ার অর্থ রয়েছে।"[৬৯৪]

এছাড়াও সাধারণত ফিউচারসে উপরোল্লিখিত ফরেক্সের অন্যান্য সমস্যাও পাওয়া যায়।

গ. নিছক প্রতিশ্রুতির বিনিময় গ্রহণ: ফরেক্সে অপশন্সের ক্রয়-বিক্রয়ও হয়ে থাকে। একে 'কারেন্সি অপশন্স' (Currency Options) বলা হয়। Option শব্দের অর্থ: সুযোগ, কোনো কিছু বেছে নেয়া বা সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ইত্যাদি।[৬৯৫] বর্তমানে আরবীতে অপশন'কে الاختيارات বলা হয়। অপশন বিক্রয়কে বলা হয় بيع الاختيار। অপশন ক্রয়-বিক্রয় হলো, (অর্থের বিনিময়ে) ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত কোনো এক পক্ষকে চুক্তিস্থলে নির্ধারিত রেটে ক্রয় বা বিক্রয়ের অধিকার প্রদান করা। এই অধিকারটিকে অপশন বলা হয়। পণ্যের মতো সরাসরি এ অধিকার নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। ভবিষ্যতে মূল্য বেড়ে যাওয়ার ভয়ে এ ধরনের চুক্তি করা হয়ে থাকে।

যেহেতু শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এ অধিকার মাল বা মালের মতো হস্তান্তরযোগ্য কোনো শর'য়ী হকও নয়, তাই এর ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না।

অপশন ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

ومثل هذه الاختيارات شائعة اليوم في بيع أسهم الشركات، والعملات، والسلع الدولية. وإن هذه البيوع باطلة في الشريعة الإسلامية، لأن البائع فيها لا ينقل إلى المشتري مالا، ولا حقا ماليا، فهو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل...

والواقع أن هذه التعاملات داخلة في المضاربات التي هي أشبه بالمقامرة منها بالبيع والتجارة. وذلك أن بائع الاختيار لا يملك عادة ما يلتزم ببيعه، وإنما يدخل في هذا الالتزام على أساس التوقعات التي يخمّنها للمستقبل، وكذلك المشتري.

ولا يقاس هذا على الحقوق التي التحقت بالأعيان في جواز بيعها على أساس العرف، والتي سبق أن ذكرنا جواز مبادلتها بالمال، لأنها حقوق مشروعة يملكها البائع قبل البيع، فينقلها إلى المشتري بثمن، بخلاف الاختيارات، فإن هذا الالتزام ليس حقا يقبل الانتقال إلى المشتري، وإنما هو وعد محض من قبل الملتزم،

---

[৬৯৩] তাবয়ীনুল হাকাইক: ৪/৫৪৯, এইচ, এম, সাঈদ, পাকিস্তান

[৬৯৪] আদ্দুররুল মুখতার: ৭/৫৫১, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৬৯৫] Oxford Advanced learner's dictionary

ولا يجوز أخذ العوض على مثل هذا الوعد.

"অপশনের বেচা-কেনা বর্তমানে শেয়ার, কারেন্সি এবং ইন্টারন্যাশনাল কমোডিটির ক্ষেত্রে অহরহ হচ্ছে। এসব বেচা-কেনা ইসলামী শরী'আতে বাতিল বলে গণ্য। কারণ, এতে বিক্রেতা ক্রেতার কাছে না কোনো অর্থ হস্তান্তর করে, না কোনো আর্থিক অধিকার হস্তান্তর করে। সুতরাং তা আকলু আমওয়ালিন নাসি বিল বাতিল (অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা)-এর অন্তর্ভুক্ত।....আর বাস্তবতা হলো এসব লেনদেন প্রচলিত ফটকা কারবারের অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের তুলনায় জুয়ার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। কারণ, অপশন বিক্রেতা বিক্রয়ের মাধ্যমে যে বিষয়টি নিজের উপর আবশ্যক করে নেয়, স্বাভাবিকভাবে সে নিজেই তার মালিক হয় না। শুধুমাত্র ভবিষ্যতের অনুমাননির্ভর কিছু সম্ভাবনাকে ভিত্তি করে সে এসব চুক্তি-প্রতিজ্ঞা করে থাকে। অনুরূপভাবে ক্রেতাও। এটাকে ঐ সব অধিকারের উপর কিয়াস করা যাবে না, যেগুলোর কেনা-বেচা প্রচলনের ভিত্তিতে দৃশ্যমান বস্তুর কেনা-বেচার ন্যায় বৈধ। কারণ, এগুলো শরী'আতসম্মত কিছু অধিকার, যা বিক্রয়ের পূর্বেই বিক্রেতার মালিকানাধীন হয়ে থাকে। অতঃপর সে তা ক্রেতার কাছে মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করে থাকে। এর বিপরীতে (আলোচনাধীন) অপশনগুলো; কারণ, এতে বিক্রেতার চুক্তি-প্রতিজ্ঞা এমন কোনো অধিকার নয় যা ক্রেতাকে হস্তান্তর করা যায়। এটি বিক্রেতার পক্ষ থেকে নিরেট একটি প্রতিশ্রুতি মাত্র। এ ধরনের প্রতিশ্রুতির উপর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে না।"[৬৯৬]

৭. সন্দেহজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ বাজার

উপরোক্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত ফরেক্স লেনদেনে বিভিন্নরূপে গারার (غرر) ও মুশতাবিহাত পাওয়া যায়। 'রিবা'র মতো 'গারার' শরী'আতে নিষিদ্ধ একটি মৌলিক সমস্যা। ইতিপূর্বে ফরেক্সে বিদ্যমান যেসব শর'য়ী সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার অনেকগুলোর সাথে গারারও বিদ্যমান রয়েছে; বরং অনেকক্ষেত্রে গারারের কারণেই মূলত ঐসব বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

চুক্তির কোনো পক্ষের চুক্তির কোনো মৌলিক অংশ (পণ্য বা মূল্য) লাভ করার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা থাকলে তাকে ফিকহ ও আইনের পরিভাষায় 'গারার' বলা হয়।[৬৯৭] ইসলামে গারারবিশিষ্ট লেনদেন নিষিদ্ধ। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. (৫৯ হি.) বলেন-

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ

"রাসূল সা. বাই'উল হাসাত (তৎকালীনযুগে প্রচলিত এক ধরনের বেচা-কেনা চুক্তি, যেখানে পাথর ছুঁড়ে অনুমানভিত্তিক পণ্য নির্ধারণ করা হতো) এবং বাই'উল গারার (অর্থাৎ, যে চুক্তিতে কোনো ধরনের ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয়া হয়) থেকে নিষেধ করেছেন।"[৬৯৮]

ফরেক্সে বিদ্যমান গারারের অন্যতম দু'টি রূপ হলো, কবযা ও যামানের হস্তান্তর ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় এবং ফটকাবাজি ও জুয়া। এছাড়াও ফরেক্সে গারারের আরো অনেক দিক রয়েছে। আর

---

[৬৯৬] ফিকহুল বুয়ূ' পৃ. ২৮৭-২৮৮ (১ম খণ্ড) মাকতাবায়ে মা'আরিফুল কুরআন, আরো দেখুন: আল মা'আঈরুশ শারইয়্যাহ পৃ. ৫৫২

[৬৯৭] আল গারারু ওয়া আসারুহু ফিল উকুদ: ৪৭-৫৪, মালী মুআমালাত পর গারার কে আসারাত: ২৭

[৬৯৮] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৫১৩

এটি একটি স্বীকৃত বাস্তবতা যে, ফরেক্স মার্কেটের ভিত্তিই হলো, ঝুঁকি এবং অস্বচ্ছতার উপর। ব্রোকার কোম্পানির নিকট একাউন্ট খুললেই সাধারণত তারা Risk Discloser (ঝুঁকি উন্মোচন) শীর্ষক একটি সাপ্লিমেন্ট প্রদান করে। ফরেক্স ট্রেডিং-এ 'রিস্ক ম্যানেজমেন্ট' বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা'কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। আর অস্বচ্ছতার সৃষ্টি হয় এ ধরনের ঝুঁকি থেকেই।

ফরেক্সে বিদ্যমান শর'য়ী ঝুঁকি ও সন্দেহের কিছু বিষয় উদাহরণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হলো-

১. আমরা পূর্বেই জেনেছি, ফরেক্স 'ওভার দ্যা কাউন্টার' মার্কেট। এ ধরনের মার্কেটের বৈশিষ্ট্যই হলো, এখানে বিধিবদ্ধ লেনদেন পদ্ধতি থাকে না। কোনো আইনগত নিয়ন্ত্রণ বা বাধ্যবাধকতাও থাকে না। কোনো নিয়মতান্ত্রিক ক্যাশ হাউজও থাকে না। কিছু রেগুলেটরী কার্যক্রম থাকলেও তা নামকেওয়াস্তে পর্যায়ের হয়ে থাকে।

বর্তমানে ব্যাংকের জায়েয মু'আমালার ক্ষেত্রেও উলামায়ে কেরাম এ ধরনের শর্তারোপ[৬৯৯] করে থাকেন যে, লেনদেন প্রক্রিয়ার পুরো বিষয়টি যেন আলাদা আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়, যাতে শর'য়ী নিরীক্ষণের সুযোগ থাকে। অর্থাৎ, বিধিবদ্ধ নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও শুধু তার উপর নির্ভর করা হয় না; বরং প্রত্যেকটি মু'আমালা ভিন্নভাবে নিরীক্ষণের কথা তারা বলে থাকেন। তাহলে ওভার দ্যা কাউন্টার মার্কেটের অবস্থা কী হবে?

স্টক মার্কেটেও 'ওভার দ্যা কাউন্টার' পদ্ধতি চালু আছে। সমকালীন ফকীহগণ সেখানেও এ পদ্ধতির ট্রেডিংকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' আখ্যা দিয়েছেন। এমনকি তারা স্টকের শর'য়ী হুকুম বয়ান করার ক্ষেত্রে ওভার দ্যা কাউন্টার মার্কেটের ব্যাপারে কোনো বিবরণই পেশ করেন না।[৭০০]

২. ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে চুক্তির সকল পক্ষের চুক্তি ও লেনদেনের স্বরূপ সম্পর্কে এতটুকু ধারণা হলেও থাকা উচিত, যাতে লেনদেনটি আসলে কিসের লেনদেন বা কার সাথে হচ্ছে, তা জানা থাকে। কিন্তু ফরেক্স ট্রেডিং পদ্ধতি এতটা জটিল ও কৃত্রিম যে, এর স্বরূপ বোঝা খুবই কম সংখ্যক লোকের জন্য সম্ভব হয়। উল্লেখ্য, এখানে টেকনিক্স এবং এনালাইসিস উদ্দেশ্য নয়।

হযরত মাওলানা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

"Many transactions in financial markets are not transparent in that sense that they are too complex and complicated to be fully understood by many stakeholders. They are hardly comprehended even by financial exparts, let alone common people. Such is the baffaring complexity of many financial products that even a person like George Soros, the well known economist of our time, and also a player in financial markets, admitted that he could not understand how they work. Richard Thomson reports in his books on derivatives: ....."

---

[৬৯৯] উদাহরণস্বরূপ আল মা'আঈরুশ শার'ইয়্যাহ-এর প্রথম কয়েকটি মি'য়ার দ্রষ্টব্য।

[৭০০] যেমন, দেখুন: স্টক এক্সচেঞ্জ: এক তা'আরুফ (ওভার দ্যা কাউন্টার-এর আলোচনা)

"বর্তমান ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটের অনেক লেনদেন স্বচ্ছতার গণ্ডিতে না আসার আরেকটি কারণ হলো, তা এত জটিল ও দুর্বোধ্য যে, অনেক জাঁদরেল ব্যবসায়ীও তা বোঝে না। সাধারণ মানুষের কথা বাদ, অর্থনীতির বিষেশজ্ঞরাও কদাচিৎ তা অনুধাবন করতে পারে। কোনো কোনো ফিন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টের জটিলতা এত মারাত্মক যে, জর্জ সোরোস-এর মতো প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটের খেলোয়াড়ও স্বীকার করেছেন যে, কীভাবে এসব লেনদেন সম্পন্ন হয়, তা বোঝা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। রিচার্ড থমসন 'ডেরিভেটিভস' বিষয়ে তার বইয়ে লিখেন....।"[৭০১]

৩. সাধারণত ট্রেড করা হয় মার্কেট মেকার ব্রোকারের সাথে। তারা সরাসরি ডিপোজিট আটকে না রাখলেও ট্রেড চলাকালীন বহু ধরণের অস্বচ্ছতা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়।[৭০২] এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো-

(ক) ট্রেডারের অনুমতি ব্যতীত লিভারেজ কমিয়ে স্টপ আউট দেয়া।

(খ) ট্রেড ফ্রিজ করা। এতে উপযুক্ত সময়ে ট্রেডার ট্রেড ক্লোজ করতে পারে না।

(গ) এক্সিকিউশন স্পিড কমিয়ে লাভ-লসে হস্তক্ষেপ করা।

(ঘ) ফেইক কান্ড্যল তৈরী করে ট্রেডারকে ধোকা দেয়া। অনেক সময় দেখা যায়, ট্রেডারের চার্টে এমন একটা কান্ড্যল তারা উপস্থাপন করে, যা শুধু এই চার্টেই আছে, অন্য কোথাও নেই।

৪. অনেক সময় বেশি প্রফিট করলে বা অন্য কোনো কারণে ব্রোকার উইথড্রলেও বাঁধা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সূত্রে বিষয়টি নিশ্চিত করা গেছে।

৬. আর মার্কেট নিয়ন্ত্রণকারীদের জালিয়াতি ও অস্বাভাবিক কর্মকান্ডের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। তারাই মার্কেটের উঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের বিভিন্ন কৃত্রিম সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে গোটা মার্কেট পরিচালিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে তারা একটি জাতিকে ফকির বানাতে সক্ষম, আবার মুহূর্তের মধ্যে ধনকুবের বানাতেও সক্ষম। এটাই পুঁজিবাদের সাধারণ চিত্র।

'ইহতিকার'-এর নাজায়েয সূরত এবং 'নাজাশে'র সমস্যাও ফরেক্সে পাওয়া যায়। যেহেতু শুধু বাজার নিয়ন্ত্রকদের মাধ্যমেই এ সমস্যা হয়, তাই এখানে বিস্তারিত তার আলোচনার প্রয়োজন নেই।

৭. ফরেক্স মার্কেট মূলত স্পেকিউলেটিভ বা ফটকামূলক মার্কেট হওয়ার কারণে এখানে বিনিয়োগকারীরা ফটকায় জড়িত হতে একপ্রকার বাধ্য থাকে। যদিও ফটকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য না হয়।

শুধু ফরেক্স নয়; বরং বর্তমান ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটের বৃহৎ অংশ জুড়ে স্পেকিউলেশন ও ফটকার দাপট পরিলক্ষিত হয়। তবে বিভিন্ন কারণে স্বাভাবিকভাবেই কারেন্সি মার্কেটে এর প্রবণতা তুলনামূলক বেশি। আর কারেন্সির ক্ষেত্রে শরী'আতের বিশেষ বাধ্যবাধকতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এক কথায়, বিভিন্ন অবৈধ ও নাজায়েয প্রক্রিয়ার সাথে সাথে সন্দেহজনক ও অস্বচ্ছ কার্যক্রমের

---

[৭০১] Present Financial Crisis: Causes and Remedies, p. 28

[৭০২] উদাহণস্বরূপ দেখুনঃ Forex Brokers Market Maker. Myths And Realities, www.forex-giants.com

কারণেও ফরেক্স মার্কেটে অংশগ্রহণ করা শর‘য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হবে না।

৮. অর্থনৈতিক বিশৃংখলা ও শর‘য়ী মূল্যায়ন

প্রচলিত স্পেকিউলেটিভ ফরেক্স শরী‘আতের মৌলিক ‘মাকাসিদ’ এবং ‘মাসালিহ’-এর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণেও নাজায়েয। কারণ, সমাজ, রাষ্ট্র, জনগণ এবং অর্থনীতির উপর এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির জন্য ক্ষতিকর এ ধরনের কার্যক্রম শরী‘আতে কখনো গ্রাহ্য হতে পারে না। ফরেক্সে ট্রেডিং-এর মন্দ প্রভাব সম্পর্কে এ প্রবন্ধে কিছুটা আলোচনা এসেছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না করার জন্য অনেকক্ষেত্রে শুধু বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনীতিতে ফরেক্সের মন্দ প্রভাব সম্পর্কে পাঠক নিম্নের বই বা প্রবন্ধগুলোও দেখতে পারেন:

১. Present Financial Crisis: Causes and Remedies (অনুবাদ: موجودہ عالمی بحران اور اسلامی تعلیمات), মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ;

২. المضاربة على الأسعار بين المؤيدين والمعارضين বা Speculation between Proponents and Opponents, ড. রফিক ইউনুস;

৩. মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, ১১ তম সংখ্যা;

৪. المتاجرة بالهامش, ড. শওকী আহমদ;

৫. The Global Trap: Globalization and the Assault on prosperity and Democracy, Hans-Peter-Martin

৯. সরকারী আইন অমান্য করা

আমাদের জানা মতে, বাংলাদেশের আইনে প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডিং সম্পূর্ণ অবৈধ। ইন্টারনেটে বিভিন্ন ব্লগ ও সাইট ভিজিট করে এ নিয়েও দেখা গেছে অনেক বিভ্রান্তি। কিন্তু ‘বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭’ এবং ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২’ এর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো অধ্যয়ন করলে প্রচলিত ফরেক্স নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট বুঝে আসে। এছাড়াও বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রচলিত ফরেক্সকে বেআইনী এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য সকলকে আহবান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত একটি গণবিজ্ঞপ্তির[৭০৩] ভাষ্য নিম্নরূপ-

‘‘সতর্কতামূলক গণবিজ্ঞপ্তিঃ Forex trading/dealing এর মাধ্যমে মুনাফার প্রলোভনে বৈদেশিক মুদ্রার বেআইনী ক্রয়বিক্রয় থেকে বিরত থাকুন।

ইন্টারনেটে online forex trading/dealing থেকে বড় মাত্রায় লাভের প্রলোভন দেখানো প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির আকর্ষণের লক্ষ্যে বেশ কিছু বেআইনী বিজ্ঞাপণ বাংলাদেশ ব্যাংকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ইদানিং এ ধরণের বিজ্ঞাপণ প্রকাশ করা হচ্ছে। এসব বিজ্ঞাপণে বিদেশী মুদ্রার ব্যবসার লক্ষ্যে ডেবিট কার্ডে currency load এর ব্যবস্থার আশ্বাসও দেয়া হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের

[৭০৩] বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট হতে উদ্ধৃত।

দৈনন্দিন ওঠানামার সুযোগ নিয়ে বাড়তি মুনাফা অর্জনের মতো ঝুঁকি নেবার আহ্বানও এ বিজ্ঞাপণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের জন্য অনুমোদিত লাইসেন্স প্রাপ্ত ডিলার/মানিচেঞ্জার ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান-এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় করা যায় না। Foreign Exchange Regulation Act. 1947 এর আওতায় ঐসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এসব ট্রেডিং/ডিলিং পুরোপুরি বেআইনী এবং দন্ডযোগ্য অপরাধ। এ ধরণের বেআইনী কার্যক্রমের বিজ্ঞাপণে লোভের বশবর্তী হয়ে আকৃষ্ট না হবার জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করা যাচ্ছে। বিজ্ঞাপণদাতাদের বিরুদ্ধেও একই সঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।''

উপরোক্ত (বিশেষত, রেখাবিশিষ্ট বক্তব্য) ভাষ্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রচলিত ফরেক্স, যা সাধারণত বাংলাদেশ ব্যাংকের অননুমোদিত ব্রোকার কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে হয়ে থাকে সম্পূর্ণ বেআইনী। নিষিদ্ধ ফরেক্সের যে কার্যক্রম ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রচলিত ফরেক্সের 'সাধারণ' বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ফরেক্সের কোনো ধরন বা প্রকার তা থেকে মুক্ত না।

এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত ''ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন্স ২০০৯'' (খণ্ড-১) দ্রষ্টব্য। এর সংক্ষিপ্ত রূপ "ব্যক্তি পর্যায়ে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের উল্লেখযোগ্য বিধি ব্যবস্থাদি"ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিলার ও মানিচেঞ্জারদের তালিকাও (সর্বমোট ২৩৪ টি) বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইটে আছে। তাদের মধ্যে আমাদের জানা মতে, প্রচলিত ফরেক্সের কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান নেই।

বিষয়গুলো নিয়ে লেখক বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এবং স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের মহাব্যবস্থাপক জনাব শেখ মোহাম্মদ সেলিমের সাথে যোগাযোগ করলেও একই তথ্য পাওয়া যায়।[৭০৪] বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগে যোগাযোগ করেও যে কেউ এ সংক্রান্ত তফসিল জেনে নিতে পারে।[৭০৫, ৭০৬]

---

[৭০৪] এ প্রবন্ধের সংশ্লিষ্ট অংশ জনাব সেলিম সাহেব পড়ে দেখেছেন এবং সত্যায়ন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

[৭০৫] ই-মেইলঃ gm.fepd@bb.org.bd

[৭০৬] প্রচলিত ফরেক্সে বহুল ব্যবহৃত 'বিটকয়েন' সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের আরেকটি বিজ্ঞপ্তি (বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট থেকে) এখানে উদ্ধৃত করা হলো-

"অনলাইনে কৃত্রিম মুদ্রায় (যেমনঃ বিটকয়েন) লেনদেন হতে বিরত থাকার বিষয়ে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিঃ বিটকয়েন নামীয় অনলাইনভিত্তিক কৃত্রিম মুদ্রায় (Crypto currency) লেনদেন বিষয়ক কতিপয় সংবাদ বাংলাদেশ ব্যাংকের গোচরীভূত হয়েছে। ইন্টারনেট হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায় যে, বিটকয়েন বিবিধ বিনিময় প্লাটফর্মে (exchange platform) কেনা-বেচা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এটি কোনো দেশের ইস্যুকৃত বৈধ মুদ্রা (legal tender) নয়। বিটকয়েন বা বিটকয়েনের ন্যায় অন্য কোনো কৃত্রিম মুদ্রায় লেনদেন বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সরকারের কোনো সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত নয়। বিটকয়েনের মাধ্যমে অর্থমূল্য পরিশোধ ও নিষ্পত্তি সংঘটিত হয় মূলতঃ অনলাইন ভিত্তিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং এটি কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ/পেমেন্ট সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ কতৃর্পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত না হওয়ায় গ্রাহকগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। এসব মুদ্রায় লেনদেনে বৈদেশিক মুদ্রার অননুমোদিত আদান-প্রদানের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে যা বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭ অনুসারে দন্ডযোগ্য হবে। তাছাড়া এসব মুদ্রা ব্যবহারকারীরা মানিলন্ডারিং আইন ভঙ্গ করার দায়ে মানি লন্ডারিং

শরী'আতের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান (শর'য়ীভাবে) বৈধ কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেও তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।[৭০৭] আর প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডিং তো বিভিন্ন শর'য়ী সমস্যা পাওয়া যাওয়ার কারণে এমনিতেই নাজায়েয। উপরন্তু রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশ না মানার কারণেও এটি শর'য়ী দৃষ্টিতে অবৈধ।

১০. নিরেট মুদ্রাকেন্দ্রীক ব্যবসা : শর'য়ী দৃষ্টিকোণ

মৌলিকভাবে শরী'আতে যেমন কারেন্সির ক্রয়বিক্রয় (শর্তসাপেক্ষে) জায়েয, তেমনি কারেন্সি ব্যবসাও (শর্তসাপেক্ষে) জায়েয বা বৈধ। তবে কারেন্সি সংক্রান্ত শরী'আতের আহকাম থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, শরী'আত নিছক মুদ্রাকেন্দ্রীক ব্যবসা কে পছন্দ করে না। সুদ নিষিদ্ধের প্রেক্ষাপট ও বাই'য়ে সরফের নীতিমালার দিকে তাকালে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝে আসে।

সারকথা, ভিন্ন কারেন্সির ব্যবসা যদিও বৈধ; কিন্তু শরী'আত নীতিগতভবে তা পছন্দ করে না। কারণ, কারেন্সি স্বাভাবিক ব্যবসা পণ্য নয়। এছাড়াও অর্থনীতির উপর কারেন্সি ব্যবসার রয়েছে নানাবিধ ক্ষতিকর প্রভাব। এজন্য এ ব্যাপারে যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও ইমামগণ যুগে যুগে সতর্ক করে আসছেন।

ইমাম আবু হামেদ আল গাযালী রাহ. (৫০৫ হি.) এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর পুরো আলোচনা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। নিম্নে তাঁর সারগর্ভ আলোচনার শেষাংশ অনুবাদ ছাড়াই উল্লেখ করা হলো-

... وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير فقد كفر النعمة وظلم، لأنهما خلقا لغيرهما لا لنفسهما، إذ لا غرض فى عينهما، فإذا اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصودا على خلاف وضع الحكمة، إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم، ومن معه ثوب ولا نقد معه فقد لا يقدر على أن يشترى به طعاما ودابة، إذ ربما لا يباع الطعام والدابة بالثوب، فهو معذور في بيعه بنقد آخر ليحصل النقد فيتوصل به إلى مقصوده، فإنهما وسيلتان إلى الغير لا غرض في أعيانهما ... فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله فيبقى النقد مقيدا عنده وينزل منزل المكنوز، وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم كما أن حبسه ظلم، فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصودا للادخار وهو ظلم.[৭০৮]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ.ও (৭৫১ হি.) এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন-

"... فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن (النقد) هو المعيار الذي به يُعْرَف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسِّلَع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سِلَعٌ، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك

প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর আওতায়ও অভিযুক্ত হবেন। এমতাবস্থায়, সম্ভাব্য আর্থিক ও আইনগত ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে বিটকয়েনের ন্যায় কৃত্রিম মুদ্রায় লেনদেন বা এসব লেনদেনে সহায়তা প্রদান ও এর প্রচার হতে বিরত থাকার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।"

[৭০৭] শরহুস সিয়ারিল কাবির: ১/১৬৮। এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: দরসুল ফিকহ: ১/ ৩৪৯-৩৫৪

[৭০৮] ইহয়াউ উলুমিদ্দীন: ৪/৮৯-৯১, ফাযায়েল অধ্যায়, শোকরের আলোচনা

لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تُقَوَّم به الأشياء، ويستمر على حالة واحدة، ولا يقومُ هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف، ويشتد الضرر، كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، ولو جعلت ثمناً واحداً لا يزداد ولا ينقص بل تُقَوَّم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصلح أمْرُ الناس...؛ فالأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعاً تقصد لأعيانها فسد أمر الناس، وهذا معنى معقول يختص بالنقود...".

"....দিরহাম-দিনার পণ্যের মূল্য পরিমাপক। মুদ্রার মাধ্যমেই পণ্যের মূল্যমান নির্ধারণ হয়। সুতরাং মুদ্রামান উঠানামা না করে স্থিতিশীল এবং সীমারেখার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা চাই। যদি পণ্যের মতো মুদ্রামানও উঠানামা করতে থাকে, তাহলে পণ্যমূল্য বোঝার জন্য গ্রহণযোগ্য কোনো পরিমাপক থাকবে না। ... পণ্যের মূল্যমান জানা থাকা মানুষের জন্য অপরিহার্য । এর জন্য চাই এমন মুদ্রা যদ্বারা জিনিসের মূল্য নির্ণয় করা যাবে। উক্ত মুদ্রার মান স্থির থাকবে। তাকে অন্যকিছু দিয়ে বিচার করা হবে না। যদি মুদ্রা স্বয়ং পণ্যে পরিণত হয় এবং এর মূল্যমান উঠানামা করতে থাকে, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা শুরু হবে। আমি দেখেছি, মানুষের লেনদেন ও বেচা-কেনার মাঝে কি পরিমাণ গোলযোগ, লোকসান ও অন্যায়-অনাচার শুরু হয়েছিলো, যখন মুদ্রাকে লাভজনক পণ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিলো। যদি একটি মুদ্রাকে গ্রহণ করা হয়, যার মূল্য উঠানামা করবে না এবং যেটা দিয়ে অন্যান্য জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা হবে...তাহলে বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। মোটকথা, মুদ্রা তদ্বারা মুদ্রা অর্জনের জন্য নয়; বরং অন্যকিছু ক্রয় করার জন্য। যদি সেটা নিজেই পণ্য হয়ে যায়, তাহলে সৃষ্টি হবে যতো সমস্যা।"[৭০৯]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২ হি.) বলেন-

"لأن الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود، إذ الانتفاع بالأعيان، لا بالأثمان... فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصناع."

"মুদ্রা কখনো উদ্দিষ্ট হয় না; বরং তা উদ্দিষ্ট বস্তু অর্জনের মাধ্যম। কেননা পণ্য ভোগ করা যায়; কিন্তু মুদ্রা সরাসরি ভোগ করা যায় না... এই অর্থে মুদ্রা যেন উৎপাদনের উপকরণ মাত্র।"[৭১০]

পশ্চিমা অর্থনীতিবিদগণও এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে, কারেন্সির একমাত্র ধর্ম হলো, এটি মূল্য পরিমাপক এবং প্রতিটি বস্তুর মূল্যের মানদণ্ড। এর স্বাভাবিক ফলাফল এটাই দাঁড়ায় যে, কারেন্সি প্রাকৃতিক ব্যবসা পণ্য নয়। অর্থনীতিতে পণ্যের যে প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়, তার কোনোটিতে কারেন্সিকে অর্ন্তভুক্ত করা সম্ভব নয়। কারেন্সি না Consumption goods (ভোগপণ্য) এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, না Productive goods (উৎপাদনশীল পণ্য)-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে (কারণ, এখানে উৎপাদনশীল অর্থ, যা সরাসরি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়)। মানি'র যেহেতু কোনো অন্তর্নিহিত মূল্যই নেই, তাই এটি কোনো প্রকারে স্থান পায় না।

[৭০৯] আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ: ২৮১। আরো দেখুন: ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন ২/১৫১

[৭১০] রদ্দুল মুহতার ৭/৮, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

সাড়াজাগানো অনেক বইয়ের লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ Ludwing Von Mises (১৯৭৩ খৃ.) তার বই The Theory of Money And Credit[৭১১] -এ এ মতই ব্যক্ত করেছেন এবং যারা মানি'কে দ্বিতীয় প্রকার পণ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাদের বলিষ্ঠ সমালোচনা করেছেন।

২০১০ সালে অর্থনৈতিক সংকটের প্রাক্কালে সুইজারল্যান্ডে 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' (WEF) আয়োজিত একটি জরুরী সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত এক প্রবন্ধে মুফতী তাকী উসমানী দা. বা. Money ও Commodity-র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৭১২] তিনি কারেন্সিকে ব্যবসা পণ্য হিসেবে গ্রহণ করাকে তৎকালীন সংকটের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ফরেক্সে শুধু কারেন্সিকে ব্যবসা পণ্যই বানানো হয়েছে এমন নয়; বরং যেসব ফলাফলের আশঙ্কায় শরী'আত কারেন্সি ব্যবসা অপছন্দ করেছে, সরাসরি তারই (প্রায় পরিপূর্ণভাবে) প্রয়োগ করা হয়েছে। যদি ফরেক্সে উপরোল্লিখিত শর'য়ী সমস্যাগুলো নাও পাওয়া যেত, তাও এটি শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে অপছন্দনীয়ই হতো। কারণ, এখানে শুধু কারেন্সি ব্যবসা কে কেন্দ্র করে বাজার গড়ে তোলা হয়েছে। শর'য়ী দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় কোনো কাজ করা এক বিষয়, আর তার বাজার গড়ে তোলা আরেক বিষয়। দ্বিতীয়টি যে সর্বাবস্থায় অনেক বেশি নিন্দনীয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফটকা ও জুয়ার শর'য়ী বিকল্প হতে পারে না

শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ যেকোনো লেনদেন ও মুআমালার বৈধ বিকল্প পেশ করা সর্বক্ষেত্রে জরুরী নয়। হ্যাঁ, যদি কোনো অবৈধ প্রকল্প কোনো বাস্তব প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে, যা ব্যতীত ব্যক্তি ও সমাজের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ব্যহত হয়ে পড়ে, তাহলে তার শর'য়ী বিকল্প বের করা এবং মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করা আহলে ইলম এবং আহলে ফিকহের দায়িত্ব। যুগে যুগে তারা এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনও করে আসছেন।

প্রচলিত ফরেক্স মার্কেটের বৃহৎ অংশ জুড়ে স্পেকিউলেশন ও ফটকার দাপট পরিলক্ষিত হয়। যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ গর্হিত জুয়ারই নামান্তর। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রচলিত স্পেকিউলেশন কোনো ক্রমেই শর'য়ী জরুরত ও হাজতের আওতায় পড়ে না। তাই সমকালীন ফকীহগণ বহু আগেই কারেন্সি মার্কেটসহ অন্যান্য ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটে হোক স্পেকিউলেশনকে অবৈধ এবং তার বিকল্প উপস্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই, এ মর্মে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

জরুরী সতর্কীকরণ

অনেকে এ ধরনের প্রচারণা চালায় যে, প্রচলিত ফরেক্সের শর'য়ী বিধানের ব্যাপারে সমকালীন উলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে এবং তাঁদের অনেকে এটিকে জায়েযও বলে। এটাকে তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা না বললেও এতটুকু বলতে হয় যে, পুরো বিষয়টিকে না বুঝে

---

[৭১১] Liberty Classic ladiana polis থেকে ১৯৮০-তে প্রকাশিত।

[৭১২] Present Financial Crisis: Causes and Remedies (অনুবাদ:موجودہ عالمی بحران اور اسلامی تعلیمات), মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ;

এ ধরনের স্পর্শকাতর এবং শর'য়ী বিষয়ে মত ব্যক্ত করা কোনোভাবেই তাদের উচিত হয়নি। আমাদের জানা মতে, কোনো নির্ভরযোগ্য ফাতওয়া বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরনের কোনো ফাতওয়া প্রদান করা হয়নি যে, **প্রচলিত ফরেক্স ট্রেডিং** জায়েয। যাদের ব্যাপারে এ ধরনের অপবাদ আরোপ করা হয় যে, তারা প্রচলিত ফরেক্সকে জায়েয বলেছেন তাদের বক্তব্যের বাস্তবতা আসলে অন্যটি। তারা মূল বিষয়কে ঢেকে রেখে ভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। আমীন।

সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
১৬ রজব, ১৪৩৯ হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
২১ রজব, ১৪৩৯ হি.

ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড : শর'য়ী বিশ্লেষণ ও আহকাম

মাওলানা এনামুল হাসান (তানিম), গাজিপুর

সেই আদিকাল থেকেই মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি ব্যবহার করে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে তৎপর রয়েছে। এ যাত্রায় মানব সমাজ এগিয়ে গেছে বহুদূর। যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে হাজার কোটি ডলারের লেনদেন। সময়স্বল্পতা, নিরাপত্তাঝুঁকি এবং জটিল প্রক্রিয়া এড়াতে মানুষ আবিষ্কার করে চলছে আধুনিক থেকে আধুনিক লেনদেনের উপায়-পদ্ধতি।

প্রাচীন যুগে মানুষ দ্রব্যকে মুদ্রা বা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতো। এক্ষেত্রেও মানুষ গরু-ছাগল থেকে নিয়ে চাল-ডালসহ বিভিন্ন মাধ্যম গ্রহণ করে লেনদেনে সহজতা আনার চেষ্টা করেছিলো। পরবর্তীতে মানুষ প্রধানত স্বর্ণ-রূপা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থকে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। একসময় এর বিকল্প হিসেবে চালু করা হয় কাগুজে নোট।

কিন্তু আজকের ব্যস্ততম পৃথিবীতে মানুষের জন্য কাগুজে নোটের বোঝা বহন করে চলাফেরা করাও কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফ্‌ট[৭১৩], বন্ডস[৭১৪] এবং সিকিউরিটিস[৭১৫] ইত্যাদি হালকা ডকুমেন্ট ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে এ সমস্যার সমাধান করা হয়। কিন্তু লেনদেনের আন্তর্জাতিকতা এবং গতিশীলতার মোকাবেলায় এগুলো সব পিছিয়ে পড়ে। উদ্ভাবিত হয় ইলেক্ট্রনিক বা বৈদ্যুতিক মানি। এ মানি অনলাইন-অফলাইন সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। এজন্য কোনো দেশ-মহাদেশের সীমানায় একে আটকে থাকতে হয় না। ইলেক্ট্রনিক মানি বহন করার জন্য উদ্ভাবন করা হয় বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিক কার্ড। এ ধরনের প্রচলিত কিছু কার্ড তথা 'ব্যাংক কার্ড' নিয়েই এ প্রবন্ধে আমরা আলোচনার প্রয়াস পাবো।

বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক মানি কার্ড

নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজেই আমাদের কার্ডের ব্যবহার করতে হয়। অর্থ আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে যেসব ইলেক্ট্রনিক বা বৈদ্যুতিক কার্ড ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে একসাথে 'ইলেক্ট্রনিক মানি কার্ড' বলা হয়। এ কার্ডগুলো প্রধানত দু'ধরনের হয়ে থাকে-

(ক) ব্যাংক-একাউন্টকেন্দ্রিক কার্ড। গ্রাহক তার ব্যাংক-একাউন্টে টাকা জমা বা উত্তোলন করতে এবং একাউন্টকেন্দ্রিক অন্যান্য লেনদেন করতে এ কার্ড ব্যবহার করে।

(খ) ব্যাংক-একাউন্টবিহীন কার্ড। এসব কার্ডের কোনো ব্যাংক-একাউন্ট থাকে না; বরং কার্ড কর্তৃপক্ষকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিলে তারা ঐ পরিমাণ মূল্যমানের কার্ড গ্রাহককে সরবরাহ করে। গ্রাহক ঐ কার্ড দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ কেনাকাটা বা পরিশোধ করতে পারে। এর একটি পরিচিত উদাহরণ হলো, মোবাইল সিম কোম্পানিগুলোর প্রি-পেইড কার্ড।

ব্যাংক একাউন্টকেন্দ্রিক কার্ডগুলো আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে-

---

[৭১৩] বিশেষ ধরনের ব্যাংক চেক (Oxford Dictionary of Finance and Banking, p. 34)

[৭১৪] আর্থিক দলীল বা চুক্তিপত্র

[৭১৫] আর্থিক দলীল চুক্তিপত্র বা ঋণপত্র

(ক) এ.টি.এম কার্ড: এ.টি.এম (ATM) শব্দটি Automated teller machine-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। টেলার (teller) শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হলো, ব্যাংকের ক্যাশিয়ার বা ঐ কর্মকর্তা, যে গ্রাহকদের সাথে তাদের একাউন্টের অর্থ আদান-প্রদান করে। সুতরাং Automated teller machine মানে হলো, স্বয়ংক্রিয় ক্যাশিয়ার মেশিন। আর যে কার্ড দিয়ে উক্ত মেশিনের সাহায্যে ব্যাংক-একাউন্টে টাকা জমা[৭১৬] বা উত্তোলন করা হয়, তাকে এ.টি.এম কার্ড বলা হয়।

(খ) এ.টি.এম + পেমেন্ট কার্ড: এসব কার্ড ব্যবহার করে শুধু টাকা জমা বা উত্তোলন করা যায়, তা নয়; বরং পণ্য ও সেবার মূল্য এবং ঋণও পরিশোধ করা যায়। আবার কোনো কোনো কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের ঋণও নেয়া যায়। যেহেতু পেমেন্ট বা পরিশোধ করা এ কার্ডগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাই একবাক্যে এগুলোকে **'ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট কার্ড'**ও বলা হয়। আবার যেহেতু এগুলো ব্যাংক-একাউন্টকেন্দ্রিক কার্ড, তাই এগুলোকে **'ব্যাংক কার্ড'**ও বলা হয়।

এ ধরনের 'ব্যাংক কার্ড' বা 'ইলেক্ট্রনিক পেমেন্ট কার্ড'কে বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে মূলত তিন প্রকারে ভাগ করা হয়। যথা-

১. ডেবিট কার্ড; ২. ক্রেডিট কার্ড; ও **৩. 'চার্জ কার্ড**।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা এ তিন ধরনের কার্ড নিয়েই আলোচনা করবো। যেহেতু এ কার্ডগুলো এ.টি.এম. কার্ড হিসেবেও কাজ করে, তাই এ.টি.এম. কার্ড সংক্রান্ত বিষয়াবলিও এতে প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসবে। তবে আমরা মূলত ডেবিট (কর্তন মূলক পরিশোধ) বা ক্রেডিট (ঋণ গ্রহণ বা ঋণমূলক পরিশোধ) কার্ড তথা পেমেন্ট কার্ড হিসাবেই উক্ত কার্ডগুলোর আলোচনা করবো। কারণ, এটিই (পেমেন্ট বা পরিশোধ) এসব কার্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর কার্ডগুলোর ক্ষেত্রে এটিই হলো বিশ্লেষণযোগ্য এবং জটিলতাপূর্ণ বিষয়।

ব্যাংক-কার্ডগুলোর সাধারণ পরিচিতি, বিভিন্ন পক্ষ ও তাদের মাঝে লেনদেন

আজকের গতিশীল পৃথিবীতে পকেট বা মানিব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে লেনদেন করাটা রীতিমতো দুষ্কর ব্যাপার। ব্যাংক চেকগুলোর ব্যবহারক্ষেত্রও সীমিত ধরনের। এছাড়াও এগুলোর মাধ্যমে যেকোনো স্থানে যেকোনো সময় অর্থ উত্তোলনের সুবিধা পাওয়া যায় না। এসব দিক লক্ষ করে কিছু আন্তর্জাতিক কোম্পানি আন্তর্জাতিকভাবে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক কার্ড উদ্ভাবন করে। তারা সারা দুনিয়ার ব্যাংকগুলোকে তাদের পক্ষ থেকে এসব কার্ড সরবরাহ করার জন্য লাইসেন্স প্রদান করে। ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিক কোম্পানির লাইসেন্স নিয়ে গ্রাহকদেরকে তাদের কার্ডসমূহ সরবরাহ করা শুরু করে। গ্রাহকরা এসব কার্ড দিয়ে সহজেই বিক্রেতা বা কোনো সেবাদানকারীকে মূল্য পরিশোধ করতে পারে। সাধারণত বিক্রেতা বা সেবাদানকারীর ব্যাংক ক্রেতার ব্যাংক (কার্ড সরবরাহকারী ব্যাংক) থেকে মূল্য পরিশোধ করে নেয়।

---

[৭১৬] সাধারণ এটিএম মেশিন থেকে শুধু টাকা উত্তোলন করা যায়, টাকা জমা করা যায় না। তবে কিছু কিছু এটিএম মেশিনে টাকা জমাও করা যায়।

তাহলে এখানে কার্ডকে কেন্দ্র করে পাঁচটি পক্ষ পাওয়া যায়। নিচের ছকটির প্রতি লক্ষ করুন:
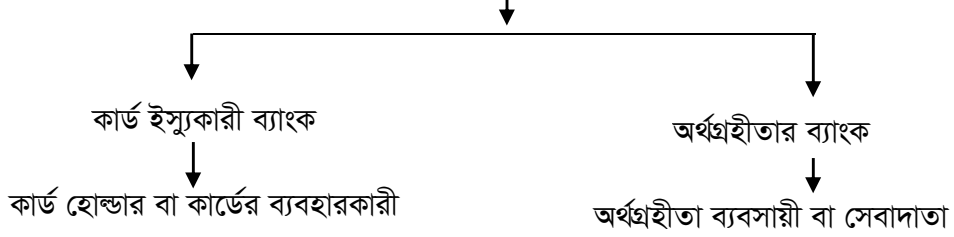
১. কার্ডনির্মাতা সংস্থা: বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক কার্ডনির্মাতা সংস্থা তিনটি- 'ভিসা' (Visa), 'মাস্টার কার্ড' (Master card) ও 'আমেরিকান এক্সপ্রেস' (American express)। এর সাথে আরো আছে- 'ডাইনেস্ ক্লাব' (Diners club), 'মাইস্ট্র' (Maestro) ইত্যাদি।

সাধারণত এসব কোম্পানি কার্ড ইস্যু করা বা সংশ্লিষ্ট লেনদেনে সরাসরি জড়িত থাকে না। American Express ছাড়া অন্যগুলো সরাসরি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানও না; বরং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ক্লাব বা সংঘ হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এরা শুধু কার্ডগুলোর নির্মাতা কোম্পানি। সারা দুনিয়ার ব্যাংকগুলো তাদের সাথে চুক্তি করে তাদের নামেই কার্ড ইস্যু করে। কার্ডনির্মাতা কোম্পানিগুলো শুধু লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। তবে তারাও সরাসরি কিছু কার্ড ইস্যু করে। যদিও তার পরিমাণ তেমন বেশি না।

২. কার্ড ইস্যুকারী (সরবরাহকারী) ব্যাংক: কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংকেই কার্ড ব্যবহারকারীর একাউন্ট থাকে। এ ব্যাংক কার্ড তৈরী করে গ্রাহককে সরবরাহ করে। কার্ড ব্যবহার করে কার্ড ব্যবহারকারী যা লেনদেন করে, তা ইস্যুকারী ব্যাংকের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন, টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডার (ব্যবহারকারী) যদি ইস্যুকারী ব্যাংক ব্যতীত অন্য ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে, তাহলে ইস্যুকারী ব্যাংক উক্ত ব্যাংককে তা পরিশোধ করে। এমনিভাবে কার্ডহোল্ডার কার্ড ব্যবহার করে যা কেনাকাটা বা সেবা ভোগ করে, তার বিলও ইস্যুকারী ব্যাংক বিক্রেতা বা সেবাদানকারীর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডারকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

৩, ৪. কার্ডহোল্ডার ও তার প্রাপক বা অর্থগ্রহীতা: কার্ডহোল্ডার হলো কার্ড ব্যবহারকারী, যে কার্ড ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন বা পরিশোধ করে। আর অর্থগ্রহীতা হলো, কার্ডহোল্ডারের প্রাপক। অর্থাৎ, যে কার্ডহোল্ডার থেকে টাকা পায়। কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডারের পক্ষ থেকে গ্রহীতাকে টাকা পরিশোধ করে। গ্রহীতা ক্ষেত্রবিশেষে কোনো ব্যাংক, বিক্রেতা বা সেবাদানকারী হতে পারে। বিস্তারিত নিম্নের অলোচনায় আসছে।

আমরা জেনেছি যে, **কার্ডহোল্ডার কার্ড ব্যবহার করে মূলত দু'ধরনের সুবিধা ভোগ করে**। যথা-

ক. কার্ডহোল্ডার কার্ড ব্যবহার করে এ.টি.এম-এর সাহায্যে দিন-রাত ২৪ ঘন্টা যেকোনো সময় নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারে। ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডারের একাউন্টে যা জমা আছে সে পরিমাণ, আর ক্রেডিট কার্ডে 'ক্রেডিট লিমিট' (নির্দিষ্ট ঋণ সীমা) অনুযায়ী। যেহেতু সারা দেশে গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা স্থাপনাগুলোতে বুথ থাকে, তাই সহজেই যেকোনো স্থানে টাকা তোলা যায়। এছাড়াও দেশে বিদেশে ইস্যুকারী ব্যাংক ছাড়াও অন্য ব্যাংক থেকেও সহজেই

টাকা উত্তোলন করা যায়।

কার্ড ব্যবহারকারী যদি ইস্যুকারী ব্যাংকের বুথ থেকেই টাকা উত্তোলন করে, তাহলে তো এখানে শুধু ইস্যুকারী ব্যাংক ও তার মাঝেই লেনদেন হচ্ছে। আর যদি অন্য কোনো ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে, তাহলে লেনদেন হবে তিন পক্ষের মাঝে। অর্থাৎ, কার্ডহোল্ডার, ইস্যুকারী ব্যাংক ও তৃতীয় আরেকটি ব্যাংক। এক্ষেত্রে ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডারের পক্ষ থেকে তৃতীয় ব্যাংকটিকে উত্তোলনকৃত অর্থের সমপরিমাণ পৌঁছিয়ে দেয়। এখানে তৃতীয় ব্যাংকটি হলো কার্ডহোল্ডারের অর্থগ্রহীতা।

খ. কার্ডহোল্ডার কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা ও পণ্যের মূল্য বা যেকোনো ঋণ পরিশোধ করতে পারে। ক্রেডিট কার্ড দ্বারা কেবল ঐ সকল দোকান বা মার্কেট থেকেই কেনাকাটা করা যায় যাদের সাথে কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংকের চুক্তি থাকে। উন্নত বিশ্বে অধিকাংশ বিপণী ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে এই কার্ড ব্যবহারের সুযোগ আছে। আমাদের দেশেও এখন ক্রেডিট কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক এর ব্যবহারকারী ও ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মার্কেট, হোটেলসহ বিভিন্ন স্থানে কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের জন্য বিশেষ ধরনের একটি মেশিন থাকে। একে 'পেমেন্ট মেশিন' বা 'পেমেন্ট টার্মিনাল' বলা হয়। কার্ডটি প্রাপক তথা বিক্রেতা বা সেবাদানকারীকে (যেমন, রেস্তোরাঁ বা হোটেল মালিক) দিলে সে তার পেমেন্ট মেশিনে তা প্রবেশ করায়। মেশিনে কার্ড প্রবেশ করানোর সাথে সাথে কার্ডটি আপডেট কিনা, তা বাস্তবেই ক্রেতার কিনা এবং ক্রেতা বা ব্যবহারকারীর একাউন্টে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আছে কিনা অথবা তার ক্রেডিট লিমিট (ঋণ সীমা) পর্যাপ্ত কিনা ইত্যাদি সকল তথ্য দেখা যায়। এরপর বিক্রেতা বা সেবাদানকারী ইস্যুকারী ব্যাংককে ক্রেতা বা কার্ডহোল্ডার যে পরিমাণ কেনাকাটা করেছে তার বিল পাঠায়। ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডের ধরন অনুযায়ী (ডেবিট-ক্রেডিট) তৎক্ষণাৎ বা পরবর্তীতে বিক্রেতার নিকট (তার ব্যাংক একাউন্টে) বিল পরিশোধ করে । বিলের একটি কপি ডকুমেন্ট হিসেবে ক্রেতা বা কার্ডহোল্ডারের নিকটও সংরক্ষিত থাকে।

৫. অর্থগ্রহীতার (বিক্রেতা বা সেবাদানকারী) ব্যাংক: অর্থগ্রহীতা বিক্রেতা বা সেবাদানকারীর একাউন্ট তো কার্ডহোল্ডারের ব্যাংকেই থাকা জরুরী নয়। ধরুন, কার্ডহোল্ডার চট্টগ্রাম নিবাসী। আর বিক্রেতা (অর্থগ্রহিতা) হলো ওয়াশিংটন ডি.সি নিবাসী। লেনদেন হচ্ছে ওয়াশিংটনে। স্বাভাবিকভাবে বিক্রেতার একাউন্ট ওয়াশিংটনের কোনো একটি ব্যাংকেই থাকবে। সাধারণত এ ব্যাংকের মাধ্যমেই সে কার্ডহোল্ডারের ব্যাংক তথা ইস্যুকারী ব্যাংক থেকে অর্থ আদায় করে নেয়। যেহেতু বিষয়টি স্পষ্ট, তাই পৃথকভাবে সবক্ষেত্রে বিক্রেতার ব্যাংকের উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা কার্ড ব্যবহার করে যে লেনদেন করা হয়, তার বিভিন্ন পক্ষ ও তাদের লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করলাম। নিম্নে কিছুটা বিস্তারিতভাবে কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক ও অন্যান্য পক্ষের মাঝে যেসব লেনদেন হয় তার বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছে। কারণ, ফিকহী ব্যাখ্যা ও শর'য়ী হুকুম কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর উপরই নির্ভর করে।

কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক ও কার্ডহোল্ডারের মাঝে সেবা ও ফিসের আদান-প্রদান

কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডারকে নিম্নোক্ত সেবা প্রদান করে থাকে-

(ক) ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডারকে বিশেষ ধরনের উন্নত প্রযুক্তির ইলেক্ট্রনিক কার্ড প্রদান করে। এ কার্ডে থাকে বিশেষ ধরনের ম্যাগনেটিক ফিতা। আরো থাকে সিগনেচার এবং

সিকিউরিটি কোড ইত্যাদির বিশেষ ব্যবস্থা। কার্ডটি ইস্যুকারী ব্যাংকের মালিকানাতেই থাকে।
(খ) লেনদেনের সকল হিসাব রক্ষা করাসহ সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের ব্যবস্থাপনা। এজন্য ব্যাংকের অনেক কর্মচারী, অফিস এবং সরঞ্জামের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়াও আছে বিল আদান-প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থাপনা। কার্ডহোল্ডার ও বিক্রেতার মাঝে হিসাবে গরমিল হলে পুরো বিষয়টি অনুসন্ধান ও যাচাই করা এবং তার সমাধান বের করা।
(গ) শহরে শহরে বুথ স্থাপন করা, তা সংরক্ষণ এবং তত্ত্বাবধান করা ইত্যাদি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ।
উপরোক্ত সুবিধার জন্য কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডার থেকে সাধারণত তিন ধরনের ফি নিয়ে থাকে-
(ক) কার্ড প্রথমে প্রদানের সময় 'সদস্য ফি';
(খ) বাৎসরিক ফি। এ ফি সাধারণত 'সদস্য ফি' থেকে কম হয়। কোনো কোনো কার্ডে এ ফি থাকেই না।[৭১৭]
(গ) কার্ড হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে তা ক্যান্সেল করে নতুন কার্ড প্রদানের ফি। একে 'রিপ্লেসমেন্ট ফি' বলা হয়।
এ তিন প্রকার ফি'ই নির্দিষ্ট অঙ্কের হয়ে থাকে। পার্সেন্টিজ হিসেবে নয়।

কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক ও বিক্রেতা বা সেবাদানকারীর মাঝে চুক্তি ও লেনদেন

কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক বিক্রেতা বা সেবাদানকারীকে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ প্রদান করে থাকে-
(ক) অনেকক্ষেত্রে ইস্যুকারী ব্যাংক বিক্রেতাকে পেমেন্ট মেশিন সরবরাহ করে থাকে।
(খ) পেমেন্ট মেশিনে কার্ড প্রবেশ করানোর পর বিক্রেতাকে কার্ড এবং কার্ডহোল্ডারের ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করা।
(গ) কার্ডহোল্ডারের বিল পরিশোধ করা।
(ঘ) কাস্টমার সরবরাহ করা। যেসব মার্কেট, রেস্টুরেন্ট বা হোটেল ইত্যাদিতে ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা থাকে, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কাস্টমারদের আনাগোনা ও বিক্রয়ের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।[৭১৮]
উপরোক্ত সুবিধাসমূহের মোকাবেলায় কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক বিক্রেতা বা সেবাদানকারী (অর্থগ্রহীতা) থেকেও ফি গ্রহণ করে থাকে। সাধারণত বিক্রেতাকে যে বিল কার্ডহোল্ডারের পক্ষ থেকে পরিশোধ করা হয়, তা থেকেই পার্সেন্টিজ হিসেবে এ ফি নেয়া হয়। যেমন, কার্ডহোল্ডার একটি দোকান থেকে ৫০০/= টাকা মূল্যের বাজার করলো। এখন ব্যাংক কার্ডহোল্ডারের পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে শুধু ৪৯৫/= টাকা পরিশোধ করবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে তার উপর ১% ফি নেয়া হলো। এ ফি বাদ দিয়ে বাকিটা পরিশোধ করা হয়েছে।
পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড এবং চার্জ কার্ডের বিভিন্ন পক্ষ ও তাদের মাঝে যেসব সুবিধা ও ফিসের লেনদেন হয়ে থাকে, তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ

---

[৭১৭] HSBC Bank Bangladesh-এর ওয়েবসাইট

[৭১৮] এই সেবাটি সরাসরি দালালি বা السمسرة -এর অন্তর্ভুক্ত না হলেও তার মতোই। কারণ, দালালি বা السمسرة -এর সারকথা হলো, কাস্টমার বা গ্রাহক সরবরাহ করা। আর কাছাকাছি এ সেবাটিই দোকানি বা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থার মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

করেছি। এখন প্রত্যেকটি কার্ডের বিশেষ পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে-

ডেবিট কার্ড ('ইমিডিয়েট ডেবিট কার্ড' বা তৎক্ষণাৎ কর্তনমূলক কার্ড)

আরবীতে একে 'بطاقة الحسم الفوري' বলা হয়। আরবী নামটি এ কার্ডের পূর্ণ বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ হতে পারে Immediate debit card।[৭১৯] এখানে ডেবিট (Debit) বা الحسم অর্থ, কর্তন করা। আর الفوري বা Immediate অর্থ, তৎক্ষণাৎ, উপস্থিত ইত্যাদি। পুরো অর্থ হলো, 'দ্রুত কর্তনমূলক কার্ড'। কারণ, এ কার্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য দু'টি-

প্রথমত, এ কার্ড ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন বা পরিশোধের জন্য ইস্যুকারী ব্যাংকে কার্ডহোল্ডারের একাউন্ট থাকতে হয় এবং সে একাউন্টে টাকা জমাও থাকতে হয়। এ জমা টাকা থেকে কর্তন করেই উইথ্‌ড্রল (টাকা উত্তোলন) বা পেমেন্ট (পরিশোধ) করা হয়। এটা পুরোই প্রিপেইড সিমের মতো। আপনার একাউন্টে বা কার্ডে যত টাকা থাকবে তার বেশি সাধারণত ব্যবহার বা খরচ করতে পারবেন না বা তুলতে পারবেন না। ধরুন, আপনার একাউন্টে উত্তোলনযোগ্য ৫০০/= টাকা জমা আছে। এখন, ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে আপনি শুধু পাঁচশ টাকার পণ্য বা সেবা ক্রয় করতে পারবেন, অথবা নগদ শুধু পাঁচশ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন। এর বেশি না।[৭২০]

দ্বিতীয়ত, ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে পরিশোধের ক্ষেত্রে যত টাকার পণ্য আপনি ক্রয় করেছেন আপনার একাউন্ট থেকে তৎক্ষণাৎ তার বিল পরিমাণ অর্থ ব্যাংক কর্তন করে বিক্রেতা বা সেবাদানকারীর একাউন্টে পৌঁছিয়ে দিবে। এজন্যই একে দ্রুত বা তৎক্ষণাৎ কর্তনমূলক কার্ড বলা হয়।

ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ও চার্জ কার্ড ব্যবহার করে মৌলিক যে দু'টি সুবিধা লাভ করা যায়, অর্থাৎ, টাকা উত্তোলন এবং পরিশোধ করা, তার বিবরণ পূর্বেই আমরা জেনেছি। সুতরাং এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

ক্রেডিট কার্ড ('অটোমেটিক রিভলভিং ক্রেডিট কার্ড' বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃনবায়ন হয় এমন মেয়াদী ঋণসম্বলিত কার্ড)

আরবীতে একে 'بطاقة الائتمان المتجدِّد' বলা হয়। আরবী নামটি এ কার্ডের পূর্ণ বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ হতে পারে Automatic revolving credit card।[৭২১] অর্থাৎ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃনবায়ন হয় এমন মেয়াদী ঋণসম্বলিত কার্ড। এ নাম থেকেই এ কার্ডের নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়-

১. এটি একটি ঋণভিত্তিক কার্ড। অর্থাৎ, এটি ব্যবহার করে টাকা উত্তোলন বা পরিশোধ করার জন্য কার্ডহোল্ডারের একাউন্টে টাকা জমা থাকার প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাংকে একাউন্ট থাকারও প্রয়োজন হয় না; বরং কার্ডহোল্ডার এমনিতেই ইস্যুকারী ব্যাংক থেকে নির্দিষ্ট

---

[৭১৯] দেখুন: আল মা'আঈরুশ শারইয়্যাহ, ইংরেজী অনুবাদ

[৭২০] উল্লেখ্য, সাধারণ কারেন্ট একাউন্ট বা চলতি হিসাবের মতো ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট পরিমাণ ওভারড্রাফ্‌ট বা জমা টাকার অতিরিক্ত উত্তোলনের সুবিধা থাকে। অতিরিক্ত উত্তোলনের নির্দিষ্ট পরিমাণকে 'ওভারড্রাফ্‌ট লিমিট' বলা হয়।

[৭২১] দেখুন: আল মা'আঈরুশ শারইয়্যাহ, ইংরেজী অনুবাদ

পরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে ব্যবহার (উত্তোলন বা পরিশোধ) করতে পারে।

ক্রেডিট লিমিট: পূর্বেই আমরা জেনেছি যে, ঋণের উক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণকে 'ক্রেডিট লিমিট' (ঋণ সীমা) বলা হয়। 'ক্রেডিট লিমিট' পর্যন্ত কার্ডহোল্ডার কেনাকাটা বা সেবা ভোগ করতে পারে। তবে উত্তোলন করতে পারে ক্রেডিট লিমিট বা ঋণসীমার অর্ধেক পর্যন্ত।[৭২২] যেমন, ক্রেডিট লিমিট বা ঋণসীমা যদি একলক্ষ টাকা হয়, তাহলে কার্ডহোল্ডার এক মেয়াদে একলক্ষ টাকার পরিমাণ কেনাকাটা বা সেবা ভোগ করতে পারবে; তবে নগদ উত্তোলন করতে পারবে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা। তবে কোনো কোনো ব্যাংক পুরো ক্রেডিট লিমিট উত্তোলনের সুবিধা দিয়ে থাকে।[৭২৩]

২. দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি ক্রেডিট কার্ডের নাম থেকে বুঝা যায় তা হলো, ক্রেডিট কার্ডের ঋণ একটি মেয়াদী ঋণ। ক্রেডিট কার্ডের ঋণের মেয়াদকে 'বিলিং সাইক্‌ল' (Billing Cycle) বলা হয়। 'বিলিং' মানে হলো, ধার্য টাকার বিবরণ তৈরী করা। আর 'সাইকেল' শব্দের অর্থ, চক্র, আবর্ত ইত্যাদি। ক্রেডিটের একটি মেয়াদ বা 'বিলিং সাইক্‌ল' সাধারণত ২০-২৫ দিন হয়ে থাকে। 'বিলিং সাইক্‌ল' শেষ হবার পর ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডার বরাবর বিল প্রেরণ করে থাকে। বিল তৈরির আগ পর্যন্ত যত টাকার কেনাকাটা করা হয়েছে বা যত টাকা খরচ করা হয়েছে তার পুরো হিসাব এতে থাকে। প্রতিবেদন আকারে তৈরি ঐ বিলে আরো উল্লেখ থাকে কত তারিখের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে হবে। গত মাসের বিল-তারিখের পরে কোনো টাকা পরিশোধ করে থাকলে, তার বিবরণ এবং আরো প্রয়োজনীয় তথ্য। মাসের যে নির্ধারিত তারিখে কার্ডহোল্ডার বরাবর বিল প্রেরণ করা হয়, তাকে 'স্টেটমেন্ট ডেট' (বিবরণী প্রদানের তারিখ) বলা হয়।

৩. তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি ক্রেডিট কার্ডের নাম থেকে বুঝা যায় তা হলো, ক্রেডিট কার্ডের ঋণের মেয়াদ বা 'বিলিং সাইক্‌ল' স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃনবায়ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ, একটি 'বিলিং সাইক্‌ল' শেষ হবার পর দ্বিতীয় আরেকটি 'বিলিং সাইক্‌ল' নতুন 'ক্রেডিট লিমিট'সহ এমনিতেই শুরু হয়ে যায়। যদিও প্রথম মেয়াদের ঋণ আংশিক বা সম্পূর্ণ অনাদায়ীই থেকে যায়।

এখান থেকে বুঝা যায় যে, ক্রেডিট কার্ডের মেয়াদগুলোর কার্যত তেমন কোনো গুরুত্ব নেই।[৭২৪] এজন্য ক্রেডিট কার্ডকে মেয়াদহীন বা অতিদীর্ঘমেয়াদী ঋণকার্ড মনে করা হয়। হ্যাঁ, কার্ডহোল্ডারের নিকট মেয়াদের বিষয়টি এজন্য গুরুত্ব পায় যে, মেয়াদ শেষ হবার পর নির্দিষ্ট কিছু দিন[৭২৫] কার্ডহোল্ডারকে এ সুবিধা দেয়া হয় যে, সে এর ভিতরেই বিল পুরোপুরি পরিশোধ করলে তার উপর কোনো সুদ আসবে না। অন্যথায় স্বাভাবিকভাবে তাকে পুরো মেয়াদের সুদের বোঝা বহন করতে হয় (সামনে বিস্তারিত আসছে)। তবে কার্ডহোল্ডার নিজ ইচ্ছেমতো আরো দেরিতে পরিশোধ করতে পারে।[৭২৬]

---

[৭২২] নতুন নীতিমালায় বিধান করা হয়েছে, ব্যাংক গ্রাহককে ক্রেডিট কার্ডে যে অর্থ সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, তার ৫০ ভাগ গ্রাহককে নগদ টাকা উত্তোলনের সুবিধা দিতে হবে। (দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট, ২০১৭ ইং)

[৭২৩] Dutch-Bangla Bank bd website: Credit card Features & Benefits. তবে তারা ব্যালেন্স ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ৯০% ব্যবহারের সুযোগ দেয়।

[৭২৪] দেখুন: Americanexpress.com

[৭২৫] এটাকে 'গ্রেস পিরিয়ড' বা ছাড়যুক্ত মেয়াদ বলা হয়। সামনে বিস্তারিত আসছে।

[৭২৬] তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত একটি ঘোষণা অনুযায়ী, ক্রেডিট কার্ড পেতে হলে কোনো ধরনের ঋণখেলাপি

ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা শর'য়ী হুকুমের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে, নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে-

ক. সুদ ও গ্রেস পিরিয়ড: ক্রেডিট কার্ড চুক্তিটি (Credit Card Agreement)[৭২৭] আসলে একটি সুদী চুক্তি। ক্রেডিট কার্ডের সুদের হার সাধারণত অন্য যেকোনো সুদের হারের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে। আমাদের দেশের ব্যাংকগুলো সাধারণত ১৮ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৩৬ শতাংশ হারে ক্রেডিট কার্ডের সুদ নিয়ে থাকে।[৭২৮] বেশিরভাগ ব্যাংকেরই এই সুদের হার ৩০ শতাংশের বেশি।[৭২৯] তবে ইদানীং সরকারের চাপে তারা এ হার কিছুটা কমিয়েছে।[৭৩০]

আমরা জানি, ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার মূলত দু'ধরনের হয়ে থাকে- ১. পেমেন্ট ও ২. ক্যাশ। ক্যাশ অর্থ, নগদ অর্থ ব্যবহার। চাই তা নগদ উত্তোলন হোক বা নগদ ট্রান্সফার হোক।

ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ক্যাশ করার ক্ষেত্রে সুদ আদায় করা আবশ্যকীয়। এক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেয়া হয় না। তবে পেমেন্টের ক্ষেত্রে 'গ্রেস পিরিয়ডের' সুযোগ দেয়া হয়।

'গ্রেস পিরিয়ড' (Grace period) এর শাব্দিক অর্থ হলো, ছাড়যুক্ত মেয়াদ। আরবীতে একে 'فترة سَماح' বলা হয়। একটি বিলিং সাইক্ল শেষ হবার পর থেকে (অর্থাৎ, স্টেটমেন্ট বা বিল প্রেরণের তারিখ থেকে) সাধারণত ৯-১০ দিন কার্ডহোল্ডারকে সুদমুক্ত বিল আদায়ের সুযোগ দেয়া হয়। এ সময়ের শেষদিনকে বলা হয়, ডিও ডেট বা ঋণ আদায়ের তারিখ। 'স্টেটমেন্ট ডেট' থেকে 'ডিও ডেট' পর্যন্ত এ সময়ককালকেই 'গ্রেস পিরিয়ড' বলা হয়। এর ভিতরে পুরো ঋণ আদায় করে দিলে (পেমেন্টের ক্ষেত্রে, ক্যাশের ক্ষেত্রে নয়) কোনো সুদ আসবে না। পুরো বা আংশিক ঋণ অনাদায়ী থাকলে গ্রেস পিরিয়ডের আর কোনো মূল্য থাকে না। এক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড না থাকার মতোই[৭৩১] হয়ে যায়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে মাসের শুরু থেকে বা বিলিং পিরিয়ডের শুরু থেকেই অনাদায়ী ঋণের সুদের হিসাব করা হয়। হুবহু ক্যাশের মতো।

উল্লেখ্য, গ্রেস পিরিয়ডে নতুন ক্রয়-বিক্রয় করলে তা নতুন বিলিং সাইক্লের অন্তর্ভুক্ত হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, একটি বিলিং সাইক্ল শেষ হবার পরই আরেকটি বিলিং সাইক্ল শুরু হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয় যে, যে আগের বিলিং পিরিয়ডের ঋণ আদায় করে না, তার জন্য দ্বিতীয় মেয়াদ থেকে মোটেও গ্রেস পিরিয়ড থাকে না।[৭৩২]

হওয়া যাবে না, পাশাপাশি গ্রাহকের ই-টিআইএন থাকতে হবে। কার্ডে যে ঋণ হবে, তা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পরিশোধ না করলে গ্রাহক খেলাপি হয়ে পড়বেন। তাঁর নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ তথ্য ব্যুরোতে (সিআইবি) প্রতিবেদন পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে। সুদ হিসাবের পদ্ধতি, বকেয়া পরিশোধের শেষ সময়সীমা গ্রাহককে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করতে হবে। (দৈনিক প্রথম আলো: ২০ মে ২০১৭ ইং)

[৭২৭] কার্ড ইস্যুকারী কোম্পানি ও ব্যাংকের ওয়েবসাইটে সব ধরনের কার্ডের ভিন্ন এগ্রিমেন্ট পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রে গ্রাহকদেরকেও তা প্রদান করা হয়।

[৭২৮] দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট, ২০১৭

[৭২৯] দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ আগস্ট, ২০১৭

[৭৩০] প্রাগুক্ত

[৭৩১] Investopedia: Grace periods (credits), আরো দেখুন: http://www.greedyrates.ca/blog/dark-secret-credit-card-grace-period-really-work, এবং How to use the grace period to avoid paying interest (www.creditcards.com).

[৭৩২] What is a credit card grace period? Nolo.com, legal encyclopedia.

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটা হলো পেমেন্ট তথা কেনাকাটা বা অন্যান্য বিল পরিশোধে খরচকৃত ঋণের ব্যাপারে। তবে এ.টি.এম বুথ থেকে নগদ উত্তোলন বা ব্যালেন্স ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো 'গ্রেস পিরিয়ড' বা ছাড়যুক্ত মেয়াদ থাকে না; বরং এক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম থেকেই বিল পরিশোধের তারিখের আগ পর্যন্ত সুদ আসতে থাকে।

খ. জরিমানা ও অন্যান্য চার্জঃ গ্রেস পিরিয়ডের শেষে বিল-তারিখে পুরো ঋণ পরিশোধ না করলেও ঋণের নির্দিষ্ট একটি ক্ষুদ্র অংশ আদায় করতে হয়। একে 'মিনিমাম ডিও' (সর্বনিম্ন প্রদেয়) বলা হয়। বিল-তারিখটি আসলে 'মিনিমাম ডিও' আদায়ের তারিখ। 'মিনিমাম ডিও' আদায় না করলে পরবর্তীতে কার্ডহোল্ডারকে (সুদের সাথে সাথে)[৭৩৩] নির্ধারিত অঙ্কের জরিমানাও আদায় করতে হয়। একে 'লেইট পেমেন্ট ফি' বলা হয়। কখনো এ জরিমানা শতকরা হারেও হয়ে থাকে।[৭৩৪]

এছাড়াও দেরির ক্ষেত্রে শাস্তিস্বরূপ অনেক সময় পরবর্তীতে সুদের হার বাড়িয়ে দেওয়া হয়।[৭৩৫] কোনো কোনো ব্যাংক জরিমানা গ্রহণ না করে শুধু সুদের হার বাড়িয়ে দেয়।[৭৩৬]

এছাড়াও নগদ উত্তোলন বা ব্যালেন্স ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে প্রতিবারের জন্য আলাদা ফিস আদায় করতে হয়।[৭৩৭] এ ফি নির্ধারিত বা শতকরা যেকোনো ধরনের হতে পারে। তবে অনেক ব্যাংক নগদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ফি নেয় না।[৭৩৮]

ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ফি হলো, 'ওভার লিমিট ফি'। অর্থাৎ, বিলিং পিরিয়ডের ভেতরেই ক্রেডিট লিমিটের অতিরিক্ত পরিশোধ বা ক্যাশ হলে তার জন্যও আলাদা একটি ফি প্রদান করতে হয়।[৭৩৯]

উপরোক্ত ফি'সমূহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরির ক্রেডিট কার্ডে ইস্যুকারী ব্যাংক আরো অন্যান্য ফি'ও নিয়ে থাকে।[৭৪০]

গ. ক্রেডিট কার্ডের বিল 'ডাইরেক্ট পেমেন্ট' করারও সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ, কার্ডহোল্ডারের যেকোনো ব্যাংক একাউন্ট থেকে সরাসরি পরিশোধেরও ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে ইস্যুকারী ব্যাংকের সাথে এ মর্মে চুক্তি করা হয় যে, বিলিং পিরিয়ডে কার্ডহোল্ডার যা খরচ করেছে, নির্ধারিত তারিখে তা সরাসরি কার্ডহোল্ডারের একাউন্ট থেকে কেটে নিবে।

ঘ. সাধারণত ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য কার্ডহোল্ডারকে অতিরিক্ত অর্থপ্রদান করতে হয় না; বরং সাধারণ বাজার মূল্যেই সে কেনা-কাটা করতে পারে। কারণ কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংককে দোকানী কর্তৃক কমিশন প্রদান করা লাগলেও যে দোকানে এ সুবিধা

---

[৭৩৩] 'মিনিমাম ডিও' আদায় না করলে তো পুরো ঋণই অনাদায়ী। এক্ষেত্রে পুরো ঋণের উপর সুদ আসতে থাকে। আর 'মিনিমাম ডিও' আদায় করলেও বাকি ঋণের উপর নির্ধারিত হারে সুদ আসতে থাকে।

[৭৩৪] AmEx Agreement

[৭৩৫] Investopedia: 5 Secrets Credit Card Companies Don't Want You To Know, By Debbie Dragon.

[৭৩৬] Dutch-Bangla Bank bd website: Credit card Features & Benefits.

[৭৩৭] Investopedia: 5 Secrets Credit Card Companies Don't Want You To Know, By Debbie Dragon. দৈনিক প্রথম আলোঃ ১২ অক্টোবর, ২০১৬ ইং

[৭৩৮] Dutch-Bangla Bank bd website: Credit card Features & Benefits.

[৭৩৯] দেখুনঃ What is a credit card over limit fee, thebalance.com

[৭৪০] উদাহরণস্বরূপ দেখুনঃ AmEx Agreement

থাকে সেখানে বিক্রয় র পরিমাণ বেড়ে যায় এবং গড় হিসেবে এটি লাভজনক হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো ছোট দোকানদার অথবা খুবই স্বল্প লাভ করে থাকে (যেমন ১-৩%) এমন প্রতিষ্ঠান কার্ডে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৩% চার্জ করে থাকে। তাদের দাবি হচ্ছে, ব্যাংক তাদের থেকে যে ৩% কমিশন নিয়ে থাকে সেটিই তারা গ্রাহকের কাছ থেকে অতিরিক্ত নিচ্ছে।

ঙ. ক্রেডিট কার্ডে ফিসের যেমন কোনো কমতি নেই, তেমনি সুবিধাও অনেক। ভালো ক্যাটাগরীর ক্রেডিট কার্ডে সাধারণত স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বীমা সুবিধাও প্রযোজ্য হয়।

চ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করা বা অন্যান্য বাধ্যবাধকতাও থাকে।

দেশে প্রতিনিয়ত বাড়ছে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার। প্রতি মাসেই গ্রাহকরা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে প্রায় সাড়ে সাতশো কোটি টাকার লেনদেন করছে। গত জানুয়ারিতে প্রায় ৮ লাখ ৭৭ হাজার ক্রেডিট কার্ড চালু ছিলো।[৭৪১] বর্তমানে দেশে ৯ লাখ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী রয়েছে।[৭৪২]

চার্জ কার্ড ('স্পেসিফাইড ক্রেডিট কার্ড' বা নির্দিষ্ট মেয়াদের ঋণসম্বলিত কার্ড)

চার্জ কার্ডও একটি ক্রেডিট বা ঋণকার্ড। তবে ক্রেডিট কার্ডের সাথে এর কিছু পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশে এখনো এ কার্ডের ব্যবহার নেই বললেই চলে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ কার্ড নিয়েও কিছু আলোচনা করা জরুরী মনে হচ্ছে।

চার্জ কার্ড অর্থ, বকেয়া কার্ড। আরবীতে একে 'بطاقة الائتمان والحسم الآجل' বলা হয়। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ হতে পারে Specified credit card।[৭৪৩] অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মেয়াদী ঋণকার্ড।

যেহেতু চার্জ কার্ডও একটি ক্রেডিট কার্ড, তাই এখানে ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারে যা উল্লেখ করা হয়েছিলো তার পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু ক্রেডিট কার্ডের সাথে পার্থক্যের দিকগুলো উল্লেখ করলেই এ কার্ডের বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝা যাবে। নিম্নে তাই উল্লেখ করা হলো।[৭৪৪]

১. ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারে আমরা জেনেছি যে, এটির মাধ্যমে শুধু নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (ক্রেডিট লিমিট) ব্যবহার করা যায়। তবে ব্যবহারের মেয়াদের ('বিলিং সাইক্ল') এতে তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু চার্জ কার্ডের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো। এতে ক্রেডিট লিমিটের কোনো গুরুত্ব নেই; তবে বিলিং সাইক্লের গুরুত্ব অপরিসীম।

চার্জ কার্ড ব্যবহার করে আনলিমিটেড বা অনেক বড় লিমিটের অর্থ ব্যবহার করা যায়।[৭৪৫] তবে বিলিং পিরিয়ড এবং 'গ্রেস পিরিয়ড' শেষ হলে অবশ্যই পুরো ঋণ আদায় করতে হয়। নইলে কার্ডহোল্ডারের মেম্বারশিপ বাতিল হয়ে যেতে পারে।

২. যেহেতু চার্জ কার্ডে নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিতরেই পুরো বিল পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক, তাই কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী এতে সুদের কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে নির্দিষ্ট মেয়াদের পরও

---

[৭৪১] দৈনিক প্রথম আলো: ২০ মে ২০১৭ ইং

[৭৪২] দৈনিক প্রথম আলো: ২০ মে ২০১৭ ইং

[৭৪৩] দেখুন, আল মাআঈরুশ শারইয়্যাহ, ইংরেজী অনুবাদ

[৭৪৪] এ বৈশিষ্ট্যগুলো সব AmEx এর ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত (Understanding the differences between charge & credit cards)

[৭৪৫] কারণ, চার্জ কার্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বড় ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের জন্য।

আংশিক বা পুরো বিল বাকী থাকলে মোটা অঙ্কের জরিমানা ('পেনাল্টি ফিস') গুণতে হয়। এ জরিমানা সাধারণত নির্দিষ্ট অঙ্কের হয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রে পার্সেন্টিজ আকারেও হয়।

ফিকহী ব্যাখ্যা ও শর'য়ী হুকুম প্রসঙ্গ

প্রথমেই আমরা ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের শর'য়ী ব্যাখ্যা ও আহকাম সংক্রান্ত কিছু মৌলিক আলোচনা করবো। এরপর আমরা প্রত্যেকটি কার্ডের সাথে সম্পৃক্ত আহকাম পৃথকভাবে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

শর'য়ী হুকুম উল্লেখ করার পূর্বেই দু'টি বিষয়ের ফিকহী ব্যাখ্যা উল্লেখ করা জরুরী-

১. বিভিন্ন পক্ষের মাঝে যে চুক্তি হয় তার ফিকহী ব্যাখ্যা;

২. কার্ডহোল্ডার এবং ব্যবসায়ী থেকে ইস্যুকারী ব্যাংক যে ফিস গ্রহণ করে তার ব্যাখ্যা।

আমরা পরিচিতি পর্বে আলোচনা করেছি যে, কার্ড গ্রহণ ও ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে মৌলিকভাবে তিনটি পক্ষের মাঝে লেনদেন হয়ে থাকে-

ক. ইস্যুকারী ব্যাংক।

খ. গ্রাহক বা কার্ডহোল্ডার।

গ. বিক্রেতা বা সেবাদানকারী।[৭৪৬]

১. বিভিন্ন পক্ষের মাঝে চুক্তির শর'য়ী বিশ্লেষণ

গ্রাহক, বিক্রেতা ও ব্যাংকের মাঝে যে চুক্তিগুলো হয় তা মৌলিকভাবে তিনপ্রকার- প্রথমত, ঋণচুক্তি। দ্বিতীয়ত, হাওয়ালা'র চুক্তি। তৃতীয়ত, ইজারা বা সার্ভিসেস চুক্তি। নিম্নে এ তিন ধরনের চুক্তি নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

(ক) ঋণ-চুক্তি

আমরা পূর্বে জেনেছি যে, ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে কোনো ঋণ-চুক্তি হয় না; বরং কার্ডহোল্ডারের একাউন্টে জমা টাকা থেকে কর্তন করেই টাকা উত্তোলন বা পরিশোধ করা হয়।

তবে চার্জ কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডার এবং ইস্যুকারী ব্যাংকের মাঝে ঋণ-চুক্তি হয়ে থাকে। কার্ডহোল্ডার কখনো ইস্যুকারী ব্যাংক থেকে সরাসরি ঋণ নেয়। আর কখনো ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডারের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পরিশোধ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এ পরিশোধিত অর্থ মূলত ইস্যুকারী ব্যাংক কর্তৃক কার্ডহোল্ডারকে প্রদত্ত ঋণ। কার্ডহোল্ডার মেয়াদান্তে এ ঋণ ইস্যুকারী ব্যাংককে পরিশোধ করে।

যেমনটি আমরা দেখেছি, ক্রেডিট ও চার্জ কার্ডের ক্ষেত্রে ঋণ-চুক্তিটি স্পষ্ট। এর কোনো আলাদা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

(খ) হাওয়ালা চুক্তি

ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে কার্ডহোল্ডার কোনো পণ্য ক্রয় বা কোনো সেবা গ্রহণ করার পর তার মূল্য বা বিল তার নিকট বিক্রেতা বা সেবাদানকারীর প্রাপ্য ঋণ হিসেবে থাকে। আমরা জানি, এ ঋণ কার্ডহোল্ডার নিজেই বিক্রেতা বা সেবাদানকারীকে আদায় করে না; বরং সে ইস্যুকারী ব্যাংককে এই ঋণ সমর্পণ করে। ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডারের পক্ষ থেকে বিক্রেতা

---

[৭৪৬] বিক্রেতা পক্ষের সকল লেনদেন তার ব্যাংকের সাথেই সাধারণ নিয়মে হয়ে থাকে। তাই এখানে ভিন্নভাবে ব্যাংকের কথা উল্লেখ করা হলো না।

বা সেবাদানকারীকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করে।[৭৪৭]

এভাবে ঋণকে নিজ জিম্মা থেকে আরেকজনের জিম্মায় স্থানান্তর করা বা আরেকজনকে ঋণের দায় সমর্পণ করাকে হাওয়ালা বলা হয়।[৭৪৮]

---

[৭৪৭] উল্লেখ্য, হাওয়ালার মূল বৈশিষ্ট্য তো এটাই যে, এতে মুহীলের ঋণের দায় মুহাল আলাইহ বা দায়ভারগ্রহণকারীর উপর চলে আসে। এজন্য সাধারণ অবস্থায় মুহাল লাহু বা ঋণদাতা মুহীল থেকে ঐ ঋণ আর তলব করতে পারে না। সে মুহাল আলাইহ বা দায়ভারগ্রহণকারী থেকেই ঐ ঋণ তলব করতে পারে। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফিকহের অগ্রগণ্য মতানুযায়ী মুহাল আলাইহি বা দায়বদ্ধ ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হলেও ঋণের দায় মুহীলের উপর বর্তাবে না। তবে হানাফী ফকীহদের মতে, যদি কোনো কারণে মুহাল আলাইহি বা দায়বদ্ধ ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়, তাহলে ঋণদাতা মুহীল থেকে তার ঋণ তলব করতে পারবে।
আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন (আল হিদায়া ৩/১০০):

قال: "ولا يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه" وقال الشافعي رحمه الله: لا يرجع وإن توي، لأن البراءة حصلت مطلقة فلا تعود إلا بسبب جديد. ولنا أنها مقيدة بسلامة حقه له إذ هو المقصود، أو تنفسخ الحوالة لفواته لأنه قابل للفسخ فصار كوصف السلامة في المبيع.

قال: "والتوى عند أبي حنيفة رحمه الله أحد الأمرين: إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه، أو يموت مفلسا" لأن العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد منهما.. وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافا لهما، لأن مال الله غاد ورائح.

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, মুহাল আলাইহি ব্যর্থ হলে মুহীলের কাছে তলব করা এটা ব্যবসায়ী বা মুহাল লাহুর একটি অধিকার। স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো হাওয়ালা চুক্তি হলে তার জন্য এ অধিকার বলবৎ থাকবে। তবে যদি মুহাল লাহু ও মুহীল চুক্তির সময় মুসালাহাত করে নেয় যে, সে আর তার অধীকার মুহীল থেকে তলব করবে না, তাহলে আশা করা যায়, এমন মুসালাহাত হাওয়ালা চুক্তির জন্য প্রতিবন্ধক হবে না।

[৭৪৮] ক্রেডিট ও চার্জ কার্ডের চুক্তিতে মূলত কার্ডহোল্ডার তার পরিশোধ্য অর্থের দায় ইস্যুকারী ব্যাংককে সমর্পণ করে। এ অর্থের প্রাপক তথা বিক্রেতা বা সেবাদানকারীও এ দায় সমর্পণ সমর্থন করে। এর ফলে বিক্রেতা বা সেবাদানকারী আর কার্ডহোল্ডার তথা ক্রেতা বা সেবাগ্রহণকারী থেকে উক্ত অর্থ তলব করতে পারে না। এ ধরনের চুক্তিকেই ফিকহে ইসলামীর পরিভাষায় 'হাওয়ালা বলা হয়।
বর্তমানের কোনো কোনো মুফতী সাহেব কার্ডের বিভিন্ন পক্ষের মাঝে চুক্তিকে কাফালাহ বা ওয়াকালাহ-এর চুক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ফকীহগণের নুসূস ও উপরোক্ত চুক্তিগুলোর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করলে হাওয়ালা-এর চুক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।
কারণ, কাফালাহ-এর সংজ্ঞায় ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, এটি হলো- ضمُّ ذمة إلى ذمة
এজন্য কাফালাহ-এর ক্ষেত্রে মাকফুল লাহু বা প্রাপক কাফীল ও মাকফুল আনহু উভয় থেকেই ঋণ তলব করতে পারে। কারণ, এখানে দায় বহনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একজন (কাফীল) যোগ হয়, কেউ বাদ পড়ে না।
আমরা পূর্বে দেখেছি যে, ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের চুক্তিটি এমন নয়; বরং এখানে মূল ঋণী ব্যক্তি (কার্ডহোল্ডার) দায়মুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং এটি হাওয়ালা চুক্তির সাথেই অধিক সামঞ্জস্য রাখে।
আর কাফালাহ-এর ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম মাকফুল লাহু নির্দিষ্ট হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। যেমন, আল্লামা আবু বকর কাসানী রাহ. বলেন:

(وأما) الذي يرجع إلى المكفول له. فأنواع (منها) أن يكون معلوما، حتى أنه إذا كفل لأحد من الناس لا تجوز، لأن المكفول له إذا كان مجهولا لا يحصل ما شرع له الكفالة وهو التوثق.

অথচ ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের চুক্তিতে যাকে ঋণ আদায় করা হবে, তাকে নির্দিষ্ট করার কোনো উপায় নেই। বলা বাহুল্য, কার্ডহোল্ডার কখন কোন দোকানে কেনাকাটা করবে বা কার সেবা গ্রহণ করবে, তা কারো জানা নেই। এদিক থেকেও কাফালাহ-এর সাথে আলোচ্য চুক্তির পার্থক্য বিদ্যমান।
আর ওয়াকালাহ-এর প্রকৃতিও ডেবিট-ক্রেডিট কার্ডের চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, ওয়াকীলের দায়িত্বের সীমারেখা সাধারণত অনেক সংকীর্ণ হয়ে থাকে। সে সাধারণ অবস্থায় কোনো সমস্যার দায়ভার বা

যিনি ঋণের দায় সমর্পণ করেন, তাকে মুহীল (مُحيل) বা সমপর্ণকারী বলে। যেমন, এখানে কার্ডহোল্ডার হলো 'মুহীল' (مُحيل)।

দায় সমর্পণ গ্রহণকারী ব্যক্তিকে মুহাল আলাইহি (مُحال عليه) বা দায়বদ্ধ বলে। যেমন, এখানে ইস্যুকারী ব্যাংক হলো 'মুহাল আলাইহ' (مُحال عليه)।

আর ঋণের অধিকারী ব্যক্তিকে মুহাল লাহু বা মুহাল (مُحال) বা দায়ের অধিকারী বলে। যেমন, এখানে বিক্রেতা বা সেবাদানকারী হলো 'মুহাল' (مُحال)।

হাওয়ালার বৈধতার ব্যাপারে হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষ্য এসেছে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন-

مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع.

"ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তির টালবাহানা অন্যায়। তোমাদের কেউ স্বীয় ঋণ কোনো ধনী ব্যক্তির উপর হাওয়ালা করলে পাওনাদার যেন তা মেনে নেয়।"[৭৪৯]

এজন্য 'হাওয়ালা' বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত।[৭৫০]

পূর্বে আমরা দেখেছি যে, হাওয়ালা চুক্তিতে তিন পক্ষ একসাথে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং এটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি। তাই এতে তিন পক্ষ রাজী হওয়া শর্ত।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

قال (وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليه) أما المحتال فلأن الدين حقه وهو الذي ينتقل بها والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه، وأما المحتال عليه فلأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه، وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه ذكره في الزيادات لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره.

"তিনি বলেন, (হাওয়ালা শুদ্ধ হবে মুহীল, মুহতাল ও মুহতাল আলাইহির সন্তুষ্টি পাওয়া গেলে) মুহতালের সন্তুষ্টি শর্ত, কেননা ঋণ তার হক। হাওয়ালার মাধ্যমে তারই অধিকার বা পাওনা স্থানান্তর করা হচ্ছে। অতএব তার সন্তুষ্টি অবশ্যক।

আর মুহতাল আলাইহির সন্তুষ্টিও শর্ত; কেননা হাওয়ালাতে ঋণ তার উপর বর্তায় আর অনিচ্ছায় কারো উপর কোনো কিছু আবশ্যক করা যায় না।

আর মুহীলের ইচ্ছা ছাড়াও হাওয়ালা শুদ্ধ হয়। এটা যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ঋণের দায় নিজের কাঁধে নেয়া মুহতাল আলাইহির নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং এতে মুহীলের কোনো ক্ষতি নেই; বরং লাভ রয়েছে। কারণ, হাওয়ালা তার নির্দেশে না হলে মুহতাল আলাইহি ঋণটা

ضمان বহন করে না। আল্লামা সারাখসী রাহ. বলেন:

ولا يضمن الوكيل؛ لأنه لم يخالف، والوكيل إنما يضمن بالخلاف لا بفساد العقد.

অথচ এখানে কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক ঋণের পুরো দায়ভার ও যামান বহন করে, যেমনটি আমরা পূর্বে দেখেছি। হাওয়ালা-র ক্ষেত্রে উপরোক্ত সমস্যাগুলো হচ্ছে না। আর বৈশিষ্ট্যগতভাবে ডেবিট-ক্রেডিট চুক্তি এর সাথেই সামঞ্জস্য রাখে।

[৭৪৯] সহীহ বুখারী: ১/৩২৩ হাদীস নং ২৪০০, সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৫৬৪, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা

[৭৫০] মাতালিবু উলিন নুহা: ৩/৩২৪, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যা ১৮/১৭১

মুহীল থেকে ফেরতও নিতে পারবে না।"[৭৫১]
আল্লামা মাজদুদ্দীন আবুল ফযল মাওসিলী রাহ. (৬৮৩ হি.) বলেন-

قال: (وتصح برضا المحيل والمحتال والمحال عليه) أما المحيل فلأنه الأصل في الحوالة، ومنه توجد، وذكر في الزيادات أن رضا المحيل ليس بشرط لأن المحال عليه يتصرف في نفسه بالتزام الدين ولا ضرر على المحيل بل فيه نفعه ; لأنه لا يرجع عليه إلا برضاه. وأما المحتال والمحال عليه، فلتفاوت الناس في القضاء والاقتضاء، فلعل المحال عليه أعسر وأفلس، والمحتال أشد اقتضاء ومطالبة، فيشترط رضاهما دفعا للضرر عنهما.

"তিনি বলেন, (হাওয়ালা শুদ্ধ হবে মুহীল, মুহতাল ও মুহতাল আলাইহির সন্তুষ্টি পাওয়া গেলে) মুহীলের ইচ্ছা থাকা শর্ত, কারণ সেই তো হাওয়ালাকারী। তার উদ্যোগেই হাওয়ালা অস্তিত্বে আসবে। (তবে) 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মুহীলের সন্তুষ্টি শর্ত নয়। কেননা তার ইচ্ছা ছাড়া মুহতাল আলাইহি নিজের উপর দায় আবশ্যক করে নিলে মুহীলের লাভ বৈ কোনো ক্ষতি নেই। অতএব তার সন্তুষ্টি বা ইচ্ছার আবশ্যকতা নাই। কেননা মুহতাল আলাইহি মুহীলের ইচ্ছায় দায় নিলেই কেবল ফেরত নিতে পারবে, অন্যথায় নয়। আর মুহতাল ও মুহাল আলাইহির সন্তুষ্টি আবশ্যক। কেননা আদায় করা ও আদায় দাবি করার মাঝে মানুষ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। হতে পারে মুহাল আলাইহি দরিদ্র, নিঃস্ব এবং মুহতাল দাবি ও চাওয়ার ক্ষেত্রে খুব বেশি অস্থির। এজন্য উভয়কে ক্ষতি থেকে বাঁচাতে সন্তুষ্টির শর্ত করা হয়েছে।"[৭৫২]

লক্ষণীয় যে, হাওয়ালা-তে محال عليه-এর কাছে পূর্ব থেকে محيل-এর অর্থ জমা থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে। এই দিক থেকে ফকীহগণ হাওয়ালাকে দু'প্রকারে ভাগ করেছেন-

১. হাওয়ালা মুকায়্যাদাহ (الحوالة على مدين বা الحوالة المقيدّة)

মুহাল আলাইহি'র (দায়বদ্ধ) কাছে মুহীলের (দায় সমর্পণকারী) যে মাল আছে, তা থেকে দায়ের অর্থ পরিশোধ করার শর্ত করা হলে, তাকে 'হাওয়ালা মুকায়্যাদাহ' (শর্তযুক্ত দায় সমর্পণ) বলা হয়।

২. হাওয়ালা মুতলাকাহ (الحوالة على غير مدين বা الحوالة المطلقة)

মুহাল আলাইহি'র কাছে মুহীলের যে মাল আছে, তা থেকে দায়ের অর্থ পরিশোধ করার শর্ত না থাকলে, তাকে 'হাওয়ালা মুতলাকাহ' (নিঃশর্ত দায় সম্পর্ণ) বলা হয়।

'হাওয়ালা মুকায়্যাদাহ' জায়েয হওয়ার ব্যপারে তো চার ফিকহী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম একমত। আর হানাফী ফকীহগণের নিকট 'হাওয়ালা মুতলাকাহ'ও জায়েয এবং এতে শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা নেই।

শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. বলেন-

فإن الحوالة قد تكون مقيدة بما للمحيل على المحتال عليه وقد تكون مطلقة، بل حقيقة الحوالة هي المطلقة.

"হাওয়ালা কখনো মুহতাল আলাইহির উপর মুহিলের যে মাল রয়েছে তা থেকে আদায়ের

[৭৫১] আল হিদায়া: ৩/১২৭, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া
[৭৫২] আল ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার: ৩/৪, দারুল হাদীস, কায়রো

শর্তযুক্ত হয়ে থাকে। আর কখনো মুতলাকাহ (শর্তহীন) হয়; বরং হাওয়ালার মূল অবস্থা হলো মুতলাকাহ হওয়া।"[৭৫৩]

আল্লামা আবু বকর কাসানী রাহ. বলেন-

والجملة فيه أن الحوالة نوعان: مطلقة، ومقيدة، فالمطلقة: أن يحيل بالدين على فلان، ولا يقيده بالدين الذي عليه، والمقيدة: أن يقيده بذلك، والحوالة بكل واحدة من النوعين جائزة؛ لقوله – عليه الصلاة والسلام –: «من أحيل على مليء فليتبع» من غير فصل. إلا أن الحوالة المطلقة؛ تخالف الحوالة المقيدة في أحكام...

"এ বিষয়ে মুদ্দাকথা হলো, হাওয়ালা দুই প্রকার: **১.** মুতলাকাহ **২.** মুকায়্যাদাহ। মুতলাকাহ হলো পাওনাকে কারো উপর হাওয়ালা করা এবং নিজের পাওনার সাথে শর্তযুক্ত না করা। মুকায়্যাদাহ হলো, সেটার সাথে শর্তযুক্ত করা। উভয় প্রকারের হওয়ালা জায়েয। রাসূল ﷺ এর এই হাদীসের কারণে: যদি কারো পাওনা কোনো ধনীর উপর হাওয়ালা করা হয়, সে যেন মেনে নেয়।' এ হাদীসে ব্যাপকভাবে হাওয়ালার বৈধতা দেয়া হয়েছে। কোনো প্রকারকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং উভয় প্রকার হাওয়ালাই বৈধ; তবে কিছু আহকামের ক্ষেত্রে হাওয়ালা মুতলাকাহ হাওয়ালা মুকায়্যাদাহ থেকে ভিন্ন।"[৭৫৪]

ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে 'হাওয়ালা মুকায়্যাদাহ' পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, এক্ষেত্রে ব্যাংক কার্ডহোল্ডারের অর্থ (যা ব্যাংকের নিকট কার্ডহোল্ডারের প্রাপ্য ঋণ হিসেবে রয়েছে) থেকেই তৃতীয় পক্ষের ঋণ আদায় করে থাকে। যদি কার্ডহোল্ডারের একউন্টে টাকা না থাকে, তাহলে ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা সম্ভব না।

আর **ক্রেডিট কার্ড** ও **চার্জ কার্ডের** ক্ষেত্রে 'হাওয়ালা মুতলাকাহ' পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, এক্ষেত্রে ইস্যুকারী ব্যাংকের নিকট কার্ডহোল্ডারের কোনো অর্থ থাকে না বা থাকলেও তা থেকে পরিশোধের চুক্তি হয় না; বরং ইস্যুকারী ব্যাংক নিজস্ব অর্থ থেকেই দায়ের অর্থ শোধ করে।

(খ) ইজারা বা সেবা চুক্তি

পূর্বে আমরা জেনেছি যে, ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডার এবং বিক্রেতা বা সেবাদানকারী উভয়কেই বিভিন্ন সুবিধা দিয়ে থাকে। পূর্বে আমরা ইস্যুকারী ব্যাংক কর্তৃক উভয়পক্ষকে যেসব সুবিধা দেয়া হয় তার মোটামুটি বিবরণ পেয়েছি। তার আলোকে বলা যায়, এখানে দু'পক্ষের সাথে ইস্যুকারী ব্যাংকের ভিন্ন ভিন্ন ইজারা বা সেবা-চুক্তি হচ্ছে। এ থেকে আমরা সহজেই বিভিন্ন পক্ষের মাঝে যে ফিসের আদান-প্রদান হয়, তার বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণালাভ করতে পারি।

২. কার্ডহোল্ডার এবং ব্যবসায়ী থেকে যে ফিস নেয়া হয় তার ব্যাখ্যা

আমরা জেনেছি যে, কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক কার্ডহোল্ডার এবং বিক্রেতা বা সেবাদানকারী উভয় থেকে ফিস নিয়ে থাকে। নিম্নে এই ফিসের কারণ ও তার ব্যাখ্যা পেশ করা হলো।

ক. কার্ডহোল্ডার থেকে যে ফিস নেয়া হয়:

কার্ডহোল্ডার থেকে যে ফিস নেয়া হয়, তা মূলত উপরোল্লিখিত বিভিন্ন সার্ভিসেস বা সেবার বিনিময় বা 'সার্ভিস চার্জ' হিসেবে নেয়া হয়।

---

[৭৫৩] আল মাবসূত: ২০/৫৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া

[৭৫৪] বাদায়েউস সানায়ে ৭/৩৯৪, দারুল হাদীস

ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো ঋণচুক্তি নেই, তাই এই ফিসকে 'সার্ভিস চার্জ' ধরার বিষয়টি স্পষ্ট। তবে ক্রেডিট কার্ড এবং চার্জ কার্ডের ক্ষেত্রে যেহেতু ঋণচুক্তি আছে, তাই এই আপত্তি হতে পারে যে, ঋণের বিনিময়ে এই চার্জ নেয়া হচ্ছে। কিন্তু নিম্নোক্ত আলামতের দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্যাপারটি এমন নয়-

১. সাধারণত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একে সার্ভিস চার্জ হিসেবেই গণ্য করে থাকে। আর আমরা জানি, কোনো মু'আমালার ফিকহী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের নিয়ত, উদ্দেশ্য, তাদের ধারণা ও বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[৭৫৫] যদি পরিষ্কার কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহলে তা আমলে নেয়া হয়।

আরো উল্লেখ্য যে, ক্রেডিট কার্ডের ঋণের জন্য আলাদা সুদ গ্রহণ করা হয়, যা অনেক বড় হারের হয়ে থাকে। তাই ফিসকেও ঋণের উপর প্রদত্ত সুদের অন্তর্ভুক্ত করা বাস্তবসম্মত নয়।

২. এর সাথে ঋণ দেয়া নেয়ার কোনো সম্পর্ক থাকে না। ঋণ না নিলেও এই চার্জ বা ফিস বহাল তবিয়তে আরোপিত হয়ে থাকে।

৩. এটি একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ফি। কেউ একলক্ষ টাকা ঋণ নিলে যা দিতে হবে, একশ টাকা নিলেও তাই দিতে হবে। ঋণের পরিমাণের সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই।

৪. ক্রেডিট কার্ডে কার্ডহোল্ডারের অন্য একাউন্ট থেকে সরাসরি পরিশোধ করারও সিস্টেম আছে। তখন তো ঋণ নেয়া হয় না। তারপরও এ চার্জ আসে।

খ. ব্যবসায়ী বা সেবাদানকারী থেকে যে ফিস নেয়া হয়:

আর ব্যবসায়ী বা সেবাদানকারী থেকে যা নেয়া হয় তাও উপরোল্লিখিত বিভিন্ন সার্ভিসেসের বিনিময়ে। এছাড়াও দালালির কমিশনও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

এ সকল অবস্থা ও আলামতের বিবেচনায় উক্ত ফিস 'সার্ভিস চার্জ' হওয়াটাই প্রাধান্য পায়। কেউ বলতে পারেন যে, এটা قبول الحوالة -এর ফিস হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর হাওয়ালা এবং কাফালা'র ফিস নেওয়া জায়েয নেই।[৭৫৬] কারণ, উভয়টি কর্জ বা ঋণসদৃশ আকদ। ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

والكفالة والحوالة يتقاربان من حيث إن كل واحد منهما إقراض للذمة والتزام على قصد التوثُّق.

"কাফালা' এবং হাওয়ালা' এদিক থেকে কাছাকাছি যে, উভয়টিই জিম্মার কর্জ প্রদান এবং ঋণ আদায় নিশ্চিত করার অঙ্গিকার।"[৭৫৭]

আল্লামা হাফেযুদ্দীন কারদারী রাহ. (৮২৭ হি.) 'কাফালাহ'-এর বিনিময় গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলেন-

لأن الكفيل مقرض في حق المطلوب، فإذا شرط الجعل مع ضمان المثل فيه، شرط الزيادة على ما أقرضه، وإنه ربا"

[৭৫৫] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/১০২, ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান

[৭৫৬] ইমাম ইবনুল মুনযির রাহ. বলেন:

أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل لا تحل ولا تجوز. [الإشراف على مذاهب أهل العلم: ٢/٥٢؛ دار الفكر]

[757] আল মাবসূত: ২০/৪৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

"কাফীল যেন ঋণগ্রস্তকে কর্জ প্রদান করছে। সুতরাং যদি সে ঋণগ্রস্ত থেকে বিনিময় খোঁজে, তাহলে এটা কর্জের উপর মুনাফা খোঁজার মতো। আর কর্জের উপর মুনাফা তো সুদ।"[৭৫৮]

কিন্তু বাস্তবতার আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এটা (১) উপরোক্ত সার্ভিসেস এবং (২) দালালির ফিস; কবুলে হাওয়ালার নয়। আর যদি একে হাওয়ালা-র মোকাবেলায়ও গণ্য করার সম্ভাবনা থাকে, তাও এখানে তা প্রভাবক হবে না। কারণ, সাধারণ উকূদ বা চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে কোনো চুক্তি যদি জায়েয এবং নাজায়েয উভয় দিকের সম্ভাবনা রাখে বা উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে, সেক্ষেত্রে অনেক সময় ফুকাহায়ে কেরাম ঐ দিকটিই গ্রহণ করেন, যার দ্বারা আকদ শুদ্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম যে মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, তা হলো-

تصحيح العقود واجب ما أمكن.

"চুক্তিকে যথাসম্ভব শুদ্ধ আখ্যা দিতে হবে।"[৭৫৯]

এর অনেক নযির ফিকহের কিতাবে রয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে ফুকাহায়ে কেরাম এর কারণও অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন ইবনে মাযাহ আল বুখারী রাহ. বলেন-

قال محمد رحمه الله: في «الجامع الصغير»: رجل استأجر خبازاً ليخبز له هذه المحاسم دقيق هذا اليوم بدرهم فهو فاسد. وفي إجارات «الأصل» عن أبي يوسف ومحمد أنه جائز هما يقولان تصحيح العقود واجب ما أمكن وقد أمكن بأن يجعل العقد واقعاً على العمل وهو الخبز فيكون أجير مشترك، وهذا لأنه أوقع العقد على العمل ابتداء وقوله اليوم وإن كان ذكر الوقت إلا أنه يحتمل أنه أراد به إيقاع العقد على المنفعة فيكون أخر وحل فيفسد العقد لجهالة المعقود عليه، وتحمل أنه قصد بذكر الوقت الاستعجال لا إيقاع العقد على المنفعة فيبقى أجير مشترك فيصح العقد فيحمل ذكر اليوم على سبيل الاستعجال تصحيحاً للعقد بقدر الممكن.

"ইমাম মুহাম্মদ রাহ. 'আল জামিউস সগীর' কিতাবে বলেন, এক ব্যক্তি একজন রুটি প্রস্তুতকারী ভাড়া নিলো যে, সে আজকের মধ্যে তাকে দশ মাখাতিম (পাত্রবিশেষ) পরিমাণ আটার রুটি বানিয়ে দিবে, এক দিরহামের বিনিময়ে- এই চুক্তি ফাসেদ।

তবে কিতাবুল আসলের ইজারা পরিচ্ছেদে আছে, ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহ.-এর মতে এই চুক্তি জায়েয ধরা হবে। তারা বলেন, লেনদেনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব আকদকে শুদ্ধ ও বলবৎ রাখার চেষ্টা করা উচিত...।"[৭৬০]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

قال: ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع وجعل كل جنس منهما بخلافه ..... أن المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد كما في مقابلة الجنس بالجنس، وأنه طريق متعين لتصحيحه فيحمل عليه

---

[758] ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়্যাহ: ৬/১৮ (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যার সাথে), মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, (পৃথক ১২/১২ পৃষ্ঠায়)

[759] আল আসল (ইজারাত-অধ্যায়)

[760] আল মুহীতুল বুরহানী: ৯/১২০, দারু ইয়াহইয়াইত তুরাছ

تصحيحا لتصرفه، وفيه تغيير وصفه لا أصله لأنه يبقى موجبه الأصلي وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل، وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف إلى نصيبه تصحيحا لتصرفه.....

"তিনি বলেন, কেউ দুই দিরহাম ও এক দীনারের বিনিময়ে এক দিরহাম ও দুই দিনার বেচাকেনা করলো। এই বেচাকেনা জায়েয হবে এবং দিনারকে দিরহাম ও দিরহামকে দীনারের বিনিময়ে ধরা হবে। যদিও এখানে দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম ধরার সুযোগও থাকে; কিন্তু চুক্তিকে শুদ্ধ রাখার জন্য প্রথম সূরতটাই ধর্তব্য হবে। যাতে করে একই জিনসের (সমজাতীয় বস্তুর) মাঝে কমবেশি হওয়ার করণে রিবা না হয়...।"[৭৬১]

আল্লামা শিহাবুদ্দীন কারাফী মালেকী রাহ. (৬৮৪ হি.)[৭৬২] বলেন-

لقولهم: أصل التصرفات: حملها على الصحة، إلا أن يغلب الفساد......والتصرف أنما يُحمل على الغالب.

"লেনদেনের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যতদূর সম্ভব এগুলোকে শুদ্ধ ধরা। তবে যদি ফাসাদ অধিক হয় তাহলে উক্ত লেনদেনকে অশুদ্ধ ধরা হবে।.. লেনদেন শুদ্ধ-অশুদ্ধ হওয়ার বিধান দেয়া হবে ভালো-মন্দের আধিক্যের উপর ভিত্তি করে।"[৭৬৩]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

قال: "ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز" لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه، وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام "وإن كان له ألف سود فصالحه على خمسمائة بيض لم يجز" لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زائدة وصف فيكون معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف وهو ربوا، بخلاف ما إذا صالح عن الألف البيض على خمسمائة سود لأنه إسقاط بعض حقه قدرا ووصفا، وبخلاف ما إذا صالح على قدر الدين وهو أجود لأنه معاوضة المثل بالمثل، ولا معتبر بالصفة إلا أنه يشترط القبض في المجلس، ولو كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالّة أو إلى شهر صح الصلح لأنه أمكن أن يجعل إسقاطا للدنانير كلها والدراهم إلا مائة وتأجيلا للباقي فلا يجعل معاوضة تصحيحا للعقد ولأن معنى الإسقاط فيه ألزم.

"... অনুরূপভাবে কারো উপর যদি এক হাজার দিরহাম ও একশ দীনার পাওনা থাকে অতঃপর সে একশ দিরহাম নগদ অথবা একমাসের ভেতর আদায়ের শর্তে সন্ধি (বোঝাপড়া) করে নেয়, তাহলে এই চুক্তি শুদ্ধ হবে। কেননা এক্ষেত্রে একশ দিনার ও নয়শ দিরহামকে ইসকাত তথা ছাড় হিসেবে ধরে বাকি একশ দিরহামের বিনিময় ধরা যায়। এই একশ দিরহামকে পুরোটার

---

761 আল হিদায়া: ৩/১০৭, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

৭৬২ আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনে সালীম আলবূছীরী, আলকানানী, আলকাহেরী, আশশাফেয়ী। তিনি ৭৬২ হিজরীতে কায়রোর আবূসীর নামক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। ৮৪০ হিজরীর শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা ইরাকী, ইবনে হাতেম বালকীনী প্রমুখ তাঁর প্রসিদ্ধ উস্তায ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বড় বুৎপত্তি ছিল। 'ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ' বিযাওয়াইদিল মাসানিদিল আশারাহ', 'মিসবাহুয যুজাযাহ ফী যাওয়াইদি ইবনে মাজাহ' তাঁর রচনাবলির অন্যতম। (আয যওউল লামে': ১/২৫১)

৭৬৩ আল ফুরূক: ৪/৭৩

মু'আওয়াযা (বিনিময়) ধরলে আকদ শুদ্ধ হবে না। অতএব চুক্তিকে শুদ্ধ রাখার জন্য ইসকাত (ছাড়) ধরা হবে...।"[৭৬৪]
তিনি আরো বলেন-

ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن"؛ لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد.

"যদি গাছে ফল থাকে, তাহলে তা গাছের সাথে বন্ধকের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে। ...চুক্তিকে শুদ্ধ রাখার জন্য।"[৭৬৫]
উপরোক্ত ফিসের ব্যাপারেও এ মূলনীতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। কারণ, এখানে নাজায়েযের দিক থাকার সম্ভাবনা থাকলেও তা জায়েযের দিকের তুলনায় নিতান্ত গৌণ। সুতরাং জায়েযের দিক গ্রহণ করে ব্যাখ্যা করার অবকাশ আছে।

ডেবিট কার্ডের শর'য়ী হুকুম

আমরা জেনেছি যে, ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে الحوالة المقيدّة পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, ব্যাংকে আগ থেকেই কার্ডহোল্ডারের টাকা জমা আছে। অর্থাৎ, ব্যাংক তার নিকট ঋণী। এখন সে বিক্রেতাকে বলছে যে, আমার ঋণ তুমি আমার ব্যাংক থেকে উসূল করে নাও। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের হাওয়ালা ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্যে জায়েয আছে।
আর ফিসের ব্যাপারে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এটি কাফালাহ বা হাওয়ালার ফিস না। তাই এতে কোনো শর'য়ী সমস্যা নেই। আর ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রে তো কোনো ঋণও নেই। এজন্য ঋণের বিনিময় হওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না; বরং এখানে ব্যাংকই ঋণগ্রস্ত।
সুতরাং বাড়তি কোনো শর'য়ী সমস্যা পাওয়া না গেলে (যেমন, সুদী একাউন্ট খোলার বাধ্যবাধকতা বা অন্য কোনো নাজায়েয চুক্তি) ডেবিট কার্ড ব্যবহার করা জায়েয। সমকালীন ফকীহগণ প্রায় এ ব্যাপারে সকলেই একমত।
দারুল উলূম করাচী, জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামীয়্যাহ বান্নুরী টাউন এবং দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া বিভাগ থেকেও অনুরূপ ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে।
এ সংক্রান্ত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী-র সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো। এতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্তেরও উল্লেখ রয়েছে-

أ- يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة، والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.

ب- ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار ١٠٨(١٢/٢) بشأن الرسوم، والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.

ج- يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة.

ث- لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري أو دخول الأماكن المحظورة شرعاً. أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع

---
[৭৬৪] আল হিদায়া ৩/২৫১, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা
[৭৬৫] আল হিদায়া ৪/৫২৬, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

من ذلك شرعاً.

د- على المؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم بدائل للبطاقة غير المغطاة أن تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية، وأن تتجنب شبهات الربا أو الذرائع التي تؤدي إليه، كفسخ الدين بالدين.

"১. ডেবিট কার্ড ইস্যু করা এবং ব্যবহার করা বৈধ। যদি বিলম্বে আদায় করলে সুদের শর্ত না থাকে।

২. গৃহীত সিদ্ধান্ত নং- ১০৮-এ যে সকল ট্যাক্স বা চার্জের কথা উল্লেখ আছে, সেগুলো (সেখানে উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে) ডেবিট কার্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৩. ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে সোনা, রূপা ও কারেন্সি ক্রয় করা যাবে।

৪. ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান ব্যবহারকারীকে শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এমন কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা অফার দিতে পারবে না। যেমন, কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স (ব্যবসায়িক বীমা) অথবা নাজায়েয স্থানে গমনের সুযোগ। তবে বৈধ সুবিধা দিতে পারবে। যেমন, সেবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান অথবা পণ্যের মূল্যহ্রাস করা।"

ইসলামী ফিকহ একাডেমী, ইন্ডিয়া-এর ১৫তম সেমিনারের সিদ্ধান্তে আছে-

اے ٹی ایم کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے حصول اور استعمال کے لئے جو رقم ادا کی جاتی ہے وہ کارڈ کا معاوضہ اور سروس چارج ہے، اس لئے اس کا ادا کرنا جائز ہے۔

"ব্যাংক থেকে এটিএম কার্ড ও ডেবিট কার্ড সংগ্রহ করা এবং তা ব্যবহার করার জন্য ব্যাংককে যে অর্থ প্রদান করা হয়, সেটা সার্ভিস চার্জ। তাই সেটা আদায় করা বৈধ।"

বি. দ্র., কার্ড ব্যবহারকারীর জন্য এ কার্ড ব্যবহার করে কোনো ধরনের নাজায়েয চুক্তি করা বা নাজায়েয কাজের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা বৈধ হবে না।

ক্রেডিট কার্ডের শর'য়ী হুকুম

ক্রেডিট কার্ড মূলত সুদী ঋণভিত্তিক কার্ড। এ কার্ডকে কেন্দ্র করে যে চুক্তি হয়ে থাকে তা মূলত সুদী চুক্তি। যদিও চার্জ কার্ডের মতো এতে গ্রেস পিরিয়ড থাকে, তবে মূল হিসাব হয়ে থাকে সুদী চুক্তি হিসেবে। এজন্য গ্রেস পিরিয়ডের পর ঋণের কোনো অংশ অনাদায়ী থাকলে তখন পুরো ঋণই সুদাসল আদায় করতে হয়। এদিক থেকে এর সাথে চার্জ কার্ডের পার্থক্য বিদ্যমান, যেমনটি আমরা পূর্বে (পরিচিতি পর্বে) উল্লেখ করেছি।

আরেকটি পার্থক্য হলো, ক্রেডিট কার্ডে ঋণের মেয়াদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন (Rescheduling) হয়ে থাকে এবং এর সাথে সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুদের হারও বাড়তে থাকে।

এজন্য ক্রেডিট কার্ড সাধারণ পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কারণ, এর দ্বারা টাকা উত্তোলন করতে হলে অবশ্যই সুদ আদায় করতে হয়। আর কেনাকাটা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ছাড়যুক্ত মেয়াদ থাকলেও আগাগোড়া চুক্তিটি সুদী চুক্তিই হয়ে থাকে, যেমনটি আমরা পূর্বে দেখেছি।

আর মৌলিকভাবে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের পিছনে নিতান্ত কোনো শর'য়ী জরুরত নেই। ক্রেডিট কার্ডের সুযোগ-সুবিধাগুলো সাধারণত আরাম-আয়েশের পর্যায়ে হয়ে থাকে, নিতান্ত প্রয়োজনের আওতায় আসে না। সুতরাং এই কার্ড ব্যবহার করা বৈধ হবে না।

দারুল উলূম করাচী,[৭৬৬] জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, বান্নুরী টাউন[৭৬৭] এবং হিন্দুস্তানের নির্ভরযোগ্য দারুল ইফতাগুলো থেকে এমন ফাতওয়াই প্রদান করা হয়েছে।
ইসলামী ফিকহ একাডেমী, ইন্ডিয়া-এর এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে উল্লেখ আছে-

کریڈٹ کارڈ کی مروج صورت چوں کہ سودی معاملہ پر مشتمل ہے، لہذا کریڈٹ کارڈ یا اس قسم کے کسی کارڈ کا حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

"প্রচলিত ক্রেডিট কার্ড সুদভিত্তিক হওয়ার কারণে এই কার্ড বা এ ধরনের অন্যান্য কার্ড সংগ্রহ করা বৈধ নয়।"
মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জিদ্দাহ-এর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উল্লেখ আছে-

أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ثانيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه.

ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم ١٣(٢/١٠) و١٣(١/٣).

رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة .

"প্রথমত: ক্রেডিট কার্ড সরবরাহ এবং ব্যবহার করা জায়েয হবে না, যদি তাতে সুদ আদায়ের শর্ত থাকে। এমনকি কার্ডধারী গ্রেস পিরিয়ড তথা ছাড়যুক্ত মেয়াদে আদায় করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী হলেও।
দ্বিতীয়ত: ক্রেডিট কার্ড সরবরাহ তখনই বৈধ হবে যখন এতে মূল ঋণের উপর কোনো প্রকার সুদ আদায়ের শর্ত থাকবে না।"...
তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি এটি ব্যবহারে বাধ্য হয় এবং ডেবিট কার্ড ব্যবহার করার সুযোগ না থাকে বা তা ব্যবহার করে কাজ না হয়, তাহলে নিম্নোক্ত শর্তের সাথে ব্যবহার করা যাবে:
১. ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ক্যাশ করা যাবে না। কারণ, এতে সাধারণত সুদ আদায় করা বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে।

[৭৬৬] ফাতাওয়ায়ে উসমানী: ফাতওয়া রেজিস্ট্রার, দারুল উলূম করাচী, ফাতওয়া নং ৫১/৮৬১ এবং ১৩৩৯/৩৬
[৭৬৭] জামেয়ার ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য।

২. ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে কোনো ধরনের সুদী লেনদেন করা যাবে না। সুদ আসার পূর্বে গ্রেস পিরিয়ডেই ঋণ শোধ করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে এবং এর জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে সুদ না আসে। কার্ডহোল্ডার এক্ষেত্রে তার অন্য একাউন্ট থেকে ডাইরেক্ট পেমেন্টের ব্যবস্থা করতে পারে।

৩. যদি কার্ডহোল্ডার এ কার্ড ব্যবহার করে সুদের কোনো লেনদেন করতে না হয় মতো ব্যবস্থা করে রাখে, তারপরও মূলত চুক্তিটি একটি সুদী চুক্তি। এজন্য কার্ডহোল্ডারকে এই সুদী চুক্তি করার কারণে তাওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে।

দারুল উলূম করাচী'র এ সংক্রান্ত একটি ফাতওয়ায়ও একান্ত অপরাগতাবশত উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে।[৭৬৮] দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রদত্ত ফাতওয়ায়ও এ ধরনের অবকাশ রাখা হয়েছে।[৭৬৯]

চার্জ কার্ডের শর'য়ী হুকুম

চার্জ কার্ড যদিও ক্রেডিট কার্ডের (ঋণভিত্তিক কার্ড) একটি প্রকার, তবে চার্জ কার্ড সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, এতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুদ আসে না। ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ডে পুরো ঋণের উপর নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুদ আরোপিত হয়। কিন্তু চার্জ কার্ডে গ্রেস পিরিয়ড পার হলে ঋণের উপর শতকরা হারে সুদ আসে না; বরং নির্দিষ্ট অঙ্কের জরিমানা আসে। তবে এই জরিমানার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে তাও খালেস সুদ তথা 'রিবান নাসিয়া'র অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, রিবান নাসিয়া'র মর্মকথা হলো, ঋণের অতিরিক্ত মেয়াদের উপর বিনিময় গ্রহণ। বলা বাহুল্য, এ জরিমানাও তথৈবচ। জাহিলিয়্যাহ–Gi hy‡M এভাবেই সুদের

---

[৭৬৮] ফাতওয়া রেজিষ্টার, দারুল উলূম করাচী, রেজি. নং: ৫১/৮৬১। ফাতওয়ার পূর্ণ ভাষ্য নিম্নরূপ-

اس کارڈ کے حامل کا بھی کوئی اکاؤنٹ ادارے میں نہیں ہوتا بلکہ وہ معاہدہ ہی ادھار پر سود کا کرتا ہے اس معاہدے میں اگرچہ ادارہ ایک متعین مدت فراہم کرتا ہے کہ جس میں اگر حامل بطاقہ ادائیگی کردے تو اس کو سود ادا نہیں کرنا پڑتا لیکن اصلا معاہدہ سود کی بنیاد پر ہوتا ہے جس سے ادائیگی کی مدت بڑھ جاتی ہے البتہ اس کے ساتھ ساتھ شرح سود میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں اضافی رقم لی جاتی ہے

اس کا حکم یہ ہے کہ اس کارڈ کا استعمال جائز نہیں ہے الّا یہ کہ ڈیبٹ کارڈ یا چارج کارڈ الگ سے مہیا نہ ہو اور اس کو ڈیبٹ کارڈ یا چرج کارڈ کی طرح مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے۔(دیکھئے اس مقالے کے آخری صفحے کے حاشیہ میں: شرائط استعمال چارج کارڈ- محرر درس الفقہ)

[৭৬৯] দারুল উলূমের দারুল ইফতার ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য (Fatwa ID: 73-73/Sn=11/1435-U)। ফাতওয়ার পূর্ণ ভাষ্য নিম্নরূপ-

”کریڈٹ کارڈ“ کے بارے میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اس میں بینک کی طرف سے ایک مدت مقرر ہوتی ہے، کارڈ ہولڈر اگر اس مدت کے اندر بینک کو ادائیگی کردیتا ہے تو اس پر کوئی سود لاگو نہ ہوگا،اگر یہ بات سچی ہے تو جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ مقررہ مدت کے اندر اندر سود لاگو ہونے سے پہلے پہلے بینک کو ادائیگی کردیگا، تو اس کے لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا شرعاً درست ہوگا۔

وما لا يبطل بالشرط الفاسد القرض بأن أقرضتک هذه المأة بشرط أن تخدمني شهرًا مثلاً فإنه لا يبطل بهذا الشرط وذلک لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وأنه يختص بالمبادلة الماليّة، وهذه العقود كلها ليست بمعاوضة مالية فلا تو ٔثر فيها الشروط الفاسدة الخ (البحر الرائق: ٣١٢/٦، كتاب البيع باب المتفرقات، ط: زكريا، وللمزيد من التفصيل راجع: الفتاوى العثمانية : ٣٥٢/٣، فصل في البطاقات وأحكامها، ط: نعیمیہ دیوبند)

আদান-প্রদান হতো। হযরত যায়দ ইবনে আসলাম রাযি. বলেন-

كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل **الحق إلى أجل** فإذا حل الأجل قال أتقضي أم تربي فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل.

"জাহেলী যুগে সুদী মু'আমালার একটি নমুনা হলো, এক ব্যক্তির কাছে অন্য ব্যক্তির নির্দিষ্ট মেয়াদী পাওনা থাকে। মেয়াদ শেষ হলে তাকে বলা হয়, তুমি আদায় করবে নাকি বৃদ্ধি করবে? আদায় করলে তো সে তার হক নিয়ে নিলো। আর না পারলে সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং আরেকটা মেয়াদ পর্যন্ত তাকে সুযোগ দেয়।"[৭৭০]

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

إنما الربا : أخر لي ، وأنا أزيدك ...

"সুদ হলো, ...আমাকে আরো কিছুদিন সুযোগ দাও, আমি বাড়িয়ে দিবো।..."[৭৭১]

ইমাম আবু বকর বাইহাকী রাহ. 'আস সুনানুস সুগরা'তে বলেন-

روينا عن فضالة بن عبيد أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وروينا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن سلام، وغيرهم في معناه، وروي عن عمر، وأبي بن كعب رضي الله عنهما.

"প্রত্যেক কর্জ, যা লাভ সংগ্রহ করে দেয়, তা সুদের একটি প্রকার।"[৭৭২]

তবে আমরা জেনেছি যে, এ অর্থ সুদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তা আদায় করা জরুরী নয়। কার্ড ব্যবহারকারী মেয়াদান্তে ঋণ আদায় না করলেই তা আদায় করতে হয়। কিন্তু সুদের আদান-প্রদানই শুধু গর্হিত হারাম ও নিষিদ্ধ নয়; বরং যেকোনো ধরনের সুদী চুক্তিতে প্রবেশ করাই শরী'আতে নিষিদ্ধ ও হারাম।

হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: هم سواء.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, সুদী চুক্তি-পত্রের লেখক ও সাক্ষী সকলকে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, তারা সবাই সমান।"[৭৭৩]

তবে এখানে এ ধরনের সুদী চুক্তির শর্তে প্রবেশের ব্যাপারে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়-

১. আমরা জানি, কোনো কোনো চুক্তিতে নাজায়েয হওয়ার অন্য কারণ বিদ্যমান থাকলেও

---

[৭৭০] মুয়াত্তায়ে মালিক: হাদীস নং ১৩৮০, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা, সুনানুল কুবরা বাইহাকী: হাদীস নং ১০৬০৪

[৭৭১] মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক: হাদীস নং ১৪৩৬২ (কিতাবুল বুয়ূ), ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, পাকিস্তান, আল ইস্তিযকার: ৬/৪৮৯। হাদীসটির সনদ ইবনে আব্দুল বার রাহ. উল্লেখ করেছেন এভাবে-

قال ابن عيينة: وأخبرني عمرو قال: قال ابن عباس.

এ সনদ হিসেবে ইবনে উ'আইনা হাদীসটি আমরের সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আব্দুল রাজ্জাক রাহ. সনদটি উল্লেখ করেছেন এভাবে-

قال ابن عيينة: واخبرني غير عمرو قال: قال ابن عباس.

সুতরাং যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে আমর থেকেই বর্ণনা করেন, তাহলেও সনদ সহীহ হবে। আর যদি তিনি আমর ব্যতীত অন্য করো সূত্রে বর্ণনা করেন, তাহলেও নির্ভরযোগ্য হবে। কারণ ইবনে 'উআইনা সাধারণত কোনো রাবীর নাম উহ্য রাখলে ছেকার নামই উহ্য রাখেন।

[৭৭২] আস সুনানুস সুগরা: ৪/৩৫৩

[৭৭৩] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৫৯৮, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা

কার্যগতভাবে মূল চুক্তি হয়ে যায় এবং তদনুযায়ী উভয় পক্ষের উপর বাধ্যবাধকতাও আরোপিত হয়। ঐ সব চুক্তির মাঝে কর্জ অন্যতম। সুতরাং এখানে সুদের শর্ত বাতিল হলেও মূল কর্জ-চুক্তি শুদ্ধ হয়ে যাবে।

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

لا يبطل بالشرط الفاسد القرض، بأن قال أقرضتك هذه المأة بشرط أن تخدمني شهرا فإنه لا يبطل بهذا الشرط... وتعليق القرض حرام والشرط لايلزم.[৭৭৪]

"শর্তে ফাসিদের দ্বারা যেসব চুক্তি বাতিল হয় না, তন্মধ্যে অন্যতম কর্জ চুক্তি। যদি বলে, আমি তোমাকে একশ দিরহাম কর্জ দিলাম এই শর্তে যে, তুমি এক মাস আমার সেবা করবে। তাহলে কর্জ-চুক্তি শুদ্ধ হবে। তবে কর্জকে শর্তযুক্ত করা হারাম এবং এই শর্তের কোনো মূল্য নেই।"

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. বলেন-

"... وأما القرض المشروط بالفضل والمنفعة، قال الشافعي ومالك يبطلان عقد القرض ، وقال الحنفية: يبطل الشرط لكونه منافيًا للعقد ويبقى القرض صحيحًا...ومرادهم بكون القرض صحيحًا والشرط باطلًا أن المستقرض إذا قبض الدراهم التي استقرضها بالشرط يصير دينًا عليه؛ وأما أن الإقراض والاستقراض بالشرط يكون جائزًا فكلا..."[৭৭৫]

কাযী মুহাম্মদ কদরী পাশা রাহ. (১৩০৬) বলেন-

"كل ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والمزارعة والمساقاة والقسمة والصلح عن مال....، لا يصح اقترانه بالشرط الفاسد ولا تعليقه به، أما ما كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والخلع على مال والتبرعات كالهبة والقرض... وكذلك الإقالة والرهن والكفالة والحوالة والوكالة ... ففي هذه التصرفات كلها إذا اقترن العقد بالشرط الفاسد صح العقد ولغي الشرط"[৭৭৬]

তবে এ ধরনের সুদী চুক্তির শর্তযুক্ত আকদ করা গুনাহ ও সম্পূর্ণ নাজায়েয, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যেমনটি বলা হয়েছে, উপরোক্ত জরিমানা ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে সুদের অন্তর্ভুক্ত এবং এর আদান-প্রদান হারাম ও গুনাহের কাজ। ঋণদাতার তো অবশ্যই গুনাহ হবে। কারণ, সাধারণত তার পক্ষ থেকেই এ চুক্তি আরোপ করা হয়। ঋণগ্রহীতাও সাধারণ অবস্থায় গুনাহগার হবে। তবে যদি সে এ শর্ত অনুযায়ী কাজ না করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় এবং সে অনুযায়ী সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার দ্বারা শর্তটি নিশ্চিতভাবে অকার্যকর ও অসার হয়ে যায়, এমতাবস্থায় অনেকের মতে, তার জন্য এ ধরনের শর্তে বাহ্যিকভাবে প্রবেশ করার অবকাশ রয়েছে। কারণ, এক্ষেত্রে সুদী শর্তের কার্যত কোনো অস্তিত্ব থাকছে না।

নিম্নের হাদীসটি আলোচ্যবিষয়ে পূর্ণ দলীল না হলেও তা থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ অকার্যকর শর্তের কোনো গুরুত্ব নেই। যদিও তা মৌখিকভাবে উচ্চারণ করা হয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়শা রাযি. হতে বর্ণিত,

---

[৭৭৪] আল বাহরুর রায়িক: ৬/৩১২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৭৭৫] ই'লাউস সুনান: ১৪/৬০০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[৭৭৬] মুরশিদুল হায়রান ফী মা'রিফাতি আহওয়ালিল ইনসান: ৩২৩-৩২৬

قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي – وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها، ويكون الولاء لنا – فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر – وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر – فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا، ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مائة مرة»

"তিনি বলেন, বারীরাহ (রাযি.) তাঁর নিকট এসে কিতাবাত (সম্পদের বিনিময়ে আযাদীর চুক্তি)-এর দেনা পরিশোধের জন্য সাহায্য চাইলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি চাইলে আমি (তোমার মূল্য) তোমার মালিককে পরিশোধ করবো। তবে শর্ত হলো, উত্তরাধিকার স্বত্ব থাকবে আমার। তার মালিক আয়েশা রাযি. -কে বললো, আপনি চাইলে তাকে আযাদ করতে পারেন, তবে উত্তরাধিকার স্বত্ব থাকবে আমাদের। যখন আল্লাহর রাসূল রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন, তখন আমি তাঁর নিকট ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কারণ উত্তরাধিকার স্বত্ব তারই থাকে, যে আযাদ করে। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ মিম্বারে আরোহণ করে বললেন, লোকদের কী হলো? তারা এমন সব শর্ত করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। কেউ যদি এমন শর্তারোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তাহলে তার সে শর্তের কোনো মূল্য নেই। এমনকি এরূপ শর্ত একশবার আরোপ করলেও।"[৭৭৭]

হাদীস ব্যখ্যাকারগণ বলেন-

معناه: لا تبالي لأن اشتراطهم مخالف للحق، فلا يكون ذلك للإباحة، بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط وإن وجوده كعدمه.

"...(রাসূল ﷺ হযরত আয়েশাকে যা বলেছেন তার অর্থ হলো-) তুমি তাদের কথায় ভ্রুক্ষেপ করো না। কেননা তা সত্য পরিপন্থী... নিশ্চয় এই ধরনের শর্তারোপ করা না করা বরাবর।"[৭৭৮]

এ হাদীস দ্বারা ইস্তিদলাল পূর্ণ না হওয়ার কারণ হলো, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবৈধ শর্তটিকে বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্যবিষয়ে অবৈধ শর্তটি কার্যত বাস্তবায়িত না হলেও বা বাস্তবায়ন না করার পূর্ণ ব্যবস্থা নেয়া হলেও তা চুক্তির একটি অংশ হিসেবে থেকে যাচ্ছে।

তবে বর্তমানে এ ধরনের শর্ত প্রায় সব চুক্তিতেই থাকে। বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল থেকে নিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্ত থাকে যে, আদায়ে দেরি হলে নির্দিষ্ট জরিমানা আরোপিত হবে। এ সকল চুক্তি বর্তমানে এতো ব্যাপকতা (عموم البلوى) লাভ করেছে যে, শুধু এর কারণে এসব চুক্তিকে নাজায়েয বললে মানুষ ব্যাপক সমস্যায় পতিত হবে। তাই সমকালীন মুফতিয়ানে কেরাম এসব চুক্তিকে শুধু এ শর্তের কারণে অবৈধ বলেননি।

এজন্য একান্ত অপারগ হলে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে চার্জ কার্ড ব্যবহার করা যাবে।

১. অবশ্যই গ্রেস পিরিয়ডের ভিতরেই ঋণ আদায় করে দিতে হবে। জরিমানা তথা সুদ যাতে না আসে এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে এবং এর জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

---

[৭৭৭] সহীহুল বুখারী: হাদীস নং ৪৫৬

[৭৭৮] সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম, হাদীস নং ৭৪৩ (কিতাবুল বুয়ূ')

কার্ডহোল্ডার এক্ষেত্রে তার অন্য একাউন্ট থেকে ডাইরেক্ট পেমেন্টের ব্যবস্থা করতে পারে। সাধারণত চার্জ কার্ডেও ডাইরেক্ট পেমেন্টের ব্যবস্থা করা যায়। এক্ষেত্রে এ শর্ত একেবারেই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এ ধরনের ব্যবস্থা করেই চার্জ কার্ড ব্যবহার করা উচিত।
২. ডেবিট কার্ড দ্বারা প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে চার্জ কার্ড ব্যবহার করবে না।
দারুল উলূম করাচী'র এ সংক্রান্ত ফাতওয়ায় উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে অতীব প্রয়োজনে চার্জ কার্ড ব্যবহারের অবকাশ রাখা হয়েছে।[৭৭৯] আর দারুল উলূম দেওবন্দ-এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফাতওয়াও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

চার্জ কার্ড ও ক্রেডিট কার্ডের ফিস প্রসঙ্গে

কার্ডের উপর আরোপিত বাৎসরিক ফিসের ব্যাপারে তো আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, এতে কোনো শর'য়ী সমস্যা নেই। তবে এখানে যেহেতু উপরোক্ত সার্ভিস বা সেবার সাথে ঋণও থাকে, তাই ফিসের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন তা স্বাভাবিকের (أجرة المثل) চেয়ে বেশি না হয়। বেশি হলে তা যদিও সার্ভিসের বিনিময়, ঋণের বিনিময় নয়; তথাপি এতে ঋণের বিনিময় হওয়ার সাদৃশ্য বিদ্যমান। শরী'আত রিবাকে যেমন নিষিদ্ধ করেছে, তেমনি বিশেষ হিকমতের কারণে রিবার উপযুক্ত সাদৃশ্যপূর্ণ সকল লেনদেনকেও নিষিদ্ধ করেছে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة.

"রিবার আয়াত একেবারে শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগে এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে যেতে পারেননি। অতএব রিবা ও রিবার গন্ধ থেকেও তোমরা বেঁচে থাকো।"[৭৮০]
এজন্য ফিসের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এর একটি প্রসিদ্ধ নযির ফিকহের কিতাবে

---

[৭৭৯] ফাতওয়া রেজিস্ট্রার, দারুল উলূম করাচী, রেজি, নং: ৫১/৮৬১। ফাতওয়ার পূর্ণ ভাষ্য নিম্নরূপ-

اس کارڈ کے حامل کا ادارے میں پہلے سے اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ ادارہ حامل بطاقہ کو ادھار کی سہولت فراہم کرتا ہے حامل بطاقہ کو ایک متعین ایام کی ادھار کی سہولت میسر ہوتی ہے جس میں اس کو ادارے کو ادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے اگر اس مدت میں ادائیگی ہو جائے تو سود انہیں لگتا البتہ اگر حامل بطاقہ نے وقت پر ادائیگی نہ کی تو پھر اس کو سود کے ساتھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے ادارہ اس کارڈ کو جاری کرنے کی فیس وصول کرتا ہے اس کارڈ کو مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ استعمال کرنا جائز ہے

(۱)امل بطاقہ اس بات کا پورا انتظام کرے کہ وہ معین وقت سے پہلے پہلے ادائیگی کردے اور کسی بھی وقت سود عائد ہونے کا امکان باقی نہ رہے

(۲)امل بطاقہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہو کہ اس کارڈ کو غیر شرعی امور میں استعمال نہ کرے

(3)... اگر ضرورت ڈیبٹ کارڈ سے پوری ہو رہی ہو تو بہتر ہے کہ اس کارڈ کو استعمال نہ کرے

[৭৮০] (সহীহ) সুনানু ইবনে মাজাহ: হাদীস নং ২২৭৬, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা
আল্লামা নুরুদ্দীন হাইসামী রাহ. বলেন: [.... :مجمع الزوائد] .إسناده صحيح ورجاله موثوقون
সাঈদ বিন আবী 'আরুবা শেষ বয়সে ইখতিলাত রোগে আক্রান্ত হলেও তার শাগরিদ খালিদ বিন হারেস তাঁর থেকে ইখতিলাদের পূর্বেই হাদীস শুনেছেন। দ্র. কিতাবুল মুখতালিতীন-আলাঈ। আল্লামা বুসীরী রাহ. বলেন:

هذا إسناده صحيح، رجاله ثقات. (مصباح الزجاجة ٢/٢١ دار الجنان، بيروت)

আছে যে, মূলত কাযা বা ইফতার বিনিময় নেওয়া জায়েয নেই। তবে এর সাথে লেখালেখি বা অন্য কোনো কাজ থাকলে তার বিনিময় নেয়া যাবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে যে, এই বিনিময় স্বাভাবিক (أجرة المثل) হতে হবে। কারণ, অত্যাধিক হলে তা প্রকারান্তরে কাযা বা ইফতার বিনিময়ই হবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

(يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق) والمحاضر والسجلات (قدر ما يجوز لغيره كالمفتي) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى؛ لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان، ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال.[৭৮১]

অনুরূপভাবে উল্লিখিত ফিসের ক্ষেত্রেও সার্ভিসের স্বাভাবিক বিনিময়ের চেয়ে বেশি গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

<u>*সত্যায়নে*</u>

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৭ জুমাদাল আখেরাহ ১৪৩৯ হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৮ জুমাদাল আখেরাহ ১৪৩৯ হি.

[৭৮১] আদ্দুররুল মুখতার: ৯/১৫৫, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

ওয়াক্ফ : কিছু মৌলিক ও জরুরী আহকাম

মাওলানা আবদুর রউফ বিন গুলজার আলী, রাজশাহী

ইসলামী শরী'আতে সাদকার একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। এর মাঝে ওয়াক্ফ অন্যতম। রাসূল ﷺ -এর যামানা থেকে অদ্যাবধি মুসলমানগণ নিজ জমি ও অন্যান্য সম্পদ ওয়াক্ফ করার মাধ্যমে সাদকা করে আসছেন।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা প্রথমেই ফকীহগণের বক্তব্যের আলোকে ওয়াক্ফের মূলতত্ত্ব ও তদসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় আলোচনা করবো। এরপর ওয়াক্ফ সম্পত্তি স্থানান্তর ও পরিবর্তনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও অবস্থা সম্পর্কে মৌলিক বিধানাবলি উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

এক. ওয়াক্ফিয়া সম্পদের মালিকানা : ফিকহী বিশ্লেষণ

ওয়াক্ফ মূলত সাদকার একটি প্রকার। প্রথম যুগে সাধারণত ওয়াক্ফের ব্যাপারে 'সাদকা' ও 'হাব্স' শব্দ ব্যবহৃত হতো। হাদীস ও ফিকহের কিতাবের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়েও ওয়াক্ফের ব্যাপারে 'সাদকা' পরিভাষা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৭৮২] শুধু ইমাম আবু বকর খাস্সাফ রাহ. (২৬১ হি.) এর 'আহকামুল আওকাফ' এর সূচি দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝে আসে।

তবে ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে ওয়াক্ফ সম্পত্তির ফায়েদা কোনো নির্দিষ্ট খাতের জন্য দান করা হয়; কিন্তু মূল সম্পত্তি কারো মালিকানায় দেয়া হয় না। পক্ষান্তরে সাধারণ সাদকায় মূল সম্পদ অন্যের মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয়।

যেহেতু ওয়াক্ফ মূলগতভাবে সাদকারই একটি প্রকার, তাই (ওয়াক্ফের বিশেষ প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে) সাদকার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তাতে পাওয়া যাওয়া স্বাভাবিক। আমরা জানি, সাদকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সাদকাকৃত সম্পদ সাদকাকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়। ওয়াক্ফের ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকে। ওয়াক্ফ করার পর তাতে আর ওয়াক্ফকারীর মালিকানা বহাল থাকে না।

তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ফিকহী উসূল অনুযায়ী সাধারণত প্রতিটি সম্পদের একজন মালিক থাকে। এ হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তি ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় না থাকলে তার মালিক কে হবে? ওয়াক্ফ সংক্রান্ত হাদীস ও আসার থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম ওয়াক্ফিয়া সম্পদের কোনো নিয়মতান্ত্রিক মালিক নির্ধারণ করেননি। অর্থাৎ, মালিকানার প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি ও মালিকানা সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহ (যেমন, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য তাসাররুফ) কারো জন্য স্থির করেননি। হযরত উমর রাযি.-এর

---

[৭৮২] قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإشهاد في الوقف الصدقة. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه: أن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: «نعم»، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها (صحيح البخاري، رقم الحديث: ٢٦٨٢).

قال العيني رحمه الله في عمدة القاري (٥٦/١٤): مطابقته للترجمة التي هي قوله: "والصدقة" ظاهرة صورة، وكذلك يطابق قوله "في الوقف" معنى، لأن الصدقة عليها تكون بطريق الوقف.

ওয়াক্‌ফের বিবরণ থেকে বিষয়টি সহজেই অনুমেয়।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

"হযরত উমর রাযি. খায়বারে একটি জমি পেয়েছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, আমি একটি জমি পেয়েছি। এর চেয়ে উত্তম সম্পদ আমি কখনও পাইনি। এই সম্পদের ব্যাপারে আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন? রাসূল ﷺ বলেন, তুমি যদি চাও তাহলে তার মূল বাকি রেখে তা সাদকা (অর্থাৎ, ওয়াক্‌ফ) করতে পারো। উমর রাযি. তা দরিদ্র, আত্মীয়-স্বজন, ক্রীতদাস, মুজাহিদ, মেহমান এবং মুসাফিরদের মাঝে সাদকা করে দিলেন। এই শর্তে যে, তার মূল বিক্রি অথবা হেবা করা যাবে না এবং মিরাছ হিসেবেও তা কেউ পাবে না। তবে যে তার দায়িত্বশীল থাকবে সে ন্যায়সঙ্গতভাবে মাল জমা না করে তা থেকে খাওয়া অথবা বন্ধু-বান্ধবদের (মালিক না বানিয়ে) খাওয়াতে কোনো গুনাহ নেই।"[৭৮৩]

হযরত উমর রাযি.-এর মতো অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামও একই ধারায় নিজ নিজ সম্পদ ওয়াক্‌ফ করতে থাকেন। হযরত জাবের রাযি. বলেন-

لماّ كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صدقته في خلافته دعا نفرا من المهاجرين والأنصار، فأحضرهم وأشهدهم على ذلك، فانتشر خبرها. قال جابر: فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلّا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولاتوهب. قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار عليها إلّا وقد وقف من ماله حبسا لايشترى ولايورث حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

"... হযরত জাবের রাযি. বলেন- আমি রাসূল ﷺ-এর মুহাজির এবং আনসার সাহাবীদের মধ্যে কোনো সামর্থ্যবান সাহাবীর ব্যাপারে জানি না যে, তিনি কোনো সম্পদ এভাবে ওয়াক্‌ফ করেননি যে, তা বিক্রি করা যাবে না বা মিরাছ হিসেবে গণ্য হবে না এবং তা হিবাও করা যাবে না (অর্থাৎ, প্রায় সবাই এ পদ্ধতিতে ওয়াক্‌ফ করেছেন)। হযরত কুদামা ইবনে মূসা রাহ. বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে যুরারাহ রাহ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর বদরী মুহাজির এবং আনসার সাহাবীদের ব্যাপারে জানি না যে, তাঁরা তাদের কোনো সম্পদ এমনভাবে ওয়াক্‌ফ করেননি যে, তা বিক্রি করা হবে না এবং তা মিরাছ হিসেবে গণ্য হবে না।..."[৭৮৪]

[৭৮৩] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২৬১৯

[৭৮৪] আহকামুল আওকাফ লিল খাস্‌সাফ: ১৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

(قال الخصاف: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال حدثنا قدامة بن موسى الجمحي عن بشير مولى المازنيين قال:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দু'টি বিষয় বুঝে নিলাম-

এক. ওয়াক্‌ফের সাথে সাথে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়।

দুই. অন্য কোনো ব্যক্তিও তার মালিক হয় না।

এককথায়, ওয়াক্‌ফের পর ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদে কারো জন্য মালিকানাসুলভ হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকে না।

তবে যেহেতু ফিকহের সাধারণ মূলনীতি অনুযায়ী দুনিয়াবী কারবার বাস্তবায়নের জন্য সম্পদের মালিক থাকতেই হয়, আর ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদের নিয়মতান্ত্রিক মালিক কোনো ব্যক্তি বা খাতকে বানানো যাচ্ছে না, তাই হাদীসের ব্যাখ্যাকার হিসেবে ফুকাহায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, দুনিয়াবী কারবারের ক্ষেত্রেও এ সম্পদ 'আল্লাহর মালিকানা'য় স্থানান্তর হয়ে যায় বলে ধরে নেয়া হবে। ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষা 'على حكم ملك الله' থেকে তা সহজেই বুঝে আসে।

নিম্নে এ প্রসঙ্গে ফুকাহায়ে কেরামের কিছু ভাষ্য পেশ করা হলো।

ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. (৫৯৩ হি.) বলেন-

وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث.

"ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর নিকট ওয়াক্‌ফ হলো- মূল বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় আটকে রাখা। সুতরাং ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা তা থেকে দূর হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে এমন ভাবে স্থানান্তর হয় যে, তার ফায়েদা বান্দারা ভোগ করে। অতএব এটা আবশ্যক যে, তা বিক্রি এবং হেবা করা যাবে না এবং তা মিরাছ হিসেবেও গণ্য হবে না।"[৭৮৫]

আল্লামা মাজদুদ্দীন মাওসিলী রাহ. (৬৮৩ হি.) বলেন-

وعندهما هو إزالة العين عن ملكه إلى الله – تعالى – وجعله محبوسا على حكم ملك الله – تعالى – على وجه يصل نفعه إلى عباده، فوجب أن يخرج عن ملكه ويخلص لله – تعالى – ويصير محررا عن التمليك ليستديم نفعه ويستمر وقفه للعباد. لهما أن الحاجة ماسة إلى لزوم الوقف ليصل ثوابه إليه على الدوام، وأنه ممكن بإسقاط ملكه وجعله لله – تعالى – كالمسجد فيجعل كذلك.

"সাহেবাইনের নিকট ওয়াক্‌ফ হলো- ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা থেকে মূল বস্তু বের করে তা আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় এমনভাবে আটকে রাখা যে, তার ফায়েদা আল্লাহর বান্দাগণ ভোগ করবে। এর জন্য ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়ে যাওয়া আবশ্যক। ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুর ফায়েদা স্থায়ী অব্যাহত থাকার জন্য তা ব্যক্তি মালিকানা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। বান্দার নিকট স্থায়ীভাবে সওয়াবে পৌঁছার জন্যও ওয়াক্‌ফের স্থায়িত্বের প্রয়োজন রয়েছে। আর এটা

سمعت جابر بن عبد الله يقول...)

আরো দ্রষ্টব্য: আদ দিরায়াহ: ২/১৪৫

[৭৮৫] আল হিদায়া: ২/৬১২, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

বান্দার মালিকানা দূর করে তা শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করার মাধ্যমেই সম্ভব। যেমনটি মসজিদের ক্ষেত্রে সর্বস্বীকৃত।"[৭৮৬]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২ হি.) বলেন-

(قوله على حكم ملك الله تعالى) قدر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف ولا انتقل إلى ملك غيره، بل صار على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحد سواه، وإلا فالكل ملك لله تعالى.

"....'হুকমুন' লফজটি এটা বুঝানোর জন্য স্থির করা হয়েছে যে, ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুটি ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় বাকি থাকবে না এবং তা অন্যের মালিকানায় স্থানান্তরও হবে না; বরং তা এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় চলে যাবে যে, অন্য কারো দুনিয়াবী মালিকানাও সেখানে থাকবে না।"[৭৮৭]

যাই হোক, ফিকহের উপরোক্ত পরিভাষা 'على حكم ملك الله' সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে শক্তিশালী ও নিরাপদ। ইসলামী শরী'আতে এ ধরনের মালিকানার নযির রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম মসজিদকে এর নযির হিসেবে পেশ করেছেন।[৭৮৮]

উল্লেখ্য, 'আল্লাহর মালিকানা' বা মালিকানার প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত হওয়ার (অর্থাৎ, অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত না হওয়ার) অর্থ এটা না যে, মালিকানাসুলভ কোনো ধরনের তাসাররুফ কোনো অবস্থাতেই ওয়াক্‌ফে চলবে না। কারণ, আমরা প্রথমেই বলেছি যে, 'আল্লাহর মালিকানা' একটি ফিকহী পরিভাষা। এর নির্দিষ্ট অর্থ, ব্যাখ্যা ও সীমারেখা রয়েছে। ফিকহের এই পরিভাষার (على حكم ملك الله) ব্যাখ্যা সকল নস ও দলীলকে সামনে রেখে করলে তবেই তা সঠিক ব্যাখ্যা হবে। শুধু শাব্দিক অর্থকে সামনে রেখে এর সঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

ফকীহগণ কিছু ক্ষেত্রকে 'আল্লাহর মালিকানা' শীর্ষক অবস্থা থেকে ভিন্ন রেখেছেন। এসব ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের মাঝে আংশিক রদবদলের সুযোগ রয়েছে। মৌলিকভাবে দু'টি ক্ষেত্রে উক্ত রদবদল বা পরিবর্তন হতে পারে। যথা-

ক. অতীব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফের মাঝে শর্তসাপেক্ষে পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে)

খ. ওয়াক্‌ফকারী যদি ওয়াক্‌ফের সময় পরবর্তীতে কোনো ধরনের পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণের শর্ত করে থাকে, তাহলেও শর'য়ী শর্তসাপেক্ষে পরবর্তীতে ওয়াক্‌ফের মাঝে নির্দিষ্ট পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে।

ওয়াক্‌ফের মাঝে রদবদলের বিভিন্ন অবস্থা ও শর্তসমূহের আলোচনা সামনে আসছে। মূল ওয়াক্‌ফ তুলে নেয়া বা বিনা প্রয়োজনে ওয়াক্‌ফের মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তনের অবকাশ শরী'আতে রাখা হয়নি। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

দুই. ওয়াক্‌ফকারীর শর্তের গুরুত্ব ও মূল্যায়ন

আমরা পূর্বে জেনেছি যে, ওয়াক্‌ফ এক ধরনের সাদকা। আর সাদকার ক্ষেত্রে সাদকাকারীর

---

[৭৮৬] আল ইখতিয়ার লিতা'লিলিল মুখতার: ৩/৫৫, দারুল হাদীস, কায়রো

[৭৮৭] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫১৮-৫১৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৭৮৮] আল ইখতিয়ার লিতা'লিলিল মুখতার: ৩/৫৫, দারুল হাদাস, ফাতহুল কাদীর: ৬/১৫

নিয়ত ও ইচ্ছার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, সে সম্পদের মালিক। আর মালিক তার সম্পদকে যেকোনো বৈধ খাতেই ব্যবহার করতে পারে। অন্যদের কর্তব্য হলো, তার নিয়ত বা ইচ্ছার প্রতি গুরুত্ব দেয়া।

ফিকহের পরিভাষায় ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফের সময় ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, বন্টন ও খাত সম্পর্কে যে নিয়ত বা ইচ্ছা ব্যক্ত করে, তাকেই ওয়াক্‌ফকারীর 'শর্ত' বলা হয়। শরী'আতে ওয়াক্‌ফকারীর শর্তকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত সাহাবা-তাবেঈনের আহাদীস ও আসার থেকে বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এ ব্যাপারে হযরত উমর রাযি. -এর প্রসিদ্ধ হাদীসটি প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত হাদীস উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার রাহ. (৮৭২ হি.) বলেন-

الأصل أن شروط الوقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه، وعليه جرت أوقاف الصحابة...

"ওয়াক্‌ফের শর্তসমূহের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো- যদি তা স্বয়ং ওয়াক্‌ফের পরিপন্থী বা বিরোধী না হয়, তাহলে তা কার্যকর করা জরুরী। সাহাবায়ে কেরামের ওয়াক্‌ফের রীতিও এমন ছিলো।..."[৭৮৯]

তবে ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে 'শর্ত' করার বিষয়টি মালিকের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত নয়। শরী'আতে এর জন্য কিছু নিয়মনীতি ও বিধি-বিধান রয়েছে। তা মেনে শর্ত করলেই 'শর্ত' গ্রহণযোগ্য হবে। অন্যথায় তা আমলযোগ্য হবে না। আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. (৯৭০ হি.) আল্লামা কাসিম ইবনে কুতলুবুগা রাহ. (৮৭৯ হি.)-এর 'ফাতাওয়া'র উদ্ধৃতিতে বলেন-

...وبهذا علم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه، قال العلامة قاسم في فتاواه، أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به، ومنها ما ليس كذلك...

"... ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য- "ওয়াক্‌ফকারীর শর্ত শর'য়ী নসের মতো" এটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লামা কাসেম রাহ. তাঁর ফাতাওয়া-এ বলেন, গোটা উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, ওয়াক্‌ফকারীদের শর্তসমূহের মধ্যে যা শর'য়ী দৃষ্টিতে সহীহ এবং গ্রহণযোগ্য, শুধু তাই কার্যকর হবে। আর যেগুলো এমন নয় তা কার্যকর হবে না।... "[৭৯০]

ওয়াক্‌ফকারীর 'শর্ত' আমলযোগ্য হওয়ার জন্য দু'টি বিষয় জরুরী।

এক. শরী'আত বিরোধী কোনো শর্ত করা যাবে না।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. (৬৮১হি.) বলেন-

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع.

"ওয়াক্‌ফকারীর শর্তসমূহ যদি শরী'আতের পরিপন্থী না হয়, তাহলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে।"[৭৯১]

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২ হি.) বলেন-

فإن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، وهو مالك، فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية،

---

[৭৮৯] আত তালখীসুল হাবীর: ৩/১৫০, মুআসসাসাতু কুরতুবাহ্

[৭৯০] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৪১১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৭৯১] ফাতহুল কাদীর: ৬/১৮৭, আশরাফিয়া

وله أن يخص صنفا من الفقراء، ولو كان الوضع في كلهم قربة.

"ওয়াক্‌ফকারীর শর্তসমূহ যদি শরী'আতের পরিপন্থী না হয়, তাহলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে। ওয়াক্‌ফকারী ঐ সম্পদের মালিক। তাই তার জন্য গুনাহের কাজ ব্যতীত যেকোনো কাজে তা ব্যয় করার অধিকার রয়েছে। সে দরিদ্রদের কোনো এক শ্রেণীকেও (ওয়াক্‌ফের খাত হিসেবে) নির্দিষ্ট করতে পারে। যদিও সকল দরিদ্রদের সম্পদ দেয়া সওয়াবের কাজ।"[৭৯২]

দুই. ওয়াক্‌ফের বৈশিষ্ট্য, মাসলাহাত ও উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক, এমন কোনো শর্ত করা যাবে না।

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

ومقتضى قواعد المذهب أن للقاضي أن يستبدل إذا رأى المصلحة في الاستبدال، لأنهم قالوا: إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف، أنه شرط باطل، وللقاضي الكلام، لأن نظره أعلى، وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل للوقف، فيكون شرطا لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا يقبل. اهـ.

"মাযহাবের মূলনীতির দাবি হলো- কাযী যদি ওয়াক্‌ফের খাত পরিবর্তন করাকে কল্যাণকর মনে করে, তাহলে পরিবর্তন করতে পারবে। কেননা ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যদি ওয়াক্‌ফকারী এই শর্ত করে যে, কাযী অথবা বাদশাহর ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে কোনো দখল থাকতে পারবে না, তাহলে এই শর্তটি বাতিল; বরং কাযীর তাতে আধিকার থাকবে। কেননা কাযীর দৃষ্টিভঙ্গি আরো উচ্চপর্যায়ের। আর এই শর্তের কারণে যাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তাদের স্বার্থ এবং ওয়াক্‌ফের মাসলাহাত বাস্তবায়নের পথ রুদ্ধ হয়। সুতরাং এই শর্তের মাঝে ওয়াক্‌ফের কোনো ফায়েদা বা কল্যাণ নেই। অতএব তা গ্রহণ করা হবে না।"[৭৯৩]

আল্লামা শামী রাহ. উক্ত বক্তব্যের টীকায় বলেন-

(قوله وهذا شرط إلى قوله فلا يقبل) قال الرملي: هذا صريح في أن كل شرط كذلك لا يقبل، ونرى كثيرا من هذا في شروط الواقفين، فيحكم بعدم قبوله.

"...যেসকল শর্ত ওয়াক্‌ফের ফায়েদা এবং কল্যাণের পরিপন্থী হবে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। ওয়াক্‌ফকারীদের শর্তসমূহে এমন অনেক কিছু আমরা দেখি। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ফয়সালা করা হবে।"[৭৯৪]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ.[৭৯৫] বলেন-

ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على أن لي أصلها أو على أنه لا يزول ملكي عن أصلها أو على أن أبيع

---

[৭৯২] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫২৬, মাকতাবাতুল আযাহার, ঢাকা

[৭৯৩] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৩৭৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৭৯৪] মিনহাতুল খালিক্, হাশিয়াতুল বাহরির রায়িক: ৫/৩৭৪-৩৭৫, মাকাতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৭৯৫] বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ইবনে মূসা ইবনে আবু বকর ইবনে শায়খ আলী আততারাবলুসী, আলহানাফী। ৮৫৩ হিজরীতে শামের তারাবলুস (বর্তমান লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলি) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯২২ হিজরীতে কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। 'আল ইস'আফ ফী আহকামিল আওকাফ' তাঁরই রচনা। (আল আ'লাম লিযযিরিকলী: ১/৭৬)

أصلها وأتصدق بثمنها، كان الوقف باطلا. اهـ

"যদি কেউ বলে, আমার এই জমি ওয়াক্ফ করলাম এই শর্তে যে, তার মূল মালিকানা আমার থাকবে অথবা আমি চাইলে মূল জমি বিক্রি করে তার মূল্য সাদকা করতে পারবো, তাহলে ওয়াক্ফ সহীহ হবে না।"[৭৯৬]

শাইখ মুস্তফা আহমদ যারকা রাহ. (১৪২০ হি.)[৭৯৭] বলেন-

الشرط الذي يضر بمصلحة الوقف وصيانته: وذلك كما شرط الواقف أن لايعمر الوقف، إذا احتاج إلى التعمير أو شرط أن يقدم إعطاء الموقوف عليهم كفايتهم، ثم يعمر بما يفضل عنهم، فكل ذلك ونحوه باطل شرطه، لأن الواجب في الوقف أن يبدأ من غلته بعمارته صيانة لعين الوقف، ولدوام منافعه، ولمصلحة الموقوف عليه.

"যে সমস্ত শর্ত ওয়াক্ফের কল্যাণ এবং তা রক্ষা করার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়, যেমন, ওয়াক্ফকারী শর্ত করলো যদি ওয়াক্ফকৃত বস্তু সংস্করণের প্রয়োজন হয়, তাহলে তা সংস্কার করা হবে না, অথবা যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাদেরকে প্রয়োজন পরিমাণ দেয়ার পর সম্ভব হলে ওয়াক্ফের সংস্কার করা হবে ইত্যাদি- এগুলো এবং এ ধরনের সমস্ত শর্ত বাতিল। কেননা ওয়াক্ফকে বাকি ও স্থায়ী রাখার জন্য এবং যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাদের ফলপ্রসু কল্যাণের প্রতি লক্ষ করে ওয়াক্ফের আয় দ্বারা প্রথমেই তার সংস্কার করা ওয়াজিব।"[৭৯৮]

উল্লিখিত দুই শর্ত (ওয়াক্ফের কল্যাণ এবং শরী'আতের পরিপন্থী না হওয়া।) বিদ্যমান থাকলে ওয়াক্ফকারীর শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে আমলে নিতে হবে। এর বিরোদ্ধাচরণের কোনো সুযোগ নেই।

এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ওয়াক্ফ করার দ্বারা যেহেতু ওয়াক্ফকৃত সম্পদ ওয়াক্ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে যায়, তাই ওয়াক্ফ করার পর আর নতুন করে কোনো শর্ত করার সুযোগ নেই। এমনকি পূর্বের শর্ত থেকে সরে আসার বা তা প্রত্যাহার করারও সুযোগ নেই।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ. বলেন-

لو اشترط فى وقفه أن يزيد فى وظيفة من يرى زيادته وأن ينقص من وظيفته من يرى نقصانه من أهل الوقف وأن يدخل معهم من يرى إدخاله وأن يخرج منهم من يرى إخراجه جاز ثم إذا زاد أحدا منهم أو نقصه مرة أو أدخل أحدا أو أخرج أحدا ليس له أن يغيره بعد ذلك لأن شرطه وقع على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فقد انتهى ما رآه.

"যদি কেউ ওয়াক্ফে এই শর্ত করে যে, যাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাদের মধ্যে যাকে

---

[৭৯৬] আল ইস'আফ: ৩৪

[৭৯৭] মুস্তফা ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উসমান যারকা আলহালাবী, আলহানাফী। তিনি ১৩২২ হিজরী মোতাবেক ১৯০৪ ঈসায়ীতে সিরিয়ার হালব শহরে জন্মগ্রহণ করেন। রবিউল আউয়াল ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ ঈসায়ীতে রিয়াদে ইন্তেকাল করেন। তিনি জামিয়া দিমাশকের উস্তাদ এবং ফিকহ ও আইন শাস্ত্রে বর্তমান শতাব্দির বিশ্ববরেণ্য আলেম ছিলেন। 'আল মাদখাল ইলাল ফিকহিল আম', 'আহকামুল আওফাক' রচনা জগতে তাঁর অমর কীর্তি। (আলবুদূরুল মুযিয়্যাহ আলা তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ: ১৮/৭৯-৯২)

[৭৯৮] আহকামুল আওকাফ (মুস্তফা আহমাদ যারকা): ১৪৫

ইচ্ছা সে ভাতা বাড়িয়ে দিবে, যাকে ইচ্ছা কম দিবে, যাকে ইচ্ছা তাদের অন্তর্ভুক্ত করবে এবং যাকে ইচ্ছা বাদ দিবে, তাহলে ওয়াক্ফ জায়েয হবে। তবে একবার যদি সে তাদের মধ্যে কাউকে অতিরিক্ত দেয়া অথবা কম দেয়া অথবা কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা অথবা বাদ দেয়ার শর্ত করে ফেলে, তাহলে পরবর্তীতে উক্ত শর্তের মাঝে আর কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। কেননা তার শর্তটি তার ইচ্ছানুযায়ীই স্থিরকৃত হয়েছে। সে চিন্তা-ভাবনা করে তা বাস্তবায়ন করার পর সেখনে আর তার এখতিয়ার থাকবে না।"[৭৯৯]

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. আল্লামা কাসিম ইবনে কুতলুবুগা'র 'ফাতাওয়া'র উদ্ধৃতিতে বলেন-

وفي فتاوى الشيخ قاسم: وما كان من شرط معتبر في الوقف فليس للواقف تغييره ولا تخصيصه بعد تقرره، ولا سيما بعد الحكم. اهـ.

"শায়খ কাসেম রাহ.-এর ফাতাওয়াতে উল্লেখ আছে- ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে যে শর্তটি গ্রহণযোগ্য হবে, ওয়াক্ফকারী নিজের তা আর পরিবর্তন করতে পারবে না এবং তা কার্যকর হওয়ার পর (ব্যাপক থাকলে) তা আর বিশিষ্টও করতে পারবে না। বিশেষ করে ফয়সালার পর।"[৮০০]

আল্লামা মোল্লা খসরু রাহ. (৮৮৫ হি.)[৮০১] বলেন-

(وقف ضيعة على الفقراء وسلمها إلى المتولي، ثم قال لوصيه أعط من غلتها فلانا كذا وفلانا كذا أو افعل ما رأيت من الصواب فجعله لهم باطل) لأن الوقف بعد التسجيل خرج عن ملكه فلا يقدر وصيه على التصرف فيه (إلا إذا كان شرط في الوقف) قبل التسجيل (أن يصرف) أي الواقف (غلتها إلى من شاء) كذا في الخانية.

"কেউ দরিদ্রদের জন্য ফসলি জমি ওয়াক্ফ করে মুতাওয়াল্লির নিকট তা অর্পণ করলো। অতঃপর তার অছিকে বললো, এর ফসল থেকে অমুককে এই পরিমাণ দাও, অমুককে এই পরিমাণ দাও, অথবা তুমি যা সঠিক মনে করো তা করো, তাহলে তার এসব হস্তক্ষেপ বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা ওয়াক্ফ রেজিস্ট্রার হওয়ার পর তার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে। সুতরাং তার অছি তাতে তাসাররুফের ক্ষমতা রাখে না। তবে লিপিবদ্ধ হওয়ার আগে ওয়াক্ফের সময় যদি সে শর্ত করে যে, সে এর ফসল যাকে ইচ্ছা তাকে দিবে তাহলে তা শুদ্ধ হবে।"[৮০২]

এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম যে, শরী'আতে ওয়াক্ফকারীর শর্তের বিশেষ গুরুত্ব ও মূল্য রয়েছে। তাই সাধারণ অবস্থায় ওয়াক্ফকারীর শর্ত লঙ্ঘন করার কোনো অনুমতি নেই। তবে ওয়াক্ফের খাত বহাল রাখার জন্য বা বিশেষ প্রয়োজনে কখনো কখনো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে ওয়াক্ফকারীর 'শর্তের' মাঝে রদবদল করা যায়।

---

[৭৯৯] আল ইস'আফ: ৩৮

[৮০০] রদ্দুল মুহতার: ৬/৭০৪, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮০১] মুহাম্মদ ইবনে ফারামুরয ইবনে আলী আররুমী, আলহানাফী। তিনি মোল্লা খসরু নামে প্রসিদ্ধ। ৮৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৪৮০ ঈসায়ীতে কুস্তুন্তুনিয়াতে ইন্তেকাল করেন। তিনি কুস্তুন্তুনিয়ার গভর্নর ছিলেন। ফিকহ ও উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি রয়েছে। 'দুরারুল হুক্কাম শরহু গুরারুল আহকাম' তার অন্যতম। (আল আ'লাম লিযযিরিকলী: ৬/৩২৮)

[৮০২] দুরারুল হুককাম শরহু গুরারিল আহকাম: ২/১৩৬

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে কোনো প্রয়োজনেই ওয়াক্ফকারীর শর্তে পরিবর্তন করা যাবে না; বরং এর নির্দিষ্ট শর্ত, নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ওয়াক্ফকৃত বস্তু বিক্রয়, বদলানো ও খাত পরিবর্তন সংক্রান্ত জটিলতা

আমরা জানি, ওয়াক্ফ একটি স্থায়ী সাদকা। ওয়াক্ফ তখনই বাস্তবায়ন হবে যখন তাতে স্থায়ীত্বের উপাদান থাকবে। হাদীস ও আসার থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় এবং এর উপর ইমামদের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে। ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. উল্লেখ করেন-

إن التأبيد شرط بالإجماع.

"ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে স্থায়ী হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত।"[৮০৩]

এজন্য ওয়াক্ফের মূল কাঠামো ও প্রকৃতির মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা ওয়াক্ফ করার পর তা প্রত্যাহার করা কোনো অবস্থায় সম্ভব নয়। তবে মূল ওয়াক্ফ বহাল রেখে শাখাগত বিষয়ে বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে। নিম্নে আমরা এ পরিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থা, এর শর্ত ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে কিছু মৌলিক আলোচনা করবো।

ওয়াক্ফিয়া সম্পদের পরিবর্তন ও রদবদল তিন ক্ষেত্রে হতে পারে-

ক. ওয়াক্ফের জমির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, জমি ওয়াক্ফ করার পর তা বিক্রয় করে তদস্থলে আরেকটি জমি ক্রয় করা বা সরাসরি আরেকটি জমির সাথে বদলানো। অনেকসময় ওয়াক্ফ প্রকল্পের কোনো অংশ বা সরঞ্জাম পরিবর্তন করা হয়। এটাও উক্ত বিষয়ের সাথে যোগ হবে।

খ. ওয়াক্ফের খাতের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, কোনো এক খাতে জমি বা অন্য কোনো বস্তু ওয়াক্ফ করার পর তা ভিন্ন খাতে ব্যবহার করা।

গ. ওয়াক্ফের ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে পরিবর্তন। যেমন, মুতাওয়াল্লি নিয়োগ, তাদের ভাতা নির্ধারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারী যে শর্ত করেছে, তাতে পরিবর্তন।

নিম্নে আমরা এই তিন ক্ষেত্র নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

১. ওয়াক্ফকৃত জমি বিক্রয় ও বদলানো

পূর্বের আলোচনা হতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তির পুরোপুরি বিক্রয় এবং তা পুনরায় ব্যক্তি মালিকানায় প্রবেশ করানো কোনো অবস্থায় বৈধ নয়। কারণ, বিক্রয় 'ওয়াক্ফের' সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে সাংঘর্ষিক। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃতিগতভাবে ওফাক্ফ হলো স্থায়ী সাদকা। সুতরাং বিক্রয় বা এ জাতীয় অন্যান্য হস্তক্ষেপ থেকে ওয়াক্ফকৃত সম্পদকে মুক্ত রাখা অপরিহার্য। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. ও ইমাম যুফার রাহ.-এর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম হিলাল ইবনে ইয়াহ্য়া আল বসরী রাহ. (২৪৫ হি.)[৮০৪] তাঁর প্রণীত 'আহকামুল ওয়াক্ফ'-এ বলেন-

---

[৮০৩] আল হিদায়া: ২/৬১৫, মাকতাবায়ে ইসলামিয়া

[৮০৪] হিলাল ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুসলিম আররায়, আলবসরী, আলফকীহ, আলহানাফী। তিনি ২৪৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. ইমাম যুফার রাহ.-এর নিকট থেকে ফিকহশাস্ত্র অর্জন করেছেন। জ্ঞানের আধিক্যের কারণে তাঁকে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। 'আহকামুল আওকাফ' তার জগত বিখ্যাত গ্রন্থ। (আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ : ২২৩)

...لأن الوقف لا يطلب به التجارة، ولا تطلب به الأرباح، وإنما سميت وقفا لأنها تبقى لا تباع.

"…. ওয়াক্‌ফ দ্বারা ব্যবসা উদ্দেশ্য নয়। ওয়াক্‌ফকে এজন্যই 'ওয়াক্‌ফ' বলে নামকরণ করা হয়েছে যে, তা বাকি রাখা হয়, বিক্রয় করা যায় না।"[৮০৫]

এছাড়াও ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াক্‌ফিয়া সম্পদের বিক্রয়ের কারণে আরো কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। যথা-

ক. ওয়াক্‌ফকৃত জমির উপর মালিকানাসুলভ হস্তক্ষেপ। আমরা জানি, ওয়াক্‌ফিয়া জমির উপর কারো মলিকানাই প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই ঐ সম্পদে যেকোনো ধরনের মালিকানাসুলভ হস্তক্ষেপ 'অ-মালিকানাধীন বস্তুতে হস্তক্ষেপ' (التصرف فيما لا يملك) বলে বিবেচিত হবে, যা শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. (৬৮১ হি.) ওয়াক্‌ফিয়া সম্পদ বিক্রয়ের ব্যাপারে বলেন-

...ولأنه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن من البيع.

"…. ওয়াক্‌ফ সম্পন্ন হওয়ার দ্বারা উক্ত সম্পদ ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে। আর মালিকানা ব্যতীত কোনো কিছু বিক্রির অবকাশ নেই।"[৮০৬]

সুতরাং যে ব্যক্তি ক্রেতা হিসেবে উক্ত জমি গ্রহণ করবে, সেও তার মালিক হবে না। কারণ, ওয়াক্‌ফিয়া জমিতে কোনো ধরনের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিই শুদ্ধ হয় না। হ্যাঁ, বিশেষ কিছু ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম, যার বিবরণ সামনে আসছে।

খ. ওয়াক্‌ফকৃত জমিকে তার নির্দিষ্ট খাত থেকে শর'য়ী প্রয়োজন ব্যতীত সরিয়ে ফেলা। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, ওয়াক্‌ফকৃত জমি ওয়াক্‌ফের খাতের সাথে এমনভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায় যে, এ জমিকে বিক্রয় তো দূরের কথা, অন্য কোনো খাতেও ব্যবহার করা যায় না। সেখানে বিক্রয় অর্থ হলো জমিটিকে তার খাত থেকে একদম সরিয়ে ফেলা, যা সম্পূর্ণ উসূল পরিপন্থী কাজ।

গ. পূর্বে আমরা জেনেছি যে, ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফকারীর শর্ত ও উদ্দেশ্যের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এর মাঝে যথাসম্ভব কোনো ধরনের রদবদল করার অনুমতি নেই। আর বিক্রয়ের দ্বারা ওয়াক্‌ফকারীর শর্ত সমূলে উৎপাটিত হয়।

এজন্য সাময়িক লাভ বা সাধারণ অজুহাতের কারণে বিক্রয় বা বদলানো থেকে ফুকাহায়ে কেরাম নিষেধ করেছেন। শুধু ওয়াক্‌ফের ফায়েদা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে বিক্রয়ের অনুমতি দিলে কোনো ওয়াক্‌ফিয়া জমি বহাল রাখা সম্ভব হবে না। এছাড়া মুতাওয়াল্লি পরিবর্তন হলেই নতুন রদবদলের রাস্তা খুলে যাবে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের মতানুযায়ী এ অবস্থায় পরিবর্তনের অনুমতি নেই। এর কারণ পূর্বে ইমাম হিলাল ইবনে ইয়াহয়া রাহ. এর ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা সিরাজুদ্দীন কারিউল হিদায়া রাহ. (৮২৯)[৮০৭] ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. এর বক্তব্যের

---

[৮০৫] আহকামুল ওয়াক্‌ফ: ৯৪-৯৫ মাজলিসু দাইরাতিল মা'আরিফিল উসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ, ১৩৫৫ হি.

[৮০৬] ফাতহুল কাদীর: ৬/২০০ আশরাফিয়া

[৮০৭] সিরাজুদ্দীন উমর ইবনে আলী ইবনে যুবাইর আলকাহেরী, আলহুসাইনী, আলহানাফী। তিনি কারীউল হিদায়া নামে প্রসিদ্ধ। ৮২৭/৮২৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচনার মধ্যে 'ফাতাওয়ায়ে কারীউল হিদায়া'

উপর ভিত্তি করে ওয়াকফের উন্নয়নের জন্য পরিবর্তন জায়েয হওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু আল্লামা সদরুশ শরী'আহ রাহ. (৭৪৭ হি.) সহ অন্যান্য ফকীহগণ ঐ মত গ্রহণ করেননি।[৮০৮] আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة، وأحسن صقعا فيجوز على قول أبي يوسف وعليه الفتوى كما في فتاوى قارئ الهداية قال صاحب النهر في كتابه إجابة السائل قول قارئ الهداية والعمل على قول أبي يوسف معارض مما قاله صدر الشريعة، نحن لا نفتي به وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا يعد ويحصى: فإن ظلمة القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المسلمين وعلى تقديره فقد قال في الإسعاف المراد بالقاضي: هو قاضي الجنة المفسر بذي العلم والعمل اه ولعمري إن هذا أعز من الكبريت الأحمر، وما أراه إلا لفظا يذكر، فالأحرى فيه السد خوفا من مجاوزة الحد والله سائل كل إنسان اه.

قال العلامة البيري بعد نقله أقول: وفي فتح القدير والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال أولا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم، فينبغي أن لا يختلف فيه وإن كان لا لذلك بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعا به، فينبغي أن لا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول الشرط وفي الثاني الضرورة ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان. اه.

أقول: ما قاله هذا المحقق هو الحق الصواب اه كلام البيري وهذا ما حرره العلامة القنالي كما قدمناه (قوله: قلت لكن إلخ) استدراك على الصورة الرابعة المذكورة (قوله: بمنع استبداله) أي استبدال العامر إذا قل ريعه ولم يخرج عن الانتفاع بالكلية وهو الصورة الرابعة بقرينة قوله تبعا لترجيح صدر الشريعة فإن الذي رجحه هو هذه الصورة كما علمته آنفا[৮০৯]

আল্লামা শামী রাহ. অন্য এক স্থানে বলেন-

والثالث: أن لا يشرطه أيضا، ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار كذا حرره العلامة قنالي زاده[৮১০] في رسالته الموضوعة في الاستبدال، وأطنب فيها عليه الاستدلال.

"তৃতীয় অবস্থা: ওয়াক্ফকারী পরিবর্তনের শর্ত করেনি; তবে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের

অন্যতম। (আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ: ৩৯৪)

[৮০৮] শারহুল বিকায়াহ (ওয়াক্ফের অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

[৮০৯] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৯৪-৫৯৫ মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮১০] আলী চালাপী ইবনে আমরুল্লাহ ইবনে আব্দুল কাদের কুনালী যাদাহ আততুর্কী, আলকাযী, আলহানাফী। তিনি ইবনুল হানা'য়ী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ইসবার্তা (বর্তমান গ্রীসের স্পার্টি) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৭৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ইতিহাস ও ভূগোল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আকায়েদ, তাফসীর এবং ফিকহ শাস্ত্রে তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলি রয়েছে। 'তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ', 'আল ইস'আফ ফী আহকামিল আওকাফ' তাঁরই অনবদ্য রচনা। (হাদিয়াতুল আরেফীন: ৫/৭৪৮)

তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা "তাবাকাতুল হানাফিয়্যাহ" (২০০৫ সালে ৩ খন্ডে প্রকাশিত) আমাদের নিকট আছে।

জন্য মোটামুটি উপকার রয়েছে। অর্থাৎ, বিনিময়ে যে জমি ক্রয় করতে চাচ্ছে তা উর্বরতা এবং সুবিধার দিক থেকে তুলনমূলক বেশি ভালো। এক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী পরিবর্তন করা জায়েয হবে না। যেমনটি আল্লামা ক্বানালী যাদাহ্ ইস্তিবদাল সম্পর্কে তাঁর রিসালাতে উল্লেখ করেছেন এবং এ ব্যাপারে একাধিক দলীলও পেশ করেছেন।"[৮১১]

শর'য়ী প্রয়োজনে ওয়াক্ফকৃত জমি বিক্রয় ও বদলানো

আমরা জানলাম যে, ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয় করে ওয়াক্ফ সম্পূর্ণরূপে তুলে নেয়া কোনো অবস্থায় বৈধ নয়। তবে কখনো কখনো বিশেষ পরিস্থিতিতে শর'য়ী প্রয়োজনে ওয়াক্ফিয়া জমি বিক্রয় করে তার পরিবর্তে অন্য আরেকটি জমি ক্রয় করার অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় জমিতে পূর্বের ওয়াক্ফ হুবহু বহাল থাকবে। আর এ পরিবর্তনও কাযী, প্রশাসক, কমিটি ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে হতে হবে। ফুকাহায়ে কেরাম এ ধরনের গ্রহণযোগ্য প্রয়োজনের একাধিক ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন। যথা-

ক. বিক্রয় করতে বাধ্য হলে। ওয়াক্ফ বিক্রয় করতে যদি বাধ্য করা হয় এবং বিক্রয় না করে অন্য কোনো উপায় না থাকে, যেমন, যদি ওয়াক্ফের জমি কেউ গসব (জবরদখল) করে নেয় এবং তার থেকে বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকে, এ অবস্থায় বিক্রয় করা বা বিনিময় গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل... الثانية: إذا غصبه غاصب، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح للزراعة فيُضمِّنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا. الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة، وهي في الخانية.

"নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত সমৃদ্ধশীল ওয়াক্ফিয়া জমির রদবদল জায়েয নেই।....দ্বিতীয়ত, যদি কেউ জবরদখল করে নেয় এবং জমির উপর এই পরিমাণ পানি প্রবাহিত করে যে, তা আর চাষাবাদের উপযোগী থাকে না, তাহলে মুতাওয়াল্লি তার থেকে যামান (ক্ষতিপূরণ) আদায় করে এর পরিবর্তে অন্য জমি ক্রয় করলে তা বৈধ হবে। তৃতীয়ত, যদি কেউ ওয়াক্ফিয়া জমিটি জবরদখল করে নেয় এবং তা নিজের বলে দাবি করে, এদিকে উপযুক্ত প্রমাণ নেই, তাহলে এর পরিবর্তে অন্য জমিতে ওয়াক্ফ বহাল রাখার অবকাশ আছে।..."[৮১২]

খ. ওয়াক্ফকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষার জন্য। অর্থাৎ, যদি ওয়াক্ফকৃত সম্পদ এমন অবস্থায় পরিণত হয় যে, তা থেকে কোনো উপকার সাধন করা সম্ভব হচ্ছে না বা ওয়াক্ফকৃত বস্তুকে ওয়াক্ফ হিসেবে বাকি রাখাই সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে ওয়াক্ফের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং তার উদ্দেশ্যের সংরক্ষণের জন্য তাতে শর্তসাপেক্ষে পরিবর্তন করা যাবে। আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. (৯৭০ হি.) বলেন-

ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها، والمعتمد أنه بلا شرط، يجوز للقاضي **بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية** وأن لا يكون هناك **ريع للوقف يعمر به** وأن لا يكون البيع بغبن فاحش.

"যদি জমির অবস্থা এমন হয় যে, এর দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে

---

[৮১১] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৮৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮১২] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ২/১০৫-১০৬, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, ঢাকা

নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী কাযী তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে পরিবর্তন করতে পারবে। **১.** ওয়াক্ফকৃত বস্তুটি একেবারে ফায়েদা থেকে খালি হয়ে যাওয়া। ২. ওয়াক্ফের এমন কোনো আয় না থাকা যার দ্বারা তার সংস্কার করা যাবে। ৩. বিক্রয়টি মারাত্মক ক্ষতিযুক্ত না হওয়া।"[৮১৩]
উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে পূর্ব থেকে পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণের শর্ত থাকা জরুরী নয়।
আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. বলেন-

والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت، لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، **أو لا يفي بمؤنته** فهو أيضا جائز على الأصح، إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه.

"ওয়াক্ফকারী পরিবর্তনের শর্ত করেনি।.... তবে ওয়াক্ফকৃত বস্তুটির অবস্থা এমন হয়েছে যে, তা থেকে কোনোভাবে উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, তা থেকে কোনো আয় হয় না অথবা যে আয় হয় তা দ্বারা তার খরচও মেটে না, এমতাবস্থায় যদি কাযীর অনুমতি থাকে এবং কাযী কল্যাণকর মনে করে, তাহলে পরিবর্তন করা জায়েয।"[৮১৪]

গ. ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফের সময় পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণের শর্ত করে থাকে, তাহলেও শর'য়ী শর্তসাপেক্ষে পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে। ইমাম আবু বকর আল খাস্সাফ রাহ. (২৬১ হি.) বলেন-

قلت: أرأيت إذا قال على أن لي بيعها والاستبدال بها؟ قال: فله أن يستبدل بها ما شاء من الدور والعقارات.

"...যদি কেউ ওয়াক্ফের সময় এই শর্ত করে যে, ওয়াক্ফকৃত বস্তু বিক্রয় অথবা পরিবর্তনের অধিকার আমার থাকবে, তাহলে আপনি কি মনে করেন? তিনি বললেন, তার জন্য ঘর-বাড়ি অথবা জমি যে কোনো জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করার অধিকার থাকবে।"[৮১৫]
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا....

"...পরিবর্তন তিন অবস্থায় হতে পারে। **১.** যদি ওয়াক্ফকারী পরিবর্তনের শর্ত নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য অথবা নিজের এবং অন্যের জন্য করে, তাহলে এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী পরিবর্তন করা জায়েয। কেউ কেউ বলেন সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয....।"[৮১৬]
তবে এ পরিবর্তন শর্তের গণ্ডির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং একাধিকবার পরিবর্তনের শর্ত না করলে শুধু একবারই পরিবর্তন করতে পারবে। এমনিভাবে ওয়াকিফের শর্তের কারণে তার নিযুক্ত মুতাওয়াল্লি পরিবর্তন করতে পারবে না। হ্যাঁ, ওয়াকিফ যদি মুতাওয়াল্লির জন্যও পরিবর্তনের শর্ত করে থাকে, তাহলে সে পরিবর্তন করতে পারবে।
আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

ولو شرط أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضا أخرى ولم يزد صح استحسانا وصارت الثانية وقفا بشرائط الأولى...

---

[৮১৩] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৩৭২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৮১৪] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৮৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা
[৮১৫] আহকামুল আওকাফ লিল খাস্সাফ: ১৩৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন
[৮১৬] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৮৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

وليس له أن يستبدل الثانية بأرض ثالثة لأن الشرط وجد في الأولى فقط.

"যদি ওয়াক্ফকারী এই শর্ত করে যে, সে তা বিক্রি করে তা দ্বারা অন্য জমি ক্রয় করবে....তাহলে তা সহীহ হবে এবং দ্বিতীয় জমিটি প্রথম জমির শর্ত অনুযায়ী তার স্থালাভিষিক্ত হয়ে ওয়াক্ফ হবে।....তবে সে দ্বিতীয়টি তৃতীয় কোনো জমি দ্বারা পরিবর্তন করতে পারবে না, কেননা পরিবর্তনের শর্ত শুধু প্রথমটির ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে।"[৮১৭]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ. বলেন-

ثم إذا أحدث فيه شيئا مما شرطه لنفسه أو مات قبل ذلك يستقر أمر الوقف على الحالة التي كان عليها يوم موته وليس لمن يلي عليه بعده شئ من ذلك إلا أن يشرطه له فى أصل الوقف

"ওয়াক্ফকারী নিজের জন্য পরিবর্তনের শর্ত করলে, এক্ষেত্রে সে কোনো কিছু (পরিবর্তন) বাস্তবায়ন করলে তো করলো, অন্যথায় ওয়াক্ফের বিষয়াবলি তার মৃত্যুর দিন যে অবস্থায় ছিলো সেই অবস্থায় বহাল থাকবে। পরবর্তীতে যে দায়িত্বশীল হবে সে এসব বিষয়ে কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফের সময় তার জন্যও পরিবর্তনের শর্ত করে, তাহলে পারবে।"[৮১৮]

উপরোক্ত তিন ক্ষেত্রে শরী'আতের নিয়ম-নীতি মেনে ওয়াক্ফ বিক্রয় ও স্থানান্তর করা যাবে। তবে আমরা লক্ষ করেছি যে, ফুকাহায়ে কেরাম এসব ক্ষেত্রে বিক্রয় ও স্থানান্তরের অনুমতি দিলেও মৌলিকভাবে আরো দু'টি শর্ত যোগ করেছেন। যথা-

এক.

বিক্রয় ও স্থানান্তরের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, বিপরীতে (প্রথমটির চেয়ে ভালো না হলেও কমপক্ষে) সমমান ও সমশ্রেণির সম্পদ হতে হবে।

আল্লামা শামী রাহ. আল্লামা ক্বানালী যাদাহ্ রাহ.-এর উদ্ধৃতিতে বলেন-

ويؤخذ مما مر زيادة شرط آخر في بعض الصور، وهو كونهما من جنس واحد. قال العلامة قنالي زاده في رسالته في شرائط الاستبدال: منها: أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد وهذا ذكروه فيما شرط الاستبدال لنفسه فلما كان شرطا فيه فلأن يكون شرطا فيما لم يشترط بكتاب الوقف أولى.

"উপরে যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে আরো একটি শর্ত প্রতীয়মান হয়। তা হলো- যে বস্তুর বিনিময়ে বদলানো হবে তা সমশ্রেণির হওয়া। আল্লামা ক্বানালী যাদাহ্ তাঁর রিসালায় পরিবর্তনের শর্তের আলোচনায় বলেন, ওয়াক্ফ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আরো একটি শর্ত হলো পরিবর্তিত এবং যা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে, উভয়টি সমশ্রেণীর হওয়া।"[৮১৯]

টাকা বা অন্য কোনো অস্থায়ী জিনিসের বিনিময়ে পরিবর্তন করলেও তদ্বারা স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে ওয়াক্ফের খাতে ব্যয় করতে হবে। বর্তমান যামানার মানুষের মাঝে দ্বীনী অবনতির কারণে টাকা বা তরল সম্পদ যথাযথ খাতে ব্যবহার না করার আশঙ্কা থাকায় ফুকাহায়ে কেরাম টাকা বা মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় করা থেকে নিষেধ করেছেন।

---

[৮১৭] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৩৭১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৮১৮] আল ইস'আফ: ৩৯
[৮১৯] মিনহাতুল খালিক: ৫/৩৭২-৩৭৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

ويجب أن يزاد آخر في زماننا، وهو أن يستبدل بعقار لا بالدراهم والدنانير، فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونها وقل أن يشترى بها بدل، ولم نر أحدا من القضاة يفتش على ذلك مع كثرة الاستبدال في زماننا مع أني نبَّهت بعض القضاة على ذلك وهم بالتفتيش ثم ترك، فإن قلت كيف زدت هذا الشرط والمنقول السابق عن قاضي خان يرده؟ قلت: لما في السراجية: سئل عن مسألة استبدال الوقف ما صورته وهل هو على قول أبي حنيفة وأصحابه أجاب الاستبدال إذا تعين بأن كان الموقوف لا ينتفع به وثم من يرغب فيه ويعطي بدله أرضا أو دارا لها ريع يعود نفعه على جهة الوقف فالاستبدال في هذه الصورة قول أبي يوسف ومحمد وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب شخص في استبداله إن أعطى مكانه بدلا أكثر ريعا منه في صقع أحسن من صقع الوقف جاز عند القاضي أبي يوسف والعمل عليه وإلا فلا يجوز اهـ. فقد عين العقار للبدل فدل على منع الاستبدال بالدراهم والدنانير.

"বর্তমানে আরো একটি শর্ত বৃদ্ধি করা ওয়াজিব। তা হলো জমিকে জমির বদলায় পরিবর্তন করতে হবে, দিনার, দিরহাম দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না। কেননা আমরা দায়িত্বশীলদের দেখেছি যে, তারা অনেকক্ষেত্রে বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ আত্মসাৎ করে নেয়। বর্তমানে কোনো কাযীকেও এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে দেখা যায় না। অথচ কোনো কোনো কাযীকে আমি এ ব্যাপারে সতর্ক করেছি। তারা অনুসন্ধান করেছে; কিন্তু তারপর ছেড়ে দিয়েছে।
তুমি বলতে পারো, কীভাবে আপনি এই শর্ত বৃদ্ধি করলেন, অথচ কাযীখানের বর্ণনা এর বিপরীত? আমি বলবো, 'সিরাজিয়্যা'য় উল্লেখ আছে, তাঁকে (সিরাজিয়্যা গ্রন্থেকারকে) ওয়াক্ফ পরিবর্তনের মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, তার সূরত কী হবে? (মাসআলা ....) তার মাসআলা বর্ণনার ভাষ্য থেকে বোঝা গেলো যে, সরাসরি জমির বিনিময়েই জমি পরিবর্তন করতে হবে। দিনার-দিরহাম দ্বারা করা যাবে না।...."[৮২০]

সংশ্লিষ্ট আলোচনায় ইমাম কাযীখান ও আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ.-এর বক্তব্যের সমন্বয়ে আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

والجواب أن صاحب البحر، لم ينكر كون المنقول في المذهب ما قاله قاضي خان، ولكن مراده أن هذا المنقول كان في زمنهم، وأن ما قاله قارئ الهداية مبني على تغير الزمان، ويدل على أن مراده هذا قوله فيما سبق "ويجب أن يزاد آخر في زماننا" إلخ. ولا شك أن هذا هو الاحتياط، ولا سيما إذا كان المستبدل من قضاة هذا الزمن، وناظر الوقف غير مؤتمن.

"সমাধান, কাযীখানে যা আছে, তাই মাযহাবের মূল মাসআলা হওয়ার বিষয়টি আল বাহরুর রায়িক-এর লেখক অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর বক্তব্য হলো, এটা তাদের যুগের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিলো। আর কারিউল হিদায়া রাহ. যা বলেছেন, তা তিনি পরিবর্তিত অবস্থা অনুযায়ী বলেছেন। এজন্যই তিনি কলেছেন, "আমাদের যামানায়"। আর সর্তকতার দাবিও এটাই। বিশেষ করে পরিবর্তন যদি বর্তমান যামানার কাযীদের দ্বারা বা অনির্ভরযোগ্য

[৮২০] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৩৭২-৩৭৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

মুতাওয়াল্লির দ্বারা হয়ে।"[৮২১]

হ্যাঁ, পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, স্থায়ী কোনো সম্পদের সাথে বিনিময় সম্ভব না হয়; বরং টাকা বা অন্য কোনো অস্থায়ী সম্পদ বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে তা গ্রহণ করেই স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করে ওয়াক্ফের পূর্বের খাতে ব্যবহার করতে হবে। আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ. (৯২২ হি.) বলেন-

فإن الوقف مما يحتمل الانتقال من أرض إلى أخرى، فإن أرض الوقف إذا غصبها انسان وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا، لاتصلح للزراعة، وضمن قيمتها، وشرى بقيمتها أرضا أخرى، تكون وقفا على شرائط الأولى.

"ওয়াক্ফ এক জমি থেকে অন্য জমিতে স্থানান্তর হতে পারে। ধরুন, কোনো মানুষ ওয়াক্ফকৃত জমি জবরদখল করেছে এবং তাতে এতো পানি প্রবাহিত করেছে যে, তা সমুদ্রের মতো হয়ে গেছে এবং এতে চাষাবাদের কোনো সুযোগও বাকি থাকেনি। এমতাবস্থায় তার থেকে জরিমানা (-র অর্থ) নিয়ে তদ্বারা আরেকটি জমি ক্রয় করতে হবে।"[৮২২]

উল্লেখ্য, পরিবর্তন ও স্থানান্তরের সাথে সাথে দ্বিতীয় জমিটি পুনরায় ওয়াক্ফ হয়ে যাবে। অর্থাৎ, তা মোটেও প্রথম পক্ষের মালিকানায় আসবে না এবং নতুনভাবে ওয়াক্ফ করারও প্রয়োজন হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে পূর্বের ওয়াকফ (তার 'শর্ত' ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসহ) বহাল তবিয়তে বাকি আছে। শুধু জমি বা সরঞ্জাম বদলেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকবে না।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

والضيعة الموقوفة بعبيدها إذا ضعف أحدهم فاشترى ببدله آخر، فإنه لا يدخل في ملك المشتري؛ لأن ذلك

---

[৮২১] রদ্দুল মুহতার ওয়াক্ফ-এর অধ্যায়- مطلب في شروط الاستبدال আল্লামা শামী রাহ. এ প্রসঙ্গে আল বাহর-এর টীকায় (মিনহাতুল খালিক ৫/৩৭৩-৩৭৪) বলেন:

(قوله والمنقول السابق يرده) قال الرملي: كيف يخالف قاضي خان مع صراحته بالجواز بما في السراجية مع أنه ليس فيه تعرض للاستبدال بالدراهم والدنانير لا بنفي ولا إثبات فلا دلالة فيه على مدعاك أصلا والمنقول السابق عن قاضي خان قوله وقال أبو يوسف وهلال لا يملكه إلا بالنقد كالوكيل بالبيع. اهـ.

قلت: وقد يجاب بأن المؤلف لم ينكر مخالفته لقاضي خان وإنما منع الاستبدال بالدراهم في زمانه لما ذكره من العلة إذ لا شك أن قاضي خان ومن قبله لو علموا بما حدث من أكل مال البدل لمنعوه أشد المنع (قوله فقد عين العقار للبدل) قال الرملي كأنه استفاد من قوله وإلا فلا يجوز ولقائل أن يقول ينبغي حمله على التمثيل توفيقا بينه وبين كلام قاضي خان والذي يدل عليه ما كثر إيراده ونقله في كتب الفقه عن نوادر هشام الوقف إذا صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر ولا يجوز بيعه إلا للقاضي. اهـ.

فهذا كما ترى صريح في جواز بيعه بالدراهم وكذا ما في المحيط من قوله لو ضاع الثمن من المستبدل لا ضمان عليه وكذا في كثير من الكتب قال في النهر ورأيت بعض الموالي يميل إلى هذا أي تعيين العقار للبدل ويعتمده وأنت خبير بأن المستبدل إذا كان هو قاضي الجنة فالنفس به مطمئنة ولا يخشى الضياع معه ولو بالدراهم والدنانير والله تعالى هو الموفق وقد أوضحنا المسألة بأكثر من هذا في كتابنا إجابة السائل باختصار أنفع الوسائل فعليك به مستغفرا لمؤلفه. اهـ.

[৮২২] আল ইস'আফ: ৩৫

ليس من هذا الباب، بل من باب الأوقاف، وحكم الأوقاف ذلك.[৮২৩]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

ولو شرط أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضا أخرى ولم يزد صح استحسانا وصارت الثانية وقفا بشرائطه الأولى ولا يحتاج إلى إيقافها كالعبد الموصى بخدمته إذا قتل خطأ واشترى المولى بقيمته عبدا آخر ثبت حق الموصى له في خدمته والمدبر إذا قتل خطأ فاشترى المولى بقيمته آخر صار مدبرا.[৮২৪]

দুই.

কাযীর অনুমতি থাকতে হবে। ওয়াক্ফ বিক্রয় বা স্থানান্তরের জন্য ফিকহের কিতাবে সাধারণত কাযীর অনুমতির শর্তারোপ করা হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম এ শর্তটি বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন, আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

[مطلب في استبدال الوقف وشروطه]... وشرط في البحر: خروجه عن الانتفاع بالكلية، وكون البدل عقارا، والمستبدل قاضي الجنة: المفسر بذي العلم والعمل، وفي النهر أن المستبدل قاضي الجنة، فالنفس به مطمئنة، فلا يخشى ضياعه، ولو بالدراهم والدنانير.

"... ওয়াক্ফ বদলানোর শর্তসমূহ: ১. যে জমি বদলারো হবে, তা পরিপূর্ণভাবে ফায়েদা থেকে খালি হওয়া; ২. সরাসরি আরেক জমির মাথে বিনিময় করা। ৩. পরিবর্তনকারী কাযিল জান্নাত হওয়া অর্থাৎ, ইলম ও আমলওয়ালা হওয়া। এ ধরনের কাযী হলে দিনার, দিরহাম দ্বারা বিনিময় করলেও সমস্যা নেই। কারণ, এক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বনের সম্ভবনা নেই।"[৮২৫]

কাযীর কথা উল্লেখ থাকলেও বিষয়টি প্রয়োজনীয়তা ও যামানার সাথে সম্পৃক্ত। ওয়াক্ফের একাধিক বিষয়ে যামানা পরিবর্তনের কারণে ফুকাহায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। যেমনটি মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় নাজায়েয হওয়া সম্পর্কে একটু আগেই আমরা আল্লামা শামী রাহ.-এর বক্তব্য পড়েছি।

অনুরূপভাবে এ শর্তটিও আমাদের সমসাময়িক অবস্থার সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করাই বাঞ্চনীয়। আমাদের দেশের ওয়াক্ফ স্টেটগুলো দুই প্রকার:

১. সরকারী ওয়াক্ফ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন ওয়াকফ স্টেট ও ওয়াক্ফ সম্পত্তি।

২. মুতাওয়াল্লি বা কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ ওয়াক্ফ, যার উপর সরকারের সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

আমাদের দেশের প্রচলিত আইন[৮২৬] অনুযায়ী ওয়াক্ফ বিক্রয় বা স্থানান্তরের উদ্যোগ মুতাওয়াল্লি বা স্থানীয় ওয়াক্ফ সম্পত্তির কমিটি গ্রহণ করতে পারবে না; বরং এক্ষেত্রে ওয়াক্ফ প্রশাসকের অনুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এমনকি প্রশাসককেও এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।[৮২৭]

---

[৮২৩] ফাতহুল কাদীর: ৬/২৮৪, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[৮২৪] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৩৭১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৮২৫] আদ্দুররুল মুখতার ৪/৩৮৬, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮২৬] 'ওয়াক্ফ অধ্যাদেশে, ১৯৬২' ও 'ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩'

[৮২৭] এ্যযব ডধয়ভং ঙৎফরহধহপব, ১৯৬২, ৩-৩৩

'ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩' অনুযায়ী প্রশাসক ওয়াক্ফ স্থানান্তরের জন্য ১২ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবে। তাদের পরামর্শ অনুসরণ করে এবং সরকারের অনুমতি নিয়েই প্রশাসক কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবেন।[৮২৮]

বর্তমানে দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ, বেসরকারী) ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে সবক্ষেত্রে প্রশাসক, আদালত ও সরকারের অনুমতি নেওয়া দুষ্কর ব্যাপার।[৮২৯] তাই মুফতিয়ানে কেরাম প্রয়োজনে মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বশীল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানান্তরের অনুমতি দিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারে মুফতী রশিদ আহমদ লুধিয়ানভী রাহ. (১৪২২ হি.) বলেন-

قلت: في زماننا جماعة المسلمين بمنزلة القاضي؛ لأن ولايته مستفاد منهم، فكأنه هم وكأنهم هو، فإن حكام زماننا لا يعبئون بمثل هذه الأمور الدينية.

"বর্তমান সময়ে মুসলমানদের জামা'আতই কাযীর স্থলাভিষিক্ত। কেননা কাযীর কর্তৃত্ব মূলত তাদের থেকেই প্রাপ্ত। সুতরাং কাযী যেন তারা, আর তারা যেন কাযী। কারণ, বর্তমানের বিচারকগণ এই ধরনের দ্বীনি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখে না।"[৮৩০]

ওয়াক্ফের গৌণ অংশ বা সরঞ্জাম বিক্রয় ও পরিবর্তন

উপরের আলোচনাটি ছিলো মূল ওয়াক্ফিয়া জমি বা পুরো ওয়াক্ফ প্রকল্প বিক্রয়ের ব্যাপারে। আর ওয়াক্ফের কোনো গৌণ অংশ বা সরঞ্জাম (যেমন, দরজা, জানালা ইত্যাদি) যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং তা আর কোনোভাবেই কাজে না আসে বা কাজে আসার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে তা উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করে তার মূল্য ঐ ওয়াক্ফ প্রকল্পের জন্য নিয়মানুযায়ী[৮৩১] খরচ করা হবে। অন্য কোনো ওয়াক্ফের জন্য নয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, এ অর্থ সাধারণ ওয়াক্ফের আমদানীর মতো ওয়াক্ফের খাত তথা ফায়েদা ভোগকারীদের মাঝে বন্টন করা যাবে না। কারণ, এটা মূল ওয়াক্ফের অংশ। আর মূল ওয়াক্ফকে আপন অবস্থায় বহাল রেখে তার প্রবৃদ্ধিই ওয়াক্ফের খাতে ব্যয় করা হয়।

আল্লামা মারগীনানী রাহ. বলেন-

وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف، إن احتاج إليه، وإن استغنى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته، فيصرفه فيها"؛ لأنه لا بد من العمارة ليبقي على التأبيد، فيحصل مقصود الواقف. فإن مست الحاجة إليه في الحال صرفها فيها، وإلا أمسكها حتى لا يتعذر عليه ذلك أوان الحاجة، فيبطل المقصود، وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل، "ولا

---

[৮২৮] কমিটির বিস্তারিত বিবরণ ও শর্তাদি দেখুন: ওয়াক্ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ আইন, ২০১৩, ধারা নং ৮ (১), পৃষ্ঠা ৩

[৮২৯] উদাহরণস্বরূপ দেখুন:
http://ajkersangbad.com/10653/%E0%A6,
http://www.bbarta24.net/national/2419

[৮৩০] আহসানুল ফাতাওয়া: ৬/৪২৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৮৩১] অর্থাৎ, তা ওয়াক্ফ সংস্কার ও নির্মাণে খরচ করা হবে। এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, পূর্বে তা যেখানে ছিলো, ঐ স্থলেই খরচ করতে হবে।

يجوز أن يقسمه" يعني النقض "بين مستحقي الوقف" لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه، وإنما حقهم في المنافع، والعين حق الله تعالى، فلا يصرف إليهم غير حقهم.

"ওয়াক্ফের স্থাপনা এবং তার সরঞ্জামাদি থেকে যা ভেঙ্গে পড়েছে কাযী প্রয়োজন হলে তা ওয়াক্ফ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যয় করবে। আর সংস্কারের প্রয়োজন না হলে প্রয়োজন হওয়া পর্যন্ত সেগুলোকে জমা করে রাখবে। অতঃপর প্রয়োজন হলে সেখানেই ব্যয় করবে। কেননা ওয়াক্ফকে স্থায়ীভাবে বাকি রাখার জন্য তা সংস্কার করা আবশ্যক। এর দ্বারাই ওয়াক্ফকারীর উদ্দেশ্য অর্জন হবে। তবে ওয়াক্ফের ভগ্নাবশেষ ওয়াক্ফের মুস্তাহিকদের মাঝে বণ্টন করা জায়েয হবে না। কেননা এগুলো মূল ওয়াক্ফের অংশ। তাতে ওয়াক্ফের মুসতাহিকদের কোনো অধিকার নেই। তাদের হক শুধু ওয়াক্ফের প্রবৃদ্ধির মাঝে। ওয়াক্ফের মূল বস্তু আল্লাহ তা'আলার হক। সুতরাং তা তাদের জন্য ব্যয় করা যবে না।"[৮৩২]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. এ প্রসঙ্গে বলেন-

ولا يقسمه بين مستحقي الوقف؛ لأنه من عين الوقف، ولا حق لهم في العين الموقوفة، لأنها حق الله تعالى وحقهم في الغلة فقط.

"ওয়াক্ফের ভগ্নাবশেষ তার মুসতাহিকদের মাঝে বন্টন করা হবে না। কেননা তা মূল ওয়াক্ফের অংশ। ওয়াক্ফের মূল বস্তুতে তাদের কোনো অধিকার নেই। কেননা তা আল্লাহর হক। তাদের হক শুধু উৎপাদনের মধ্যে।"[৮৩৩]

ওয়াক্ফের আমাদানী ও ওয়াক্ফের কল্যাণে দানকৃত জমি প্রসঙ্গ

ওয়াক্ফের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু সম্পদ থাকে, যা ওয়াক্ফ নয়। যেমন-

ক. ওয়াক্ফের আমাদানী তথা ওয়াক্ফিয়া সম্পদে কারবার করার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা বা ওয়াক্ফিয়া জমির উৎপাদিত ফসল ইত্যাদি ওয়াক্ফ নয় বটে; তবে তা ওয়াক্ফের নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করতে হবে। কারণ, ওয়াক্ফের আমাদানীও ওয়াক্ফ হয়ে গেলে ওয়াক্ফের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যায়।[৮৩৪]

খ. এমনিভাবে যে জমি বা সম্পদ ওয়াক্ফিয়া সম্পদের কল্যাণে দান করা হয়েছে, তবে তাতে ওয়াক্ফের নিয়ত করা হয়নি, এমন জমি বা সম্পদের ক্ষেত্রেও ওয়াক্ফের বিধান প্রযোজ্য হবে না।[৮৩৫]

---

[৮৩২] আল হিদায়া: ২/৬৪২, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

[৮৩৩] ফাতহুল কাদীর: ৬/২০৮ মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৮৩৪] ফাতাওয়ায়ে আনকারাভিয়্যাহ-এ আছে-

متولي المسجد إذا اشترى من غلته دارا أو حانوتا فهذه الدار وهذه الحانوت هل تلحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد ومعناه هل تصير وقفا؟ اختلف المشائخ فيه، قال: الصدر الشهيد المختار أنه لاتلتحق ولكن تصير مستغلا للمسجد، وهذا لأن الشرائط اللتي يتعلق بها لزوم الوقف وصحته حتى لايجوز نسخه ولابيعه لم يوجد شيئ من ذلك ههنا فلم يصر وقفا فيجوز بيعه. في التاسع عشر من الذحيرة.

[৮৩৫] আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. আল মুহীতের উদ্ধৃতিতে বলেন:

وفي المحيط رجل غرس في المسجد يكون للمسجد لأنه بمنزلة البناء بالمسجد وكذا لو بنى في أرض الوقف أو نصب فيها بابا فإن نوى عند البناء أنه بنى للوقف يصير وقفا لأنه جعله وقفا ووقف البناء تبعا لغيره يجوز وإن لم ينو ذلك لا يصير وقفا لأنه لم

যেহেতু এসব সম্পদ মূল ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই এর ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং উপরে আমরা ওয়াক্ফ সম্পত্তি বিক্রয় ও স্থানান্তর সম্পর্কে যেসব বিধি-বিধান ও শর্তাবলি উল্লেখ করেছি তা এসবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এসব সম্পত্তি ওয়াক্ফের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে বিক্রয়, পরিবর্তন ও স্থানান্তর করা যাবে।

ওয়াক্ফের আমাদানি থেকে ক্রয়কৃত জমি বদলানোর হুকুম প্রসঙ্গে ফুকাহায়ে কেরাম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به، هو فيما ورد عليه وقف الواقف، أما فيما اشتراه المتولي من مستغلات الوقف، فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط، وهذا لأن في صيرورته وقفا خلافا، والمختار أنه لا يكون وقفا، فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت.

"ওয়াক্ফ বিক্রয়ের জন্য তা থেকে ফায়েদা অর্জন অসাধ্য হয়ে পড়ার শর্ত হলো মূল ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, ওয়াক্ফকৃত জমি বা বস্তুর ক্ষেত্রে। তবে মুতাওয়াল্লি যা কিছু ওয়াক্ফের প্রবৃদ্ধি দ্বারা ক্রয় করেছে সেগুলো এই শর্ত ছাড়াও বিক্রয় করা জায়েয হবে। কারণ, গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী এগুলো ওয়াক্ফ নয়। সুতরাং কোনো মাসলাহাত থাকলে মুতাওয়াল্লি চাইলে তা বিক্রি করতে পারবে।"[৮৩৬]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ. বলেন-

ولو اشترى المتولي بما فضل من غلة وقف المسجد حانوتا أو مستغلا آخر جاز، لأن هذا من مصالح المسجد، فلو باعه اختلفوا فيه، والصحيح أنه يجوز، لأن المشتري لم يذكر شيئا من شرائط الوقف، فلا يكون من جملة أوقاف المسجد.

"যদি মুতাওয়াল্লি মসজিদের ওয়াক্ফের আয় দ্বারা মসজিদের জন্য দোকান অথবা অন্য কোনো উৎপাদনশীল জমি বা ক্ষেত্র ক্রয় করে, তাহলে তা জায়েয আছে। কেননা এগুলো মসজিদের কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। যদি সে এগুলো বিক্রয় করে, তাহলে তা জায়েয হবে কিনা এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের ইখতিলাফ রয়েছে। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী জায়েয হবে। কেননা ক্রেতা (মুতাওয়াল্লি) এক্ষেত্রে ওয়াক্ফের কোনো শর্ত উল্লেখ করেনি। সুতরাং তা মসজিদের ওয়াক্ফের অন্তর্ভুক্ত হবে না।"[৮৩৭]

সুতরাং মাদরাসা ও মসজিদের কল্যাণে যেসব জমিজমা ওয়াক্ফ করা ছাড়া বা ওয়াক্ফের নিয়ত ব্যতীত দান করা হয়, তা প্রয়োজনে বিক্রয় করা যাবে। এক্ষেত্রে তার মূল্য নিয়মানুযায়ী উক্ত মাদরাসা বা মসজিদের জন্য খরচ করবে।

২. ওয়াক্ফের খাত পরিবর্তন

ওয়াক্ফের খাত অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য সম্পদটি ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তা মৌলিকভাবে দুই ধরনের হতে পারে।

يجعله وقفا. [البحر الرائق ٣٤١/٥]

৮৩৬ ফাতহুল কাদীর: ৬/২০৮, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

৮৩৭ আল ইস'আফ: ৬০

ক. এক বা একাধিক ব্যক্তি

ওয়াক্ফ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য হতে পারে। যেমন, শুধু গরীবদের জন্য ওয়াক্ফ হতে পারে বা নিজ পরিবারের সদস্যদের জন্য হতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, যদি কোনো কারণে ঐ ব্যক্তি বা শ্রেণী বা পরিবারের সদস্যগণ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিলুপ্তির কারণে মূল ওয়াক্ফ বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

খ. এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান শব্দটি আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছি। এখানে যে কোনো যৌথ স্টেট বুঝানো হয়েছে। যেমন, মসজিদ, ঈদগাহ, মাদরাসা বা অন্য কোনো সংস্থা।

ওয়াক্ফকারীর নিয়ত ও শর্ত হিসেবেই খাত নির্ধারিত হবে। খাত নির্ধারিত হওয়ার পর তাতে আর কোনো ধরনের পরিবর্তন করা যাবে না।

পূর্বে আমরা ওয়াক্ফকারীর শর্ত শিরোনামে আলোচনা করেছি যে, ওয়াক্ফকারীর শর্ত নিশ্চিত হওয়ার পর তা সর্বাবস্থায় বহাল রাখা জরুরী এবং তাতে রদবদলের সুযোগ নেই। ইসলামী শরী'আতে এ ব্যাপারে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত প্রমাণাদি ও ফিকহী ভাষ্য পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে।

খাত পরিবর্তনের অবকাশ প্রসঙ্গ

খাত পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বের আলোচনা ছিলো স্বাভাবিক অবস্থার ক্ষেত্রে। স্বাভাবিক অবস্থায় বিধান এটাই যে, তা পরিবর্তন করা যাবে না। তবে বিশেষ কিছু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে খাত পরিবর্তন করার অবকাশ আছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওয়াক্ফের স্থায়িত্ব ও সুষ্ঠু ফায়েদা নিশ্চিত করার জন্য এ পরিবর্তন জরুরী হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা থেকে পরিবর্তনের নিম্নোক্ত সূরতগুলো পাওয়া যায়-

(১) পরিবর্তনের শর্তের ক্ষেত্রেঃ ওয়াক্ফকারী নির্দিষ্ট কোনো পরিবর্তনের শর্ত করতে পারে, অথবা নির্দিষ্ট পরিবর্তনের শর্ত না করে ব্যাপকভাবে পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণের শর্তও করতে পারে। এক্ষেত্রে তার জন্য প্রায় সব ধরনের পরিবর্তনের অনুমতি থাকে। যেমন, কাউকে ওয়াক্ফের আওতাভুক্ত করা, কাউকে বাদ দেওয়া, কারো জন্য ভাতা বৃদ্ধি করা বা কমানো ইত্যাদি। কারণ, পূর্বে আমরা জেনেছি, শরী'আতে ওয়াক্ফকারীর শর্তের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। শর্ত করার পর ওয়াক্ফকারীর জন্যও তার বিরুদ্ধাচরণের সুযোগ থাকে না।

মুফতী মুহাম্মদ আব্বাসী আল মাহদী রাহ. (১৩১৫ হি.)[৮৩৮] তাঁর 'আল ফাতাওয়াল মাহদিয়্যাহ' -এ উল্লেখ করেন-

فإذا شرط الواقف لنفسه التغيير والتبديل في شروط وقفه، كان له أن يجري جميع صور التعديل التي يملكها بأحد الألفاظ المتقدمة، فيزيد أو ينقص أو يدخل أو يخرج أو يعطي أو يحرم أو يخصص أو يفضل أو يرتب بين المستحقين كما يشاء؛ حتى إن له أن يغير الوقف الأول في إنشائه وشروطه وينشئه على وجه آخر،

[৮৩৮] মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আমীন ইবনে মুহাম্মাদ আলমাহদী, আলআব্বাসী, আলহানাফী। তিনি ১২৪৩ হিজরীতে মিশরের ইস্কেনদারাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১৫ হিজরীতে কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। তিনি এক যুগ মিশরের গ্রান্ড মুফতী ও শাইখুল আযহার-এর দায়িত্ব পালন করেছেন। সুবিশাল ফাতওয়া গ্রন্থ 'আলফাতাওয়াল মাহদিয়্যাহ ফী ওকাইয়িল মিশরিয়্যাহ' তাঁরই অমর কীর্তি। (আল আলাম লিযযিরিকলী: ৭/৭৫)

فيجعله خيريا بعد أن كان ذريا، وبالعكس.

"ওয়াক্ফকারী যদি ওয়াক্ফের শর্তের মাঝে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার শর্ত করে, তাহলে সে উপরোক্ত শব্দসমূহের কোনো একটির মাধ্যমে যতো ধরনের পরিমার্জন করতে চায়, করতে পারবে। যেমন, কাউকে বেশি দেয়া, কাউকে কম দেয়া, কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা, কাউকে বাদ দেয়া, কাউকে দান কর, কাউকে বঞ্চিত করা, কাউকে নির্দিষ্ট করা, কাউকে প্রাধান্য দেয়া ইত্যাদি। এমনিভাবে ওয়াক্ফকারী যেভাবে ইচ্ছা ওয়াক্ফের মুসতাহিকদের মাঝে বিন্যাস করতে পারবে। এমনকি ওয়াক্ফের ধরনের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন করতে পারবে। যেমন, আওলাদী ওয়াক্ফকে জনকল্যাণমূলক ওয়াক্ফ হিসেবে স্থির করতে পারবে।"[৮৩৯]

(২) শর্তকৃত খাতের অবর্তমানে: ওয়াক্ফকারী যদি কোনো সীমিত খাতের শর্ত করে থাকে, যেমন, তার সন্তান বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে খাত নির্ধারণ করলো, এক্ষেত্রে খাত বিলুপ্ত হয়ে গেলে গরীব-মিসকিনদেরকে ওয়াক্ফের খাত সাব্যস্ত করা হবে।

এমনিভাবে যদি সে এমন কোনো খাতের শর্ত করে থাকে, যা বর্তমানে বিদ্যমান নেই বা মাঝে সাময়িকভাবে বিদ্যমান থাকবে না, তাহলেও তাদের অবর্তমানে সাধারণ গরীব-মিসকিনগণ ওয়াক্ফটির খাত হিসেবে গণ্য হবে।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ. বলেন-

ولو قال وقفت أرضي هذه على ولدي وولد ولدي ونسلهم أبدا يصح عند أبي يوسف فإذا انقرضوا تكون الغلة للفقراء.

"যদি কেউ বলে, আমার এই জমি সর্বদা আমার সন্তান, তার সন্তান এবং তাদের বংশধরের জন্য ওয়াক্ফ করলাম। তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর নিকট তা সহীহ হবে। সুতরাং যদি তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার আয় দরিদ্রদের জন্য হবে।"[৮৪০]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

(صح الوقف قبل وجود الموقوف عليه) فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له أو على مكان هيأه لبناء مسجد أو مدرسة صح (في الأصح) وتصرف الغلة للفقراء إلى أن يولد لزيد أو يبنى المسجد عمادية زاد في النهر: وينبغي أنه لو وقفه على مدرسة يدرس فيها المدرس مع طلبته فدرس في غيرها لتعذر التدريس فيها أن تصرف العلوفة له لا للفقراء كما يقع في الروم.

"যদি কেউ যায়েদের সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করে, অথচ তার কোনো সন্তান নেই অথবা এমন স্থানের জন্য ওয়াক্ফ করে যাকে মসজিদ বা মাদরাসা নির্মাণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তাহলেও (বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী) ওয়াক্ফ সহীহ হবে। সুতরাং যায়েদের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অথবা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা পর্যন্ত উক্ত ওয়াক্ফের আয় দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করা হবে। (ইমাদিয়্যা)। ...."[৮৪১]

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. শর্তকৃত খাত বিদ্যমান না থাকার বিভিন্ন অবস্থা ও তার বিধান

---

[৮৩৯] আল ফাতাওয়াল মাহদিয়্যাহ: ৪/৩৬

[৮৪০] আল ইস'আফ: ২০-২১, দারুর রাইদ আল আরাবী

[৮৪১] আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৬৬০-৬৬১, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন-

(قوله وتصرف الغلة للفقراء إلخ) أقول: هذا الوقف يسمى منقطع الأول. قال في الخانية ولو قال أرضي صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد وليس له ولد يصح، فإذا أدركت الغلة تقسم على الفقراء، وإن حدث له ولد بعد القسمة تصرف الغلة التي توجد بعد ذلك إلى هذا الولد، لأن قوله صدقة موقوفة وقف على الفقراء وذكر الولد الحادث للاستثناء كأنه قال إلا إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي اه ومنه ما في الإسعاف: وقف على ولده وليس له إلا ولد ابن تصرف الغلة لولد الابن إلى أن يحدث للواقف ولد لصلبه فتصرف إليه اه وقد يكون منقطع الوسط، ومنه ما في الخانية وقف على ولديه ثم على أولادهما أبدا ما تناسلوا. قال ابن الفضل إذا مات أحدهما عن ولد يصرف نصف الغلة إلى الباقي والنصف إلى الفقراء فإذا مات الآخر يصرف الجميع إلى أولاد أولاد الواقف لأن مراعاة شرط الواقف لازم والواقف إنما جعل أولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف النصف إلى الفقراء. اهـ.

مطلب في الوقف المنقطع الأول والمنقطع الوسط.

تنبيه: علم من هذا أن منقطع الأول ومنقطع الوسط يصرف إلى الفقراء. ووقع في الخيرية خلاف، حيث قال في تعليل جواب ما نصه للانقطاع الذي صرحوا، بأنه يصرف إلى الأقرب للواقف لأنه أقرب لغرضه على الأصح اهـ.

وهذا سبق قلم، فإن ما ذكره مذهب الشافعي فقد قال نفسه في محل آخر من الخيرية والمنقطع الوسط فيه خلاف قيل يصرف إلى المساكين وهو المشهور عندنا والمتظافر على ألسنة علمائنا، ثم قال بعد أسطر في جواب سؤال آخر: وفي منقطع الوسط الأصح صرفه إلى الفقراء وأما مذهب الشافعي فالمشهور أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف اهـ.

"ওয়াক্ফের আয়কে দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করা হবে। এটাকে 'মুনকাতিউল আওয়াল' বা এমন ওয়াক্ফ বলা হয় যার খাতের প্রথমাংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফাতওয়ায়ে খানিয়্যায় আছে- যদি কেউ বলে, আমার যে সন্তান জন্মলাভ করবে তার জন্য ওয়াক্ফ; অথচ বর্তমানে তার কোনো সন্তান নেই, তাহলেও ওয়াক্ফ সহীহ হবে। বর্তমানে তা দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। সন্তান হলে তার জন্য পরবর্তী আয়গুলো ব্যয় করা হবে। কারণ, ওয়াকিফ ওয়াক্ফ বলার সাথে সাথে তা মূলত দরিদ্রদের জন্য ওয়াক্ফ হয়ে গিয়েছে (কারণ, তারাই ওয়াক্ফের সাধারণ খাত)। যখন সে সন্তানের কথা উল্লেখ করলো, তখন সে যেন আলাদা করে বললো, যদি আমার সন্তান হয়, তাহলে সে জীবিত থাকা পর্যন্ত এর আয় সে ভোগ করবে।

(উপরে বর্ণিত অবস্থায় ওয়াক্ফের খাতের প্রথমাংশ বিলুপ্ত ছিলো) আর কখনো এমন হয় যে, ওয়াক্ফের খাতের মধ্যাংশ বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন কেউ ধারাবাহিকভাবে তার সন্তান, সন্তানের সন্তান এভাবে পরবর্তী বংশধরের জন্য ওয়াক্ফ করলো। মাঝে নির্দিষ্ট খাত (তার বংশধর) না পাওয়া গেলে দরিদ্রদের জন্য খরচ করা হবে।

বি. দ্র. এখান থেকে জানা গেলো যে ওয়াক্ফের প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশ বিচ্ছিন্ন বা বিলুপ্ত,

তার আয় দরিদ্রদের জন্য খরচ করা হবে। ... "[৮৪২]

(৩) শর্তকৃত খাত ফায়েদা ভোগ করতে অস্বীকৃতি জানালেঃ ওয়াক্‌ফের খাত যদি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ হয়ে থাকে, তাহলে তারা ওয়াক্‌ফ কবুল করলে ওয়াক্‌ফের খাত তারাই হবে। আর যদি তারা ওয়াক্‌ফের ফায়েদা ভোগ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে সে ওয়াক্‌ফের খাত ধরা হবে সাধারণ দরিদ্রদেরকে। শর্তকৃত খাত একবার অস্বীকার করার পর আর কবুল করতে পারবে না। আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ. বলেন-

فصل في بيان اشتراط قبول الوقف وعدمه: قبول الموقوف عليه الوقف ليس بشرط إن وقع لأقوام غير معينين كالفقراء والمساكين، وإن وقع لشخص بعينه وجعل آخره للفقراء يشترط قبوله في حقه، فإن قبله كانت الغلة له، وإن رده تكون للفقراء، ويصير كأنه مات، ومن قبل ما وقف عليه ليس له الرد بعده، ومن رده أول مرة ليس له القبول بعده.

"ওয়াক্‌ফ কবুল করতে হয় কিনা- সে প্রসঙ্গঃ যদি অনির্দিষ্ট কারো জন্য (যেমন, ফকীর, মিসকীন) ওয়াক্‌ফ করা হয়, তাহলে তাদের ওয়াক্‌ফ কবুল করা ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। তবে যদি নির্দিষ্ট কারো জন্য ওয়াক্‌ফ করে, তাহলে তার কবুল করা শর্ত। যদি সে কবুল না করে, তাহলে দরিদ্ররাই ওয়াক্‌ফের হকদার গণ্য হবে।..."[৮৪৩]

আমরা দেখতে পাচ্ছি, উপরোক্ত দুই অবস্থায় শর্তযুক্ত খাতের অবর্তমানে সাধারণ দরিদ্রগণ ওয়াক্‌ফের মাসরিফ (খাত) পরিগণিত হচ্ছে। কারণ, ফুকাহায়ে কেরামের ভাষায়, দরিদ্রগণ হলো ওয়াক্‌ফের মূল খাত। এ ব্যাপারে কিছু ফিকহী ভাষ্য একটু পরেই 'অজ্ঞাত খাতের বিধান' এর আলোচনায় উল্লেখ করা হবে।

(৪) নির্দিষ্ট খাতে প্রয়োজন বাকি না থাকলেঃ[৮৪৪] ওয়াক্‌ফের অতিরিক্ত আমাদানী সাধারণ অবস্থায় অন্য ওয়াক্‌ফের জন্য ব্যবহারের অনুমতি নেই। কারণ, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ওয়াক্‌ফ তার খাতের সাথে খাস হয়ে থাকে। তাই ওয়াক্‌ফের প্রয়োজনাতিরিক্ত আমাদানী ওয়াক্‌ফ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহার করা হবে। অন্য ওয়াক্‌ফের খাতে দেয়া যাবে না।

তবে পূর্বে আমরা জেনেছি যে, ওয়াক্‌ফের অকেজো অংশ বা সম্পদ অন্য ওয়াক্‌ফে স্থানান্তরের অনুমতি রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী অনেক ফকীহ ওয়াক্‌ফের কল্যাণ ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ করে ওয়াকফের উদ্বৃত্ত আমাদানীর ক্ষেত্রেও অন্য খাতে স্থানান্তরের অনুমতি দিয়েছেন। তবে শর্ত হলো, ওয়াক্‌ফের আমাদানী এতো অধিক হতে হবে যে, বর্তমানে তার প্রয়োজন হচ্ছে না এবং আপাতদৃষ্টিতে সামনেও প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না।

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

(ومثله) في الخلاف المذكور (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و) كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر) والحوض (إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض

---

[৮৪২] রদ্দুল মুহতার: ৬/৬৬০-৬৬১, মাকতাবাতুল আযহার

[৮৪৩] আল ইস'আফ: ২১

[৮৪৪] উপরোক্ত সূরতে যদিও পুরোপুরি খাতের পরিবর্তন হচ্ছে না, তবে এক ওয়াক্‌ফের আমদানী অন্য ওয়াক্‌ফে স্থানান্তর করা হচ্ছে। তাই প্রসঙ্গক্রমে এখানে আলোচনা করা হলো।

(إليه).

"..... মসজিদের ঘাস এবং চাটাই ইত্যাদির যদি কোনো প্রয়োজন বাকি না থাকে, এমনিভাবে মসজিদের কুয়া দ্বারা যদি কোনোভাবে উপকৃত হওয়া না যায়, তাহলে মসজিদ, কুয়া বা হাউজ ইত্যাদির ওয়াক্ফ সমশ্রেণীর কোনো খাতে খরচ করা হবে।"[৮৪৫]

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. বলেন-

لف ونشر مرتب، وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. اهـ. ط.

"বিরান মসজিদের ওয়াক্ফ কোনো হাউজে খরচ করা জায়েয হবে না, এমনিভাবে হাউজের ওয়াক্ফ মসজিদে খরচ করা যাবে না। শরহে মুলতাকায় উল্লেখ আছে- খাত বিলুপ্ত ওয়াক্ফকে সমশ্রেণীর কোনো খাতে ব্যয় করা হবে।"[৮৪৬]

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. উপরোক্ত ইবারতদ্বয় উল্লেখ করে বলেন-

قلت: وهذه الرواية وإن كانت منقولة في صورة خراب المسجد وغيره، لكن ما كان مبنى الحكم الاستغناء كان الحكم عاما وإن لم يخرب، وهذا ظاهر عندي.

"...যদিও এই বর্ণনা বিরান মসজিদ এবং এর মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্ণিত। কিন্তু যেহেতু হুকুমের ভিত্তি প্রয়োজন না থাকা, তাই হুকুমটি ব্যাপক হবে, যদিও তা বিরান না হয়।..."[৮৪৭]

(৫) স্থানান্তরে বাধ্য হলে: বিশেষ শর'য়ী প্রয়োজন ও জনসাধারণের ব্যাপক দুর্ভোগ লাঘবের জন্য ওয়াক্ফের খাত পরিবর্তন করার সুযোগ আছে। যেমন, ফুকাহায়ে কেরাম বিশেষ প্রয়োজনে ওয়াক্ফিয়া রাস্তার কোনো অংশকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছেন।[৮৪৮]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ. বলেন-

ولو كان طريق العامة واسعا فبنى فيه أهل محلة مسجدا للعامة وهو لايضر بالمارة قالوا لابأس به وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد رحمها الله، لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا ولو احتيج إلى توسعته من الطريق أو توسعة الطريق منه ولاضرر فيها على الآخر يجوز لما قلنا.[৮৪৯]

আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ মাওসিলী রাহ. বলেন-

(ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد)؛ لأن كليهما للمسلمين، نص عليه محمد (ولو ضاق الطريق وسع من المسجد) عملا بالأصلح، ويجوز القضاء بالشهادة القائمة على الوقف من غير دعوى، لأنه من حقوق الله –تعالى– فلا تحتاج إلى مدع وهو مجتهد فيه فينفذ بالإجماع.[৮৫০]

আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. বলেন-

---

[৮৪৫] আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৫৫১, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮৪৬] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৫১, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮৪৭] ইমদাদুল ফাতওয়া: ২/৫৯৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৮৪৮] মসজিদ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, পরবর্তী প্রবন্ধ ''মসজিদ ও মসজিদের ওয়াক্ফিয়া জমি: কিছু মৌলিক বিধান''।

[৮৪৯] আল ইস'আফ: ৭৭

[৮৫০] আল ইখতিয়ার লিতা'লিলিল মুখতার: ৩/৬১, দারুল হাদীস, কায়রো

ويؤيده ما في التتارخانية عن فتاوى أبي الليث، وإن أراد أهل المحلة أن يجعلوا شيئا من المسجد طريقا للمسلمين فقد قيل ليس لهم ذلك وأنه صحيح، ثم نقل عن العتابية عن خواهر زاده إذا كان الطريق ضيقا والمسجد واسعا لا يحتاجون إلى بعضه تجوز الزيادة في الطريق من المسجد لأن كلها للعامة اه والمتون على الثاني، فكان هو المعتمد لكن كلام المتون في جعل شيء منه طريقا، وأما جعل كل المسجد طريقا فالظاهر أنه لا يجوز قولا واحدا.[৮৫১]

অজ্ঞাত খাতের বিধান

আমাদের দেশে কিছু কিছু জমি এমন আছে যার প্রাচীন দলীলে ওয়াক্ফ বা উইলের কথা লেখা আছে; কিন্তু খাত উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়াও কোনো কোনো ওয়াক্ফ সম্পদের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারী কোন্ খাতে ওয়াক্ফ করেছে তা জানার উপায় থাকে না। এসব ক্ষেত্রে দরিদ্রগণ ওয়াক্ফের খাত সাব্যস্ত হবে।

শরী'আত এবং উরফের[৮৫২] দৃষ্টিতে দরিদ্রগণ হলো ওয়াক্ফের সাধারণ খাত। তাই শর্তের অবর্তমানে বা শর্তকৃত খাতের অবর্তমানে তারাই (দরিদ্রগণ) ওয়াক্ফের হকদার হবে। ফুকাহায়ে কেরামের ভাষায়, দরিদ্রগণ হলো ওয়াক্ফের মূল খাত। তবে ওয়াক্ফকারী (দরিদ্র ব্যতীত) অন্য কাউকে খাত হিসেবে স্থির করে থাকলে বা অন্য কারো জন্য শর্ত করলে, সে বা তারা অস্থায়ীভাবে হকদার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেলে ওয়াকফের মূল খাতের হকদার ফকীরগণ হবে।

এমনিভাবে ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফের সময় নির্দিষ্ট কোনো খাত শর্ত না করলে, সেক্ষেত্রেও ওয়াক্ফের খাত হবে সাধারণ ফকীর ও দরিদ্রগণ। আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ. বলেন-

وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز ويكون وقفا على المساكين لأن مطلقه ينصرف إلى المساكين عرفا، ولو قال ارضي هذه صدقة موقوفة او موقوفة صدقة ولم يزد على هذا جاز في قول أبي يوسف و محمد وهلال الرأى رحمهم الله ويكون وقفا على الفقراء وقال يوسف بن خالد السمتي رحمه الله لايجوز مالم يزد قوله وآخرها للفقراء أبدا والصحيح قول أصحابنا **لأن محل الصدقة في الاصل الفقراء** فلا يحتاج إلى ذكرهم ولا انقطاع لهم فلا يحتاج إلى ذكر الابد أيضا.

"ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. বলেন, ওয়াক্ফ শুদ্ধ হবে এবং তা দরিদ্রদের জন্য সাব্যস্ত হবে। কেননা উরফের ভিত্তিতে সাধারণ ওয়াক্ফ দরিদ্রদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যদি কেউ বলে, আমার এই জমি ওয়াক্ফ। এর চেয়ে বেশি কোনো শব্দ না বলে, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ এবং হিলাল রায়ী' রাহ.-এর মত অনুযায়ী তা জায়েয হবে এবং তা দরিদ্রদের জন্য ওয়াক্ফ হবে। আর ইমাম ইউসুফ ইবনে খালেদ সামতী রাহ. বলেন, ওয়াক্ফের শেষে 'এটা স্থায়ীভাবে দরিদ্রদের জন্য' না বলা পর্যন্ত তা ওয়াক্ফ হবে না। তবে আমাদের ইমামদের কথাই গ্রহণযোগ্য। কেননা সাদকার মূল মাসরিফ হলো দরিদ্ররা। সুতরাং তাদের উল্লেখের প্রয়োজন হবে না। আর তাদের তো বিলুপ্তিও নেই। সুতরাং 'স্থায়ীভাবে' শব্দ উল্লেখেরও প্রয়োজন হবে

---

[৮৫১] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৭০, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮৫২] মানুষের মাঝে প্রচলিত রীতি-নীতি।

না।"[৮৫৩]

তিনি আরো বলেন-

فلو قال وقفت أرضي هذه أو قال جعلتها موقوفة ولم يزد عليه جاز عنده وصارت وقفا على الفقراء، وبه أفتى مشايخ بلخ وعليه الفتوى لأن قوله وقفت يقتضي ازالة إلى الله تعالى ثم إلى نائبه وهو الفقير وإذا يقتضي التأبيد فلا حاجة إلى ذكره كالاعتاق وعند محمد لايجوز لأن موجبه زوال الملك بدون التمليك.

"যদি কেউ বলে, 'আমার এই জমি ওয়াক্ফ' বা 'আমি তা ওয়াক্ফ করলাম' এবং এর চেয়ে বেশি কিছু না বলে, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর নিকট তা দরিদ্রদের জন্য ওয়াক্ফ হবে।..."[৮৫৪]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

الخامس موقوفة فقط لا يصح إلا عند أبي يوسف فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ موقوفة على الفقراء وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف أعني الفقراء لزم كونه مؤبدا لأن جهة الفقراء لا تنقطع. قال الصدر الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف ونحن نفتي بقوله أيضا لمكان العرف وبهذا يندفع رد هلال قول أبي يوسف بأن الوقف يكون على الغني والفقير ولم يبين فيبطل **لأن العرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم**.

"যেহেতু মানুষের উরফে সাধারণভাবে ওয়াক্ফ করা হলে তা দরিদ্রদের হক বুঝায়, তাই (খাত অব্যক্ত থাকলেও) তা স্পষ্টভাবে বলার মতোই।....."[৮৫৫]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ. এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তার পূর্ণ আলোচনা এখানে তুলে ধরা হলো। তিনি বলেন-

(فصل في ذكر حكم الأوقاف المتقادمة) إذا تقادم أصل الوقف ومات شهوده فما كان في أيدي القضاة وله رسوم في دواوينهم وتنازع أهله فيه فإنه يجري على الرسوم الموجودة فيها استحسانا، وما ليس له رسوم في دواوينهم وتنازع أهله فيه حملوا في القياس على التثبت فمن برهن على شئ حكم له به، وإذا حملوا على التثبت يصير حشريا وتبقى غلته في يد القاضي. ولو أن قاضيا تولى بلدا فوجد في ديوان من كان قبله ذكر أوقاف وهي في أيدي أمناء ولها رسوم في ديوانه فإنه يعمل بها استحسانا ولو تنازع فيه قوم وادعى كل فريق أنه وقفه فلان بن فلان علينا وليس لهم بينة فإن كان للواقف ورثة يرجع في البيان إليهم ويعمل بقولهم وإن يكن الوقف في أيديهم بل كان في يد أمين القاضي الذي كان قبله وإلا حملوا على التثبت فإن اصطلحوا على أخذه وليس لهم رسم في ديوان القاضي ليعمل به يستحسن تنفيذه وقسمة غلته بينهم **وإلا يصرف إلى الفقراء لأنه بمنزلة اللقطة لأنه مال تعذر إيصاله إلى مستحقه** ولو أنكر الورثة وقف مورثهم إياه وقالوا هو ميراث لنا كان ملكا لهم ولو قالوا إنما وقفه علينا وعلى أولادنا خاصة ثم من بعدنا على المساكين.

---

[৮৫৩] আল ইস'আফ: ১৫-১৬

[৮৫৪] আল ইস'আফ: ২০

[৮৫৫] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৩১৭-৩১৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

قال الخصاف الوقف في أيدي القضاة ولا يجوز إن أقبل قولهم فيما ليس في أيديهم ومحمل قوله هذا على ما ذكر في آخر هذا الفصل ولو أتى القاضي رجل وقال إني كنت أمينا لمن كان قبلك وفي يدي ضيعة كذا وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا فإنه يرجع في أمرها إلى ورثة زيد فإن ذكروا جهة تخالف قوله عمل بقولهم وإن قالوا هي وقف علينا وعلى أولادنا ثم من بعدنا على المساكين.[৮৫৬]

এমনিভাবে যদি ওয়াক্‌ফকারী ওয়াক্‌ফের শুধু আংশিক খাত নির্ধারণ করে থাকে, তাহলেও বাকি ফায়েদার হকদার হবে দরিদ্রগণ। আল্লামা বুরহানুদ্দীন ইবনে মাযাহ আল বুখারী রাহ. (৬১৬ হি.) বলেন-

ولو قال: أرضي صدقة موقوفة لعبد الله من غلاتها مئة درهم ولزيد مئتان فزادت الغلة فالغلة الزائدة تكون للفقراء ولا يكون بينهما بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه أطلق الوقف حيث قال: أرضي صدقة موقوفة، لو اقتصر عليه كانت الغلة للفقراء فلما قال: لعبد الله من غلاتها مئة درهم ولزيد مئتان فقد استثنى هذ القدر عن حق الفقراء فما بقي يبقى على أصل الوقف، أما في المسألة الأولى جعل الوقف على عبد الله، وزيد ثم فضل أحدهما على الآخر فما بعد التفضيل يصرف إليهما على السواء قضية للإيجاب واعتبر هذا بالوصية.[৮৫৭]

আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

قلت: ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز إلى ما عينه الواقف، والباقي إلى الفقراء **لأنهم مصرف الوقف في الأصل، ما لم ينص على غيرهم**.[৮৫৮]

৩. ব্যবস্থাপনাগত পরিবর্তন

ওয়াক্‌ফের মাঝে মুতাওয়াল্লি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু ওয়াক্‌ফের কোনো মালিক থাকে না, তাই তা পরিচালনা ও পরিচর্যা করার জন্য মুতাওয়াল্লির প্রয়োজন হয়। ফুকাহায়ে কেরাম মুতাওয়াল্লির গুণাগুণ ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে শুধু মুতাওয়াল্লির পরিবর্তন বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো।

ওয়াক্‌ফের মুতাওয়াল্লিকে মৌলিকভাবে দুই কারণে পরিবর্তন করা যায়-

এক. ওয়াক্‌ফকারী নিজেই যদি মুতাওয়াল্লি পরিবর্তনের (শরী'আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য) শর্ত করে, তাহলে ওয়াক্‌ফের মাসলাহাত অনুযায়ী পরিবর্তন করা যাবে অথবা যদি ওয়াকফ্‌কারী নির্দিষ্ট গুণাগুণের শর্ত করে, তাহলেও ঐ শর্ত পাওয়া না গেলে পরিবর্তন করা যাবে। পিছনে আমরা ওয়াক্‌ফকারীর শর্তের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পড়ে এসেছি।

দুই. ওয়াক্‌ফের স্বার্থে ফুকাহায়ে কেরাম মুতাওয়াল্লির জন্য কিছু গুণাগুণের শর্ত করেছেন। যেমন, স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া, আদিল বা ন্যায়বান হওয়া, আমানতদার এবং যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া।

لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل

---

[৮৫৬] আল ইস'আফ: ৯৭, দারুর রাইদ আল আরবী

[৮৫৭] আল মুহিতুল বুরহানী: ৭নং খণ্ড (الفصل السادس عشر في الرجل يقف أرضه على وجوه)

[৮৫৮] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫২১, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به ويستوي فيها الذكر والأنثى وكذلك الأعمى والبصير وكذلك المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين.

"বিশ্বস্ত, স্বয়ং নিজে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে দায়িত্ব আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে মুতাওয়াল্লি বানানো হবে না। কেননা দায়িত্বের জন্য কল্যাণকামীতা শর্ত। কোনো বিশ্বাসঘাতককে দায়িত্ব দেয়ার মাঝে কল্যাণকামীতা নেই; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য বিঘ্ন হয়। এমনিভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়ার মধ্যেও কোনো কল্যাণকমীতা নেই। কেননা এর দ্বারাও উদ্দেশ্য অর্জন হয় না। আর দায়িত্বের ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা, অন্ধ ও দৃষ্টিবান সমান। কোনো অন্যায়ের কারণে যার উপর হদ কায়েম করা হয়েছে সে যদি তাওবা করে, তাহলে সেও বিশ্বস্ত হলে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে।"[৮৫৯]

এসব শর্ত বিদ্যমান না থাকলে কাযী নির্দিষ্ট নিয়মে মুতাওয়াল্লি পরিবর্তন করতে পারবে। বিশেষত যদি মুতাওয়াল্লির খিয়ানত নিশ্চিত হয়, তাহলে তাকে পরিবর্তন করা ওয়াক্ফের মাসলাহাতের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের অবস্থায় মুতাওয়াল্লি পরিবর্তন করা কাযীর জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে যায়।

আল্লামা হাসকাফী রাহ. বলেন-

(وينزع) وجوبا بزازية (لو) الواقف درر فغيره بالأولى (غير مأمون) أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه فتح، أو كان يصرف ماله في الكيمياء نهر بحثا (وإن شرط عدم نزعه) أو أن لا ينزعه قاض ولا سلطان لمخالفته لحكم الشرع فيبطل كالوصي.

"যদি ওয়াক্ফকারী বিশ্বস্ত না হয় বা পরিচালনায় অক্ষম হয় অথবা তার ফিস্ক প্রকাশ পায়, তাহলে আবশ্যই তাকে মুতাওয়াল্লির দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হবে। যেখানে এধরনের পরিস্থিতিতে স্বয়ং ওয়াকিফকে অপসরণ করা হয়, সেখানে অন্যদের ব্যাপার তো স্পষ্ট.... যদি ওয়াক্ফকারী তাকে অপসারণ না করার শর্ত করে, তাহলে এই শর্ত বাতিল বলে বিবেচিত হবে।"[৮৬০]

মুদ্রা ও স্থানান্তরশীল সম্পদের ওয়াক্ফ

আমরা পূর্বে জেনেছি যে, ওয়াক্ফের মূল বৈশিষ্ট্য হলো স্থায়ীত্ব। এজন্য সাধারণ নিয়মানুযায়ী এমন বস্তুরই ওয়াক্ফ শুদ্ধ হতে পারে যা স্থায়ীভাবে বাকি থাকে। পক্ষান্তরে মুদ্রা বা স্থানান্তরশীল সম্পদ কোনো স্থায়ী সম্পদ নয়। তাই মৌলিকভাবে এ সকল সম্পদ ওয়াক্ফের আওতায় না আসলেও ওয়াক্ফের বিষয়টি যেহেতু উরফের সাথেও সম্পৃক্ত, তাই উরফের দিকে লক্ষ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব সম্পদ ওয়াক্ফ হিসেবে রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে কিছু সাহাবীর নিজের যুদ্ধাস্ত্র ওয়াক্ফ করার নযিরও বিদ্যমান রয়েছে, যা একটি স্থানান্তরশীল সম্পদ।

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. উরফের কারণে এ ধরনের কিছু সম্পদের ক্ষেত্রে ওয়াক্ফ জায়েয হওয়ার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

---

[৮৫৯] আল ইস'আফ: ৫৩

[৮৬০] আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৫৮৩-৫৮৫, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح" ومعناه وقفه في سبيل الله، وأبو يوسف معه فيه على ما قالوا، وهو استحسان. والقياس أن لا يجوز لما بيناه من قبل. وجه الاستحسان الآثار المشهورة فيه: منها قوله عليه الصلاة والسلام: "وأما خالد فقد حبس أدرعا وأفراسا له في سبيل الله تعالى وطلحة حبس دروعه في سبيل الله تعالى"[৮৬১] ويروى أكراعه. والكراع: الخيل.[৮৬২] ويدخل في حكمه الإبل؛ لأن العرب يجاهدون عليها، وكذا السلاح يحمل عليها وعن محمد أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس والمر والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. وعند أبي يوسف لا يجوز؛ لأن القياس إنما يترك بالنص، والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه. ومحمد يقول: القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع، وقد وجد التعامل في هذه الأشياء. وعن نصير بن يحيى أنه وقف كتبه إلحاقا بالمصحف، وهذا صحيح لأن كل واحد يمسك للدين تعليما وتعلما وقراءة، وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد، وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه.

“ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন, ঘোড়া এবং অস্ত্র আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করা জায়েয আছে। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.ও তাঁর সাথে একমত। এটা ইস্তিহসানের ভিত্তিতে। কিয়াসের দাবি হলো জায়েয না হওয়া। কারণ পূর্বে বলা হয়েছে যে, স্থানান্তরশীল বস্তুর ওয়াক্ফ সহীহ নয়। এখানে ইস্তিহসানের ভিত্তি হলো এ ব্যাপারে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস। রাসূল ﷺ খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. সম্পর্কে বলেন, খালেদ তাঁর বর্ম ও ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করেছে এবং তালহাও তাঁর বর্ম আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে রেখেছে।....

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকে বর্ণিত আছে, যেসব স্থানান্তরশীল বস্তু ওয়াক্ফ করার প্রচলন রয়েছে, সেগুলো ওয়াক্ফ করা জায়েয। যেমন, কুড়াল, কোদাল, করাত, খাটিয়া, খাটিয়ার কাপড়, বড় পাত্র, কড়াই, মুসহাফ (কুরআন শরীফ)। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর নিকট এগুলো ওয়াক্ফ করা জায়েয নয়। কারণ, যেখানে নস পাওয়া যাবে, শুধু সেখানেই কিয়াস ছেড়ে দেয়া হয়। আর এক্ষেত্রে নস শুধুমাত্র ঘোড়া এবং অস্ত্রের ব্যাপারে পাওয়া যায়। সুতরাং তাতেই ওয়াক্ফ

---

[৮৬১] সহীহ বুখারী (باب العرض في الزكاة), মুসনাদে আহমদ: ৮২৮৩, সুনানু আবী দাউদ: ১২২৩

[৮৬২] আল্লামা জামালুদ্দীন যাইলাঈ রাহ. বলেন:

الحديث الثالث : قال عليه السلام : { وأما خالد فقد حبس أدرعا في سبيل الله }; قلت : أخرجه البخاري ، ومسلم في "الزكاة" عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : { بعث النبي ﷺ عمر بن الخطاب على الصدقة ، فمنع ابن جميل ، وخالد بن الوليد، والعباس، فقال رسول الله ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ; وأما خالد ، فإنكم تظلمون خالدا ، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس عم رسول الله ﷺ فهي علي ، ومثلها ، ثم قال : أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟، }انتهى.

وأخرج الطبراني في "معجمه" عن ابن المبارك ثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل ، قال : لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة ، قال : لقد طلبت القتل ، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي ، وما من عملي أرجى من : لا إله إلا الله ، وأنا مترس بها ، ثم قال : إذا أنا مت فانظروا سلاحي ، وفرسي ، فاجعلوه عدة في سبيل الله تعالى انتهى .

قوله : { وطلحة رضي الله عنه حبس دروعه في سبيل الله } ، ويروى أكراعه ; قلت : غريب جدا.

শুদ্ধ হওয়ার বিধান সীমাবদ্ধ থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন, নসের মতো উরফ বা প্রচলনের ভিত্তিতেও কিয়াসকে বাদ দেয়া হয়। যেমন, ইস্তিসনার ক্ষেত্রে হয়েছে। এমনিভাবে এ সকল বস্তুর ওয়াকফের প্রচলনও রয়েছে।....”[৮৬৩]

পরবর্তী ফকীহগণ নিজ নিজ যামানার উরফের প্রতি লক্ষ রেখে আরো ব্যাপকভাবে ফাতওয়া দিয়েছেন। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في الفتح: إن بعض المشايخ زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا جريان التعامل فيها.

“ইমাম মুহাম্মদ রাহ. দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন কিছু বস্তু উল্লেখ করেছেন যেগুলো ওয়াক্‌ফ করার প্রচলন তাঁর যামানায় ছিলো। ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন, এগুলো ছাড়াও কোনো কোনো মাশায়েখ আরো কিছু স্থানান্তরশীল বস্তু উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর প্রচলন তারা দেখেছেন।”[৮৬৪]

ইমাম যুফার রাহ. আরো ব্যাপক করেছেন। তিনি স্বাভাবিকভাবে মুদ্রার ওয়াক্‌ফকে অনুমোদন করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার রাহ.-এর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম অন্যান্য স্থানান্তরশীল সম্পদকে ওয়াক্‌ফের আওতায় এনেছেন। আল্লামা শামী রাহ. আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

ففي الخلاصة: وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل، قال: إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزا، وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم، أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز؟ ذلك قال: نعم قيل وكيف؟ قال يدفع الدراهم مضاربة، ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال أو يوزن يباع ويدفع ثمنه لمضاربة أو بضاعة، قال فعلى هذا القياس إذا وقف كرا من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم، ثم يؤخد منهم بعد الإدراك قدر القرض، ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل، يجب أن يكون جائزا قال ومثل هذا كثير في الري وناحية دوماوند اهـ.

وبهذا ظهر صحة ما ذكره المصنف من إلحاقها بالمنقول المتعارف على قول محمد المفتى به[৮৬৫] وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاك؛ ولأنه هو الذي قال بها ابتداء قال في النهر: ومقتضى ما مر عن محمد عدم جواز ذلك أي وقف الحنطة في الأقطار المصرية لعدم تعارفه بالكلية. نعم وقف الدراهم والدنانير تعورف في الديار الرومية. اهـ.[৮৬৬]

একই ধারাবহিকতায় মূল ওয়াক্‌ফের সাথে যুক্ত সম্পদকেও ওয়াক্‌ফের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন, মসজিদের জমিতে গাছ মসজিদের ওয়াক্‌ফ বলে পরিগণিত হয়।

আল্লামা আবু বকর খাসসাফ রাহ. বলেন-

---

[৮৬৩] আল হিদায়া: ২/৬৪০, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

[৮৬৪] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৫৮, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮৬৫] قال في الاختيار لتعليل المختار (٤٨/٣): والفتوى على قول محمد؛ لحاجة الناس، وتعاملهم بذلك.

[৮৬৬] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৫৮, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

قلت: وكذلك إن كان فيها نخل وشجر؟ قال: هو مثل البناء ويدخل ذلك في الوقف. ......قال: فإن كان فيها أثل أو غرب أو خلاف أو طرفاء أو غياض أو كان فيها أجمة فيها قصب؟ قال: ما كان من ذلك مما يقطع في سنة فهو للواقف وما كان من شجر يقطع في السنتين أو الثلاث فهو داخل في الوقف......قلت: فما تقول في شجر الورد والياسمين وشجر الحناء؟ قال: ما كان في ذلك من ورد وحمل فهو للواقف وأما الشجر فهو داخل في الوقف... [৮৬৭]

এমনিভাবে যদি ওয়াক্‌ফ করার সময় জমি ও জমির সাথে যুক্ত সম্পদসহ ওয়াক্‌ফ করে তাহলেও তা ওয়াক্‌ফের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেন-

"وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز" وكذا سائر آلات الحراسة لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود، وقد يثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف، ومحمد معه فيه، لأنه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده فلأن يجوز الوقف فيه تبعا أولى.[৮৬৮]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

... وذكر الناطفي: إذا قال بحقوقها تدخل في الوقف، وهذا أولى، خصوصا إذا زاد بجميع ما فيها ومنها، ولو وقف دارا بجميع ما فيها، وفيها حمامات يطرن أو بيتا وفيه كورات عسل يدخل الحمام والنحل تبعا للدار والعسل، كما لو وقف ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدواليب وآلات الحراثة اه ملخصا.[৮৬৯]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ওয়াক্‌ফকৃত বস্তুকে যতটুকু সম্ভব স্থায়ী রাখার চেষ্টা করতে হবে; বরং মুদ্রার ক্ষেত্রে অনেকে বলেছেন যে, তা স্থায়ী রাখা খুব স্বাভাবিক। কারণ, টাকা বা মুদ্রা নির্দিষ্ট করার দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং ওয়াক্‌ফিয়া টাকা কর্জ বা মুদারাবা হিসেবে ব্যবহার করতে থাকলে তা কাজেও লাগবে আবার বিলুপ্তও হবে না।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন তারাবুলুসী রাহ. বলেন-

وفى فتاوى الناطفى عن محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر رحمه الله أنه يجوز وقف الدراهم والطعام والمكيل والموزون فقيل له وكيف يصنع بالدراهم قال يدفعها مضاربة ويتصدع بالفضل وكذا يباع المكيل والموزون بالدراهم أو الدنانير ويدفع مضاربة ويتصدق بالفضل وقيل على هذا ينبغي أن يجوز إذا قال وقفت هذا الكر على أن يقرض لمن لا بذر له من الفقراء فيدفع إليهم ويبذرونه فإذا حصدوا يؤخذ ويقرض لغيرهم وهكذا دائما[৮৭০]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال نعم، قيل وكيف؟ قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه، وما يكال وما يوزن

---

[৮৬৭] আহকামুল আওকাফ: ২২২, [مطلب يدخل في الوقف الأرض البناء والشجر لا الزرع وثمرة الشجر]

[৮৬৮] আল হিদায়া: ২/৬৩৯, মাকতাবায়ে ইমলামিয়া

[৮৬৯] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৫৪, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮৭০] আল ইস'আফ: ২৬

يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة. قال: فعلى هذا القياس إذا وقف هذا الكر من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعوه لأنفسهم، ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض، ثم يقرض لغيرهم من الفقراء أبدا على هذا السبيل يجب أن يكون جائزا. قال: ومثل هذا كثير في الري وناحية دنباوند،[৮৭১]

তবে বর্তমানে আমানতদারীর অভাবের কারণে ওয়াক্ফিয়া সম্পদ কর্জ বা মুদারাবা হিসেবে প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।
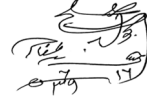
বি. দ্র.: এ সকল বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন এ ধরনের সম্পদ ওয়াক্ফের নিয়তে দান করা হবে। যদি ওয়াক্ফের নিয়ত না থাকে; বরং শুধু দান হিসেবে দেয়, তাহলে যে খাতে দান করবে, সে খাত তার অধিকারী হবে।[৮৭২]

সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৬ জুমাদাল আখেরাহ ১৪৩৯ হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১৫ জুমাদাল আখেরাহ ১৪৩৯ হি.

---

[৮৭১] ফাতহুল কাদীর: ৬/২০৩, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৮৭২] ইমদাদুল আহকাম ৩/১৮৯, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়্যাহ

মসজিদের ওয়াক্‌ফ : কিছু মৌলিক বিধান

মাওলানা ফাহিমুদ্দীন মাসুম, হাটহাজারী

ওয়াক্‌ফের বিশেষ একটি প্রকার হলো শর'য়ী মসজিদ। ইসলামে মসজিদ থেকেই ওয়াক্‌ফের সূচনা হয়েছে। মসজিদের বিশেষ প্রকৃতি ও আলাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে কিছু কিছু বিধানের ক্ষেত্রে সাধারণ ওয়াক্‌ফ ও মসজিদের মাঝে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

পূর্বের প্রবন্ধে সাধারণ ওয়াক্‌ফের কিছু মৌলিক আহকাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা মসজিদের ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত কিছু মৌলিক বিষয় ও বিধান সম্পর্কে অবগতি লাভ করবো ইনশাআল্লাহ।

মসজিদের স্বকীয়তা ও বিশেষ আহকাম

ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন ও হাদীসে মসজিদের স্থানকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে। শর'য়ী মসজিদ হওয়ার জন্য শরী'আতে জমি ওয়াক্‌ফিয়া হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। মসজিদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

ক. আল্লাহ তা'আলা মসজিদকে নিজের দিকে নিসবাত ও সম্বন্ধ করেছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾

"এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না।"[৮৭৩]

সাধারণ ওয়াক্‌ফকে আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় ধরা হয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে।[৮৭৪] আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো নস (ভাষ্য) পাওয়া যায় না। কিন্তু মসজিদের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই নিজের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য, এদিক থেকে মসজিদের ওয়াক্‌ফ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

খ. পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে, মসজিদ আল্লাহর জন্য, আর মসজিদ থেকে বাধা দেয়ার অধিকার কারও নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ وَسَعَىٰ فِى خَرَابِهَآ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَآئِفِينَ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

"সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর নাম নিতে বাধা প্রদান করে এবং তাকে বিরান করার চেষ্টা করে? এরূপ লোকের তো ভীত-বিহ্বল না হয়ে তাতে প্রবেশ করাই সঙ্গত নয়। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে রয়েছে

---

[৮৭৩] সূরা জ্বিন: ১৮

[৮৭৪] বিস্তারিত দেখুন পূর্বের প্রবন্ধ: 'ওয়াক্‌ফ: কিছু মৌলিক ও জরুরী আহকাম'

মহাশাস্তি।"[৮৭৫]

গ. হাদীসে মসজিদকে আল্লাহর ঘর আখ্যা দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

المساجد بيوت الله في الارض، تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الارض .

"পৃথিবীতে মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর। তা আসমানবাসীদের আলো দান করে, যেমনিভাবে তারকারাজি পৃথিবীর অধিবাসীদের আলো দান করে।"[৮৭৬]

এছাড়াও রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম মসজিদের প্রতি যে গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তা থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, কোনো জমি একবার মসজিদ হয়ে গেলে তার মর্যাদা ও সম্মান সারা পৃথিবীর অন্যান্য জমি থেকে ভিন্ন হয়ে যায় এবং সাধারণ ওয়াক্ফিয়া জমি ও মসজিদের ওয়াক্ফিয়া জমির মাঝে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তাই অনেক বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম মসজিদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ওয়াক্ফ থেকে ভিন্ন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মসজিদের জন্য ওয়াক্ফিয়া জমি দু'ধরনের:

ক. মসজিদদের জন্য ওয়াক্ফ করার পর উক্ত জমিতে নামাযও আদায় করা হয়েছে।

খ. মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে; তবে সেখানে এখনো নামায আদায় করা হয়নি।

উভয় প্রকারের ক্ষেত্রে মসজিদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আরোপিত হলেও প্রথম প্রকার তথা যেখানে নামায আদায় করা হয়েছে তার গুরুত্ব তুলনামূলক বেশি।

মসজিদের জমির কিছু বিশেষ আহকাম

১. মসজিদের জন্য যৌথ সম্পত্তির ওয়াক্ফ শুদ্ধ হয় না

মসজিদ যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, তাই মসজিদের জমিতে কারো অংশীদারিত্বের অবকাশ নেই। সুতরাং শরীকী জমি বন্টনের পূর্বেই কোনো একজনের অংশে মসজিদ বানালে তা শর'য়ী মসজিদ হবে না। কারণ ঐ অংশে এখনো অন্যের মালিকানা রয়েছে। আল্লামা শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) বলেন-

فأما المسجد والمقبرة لاتتم مع الشيوع فيما لايحتمل القسمة، لأن بقاء الشركة يمنع أن تكون البقعة لله تعالى خالصا.

"বন্টনযোগ্য নয় এমন শরীকী জমিতে মসজিদ এবং কবরস্থানের ওয়াক্ফ হয় না; কেননা অংশীদারিত্ব ভূখণ্ডকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে।"[৮৭৭]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. (৯৭০ হি.) বলেন-

والحاصل أن وقف المشاع مسجدا أو مقبرة غير جائز مطلقا اتفاقا، وفي غيرهما إن كان مما لا يحتمل

---

[৮৭৫] সূরা বাকারা: ১১৪

[৮৭৬] আল মু'জামুল কাবীর লিত তাবরানী: ১০/২৬২, হাদীস নং ১০৬০৪৮, দারু ইয়াহইয়াইত তুরাস আল আরাবী। নুরুদ্দীন হাইসামি রাহ. (৮০৭ হি.) বলেন: رجاله موثقون (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/৮)

[৮৭৭] আল মাবসূত: ১২/৪১

القسمة جاز اتفاقا.

"মোটকথা, শরীকী জমি মসজিদ অথবা কবরস্থানের জন্য ওয়াক্ফ করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। তবে এ দু'টি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বন্টন অযোগ্য শরীকী জমি ওয়াক্ফ করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।"[৮৭৮]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২ হি.) বলেন-

ويصح أن يراد بالفعل الإفراز، ويكون بيانا للشرط المتفق عليه عند الكل كما قدمناه من أن المسجد لو كان مشاعا لا يصح إجماعا....

"....মসজিদের জমি যৌথ হলে তার ওয়াক্ফ সহীহ হয় না...."[৮৭৯]

পক্ষান্তরে সাধারণ ওয়াক্ফ যৌথ জমিতেও হতে পারে। যদিওবা তা আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় বলে বিবেচিত হয়; তথাপি মসজিদের বিশেষত্বের কারণে এ বিধানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা হয়েছে।

২. মসজিদের ওয়াক্ফে খিয়ারে শর্তের অনুমতি নেই

সাধারণ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ফকীহ তিন দিনের জন্য খিয়ারের শর্ত করার সুযোগ আছে বলে মত প্রদান করেছেন; কিন্তু মসজিদের ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে হানাফী ফকীহদের ঐকমত্যে এ ধরনের খিয়ারের শর্ত করা যায় না।[৮৮০]

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ মাওসিলী রাহ. (৬৮৩ হি.) বলেন-

قال الله -تعالى-: ﴿وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ﴾ [الجن: ١٨] أضافها إلى نفسه إضافة اختصاص كالكعبة، ولهذا لا يصح فيه شرط الخيار ولا تعيينه الإمام ولا من يصلي فيه، بخلاف غير المساجد ...

"আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 'মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য'। আল্লাহ তা'আলা মসজিদসমূহকে নিজের দিকে কা'বার মতো বিশেষভাবে সম্বন্ধ করেছেন। এজন্যই মসজিদ ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে খিয়ারের শর্ত করা, নির্দিষ্ট ইমাম অথবা নির্দিষ্ট মুসল্লী নির্ধারণের শর্ত করার সুযোগ নেই। অন্যান্য ওয়াক্ফ এর ব্যতিক্রম....।"[৮৮১]

৩. ওয়াক্ফকারীর শর্তাধিকারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে

ওয়াক্ফকারী মসজিদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট ব্যক্তি, গ্রাম, এলাকা বা মুসল্লীর শর্তারোপ করতে পারবে না। এমন শর্ত করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এককথায়, মসজিদের ব্যাপারে শর্ত করার ক্ষেত্রে ওয়াক্ফকারীর জন্য অন্যান্য ওয়াক্ফের মতো পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। পূর্বে এ ব্যাপারে আল্লামা মাওসিলী রাহ.-এর ভাষ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আবু বকর খাস্সাফ রাহ. (২৬১ হি.) সাধারণ ওয়াক্ফ ও মসজিদের ওয়াক্ফের মাঝে পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

---

[৮৭৮] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৩২৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৮৭৯] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৪৬-৫৪৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮৮০] আল মাবসূত: ১২/৪২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[৮৮১] আল ইখতিয়ার: ৩/৬০, দারুল হাদীস কায়রো

قلت: أرأيت رجلا جعل داره مسجدا وبناه، وأشهد على ذلك على أن له إبطاله أو على أن له أن يبيعه؟ قال: اشتراطه هذا في المسجد باطل، لايجوز. قلت: فما الفرق بين المسجد وبين الوقف، وكلاهما إنما يطلب بهما ما عند الله تعالى؟ قال: ألا ترى الوقوف أن الشروط فيها جائزة، وعلى هذا جرى الأمر فيها على أن له أن يدخل فيها من رأى ويخرج من شاء ويزيد من شاء وينقص من شاء، وتكون وقفا على قوم عشر سنين ثم تكون بعد العشر سنين وقفا على قوم آخرين، أن هذا كله جائزة في الوقف، وأن المساجد ليست على هذا، ولو أن رجلا بنى مسجدا لأهل محلة وقال: قد جعلته لأهل هذه المحلة خاصة، كان لمن جاء من المسلمين من غير أهل تلك المحلة أن يصلي فيه، فالاشتراط في المساجد لم يجوّزه أحد، فهذا الفرق بينهما.

"... (বর্ণনাকারী বলেন) আমি বললাম: তাহলে মসজিদের ওয়াক্‌ফ এবং অন্যান্য সাধারণ ওয়াক্‌ফের মাঝে পার্থক্য কী, অথচ উভয় ওয়াক্‌ফ দ্বারাই আল্লাহর নিকট প্রতিদান উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, দেখ, সাধারণ ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শর্তারোপ করা যায়। এভাবেই তা'আমুল চলে আসছে যে, ওয়াক্‌ফকারী তাতে বিভিন্ন ধরনের হস্তক্ষেপের শর্ত করতে পারে। যেমন, কাউকে বাদ দেয়া, কারো জন্য বেশি অংশ নির্ধারণ করা, কারো জন্য কম অংশ নির্ধারণ করা এবং কোনো সম্প্রদায়ের জন্য দশ বছর ওয়াক্‌ফ হবে, আবার দশ বছর পর অন্য সম্প্রদায়ের জন্য ওয়াক্‌ফ হবে ইত্যাদি। এ সকল বিষয়াদি সাধারণ ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে বৈধ। তবে মসজিদের ওয়াক্‌ফ এরকম নয়। যদি কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো মহল্লাবাসীর জন্য মসজিদ তৈরী করে এবং এ কথা বলে যে, আমি এই মহল্লার মানুষের জন্য বিশেষভাবে এই মসজিদ তৈরী করেছি, তাহলে অন্য মহল্লা বা গ্রাম থেকে আগন্তুক যেকোনো মুসলমানও তাতে নামায আদায় করতে পারবে। সুতরাং মসজিদের ক্ষেত্রে শর্ত করার অনুমতি কেউ দেয়নি। আর এটাই হলো মসজিদের ওয়াক্‌ফ এবং সাধারণ ওয়াক্‌ফের মাঝে পার্থক্য।"[৮৮২]

৪. মসজিদ যমিন থেকে আসমান পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়ে যায়

মসজিদের বিশেষ গুরুত্ব ও সম্মান সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। মসজিদ আল্লাহর ঘর। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সর্বপ্রথম ঘর কা'বা শরীফ। কা'বা হলো আমাদের নামাযের কেবলা। কা'বা সম্পর্কে সকল ফকীহ একমত যে, এর ভিত্তি থেকে আসমান পর্যন্ত পুরোটাই কেবলা, পুরোটাই সম্মানিত ও আল্লাহর ঘর হিসেবে বিবেচিত হয়। ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. (৫৯৩ হি.) বলেন-

لأن الكعبة هي العرصة والهواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء لأنه ينقل، ألا ترى أنه لو صلى على جبل أبي قبيس جاز، ولا بناء بين يديه، إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظيم، وقد ورد النهي عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

"মূলত কা'বা (যা নামাযের কেবলা তা) হলো- ঘরের স্থান ও তার উপরের শূন্য; ঘরটি নয়। কারণ, এই ঘর স্থানান্তর করা যায়। এজন্য কোনো ব্যক্তি যদি আবু কায়স পাহাড়ে নামায আদায় করে, তাহলেও তার নামায আদায় হয়ে যাবে। অথচ তার সামনে কা'বা ঘর নেই।

[৮৮২] আহকামুল আওকাফ লিল্ খাস্‌সাফ: ১১০-১১১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

তবে তা মাকরূহ হবে; কারণ এতে কা'বার সম্মান রক্ষা হয় না। আর রাসূল ﷺ তা থেকে নিষেধ করেছেন।"[৮৮৩]

এর ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, পৃথিবীর সকল মসজিদের ক্ষেত্রেও এমনই বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ মসজিদের ভূমি থেকে আসমান পর্যন্ত পুরোটাই মসজিদ বলে বিবেচিত হবে।[৮৮৪] আল্লামা ফখরুদ্দীন যাইলায়ী রাহ. (৭৪৩ হি.) এ বিষয়ে আরো কিছু কারণ ও নযির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

لأن سطح المسجد مسجد إلى عنان السماء، ولهذا يصح اقتداء من بسطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام، ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه، ولا يحل للجنب والحائض والنفساء الوقوف عليه.

"মসজিদের ছাদও আসমান পর্যন্ত মসজিদ। এজন্য কোনো ব্যক্তি যদি মসজিদের ছাদ থেকে মসজিদের ভিতরের কোনো ব্যক্তির ইকতেদা করে, তাহলে তার ইকতেদা সহীহ হবে, যদি সে ইমামের আগে না দাঁড়ায়। এছাড়াও মসজিদের ছাদে উঠার দ্বারা ইতিকাফ ভঙ্গ হয় না এবং জুনুবী, হায়েযা, নেফাসগ্রস্তা মহিলাদের জন্য মসজিদের ছাদে অবস্থান করা বৈধ নয়।"[৮৮৫]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. (৮৬১ হি.) বলেন-

لأن سطح المسجد له حكمه إلى عنان السماء.

"মসজিদের ছাদের হুকুম আসমান পর্যন্ত মসজিদের মতই।"[৮৮৬]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. (১০৮৮ হি.) বলেন-

لأنه مسجد إلى عنان السماء.

"মসজিদের উপরের অংশও আসমান পর্যন্ত মসজিদ।"[৮৮৭]

আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

وكذا إلى تحت الثرى كما في البيري عن الأسبيجابي.

"এমনিভাবে (উপরের মতো) যমীনের নিম্নস্তর পর্যন্ত মসজিদের হুকুমে হবে। যেমনটি আল্লামা বীরী আল্লামা আসবীজাবী রাহ-এর উদ্ধৃতিতে বলেছেন।"[৮৮৮]

তবে মসজিদের নিম্নাংশকে অযু, গোসল বা মসজিদের অন্য কোনো কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।[৮৮৯] ইসলামের প্রথম কেবলা মসজিদুল আকসাতে এমন ব্যবস্থাপনা

---

[৮৮৩] আল হিদায়া: ১/১৮৫, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, (باب الصلاة في الكعبة)

[৮৮৪] মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ হলেই উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে ওয়াক্ফের সময়ই যদি উক্ত জমির কোনো অংশ বা তার উপর নির্মিত ভবনের কোনো অংশ মসজিদের সংশ্লিষ্ট কোনো কাজের জন্য ব্যবহারের নিয়ত করা হয়, তাহলে তার সুযোগ রয়েছে। বিস্তারিত সামনে আসছে।

[৮৮৫] তাবয়ীনুল হাকায়েক: ১/৪১৯, এইচ. এম. সাঈদ

[৮৮৬] ফাতহুল কাদীর: ১/৪৩৪, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[৮৮৭] আদ্দুররুল মুখতার: ২-৫১৬, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৮৮৮] রদ্দুল মুহতার: ২/৫১৭, মাকতাবাতুল আযাহার, ঢাকা

[৮৮৯] অর্থাৎ, মসজিদ নির্মাণের সময়ই যদি তার নিয়ত করে থাকে। বিস্তারিত সামনে হযরত থানভী রাহ.-এর ইবারতে আসছে।

ছিলো। খুলাফায়ে রাশেদীন তা সমর্থন করেছেন এবং এর ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরামও ফাতওয়া দিয়েছেন।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق، وعزله عن ملكه فله أن يبيعه، وإن مات يورث عنه؛ لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به، ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس.

"যদি কেউ এমন স্থানকে মসজিদ বানায় যার নিচে পতালকুঠরী অথবা উপরে বাসস্থান আছে, তাহলে সাধারণ রাস্তার দিকে মসজিদের দরজা খুলে দিলে এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের মালিকানা থেকে বের করে দিলেও ঐ ব্যক্তির জন্য সেই স্থান বিক্রয় করার অধিকার রয়েছে এবং সে যদি মারা যায় তাহলে তার ওয়ারিছরা তা মিরাছ হিসেবে পাবে। কারণ, তাতে বান্দার হক সম্পৃক্ত থাকায় নিরঙ্কুশভাবে তা আল্লাহর জন্য হয়নি (এজন্য মসজিদও হয়নি)। তবে যদি মসজিদের নিচের ঘর নামায ছাড়া মসজিদের কোনো কাজের জন্য ওয়াক্ফ হয়, তাহলে উক্ত মসজিদের ওয়াক্ফ সহীহ হবে। যেমন, বাইতুল মাকদিস মসজিদে আছে।"[৮৯০]

আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রাহ. (১৩৬৩ হি.) উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্নে সংশ্লিষ্ট অংশ তুলে ধরা হলো-

قوله... (مسئلہ) اگر کوئی مسجد ایسی بنادی جائے کہ نیچے دکانیں یا تہہ خانے وغیرہ بنالے۔

اقول: اس باب میں تتبع وتفحص بالغ روایات فقہیہ کے جو میں سمجھا ہوں وہ معروض ہے:

(۱) ... ماخذ اس مسئلہ کا بیت المقدس کے سرادیپ ہیں جن پر خیر القرون میں کسی نے نکیر نہیں کیا، اس سے سمجھا گیا کہ مصالح مسجد کے لئے دوسرا درجہ جو بناء میں مسجد کے تابع ہو مشروع ہے۔

(۲) یہ حکم تعبدی نہیں بلکہ اشتراک علّتِ تبعیت قیاسا متعدی ہو سکتا ہے۔

(۳) ...اگر مصالح ویسے ہی ہوں جو سرادیپ مذکورہ سے متعلق ہوں اور تبعیت کی وہی ہیئت جو ان سرادیپ میں ہے، تب تو قیاس یہی ہے اور اگر مصالح دوسری قسم کے ہوں جیسے وقف بالاستقلال للمسجد یا ہیئت تبعیت دوسری طور کی ہو جیسے مسجد کا علو پر ہونا یا مسجد پر علو کا ہونا، اس کا الحاق خفی ہے، چنانچہ بہت روز تک مجھ کو اس میں تردد رہا، لیکن شامی نے کتاب الوقف میں اسعاف سے ایک عبارت نقل کی ہے۔

واذا كان السراديب أو العلو لمصالح المسجد أو كان وقفا عليه صار مسجدا. شرنبلالية.

اس میں أو كان وقفا عليه کا عطف كان لمصالح المسجد پر ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ استقلال للمسجد کا حکم بھی یہی ہے، خواہ اس کا نام مصالح مسجد رکھا جائے خواہ فی حکم مصالح المسجد رکھا جائے، بہر حال حکم مشترک ہے، اور ہدایہ میں ہے

---

[৮৯০] আল হিদায়া: ২/৬৪৪, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ

:

وروى الحسن عنه (أي ابى حنيفة) أنه إذا جعل السفل مسجدا و على ظهره مسكن فهو مسجد... وعن محمد على عكس هذا (أى جعل العلو مسجدا يصح ١٢)، ... وعن أبي يوسف أنه جوز في الوجهين.... و عن محمد أنه حين دخل الري أجاز ذلك كله لما قلنا (من الضرورة اه) ملخصا

اس سے ظاہر ہے کہ یہ سب ہیئتیں تبعیت کی مقیس علیہ کے ساتھ ملحق ہیں۔

(۴)... یہ الحاق بالقیاس بضرورت ہے، چنانچہ ہدایہ کی مذکورہ عبارت میں ضرورت کا بناء الحاق ہونا مصرح ہے۔

(۵)... اس دوسرے درجہ کی بناء مشروط ہے اس کے ساتھ کہ کی مسجدیت کے قبل بانی کی نیت اس بناء کی ہو، ورنہ بعد تمامیت مسجد کے ایسا کوئی تصرف جائز نہیں۔

(۶) ...فقہاء نے جو مسجد کو عنان سماء وتحت الثری تک مسجد کہا ہے یہ تقیید ہے اس صورت کے ساتھ جب کہ بناء مسجد کے وقت دوسرے درجہ فوقانی یا تحتانی کے بنانے کی نیت نہ ہو۔

(۷) ... ونبهت عليه لغفلة كثير من الناس عنه حتى المنسوبين إلى العلم. ان سب احکام میں فناء مسجد بھی یعنی حصہ متعلقہ مسجد ہی کے حکم میں ہے۔

في البحر الرائق في المجتبى لا يجوز لقيم المسجد أن يبني حوانيت في حد المسجد أو فنائه. (٢٦٩/٨).

"...মাসআলা: যদি কোনো মসজিদ এমন নির্মাণ করা হয় যার নিচে দোকান অথবা ভূগর্ভস্থ ঘর আছে...

সংযোজন: এই অধ্যায়ে ফিকহী রিওয়ায়াতসমূহ অনুসন্ধান এবং অধ্যয়ন করার পর আমার যা বুঝে এসেছে তা নিম্নে পেশ করা হলো-

১. ...এই মাসআলার মূল ভিত্তি হলো বাইতুল মাকদিসের সিরদাপ বা ভূগর্ভস্থ কক্ষ। যার ব্যাপারে খাইরুল কুরুনের কেউ আপত্তি করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদের কল্যাণ কর্মের জন্য মসজিদের অনুগত ভবনের কোনো তলাকে রাখার অনুমতি শরী'আতে রয়েছে।

২. এই হুকুম তা'আব্বুদী নয়; বরং ইল্লাতের ভিত্তিতে কিয়াস করে অন্যত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩. ...যদি খাত এবং অনুগত হওয়ার ধরন ঐ রকম হয় যা বাইতুল মাকদিসের সিরদাপের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে তো কিয়াস এটাই হবে।

আর যদি **খাত ভিন্ন ধরনের হয়,** যেমন, সরাসরি মসজিদের কোনো কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ না করে শুধু মসজিদের ওয়াক্‌ফের (উন্নয়নের) জন্য রাখা হলো, অথবা যদি **ঘরটি মসজিদের অনুগত হওয়ার** ধরন ভিন্ন হয়, যেমন, মসজিদের উপরে ঘর, তাহলে এটাকে উপরোক্ত সিরদাপ (আন্ডারগ্রাউন্ড) উপর কিয়াস করা সূক্ষ্ম বিষয়। অনেক দিন পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম; কিন্তু আল্লামা শামী রাহ. ইস'আফ থেকে একটি নস উল্লেখ করেছেন যে, 'যদি সিরদাপ অথবা উপরতলা মসজিদের কাজের জন্য বা মসজিদের (খরচ ও উন্নয়নের) জন্য ওয়াক্‌ফ হয়,

তাহলে তা শর'য়ী মসজিদ হিসেবে বিবেচিত হবে।' (শুরুম্বুলালী)। এই ইবারত থেকে বুঝে আসে যে, মসজিদের (খরচ ও উন্নয়নের) জন্য ওয়াক্‌ফ করার হুকুমও একই (অর্থাৎ মসজিদের সংশ্লিষ্ট কোনো কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করার মতোই)। চাই একে 'মসজিদের কল্যাণে' অথবা 'মসজিদের কল্যাণের হুকুমে' যাই বলা হোক। মোটকথা, এর হুকুম একই। 'হিদায়া'তে উল্লেখ আছে- ইমাম হাসান রাহ. ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে বর্ণনা করেন, যদি ঘরের নিচ তলাকে মসজিদ বানানো হয়, তাহলে তা শর'য়ী মসজিদ হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকে বর্ণিত আছে এর বিপরীত। অর্থাৎ, উপরের অংশ মসজিদ বানানো সহীহ হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি উভয় পদ্ধতিরই অনুমতি দেন। ইমাম মুহাম্মদ রাহ.ও যখন রায়' নামক এলাকায় প্রবেশ করলেন তখন প্রয়োজনের ভিত্তিতে সব পদ্ধতির অনুমতি দিয়েছেন।

এখান থেকে স্পষ্ট যে, এই সমস্ত সূরত বাইতুল মাকদিসের সিরদাপের উপর "মসজিদের অনুগত ওয়াক্‌ফ" হওয়ার ভিত্তিতে কিয়াস করা হয়েছে।

৪. তবে এ কিয়াস শর'য়ী জরুরতের ভিত্তিতে করা হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত হিদায়ার ইবারতে এই কিয়াস শর'য়ী জরুরতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. অন্য তলা মসজিদ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য বরাদ্দের শর্ত হলো, মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফের পূর্বেই তার নিয়ত থাকতে হবে। অন্যথায় মসজিদ নির্মাণ হওয়ার পর তাতে এই ধরনের কোনো হস্তক্ষেপ জায়েয হবে না।

৬. ...ফুকাহায়ে কেরাম মসজিদকে আসমান থেকে মাটির নিচ পর্যন্ত মসজিদের হুকুমে বলেছেন। এটা ঐ সূরতের সাথে সম্পৃক্ত, যখন মসজিদ বানানোর সময়ই মসজিদের উপরে অথবা নিচে কোনো কিছু বানানোর নিয়ত না করবে।

৭. ...আমি অনেকের এমনকি অনেক আহলে ইলমের উদাসীনতার কারণে এ ব্যাপারে সতর্ক করলাম। মসজিদের আঙ্গিনা অর্থাৎ মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত অংশও মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল বাহরুর রায়িক-এ, মুজতাবা গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ আছে- মসজিদের দায়িত্বশীলের জন্য মসজিদের সীমানায় অথবা **আঙ্গিনায়** দোকান বানানো জায়েয হবে না।"[৮৯১]

এমনিভাবে ব্যাপক প্রয়োজন ও সমস্যা, অর্থাৎ, আবাসস্থলের সংকট এবং মসজিদের জন্য আলাদা জমি পাওয়া দুষ্কর হওয়ার কারণে মসজিদের উপর সাধারণ ঘর বা অন্য কোনো প্রকল্প (যা ওয়াক্‌ফ নয়) করা যেতে পারে। ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে ইমাম হাসান রাহ.-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী ওয়াক্‌ফের সময় নিচতলাকে মসজিদের জন্য এবং উপরতলাকে আবাসস্থলের জন্য নির্দিষ্ট করলে নিচতলা শর'য়ী মসজিদ হবে। আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

وروى الحسن عنه أنه قال: إذا جعل السفل مسجدا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد؛ لأن المسجد مما

[৮৯১] যমীমায়ে আদাবুল মাসজিদ (মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহ.-এর 'আদাবুল মাসজিদ'-এর সাথে হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ.-এর সংযোজন), জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/১৩৪-১৩৫, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ

يتأبد....

"ইমাম হাসান রাহ. ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে বর্ণনা করেন, যদি কেউ নিচের অংশে মসজিদ বানায়, আর উপরের অংশে আবাসস্থল তৈরী করে, তাহলেও তা মসজিদ হিসেবেই বিবেচিত হবে। কেননা এক্ষেত্রে মসজিদকে স্থায়ীভাবে রাখা যেতে পারে...।"[৮৯২]

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ. পরবর্তীতে মানুষের প্রয়োজনের অবস্থা দেখে মসজিদের উপরে প্রয়োজনে ঘর বা অন্য কোনো প্রকল্প (যা ওয়াক্‌ফকৃত নয়) বৈধ হওয়ার কথা বলেছেন। আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

وعن أبي يوسف أنه جوز في الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة. وعن محمد أنه حين دخل الري أجاز ذلك كله لما قلنا.

"ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি যখন বাগদাদে আগমন করলেন এবং বাসস্থানের সংকীর্ণতা দেখলেন, তখন মসজিদের উপরে এবং নিচে বাসস্থানের ব্যবস্থার অনুমতি দিয়েছিলেন। আসলে তিনি জরুরত তথা ব্যাপক সমস্যার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি যখন 'রায়' নামক এলাকায় আগমন করলেন তখন তিনিও উপরে-নীচে জরুরতের কারণে সাধারণ বাসস্থান রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন।"[৮৯৩]

বিশেষ করে বর্তমানে নির্মিত টাওয়ারের ফ্ল্যাটগুলো সর্বদিক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। হকের ক্ষেত্রে নিচের ফ্ল্যাটের সাথে উপরের ফ্ল্যাটের কোনো সম্পর্ক থাকে না। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

৫. মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা বিক্রয় বা পরিবর্তন করা যায় না

মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য পুরোপুরি উৎসর্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই এই জায়গাকে বিক্রয় বা পরিবর্তন করার কোনো অবকাশ নেই। একই মহল্লায় যদি নতুন মসজিদ বানানো হয় এবং পূর্বের মসজিদের প্রয়োজন না থাকে, তাহলেও পূর্বের মসজিদটি বহাল তবিয়তে সংরক্ষণ করা ইসলামী সরকার ও মুসলিম জনগণের উপর অপরিহার্য কর্তব্য।

ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেন-

(ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه) لأنه يحرز عن حق العباد وصار خالصا لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى، وإذا أسقط العبد ما ثبت من الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق.

"কেউ তার জমিতে মসজিদ নির্মাণ করলে সে আর তা প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং উক্ত জমিকে বিক্রয় ও করতে পারবে না এবং সে মারা গেলে তার ওয়ারিছরা তা মিরাছ হিসেবেও পাবে না। কেননা তা বান্দার হক থেকে বের হয়ে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য হয়ে

[৮৯২] আল হিদায়াঃ ২/৬৪৪, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ

[৮৯৩] আল হিদায়াঃ ২/৬৪৪-৬৪৫, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ

গেছে। সমস্ত বস্তুই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার মালিকানাধীন। মানুষ সাময়িকভাবে এতে অধিকার লাভ করে। যখন সে তার এ অধিকার প্রত্যাহার করে নেয়, তখন তা আপন অবস্থায় (আল্লাহর মালিকানায়) ফিরে যায় এবং এতে তাসাররুফের কোনো অধিকার তার জন্য বাকি থাকে না। যেমনটি গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।"[৮৯৪]

মসজিদের মহল্লাবাসি যদি এলাকা ছেড়ে চলে যায় এবং মসজিদ অরক্ষিতভাবে পড়ে থাকে, তাহলে তার বিধান কী হবে- এ বিষয়ে আমাদের ফকীহদের থেকে দু'ধরনের মত পাওয়া যায়। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মত হলো, তা মসজিদ হিসেবেই বাকি থাকবে। তাতে কোনো ধরনের পরিবর্তন বা স্থানান্তর করা যাবে না।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. (৫৯৩ হি.) বলেন-

ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه يبقى مسجدا عند أبي يوسف، لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه.

"যদি কোনো মসজিদের আশ-পাশের এলাকা বিরান হয়ে যায় এবং সেখানে মসজিদের প্রয়োজন না থাকে, তারপরও ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর নিকট তা মসজিদ হিসেবেই বাকি থাকবে। কারণ, ওয়াক্‌ফের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফকারী তার মালিকানা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সুতরাং তা আর ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করবে না।"[৮৯৫]

আল্লামা ফখরুদ্দীন যাইলায়ী রাহ. বলেন-

ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه يبقى مسجدا عند أبي يوسف لأنه إسقاط لملكه، فلا يعود إلى ملكه كالإعتاق، ألا ترى أن المسجد الحرام استغنى عنه أهله في زمن الفترة ولم يعد إلى ورثة الباني.

"যদি কোনো মসজিদের আশ-পাশের এলাকা বিরান হয়ে যায় এবং ঐ মসজিদের প্রয়োজন না থাকে, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর নিকট তা মসজিদ হিসেবে বাকি থাকবে। কেননা এক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফকারী তার মালিকানা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সুতরাং তা আর তার মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করবে না। যেমন, গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (আর এর নযিরও রয়েছে) যেমন, ফাতরাতের যামানায়[৮৯৬] মসজিদে হারামের বাসিন্দারা মসজিদে হারাম থেকে বিমুখ ছিলো। তারপরও তা তার নির্মাতার ওয়ারিছদের মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করেনি।"[৮৯৭]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. (৯৭০ হি.) বলেন-

... إذا خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر أو لخراب القرية أو لم يخرب لكن خربت القرية بنقل أهلها واستغنوا عنه...قال أبو يوسف هو مسجد أبدا إلى قيام الساعة، لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى كذا في الحاوي القدسي

---

[৮৯৪] আল হিদায়া: ২/৬৪৫, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ

[৮৯৫] আল হিদায়া: ২/৬৪৫, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ

[৮৯৬] الفترة শব্দের অর্থ, বিরতিকাল। পরিভাষায় হযরত ঈসা আ.-এর পর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নবুওয়তের বিরতিকালকে 'ফাতরাহ' বলা হয়।

[৮৯৭] তাবয়ীনুল হাকায়েক: ৪/২৭২-২৭৩, এইচ. এম. সাঈদ

وفي المجتبى. وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف. ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه.

"....যদি কোনো মসজিদ বিরান হয়ে যায় এবং তার এমন কোনো আমাদানি বাকি না থাকে যার দ্বারা তা সংরক্ষণ, নির্মাণ ও উন্নয়ন করা যাবে, আর লোকজনেরও ঐ মসজিদের প্রয়োজন বাকি না থাকে অন্য মসজিদ নির্মাণের কারণে অথবা গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে গ্রামবাসী অন্যত্র চলে যাওয়ার কারণে।....এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. বলেন, তা কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা মসজিদ হিসেবেই বাকি থাকবে। তা মিরাছ হিসেবে (ব্যক্তিগত মালিকানায়) প্রত্যাবর্তন করবে না এবং তা স্থানান্তর করা অথবা তার সামানাদি অন্য মসজিদে স্থানান্তর করা বৈধ হবে না। চাই মানুষ তাতে নামায আদায় করুক অথবা না করুক। এটাই ফাতওয়া, যেমনটি আল হাবীল কুদসী এবং মুজতাবা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। অধিকাংশ মাশায়েখগণ ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মতের উপর ফাতওয়া দিয়েছেন। ফাতহুল কাদীরে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মতকেই অগ্রগণ্য মত বলা হয়েছে।"[৮৯৮]

আল্লামা আবু বকর হাদ্দাদী রাহ. (৮০০ হি.) বলেন-

ولو خرب ما حول المسجد ولم يبق عنده أحد يبقى مسجدا أبدا عند أبي حنيفة إلى يوم القيامة؛ لأنه قد يصلي فيه المارة والمسافرون.

"যদি মসজিদের আশ-পাশ বিরান হয়ে যায় এবং তার নিকট কেউ বাকি না থাকে, তাহলেও ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর নিকটে তা কেয়ামত পর্যন্ত মসজিদ হিসেবেই বাকি থাকবে। কারণ, সেখানে পথিক এবং মুসাফিররা নামায আদায় করবে।"[৮৯৯]

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মত হলো, উপরোক্ত অবস্থায় মসজিদের জমি ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ মাওসিলী রাহ. বলেন-

ولو خرب ما حول المسجد وتفرق الناس عنه يعود ملكا، ويورث عنه عند محمد.

"যদি মসজিদের আশ-পাশের সব কিছু বিরান হয়ে যায় এবং লোকজন তা ছেড়ে চলে যায়, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর নিকট তা ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করবে এবং ওয়াক্‌ফকারীর ওয়ারিছরা তা মিরাছ হিসেবে পাবে।"[৯০০]

এ অবস্থার ব্যাপারে আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

وعند محمد عاد إلى ملك الباني، أو إلى وارثه بعد موته؛ لأنه عينه لنوع قربة، وقد انقطعت فصار كحصير المسجد أو حشيشه إذا استغني عنه.

"ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর নিকটে ওয়াক্‌ফকৃত মসজিদ ওয়াক্‌ফকারী অথবা তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা ওয়াক্‌ফকারী মসজিদের ওয়াক্‌ফকে বিশেষ একটি নৈকট্য লাভের জন্য নির্দিষ্ট করেছে, আর তা শেষ হয়ে গেছে (কারণ, বর্তমানে সেখানে আর নামায পড়া হচ্ছে না)। সুতরাং তার বিধান হবে মসজিদের চাটাই এবং খড়কুটোর মতো,

---

[৮৯৮] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৪২১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৮৯৯] আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ: ২/২৫, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, বাংলাদেশ

[৯০০] আল ইখতিয়ার লিতা'লিলি মুখতার: ৩/৬১, দারুল হাদীস, কায়রো

যখন তার আর প্রয়োজন থাকে না, তখন তা মালিকের অধিকারে ফিরে আসে।"[৯০১]

অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম দলীল ও পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রেখে মসজিদের মূল জমির ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ, উক্ত জমি মসজিদ হিসেবেই বহাল থাকবে। আর অন্যান্য সামানাদির ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

قال الزيلعي: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد، وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بها اهـ

وصرح في الخانية بأن الفتوى على قول محمد: قال في البحر: وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد، وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد اهـ والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير، بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه قريبا من أن الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثا، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر.

"আল্লামা যায়লায়ী রাহ. বলেন, মসজিদের পরিত্যক্ত চাটাই এবং খড়কুটো[৯০২] ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় প্রত্যাবর্তন করবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর নিকট তা অন্য কোনো মসজিদে স্থানান্তর করা হবে। পরিত্যাক্ত সেতু, কুয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রেও উভয় ইমামের মাঝে এ মতপার্থক্য আছে। ফাতাওয়ায়ে খানিয়্যাহ-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে ফাতওয়া ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মতের উপর হয়ে থাকে। আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন,... এখান থেকে বুঝে আসে যে, মসজিদের সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ফাতওয়া ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মতের উপর, আর মসজিদের ভূমির ক্ষেত্রে (যে তা স্থায়ীভাবে ওয়াক্‌ফ হিসেবে থাকবে) ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মতের উপর। মসজিদের সরঞ্জামাদি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মোমবাতি, চাটাই ইত্যাদি। উল্লেখ্য, বিরান মসজিদের ভগ্নাবশেষের বিধান মসজিদের সরঞ্জামাদির মতো নয় (বরং তার বিধান মূল মসজিদের মতো)। এই ব্যাপারে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, ফাতওয়া হচ্ছে মসজিদ ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় উত্তরাধিকার হসেবে প্রত্যাবর্তন করবে না এবং তা স্থানান্তর করাও জায়েয হবে না এবং তার সামানাদি ও অংশসমূহ অন্য মসজিদে স্থানান্তর করা যাবে না।"[৯০৩]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বাস্তব পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে মসজিদের ভগ্নাবশেষের ক্ষেত্রেও ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মতকে শক্তিশালী সাব্যস্ত করেছেন। তিনি

---

[৯০১] আল হিদায়া: ২/৬৪৫, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ, আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাতে (৪৫/২৫) উল্লেখ আছে-

وعند محمد يعود إلى ملك الباني (الواقف) إن كان حيا أو إلى وارثه بعد موته، وإن لم يعرف بانيه ولا ورثته كان لهم بيعه والاستعانة بثمنه في بناء مسجد آخر لأنه عينه لنوع قربة، وقد انقطعت، فصار كحصير المسجد وحشيشه إذا استغني عنه، إلا أن أبا يوسف يقول في الحصر والحشيش إنه ينقل إلى مسجد آخر.

[৯০২] অনেক এলাকায়, যেমন, মিসরের উচ্চ অঞ্চলে (صعيد مصر) চাটাইয়ের পরিবর্তে খড় বিছানো হতো।

[৯০৩] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৫১, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

বলেন-

مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه، قلت: لكن الفرق غير ظاهر فليتأمل. والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أو حوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفى بهما قدوة، ولا سيما في زماننا فإن المسجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه، وقد وقعت حادثة سئلت عنها في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب في سفح قاسيون بدمشق ليبلط بها صحن الجامع الأموي فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي، ثم بلغني أن بعض المتغلبين أخذ تلك الأحجار لنفسه، فندمت على ما أفتيت به، ثم رأيت الآن في الذخيرة قال وفي فتاوى النسفي: سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشبه، وينقلونه إلى دورهم هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي، ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟

قال: نعم وحكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب، ولا ينتفع المارة به، وله أوقاف عامرة فسئل هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به؟ نعم لأن الواقف غرضه انتفاع المارة، ويحصل ذلك بالثاني. اهـ.

"...তবে এ পার্থক্য স্পষ্ট নয় এবং বিবেচনাযোগ্য। মসজিদ এবং হাউজের মাঝে পার্থক্য না করে স্থানান্তর জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে উল্লিখিত মাশায়েখদের অনুসরণ করা উচিত। যেমনটি ইমাম আবু শুজাআ' এবং ইমাম হালওয়ানী রাহ. ফাতওয়া দিয়েছেন। তাঁরা দু'জনই অনুসরণের জন্য যথেষ্ট। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে। কেননা মসজিদ অথবা সেতু, হাউজ ইত্যাদিকে যদি স্থানান্তর না করা হয় তাহলে চোর-ডাকাত ও জবরদখলকারীরা এগুলোর ধ্বংসাবশেষ নিয়ে যায়, যেমনটি প্রায় দেখা যায়। এমনিভাবে ওয়াক্‌ফের মুতাওয়াল্লি বা দায়িত্বশীলরা অনেক সময় তা আত্মসাৎ করে নিয়ে নেয়। এছাড়াও এক্ষেত্রে স্থানান্তর না করার দরুন প্রয়োজনগ্রস্ত অন্য মসজিদটিও (যেখানে স্থানান্তর করা হবে) বিরান হয়ে যায়।

(যেমন) একবার এক আমীর দিমাশকের কাসিউন পাহাড়ের পাদদেশের একটি বিরান মসজিদের কিছু পাথর স্থানান্তর করে তা দ্বারা উমাবী জামে মসজিদের আঙ্গিনা বাঁধতে চেয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে আমার নিকট ফাতওয়া চাওয়া হলে, আমি শুরুনবুলালী রাহ.-এর অনুসরণ করে নাজায়েযের ফাতওয়া দিয়েছিলাম। অতঃপর আমার কাছে খবর পৌঁছে যে, কিছু জবরদখলকারী পাথরগুলো আত্মসাৎ করেছে। তখন আমি আমার ফাতওয়ার কারণে লজ্জিত হই। এখন আমি যখীরা কিতাবে ফাতাওয়ায়ে নাসাফীর উদ্ধৃতিতে পেয়েছি যে, শাইখুল ইসলামকে[৯০৪] এমন এক গ্রামবাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়ে ছিলো যারা অন্যত্র চলে গেছে

---

[৯০৪] শাইখুল ইসলাম ইমাম নাজমুদ্দীন উমর ইবনে মুহাম্মদ আস সামারকান্দী রাহ. ৫৩৭ হি.-এর জুমাদাল উলা'তে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি একাধারে মুফাসসির, ফকীহ, ইতিহাসবেত্তা ও সাহিত্যবিদ ছিলেন। এ সকল শাস্ত্রেই তার রচনাবলী রয়েছে, যার সংখ্যা শত পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর রচিত (منظومة النسفي في الخلاف) কে ফিকহে

এবং তাদের মসজিদ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। কিছু জবরদখলকারী প্রভাব বিস্তার করে ঐ মসজিদের তক্তা জবরদখল করছে এবং তাদের বাড়িতে তা স্থানান্তর করছে। এখন কি মহল্লাবাসির কেউ কাযীর অনুমতিতে ঐ তক্তা বিক্রয় করতে পারবে এবং তার মূল্য অন্যান্য মসজিদ অথবা ঐ মসজিদে খরচ করার জন্য জমা রাখতে পারবে?

শাইখুল ইসলাম বলেন, হ্যাঁ, পারবে। এমনিভাবে আল্লামা নাসাফী রাহ.-এর সময় একটি ব্রীজ অকেজো হয়ে গিয়েছিলো। পথিকেরা তা দ্বারা কোনোভাবেই উপকৃত হচ্ছিলো না। যদিও তার সমৃদ্ধশীল ওয়াক্‌ফ স্টেট ছিলো। তখন ইমাম নাসাফী রাহ. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, এগুলো (ব্রীজের আওতাধীন ওয়াক্‌ফসমূহ) কি অন্য ব্রীজে স্থানান্তর করা যাবে, যা দ্বারা পথিক উপকৃত হয়? তিনি বলেন, হ্যাঁ, করা যাবে। কেননা ওয়াক্‌ফকারীর উদ্দেশ্যই হলো গমনকারী উপকৃত হওয়া। আর তা স্থানান্তর করলেই সম্ভব।"[৯০৫]

উল্লেখ্য, মসজিদের সামানাদি স্থানান্তর করলেও তা অন্য কোনো মসজিদেই ব্যবহার করতে হবে। মসজিদভিন্ন অন্য কোনো খাতে ব্যবহার করা যাবে না। এমনিভাবে বিক্রয় করলেও তার মূল্য মসজিদের কাজেই ব্যবহার করতে হবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه، وفي شرح الملتقى يصرف وقفها لأقرب مجانس لها. اهـ. ط.

"বিরান মসজিদের ওয়াক্‌ফ কোনো হাউজে অথবা কোনো হাউজের ওয়াক্‌ফ কোনো মসজিদে খরচ করা যাবে না। 'শারহুল মুলতাকা' কিতাবে উল্লেখ আছে, এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, ওয়াক্‌ফ তার সবচেয়ে নিকটবর্তী খাতে ব্যয় করা।"[৯০৬]

আল্লামা আবু বকর হাদ্দাদী রাহ. (৮০০ হি.) বলেন-

وقال بعضهم: يباع ويصرف في مصالح المسجد، ولا يجوز صرف نقضه إلى عمارة البئر؛ لأنها ليست من جنس المسجد.

"কেউ কেউ বলেন, তা বিক্রয় করা হবে এবং মসজিদের কোনো প্রয়োজনে খরচ করা হবে। তবে মসজিদের ভগ্নাবশেষ (উদাহরণস্বরূপ) কোনো কূপের নির্মাণে খরচ করা যাবে না। কেননা তা মসজিদের খাত নয়।"[৯০৭]

উল্লেখ্য, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উত্তম হলো (শর্ত করা ব্যতীত) এমন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা, যে মোটামুটি ভালো কাজে ব্যবহার করবে। কোনো ঘৃণিত কাজে ব্যবহার করবে না। কারণ, মসজিদ যেমন সম্মানিত তেমন মসজিদের সামানাদিও সম্মানিত।

মসজিদের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার আলোকে নিম্নে আমরা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল ও আহকাম আলোচনা করবো।

ইসলামীতে প্রথম পদ্য রচনা হিসেবে অনেকে গণ্য করে থাকেন। তাঁর রচিত (العقائد)-এর শরহ দরসে নিজামীতে শুরু থেকেই অন্তর্ভুক্ত আছে। (হাদিয়্যাতুল আরেফীন, আল আ'লাম, আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ,)

[৯০৫] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৫২-৫৫৩, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৯০৬] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৫১, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৯০৭] আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ: ২/২৫, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, বাংলাদেশ

বহুতল ভবনে মসজিদ

আমরা জানি, ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম হলো, জমি ওয়াক্ফ করা। ওয়াক্ফের বৈশিষ্ট্যর সাথে এটাই সঙ্গতিপূর্ণ। জমি ব্যতীত শুধু নির্মিত ভবনের ওয়াক্ফ বৈধ হওয়ার কথা নয়। এজন্য যাহিরুর রিওয়ায়াহ তথা কিতাবুল আস্‌ল-এ জমি ব্যতীত শুধু ভবনের ওয়াক্ফ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

ثم نقل عن الأصل أن وقف البناء بدون أصل الدار لا يجوز.

"'ফাতাওয়ায়ে খানিয়্যাহ'-এ কিতাবুল আসল-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জমি ব্যতীত শুধু ভবনের ওয়াক্ফ জায়েয নয়।"[৯০৮]

তবে এ ধরনের ওয়াক্ফের অনুমোদন ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে নাওয়াদিরের কিতাবের একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। আল্লামা বুরহানুদ্দীন ইবনে মাযাহ আল বুখারী রাহ. (৬১৬ হি.) বলেন-

وجدت في «النوادر» عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه أجاز وقف المقبرة والطريق، فهذه الرواية استفيدت من جهته، قال هلال: وكذلك القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين، يطوفون فيها لا يكون بناؤها ميراثاً للورثة وصار وقفاً، فقد خص بناء القنطرة ببطلان الميراث فيها، وهذا يدل على أن موضع بناء القنطرة لم يكن ملكاً للباني، وهذا هو الظاهر، فإن الإنسان إنما يحتسب بناء القنطرة على نهر العامة، **فيدل هذه الرواية على جواز وقف البناء دون أصل البقعة**.

"নাওয়াদিরের সূত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কবরস্থান ও রাস্তার ওয়াক্ফের অনুমতি দিয়েছেন। এই বর্ণনাটি তাঁর থেকে এসেছে। আল্লামা হিলাল রাহ. বলেন, ব্রীজের ব্যাপারটিও এমন যার উপর মানুষ চলাচল করে। অর্থাৎ, তার কাঠামো। ওয়াক্ফকারীর ওয়ারিছদের মিরাছ গণ্য হবে না; কারণ, তা ওয়াক্ফ হয়ে গেছে। (ইমাম হিলাল রাহ.) তিনি ব্রীজের কাঠামোকে ওয়াক্ফ হওয়া এবং মিরাছ না হওয়ার ব্যাপারে নির্দিষ্ট করেছেন। এটা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, ব্রীজের জায়গা ঐ ব্যক্তির (নির্মাতার) মালিকানায় নেই। এখানে এটাই স্পষ্ট। কেননা মানুষ সাধারণত সাধারণ মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ করে থাকে।

সুতরাং এই বর্ণনা মূল জমি ব্যতীত শুধু ভবনের ওয়াক্ফ সহীহ হওয়ার পক্ষে প্রমাণ বহন করে।"[৯০৯]

---

[৯০৮] ফাতহুল কাদীর: ৬/২০২, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৯০৯] আল মুহিতুল বুরহানী: ৯/১৪৪, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, পাকিস্তান

তবে ইমাম হিলাল ইবনে ইয়াহয়া রাহ. (২৪৫ হি.) বলেন:

وكذلك القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين ويتطرقون فيها لا يكون بناءها ميراثا لورثته، وقد صارت وقفا.

আল্লামা বুরহানুদ্দীন ইবনে মাযাহ আল বুখারী রাহ. তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন:

فقد خص بناء القنطرة الميراث فيها، وهذا يدل على أن موضع بناء القنطرة لم يكن ملكاً للثاني وهذا هو الظاهر، فإن الإنسان إنما يحتسب بناء القنطرة على نهر العامة، **فتدل هذه الرواية على جواز وقف البناء دون أصل البقعة**.

আল্লামা আবু আম্মার শুরুনবুলালী রাহ. দুরারুল হুককামের টীকায় বলেন-

(قوله وفي القاعدية ... إلخ) أقول وفي الخانية أيضا مع زيادة، حيث قال: وحكي عن الحاكم المعروف بمهرويه أنه قال: وجدت في النوادر عن أبي حنيفة –رحمه الله– أنه أجاز وقف المقبرة والطريق كما أجاز المسجد، وكذا القنطرة يتخذها الرجل للمسلمين ويتطرقون فيها ولا يكون بناؤها ميراثا لورثته، خص بناء القنطرة في بطلان الميراث، قالوا: تأويل ذلك إذا لم يكن موضع القنطرة ملك الباني وهو المعتاد، والظاهر أن الإنسان يتخذ القنطرة على النهر العام، وهذه المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الأصل اهـ.

"....ফাতাওয়ায়ে খানিয়্যাহ-এ আছে, হাকেম মাহরুয়াহ রাহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাওয়াদিরের সূত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি কবরস্থান এবং রাস্তার ওয়াক্‌ফের অনুমতি দিয়েছেন, যেমনিভাবে মসজিদের অনুমতি দিয়েছেন। এমনিভাবে ঐ ব্রীজ যা মুসলমানদের একজন ওয়াক্‌ফ করেছে এবং সাধারণ মুসলমানগণ তার উপর পারাপার করে, তার কাঠামো ওয়াক্‌ফকারীর ওয়ারিছদের মিরাছ গণ্য হবে না।

এখানে ব্রীজের কাঠামোকে মিরাছ না হওয়ার ব্যাপারে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, এর কারণ হলো, এখানে ব্রীজের জায়গা ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় নেই। এমনই সচরাচর হয়ে থাকে। মানুষ সাধারণের নদীর উপরই ব্রীজ তৈরী করে (নিজের মালিকানাধীন)। এই মাসআলা মূল জমি ব্যতীত শুধু ভবনের ওয়াক্‌ফ সহীহ হওয়ার দলীল।"[৯১০]

নাওয়াদিরের এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, এমন জায়গায় ব্রীজ নির্মাণ করা যাবে, যার মূল জমি ওয়াক্‌ফ করা হয়নি। যেহেতু এ ধরনের ওয়াক্‌ফের প্রচলন ছিলো না এবং যাহিরুর রিওয়ায়াতে মূল জমির ওয়াক্‌ফের কথা উল্লেখ রয়েছে, তাই অনেক ফকীহ ও ইমাম এমন ওয়াক্‌ফের অনুমতি দেননি। পরবর্তীতে এ ধরনের ওয়াক্‌ফের প্রচলন শুরু হলে একাধিক ফকীহ ও ইমাম এর অনুমতি দিয়েছেন। যেমন, ফুকাহায়ে খুওয়ারিজম এ ধরনের ফাতওয়া দিয়েছেন। আল্লামা ইবনুশ শিহনাহ রাহ. (৯২১ হি.) বলেন-

وفي البزازي وقف البناء بدون الأرض لم يجوزه هلال رحمه الله تعالى، وهو الصحيح، قال: وعمل أئمة خوارزم على خلافه.

"ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়ায়" উল্লেখ আছে, আল্লামা হিলাল রাহ. জমি ব্যতীত শুধু ভবনের ওয়াক্‌ফের অনুমতি দেননি। এটাই সহীহ। তিনি বলেন, খুয়ারিজাম-এর ইমাম ও ফকীহগণ এর বিপরীত আমল করেন।"[৯১১]

যে সকল ফুকাহায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন তাদের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উরফ।[৯১২] আমরা পূর্বের প্রবন্ধে স্থানান্তরশীল সম্পদের ওয়াক্‌ফের ক্ষেত্রে দেখেছি যে, উরফের কারণে ইমামগণ এ সকল বস্তুর ওয়াক্‌ফ বৈধ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। অনুরূপভাবে এখানেও (জমি ব্যতীত শুধু ভবন ওয়াক্‌ফ করার ক্ষেত্রে উরফ বা প্রচলন হওয়ার

---

[৯১০] দুররুল হুককাম: ২/১৩৭

[৯১১] লিসানুল হুককাম: ১/২৯৪

[৯১২] প্রচলন।

পর অনেক ফকীহ অনুমতি দিয়েছেন। আল্লামা ইবনুশ শিহনাহ রাহ. ও তার শাইখ আল্লামা কাসিম রাহ.-এর বক্তব্যর মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

فهذا صريح، بأن علة عدم الجواز كونه غير متعارف لا لما ذكره العلامة قاسم، فحيث تعورف وقفه جاز، وعن هذا خالفه تلميذه العلامة عبد البر بن الشحنة بعد ما جرى بينهما كلام في مجلس السلطان الملك الظاهر سنة 872 وقال: إن الناس من زمن قديم نحو مائتي سنة وإلى الآن على جوازه والأحكام به من القضاة العلماء متواترة **والعرف جار به** فلا ينبغي أن يتوقف فيه اهـ ...قلت: لا يخفى عليك أن **المفتى به الذي عليه المتون جواز وقف المنقول المتعارف، وحيث صار وقف البناء متعارفا كان جوازه موافقا للمنقول،** ولم يخالف نصوص المذهب على عدم جوازه لأنها مبنية على أنه لم يكن متعارفا، كما دل عليه كلام الذخيرة المار **ويأتي قريبا** نص الخصاف على جوازه إذا كان البناء في أرض محتكرة هذا: والذي حرره في البحر أخذا من قول الظهيرية، وأما إذا وقفه على الجهة التي كانت البقعة وقفا عليها جاز اتفاقا تبعا للبقعة، أن قول الذخيرة لم يجز هو الصحيح مقصور على ما عدا صورة الاتفاق وهو ما إذا كانت الأرض ملكا أو وقفا على جهة أخرى، قال: وقصره الطرسوسي على الملك وهو غير ظاهر. اهـ.

"এটা স্পষ্ট যে, শুধু ভবনের ওয়াক্ফ জায়েয না হওয়ার কারণ হলো, তার প্রচলন না থাকা। আল্লামা কাসিম রাহ. যা উল্লেখ করেছেন তা নয়। সুতরাং যেখানে এর প্রচলন রয়েছে সেখানে জায়েয হবে। ৮৭২ সনে সুলতান আল মালিকুয যাহির-এর মজলিসে এ ব্যাপারে আল্লামা কাসিম ও তাঁর ছাত্র আল্লামা ইবনুশ শিহনা'র মাঝে আলোচনা হয়। এতে আল্লামা আব্দুল বার ইবনুশ শিহনাহ রাহ. আল্লামা কাসিম রাহ.-এর সাথে ইখতিলাফ করে বলেন, মানুষ দুই শতাব্দি পূর্ব থেকেই এখন পর্যন্ত তা বৈধ হিসেবেই জানে এবং আহলে ইলম কাযীগণ এ ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে ফয়সালা দিয়ে আসছেন। আর উরফেও এর প্রচলন রয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে ইতস্তত করা উচিত হবে না।......(আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন) তবে এটা স্পষ্ট যে, মুফতা বিহি ক্বওল হলো- যা মতনে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যেসব স্থানান্তরশীল বস্তুর ওয়াক্ফের প্রচলন রয়েছে, তার ওয়াক্ফ বৈধ। সুতরাং যেখানে ভবনের ওয়াক্ফের প্রচলন রয়েছে, সেখানে তার ওয়াক্ফ বৈধ হওয়া মাযহাবের রিওয়ায়াতের সাথে সমাঞ্জস্যশীল। ভবনের ওয়াক্ফ জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে মাযহাবের নসগুলো এর বিপরীত নয়। কেননা এর ভিত্তি হলো প্রচলন না থাকার উপর। পূর্বে উল্লিখিত যখীরার বক্তব্য এর উপর দালালত করে। একটু পরেই আল্লামা খাসসাফ রাহ.-এর ভাষ্য আসছে যে, স্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী ভাড়া দেয়া হয়েছে এমন ভূমির উপর নির্মিত ভবন ভূমি ছাড়া ওয়াক্ফ করা যাবে।........."[৯১৩]

ইমাম আবু বকর খাস্সাফ রাহ. এর আলোচনা থেকেও আলোচ্য বিষয়ে উরফের গুরুত্বের বিষয়টি অনুমিত হয়। আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. (৮৬১ হি.) বলেন-

وفي الفتاوى لقاضيخان. وقف بناء بدون أرض قال هلال: لا يجوز انتهى. لكن في الخصاف ما يفيد أن

---

[৯১৩] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫৯৬-৫৯৭, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

الأرض إذا كانت **متقررة للاحتكار جاز** فإنه قال في رجل وقف بناء دار له دون الأرض: إنه لا يجوز، قيل له فما تقول في حوانيت السوق إن وقف رجل حانوتا منها؟ قال: إن كان الأرض إجارة في أيدي القوم الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها فالوقف جائز لأنا رأيناها في أيدي أصحاب البناء يتوارثونها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان ولا يزعجهم عنها، وإنما له غلة يأخذها وتداولها الخلفاء ومضى عليه الدهور وهي في أيديهم يتبايعونها ويؤاجرونها وتجوز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها ويبنون غيره، فأفاد أن ما كان مثل ذلك جاز وقف البنيان فيه وإلا فلا.

وذكر في موضع آخر في فتاوى قاضي خان: إذا بنى قنطرة للمسلمين جاز ولا يكون بناؤها ميراثا، ثم ذكر أنه إنما خص البناء بذلك؛ لأن العادة أن تتخذ على جنبتي النهر العام **وذلك غير مملوك**. ثم قال: وهذه المسألة دليل على جواز وقف البناء بدون الأصل..

"ফাতাওয়ায়ে কাযীখানে উল্লেখ আছে, কেউ জমি ব্যতীত শুধু ভবন ওয়াক্ফের ব্যাপারে হিলাল রাহ. বলেন, তা জায়েয হবে না। কিন্তু আহকামুল আওকাফ লিল্ খাস্সাফের বর্ণনা থেকে বুঝে আসে যে, জমি যদি দীর্ঘমেয়াদী ভাড়ায় থাকে, তাহলে শুধু তার উপর নির্মিত ভবনকেও ওয়াক্ফ করা যাবে। কারণ, জমি ব্যতীত শুধু ভবন ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে তিনি বলেছিলেন যে, তা জায়েয হবে না। তখন তাকে বলা হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বাজারের দোকানসমূহের মধ্য থেকে কোনো দোকান ওয়াক্ফ করে তাহলে তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন: যদি জমি এমন ব্যক্তিদের হাতে দীর্ঘস্থায়ী ইজারা হিসেবে থাকে যারা দোকান তৈরী করেছে এবং বাদশাহও সেখান থেকে তাদের উঠিয়ে না দেয়, তাহলে ওয়াক্ফ জায়েয হবে। কেননা এক্ষেত্রে ভবনের মালিকরা মিরাছ হিসেবে এগুলো পরস্পর বন্টন করে নেয়, বাদশাহও তাদের বাঁধা দেয় না বা উচ্ছেদ করে না; বরং বাদশাহরও সেখানে আয় রয়েছে, যা সে গ্রহণ করে। এভাবেই একের পর এক বাদশাহ আসেন এবং বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। আর ভবনের মালিকরা তা পরস্পরে বিক্রয় করে এবং ভাড়া দেয়। তাদের ওসিয়তও এতে বাস্তবায়িত হয়, আর তারা অনেক সময় তা ভেঙ্গে অন্য ঘরও নির্মাণ করে। সুতরাং বোঝা যায়, যেখানে এই ধরনের প্রচলন থাকবে সেখানে শুধু ভবনের ওয়াক্ফ জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

ফাতাওয়ায়ে কাযীখানের অন্যত্র উল্লেখ আছে, যদি কেউ মুসলমানদের জন্য ব্রীজ বানায়, তাহলে তার ওয়াক্ফ জায়েয হবে এবং তার কাঠামো মিরাছ হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, ব্রীজের স্থাপনার কথা বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে কারণ, স্বাভাবিকভাবে মানুষ সাধারণের নদীর দুই পাশে তা তৈরী করে থাকে। ঐ নদী কারো মালিকানাভুক্ত নয়। জমি ব্যতীত শুধু ভবন ওয়াক্ফ জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে এই মাসআলা দলীল।"[৯১৪]

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. উরফের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন-

ولو وقف أشجارا قائمة فالقياس أن لا يجوز لأنه وقف المنقول، **وفي الاستحسان يجوز لتعامل الناس به**

---

[৯১৪] ফাতহুল কাদীর: ৬/২০২, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

في ذلك[৯১৫]، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.

“যদি কেউ ভূমিতে সংযুক্ত গাছ ওয়াক্‌ফ করে তাহলে কিয়াস অনুযায়ী তা নাজায়েয। কেননা তা স্থানান্তরশীল বস্তুর ওয়াক্‌ফ। তবে মানুষের মাঝে এ সকল বিষয়ের প্রচলন থাকার কারণে ইসতিহসানের ভিত্তিতে জায়েয। আর সকল মুসলমান যা উত্তম মনে করে তা আল্লাহর নিকটও উত্তম।”[৯১৬]

আমাদের ফকীহগণের মাঝে আরো কেউ কেউ এ ধরনের ওয়াক্‌ফ সঠিক বলে মত দিয়েছেন। যেমন, ইমাম সিরাজুদ্দিন কারিউল হিদায়া রাহ. (৮২৯ হি.) বলেন-

وقف البناء والغرس دون الأرض الفتوى صحة ذلك. اهـ.

“জমি ব্যতীত ভবন এবং গাছ ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে ফাতওয়া হলো- তা জায়েয।”[৯১৭]

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. তাঁর এ ফাতওয়া উল্লেখ করে বলেন-

وفي الفتاوى السراجية: سئل هل يجوز وقف البناء والغرس دون الأرض **أجاب الفتوى على صحة ذلك. اهـ .وظاهره أنه لا فرق بين أن تكون الأرض ملكا أو وقفا** وفي القنية من كتاب الإجارات يفتى برواية جواز استئجار البناء إذا كان منتفعا به كالجدران مع السقف وفي ظاهر الرواية لا يجوز لأنه لا ينتفع بالبناء وحده اهـ.

“ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়্যায় উল্লেখ আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, জমি ব্যতীত ভবন এবং গাছের ওয়াক্‌ফ জায়েয আছে কিনা? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ফাতওয়া জায়েয হওয়ার উপরই। তাঁর এ ফাতওয়া থেকে বুঝে আসে যে, (শুধু ভবন ওয়াক্‌ফ করার ক্ষেত্রে) জমি মালিকানাভুক্ত হওয়া অথবা ওয়াক্‌ফ হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।...”[৯১৮]

আমরা দেখলাম, জমি ব্যতীত শুধু নির্মিত ভবনের ওয়াক্‌ফের বৈধতার সপক্ষে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর বক্তব্য রয়েছে, যদিও তা নাওয়াদিরের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। পিছনে আমরা ইমাম হাসান রাহ.-এর সূত্রে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর আরো একটি বক্তব্য পড়ে এসেছি। তিনি মসজিদের উপর প্রয়োজনে ঘর করার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ. শর‘য়ী জরুরতের কারণে তাঁর এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

وعن أبي يوسف أنه جوز في الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل، فكأنه اعتبر الضرورة. وعن محمد أنه حين دخل الري أجاز ذلك كله لما قلنا.[৯১৯]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. জরুরতের কারণ দর্শানোকে সমর্থন করে বলেন-

---

[৯১৫] في بعض النسخ: لتعامل الناس ذلك. وفي بعضها: لتعامل الناس في ذلك.

[৯১৬] বাদায়েউস সানায়ে: ৫/৩২৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৯১৭] দুরারুল হুককাম শরহু গুরারিল আহকাম: ২/১৩৭

[৯১৮] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৩৪০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৯১৯] আল হিদায়া: ২/৬৪৪-৬৪৫, কুতুবখানা রশীদিয়া, দেওবন্দ

(وعن أبي يوسف أنه جوز ذلك في الأولين لما دخل بغداد ورأى ضيق الأماكن و) كذا (عن محمد لما دخل الري) وهذا تعليل صحيح؛ لأنه تعليل بالضرورة.[৯২০]

বর্তমানে অনেকক্ষেত্রে নগরাঞ্চলে মসজিদের জন্য আলাদা জমি বরাদ্দ করা দুষ্কর ও অসম্ভব। এমতাবস্থায় প্রয়োজনের খাতিরে টাওয়ার বা ভবনেই মসজিদের ব্যবস্থা করতে হয়। বর্তমানে এর অনেকটা প্রচলনও হয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে মসজিদের জন্য ভিন্ন জায়গার ব্যবস্থা করা কঠিন।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে একটি ফ্ল্যাট অপর ফ্ল্যাট থেকে সবদিক থেকে ভিন্ন ও আলাদা বলে বিবেচিত হয়। অন্যদের হকের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না। ওয়াক্ফের লিফ্ট বা সিঁড়ি অনেকটাই ত্বরীকে আম্মা (উন্মুক্ত রাস্তা)-এর মতো। সুতরাং প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করলে এক্ষেত্রে অন্য কোনো বাধা থাকে না।

সর্বোপরি এ সকল পরিস্থিতিতে শর'য়ী জরুরতের কারণে জমি ব্যতীত ভবন বা ভবনের কোনো এক তলায় মসজিদ করার অবকাশ রয়েছে এবং এধরনের মসজিদ শর'য়ী মসজিদ বলেই বিবেচিত হবে। তবে এক্ষেত্রে মসজিদের সম্মান ও মর্যাদা যেন পুরোপুরি বজায় থাকে তার প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী।

সরকারি জমিনে মসজিদ নির্মাণ

মসজিদ নির্মাণ 'হুকুকুল আম্মাহ'-এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের। রাসূল ﷺ মদিনায় এসে প্রথমে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। যদি সরকার অবহেলা করে তাহলে এর দায়িত্ব বর্তায় সাধারণ জনগণের উপর।

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين.

"রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থায়নে ওয়াক্ফিয়া মসজিদ নির্মাণ করা রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ওয়াজিব। যদি তিনি তা না করেন তাহলে মুসলমানদের উপর এর ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।"[৯২১]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

(قوله ووقف مسجد) أي في كل بلدة على الظاهر ط (قوله وإلا) أي وإن لم يفعل الإمام فعلى المسلمين.[৯২২]

যদি সরকারি জমিতে সরকার নিজে বা সরকারের সরাসরি অনুমতি বা মৌন সম্মতিতে জনগণ মসজিদ নির্মাণ করে, তাহলে মসজিদটি শর'য়ী মসজিদ বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে কোনোভাবে তা আর স্থানান্তর করা যাবে না। আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকারি অফিস ও কারখানায় এভাবে হাজারও মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এসব মসজিদ ভাঙ্গা বা স্থানান্তর করা যাবে না।

---

[৯২০] ফাতহুল কাদীর: ৬/২১৮, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[৯২১] আদ্দুররুল মুখতার: ৫/৫৩৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৯২২] রদ্দুল মুহতার: ৫/৫৩৯, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

আর যদি সরকারের স্পষ্ট বা মৌন কোনো ধরনের সমর্থন না থাকে, তাহলে উক্ত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না এবং নির্মাণ করলে তা শর'য়ী মসজিদ বলে গণ্য হবে না।

হারাম মাল দিয়ে মসজিদ

মসজিদ প্রথিবীর পবিত্রতম স্থান। মসজিদ মহান আল্লাহর ঘর। আল্লাহর ঘর নির্মণে কেবল পবিত্র ও হালাল সম্পদ গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা কোনো হারাম বা অবৈধ সম্পদের সাদকা গ্রহণ করেন না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা-কিছু উপার্জন করেছো এবং আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা-কিছু উৎপন্ন করেছি, তার পবিত্র জিনিসসমূহ থেকে একটি অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো। আর এরূপ মন্দ জিনিস (আল্লাহর নামে) দেয়ার নিয়ত করো না যা (অন্য কেউ তোমাদের দিলে ঘৃণার কারণে) তোমরা চক্ষু বন্ধ না করে তা গ্রহণ করবে না। মনে রেখো, আল্লাহ বেনিয়ায, সর্বপ্রকার প্রশংসা তাঁরই দিকে ফিরে।"[৯২৩]

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٥١﴾ [المؤمنون:٥١]، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ﴾ [البقرة: ١٧٢] ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر ، يمدّ يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذّي بالحرام، فأنّى يُستجاب لذلك؟

"আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলদেরকে যা আদেশ করেছেন তা মুমিনদের আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে রাসূলগণ তোমরা পবিত্র জিনিস হতে ভক্ষণ করো এবং সৎ আমল করো।' তিনি আরো বলেন, 'হে ইমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে রিজিক হিসেবে যে পবিত্র জিনিস দান করেছি তা থেকে তোমরা ভক্ষণ করো।' অতঃপর হুযুর ﷺ দীর্ঘ সফরকারী ধূলিময় এলোমেলো কেশবিশিষ্ট এক ব্যক্তির আলোচনা করলেন। সে আসমানের দিকে তার হাত প্রসারিত করে দু'আ করে, হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, সে বড় হয়েছে হারাম খাবার গ্রহণ করে, কীভাবে তার দোয়া কবুল করা হবে?"[৯২৪]

সুতরাং কোনো ব্যক্তি হারাম মাল দ্বারা জমি ক্রয় করে মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করলে তার কোনো সওয়াব সে পাবে না। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু

---

[৯২৩] সূরা বাকারা: ২৬৭

[৯২৪] সহীহ মুসলিমঃ হাদীস নং ১০১৫

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

لاتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.

"পবিত্রতাবিহীন নামায ও আত্মসাৎকৃত সম্পদের সাদকাহ আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।"[৯২৫]

এমনকি আত্মসাৎকৃত তথা অমালিকানাধীন হারাম সম্পদ[926] দ্বারা ক্রয়কৃত যমীনে মসজিদের ওয়াকফই শুদ্ধ হবে না।[৯২৭]

সত্যায়নে

শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ

আহমদ শফি হাফিযাহুল্লাহ

মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, দারুল উলূম হাটহাজারী

২২ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ

মুফতী আ'যম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী

২১ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ

মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী

১২ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ

মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী

২১ রজব ১৪৩৯ হি.

---

[৯২৫] সুনানুত তিরমিযী: হাদীস নং ১

[৯২৬] বিস্তারিত দেখুন: "হারাম অর্থ-সম্পদ: মালিকানা ও ব্যবহারবিধি" শীর্ষক প্রবন্ধ।

[৯২৭] এটা স্বীকৃত বিষয় যে, সকল হারাম মাল এক পর্যায়ের নয়। এক্ষেত্রে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম মালকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. যা অর্জনকারীর মালিকানায় আসে না। খ. যা অর্জনকারীর মালিকানায় আসে। (বিস্তারিত দেখুন: এ বইয়ের "হারাম অর্থ-সম্পদ: মালিকানা ও ব্যবহারবিধি" শীর্ষক প্রবন্ধ)। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে ওয়াক্‌ফ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে এরূপ করাটা মোটেও উচিত নয়। দ্বিতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রাহ. বলেন:

اقول: اس میں دو حکم ہیں ایک ثواب نہ ملنا، اس کی دلیل تو نص حدیث ہے "إن الله طيب لايقبل إلا الطيب أو كما قال" دوسرا حکم اس کا مسجد نہ ہونا، ... مسجد کا احکام میں مسجد ہونا مسئلہ فقہیہ ہے سو کتب فقہ میں تحقق مسجد کے لئے مال کا حلال ہونا کہیں مذکور نہیں جیسے کوئی شخص بہ نیت ریاء وقف کرے تو گو وہ وقف مقبول نہ ہو؛ بلکہ خوف معصیت ہے، لیکن احکام میں مسجد ہو جائے گی مثلا اس کی بیع جائز نہیں، اس میں حائض وجنب کا داخل ہونا جائز نہیں، اس میں بول وتغوط درست نہیں، اب صرف سوال باقی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، سو اسکا حکم کہیں منقول نظر سے نہیں گذرا، لیکن قواعد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بند کر کے محفوظ کر دیا جائے اور نہ اس میں نماز پڑھیں نہ اس کی بے حرمتی کریں؛ البتہ اگر زمین حلال ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے اور صرف ملبہ حرام ہے تو بجائے اس کے دوسرے ملبہ سے تعمیر کرا دینا جواز انتفاع کے لئے کافی ہو جائے گا اور ایسی مسجد مذکور کی جو مال حرام سے بنائی ہوئی ہے ایسی مثال ہے جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص ناپاک سیاہی سے قرآن مجید لکھ لے اس میں نہ تلاوت جائز ہے اور نہ اس کی بے ادبی جائز ہے؛ بلکہ دفن کر دیا جائے، باقی مسئلہ نازک ہے دوسرے علماء سے بھی اس میں نظر کرا لی جائے-

শরী'আতের দৃষ্টিতে হ্যাকিং

মাওলানা আশরাফ আলী, নেত্রকোনা

গত শতকের আশির দশক থেকে পারসোনাল কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এর পর থেকেই শুরু হয়েছে হ্যাকিং-এর চল। কম্পিউটারের ব্যবহারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হ্যাকিং-এর বিকাশ ঘটেছে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা মৌলিকভাবে হ্যাকিং-এর পরিচিতি, এ ব্যাপারে শর'য়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও সংশ্লিষ্ট কিছু জরুরী আহকাম বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ।

হ্যাকিং সফটওয়্যার সংশ্লিষ্ট বিষয়। তাই সফটওয়্যার হ্যাকিং সম্পর্কে জানতে হলে সবার আগে সফটওয়্যার কী- তা জানতে হবে।

সফটওয়্যার (Software) কী?

সফট (soft) অর্থ, কোমল। ওয়্যার (ware) শব্দটি পণ্যসামগ্রী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। একবাক্যে সফটওয়্যার (Software) অর্থ হলো, কোমল যন্ত্রাংশ বা পণ্যসামগ্রী।

আমরা জানি, মৌলিকভাবে দু'টো জিনিস দিয়ে কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি পরিচালিত হয়- ক. সফটওয়্যার, খ. হার্ডওয়্যার।

শাব্দিকভাবে হার্ডওয়্যার অর্থ হলো-কঠিন পণ্য। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার হল কম্পিউটারের সেইসকল অংশ যেগুলো ছোঁয়া যায়, দেখা যায়, যার কাঠামো আছে। যেমন, মনিটর, মাউস, কেসিং, মাদারবোর্ড ইত্যাদি। হার্ডওয়্যারের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাংশ দিয়ে একটি কম্পিউটার বাহ্যিকভাবে তৈরি হয়।

স্বাভাবিকভাবেই শুধু হার্ডওয়্যার বা যন্ত্রাংশ দিয়েই কম্পিউটার কাজ করতে পারে না; বরং এর জন্য কম্পিউটারের ভিতরগত সিস্টেম্স বা কার্যপ্রণালীর প্রয়োজন পড়ে। এজন্য মানুষ কম্পিউটারকে বিভিন্ন বর্ণ, শব্দ ও সংকেত দ্বারা নির্দেশ (Commands) প্রদান করে। এসব কমান্ডের একেকটি সমষ্টি হলো প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার। কম্পিউটার এসব কমান্ড অনুযায়ী জটিল থেকে জটিল বিভিন্ন কাজ সমাধা করে।

উইকিপিডিয়া-এ সফটওয়্যারের সংজ্ঞায় বলা হয়:

'কম্পিউটার সফটওয়্যার (Computer software) বলতে একগুচ্ছ কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কর্মপদ্ধতি ও ব্যবহারবিধিকে বোঝায়, যার সাহায্যে কম্পিউটারে কোনো নির্দিষ্ট প্রকারের কাজ সম্পাদন করা যায়।[৯২৮]

সফটওয়্যারকে সফটওয়্যার বা কোমল যন্ত্রাংশ বলার কারণ হলো এটা এমন পণ্য যেটাকে ধরা বা ছোঁয়া যায় না; বরং এগুলো মেমোরীতে সংরক্ষিত কিছু সংকেতপুঞ্জ (codes) যা আমরা কেবল স্ক্রীনে দেখতে পাই এবং যেগুলো ব্যবহার করে কম্পিউটার বা মোবাইল পরিচালনা করে থাকি।

সফটওয়্যারের কাজ বোঝার জন্য একটা সহজ উদাহরণ দেই। যেমন, একজন একটা বার্তা

---

[৯২৮] উইকিপিডিয়া, কম্পিউটার সফটওয়্যার

পাঠাবে যে, 'তার এক্ষুণি সাহায্য প্রয়োজন'। এখন সে কম্পিউটারে কিছু বোতাম চাপবে। এই বোতামগুলো কখন কোথায় চাপলে এই লেখা তৈরী হবে এবং গন্তব্যে চলে যাবে এটা সফটওয়্যারে ঠিক করা থাকে। ব্যবহারকারীর এটা জানা আছে বিধায় সে যথাযথ বোতাম চাপবে। কম্পিউটারের বোতাম মূলত কিছু সংকেত পাঠায় যেগুলোকে সফটওয়্যার নির্দিষ্ট ভাষায় দেখায়। ফলশ্রুতিতে কোনো সফটওয়্যারে যদি বাংলা না থাকে সারাদিন বোতাম টিপলেও বাংলা লেখা আসবে না। অনুরূপভাবে এক সফটওয়্যারে যে বোতাম চাপলে "ক" বর্ণ আসে অন্য সফটওয়্যারে সে একই বোতাম চাপলে "ঘ" বর্ণ আসতে পারে। কেননা এটা সফটওয়্যারের উপর নির্ভর করে।

ব্যাংক লেনদেন, তথ্য আদান প্রদান, ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনা, ইন্টারনেট ব্যবহার সহ যাবতীয় কাজে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সফটওয়্যার মৌলিকভাবে দু'ধরনের হয়ে থাকে-

১. এপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার। এ সব সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীর কাজে সরাসরি ব্যবহৃত হয়। যেমন- অফিস স্যুট এপ্লিকেশন, যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের চিঠিপত্র, বিল, হিসাবপত্র, তথ্য ভান্ডার তৈরি করা যায়।

২. সিস্টেম সফটওয়্যার। এ সব সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম সামগ্রিকভাবে কম্পিউটারকে পরিচালিত করে এবং হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মাঝে সমন্বয় করে 'এপ্লিকেশন সফটওয়্যার'কে ব্যবহার উপযোগী করে।[৯২৯] যেমন, মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, লিনাক্স, ম্যাক, ওএস ইত্যাদি।

সারকথা, কম্পিউটারের যাবতীয় কাজ এসব সফটওয়্যারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর সফটওয়্যার নির্মাতারা এসব সফটওয়্যারে নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখে, যাতে সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস না হয় বা সফটওয়্যারটির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার যেন কেউ করতে না পারে। সফটওয়্যারের এই নিরাপত্তা ব্যুহ ভেদ করার মৌলিক দু'টি প্রক্রিয়া হলো, হ্যাকিং ও পাইরেসি। নিম্নে আমরা হ্যাকিং ও পাইরেসি নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করবো।

হ্যাকিং কী?[৯৩০]

ইংরেজি হ্যাক (hack) শব্দের অর্থ হলো, কোপানো, কেটে কুটি কুটি করা।[৯৩১] যে হ্যাক করে তাকে বলা হয় হ্যাকার। আমাদের এখানে হ্যাকিং দ্বারা সফটওয়্যার হ্যাকিং উদ্দেশ্য।

পরিভাষায় কোনো প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার বা নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ভেদ করে তাতে

---

[৯২৯] What are the differences between hardware and software? Computer Hope. (https://www.computerhope.com/issues/ch000039.htm)
Hardware vs. Software. Diffen. (https://www.diffen.com/difference/Hardware_vs_Software)

[৯৩০] Definition of 'Hacking'/ the Economic times. (https://economictimes.indiatimes.com/definition/hacking)
Hacking, Techopedia (https://www.techopedia.com/definition/26361/hacking)

[৯৩১] এই নামকরণের কারণ বলা যেতে পারে, যেভাবে গাছ কুপিয়ে টুকরো করা হয় ভেঙে দেয়া হয়, অনুরূপভাবে হ্যাকাররা কম্পিউটারের ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেয়।

অনুপ্রবেশ করাকে হ্যাক বলা হয়। যে এই কাজ করে তাকে বলা হয় হ্যাকার বা সিকিউরিটি হ্যাকার।

উইকিপিডিয়া ফ্রী ইন্সাইক্লোপেডিয়া -এ Security Hacker প্রবন্ধে বলা হয়ঃ

A security hacker is someone who seeks to breach defenses and exploit weaknesses in a computer system or network. Hackers may be motivated by a multitude of reasons, such as profit, protest, information gathering, challenge, recreation, or to evaluate system weaknesses to assist in formulating defenses against potential hackers. The subculture that has evolved around hackers is often referred to as the computer underground.[932]

নানা প্রকারের হ্যাকার[৯৩৩]

যেমনটি আমরা পূর্বে জেনেছি, 'হ্যাক' শব্দটি একটি ব্যাপক পরিভাষা। কম্পিউটার প্রোগ্রামের যেকোনো ছিদ্রান্বেষণকেই 'হ্যাক' বলা হয়। চাই তা ভালো উদ্দেশ্যে হোক বা মন্দ উদ্দেশ্যে। হ্যাকারদের ভালো-খারাপ প্রকারকে সাধারণত ক্যাপ বা টুপি দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়। কাজের ধরন, ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য হিসেবে প্রচলিত পরিভাষায় হ্যাকারদের মৌলিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. Black hat hacker (কালো টুপির হ্যাকার): সাধারণ পরিভাষায় হ্যাকার বলতে এদেরকেই বোঝানো হয়। এরা হলো ঐ সকল হ্যাকার যারা অন্যের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে তার কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা নেটওয়ার্কের দুর্বল দিক খুঁজে বের করে এবং তাতে অনুমতি ছাড়া অনুপ্রবেশ করে বিভিন্নভাবে তার ক্ষতিসাধন করে। যেমন, কম্পিউটারে সংরক্ষিত বিভিন্ন ধরনের ডেটা বা ফাইল নষ্ট করা, চুরি করা, বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস ও ম্যালওয়্যার ছড়িয়ে দেওয়া, প্রোগ্রাম, ডিভাইস বা একউন্ট লক করে অর্থ তলব করা ইত্যাদি। এছাড়াও হ্যাকার গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে অবগত হয় এবং অবৈধ নজরদারী করে। এককথায়, হ্যাকার সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম বা নেটওয়ার্ক তার নিয়ন্ত্রণে রেখে তা ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে থাকে। পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ড নাম্বার বা এ ধরনের স্পর্শকাতর তথ্য নিয়ে হ্যাকার বড় ধরনের ক্ষতিসাধন করতে পারে, বড় অঙ্কের অর্থ সম্পদ লুট করতে পারে এবং অপরাধীদের বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারে।

২. White hat hacker (সাদা টুপির হ্যাকার)ঃ এরাও ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকারের মতো একই

---

৯৩২ There is a longstanding controversy about the term's true meaning. In this controversy, the term hacker is reclaimed by computer programmers who argue that it refers simply to someone with an advanced understanding of computers and computer networks, and that cracker is the more appropriate term for those who break into computers, whether computer criminal (black hats) or computer security expert (white hats). A 2014 article concluded that "... the black-hat meaning still prevails among the general public"… (Wikipedia)

৯৩৩ What is Hacking? Introduction & Types, Guru 99. (https://www.guru99.com/what-is-hacking-an-introduction.html)

প্রক্রিয়ায় কাজ করে। তবে এরা হ্যাকিং দক্ষতাকে ভালো কাজে ব্যবহার করে। এরা আসলে দক্ষ প্রোগ্রামার, কম্পিউটার সিকিউরিটি এক্সপার্ট বা ওয়েব সিকিউরিটি স্পেশালিষ্ট অথবা দক্ষ নেটওয়ার্ক এডমিন। এদের কাজ হলো, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সিস্টেমের দুর্বলতার দিকগুলো অনুসন্ধান ও উদঘাটন করা এবং তার সমাধান করা।

আমরা জানি, বর্তমানে সরকারী-বেসরকারী যাবতীয় অফিস ও স্থাপনা কম্পিউটারাইজ্‌ড পদ্ধতিতে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ ব্যাংকের যাবতীয় কাজ কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সাধারণত ব্যাংগুলো তাদের সিংহভাগ ট্রানজেকশন ই-কারেন্সির মাধ্যমে করে থাকে। এমনিভাবে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর পরমাণু স্থাপনা পুরোটাই কম্পিউটারাইজ্‌ড। এসব স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে সাধারণত সবচেয়ে দক্ষ হ্যাকার তথা সিকিউরিটি স্পেশালিষ্ট নিয়োগ দেয়া হয়। বড় বড় হ্যাকারদের এমন অনেক নযির রয়েছে যে, তাদের সীমাহীন দক্ষতা প্রকাশ পাওয়ার পর সরকার তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিয়োগ দান করেছে।[৯৩৪]

৩. Grey hat hacker (ধুসর টুপির হ্যাকার): উপরোক্ত দুই ধরনের হ্যাকার ছাড়া আরেক প্রকার হ্যাকার আছে, যারা নিছক সখের বশে হ্যাক করে। কখনো মানুষের ক্ষতি করে কখনোবা করে না।

উল্লেখ্য, এগুলো আসলে হ্যাক-এর প্রকার। হ্যাকারের নয়। একজন হোয়াইট হ্যাকার কখনো ব্ল্যাক হ্যাকিং করতে পারে। এমনিভাবে একজন ব্ল্যাক হ্যাকারও কখনো হোয়াইট হ্যাকিং করতে পারে।

হ্যাকিং প্রক্রিয়া

হ্যাকিং একটি অসাধারণ সৃজনশীল কাজ। সব হ্যাকিং-কে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ সাধারণত কয়টি পর্বে হ্যাকিং করা হয়, সে বিষয়ে মৌলিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

পাঠককে স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার জন্য ও শর'য়ী বিধান আলোচনার সুবিধার্থে এখানে তাদের উল্লিখিত পুরো হ্যাকিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ ও তার সংক্ষিপ্ত কিছুটা ব্যাখ্যা উল্লেখ করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

হ্যাকিং সাধারণত মৌলিকভাবে চারটি ধাপে হয়ে থাকে। নিম্নে সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা হলো।[৯৩৫]

১ম ধাপ/ পরিদর্শন (Reconnaissance বা الاستطلاع): [৯৩৬] এটি হলো উদ্দিষ্ট কম্পিউটার, প্রোগ্রাম বা নেটওয়ার্ক ও সার্ভার সম্পর্কে জরুরী সকল তথ্য সংগ্রহ করার ধাপ। এ ধাপে হ্যাকার তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সম্ভাব্য ফাঁক-ফোকর, এডমিন, কর্মকর্তা এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে। হ্যাকারগণ এ পর্বে অবস্থাভেদে স্বল্প-দীর্ঘ

---

[৯৩৪] উদাহরণস্বরূপ দেখুন: আল জাজিরা নেট, القرصنة الإلكترونية..سلاح العصر الرقمي

[৯৩৫] এক্ষেত্রে আমরা আহমদ আব্দুর রউফ মুনীফী লিখিত السرقة الإلكترونية وحكمها في الإسلام এর সাহায্য গ্রহণ করেছি।

[৯৩৬] এই ধাপের ব্যাপারে আরো দেখুন: Certified Ethical Hacker Study Guide, P 33-39

বিভিন্ন পরিধির কার্যক্রম চালায়। এ ব্যাপারে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সমীচীন মনে হচ্ছে না। এককথায়, এ ধাপে হ্যাকার সার্ভার এবং তার আওতাধীন সকল ডিভাইসের ব্যাপারে সকল তথ্য সংগ্রহ করে। সুতরাং এটা হলো প্রস্তুতি পর্ব। এ ধাপে উদ্দিষ্ট কম্পিউটারে কোনো হস্তক্ষেপ করা হয় না।

২য় ধাপ/ স্ক্যানিং বা সংযুক্তি পর্ব (Scanning.. বা مرحلة المسح والضم):[৯৩৭] এই ধাপে হ্যাকার তার উদ্দিষ্ট কম্পিউটার বা সফটওয়্যার (যার মাধ্যমে সে কম্পিউটারে প্রবেশ করে) নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত এবং চালু আছে কিনা তা অনুসন্ধান ও যাচাই করে।

এক্ষেত্রে প্রথমে কম্পিউটার সংযুক্ত আছে কিনা তা, অতঃপর উদ্দিষ্ট সফটওয়্যার চালু এবং সংযুক্ত আছে কিনা তা যাচাই করা হয়। এই ধাপ হলো হ্যাকিং এর প্রারম্ভ। চুরির জন্য দরজা খোলা বা সুড়ঙ্গ দ্বারা প্রবেশ করার মতোই।

৩য় ধাপ/ প্রবেশ পর্ব (Gaining access বা الدخول إلى النظام):[৯৩৮] এ পর্বে হ্যাকার উদ্দিষ্ট সিস্টেমে প্রবেশ করে এবং তার নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। সাধারণত প্রবেশের সময় সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম আইডি এবং পাসওয়ার্ড চায়। হ্যাকার দুই পন্থায় তা ম্যানেজ করে প্রবেশ করতে পারে-

ক. পাসওয়ার্ড নষ্ট করার দ্বারা। পূর্বে হ্যাকার সকল আইডি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিলো। এখন সে পাসওয়ার্ড ভাঙ্গার জন্য বিশেষ কিছু সফটওয়্যার/প্রোগ্রাম ব্যবহার করবে। একের পর এক চেষ্টার পর সাধারণত হ্যাকার সফলতা লাভ করে। প্রবেশের পর সে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এডমিনে পরিণত হয় এবং এডমিনের সকল ক্ষমতা সে লাভ করে। সকল ফাইল ও ডেটা তার হাতের নাগালে এসে যায়। তালা বা দরজা ভেঙ্গে সুরক্ষিত বস্তু নিজের আয়ত্বে আনার মতোই।

খ. সফটওয়্যারের নিরাপত্তার বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ দিক ব্যবহার করে তাতে প্রবেশ করা। কারণ, সাধারণত সকল সফটওয়্যারেই কিছু না কিছু ত্রুটি থাকে।

৪র্থ ধাপ/ মূল পর্ব: এ পর্বে হ্যাকার উদ্দিষ্ট ডিভাইস থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে এবং তা কপি করে। মালিকের কপিটি বাকি রাখে বা নষ্ট করে দেয়। এছাড়াও হ্যাকার হ্যাকিং-এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকলে তা বাস্তবায়ন করে। যেমন, চুরি, গোপন তথ্য সম্পর্কে অবগতি, ক্ষতিসাধন, গুরুত্বপূর্ণ নাম্বার বা কোড সংগ্রহ করে তদ্বারা বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করা, ডিভাইসটি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা বা অন্য কোনোভাবে মূল ব্যবহারকারীর ক্ষতিসাধন করা।

তথ্য চুরির ক্ষেত্রে সাধারণত হ্যাকার নিম্নোক্ত ডেটা (তথ্য) বা বিষয় অনুসন্ধান করে:

ক. গুরুত্বপূর্ণ আইডি ও পাসওয়ার্ড। যেমন, ক্রেডিট কার্ড নাম্বার, ব্যাংক হিসাব নং, বীমা নং ইত্যাদি।

খ. সরাসরি ব্যাংক হিসাবে হামলা করে তা থেকে অর্থ (ই-কারেন্সি) লুট করে নেয়।

গ. আরো বিভিন্ন ধরনের ডেটা। যেমন, বই, প্রবন্ধ, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি।

ঘ. বিভিন্ন সফটওয়্যার ও প্রোগ্রাম। বিশেষত দামী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো

---

[৯৩৭] এই ধাপের ব্যাপারে আরো দেখুন: আহমদ আব্দুর রউফ মুনীফী লিখিত السرقة الإلكترونية وحكمها في الإسلام

[৯৩৮] এই ধাপের ব্যাপারে আরো দেখুন: The basic of hacking and penetration, p. 67

সফটওয়্যার।

উপরে আমরা হ্যাকিং-এর গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো উল্লেখ করেছি। অনেকে এর পরে আরো দু'টি ধাপ উল্লেখ করে থাকেন:[৯৩৯]

১. প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ (Maintaining access বা الحفاظ على الدخول): অর্থাৎ, প্রোগ্রাম বা নেটওয়ার্কে প্রবেশ করার পর তাতে অটল বা স্থির থাকার পর্ব।

২. আলামত দূর করা (Covering track বা تغطية/تنظيف الأثار): এ পর্বে হ্যাকার তার অপারেশনের সকল দিক, আলামত ও ছাপ নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস চালায়।

হ্যাকিং-এর শর'য়ী বিধান

পূর্বে আমরা জেনেছি যে, হ্যাকিং একটি ব্যাপক পরিভাষা। এর ধরন, ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন হতে পারে। সে হিসেবে শর'য়ী হুকুমও একেক ক্ষেত্রে একেক ধরনের হবে।

হোয়াইট হ্যাকিং তো স্বাভাবিকভাবেই একটি বৈধ কার্যক্রম। ক্ষেত্রবিশেষে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা পছন্দনীয় বা আবশ্যকীয় হতে পারে। আর গ্রে হ্যাকিং-এর হুকুম হবে তার ভালো-খারাপ উদ্দেশ্য হিসেবে। উদ্দেশ্যহীনভাবে বা নিছক হেলায় খেলায় করলে তা শরী'আতের দৃষ্টিতে অবস্থার বিবেচনায় নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় হবে।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

"মুসলমানের ইসলামের সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকার মধ্যে।"[৯৪০]

ব্ল্যাক হ্যাকিং-এর ধরন থেকে সহজেই অনুমেয় যে, এতে নানাবিধ শর'য়ী আপত্তি রয়েছে। তাই ব্ল্যাক হ্যাকিং সাধারণ অবস্থায় অবৈধ। নিম্নে ব্ল্যাক হ্যাকিং বিদ্যমান কিছু শর'য়ী আপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে-

১. অন্যের গোপন বিষয় জানা বা গোপনীয়তা নষ্ট করা। ব্ল্যাক হ্যাকাররা সাধারণত অন্যের গোপনীয় বিষয়কে অবৈধভাবে অনুসন্ধান করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষের মৌলিক অধিকারের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো, তার সংরক্ষিত ও গোপনীয় বিষয়াদিকে মূল্যায়ন করা। শর'য়ী প্রয়োজন ছাড়া তা লংঘন করার কোনো অনুমতি নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোনো কোনো অনুমান গোনাহ। তোমরা কারো গোপন ক্রটির অনুসন্ধান পড়বে না এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে

---

[৯৩৯] আহমদ আব্দুর রউফ মুনীফী লিখিত السرقة الإلكترونية وحكمها في الإسلام

[৯৪০] (হাসান) সুনানুত তিরমিযী: হাদীস নং ২৩১৭, সুনানু ইবনে মাজা: হাদীস নং ৩৯৭৬, ইবনে হিব্বান: হাদীস নং ২২৯, ইমাম নববী রাহ. হাসান বলেছেন। জামেউল উলূম: ১৪৪

না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাকো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[৯৪১]

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا.

"মানুষের দোষ অনুসন্ধান করো না; গোয়েন্দাগিরি করো না; হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার চর্চা করো না; সবাই এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো।"[৯৪২]

হযরত আবু বারযাহ আসলামী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته.

"হে ঐ সকল লোক, যারা শুধু মুখে ঈমান এনেছো; কিন্তু তোমাদের অন্তরে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ তালাশ করো না। কেননা যে মুসলমানদের দোষ তালাশ করে আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করে দেন তাকে স্বীয় গৃহেই লাঞ্চিত করেন।"[৯৪৩]

আর অন্যের গোপন বিষয় তৃতীয় কারো নিকট প্রকাশ করা তো আরো জঘন্যতম অপরাধ।[৯৪৪]

২. অন্যকে কষ্ট দেওয়া। হ্যাকিং-এর মাধ্যমে অন্যকে অহেতুক বিভিন্নভাবে হয়রানির পাত্র বানানো হয়। এতে ভোগান্তির শিকার হয় সাধারণ মানুষ। আর কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া হারাম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝٥٨

"যারা মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দান করে, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।"[৯৪৫]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

"প্রকৃত মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার মুখ এবং হাত থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে।"[৯৪৬]

---

[৯৪১] সূরা হুজুরাত: ১২

[৯৪২] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫৮২৯, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা

[৯৪৩] (হাদীস হাসান) সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ৪৮৮০, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৯৭৭৬

[৯৪৪] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৪৬৯৩, সুনানু বাইহাকী: হাদীস নং ২১৭৬৬, সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ৪৮৬৯, আবু দাউদের বর্ণনা হলো-

جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:المجالس بالأمانة إلا ثلاثةَ مجالس: سفكُ دمٍ حرام، أو فَرْجٍ حرام، أو اقتطاع مالٍ بغير حق.

[৯৪৫] সূরা আহযাব: ৫৮

[৯৪৬] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ১০

ব্ল্যাক হ্যাকিং এর কোনো ধরন বা প্রকার এ পাপ থেকে মুক্ত নয়।

৩. মুসলমানকে ভীত সন্ত্রস্ত করা। এটি হ্যাকিং-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

«من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه»

"কেউ তার ভাইয়ের দিকে কোনো অস্ত্র দ্বারা ইশারা করলে, তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে লানত করে। যদিও সে (যার দিকে অস্ত্র তাক করেছে) তার আপন ভাই হয়।"[৯৪৭]

৪. মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি। হ্যাক-এর ক্ষেত্রে হ্যাকার বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন পর্যায়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। উদ্দিষ্ট সফটওয়্যারে প্রবেশের জন্য হ্যাকারের নিকট আইডি চাওয়া হলে সে মিথ্যা আইডি প্রদান করে। এছাড়াও আরো বিভিন্নভাবে সে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। এসব কাজ বা আচরণ শরী'আতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

"সুতরাং তোমরা প্রতিমাদের কলুষ পরিহার করো এবং মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকো।"[৯৪৮]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إذا أؤمن خان، وإذا حدث خان، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر.

"চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে পাক্কা মুনাফিক। যার মধ্যে এই স্বভাবগুলোর কোনো একটি থাকবে, তার মধ্যে মুনাফিকির একটা স্বভাব থাকবে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করবে (১) যখন তার নিকট কিছু আমানত রাখা হয়, তাতে সে খিয়ানত করে। (২) সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। (৩) যখন ওয়াদা করে, ভঙ্গ করে এবং (৪) যখন কারো সাথে ঝগড়া করে, তখন সে অশ্লীল ব্যবহার করে।"[৯৪৯]

হযরত আবু বাকরাহ রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها، حتى قلنا: ليته سكت.

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ সম্পর্কে খবর দিবো না? (এভাবে তিন বার বললেন)। আমরা বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা। (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। রাসূল ﷺ হেলান দিয়ে ছিলেন।

---

৯৪৭ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬১৬

৯৪৮ সূরা হজ্ব: ৩০

৯৪৯ সহীহ মুসলিমঃ হাদীস নং ৫৮, সহীহ বুখারীঃ হাদীস নং ৩৪, ২৪৫৯

এবার তিনি (তৃতীয় গুনাহটির গুরুত্ব বোঝাতে) সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখো, (৩) মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া (এভাবে তিন বার বললেন)। সাহাবী বলেন, রাসূল ﷺ এই কথা বারবার বলছিলেন। এমনকি আমরা বলছিলাম, যদি রাসূল ﷺ চুপ করতেন!"[৯৫০]

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

«من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا».

"যে আমাদের উপর অস্ত্র চালালো সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যে আমাদের ধোঁকা দিলো সেও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৯৫১]

৫. চুরি-ডাকাতি। সাধারণত হ্যাক-এর শেষ পর্যায়ে কোনো না কোনোভাবে চুরি করা হয়। আর শরী'আতে চুরি-ডাকাতি নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝٣٨

"যে পুরুষ ও যে নারী চুরি করে, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, যাতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। (এবং) আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। আল্লাহ ক্ষমতাবান প্রজ্ঞাময়।"[৯৫২]

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن.

"কোনো যিনাকারী যিনা করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। কোনো মদপানকারী মদ পান করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। কোনো ব্যক্তি মুমিন থাকা অবস্থায় প্রকাশ্য জনসম্মুখে অপরের সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারে না।"[৯৫৩]

৬. অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করা। অনেক হ্যাকার র‍্যানসমওয়্যার (Ransomware) নামক ম্যালওয়্যারের (ভাইরাস) মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেম বা প্রোগ্রাম ব্লক করে পণ আদায় করে। এটা নিঃসন্দেহে হারাম ও মারাত্মক গর্হিত কাজ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না।"[৯৫৪]

হযরত আবু উমামা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

---

[৯৫০] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২৬৫৪, সুনানে বাইহাকী: হাদীস নং ২০৮৭৯, ২১০৮৭
[৯৫১] সহীহ বুখারী: হদীস নং ৬৮৭৪, সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১০১, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা
[৯৫২] সূরা মায়েদা: ৩৮
[৯৫৩] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৬৭৭২, মাকতাবাতুল ফাতাহ, ঢাকা
[৯৫৪] সূরা বাকারা: ১৮৮

«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة»

"যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে মুসলমানের অধিকার হরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম আবশ্যক করে দেন এবং জান্নাতকে হারাম করে দেন।"[৯৫৫]

উল্লিখিত প্রত্যেকটা সমস্যাই এমন যে, কোনো কাজে তা বিদ্যমান থাকলে কাজটি বৈধ হতে পারে না। আর এখানে সবগুলো প্রায় একসাথেই পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া এ ধরনের হ্যাকের কারণে বিভিন্নভাবে সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে। সুতরাং সর্বদিক থেকেই এটা একটা অপরাধ; বরং জঘন্য অপরাধ।

হ্যাক ও সাইবার আক্রমণ বৈধ হওয়ার কিছু ক্ষেত্র

স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, জনকল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। তাই জনকল্যাণের সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ ও এর প্রতিবন্ধক সকল বিষয়কে অপসারণের ক্ষেত্রে ইসলাম বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। "ইসলামের মাকাছেদে 'আম্মা" (মৌলিক উদ্দেশ্য)-এর অন্যতম হলো জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। সুতরাং কখনো ব্যক্তিস্বার্থ জনকল্যাণের জন্য প্রতিবন্ধক হলে ইসলাম সেক্ষেত্রে জনকল্যাণকেই প্রাধান্য দেয়।

পূর্বে হ্যাকিং-এ বিদ্যমান শর'য়ী আপত্তির যেসব দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, তা ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত। তাই জনকল্যাণের স্বার্থে এ ধরনের হ্যাকিং করা যেতে পারে। তবে তা শর্তসাপেক্ষ।

ব্ল্যাক হ্যাকিং বা আক্রমণাত্মক হ্যাকিং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈধ বা করণীয় হতে পারে। যেমন-

১. অপরাধ দমন ও মুসলমানদের শত্রুদের উপর নজরদারীর ক্ষেত্রে।[৯৫৬] ডাকাত, সন্ত্রাসী, অপরাধী গোষ্ঠী বা মুসলমানদের শত্রুদের প্রোগ্রাম, নেটওয়ার্ক ও আইডি তাদের পরিকল্পনা ও গতিবিধির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে হ্যাক করা জায়েয আছে। তবে এ কাজটি রাষ্ট্র বা মুসলমানদের কোনো দায়িত্বশীল ও নির্ভরযোগ্য অথরিটি বা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে হতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ এমন করা সমীচীন হবে না।

২. মুনকার বা পাপাচার দমনের ক্ষেত্রে।[৯৫৭] সুতরাং অশ্লীল সাইট বা মুসলমানদের শত্রুদের সাইটগুলো ধ্বংস ও বিনষ্ট করা জায়েয। উক্ত বিধান ঐ সকল আইডি বা সাইটের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে, যা মানুষকে কষ্ট দেয়া এবং তাদের সম্পদ হরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

তবে এ কাজের জন্য কিছু নিয়ম-নীতি ও শর্ত রয়েছে। যেমন-

ক. যার আইডি হ্যাক করা হবে বা যে সফটওয়্যার বা নেটওয়ার্ক হ্যাক করা হবে, তার অপরাধ বা সীমালঙ্ঘন নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হওয়া।

খ. উদ্দিষ্ট ব্যক্তিই যে উক্ত হ্যাক বা সাইবার হামলার শিকার হচ্ছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

---

[৯৫৫] সহীহ মুসলিমঃ হাদীস নং ১৩৭

[৯৫৬] আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- (সূরা নিসাঃ ১০২): وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

[৯৫৭] হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত (সহীহ মুসলিমঃ হাদীস নং ৪৯), তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি-

«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»

নইলে ভুলক্রমে অন্য কোনো নির্দোষ ব্যক্তির ক্ষতিসাধন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
গ. হ্যাক বা সাইবার অক্রমণের দ্বারা ফায়েদা হওয়ার নিশ্চয়তা থাকা।
ঘ. দাফউল মুনকার (পাপাচার নিমূল)-এর জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকা। যেমন, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত অন্যান্য ফাইল ও ডেটায় হস্তক্ষেপ না করা।
জনকল্যাণের স্বার্থে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের অনেক দৃষ্টান্ত ইসলামে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন যুদ্ধে কাফেরদের অবস্থা ও তাদের গতিবিধি অনুসরণের জন্য গোয়েন্দা প্রেরণ করতেন। হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাযি. বলেন-

والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل هويا، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنة، فما قام رجل، ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم، ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف، وشدة الجوع، وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال: يا حذيفة، فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا، قال: فذهبت فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدرا، ولا نارا ولا بناء، فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه، فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي، فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان، ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم ، قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل، فلما رآني أدخلني إلى رحله، وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإنه لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فانشمروا إلى بلادهم.

"আল্লাহর শপথ। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খন্দকের প্রান্তরে অবস্থান করছি। তিনি রাতের কিছু সময় সালাতে মগ্ন রইলেন। অতঃপর আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তোমাদের মাঝে কেউ আছে কি যে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হয়ে আসবে? তিনি বললেন, সে ফিরে আসবে তো আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত বরাদ্দ করে দিবেন। কেউ দাঁড়ালো না। অতঃপর হুযুর ﷺ আরো কিছুক্ষণ নামাযে রত রইলেন এবং পুনরায় আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি যে শত্রুর মাঝে গিয়ে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে আসবে? এবং তার জন্য এই খোশখবরি দিলেন যে, আমি আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবো, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতে আমার সাথী করেন। তীব্র শীত, অনাহার ও ভীতির কারণে কেউ দাঁড়ালো না। যখন কেউ

দাঁড়ালো না রাসূল ﷺ আমাকে ডাকলেন। যেহেতু আমাকেই নির্দিষ্টভাবে ডেকেছন, তাই আমার সাড়া দেয়া ছাড়া উপায় ছিলো না। হুযুর ﷺ আমাকে বললেন, হুযায়ফা! শত্রুশিবিরে যাও। দেখে আসো তারা কী করে। এখানে ফিরে আসার আগে কিছু ঘটিয়ে বসো না।

হযরত হুযায়ফা রাযি. বলেন, আমি তাদের মাঝে প্রবেশ করলাম। প্রবল বাতাস ও আল্লাহর বাহিনী তাদের নিয়ে লীলাখেলায় মত্ত। বাতাস তাদের তাবু, চুলা-পাতিল সব তছনছ করে দিলো। তাদের সর্দার আবু সুফিয়ান ইবনে হারব দাঁড়ালো। প্রথমেই বললো, হে কোরাইশগণ! তোমাদের কার পাশে কে আছে জেনে নাও (আঁধারের কারণে কিছুই দেখা যাচ্ছিলোনা। তাই বাইরের কোন অনুপ্রবেশকারী আছে কিনা শনাক্ত করতে তার এই কৌশল) হুযায়ফা বলেন, আমি সাথে সাথে আমার পাশের ব্যক্তির হাত ধরে জানতে চাইলাম, তুমি কে? সে বললো, অমুকের ছেলে অমুক। অতঃপর আবু সুফিয়ান বললো, হে কোরাইশ শোন! এখানে তোমাদের আর অবস্থান করার জো নেই। তোমাদের পশুসমূহ বরবাদ হয়েছে। বনু কোরাইজা আমাদের সাথে গাদ্দারি করেছে। তাদের মতিগতি ভালো না। আর তুফান আমাদের কি বারোটা বাজিয়েছে তা তো তোমরা দেখছোই। আমরা চুলা জ্বালাতে পারছি না। পাতিল বসাতে পারছি না। আমাদের থাকার তাঁবুগুলো পর্যন্ত রক্ষা করতে পারছি না। অতএব ভাগো। এই বলে সে তার উটের উপর চড়ে বসলো। তিন বার আঘাত করার পর গিয়ে দাঁড়ালো। আমার জন্য সুবর্ণ সুযোগ ছিলো। 'ফিরে আসার আগ পর্যন্ত কিছু ঘটিয়ে বসো না'- রাসূল ﷺ-এর এই আদেশ না থাকলে আমি তাকে তীরের নিশানা বানানোর কামনা করছিলাম। হুযায়ফা বলেন, এরপর আমি ফিরে এলাম। রাসূল সা. তাঁর কোনো এক স্ত্রীর হাওদাজ অঙ্কিত চাদর জড়িয়ে নামাযে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি যখন আমাকে দেখলেন, তার বাহনের ভেতর প্রবেশ করালেন এবং চাদরের একটি অংশ আমার উপর চড়িয়ে দিলেন। চাদরের এক অংশ গায়ে থাকা অবস্থায় তিনি রুকু সেজদা করলেন। সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করলে আমি তাকে সংবাদ জানালাম। কোরাইশদের পলায়নের খবর পেয়ে গাতফান গোত্রও তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্বদেশের অভিমুখে পলায়ন করলো।"[৯৫৮]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ. (৮৫৫ হি.) বলেন-

ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلانا خلا بشخص ليقتله ظلما، أو بامرأة ليزني بها، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذار من فوات استدراكه.

"ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তালাশ-অনুসন্ধান নিষেধ। তবে যদি কাউকে রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য হয়, তাহলে বৈধ হবে। যেমন, বিশ্বস্ত ব্যক্তির মারফতে জানা গেলো যে অমুক কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য অথবা কোনো মহিলার সাথে যিনা করার জন্য প্রস্তুত। এক্ষেত্রে কিছু ঘটিয়ে ফেলার আগেই যেন তাকে নিবৃত্ত করা যায় সে উদ্দেশ্যে তার ব্যাপারে তদন্ত ও অনুসন্ধান করা যাবে।"[৯৫৯]

এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ সব ফিকহী মাযহাবেই স্বীকৃত। বিভিন্ন ফিকহের অনুসারী আলেমদের

---

[৯৫৮] মুখতাসার সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৭৮৮, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২৩৩৩৪

[৯৫৯] উমদাতুল ক্বারী: ১৫/২১৮, মাকতাবাতু দারিল ফিকর, বৈরুত, باب ما ينهى من التحاسد والتدابر

লিখিত সীরাত ও সিয়াসাতে শার'ইয়্যাহ সম্পর্কিত গ্রন্থ থেকে নিম্নে কিছু উদ্ধৃতি প্রদান করা হলো।

আল্লামা আব্দুল হাই কাত্তানী রাহ. (১৩৮২ হি.) বলেন-[৯৬০]

باب في الرجل يتخذ في بلد العدو عينا يكتب بأخبارهم إلى الإمام

في الاستيعاب في أخبار العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم العباس قبل فتح خيبر، وكان يكتم إسلامه، وكان يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: إن مقامك بمكة خير.

وترجم في الإصابة لأنس بن أبي مرثد الغنوي، فنقل عن ابن سعد: هو كان عين النبي صلى الله عليه وسلم بأوطاس.

باب في جعل الإمام العين على الناس في بلده

في شمائل الترمذي من حديث ابن أبي هالة الطويل: كان صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عما في الناس قال ابن التلمساني في شرح الشفا: ليس من باب التجسس المنهي عنه، وإنما هو ليعرف به الفاضل من المفضول، فيكونون عنده في طبقاتهم، وليس هو من الغيبة المنهي عنها، وإنما هو من باب النصيحة المأمور بها هـ. وقال المناوي على الشمائل: وهذا إرشاد للحكام إلى أن يكشفوا ويتفحصوا، بل ولغيرهم ممن كثر أتباعه كالفقهاء والصالحين والأكابر، فلا يغافلوا عن ذلك لئلا يترتب عليه ما هو معروف من الضرر، الذي قد لا يمكن تدارك رفعه اهـ، وقال الحافظ في باب الصبر على الأذى، من الفتح، على القصة التي قال فيها عليه السلام: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر منهذا فصبر: في هذا الحديث جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم، ليحذروا القائل اهـ.

وأخرج أسيد بن موسى في كتاب: فضائل الشيخين عن الحر قال: كان لعمر عيون على الناس.

"অধ্যায়: শত্রু এলাকায় অবস্থান করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদের বার্তা পাঠানো।

'ইসতিআব' কিতাবে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের ঘটনা-প্রবাহে বলা উল্লেখ করা হয়েছে- আব্বাস খায়বার যুদ্ধের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তার ইসলাম গ্রহণকে গোপন করছিলেন। তিনি মুশরিকদের তৎপরতা সম্পর্কে গোপনে রসূল ﷺ-কে অবহিত করতেন। রাসূল ﷺ তাকে লেখেছিলেন, তোমার মক্কায় রয়ে যাওয়াটাই ভালো হয়েছে।

'ইসাবা' কিতাবে আনাস ইবনে আবি মারসাদ আল গানাবী রযি.-এর জীবনীতে ইবনে সা'দের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি আওতাসে নাবী ﷺ-এর পক্ষে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছেন।

অধ্যায়: আমীর স্বীয় অঞ্চলে জনগণের গতিবিধির উপর নজরদারীর জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করতে পারে।

তিরমিযীর শামায়েলে মুহাম্মাদিয়াতে ইবনে আবী হালার নাতিদীর্ঘ বর্ণনায় এসেছে- রাসূল ﷺ

---

[৯৬০] আত তারাতীবুল ইদারিয়্যাহ = নিযামুল হুকুমাতিন নাবাভিয়্যাহ: ১/৩৬২

মানুষের হাল-অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। ইবনে তিলমিসানী শারহুশ শিফা-এ লিখেন- এটা নিষিদ্ধ ছিদ্রান্বেষের মধ্যে পড়ে না; বরং এটা ছিলো মানুষের অবস্থান জানার জন্য। তাদের মধ্যে কে উত্তম, অনুত্তম তা জনার জন্যে। যাতে প্রত্যেকে তার কাছে যথাযথ মর্যাদা পায়। অতএব এটা নিন্দনীয় গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং পছন্দনীয় কল্যাণকামীতার মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম মুনাবী রাহ. শামায়েলের টীকায় বলেন, এখানে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তারা যাতে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে এবং দেশে কী চলছে- সে ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিবহাল থাকেন। শুধু শাসক কেন; বরং যে সমস্ত উলামা ফুকাহা ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাদের কাছে অনেক মানুষ যাতায়াত করে, তাঁদেরও সতর্ক থাকা উচিত। খোঁজখবর রাখা উচিত। যাতে সমূহ ঝামেলা যেগুলোর ব্যাপারে পূর্ব সতর্কতা না থাকলে সামাল দেয়া সম্ভব হয় না, তা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. স্বীয় গ্রন্থ ফাতহুল বারী'তে মুসিবতের সময় ধৈর্য ধারণের অধ্যায়ে একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে– যেখানে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা মূসার উপর রহম করুন! তিনি এরচে' বেশি বেশি মুসিবতে পড়েছেন, অতঃপর অবিচল থেকে ধৈর্য ধরেছেন।' বলেন এই হাদীস থেকে আমীরের জন্য মানুষের কে কী বলে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখা বৈধ হওয়া প্রমাণিত হয়। যাতে পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করা যায়।

উসাইদ ইবনে মুসা 'ফাজাইলুশ শায়খাইন' কিতাবে 'হার' রাহ. থেকে বর্ণনা করেন, মানুষের মাঝে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য উমর রাযি.-এর গোয়েন্দা ছিলো।"

আল্লামা আবুল হাসান মাওয়ার্দী শাফেয়ী রাহ. (৪৫০ হি.) বলেন-

وأما ما لم يظهر من المحظورات، فليس للمحتسب أن يتجسس عنها، ولا أن يهتك الأستار حذرًا من الاستتار بها، قال النبي –عليه الصلاة والسلام: "من أتى من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله تعالى.

فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارات دلت، وآثار ظهرت، فذلك ضربان:

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل: أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلًا خلا بامرأة ليزني بها، أو برجل ليقتله، **فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسَّس** ويقدم على الكشف والبحث، حذرًا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات.

والضرب الثاني: ما خرج عن هذا الحد وقصر عن حد هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه....

"যে সব নিষিদ্ধ বিষয় প্রকাশ পায় না, সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করা মুহতাসিবের[৯৬১] করণীয় নয়। সে মানুষের সম্ভ্রমচাদরকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবে না। নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোনো গান্দা নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে, সে যেন আল্লাহর চাদরে আড়াল গ্রহণ করে; কেননা যে নিজের পাপ প্রকাশ করে দিবে, আমরা তার উপর হদ কায়েম করবো। যদি আলামত ও নিদর্শনের

[৯৬১] মুহতাসিব হলো, যিনি হিসবাহ তথা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে থাকেন।

দ্বারা কোনো সম্প্রদায়ের অপরাধের ব্যাপারে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়, তাহলে তার দুই অবস্থা:

১. যদি মারাত্মক পর্যায়ের হারাম সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা পরবর্তীতে পুষিয়ে নেয়ার সুযোগ নেই। যেমন বিশ্বস্ত ব্যক্তির মারফতে জানা গেলো, অমুক ব্যক্তি এক নারীর সাথে নির্জনে যিনা করতে উদ্যত। অথবা কাউকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রশাসনের জন্য গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করা বৈধ।

২. যেসব বিষয় এমন মারাত্মক পর্যায়ের নয়। এসব ক্ষেত্রে তদন্ত-অনুসন্ধান বৈধ হবে না।"[৯৬২]

আল্লামা ইবনে ফারহুন মালেকী রাহ. (৭৯৯ হি.) বলেন-

قال ابن حبيب وسمعت ابن الماجشون يقول في اللصوص وقطاع الطريق: أرى أن يطلبوا في مظانهم ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب.

"ইবনে হাবীব বলেন, আমি ইবনুল মাজিশুনকে চোর-ডাকাতের বিচারের ব্যাপারে বলতে শুনেছি, আমি মনে করি তাদের ঘাঁটিতে হানা দিয়ে তাদেরকে বের করা উচিত। অতঃপর তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা নির্বাসন দেওয়া হবে।[৯৬৩]

সত্যায়নে

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৮ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১২ রজব ১৪৩৯ হি.

---

[৯৬২] আল আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, ২০ নং অধ্যায়, الباب العشرون في أحكام الحسبة

[৯৬৩] তাবসিরাতুল হুক্কাম ফী উসূলিল আকযিয়া ওয়া মনাহিজিল হুক্কাম: ২/১৮৭

সফটওয়্যার পাইরেসি ও সংশ্লিষ্ট বিষয় : শর'য়ী দৃষ্টিকোণ

মাওলানা আনাছ বিন ওয়াহিদ, সন্দ্বীপ

কম্পিউটারের একটি মৌলিক উপাদান হলো সফটওয়্যার। সফটওয়্যার ছাড়া কোনোভাবেই কম্পিউটার ব্যবহার ও পরিচালনা সম্ভব নয়। এসব সফটওয়্যার তৈরীতে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো বিশাল জনবল, মেধা, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে। প্রচলিত আইনের চাহিদা অনুযায়ী তারাই তাদের আবিষ্কৃত এসব সফটওয়্যারের একচ্ছত্র উৎপাদন, বিক্রয় এবং তা থেকে অর্জিত মুনাফা ভোগের অধিকার রাখে। কিন্তু বর্তমানে কপি, ডুপ্লিকেশন, ক্র্যাক, প্যাচ ইত্যাদি এতটাই সহজ হয়ে গিয়েছে যে, সফটওয়্যার বের হবার পর বেশিদিন যেতে না যেতেই বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার কপিরাইট হরণ করে বসে। তৃতীয় বিশ্বের বাজারে সাধারণত সফটওয়্যারের ঐ সব নকল কপির ছড়াছড়িই থাকে। মানুষ স্বল্পমূল্যে বা সম্পূর্ণ ফ্রী-ভাবে দোকান থেকে বা নেট থেকে ঐ সব সফটওয়্যার সংগ্রহ করে ব্যবহার করে। এভাবে সফটওয়্যার পাইরেসি বা পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনজীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কী? বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা এই বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির উত্তর প্রদানের চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীকদাতা।

সফটওয়্যার পাইরেসি : পরিচিতি ও বিভিন্ন ধরন

এই বইয়ের হ্যাকিং সংক্রান্ত প্রবন্ধে কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কম্পিউটার প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের কপিরাইট লঙ্ঘন বা হরণ করাকে পাইরেসি বলা হয়। অবৈধভাবে সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম ব্যবহার করা, কপি (পুনরুৎপাদন) করা বা বিতরণ করা, এক কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য অনুমোদন নিয়ে একাধিক কম্পিউটারে ব্যবহার করা ইত্যাদি পাইরেসির বহুল প্রচলিত রূপ।[৯৬৪]

ইংরেজী পাইরেসি (Piracy) শব্দের অর্থ দস্যুতা। অন্যের কষ্ট, শ্রম, অর্থ ও ঘামে তৈরী করা সফটওয়্যারকে নকল করে অবৈধ অর্থ উপার্জনকে দস্যুতার সাথে তুলনা করে পাইরেসি বলা হয়।

কপিরাইট একটি ব্যাপক অধিকার। সৃজনশীল কর্মের বহুবিধ ব্যবহার এর আওতায় আসতে পারে। সুতরাং পাইরেসি বা কপিরাইট লঙ্ঘন শুধু পুনরাৎপাদনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অবস্থা ও পদ্ধতি হিসেবে পাইরেসির বিভিন্ন রূপ হতে পারে। ব্যাপকার্থে পাইরেসি বলতে পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহারকেও বুঝানো হয়।

নিম্নে শর'য়ী হুকুম বর্ণনার সুবিধার্থে পুনরুৎপাদন ও পুনঃব্যবহার এই দু'প্রকারের পাইরেসির কিছু প্রচলিত রূপ উল্লেখ করা হলো।[৯৬৫]

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে পাইরেসি তিন ধরনের হতে পারে:

---

[৯৬৪] Softchoice. (https://www.softchoice.com/licensing/microsoft/piracy.aspx)

[৯৬৫] https://www.symantec.com/en/uk/about/legal/anti-piracy/types-piracy

১. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পাইরেসি। অর্থাৎ, সফটওয়্যার বিক্রয় ও পরিবেশন করে ব্যবসায়িকভাবে লাভ করার জন্য পাইরেসি। এর বিভিন্ন রূপ বর্তমানে প্রচলিত আছে। যেমন-

ক. জেনুইন (লাইসেন্সকৃত) বা পাইরেটেড (লাইসেন্সবিহীন) সফটওয়্যার কপি করে বিক্রয় করা। সাধারণত এ ধরনের সফটওয়্যার ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

খ. সফটওয়্যার হুবহু ডুপ্লিকেট করে বাজারজাত করা। আমাদের দেশে দোকানপাটে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের যে সিডি পাওয়া যায়, তার সিংহভাগ পাইরেটেড। নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

গ. ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে পাইরেটেড সফটওয়্যার যুক্ত করে তা বিক্রয় করা।

২. ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে পাইরেসি। এরও বিভিন্ন রূপ হতে পারে:

ক. জেনুইন সফটওয়্যার যা শুধু এক কম্পিউটারে ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে বা একবার ব্যবহারের লাইসেন্স রয়েছে, তা একাধিক বার বা একাধিক কম্পিউটারে ব্যবহার করা।

খ. জেনুইন ট্রায়াল (নির্দিষ্টমেয়াদী) সফটওয়্যার ট্রায়াল শেষ হবার পরও ব্যবহার করা।

গ. অননুমোদিত ডিলার থেকে পাইরেটেড সফটওয়্যার ক্রয় করে তা ব্যবহার করা।

ঘ. সফটওয়্যার ক্র্যাক করে ব্যবহার করা।

ঙ. ইন্টারনেট থেকে ফ্রী (পাইরেটেড) সফটওয়্যার বা তার কোনো অংশ ডাউনলোড করে ব্যবহার করা।

উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত ব্যবহার বলতে আমাদের উদ্দেশ্য, সফটওয়্যারটি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিবেশন ও বিক্রয় না করে নিজে ব্যবহার করা। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফটওয়্যার বিক্রয় ও পুনরুৎপাদন তো উদ্দেশ্য হয় না, তবে সফটওয়্যারটিকে ব্যবসায়িক বা আর্থিক কাজে লাগানো হয়।

এ ধরনের সফটওয়্যারের বর্তমানে অভাব নেই। আমাদের হাতের নাগালেই রয়েছে বিখ্যাত Adobe কোম্পানির ফটোশপ, ইলস্ট্রেটর, ইন-ডিজাইন, ফ্লাশ বিল্ডার, ফায়ারওয়ার্কস ইত্যাদি সফটওয়্যার। এসব সফটওয়্যার দিয়েই সাধারণত ছাপাখানা, কম্পিউটার ও গ্রাফিক্সের নানা কাজ করা হয়।

৩. ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়; বরং জনসাধারণের সুবিধার্থে কপিরাইটেড সফটওয়্যার ক্র্যাক করে ফ্রী বা ওপেনসোর্স করে রাখা।

সফটওয়্যার পাইরেসি : কিছু বিষয় ও বাস্তবতা

সফওয়্যার পাইরেসির শর‘য়ী বিধানের ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয় হলো, কপিরাইট সম্পর্কে শর‘য়ী দৃষ্টিভঙ্গী। এছাড়াও সফটওয়্যার পাইরেসির শর‘য়ী বিধান জানার বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরো কিছু বিষয় বোঝা জরুরী। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা পেশ করা হলো।

১. মেধাস্বত্ব বা কপিরাইট: পরিচিতি ও বিশ্লেষণ

যেহেতু পাইরেসি মূলত সফটওয়্যারের কপিরাইট বা মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের নাম, তাই বিষয়টি ভলোভাবে বোঝার জন্য কপিরাইট সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ রা জরুরী।

আমরা জানি, সমাজ, আইন ও শরী‘আতের দৃষ্টিতে ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অধিকার রয়েছে। এসব অধিকার অনেক ক্ষেত্রে সমাজের দৃষ্টিতে অর্থ ও সম্পত্তি গণ্য হয় এবং তার

ক্রয়-বিক্রয় ও আদান-প্রদানও হয়ে থাকে।

আর্থিক অধিকার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এর মাঝে অন্যতম হলো কপিরাইট বা মেধাস্বত্ব। অর্থাৎ, সৃজনশীল যেকোনো কর্ম পুনরুৎপাদন ও বিনিয়োগের অধিকার, যা উক্ত কর্মের নির্মাতা বা সৃজনকারী এককভাবে সংরক্ষণ করে থাকে। এ অধিকারকে বস্তুগত সম্পদের সাথে তাল মিলিয়ে Intellectual property তথা 'বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ' বা 'মেধা সম্পদ'ও বলা হয়। ইংরেজী Copyright শব্দটির মধ্যেই এর অন্তর্নিহিত অর্থটি লুকিয়ে আছে। Copy শব্দের অর্থ, কপি বা নকল করা এবং Right শব্দের অর্থ, অধিকার। অর্থাৎ, কপি বা পুনরুৎপাদনের অধিকার। আরবীতে মেধাসত্বকে حقوق الملكية الفكرية অথবা حقوق الابتكار বা الحقوق الأدبية বলা হয়।

কপিরাইট বা মেধাস্বত্ব কোনো বস্তুর মালিকানার মতো নয়। যে ব্যক্তি কোনো নতুন গবেষণাকর্ম বা কোনো ক্ষেত্রে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে, সে শুধু তার উদ্ভাবিত এবং তার মালিকানাধীন নির্দিষ্ট বস্তুটির মালিক নয়; বরং সে তার ঐ সৃজন কর্ম বা মেধাকর্মের যাবতীয় অর্থনৈতিক ফায়েদা ভোগের অধিকার রাখে। অর্থাৎ, সেই একমাত্র ঐ নবউদ্ভাবিত কর্ম বা বস্তুটি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পুনরুৎপাদন, পরিবেশন ও তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। 'সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা শিল্পের বিভিন্ন প্রকার কাজের একটা বিরাট পরিব্যাপ্তিতে মেধাস্বত্ব থাকতে পারে। কবিতা, প্রবন্ধ, বই-পুস্তক এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্ম, অডিও রেকর্ডিং, চিত্র বা পেইন্টিংস, আঁকা বা ড্রইং, সফটওয়্যার, স্থাপত্য শিল্প-নকশা ইত্যাদি মেধাসত্ব বা কপিরাইটের আওতায় আসতে পারে।'[৯৬৬]

সকল ধরনের সৃষ্টিশীল কর্মই কর্মের নির্মাতা বা রচয়িতার অনুমতি ছাড়া কপি বা পুনরুৎপাদন, অনুবাদ, রূপান্তর বা অভিযোজন, তা বাণিজ্যিক বা ব্যক্তিগত, যে পর্যায়েই হোক না কেন, তা কপিরাইট ধারণা ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দেশীয় আইনের পরিপন্থী। যেহেতু কম্পিউটার প্রোগ্রামও একটা সৃজনশীল কর্ম, তাই এর নির্মাতাও এই আইনের মাধ্যমে তার অধিকার সংরক্ষণ করে।

কপিরাইটের ইতিহাস

'কপিরাইটের ধারণা ও ব্যাপক প্রচলন আধুনিক যুগেই হয়েছে। আধুনিক ছাপাখানার আবিষ্কার ও প্রচলনের পূর্বে এ নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিলো না। আঠারো শতকের শুরুর দিকে ছাপাখানাগুলোর একচেটিয়া আচরণের প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে ব্রিটেনে এরকম একটি আইনের ধারণা জন্ম নেয়।'[৯৬৭] সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যে ১৬৬২ সালে কপিরাইট আইন (Licensing of the Press Act 1662) পার্লামেন্টে পাস হয় ।

১৯৮০-র পূর্বে সফটওয়্যারগুলোর কপিরাইট সংরক্ষণের উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ ছিলো না। কারণ, সাধারণত ঐ সময় সফটওয়্যারগুলোর ফরম্যাট এমন হতো, যা কপি করা দুঃসাধ্য ছিলো। ফ্লপি ডিস্ক আসার পর প্রথম সহজে কপি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের

[৯৬৬] উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ, 'কপিরাইট' প্রবন্ধ (ঈষৎ পরিবর্তন সহকারে)
[৯৬৭] উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ, 'কপিরাইট' প্রবন্ধ

জন্য গ্রহণ করা হয় নানা ধরনের উদ্যোগ। বিস্তারিত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়[৯৬৮]।

বর্তমানে সারা বিশ্বে আইনগতভাবে কপিরাইট একটি স্বীকৃত অধিকার। পাইরেসি রুখতে এবং মেধাভিত্তিক সম্পদ বাঁচাতে আমাদের দেশে প্রণয়ন করা হয় কপিরাইট আইন, ২০০০। বর্তমানে আমাদের দেশে কপিরাইট আইন, ২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) বলবৎ আছে। কপিরাইট আইন ২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) -এ সর্বমোট **১৭** টি অধ্যায় এবং **১০৫**টি ধারা বিদ্যমান। এতে কপিরাইট লঙ্ঘনজনিত অপরাধ, অপরাধের প্রকৃতি এবং তার বিপরীতে শাস্তির বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়াও কপিরাইট সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন চুক্তি হয়েছে। যেমন, **১৮৮৬** সালে সুইজারল্যান্ডে 'প্রটেকশন অফ লিটারারী এন্ড আর্টিস্কিক ওয়ার্কস ট্রিটি,[৯৬৯] **১৯৫২** সালে (জেনেভায়) এবং **১৯৭১** সালে (প্যারিসে) ইউনিভার্সাল কপিরাইট কনভেনশন ট্রিটি। বাংলাদেশ উপরোক্ত তিনটি ট্রিটিতেই সই করেছে।[৯৭০]

এই ট্রিটিগুলোতে সই করার মাহাত্ম্য হচ্ছে, যেসব দেশ এর আওতায় আছে, তাদের জনগণের কপিরাইট আপনা-আপনি বলবৎ হবে। কোনো সরকারী অফিসে তার নিবন্ধন করা লাগবে না। তবে এটা হলো কপিরাইট নির্ধারণের বিষয়; কিন্তু যে বিধিবিধানের মাধ্যমে কপিরাইট লঙ্ঘনের প্রতিকার হবে, সেটি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর নিজস্ব আইন মোতাবেক হবে।

উল্লেখ্য, কপিরাইট কোনো স্থায়ী অধিকার নয়। এর নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। যেমন, মালিকের মৃত্যুর পর এতো বছর বা নির্মাণের পর থেকে এতো বছর। বাংলাদেশে প্রচলিত কপিরাইট আইন, ২০০০ অনুসারে (ধারা-২৪) ফটোগ্রাফ ব্যতীত অন্যান্য কর্মের মেয়াদ কপিরাইট প্রণেতার মৃত্যুর পর থেকে ৬০ বছর। আর ফটোগ্রাফের মেয়াদ ফটোগ্রাফের পর থেকে নিয়েই ৬০ বছর।

২. সফটওয়্যারের দুর্লভ্যতা ও পাইরেসির চল

আমরা ইতিপূর্বে সফটওয়্যার পাইরেসি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন করেছি। কিন্তু শর'য়ী হুকুম বোঝার জন্য বর্তমান বাস্তবতার আলোকেও একবার পুরো বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা জরুরী। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এ প্রসঙ্গে কিছু কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

আমরা জেনেছি যে, মেধাস্বত্ব আইন ও সমাজের দৃষ্টিতে একটি স্বীকৃত ও যৌক্তিক অধিকার। তবে এ অধিকারের লঙ্ঘন সারা পৃথিবীতেই[৯৭১] ব্যাপকভাবে হচ্ছে। বিশেষত নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মানুষ এ অধিকার সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। বিভিন্ন কারণে এসব দেশে সফটওয়্যার পাইরেসির হার অনেক বেশি। যেমন, চড়া মূল্য, দুষ্প্রাপ্যতা, জটিল ব্যবস্থাপনা,

---

[৯৬৮] বিস্তারিত দেখুন: A Briet History of Software protection and Licensing, Temptation interactive, Nov 8, 2013

[৯৬৯] ট্রিটি (treaty) শব্দের অর্থ, চুক্তি।

[৯৭০] দেখুন: Wikipedia: List of parties to international copy right agreements

[৯৭১] মাইক্রোসফটের এক রিপোর্ট আনুযায়ী আমেরিকার মতো দেশেও ২০-২৫% সফটওয়্যার পাইরেটকৃত। দেখুন: 20% and 25% (If You're Going To Steal Software, Steal From Us: Microsoft Exec) (https://www.informationweek.com/if-youre-going-to-steal-software-steal-from-us-microsoft-exec/d/d-id/1052865)

অজ্ঞতা, অসচেনতা ও নেতিবাচক মানসিক প্রবণতা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে পাইরেসির হার প্রায় ৯২ শতাংশ। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাইরেসির সাথে জড়িত দেশ বাংলাদেশ। কিছু কর্পোরেট অফিস ও ব্যাংক ছাড়া মোটামুটি সবাই পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করে। পাইরেসির প্রতিকারে কোনো ফলপ্রসু ব্যবস্থা না থাকায় দিন দিন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাইরেসির প্রবণতা এতো বিস্তৃত যে, অনেক ব্যবহারকারী জানেনই না সফটওয়্যার কিনে ব্যবহার করার জিনিস।[৯৭২]

পাইরেসির এই ব্যাপক চর্চার প্রধান কারণ হলো সফটওয়্যারগুলো বাজারে সহনীয় মূল্যে হাতের নাগালে পাওয়া না যাওয়া এবং এর রোধে আইন থাকলেও বাস্তবায়ন না থাকা।

সফটওয়্যার যে ধরনেরই হোক না কেন, তা নির্মাণে অর্থ, মেধা, পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হয় প্রচুর। সাধারণত বড় বড় কোম্পানি বা কর্পোরেশনগুলো মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত রেখে একেকটি সফটওয়্যার নির্মাণ করে থাকে।[৯৭৩] এসব সফটওয়্যার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় বড় বড় ফার্ম, ইন্ড্রাস্টি ও প্রকল্প। চালানো হয় বিমান ও হেলিকপ্টার। এককথায় পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল কাজের একটি হলো সফটওয়্যার নির্মাণের কাজ।[৯৭৪] এজন্য সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো সাধারণত একচ্ছত্রভাবে কপিরাইট প্রয়োগ করে থাকে। অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি (যেমন, মাইক্রোসফট) সাধারণত প্রথম বিশ্বের প্রফেশনাল বা কর্পোরেটদের প্রতি লক্ষ করে দাম নির্ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রে তারা আন্তর্জাতিক রেটিং সিস্টেমের তোয়াক্কা করে না।

এছাড়াও আমাদের দেশে সফটওয়্যার মার্কেটে সচরাচর জেনুইন লাইসেন্স পাওয়া যায় না। জেনুইন সফটওয়্যার কেনার জন্য কাঠ-খড় পোহাতে মানুষ রাজি নয়। অনলাইন থেকে সরাসরি লাইসেন্স কেনারও পর্যাপ্ত সুযোগ নেই দেশে।[৯৭৫]

তাছাড়া বিত্তাভাব, অসচেতনতা ও নকল সফটওয়্যার ব্যবহার করার মানসিক প্রবণতাও পাইরেসির উচ্চ হারের জন্য দায়ী।[৯৭৬]

৩. সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর নমনীয়তা ও কিছু কথা

Software piracy in Bangladesh: the student perceptions study on two selected public universities in Dhaka city (Manarat International University Studies, 4 (1), 2015)

[৯৭৩] উদাহরণস্বরূপ প্রসিদ্ধ হরফ কোম্পানির ‘ফিকহ ইন্সাইক্লোপেডিয়া’ সফটওয়্যারটি নির্মাণে তাদের লাগাতার চার বছর কাজ করতে হয়েছে। খরচ পড়েছে ৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। (تأثير حماية الحقوق الفكرية على الجوانب الاقتصادية মুহাম্মদ আব্দুর রহমান: ৩৩)

[৯৭৪] বিস্তারিত দেখুন: حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي পৃ. ৫০৯

[৯৭৫] এমনকি উন্নত দেশগুলোতেও এক্ষেত্রে মানুষকে অনেক ভোগান্তি শিকার করতে হয়। এর একটি উদাহরণ দেখুন এখানে:..... https://www.makeuseof.com/tag/adobe-actively-encouraging-international-software-piracy-opinion/

[৯৭৬] Software piracy in Bangladesh: the student perceptions study on two selected public
universities in Dhaka city (Manarat International University Studies, 4 (1), 2015)

সফটওয়্যার পাইরেসির ব্যাপারে বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানিগুলো বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে অনেকক্ষেত্রে নমনীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে নির্ভরযোগ্য তথ্যের আলোকে এর কিছু কারণ ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

সব সফটওয়্যার কোম্পানি অবস্থা, ধরন ইত্যাদির দিক থেকে এক নয়। আমরা এখানে প্রধানত মাইক্রোসফট (Microsoft)[৯৭৭] ও এডোবি (Adobe) কোম্পানি নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ, যেসব কোম্পানির পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করে আমাদের দেশের জনগণ কম্পিউটার দুনিয়ায় টিকে আছে, তাদের মাঝে এ দু'টি অন্যতম।

পাইরেসির ব্যাপারে মাইক্রোসফট কোম্পানির নমনীয় ভূমিকার কারণ ও প্রেক্ষাপট যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, সারা বিশ্বে তাদের প্রোডাক্টের বহুল পাইরেসি তাদের তেমন ক্ষতিগ্রস্ত করছে না। মাইক্রোসফট তৃতীয় বিশ্ব থেকে যা আয় করে তা মাইক্রোসফটের বার্ষিক আয়ের সামনে তেমন কিছুই না। সাধারণত তৃতীয় বিশ্বেই ব্যাপকভাবে তাদের প্রোডাক্টস-এর পাইরেসি হয়ে থাকে। মাইক্রোসফটের বার্ষিক রিপোর্ট, ২০১৭ থেকেও[৯৭৮] বিষয়টির প্রমাণ মেলে। এই রিপোর্টে মাইক্রোসফটের বাৎসরিক আয়কে যেসব বড়-ছোট ফ্যক্টর প্রভাবিত করে, তার একটি তালিকা দেয়া হয়েছে। সর্বনিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে পাইরেসি।[৯৭৯] এই রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় যে, প্রচলিত পাইরেসি তাদের কাছে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফ্যক্টর না। তারা একে তেমন তোয়াক্কা করে না। আর বিভিন্ন কারণে তাদের পক্ষে প্রচলিত পরিসরের পাইরেসি বন্ধ করা সম্ভবও না।[৯৮০] নিম্নে এর কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো-

১. পাইরেসির কারেণে কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও মার্কেটিং-এর খরচ বেঁচে যায়। সাধারণত এ খাতে কোম্পানিগুলোর বড় অংকের অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে।

২.প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যারের মানোন্নয়ন ও তার ত্রুটিসমূহ দূর করা, এককথায় সফটওয়্যারগুলো আপডেট করা কোম্পানিগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও লক্ষ্যোদ্দেশ্যের একটি। আর এ কাজটি অনেকাংশে পাইরেসির কারণে তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। কারণ, সারা বিশ্বে পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহারকারীরা এসব খুঁত বের করে এবং তা সমাধানের জন্য আলোচনা-পর্যালোচনা করে। শুধু কোম্পানির একক মেহনতে কাজটি দুঃসাধ্যই হতো।

৩. সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রণ করা, উপযুক্ত সংখ্যায় যোগান দেয়া, গ্রাহকদেরকে নিয়মিত সার্ভিস দেয়া, তাদের সমস্যাসমূহ সমাধান করা ইত্যাদি কাজে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর যে ব্যয়

---

[৯৭৭] ১৯৯০ দশক থেকেই মাইক্রোসফট অপারেটিং সিস্টেম এবং ইন্টেল হার্ডওয়্যার এমএস-ডস এবং উইন্ডোজ দিয়ে বাজারে আধিপত্য বজায় রেখেছে। উইন্ডোজের বিকল্প জনপিয় অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপল ওএস এক্স এবং ফ্রী মুক্ত উৎসের লিনাক্স এবং বিএসডি অপারেটিং সিস্টেম। ইন্টেলের সিপিইউ'র বিকল্প হল এএমডি। সর্বব্যাপিতার কারণে পিসি বলতে বিশেষ করে এক্স ৮৬-সামঞ্জস্য ব্যক্তিগত কম্পিউটার যাতে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে তাকে বোঝায় আবার অ্যাপলের পণ্যকে ম্যাক হিসেবে বুঝানো হয়। (উইকিপিডিয়া, পারসোনাল কম্পিউটার)

[৯৭৮] Annual report 2017,microsoft website

[৯৭৯] https://www.quora.com/Why-doesnt-Microsoft-take-action-on-the-millions-of-pirated-copies-of-Windows

[৯৮০] https://www.fastcodesign.com/1672530/adobe-5-reasons-we-killed-the-creative-suite

হতো, তা পাইরেসির কারণে বেঁচে যায়। অনেক সফটওয়্যার কোম্পানির জন্য এগুলো রীতিমতো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

৪. মাইক্রোসফটের মতো কোম্পানিগুলোর একটি বড় উদ্দেশ্য থাকে সকল স্তরের জনসাধারণকে তাদের কমিউনিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা। এজন্য তারা চায় মানুষের মাঝে তাদের প্রোডাক্টের চাহিদা সৃষ্টি করতে, মানুষকে তাদের প্রোডাক্ট ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে। কারণ, প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যখন তদের প্রোডাক্ট ব্যবহারে অভ্যস্ত হবে এবং তাদের প্রোডাক্টের সাথে তাল মিলিয়ে পিসি বা অন্যান্য মেশিন সংগ্রহ করবে এবং এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, তখন তাদের উক্ত কোম্পানির প্রোডাক্ট ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। এ অবস্থায় তাদেরকে জেনুইন প্রোডাক্টস কিনতে কোম্পানি বাধ্য করতে পারবে।

মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসকে মাইক্রোসফট প্রোডাক্টস-এর পাইরেসি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন-

Let them copy it for free and get addicted to our system as along as possible. We will begin charging them when the time comes. (Because he knew at that point of time people did not have the paying capacity for softwares) ...... we will wait for the right moment.

“যতটুকু পারা যায় তাদেরকে এটা ফ্রি কপি করতে দাও। তারা আমাদের ‘সিস্টেম’ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ুক। সময়মতো আমরা তাদের থেকে টাকা উসূল করে নেবো। (কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ঐ সময় সফটওয়্যার ক্রয় করার মতো পর্যাপ্ত সামর্থ্য সবার ছিলো না। এজন্য তিনি বলেন) আমরা মোক্ষম সময়ের জন্য অপেক্ষা করছি।”[৯৮১]

১৯৯৮ সালে বিল গেটস এমন মন্তব্যও করেছিলেন:

"Although about 3 million computers get sold every year in China, people don't pay for the software. Someday they will, though,"

“যদিও প্রতি বছর চীনে প্রায় তিন মিলিয়ন কম্পিউটার বিক্রয় হয়, মানুষ সফটওয়্যারের জন্য কোনো টাকা আদায় করে না। কিন্তু একদিন তারা এর মূল্য আদায় করবে।”

তিনি ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে এক বক্তব্যে বলেন-

"And as long as they're going to steal it, we want them to steal ours. They'll get sort of addicted, and then we'll somehow figure out how to collect sometime in the next decade."

“যদ্দুর পারুক তারা এটাকে চুরি করে ব্যবহার করতে থাকুক। তারা আমাদেরকেও চুরি করে নিয়ে যাক। তারা আমাদের পণ্যের নেশায় পড়ে যাক। এরপর আমরা পরবর্তী কোনো সময়ে কীভাবে মূল্য আদায় করে নেয়া যায় তার হিসেব-নিকেশ করবো।”[৯৮২]

এভাবে বাজার দখল করতে না পারলে অচিরেই মাইক্রোসফটের প্রতিদ্বন্দ্বীরা মাথা উঁচু করার

---

[৯৮১] https://www.quora.com/Why-doesnt-Microsoft-take-action-on-the-millions-of-pirated-copies-of-Windows

[৯৮২] https://www.quora.com/Why-is-Bill-Gates-allowing-to-run-pirated-Windows-all-over-the-world-when-he-could-infect-them-all-at-once-in-just-a-minute

সুযোগ পেতে পারে। এজন্য অনেকের মতে, মাইক্রোসফটের মার্কেট প্রতিদ্বন্দ্বী 'লিনাক্স' মাইক্রোসফট প্রোডাক্টস-এর ব্যাপক পাইরেসির ব্যাপারে মাইক্রোসফটের নমনীয় ভূমিকা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। কারণ, এজন্য তার মার্কেট শেয়ার চাঙ্গা হতে পারছে না।

এজন্য মাইক্রোসফটের দায়িত্বশীলদের বহুবার এ কথা বলতে শুনা গেছে যে, পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করলে আমাদেরটিই করুন।

মাইক্রোসফট-এর বিজনেস গ্রুপ-এর প্রধান Jeff Raikes সম্প্রতি এক কনফারেন্সে বলেন-

"If they're going to pirate somebody, we want it to be us rather than somebody else."

"তারা যদি কাউকে নকল করে, তাহলে যেন অন্য কাউকে না করে, আমাদেরকেই করে।"[৯৮৩]

তিনি আরো বলেন-

"We understand that in the long run the fundamental asset is the installed base of people who are using our products,.... "What you hope to do over time is convert them to licensing the software."....

"You want to push towards getting legal licensing, but you don't want to push so hard that you lose the asset that's most fundamental in the business,"

"এটা আমাদের ভালোভাবেই বুঝে আসে যে, সুদূর অতীতের দিকে তাকালে আমাদের মৌলিক অর্জন হলো ঐ সমস্ত লোক যারা যেকোনোভাবে (অর্থাৎ, পাইরেসি করে) এটা ব্যবহার করছে। আশা করি, সময়ের পরিক্রমায় এগুলোকে বৈধ লাইসেন্সে রূপান্তরিত করা যাবে।

তুমি লাইসেন্সিং-এর জন্য চাপ প্রয়োগ করতে চাও। কিন্তু এতটুকু চাপ প্রয়োগ করা যাবে না যাতে মূল সম্পদই (বাজার) তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়। ব্যবসার ক্ষেত্রে এটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"[৯৮৪]

৫. আর মাইক্রোসফট ও এডোবির মতো কোম্পানিগুলো ছাড় দিয়ে থাকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাধারণ জনগণের ক্ষেত্রে। বড়ো কর্পোরেটদেরকে তারা ছাড় দেয় না। মাইক্রোসফট (উদাহরণত) জানে যে, এসব দেশের সাধারণ জনগণ কখনো জেনুইন প্রোডাক্ট কিনবে না। কারণ, এটা তাদের সামর্থ্যের বাহিরে। কোম্পানিগুলোর দায়িত্বশীলরা এ ব্যাপারে তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীও অনেকক্ষেত্রে জাহির করে থাকেন। যেমন, দরিদ্র জনগণকে উন্নতির সুযোগ করে দেয়া ইত্যাদি।

মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসকে এ প্রশ্ন করা হলে যে, মাইক্রোসফট ইচ্ছা করলে প্রত্যেকটি পাইরেটেড সফটওয়্যারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কী কারণে তারা

---

[৯৮৩] 20% and 25% (If You're Going To Steal Software, Steal From Us: Microsoft Exec) (https://www.informationweek.com/if-youre-going-to-steal-software-steal-from-us-microsoft-exec/d/d-id/1052865)

[৯৮৪] 20% and 25% (If You're Going To Steal Software, Steal From Us: Microsoft Exec) (https://www.informationweek.com/if-youre-going-to-steal-software-steal-from-us-microsoft-exec/d/d-id/1052865)

করছে না? বিল গেটস উত্তরে বলেন-

"Most of piracy cases are in Asian countries, China and India in particular, we get enough royalties from licensed users, and provoking nice amount of revenues. The problem of piracy for us, lies dominantly in developing countries, and in some parts of African countries, indeed they aren't able to pay us for that operating system, they can't afford that service and respective governments aren't taking steps towards this issue, if they don't use computers, they would lag in this race of technology revolution. So it is up to us, either allow them to keep using programmes or let them live in a divided world."

"পাইরেসির প্রবণতা এশিয়ার দেশগুলোতে বেশী। বিশেষত চীন ও ইন্ডিয়াতে। লাইসেন্স ব্যাবহারকারীদের থেকে আমরা পর্যাপ্ত অর্থ পেয়ে থাকি। ...মূলত পাইরেসি আমাদের জন্য বেশ ঝামেলার কারণ হয় উন্নয়নশীল বিশ্বে এবং আফ্রিকার কিছু দেশে। প্রকৃতপক্ষে তারা (যারা নকল কপি ব্যবহার করে) আমাদের অপারেটিং সিস্টেমের মূল্য আদায়ে সক্ষম নয়। আমাদের সর্ভিস ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ তাদের নেই। এছাড়াও সেসব দেশের সরকার এর বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যদি তারা কম্পিউটার ব্যবহার করতে না পারে, তাহলে প্রযুক্তির বৈপ্লবিক বিকাশে তারা পিছিয়ে পড়ে থাকবে। অতএব এটা আমাদের ভাববার বিষয়, আমরা কি তাদেরকে আমাদের সিস্টেম ব্যবহার করতে দিবো নাকি তাদেরকে বাধ্য করবো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে।"[৯৮৫]

৬. আর সর্বসাধারণকে ধরপাকড় করতে গেলে এর পেছনেও কোম্পানির ব্যাপক অর্থ এবং শক্তি-সামর্থ্য খরচ করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই পাইরেসির কারণে কোম্পানিগুলোর যে ক্ষতি হয়, তার তুলনায় এক্ষেত্রে ক্ষতি আরো বেশি হবে।

৭. কর্পোরেটরা সাধারণত জেনুইন প্রোডাক্টস কিনতে বাধ্য থাকে। কারণ, এতে প্রাইভেসি, নিরাপত্তা ও ব্যবহারের যে সুবিধা পাওয়া যায়, তা সাধারণত পাইরেটেড কপিগুলোতে পাওয়া যায় না।[৯৮৬] এজন্য তারা জেনুইন প্রোডাক্টস সংগ্রহ করে থাকে। সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর লক্ষোদ্দেশ্য এতেই পূরণ হয়ে যায়। এজন্য ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পাইরেসির ক্ষেত্রে তাদের এক প্রকার মৌন সমর্থন থাকে।[৯৮৭]

---

[৯৮৫] https://www.quora.com/What-percentage-of-people-are-using-genuine-Windows-Operating-System-Why-does-Microsoft-doesnt-take-legal-action-though-it-identifies-illegal-copies-running-on-various-systems

[৯৮৬] https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-windows_install/what-is-difference-between-genuine-copy-of-windows/116bc85c-1fed-476e-8618-c7f71a7ecfad?auth=1

[৯৮৭] মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইটে পাইরেসি সংক্রান্ত এক প্রবন্ধে বলা হয়:

...As a result, certain images and other copyrighted content may require permissions or licenses, <u>especially if you use the work in a commercial setting</u>. (https://www.microsoft.com/en-us/legal/copyright)

তবে গোটা পৃথিবীতে হাজার হাজার সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সবার বাণিজ্য, বাণিজ্যের পরিধি ও সামর্থ্য এক রকম নয়। সবক্ষেত্রে একক ভাবে বলা যায় না যে, পাইরেসির কারণে কোম্পানীর ক্ষতি হচ্ছে না। তাছাড়া সব কোম্পানির পক্ষে সব দেশে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এর বাস্তবায়নের সুযোগ সুবিধা ও অবস্থাও থাকে না। সুতরাং ধরে বেঁধে বলা যায় না যে, এ ব্যাপারে কোম্পানি নীরব বিধায় মৌন সমর্থন রয়েছে।

মাইক্রোসফটও আপ্রাণ চেষ্টা করে যাতে কেউ আসলের নামে নকল সফটওয়্যার কিনে ধোঁকা না খায় এবং সে জন্য তারা বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।[৯৮৮] তবে, পাইরেসির কারণে তারা প্রতি বছর বিশাল অংকের মুনাফা থেকে বঞ্চিত হলেও তাদের অর্জিত মুনাফার তুলনায় তা কিছুই নয়। তারা পাইরেসির বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে যথাসম্ভব মুনাফা হাতে আসে। তবে মাঠপর্যায়ে সর্বসাধারণের মাঝে ব্যবহৃত লক্ষ লক্ষ নকল কপি নিয়ে তাদের তেমন কোনো ভাবনা ও পদক্ষেপ নেই।

মাইক্রোসফট কোম্পানির সাপোর্টে আমরা বাংলাদেশে পাইরেসির ব্যাপারে তাদের কোন পর্যায়ের সমর্থন রয়েছে, তা জানতে চাইলে, তাদের একজন প্রতিনিধি বলেন-[৯৮৯]

I see. They may use the fake copies of the license.. However, since its not genuine products, it might cause some issues in the long run.

To set your expectations as well, since the licenses will be counterfeit... The use of those licenses might fall into Fraudulent activity.

"আমি মনে করি, তারা নকল লাইসেন্স ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু নকল কখনো আসল নয়, তাই দীর্ঘ ব্যবহারে এটা বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু লাইসেন্সটি জালিয়াতি বা নকল করে ব্যবহার করা হচ্ছে সেহেতু এটির কার্যক্রমেও জালিয়াতি থাকবে।"

শরী'আতের দৃষ্টিতে কপিরাইট বা মেধাস্বত্ব

সফটওয়্যার পাইরেসির শর'য়ী বিধানের বিষয়টি ফিকহুন নাওয়াযিল বা নবঘটিত মাসাইলের অন্তর্ভুক্ত। জানা কথা যে, কপিরাইটের প্রচলিত ধারণা পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরামের যুগে ছিলো না। আর সফটওয়্যার পাইরেসির বর্তমান রূপ ও অবস্থার সূচনা তো নিকট অতীতেই হয়েছে। তবে শরী'আতে বিভিন্ন ধরনের হক বা অধিকারের ব্যাপারে যেসব বিধি-বিধান রয়েছে এবং ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন ধরনের হুকুক, মালিয়্যাত ইত্যাদি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, তার আলোকে কপিরাইট ও সফটওয়্যার পাইরেসির শর'য়ী বিধান নির্ণীত হয়। তাই মূল আলোচনার পূর্বে আর্থিক অধিকারের বিষয়ে কিছু কথা পেশ করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

আমরা জানি, ব্যক্তি ও সমাজের বিভিন্ন অধিকারকে[৯৯০] কেন্দ্র করে মানব-সমাজ গড়ে উঠেছে। এসব অধিকারের সংরক্ষণের মাধ্যমেই ইনসাফ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব অধিকারের

---

[৯৮৮] Microsoft Licensing/ Softchoice. (https://www.softchoice.com/licensing/microsoft/piracy.aspx)

[৯৮৯] আমরা যে কেস নাম্বারে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি, তা হলো- 1411811079

[৯৯০] শাইখ মুস্তফা যারক্বা রাহ. হক-এর সংজ্ঞা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:

الحق هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة وتكليفا.

রয়েছে বিভিন্ন ধরন ও প্রকার। এর মাঝে অন্যতম হলো আর্থিক অধিকার। অর্থাৎ, ঐ সব অধিকার, যার সাথে ব্যক্তি বা সমাজের আর্থিক লাভ-ক্ষতির বিষয়টি জড়িত থাকে।

আমরা জানি, অনেক অধিকারের একমাত্র উৎস শরী'আত। অর্থাৎ, শরী'আত মানুষের কল্যাণের জন্য এসব অধিকার সংরক্ষণ ও মূল্যায়নকে মানুষের উপর আবশ্যক করে দিয়েছে। যেমন, শুফ'আ, ওয়ালা, তালাক, হাযানাহ ইত্যাদির অধিকার।

আর কিছু অধিকার সৃষ্টি হয়েছে মানুষের প্রচলন, সমাজ-ব্যবস্থা ও ন্যায়-চিন্তার স্বাভাবিক চাহিদা হিসেবে। এ ধরনের অধিকার কোনো শর'য়ী সমস্যা না থাকলে শরী'আতেও স্বীকৃত। কারণ, শরী'আত বিভিন্ন ক্ষেত্রে উরফকে দলীল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

والعرف في الشرع له اعتبار # لذا عليه الحكم قد يدار.

"শরী'আতে উরফ তথা প্রচলনের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এজন্যই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর উপর বিধানের ভিত্তি রাখা হয়।"[৯৯১]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. 'আল আশবাহু ওয়ান নাযায়ের' -এ বলেন-

كل ما ورد به الشرع مطلقا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة، يرجع فيه إلى العرف.

"শরী'আতে যেসব বিষয় মুতলাক (সাধারণ শর্তহীনভাবে) এসেছে এবং শরী'আত ও মানুষের ভাষায় সেসব বিষয়ে কোনো মূলনীতি পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে উরফ তথা মানুষের প্রচলনকেই বিধানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দু বানানো হয়।"[৯৯২]

এসব অধিকারের বিষয়ে শর'য়ী দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে দু'টি দিক থেকে আলোচনা হতে পারে-

১. অধিকারটি শরী'আতে গ্রহণযোগ্য কিনা? এবং সেই অধিকারের লঙ্ঘন শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ কিনা?

২. অধিকারটিতে সম্পদের মতো তাসাররুফের বিধান। যেমন, তার ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময় গ্রহণ করে তা হস্তান্তর করা ইত্যাদি।

আমরা এখানে মেধাস্বত্ব বা কপিরাইট শরী'আতস্বীকৃত অধিকার কি না শুধু তা নিয়েই মূলত আলোচনা করবো। কারণ, তার সাথেই সফটওয়্যার পাইরেসির বিষয়টি সম্পৃক্ত।

এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত শর'য়ী দলীল ও ফিকহী নযির বিশ্লেষণ করলে প্রতিপাদন হয় যে- (১) মেধাস্বত্ব একটি শরী'আতস্বীকৃত অধিকার, যা লঙ্ঘন করার সুযোগ নেই এবং (২) মেধাস্বত্ব বর্তমানে বিনিময়যোগ্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। আমরা এখানে প্রথম বিষয়টি নিয়েই প্রধানত আলোচনা করবো।

প্রথম বিষয় অর্থাৎ, মেধাস্বত্ব শরী'আতস্বীকৃত অধিকার হওয়ার ব্যাপারে মুফতিয়ানে কেরাম প্রায় একমত।

সাধারণত সৃষ্টিশীল কাজের পিছনে প্রচুর মেধা, শ্রম ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় হয়। তাই সাধারণ বিবেকে এটা বোধগম্য নয় যে, এক ব্যক্তি প্রচুর অর্থ ও শ্রম দিয়ে আর্থিক ফায়েদা লাভের একটি সুযোগ সৃষ্টি করবে আর অপর ব্যক্তি বিনা অধিকারে তা ভোগ করবে এবং প্রথম ব্যক্তিকে তার

---

[৯৯১] রাসমুল মুফতী: ১৭৪, মাকতাবাতুল হেরা

[৯৯২] আল আশবাহু ওয়ান নাযায়ির:১৯৬

ফায়েদা থেকে বঞ্চিত করবে।
আর স্পষ্টত, কপিরাইট হরণের দ্বারা কপিরাইটের অধিকারীর ক্ষতিসাধন করা হয়। তার পরিকল্পনা ধুলিস্যাৎ করা হয়। এজন্য কপিরাইট হরণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়েয।
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لا ضرر ولا ضرار.

"ক্ষতি ও ক্ষতিসাধনের কোনো অনুমতি নেই।"[৯৯৩]

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহ. কপিরাইট প্রসঙ্গে তাঁর রিসালায় বলেন-

کسی شخص کو کسی مباح تصرف سے روکنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اس کا یہ تصرف کسی غیر کی ملک میں بلا اس کی اجازت کے ہو، دوسرے یہ کہ اس تصرف سے کسی شخص یا جماعت کا ضرر ہوتا ہو۔

"কোনো ব্যক্তিকে কোনো বৈধ হস্তক্ষেপ থেকে বারণ করার দু'টি কারণ হতে পারে। এক. অন্যের মালিকানায় মালিকের অনুমতিহীন হস্তক্ষেপ হওয়া। দুই. তার হস্তক্ষেপের কারণে অন্য কোনো ব্যক্তি বা দলের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া।"[৯৯৪]
সমকালীন মুফতিয়ানে কেরামের মতে কপিরাইট বা মেধাস্বত্বের ক্ষেত্রে উভয় বিষয়ই বিদ্যমান। সুতরাং কপিরাইট হরণ করা বৈধ হবে না।
এছাড়াও কপিরাইট বা মেধাস্বত্বের পরিচিতি ও তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ করলেই প্রতীয়মান হয় যে, এটি শরী'আতস্বীকৃত্ব হক্কুল আসবাকিয়্যাহ (প্রথম অর্জনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অধিকার)-এর সাথে মিলে যায়। কারণ, মেধাস্বত্ব হলো সৃজনশীল কর্ম প্রথমে আবিষ্কারের ভিত্তিতে তা থেকে অর্জিত আর্থিক ফায়েদা লাভের একচ্ছত্র অধিকার। আর প্রথম অর্জনের ভিত্তিতেই হক্কুল আসবাকিয়্যাহ শরী'আতে স্বীকৃত।
হযরত আসমার ইবনে মুযাররিস রাযি. বলেন-

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: «من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করলাম। তিনি ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি কোনো জলাশয় সর্বাগ্রে পেল, যা তার পূর্বে কোনো মুসলমান পায়নি, তাতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।"[৯৯৫]
যদিও হাদীসটি পতিত জমি আবাদ করার বিষয়ে; কিন্তু এর ব্যাপকতা অন্যান্য বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। হাদীস ব্যাখ্যার একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো, العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب। অর্থাৎ, যে প্রসঙ্গে হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে, তাতেই বর্ণিত বিধান সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং শব্দের ব্যাপকতা অনুযায়ী বিধানও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য হবে।
অনেক হাদীস ব্যাখ্যাকার হাদীসটির অর্থ ব্যাপক বলে মত দিয়েছেন। আল্লামা আব্দুর রউফ

---

[৯৯৩] সুনানে দারাকুতনী: হাদীস ৩০৭৯, মুস্তাদরাকে হাকেম: ২/৫৭-৫৮, মুয়াত্তায়ে মালেক: ৩১১, হাদীস ১৪৪৪
[৯৯৪] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৪/৪৪৭, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী
[৯৯৫] (হাদীস হাসান) সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ৩০৭১, সিহায়ে মুখতারা: হাদীস নং ১৪৩৪, সহীহ ইবনুস সাকান। سكت عليه أبو داود والمنذري আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী রাহ. বলেন:

وقال: إسناده جيد، وقال ابن السكن: ليس لأسمر إلا هذا الحديث الواحد. (فيض القدير ٦/١٤٨)

মুনাভী রাহ. (১০৩১ হি.) বলেন-

من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له... يحتمل أن المراد بماء واحد المياه ويحتمل كون ما موصولة وجملة لم يسبق صلتها وكونها نكرة موصوفة بمعنى شيء والأخيران أولى كأنها أعم والحمل عليه أكمل وأتم فيشمل ما كل عين وبئر ومعدن كملح ونفط فالناس فيه سواء ومن سبق لشيء منها فهو أحق به حتى يكتفي وشمل من سبق لبقعة من نحو مسجد أو شارع وخرج الكافر فلا حق له وقوله فهو له أي فهو أحق بما سبق إليه من غيره يقدم منه بكفايته فإن زاد أزعج هذا ما قرره جمع شارحون.

"" من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" এ হাদীসে- إلى -এর পরবর্তী শব্দটি দুই রকম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **এক.** ماء যা مياه শব্দের এক বচন (যার অর্থ পানি)। **দুই.** ما মাওসূলা ও তার পরবর্তী لم يسبق বাক্যটি তার সিলা হবে, অথবা ما মাওসূফা হবে তখন তা شيء -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলোর শেষের দু'টি তথা ما হয়ে তা মাওসূলা বা মাওসূফা হওয়াটাই উত্তম। কারণ, তখন তা ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার কারণে ঝর্ণা, কূপ ও খনি (যেমন লবণের খনি ও তেলের খনি) ইত্যাদি সবগুলোকেই শামিল করবে। সকল মানুষ এসব বস্তুর ক্ষেত্রে বরাবর। তবে এসব বস্তুর কোনটি যদি কেউ সর্বাগ্রে পায়, তাহলে যতটুকু তার জন্য যথেষ্ট ততটুকুর ক্ষেত্রে সেই বেশি হকদার বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে রাস্তা, মসজিদ বা এ ধরণের বস্তু (যাতে সর্বসাধারণের হক রয়েছে)-এর ক্ষেত্রে যে সর্বাগ্রে কোনো জায়গা দখল করবে সেও উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে (অর্থাৎ, সে উক্ত জায়গার বেশি হকদার হবে)। হাদীসে 'মুসলিম' শব্দ থেকে বোঝা গেল, কাফের উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং কাফেরের এসব বস্তুতে কোনো অধিকার নেই। আর হাদীসের অংশ فهو له -এর অর্থ হলো যে বস্তু সে সর্বাগ্রে পেল, সে বস্তুতে যতটুকু দিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ হয়, ততটুকুর ক্ষেত্রে তার অগ্রাধিকার থাকবে। এর অতিরিক্ত অংশে আর তার অধিকার থাকবে না। ব্যাখ্যাকারদের একদলের নিকট এ ব্যাখ্যাই স্বীকৃত।"[৯৯৬]

উল্লিখিত হাদীসের দ্বারা মেধাস্বত্ব, অর্থাৎ, প্রথম আবিষ্কারের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হয়। দৃশ্যমান হোক বা না হোক সব জিনিসের ক্ষেত্রে প্রথম অর্জনকারীর জন্য হাক্কুল আসবাকিয়্যাহ সাব্যস্ত হবে। উপরন্তু বলা যায়, সফটওয়্যারের উপর নির্মাতার অধিকার হাক্কুল আসবাকিয়্যাহ থেকেও শক্তিশালী। কেননা পতিত জমির ক্ষেত্রে শুধু প্রথমে পেয়ে গেলেই তার অধিকার সাব্যস্ত হয়; কিন্তু এখানে বিষয়টি এমন নয়; বরং সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে নির্মাতা কোম্পানি অনেক সময়, অর্থ, মেধা ও শ্রম ব্যয়ে তা নির্মাণ করে।

দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ, এই অধিকার সম্পদ সাব্যস্ত করে তা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি না? এ বিধানের ক্ষেত্রে মুফতিয়ানে কেরামের মাঝে কিছু দ্বিমত থাকলেও শরী'আত ও উরফের দাবি অনুযায়ী সম্পদ হওয়াটাই প্রমাণিত হয়।

বর্তমান উরফে এ অধিকারকে সম্পদ গণ্য করা হয়। সর্বসাধারণ কপিরাইটকে বেচাকেনাযোগ্য সম্পদ হিসেবে দেখে। আর বর্তমানে আইনগত স্বীকৃতির পর এর সাথে সম্পূর্ণ সম্পদের মতোই

---

৯৯৬ ফয়যুল কাদীর: হাদীস নং ৮৭৩৯, ৬/১৪৮

ব্যবহার করা হয়। এ অধিকারের অনেক বৈশিষ্ট্যই সম্পদের মতো। বর্তমানে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করে এর মালিকানা সংরক্ষণ করা হয়। নিবন্ধনের পর দৃশ্যমান জিনিসের মতো এটার আদান-প্রদান, প্রয়োজনে মজুতকরণ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

উরফ যেহেতু এই অধিকারকে সম্পদ বলে মেনে নিয়েছে এবং এক্ষেত্রে অন্য কোনো শর'য়ী সমস্যাও নেই, তাই মেধাস্বত্বকে বিনিময়যোগ্য সম্পদ বিবেচনা করা যেতে পারে।

শরী'আতের দৃষ্টিতে কোনো বস্তু বিনিময়যোগ্য সম্পদ কি না তা নির্ণয়ে উরফের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

والمالية إنما ثبت بتمول الناس كافة أو بتقوم البعض، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع له شرعا، فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالا كحبة حنطة، وما يكون مالا بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقوما كالخمر.

"কোনো বস্তুর সম্পদ হওয়াটা সকল মানুষ বা কিছু মানুষ তা সম্পদ গণ্য করার উপর নির্ভর করে। তবে মূল্যবান হওয়ার জন্য মানুষের সম্পদ হিসেবে গণ্য করার সাথে সাথে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ হতে হবে। সুতরাং যে বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ; কিন্তু মানুষ তা সম্পদ গণ্য করে না, তা সম্পদ হবে না। যেমন, গমের একটি দানা। আর যে বস্তু মানুষের মাঝে সম্পদ হিসেবে গণ্য; কিন্তু শরী'আতের দৃষ্টিতে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নয় তা (মাল হলেও) মূল্যবান হবে শরী'আতে তার কোনো মূল্যমান নেই। যেমন, মদ।"[৯৯৭]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم.

"মাল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ বস্তু যার দিকে মন আকৃষ্ট হয় এবং প্রয়োজনের সময়ের জন্য তা জমা করে রাখা যায়। আর কোনো বস্তু মাল হওয়াটা নির্ভর করে সকল মানুষ বা কিছু মানুষ তাকে মাল গণ্য করে কিনা তার উপর।"[৯৯৮]

আল্লামা মোল্লা খসরু রাহ. বলেন-

المال موجود يميل إليه الطبع إلخ.

"মাল ঐ দৃশ্যমান বস্তুকে বলে, যার দিকে মন আকৃষ্ট হয়। ...."[৯৯৯]

এসব কিছু বিবেচনা করে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমকালীন ফকীহ মেধাস্বত্ব বা কপিরাইট শরী'আতসমর্থিত অধিকার বলে মত দিয়েছেন। অনেকেই এটাকে সম্পদের মতো বিক্রয়যোগ্য বলেও মত প্রদান করেছেন। সমকালীন ফকীহদের অধিকাংশের মত এটিই।[১০০০]

---

[৯৯৭] আল বাহরুর রায়িক: ৫/৪৩০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৯৯৮] রদ্দুল মুহতার: ৭/৮, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[৯৯৯] দুরারুল হুক্কাম শারহু গুরারিল আহকাম। রদ্দুল মুহতার: ৭/২৩৪, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

[১০০০] মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জিদ্দাহ-এর এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়:

في قرار مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت أن: الاسم التجاري والعنوان التجاري (العلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار) هي: حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس

এক্ষেত্রে হিন্দুস্তানের আকাবিরদের মাঝে মাওলানা ফাত্হ মুহাম্মদ লাখনভী রাহ., মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী রাহ., মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী রাহ. এবং মুফতী নিযামুদ্দীন রাহ.-এর ফাতওয়া প্রণিধানযোগ্য।[১০০১]

তবে শরী'আতে মেধাস্বত্ব স্বীকৃত হলেও এর বল্গাহীন ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। পূর্বে আমরা জেনেছি যে, আইনের মাঝেও সাধারণত কপিরাইটের নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে এ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর কপিরাইটের আর কোনো মূল্য থাকে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মেধাকর্মের যে স্বত্ব তার নির্মাতা সংরক্ষণ করে, তা উক্ত কর্মের যেকোনো ধরনের ব্যবসায়িক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আরেক ব্যক্তি তা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কপি করলেই আমরা বলতে পারবো যে, সে নির্মাতা বা আবিষ্কারকের লাভের অধিকারকে হরণ করছে এবং আর্থিকভাবে তাকে উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতিতে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি নিছক ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তা কপি করে, তাহলে এক্ষেত্রে বৈধতার সাধারণ মূলনীতি অনুযায়ী অনেক ফকীহগণ এর অনুমতি আছে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

وبالجملة، فالراجح عندنا، والله سبحانه أعلم، أن حق الابتكار والتأليف حق معتبر شرعا، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا الحق بدون إذن من المبتكر أو المؤلف. وينطبق ذلك على حقوق برامج الكمبيوتر أيضا. ولكن التعدي على هذا الحق إنما يتصور إذا أنتج أحد مثل ذلك المنتج أو الكتاب أو البرنامج بشكل واسع للتجارة فيه، أو بقصد الاسترباح. أما إذا صوره لاستعماله الشخصي، أو ليهبه إلى بعض أصدقاءه بدون عوض، فإن ذلك ليس من التعدي على حق الابتكار.

فما توغل فيه نشرة الكتب ومنتجو برامج الكمبيوتر من منع الناس من تصوير الكتاب، أو قرص الكمبيوتر، أو جزء منه لاستفادة شخصية، وليس للتجارة، فإنه لامبرر له أصلا. وهذا ما ينطق عليه أن مالك الكتاب أو القرص يملك ما شاء فيه من التصرفات للاستفادة الشخصية، وليس للمنتج أن يمنعه منها. وإنما الممنوع أن ينتج مثلها بقصد الاسترباح والتجارة فيه بدون إذن منه.

"সারকথা, আমাদের নিকট অগ্রগণ্য মত হলো, আবিষ্কারস্বত্ব ও গ্রন্থস্বত্ব শরী'আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য অধিকার। সুতরাং আবিষ্কারক বা গ্রন্থকারের অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করা জায়েয হবে না। কম্পিউটারের প্রোগ্রামের স্বত্বের ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। তবে এ ধরনের অধিকারের ক্ষেত্রে কারো হস্তক্ষেপ কেবল তখনই সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে যখন কেউ সৃজিত বস্তু, গ্রন্থ বা প্রোগ্রাম ব্যাপক পরিসরে ব্যবসা বা লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে নকল করবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অথবা বিনিময়হীনভাবে কাউকে হাদিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নকল করে, তাহলে তা সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে না। অতএব গ্রন্থ প্রকাশকগণ ও কম্পিউটারের প্রোগ্রামের নির্মাতারা যে মানুষদেরকে ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের গ্রন্থ ফটোকপি করা বা কম্পিউটারের সিডি বা

لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. اه.

[১০০১] ইতরে হিদায়া কিফায়াতুল মুফতী, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়্যাহ এবং নিযামুল ফাতাওয়ার সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তার কোনো অংশ কপি করা থেকে বারণ করে থাকে, তার কোনো বৈধতা নেই। এক্ষেত্রেই বলা হবে যে, কিতাব ও সিডির মালিক ক্রেতা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য ইচ্ছেমতো তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। উৎপাদনকারী বা নির্মাতার জন্য তাকে নিষেধ করা জায়েয হবে না। নিষিদ্ধ হলো কেবল ব্যবসা, লাভের উদ্দেশ্যে কপি করা।"[১০০২]

পাইরেসি ও পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহারঃ শর'য়ী দৃষ্টিকোণ

আমরা জানলাম, কপিরাইট শরী'আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য একটি হক বা অধিকার। আর পাইরেসি যেহেতু এই অধিকার হরণের নাম, তাই মৌলিকভাবে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা নিষিদ্ধ। তবে যেমনটি আমরা জেনেছি, প্রচলিত সফটওয়্যার পাইরেসির বিভিন্ন রূপ ও অবস্থা রয়েছে। আর পাইরেসির শর'য়ী বিধানের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সীমারেখা।

পূর্বে আমরা পাইরেসির বিভিন্ন ধরন ও ক্ষেত্র উল্লেখ করেছি। আমরা উল্লেখ করেছি যে, মৌলিকভাবে পাইরেসি তিন প্রকার:

১. ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পাইরেসি।

২. ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে পাইরেসি। উৎপাদনশীল সফটওয়্যারের ব্যক্তিগত ব্যবহারকেও আমরা এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

৩. ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়; বরং সর্বসাধারণের নাগালে রাখার জন্য সফটওয়্যার পাইরেট করা।

উপরোক্ত তিন প্রকারের পাইরেসির বিভিন্ন রূপও আমরা উল্লেখ করেছি।

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, মেধাস্বত্ব একটি শরী'আতসম্মত অধিকার। এমনকি অগ্রগণ্য মতানুযায়ী এটি বর্তমানে সম্পদে পরিণত হয়েছে। তাই মালিকের অনুমতি ব্যতীত এতে অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। সুতরাং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পাইরেসি তথা ক্র্যাক, প্যাচ ইত্যাদি শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও অবৈধ। উপরোল্লিখিত 'ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পাইরেসি'-র সকল রূপ এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

ব্যক্তিগত ব্যবহারের বিধানও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এর আলোকে এটা স্পষ্ট যে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পাইরেসি শর্তসাপেক্ষে জায়েয হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফতিয়ানে কেরামের মত এটিই।[১০০৩]

[১০০২] ফিকহুল বুয়ূ ১/২৮৬, মাকতাবাতুল মা'আরেফ, করাচী

[১০০৩] এ প্রসঙ্গে দারুল উলুম করাচির ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত একটি ফাতওয়া নিম্নরূপ-

یہ مسئلہ ایک حد تک ہمارے ہاں زیر غور ہے، تاہم فی الوقت جو فتوی جاری ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے سوفٹ ویئرز کا تجارتی مقاصد کے لئے استعمال ناجائز ہے، تاہم ذاتی استعمال کی گنجائش ہے۔

واضح رہے کہ اجازت کی دو قسمیں ہیں، صراحۃ اجازت یہ ہے کہ کوئی شخص کھلے الفاظ میں لوگوں کو اپنی چیز کے استعمال کی اجازت دیدے، اور دلالۃ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص اس کی چیز استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو منع نہیں کرتا، تو یہ بھی اجازت ہے، سوفٹ ویرز کے ذاتی استعمال میں بظاہر دلالۃ اجازت موجود ہے، لہذا اس کی گنجائش دی جاتی ہے۔

এখানে উল্লেখ্য যে, অনেকক্ষেত্রে সফটওয়্যারের এগ্রিমেন্টে তা কপি করা বা মেয়াদের পর ব্যবহার না করার ওয়াদা থাকে। সেক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। জামেয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, বিন্নুরী টাউনের ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত এক ফাতওয়ায় আছে-

তবে অনেকের মতে, এটিও কপিরাইট লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নাজায়েয। শেষোক্ত মতের কেউ কেউ আবার প্রয়োজনে (যেমন, জেনুইনটি কেনার মোটেও সামর্থ্য না থাকলে) ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

বর্তমানে যেহেতু ব্যক্তিগত ব্যবহারকেও আইনত কপিরাইটের আওতাধীন গণ্য করা হয়, তাই সরকারের আনুগত্যের বিবেচনায় শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি নিষিদ্ধ হওয়া চাই। কিন্তু সাধারণত ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে কপিরাইট অধিকারীর মৌন সম্মতি থাকে। যদি বাস্তবেই মৌন সম্মতি থাকে, তাহলে ব্যবহার বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ নয়।

উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত ব্যবহারের মধ্যে উৎপাদনশীল সফটওয়্যারের ব্যবহারও (যেমন, Adobe -র প্রোডাক্টসমূহের ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) অন্তর্ভুক্ত হবে।[১০০৪]

সরাসরি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পাইরেসি বা নিছক ব্যক্তিগত ব্যবহার দু'টির বিধানই অনেক পরিষ্কার। তবে বিনামূল্যে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য পাইরেসি জায়েয হবে কি না বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ। পূর্বের আলোচনাগুলো বিবেচনা করলে শরী'আতের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক অবস্থায় এটাও বৈধ নয়। কারণ, এর দ্বারা সফটওয়্যার কোম্পানির বড় ক্ষতি হতে পারে। তবে যদি কোনো ক্ষেত্রে এমন হয় যে, কোম্পানি সফটওয়্যার বিক্রয় করে উপযুক্ত লাভ অর্জন করে নিয়েছে। এখন ক্র্যাক করার প্রতি কোম্পানির মৌন সম্মতি রয়েছে বা এর দ্বারা কোম্পানির কোনো ক্ষতি হবে না, তাহলে তার অবকাশ রয়েছে।

جو سافٹ وئیر باقاعدہ ٹرائل ایگریمنٹ پر ڈاؤن لوڈ یا خریدا گیا ہو، اس کے بعد اس کے لیے کریک استعمال کر کے اس کو خریدا ہوا ظاہر کرنا معاہدے کی خلاف ورزی اور دھوکہ دہی مبنی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

[১০০৪] দারুল উলূম দেওবন্দ-এর ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত একটি ফাতওয়া নিম্নরূপ-

سوال # ۵۰۱۱۸

ہمارے یہاں ونڈوژ اور سافٹ وئر وغیرہ پایریٹد یعنی ان کو غلط طریقے سے اکٹیویٹ کیا ہوتا ہے جو کہ آسانی سے ۳۰ روپے کی سی ڈی اور ۶۰ کی ڈی۔وی ڈی میں مل جاتا ہے جبکہ ونڈوژ کی اصل قیمت ہزاروں میں ہیں اور سافٹویر لاکھ دو لاکھ تک ہیں کیونکہ سب کی قیمت ڈالر میں ہے اور پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔اصل سافٹ وئر ایک تو مشکل سے ملتا ہے دوسرا یہ کہ ہماری خرید سے باہر ہے ایک عام بندہ خرید نہیں سکتا کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے اور ہر کام کمپیوٹر پر ہی ہوتا ہے انٹرنیٹ پر ٹایپنگ اور گرافکس وغیرہ کی جاب ملتی ہیں اب مسلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو اصل ونڈوژ ہی نہیں اور سافٹوئر بھی آصل قیمت پر خریدا ہوا نہیں ہے بلکہ پایریٹڈ ہے تو کیا اس صورت میں ہماری کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ محنت تو ہماری ہے مگر سافٹویئر آصل قیمت والا نہیں ہے کیا ان سے اتنا کمایا جائے کہ اصل سافٹوئیر خریدنے کے قابل ہوجائیں اور پھر اصل سے کام کریں۔جیسا کہ جنگ یا مفلسی کی حالت میں ہوتا ہے کہ حرام جانور کا گوشت کھاسکتے ہیں مگر صرف اتنا کہ بھوک مٹ جائے خواہش نہ ہو۔۔پھر حلال کی جستجو کرتے ہیں

Published on: Jun 9, 2014 جواب # ۵۰۱۱۸

Fatwa ID: 903-917/N=8/1435-U

صورت مسئولہ میں کمائی پر حرام ہونے کا حکم نہ ہوگا، البتہ احتیاط اور تقویٰ کی بات یہ ہے کہ اصل سافٹ ویئر استعمال کرنے کی کوشش کی جائے۔

পূর্বে আমরা জেনেছি যে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পাইরেসি শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও অবৈধ। তবে বর্তমানে সফটওয়্যার পাইরেসির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও লক্ষণীয় থাকবে-

১. মৌন সম্মতি: অনেক সফটওয়্যার কোম্পানির ব্যাপারে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা অনেক সময় নির্দিষ্ট একটি সীমার ভিতরে নন-জেনুইন প্রোডাক্ট ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে থাকে। সেক্ষেত্রে তা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

২. হারবী কাফেরদের সফটওয়্যার: হারবী কাফের, যারা অমুসলিম দেশের নাগরিক এবং যাদের সাথে কোনো ধরনের নিরাপত্তা প্রদানের চুক্তি হয়নি, তাদের ধন-সম্পদের কোনো নিরাপত্তা শরী'আতে নেই। এ ধরনের কাফেরের সম্পদ তাদের অনুমতি ব্যতীতও গ্রহণ করা যাবে।

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

مال الحربي ليس بمعصوم ، بل هو مباح في نفسه إلا أن المسلم المستأمن منع من تملكه من غير رضاه لما فيه من الغدر والخيانة.

"হারবীর মাল (আইনত) নিরাপদ নয়; বরং তা মূলত মুবাহ। তবে দারুল হারব কতৃপক্ষের নিরাপত্তাগ্রহণকারী মুসলমান হারবীদের সম্পদ তাদের সম্মতি ব্যতীত নিতে পারবে না। কারণ তা গাদ্দারি ও খিয়ানত বলে গণ্য হবে (কারণ তার সাথে তাদের নিরাপত্তা চুক্তি সংঘটিত হয়েছে)।"[১০০৫]

তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, তাদের সাথে কোনো নিরাপত্তার চুক্তি বা ওয়াদা না থাকতে হবে। বর্তমানে ভিসা প্রদানও নিরাপত্তার গ্যারান্টি হিসেবে বিবেচিত হয়। কোনো ধরনের ওয়াদা বা চুক্তির খেলাফি না হওয়া জরুরী। চাই সে ওয়াদা বা চুক্তি মৌনই হোক।

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. হতে বর্ণিত

أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي ﷺ: "أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء"، ورواية أبي داود: "أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه."

"তিনি জাহিলিয়াতের যুগে কাফেরদের একটি দলের সাথে ছিলেন। তিনি এক সুযোগে তাদের হত্যা করে তাদের মালামাল নিয়ে নিলেন। অতঃপর মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার ইসলাম গ্রহণ তো ঠিক আছে, তবে মালের (যা তুমি লুট করে এনেছো) সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

আবু দাউদের রেওয়ায়েতে শব্দের একটু ভিন্নতা রয়েছে। তা হলো- "ইসলাম তো আমি গ্রহণ করলাম, তবে মাল (যা তুমি এনেছো) তা হলো গাদ্দারির মাধ্যমে অর্জিত মাল। তাতে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।"[১০০৬]

আল্লামা ইবনে হাজার 'আসক্বালানী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

قوله " وأما المال فلستُ منه في شيءٍ " أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل

[১০০৫] বাদয়েউস সানায়ে: ৭/৬৬, দারুল হাদীস, কায়রো

[১০০৬] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২৫৮৩, সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ২৭৬৫

أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً ، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة ، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم.

"....অর্থাৎ, গাদ্দারির মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার কারণে আমি তা গ্রহণ করব না। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাফেরদের ধন-সম্পদ নিরাপত্তার সময়ে গাদ্দারি করে নিয়ে নেওয়া বৈধ হবে না। কারণ, সঙ্গীরা সঙ্গ দেয় আমানতদারির উপর ভিত্তি করে। আর আমানত তার অধিকারীকে আদায় করতে হয়। চাই সে মুসলমান হোক বা কাফের হোক। আর কাফেরদের ধন-সম্পদ তখনই হালাল হবে যখন তা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করা হবে। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাল তার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন এজন্য যে, হতে পারে তার কওমের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করবে।"[১০০৭]

শামসুল আইম্মা আল্লামা সারাখসী রাহ. বলেন-

أكره للمسلم المستأمِن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأن الغدر حرام، قال صلى الله عليه وسلم : " لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة يعرف به غدرته "، فإن غدر بهم وأخذ مالهم وأخرجه إلى دار الإسلام كرهت للمسلم شراءه منه إذا علم ذلك لأنه حصله بكسب خبيث ، وفي الشراء منه إغراء له على مثل هذا السبب وهو مكروه للمسلم ، والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

"যে মুসলমান কাফেরদের থেকে নিরাপত্তা নিয়ে তাদের ভূমিতে প্রবেশ করেছে তার জন্য তাদের সাথে গাদ্দারি করার সুযোগ নেই। কারণ গাদ্দারি বা বিশ্বাসঘাতকতা হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকদের জন্য কেয়ামতের দিন একটি ঝান্ডা থাকবে যা তার নিতম্বের নিকট গেড়ে দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাওয়া যাবে। যদি সে গাদ্দারি করে তাদের ধন-সম্পদ লুট করে মুসলিম রাষ্ট্রে নিয়ে আসে, তাহলে মুসলমানদের জন্য জানা থাকা সত্ত্বেও তার থেকে তা ক্রয় করাও মাকরূহ হবে। কারণ, সে তা অবৈধ পন্থায় অর্জন করেছে। সুতরাং তার থেকে তা ক্রয় করলে তাকে এরকম অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন করার প্রতি উৎসাহদান হবে। সুতরাং তা মাকরূহ। এক্ষেত্রে দলীল হলো, হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি.-এর হাদীস (যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।)"[১০০৮]

তবে মুসলমানদের মনে রাখতে হবে যে, তাদের উন্নতি এবং অগ্রগতির একমাত্র সোপান হলো তাদের দ্বীনের অনুসরণ। বিজাতীয় অমুসলিমদের প্রতি এসব ক্ষেত্রে মুখাপেক্ষিতা তাদের সম্মান ও মর্যাদার জন্য হানিকর। বিশেষ করে যদি কোনো মু'আহাদা থাকে, তাহলে তা রক্ষা করা অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং মুসলমানদের জন্য তা লঙ্ঘন করা বৈধ হবে না।

আর এক্ষেত্রে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর এই বক্তব্যের প্রতি লক্ষ রাখাও জরুরী, যা তিনি হিন্দুস্তানে সুদ আদান-প্রদানের ব্যাপারে লিখেছেন। হযরত থানভী রাহ. বলেন-

---

[১০০৭] ফাতহুল বারী: ৫/৪২৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১০০৮] আল মাবসূত: ১০/৯৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ
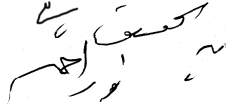
مقدمہ خامسہ... مواقع تہمت وبدنامی سے بچنا ضروریات سے ہے۔

"অপবাদ এবং দুর্নামের বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী"[১০০৯]

আর বর্তমানে আইনগত নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন হওয়ার কারণেও এটি নিষিদ্ধ হওয়া চাই।
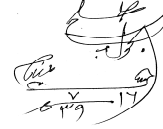
৩. পাইরেটেড হওয়াটা নিশ্চিত না হলে: মুসলমানদের সাথে মু'আমালার ক্ষেত্রে শরী'আতের মূলনীতি হলো, তাদের সম্পদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ না করা পর্যন্ত তাদের সাথে মু'আমালা ও লেনদেন করা যাবে। এজন্য নিশ্চিতভাবে কোনো সফটওয়্যার বা সফটওয়্যারের সিডি পাইরেটেড হওয়াটা প্রমাণিত না হলে তা ব্যবহার করা মোটেও শরী'আতের দৃষ্টিতে পাইরেসির আওতায় আসবে না।

সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৬ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৭ রজব ১৪৩৯ হি.

[১০০৯] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৩/১৫৭, মাকতাবায়ে দারুল উলূম, করাচী

সড়ক দুর্ঘটনা : শরী‘আতের মৌলিক আহকাম ও নির্দেশনা

মাওলানা ইসহাক, টাঙ্গাইল

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সড়ক দুর্ঘটনা। বিশেষত আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে প্রায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনায় মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে এবং আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর ‘দুর্ঘটনা গবেষণা প্রতিষ্ঠান’ (এআরআই)-এর হিসেবে গত দশ বছরে বাংলাদেশে ২৯ হাজার ৪৩২ টি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ২৬ হাজার ৬৩৮ জন। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ২১ হাজার ৫৪৮ জন।[১০১০]
ইসলাম ন্যায় ও মানবতার ধর্ম। সকল সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে তার রয়েছে উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা ও ন্যায়ানুগ বিধি-বিধান। সড়ক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে সড়ক দুর্ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর‘য়ী নির্দেশনা ও মৌলিক বিধি-বিধান উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

দুর্ঘটনা রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ : ইসলামের নির্দেশনা

আমরা জানি, প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। এজন্য দুর্ঘটনার পূর্বেই তা রোধ করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অবশ্যকীয়। দুর্ঘটনা রোধে ইসলামের কিছু মৌলিক নির্দেশনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক. ইসলাম বারবার সর্তক করেছে ক্ষতির কারণ না হতে। সরাসরি কারো ক্ষতি করা যেমন নিষেধ, ঠিক তেমনি এমন কাজ করাও নিষেধ যা অন্যের ক্ষতির কারণ হতে পারে। এজন্য যেসব কাজ বা বিষয় ক্ষতি ও দুর্ঘটনা ডেকে আনে বা তার পথ সুগম করে, তা পরিহার করাও জরুরী। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

“নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।”[১০১১]
হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাযি. হতে বর্ণিত-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.

“রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা করেছেন যে, কোনো ধরনের ক্ষতি বা ক্ষতিসাধন গ্রাহ্য নয়।”[১০১২]
রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب – وفي رواية : حجار – فقد برئت منه الذمة.

“যে ব্যক্তি রেলিংবিহীন কোনো ছাদেরাত্রি যাপন করে সে আল্লাহ তা‘আলার দায়িত্ব থেকে বের

[১০১০] Accident Research Institute -ARI (BUET)-এর ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য।
[১০১১] সূরা বাকারা: ১৯৫
[১০১২] (হাদীস সহীহ) সুনানু ইবনে মাজাহ: হাদীস নং ২৩৪০, মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২২৭৭৮। হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং একাধিক শক্তিশালী শাহেদও রয়েছে। সর্বসমন্বয়ে সহীহ-এর মানে উত্তীর্ণ। দ্র. জামেউল উলূম: ৩৯২- সহীহা (২৫০)

হয়ে যায়।"[১০১৩]

খ. রাস্তা নিরাপদ রাখার ব্যাপারে ইসলামে বিশেষ গুরুত্বপ্রদান করা হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবীদেরকে রাস্তায় যত্রতত্র বসতে নিষেধ করেছেন। রাস্তায় বসার ক্ষেত্রে তার আদাব ও শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ রাখতে বলেছেন।

-হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন

إياكم والجلوسَ على الطُّرقات، فقالوا: ما لنا بُدٌّ، إنما هو مجالسُنا نتحدَّث فيه، قال: فإذا أبَيتم إلا المجالسَ، فأعطوا الطريقَ حقَّها، قالوا: وما حقُّ الطريق؟ قال: غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، وأمرٌ بالمعروف، ونهيٌ عن المنكر.

"তোমরা রাস্তায় বসবে না। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তা থেকে বেঁচে থাকা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ পরস্পর কথা-বার্তা বলার জন্য আমাদের সেখানে বসতে হয়। তিনি বললেন, যদি তোমাদের বসতেই হয়, তাহলে রাস্তার হক আদায় করো। তারা বললেন, রাস্তার হক কী? তিনি ইরশাদ করলেন, 'দৃষ্টি নত রাখা, রাস্তা থেকে কষ্টকদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া, সালামের উত্তর দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।"[১০১৪]

রাস্তায় কষ্টদায়ক বা ক্ষতিকর কোনো বস্তু থাকলে তা 'সরিয়ে ফেলা'কে ঈমানের একটি শাখা বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

الإيمانُ بضع وسبعون – أو بضع وستون – شُعبةً، فأفضلُها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبة من الإيمان.

"ঈমানের ষাট বা সত্তরোর্ধ্ব শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো لا إله الا الله ও সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"[১০১৫]

হাদীসে বিভিন্নভাবে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণের বিশাল সওয়াব ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لقد رأيتُ رجلاً يتقلَّبُ في الجنة في شجرة قطعَها من ظَهْرِ الطريق كانت تؤذي الناسَ.

"রাস্তা থেকে একটি কষ্টদায়ক গাছ কেটে দেওয়ার কারণে এক ব্যক্তিকে আমি জান্নাতে গড়াগড়ি (বিচরণ) করতে দেখেছি।"[১০১৬]

হযরত আবু যর গিফারী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

عُرِضت عليَّ أعمالُ أمتي: حسَنُها وسيِّئُها، فوجدتُ في محاسن أعمالها الأذى يُماط عن الطريق، ووجدتُ

[১০১৩] সুনানু আবী দাউদ: ৫০৪১ (باب في النوم على سطح غير محجر) আল আদাবুল মুফরাদ (১১৯২) দ্র. সহীহুল আদাবিল মুফরাদ (৯৯২)

[১০১৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪০১, বাব নং ২২, মাকতাবাতুল ফাতাহ

[১০১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫, বাব নং ১২, মাকতাবাতুল ফাতাহ

[১০১৬] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬১৭, বাব নং ৩৬, মাকতাবাতুল ফাতাহ

في مساوئ أعمالِها النُّخاعة تكون في المسجد لا تُدفَنُ.

"আমার উম্মতের ভাল-মন্দ সব আমল আমার কাছে পেশ করা হলো। আমি তাদের নেক আমলসমূহের মধ্যে দেখতে পেলাম- কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া আর তাদের বদ আমলসমূহের মধ্যে দেখতে পেলাম- মসজিদে কফ ফেলে তা দাফন না করা।"[১০১৭]

আরেক হাদীসে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো'কে 'সাদকা' বলা হয়েছে। হযরত আবু যর গিফারী রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

يُصبحُ على كل سُلامَى من ابن آدم صدقةٌ: تسليمُه على من لقي صدقةٌ، وأمره بالمعروف صدقةٌ، ونهيه عن المنكر صدقةٌ، وإماطته الأذى عن الطريق صدقةٌ، وبُضْعتُه أهلَه صدقةٌ، قالوا: يا رسول الله، يأتي شهوةً وتكون له صدقة؟! قال: أرأيتَ لو وضعها في غير حقِّها، أكان يأثم؟ قال: ويجزئ من ذلك كلِّه ركعتان من الضحى.

"মানুষের প্রতিটি জোড়ার উপর একটি করে সাদকা ওয়াজিব হয়। (তবে এ সাদকা আদায়ের বহু পন্থা রয়েছে। যেমন,) কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়া সাদকা। সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা সাদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া সাদকা। স্ত্রী সহবাস করা সাদকা। তাঁরা (সাহাবাগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো ব্যক্তি তার যৌন চাহিদা পূরণ করবে আর তাতেও তার জন্য সাদকার সওয়াব হবে? তিনি ইরশাদ করলেন, বল দেখি, যদি সে অবৈধভাবে তা পূরণ করে, তাহলে গুনাহগার হবে কিনা? (অবৈধ পন্থায় চাহিদা পূরণ করলে যেমন গুনাহ হবে, তেমনি বৈধ পন্থায় পূরণ করলে সওয়াব হবে)

অতঃপর তিনি বললেন উপরোক্ত সবগুলোর সওয়াব অর্জনের জন্য চাশতের দুই রাকা'আত নামাযই যথেষ্ট।"[১০১৮]

রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু ফেলা বা কষ্টদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করাকে লা'নত বা অভিশাপের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

اتقوا الملاعن الثلاث قيل ما الملاعن يا رسول الله قال إن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء.

"তিন অভিশাপযোগ্য কাজ থেকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকো। জিজ্ঞেস করা হলো, সে তিনটি কাজ কী? তিনি বললেন, ছায়া, যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয় অথবা চলাচলের পথ অথবা মানুষের প্রয়োজপূরণকারী জলাশয় এসব (এ তিন) স্থানে কেউ জরুরত সারার জন্য বসে যাওয়া। (এটাই অভিশাপের কারণ)।"[১০১৯]

গ. বাহন রাস্তায় চলার উপযুক্ত কিনা তার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। ফিটনেসবিহীন গাড়ি রাস্তায়

[১০১৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫৩, বাব নং ১৩, মাকতাবাতুল ফাতাহ

[১০১৮] (সহীহ) সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৫২৪৩, বাব নং ১৭৩ মাকতাবাতুল ফাতাহ, সহীহ ইবনে হিব্বান (৪১৯২), সহীহ মুসলিম (৭২০)

[১০১৯] (হাদীস হাসান) মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৭১৫, সুনানু আবী দাউদ: হাদীস নং ২৬, হাকেম ১/১৬৭। আহমদ রাহ.-এর বর্ণনায় ইবনে লাহীয়া থাকলেও তার থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনুল মুবারক। আর এক্ষেত্রে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। এছাড়াও হাদীসটির শাহেদ রয়েছে।

নামানো যাবে না। পূর্বে উল্লিখিত শর'য়ী নুসূস থেকে আমরা জেনেছি যে, রাস্তায় ক্ষতির আশঙ্কা সৃষ্টি করে এ ধরনের সবকিছু পরিহারযোগ্য। হাদীস শরীফে ধারালো অস্ত্রকে খাপমুক্ত অবস্থায় রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত-

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتعاطى السيف مسلولا.

"নবী ﷺ কোষমুক্ত অবস্থায় তরবারি হাতবদল করতে নিষেধ করেছেন।"[১০২০]

এখানে ধারালো অস্ত্র যেহেতু অন্যের ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই তার ব্যাপারে পূর্ব থেকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রেও হাদীসের এ মূলনীতির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

ঘ. নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার জন্য কাঠামোগত ও ব্যবস্থাপনাগত সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিআরটিসি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কর্তৃপক্ষের এ দায়িত্বের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

ঙ. রাস্তা নিরাপদ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট আইন মেনে চলতে হবে। অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও সড়ক ব্যবহার, পরিবহন ও যান চলাচল সংক্রান্ত বিধি-বিধান রয়েছে। দুর্ঘটনা রোধের জন্য চালক, যাত্রী, পথচারী, পরিবহন মালিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এ সকল আইন-কানুন মেনে চলা শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যক। কারণ, যেকোনো সরকারী আইন শরী'আতবিরোধী বা অকাট্যভাবে জনস্বার্থের বিরোধী না হলে জনগণের উপর তা মান্য করা ওয়াজিব। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: দরসুল ফিকহ **১ম** খণ্ড, পৃ. ৩৪৯-৩৫৪)।

সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও তার শর'য়ী সমাধান প্রসঙ্গে ইসলামী ফিকহ একাডেমী, জেদ্দা'র একটি সেমিনার ব্রুনাই-এ **১৪১৪** হিজরী/**১৯৯৩** ইং-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। সেমিনারের সিদ্ধান্তের একটি অংশ ছিলো নিম্নরূপ-

... وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم، واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنح رخص القيادة بالشروط الخاصة بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرور والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة... قرر ما يلي:

أ- أن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعا، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال.

[১০২০] সুনানু আবী দাউদ: **২৫৮৮** (باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا)। সুনানুত তিরমিযী: **২১৬৩**

হাফেয ইবনে হাজার রাহ. এ হাদীসের ব্যাপারে 'ফাতহুল বারী'তে বলেন:

وأخرج الترمذي **بسند صحيح**، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال ألم أزجر عن هذا إذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه ولأحمد والطبراني بسند جيد عن أبي بكرة نحوه وزاد لعن الله من فعل هذا إذا سل أحدكم سيفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه..... وإنما نهي عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذي. [فتح الباري: ٢٥/١٣]

ب- مما تقتضيه المصلحة أيضا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي، لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذا بأحكام الحسبة المقررة...... [১০২১]

"... যানবাহনের লাইসেন্স সংক্রান্ত নীতিমালাগুলো এভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে নিরাপত্তার শর্তগুলো পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়।

ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি পাওয়া যাচ্ছে কিনা তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা জরুরী। যেমন, চালকের বয়স, সক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি, ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ও তা মেনে চলা, গাড়ি চালানোর সময় স্বাভাবিক গতি বজায় রাখা ও মাত্রাতিরিক্ত লোড না করা ইত্যাদি।

এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে ইসলামী ফিকহ একাডেমী জেদ্দা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করে-

ক. যেসব আইন-কনুন শরী'আতের বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তা মেনে চলা শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়াজিব। কারণ, তা উলূল আমরের ইতা'আত (আনুগত্য)-এর অন্তর্ভুক্ত। সরকারী আইনে এ সংক্রান্ত অন্যান্য শর'য়ী বিধানাবলীও অন্তর্ভুক্ত করা চাই, যার এখনও প্রয়োগ হচ্ছে না।

খ. এটাও মাসলাহাতের দাবি যে, যেসব যানবাহনের চালকরা ট্রাফিক আইন অমান্য করে রাস্তা-ঘাটে ও হাটে-বাজারে মানুষের নিরাপত্তাকে ঝুঁকির মুখে ফেলে, তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখার জন্য আর্থিক দণ্ডসহ[১০২২] যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।"

[১০২১] বিস্তারিত দেখুন: মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা ৮:২

[১০২২] **অর্থদণ্ডের বিধান : শর'য়ী দৃষ্টিকোণ**

আমরা জানি, বর্তমানে সড়ক বিধি ও আইন অমান্য করার উপর বিভিন্ন ধরনের আর্থিক জরিমানার আইন আছে। সড়ক বিধি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও জরিমানা ও ফাইনের সাথে আমরা পরিচিত। এ ধরনের জরিমানা মূলত التعزير بالمال বা অর্থদণ্ডের আওতায় আসে।

ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ ও মুফতা বিহী মতানুযায়ী অর্থদণ্ড আরোপ এবং গ্রহণ জায়েয নেই। ফকীহগণ এর দলীল হিসেবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ [سورة النساء: ٢٩]

এ আয়াতের নির্দেশনা মতে অন্যের মাল হালাল হওয়ার জন্য তার সন্তুষ্টি ও রিযা থাকা জরুরী। শর'য়ী রিযা অনুযায়ী সম্পদ গ্রহণ করলে তবেই তা হালাল হবে। (বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: 'হারাম অর্থ-সম্পদ: মালিকানা ও ব্যবহারবিধি' শীর্ষক প্রবন্ধ।) এ মর্মে অনেক হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

ফিকহী দৃষ্টিতে অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার জন্য এটা সাধারণ নীতি। তবে দু'টি ক্ষেত্রকে এ নীতি থেকে পৃথক রাখা হয়েছে। যথা-

১. শর'য়ী হুকুক: শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত হকগুলো আদায় করতে হবে। হকদার যদি নিজের প্রাপ্য জোর করেও নেয় তাও তার জন্য হালাল হবে।

২. সরকারী ট্যাক্স: সরকার প্রয়োজনে সহনীয় পর্যায়ে ট্যাক্স ধার্য করতে পারে। এক্ষেত্রে তা জোরপূর্বক আদায় করলেও বৈধ হবে। তবে শর্ত হলো তা সহনীয় পর্যায়ে হতে হবে।

যেহেতু অর্থদণ্ডের ক্ষেত্রে শর'য়ী রিযা পাওয়া যায় না, তাই উল্লিখিত দলীল ও উসূলের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, অর্থদণ্ড গ্রহণ জায়েয নেই।

উল্লেখ্য, আমাদের দেশে এখনো ১৯৮৩ সালের ‘মোটরযান আইন’ (সংশোধনীসহ) প্রচলিত আছে। এ আইনের ১৫৫ নং ধারা অনুযায়ী সকল যানবাহন বীমা করানো বাধ্যতামূলক। বীমা

এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, **অর্থদণ্ড** আর **আর্থিক ক্ষতিপূরণ** এক জিনিস নয়। উল্লিখিত মতটি শুধু জরিমানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শরী‘আতে যে ক্ষতিপূরণের বিধান রাখা হয়েছে সেক্ষেত্রে নয়।

যেমনটি আমরা জেনেছি, অর্থদণ্ডের ব্যাপারে উল্লিখিত মতটি প্রসিদ্ধ ও মুফতা বিহী। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন

والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال، وسيذكر الشارح في الكفالة عن الطرسوسي أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال: أي إذا كان يردها لبيت المال. [رد المحتار: ٩٨/٦]

নিম্নে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের বিবেচনায় আনার জন্য ফিকহে হানাফীর আরো একটি মত নিয়ে আলোচনা করা সমীচীন মনে হচ্ছে। বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম প্রয়োজনে এ মতটি বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. স্বীয় কিতাব ফাতহুল কাদীর-এ ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মত উল্লেখ করেছেন-

وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. [فتح القدير: ٣٣٠/٥]

পরবর্তী ইমামগণ ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর এ বক্তব্যের দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন-

এক. ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর উদ্দেশ্য সীমিত পদেক্ষেপ। অর্থাৎ তার থেকে জরিমানা হিসেবে অর্থ নেয়া হবে; কিন্তু খরচ করা যাবে না। পুনরায় তাকে ফেরত দিতে হবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন:

وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

দুই. অন্যরা ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আর্থিক জরিমানা নেওয়া যেতে পারে।

আল্লামা আবদুর রশীদ বুখারী রাহ. বলেন:

سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي يجوز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ ماله. (خلاصة الفتاوى ٤٤٤/٤، كتاب الحدود)

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন:

وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي يجوز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ ماله مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف (فتح القدير ٣٣٠/٥ زكريا)

ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়্যাতে উল্লেখ আছে-

والتعزير بأخذ المال إن رأى القاضي أو الوالي جاز.

ইমাম কাজী আলাউদ্দীন তারাবুলুসী হানাফী রাহ. (৮৪৪ হি.) অর্থদণ্ডের বিধান মানসূখ (রহিত) হয়ে যাওয়ার মতকে খণ্ডন করে বলেন:

ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا وليس بسهل دعوى نسخها. وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته ﷺ – مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم. (معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ٤٤٩/٢)

মুফতিয়ানে কেরামের মাঝে কেউ কেউ (১) প্রয়োজনের বিচারে এবং (২) জুলুম না হওয়ার শর্তে এ মতানুযায়ী ফাতওয়াও দিয়েছেন। যেমন, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-তে উল্লেখ আছে-

اگر مجرم توبہ نہ کرے تو پھر مصرف خیر پر صرف کرنا جائز ہے-خود رکھنا جائز نہیں-(فتاوی محمودیہ ۳۲۸/۲۰،زکریا)

ফকীহগণ এ মতের স্বপক্ষে কিছু হাদীস ও ফিকহী নযির উল্লেখ করে থাকেন, যা বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। সংক্ষিপ্ততার কারণে এখানে আলোচনা করা হলো না। পরবর্তীতে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা জানি, সকল ফিকহী মাযহাব অনুযায়ী হাকেম বা সরকার মুজতাহাদ ফীহ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিলে তা সকলের উপর কার্যকর হয়ে যায়। এখানে এ বিষয়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় থাকবে।

ব্যতীত গাড়ি চালালে ৭৫০ টাকা জরিমানার কথা উক্ত ধারায় উল্লেখ রয়েছে।

প্রচলিত বীমা[১০২৩] শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ ও ক্বিমারযুক্ত হওয়ায় নাজায়েয। সরকারী বাধ্যবাধকতার কারণে বীমা করা ছাড়া কোনো উপায় না থাকলে বীমা করা যাবে। তবে বীমার টাকা পেলে তা থেকে শুধু নিজের জমা অর্থের পরিমাণ ব্যবহার করতে পারবে।[১০২৪]

সরকারের উচিত, প্রচলিত বীমার বাধ্যবাধকতা তুলে নিয়ে এর বিকল্প হিসেবে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে সুদ, ক্বিমার ও অন্যান্য সমস্যামুক্ত সহযোগিতা ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা চালু করা।

ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে শর'য়ী দৃষ্টিভঙ্গী

ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ইসলামী আইনের মৌলিক বিধান হলো, ক্ষতি নিশ্চিত হওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্তকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। ইসলামী শরী'আতে যেমন অপরের ক্ষতি করা অবৈধ, তেমনিভাবে তার ক্ষতিপূরণ ও প্রতিবিধানও ক্ষতিসাধনকারীর উপর আবশ্যক। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকৃত বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ

"মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ।"[১০২৫]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ

"হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস (-এর বিধান) ফরয করা হয়েছে- স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী (কেই হত্যা করা হবে)।"[১০২৬]

ক্ষতি ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। কুরআনে কারীমে উল্লিখিত এক ব্যক্তির ক্ষেত-ফসল নষ্ট হওয়া এবং হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম-এর ফয়সালার ঘটনা থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ

"এবং দাউদ ও সুলাইমানকেও (হিকমত ও ইলম দিয়েছিলাম), যখন তারা একটি শস্যক্ষেত্রের ব্যাপারে বিচার করছিলো। তাতে রাতের বেলা একদল লোকের মেষপাল প্রবেশ করেছিলো।

[1023] বর্তমান 'তাকাফুল' বা 'ইসলামী বীমা' পলিসিগুলোতেও বিভিন্ন শর'য়ী সমস্যা পাওয়া যায়। প্রচলিত বীমার শর'য়ী বিকল্পের ব্যাপারে সমকলীন ফকীহগণ বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাবনা পেশ করেছেন বহু আগেই। এখন শুধু তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

[১০২৪] ফাতাওয়ায়ে উসমানী: ৩য় খণ্ড, ক্বিমার ও তা'মীন সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ

[১০২৫] সূরা শুরা: ৪০

[১০২৬] সূরা বাকারা: ১৭৮

তাঁদের ফয়সালা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করছিলাম। আমি সুলাইমানকে সে ফয়সালার বিষয়টি বুঝিয়েছিলাম এবং (এমনিতে তো) আমি উভয়কেই হিকমত ও ইলম দান করেছিলাম।"[১০২৭]

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই বিবাদের ফয়সালার ক্ষেত্রে হযরত দাউদ আ. ও হযরত সুলায়মান আ.-এর রায় ভিন্ন ছিলো। যদিও কুরআনে উভয় ফয়সালার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়নি; তবে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়নে এ বিষয়টি সামনে আসে যে, হযরত দাউদ আ. এবং হযরত সুলায়মান আ. উভয়ের রায়ের মূল বক্তব্য ছিলো, আঙ্গুর ক্ষেত নষ্টকারী ক্ষতির দায়ভার বহন করবে। ফলে আয়াতে উল্লিখিত ঘটনাটিতে একটি সাধারণ মূলনীতি পাওয়া যায়। তা হলো, যে ব্যক্তি অন্যের জান-মালের ক্ষতি-সাধন করবে, সে ঐ ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন হাদীসে এ ব্যাপারে মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ফয়সালা করেছেন। এ ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নববী নির্দেশনা হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

لا ضرر ولا ضرار

"ক্ষতি ও ক্ষতিসাধনের কোনো অনুমতি নেই।"[১০২৮]

এই হাদীসটি নিয়ে একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এই হাদীসটি কেবল অন্যের ক্ষতি করা হারাম- এ কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেনি; বরং এদিকেও ইঙ্গিত করেছে যে, যে ব্যক্তি এই ক্ষতির কারণ হবে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। কারণ, হাদীসের ভাষায় কেবল ক্ষতি সাধনকে 'না' করা হয়নি; বরং ক্ষতিকেই নাকচ করা হয়েছে। অতএব ক্ষতি হলে সেটা পুষিয়ে দিতে হবে, যাতে যথাসম্ভব ক্ষতির কোনো অস্তিত্বও না থাকে। আলোচ্যবিষয়ে এ হাদীসটি শরী'আতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ মূলনীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।[১০২৯]

ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর একটি ফয়সালা হযরত হারাম ইবনে সা'দ রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত হারাম ইবনে সা'দ রাযি. বলেন-

أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها.

"হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি.-এর একটি উটনী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে তা নষ্ট করে ফেললো। (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে তা পেশ করা হলে) তিনি ফয়সালা করলেন যে, দিনের বেলা বাগানের হেফাজত করা মালিকের দায়িত্ব। আর রাতের বেলা চতুস্পদ জন্তু কিছু নষ্ট করলে জন্তুর মালিক এর জন্য দায়ী থাকবে।"[১০৩০]

[১০২৭] সূরা আম্বিয়া: ৭৮-৭৯

[১০২৮] تقدم تخريجه.

[১০২৯] বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মু'আসিরা: ১/২৯৯, দারুল ক্বলম, দামেস্ক

[১০৩০] মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক, হাদীস নং: ১৪৬৭ (পৃ. ৬৪৪) আল্লামা আবু আমর ইবনু আবদিল বার রাহ. বলেন (আত তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তাই মিনাল মা'আনি ওয়াল আসানীদ, বাবুল মীম, ইবনু শিহাব আন ইবনি মুহায়্যিসাহ):

কুরআন-হাদীসে আরো বিভিন্নভাবে ক্ষতিপূরণের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শর'য়ী মূলনীতি

শরী'আতের সাধারণ নীতি অনুসারে সড়ক ব্যবহার ও চলাচল সাধারণ অবস্থায় সকলের জন্য বৈধ। কারণ, সড়কে চলাচল ও সড়ক ব্যবহার মানুষের মুবাহ অধিকার। তবে মুবাহ বা বৈধ অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও শরী'আত অন্যের ক্ষতিসাধন না করার শর্ত আরোপ করেছে।[১০৩১] সাধারণ রাস্তা ব্যবহারের অধিকার সবার সমান। কেউ তা এমনভাবে ব্যবহার করতে পারবে না যাতে অন্যের অধিকার খর্ব হয় অথবা কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হয়; বরং চলাচল বা ব্যবহারের সময় এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে অন্যের জান-মাল নিরাপদ থাকে। এই শর্ত মেনেই সাধারণ রাস্তায় চলাচল বৈধ। ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে যে মূলনীতি বর্ণনা করেছেন তা হলো, [১০৩২]"المرور في طريق العامة مباح بشرط السلامة"। অর্থাৎ, অন্যকে নিরাপদ রাখার শর্তে সাধারণ রাস্তায় চলাচল করা বৈধ। শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. বলেন-

والأصل في هذا أن السير على الدابة في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة، بمنزلة المشي، فإن الحق في الطريق لجماعة المسلمين، وما يكون حقا للجماعة يباح لكل واحد استيفاؤه بشرط السلامة؛ لأن حقه في ذلك يمكنه من الاستيفاء، ودفع الضرر عن الغير واجب عليه، فيقيد بشرط السلامة ليعتدل النظر من الجانبين، ثم إنما يشترط عليه هذا القيد فيما يمكن التحرز عنه؛ دون ما لا يمكن التحرز عنه، لأن ما يستحق على المرء شرعا يعتبر فيه الوسع ولأنا لو شرطنا عليه السلامة عما لا يمكن التحرز عنه تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه يمتنع من المشي والسير على الدابة مخافة أن يقتل بما لا يمكن التحرز عنه، فأما ما يستطاع الامتناع عنه لو شرطنا عليه صفة السلامة من ذلك لا يمتنع عليه استيفاء حقه، وإنما يلزمه به نوع احتياط في الاستيفاء.

"এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো- সাধারণ রাস্তায় যেভাবে হাঁটা-চলা করা মুবাহ, যানবাহন চালানোও মুবাহ। তবে শর্ত হলো, অন্যের কোনো ক্ষতি করা যাবে না। কারণ, সাধারণ রাস্তায় সব মুসলমানের অধিকার রয়েছে। আর যেক্ষেত্রে সবার অধিকার রয়েছে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকজন নিজ নিজ অধিকার আদায়ের স্বাধীনতা রাখে। তাই বলে নিজ অধিকার আদায় করতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি করা যাবে না। কেননা অন্যকে ক্ষতি থেকে যথাসম্ভব বাঁচানোও ওয়াজিব। তবে এই শর্ত ঐ সব ক্ষতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেসব ক্ষতি এড়ানো সম্ভব। আর যেসব ক্ষতি এড়ানো সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে তা শর্ত নয়। কারণ, শরী'আত মানুষের উপর সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে

هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة ، وحدث به الثقات ، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل ، وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحا ، وأكثر الفقهاء يحتجون بها، وحسبك باستعمال أهل المدينة ، وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث.

[১০৩১] আল্লামা আবু ইসহাক শাতেবী রাহ. এ প্রসঙ্গে (استعمال الحق بالنظر إلى مايؤول إليه من أضرار) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল মুওয়াফাকাত: ২/৩৪৮ দ্রষ্টব্য।

[১০৩২] অনেক ফকীহ এ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। মাজাল্লাতুল আহকামেও (ধারা নং: ৯৩২) এর উল্লেখ রয়েছে।

দেয় না। আর যা এড়ানো সম্ভব নয় তা এড়ানো শর্ত করা হলে, নিজের অধিকার আদায় করাও অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ, তখন প্রত্যেকেই এই ভয়ে রাস্তায় চলাচল ও যানবাহন চালানো থেকে বিরত থাকবে যে, হতে পারে এমন কোনো এক্সিডেন্ট হয়ে যাবে যা এড়ানো সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যে ক্ষতি এড়ানো সম্ভব তা পরিহারের শর্ত করলে নিজের অধিকার আদায় করা অসম্ভব হবে না; বরং আদায়ের ক্ষেত্রে তাকে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী হবে।"[১০৩৩]

শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) অন্য একস্থানে বলেন-

والمباحات تتقيد بشرط السلامة كالمشي في الطريق والرمي إلى الصيد.[১০৩৪]

উপরোক্ত মূলনীতি[১০৩৫] থেকে এ কথা সহজেই বুঝে আসে যে, সড়কে চলাচল একটি বৈধ অধিকার হলেও এ অধিকার চর্চা করতে গিয়ে কারো ক্ষতিসাধন হলে, সে ক্ষতির প্রতিবিধান জরুরী। কারণ, সড়ক ব্যবহার অপরের ক্ষতি না করার শর্তেই বৈধ।

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহ. বলেন-

ولا خلاف بين الفقهاء في تضمين الراكب ما أصابت بيدها، أو وطئت برجلها، والمعنى في ذلك: أنه إنما أبيح له السير في الطريق على شرط السلامة، على أن لا يعطب به إنسان؛ لأنه وإن كان له حق استطراق في الموضع، فإن سائر الناس يساوونه في الحق، فلما كان سائرًا في حق الغير، كان من شرط ذلك: أن لا يضر بإنسانٍ فيما يمكنه التحفظ منه على ما وصفنا.

"এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, বাহনের পদপিষ্ট হওয়ার কারণে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য জরিমানা আবশ্যক হবে। এর কারণ হলো, তাকে তো রাস্তা ব্যবহারের বৈধতা দেয়া হয়েছে অন্যকে নিরাপদ রাখার শর্তে। কেননা রাস্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার মতো সমস্ত মানুষেরও অধিকার রয়েছে। যেহেতু সে অন্যের অধিকারের উপর দিয়ে তার অধিকার আদায় করছে সেহেতু তাকে শর্ত দেয়া হবে, অন্যের ক্ষতি হয় এমন সব কাজ থেকে সাধ্যানুযায়ী বিরত থাকা।"[১০৩৬]

হ্যাঁ, যদি সকল আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি মেনে চলার পরও ড্রাইভারের **নিয়ন্ত্রণের বাইরে** কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তবে সে তার দায় বহন করবে না। বিস্তারিত আলোচনা সামনে 'সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন দুর্ঘটনা' এবং 'দুর্ঘটনা ও ক্ষতির দায়ভার সংক্রান্ত শর'য়ী মূলনীতি ও প্রয়োগ' শিরোনামদ্বয়ের অধীনে আসছে।

[১০৩৩] আল মাবসূত: ২৬/১৮৮ ৪/৪৪৫

[১০৩৪] আল মাবসূত: ৯/৬৫ ৪/৪৪৫। আল্লামা সারাখসী রাহ. অন্যত্র (আল মাবসূত ২৭/২৫) বলেন:

وإذا قعد الرجل في مسجد لحديث، أو نام فيه في غير صلاة، أو مر فيه فهو ضامن لما أصاب، كما يضمن في الطريق الأعظم في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف و محمد : لا ضمان عليه، لأنه لو كان مصليا في هذه البقعة لم يضمن ما يعطب به، فكذلك إذا كان جالسا فيه لغير الصلاة، بمنزلة الجالس في ملكه، فيكون ذلك مباحا مطلقا، والمباح المطلق لا يكون سببا لوجوب الضمان على الحر. وأبو حنيفة يقول: المسجد معد للصلاة، والقعود والنوم فيه لغير الصلاة مقيد بشرط السلامة .... وإن كان ذلك مباحا أو مندوبا إليه.

[১০৩৫] এ নীতি কার্যকর রাখার জন্য শরী'আতের যেসব নির্দেশনা রয়েছে, তার মধ্য থেকে কিছু পূর্বে 'দুর্ঘটনা রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ: ইসলামের নির্দেশনা' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

[১০৩৬] শরহু মুখতাসারিত তহাবী: ৬/৬৬, মাকতাবায়ে কারিমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

ক্ষতির বিভিন্ন ধরন ও ক্ষতিপূরণ

ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ফিকহে ইসলামীতে স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত দিয়াত ও যামানের অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আলোচনা করে থাকেন। সড়ক দুর্ঘটনার কারণে যে ক্ষতি হয়ে থাকে, তার ক্ষেত্রেও এসব বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

সড়ক দুর্ঘটনায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিই হতে পাবে। আমরা এখানে ক্ষতির বিভিন্ন ধরন ও তা পূরণের ক্ষেত্রে শর'য়ী আইন নিয়ে কিছু মৌলিক আলোচনা করবো। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য।

মৌলিকভাবে ক্ষতিকে চার প্রকারে ভাগ করা যেতে পারে-

১. প্রাণহানি

২. অঙ্গহানি

৩. আঘাত বা ক্ষত

৪. আর্থিক ক্ষতি

প্রাণহানি

ক্ষতির সর্বোচ্চ পর্যায় হলো প্রাণহানি। প্রাণহানি হলে অপরাধীকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যেমন ক্ষতি তেমন ক্ষতিপূরণ। অর্থাৎ, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ। যাকে কুরআনের পরিভাষায় 'কিসাস' বলে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এ ধরনের সমতামূলক ক্ষতিপূরণ কার্যকর করা সম্ভব হয় না। তাই শরী'আতে এর বিকল্প হিসেবে সম্পদের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের বিধান রাখা হয়েছে। কুরআনের পরিভাষায় এটাকে 'দিয়াত' বলা হয়েছে।

তাহলে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে যে, শরী'আতে ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে-

প্রথমত. কিসাস

দ্বিতীয়ত. দিয়াত

ক্ষতিপূরণ কিসাস হবে নাকি দিয়াত হবে, তা নির্ভর করবে ক্ষতির মাধ্যম ও ক্ষতিসাধনকারীর ইচ্ছা ও অবস্থার উপর।

প্রকাশ থাকে যে, যদি কেউ কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ না নিয়ে ক্ষতিসাধানকারীকে মাফ করে দেয়, তাও পারবে। আমরা এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না।

প্রাণহানি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও ধরন হিসেবে ফিকহে ইসলামীতে প্রাণহানিকে পাঁচ প্রকারে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের পরিচিতি ও ক্ষতিপূরণের বিধান উল্লেখ করা হচ্ছে।

১. ক্বতলে 'আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যা

ক্বতল শব্দের অর্থ হত্যা বা প্রাণনাশ। আর 'আমাদ শব্দের অর্থ, ইচ্ছা বা ইচ্ছাকৃত। শব্দের অর্থ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাকে এখানে 'কৃতলে 'আমাদ' বলা হচ্ছে। তাহলে 'কৃতলে 'আমাদ'-এর মূল মানাত বা লক্ষণীয় বিষয় হলো, **হত্যার ইচ্ছা সহকারে** আক্রমণ এবং হত্যা করা। সুতরাং যদি প্রমাণিত হয় যে, হত্যার ইচ্ছা নিয়েই হত্যা করা হয়েছে; আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু হয়নি, তাহলে তাকে কৃতলে 'আমাদ'ই বলা হবে।

আমরা জানি, হত্যার ইচ্ছা ছিলো কিনা তা জানার সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো স্বয়ং হত্যাকারীর

স্বীকারোক্তি। সুতরাং সে যদি স্বীকার করে নেয় যে, সে হত্যার উদ্দেশ্যেই আক্রমণ করেছে এবং হত্যা করেছে, তাহলে তাকে ক্বতলে 'আমাদ-এর দায়েই অভিযুক্ত করা হবে। এক্ষেত্রে সে কী দ্বারা হত্যার চেষ্টা করেছে বা হত্যা করেছে তা বিবেচ্য নয়। হত্যার ইচ্ছা ছিলো- এটাই বিবেচ্য। আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. বলেন-

أقول: مما ينبغى أن يعلم أن القتل هو إزهاق الروح، والعمد هو القصد، فالموجب للقود هو إزهاق الروح بالقصد، ولا دخل فيه لخصوص الآلة، إلا أن القصد أمر مبطن لا يعلم إلا من جهة الدليل، فإن كان الدليل هو إقرار القائل بأن أقر بأنه قتله بالقصد، فلا خلاف في أن هذا القتل موجب للقود بأى آلة كانت، كما علمت أنه لا دخل لخصوص الآلة في وجوب القود، وأنما الموجب له هو القتل عمدا.

"সুতরাং 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' পাওয়া গেলেই কিসাস আসবে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের বস্তু ব্যবহার করে হত্যা করেছে, তা মৌলিক বিষয় নয়। তবে যেহেতু ক্বসদ বা ইচ্ছা একটি গোপন বিষয় তাই তা সাব্যস্ত করার জন্য বাহ্যিক আলামত বা প্রমাণ থাকা জরুরী। যদি হত্যাকারী নিজেই স্বীকার করে যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে, তাহলে তা ক্বতলে আমাদ হওয়া এবং কিসাস আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত নেই। সে যে অস্ত্রই ব্যবহার করুক। কারণ, কিসাসের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাটাই মূল বিষয়।"[১০৩৭]

সুতরাং ইচ্ছাকৃত হত্যা ধারালো কিছু দিয়ে করা হোক বা বিষ প্রয়োগে করা হোক অথবা গাড়ি চাপা দিয়ে করা হোক, সর্বক্ষেত্রে তার উপর ক্বতলে 'আমাদ-এর বিধান জারী হবে।

যদি ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়ে হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি পাওয়া না যায় এবং ভুলক্রমে বা আকস্মিক হওয়ার প্রবল কোনো প্রমাণও না থাকে, তাহলে অন্য মাধ্যমে যাচাই করতে হবে যে, বাস্তবে তার ইচ্ছা ছিলো কিনা। ফুকাহায়ে কেরাম এক্ষেত্রে যাচাইয়ের মাধ্যম হিসেবে স্থির করেছেন হত্যার মাধ্যমকে। অর্থাৎ, তার মনের উদ্দেশ্য কী ছিলো তা যাচাইয়ের জন্য সে কী দ্বারা হত্যা করেছে বা হত্যার জন্য কী ধরনের উপায় বেছে নিয়েছে তা দেখতে হবে। এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ.-এর ভাষায় পেশ করা হলো। তিনি বলেন-

وإن لم يكن الدليل هو إقرار بأن أنكر قصد القتل، فإن كان الآلة ما لا يقصد به إلا القتل عادة، كالسلاح، وما يجري مجراه كالنار، فهو قتل عمدا موجب للقصاص بلا خلاف أيضا، وإن كان الآلة بما يقصد به القتل تارة، والتأديب أخرى، كالعصا الكبير، والحجر الكبير ونحوهما، فقال أبو يوسف، ومحمد، والأئمة الثلاثة: إنه قتل عمدا، لأنه آلة من آلات القتل كالسلاح، فلا يقصد في إنكاره القتل.

وقال أبو حنيفة: نعم! هو من آلات القتل، إلا أنه يستعمل في غير القتل أيضا، بخلاف السلاح، فإنه لا يستعمل إلا في القتل عادة، فليس ههنا ما يكذب دعواه ظاهرا"، كما كان في السلاح، فيصدق قوله، ولا يجب القصاص، لعدم ثبوت التعمد للقتل، نعم! إن أقر بأنه قتله قصدا يجب القصاص، وهذا التفصيل في القتل بالحجر الكبير، وغيره عنده يعلم مما قال صاحب 'المجتبى'، لأنه قال: "يشترط عند أبى حنيفة (في

[১০৩৭] ই'লাউস সুনান: ১৮/৭৫

عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل) أن يقصد التأديب دون الإتلاف، كافي 'البناية شرح الهداية' ٤/٤٤٥ فتنبه له.

"যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে মর্মে স্বীকারোক্তি না দেয়, এমতাবস্থায় যদি হত্যার মাধ্যম এমন জিনিস হয়ে থাকে, যা সাধারণত হত্যার জন্য ব্যবহার করা হয়, যেমন অস্ত্র বা আগুন, তাহলে এটাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য করা হবে এবং এক্ষেত্রে সবার মতে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর মাধ্যম যদি এমন হয়, যা দিয়ে হত্যাও করা যায় আবার তা শাসন বা উত্তম-মাধ্যমের জন্যও ব্যবহৃত হয়, যেমন ভারী লাঠি, বড় পাথর ইত্যাদি, এক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এবং অপরাপর তিন ইমাম বলেন, এটাও ইচ্ছাকৃত হত্যা। কেননা অস্ত্রের মতো এসব দিয়েও হত্যা করা যায়।

আর ইমাম আবু হানিফা রাহ. বলেন, এসব দিয়ে যদিও হত্যা করা যায়; কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য ছাড়াও এগুলোর ব্যবহার হয়ে থাকে। আর অস্ত্র এর ব্যতিক্রম। অস্ত্র সাধারণত শুধু হত্যার জন্যই ব্যবহৃত হয়। অতএব (অস্ত্র ব্যতীত অন্যগুলোর ক্ষেত্রে) হত্যাকারীর দাবি অর্থাৎ, হত্যার ইচ্ছা তার ছিলো না- এটাকে বাহ্যিকভাবে মিথ্যা বলার সুযোগ থাকে না, যেমন থাকে অস্ত্রের ক্ষেত্রে। সুতরাং (সতর্কতাবশত) হত্যাকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং ইচ্ছা সাব্যস্ত না হওয়ায় কিসাস ওয়াজিব হবে না। হ্যাঁ, যদি হত্যার ইচ্ছা ছিলো বলে স্বীকার করে, তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে। ..."[১০৩৮]

যানবাহনের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে, যদি ড্রাইভার ইচ্ছাকরে কাউকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে চাপা দেয় এবং সে মারা যায়, তাহলে তাকে কৃতলে 'আমাদ'ই বলা হবে। বর্তমান বিশ্বে এমন নযির প্রচুর। শত্রুতার জের ধরে অনেককেই এভাবে মেরে ফেলা হয়েছে। সুতরাং সে যদি স্বীকার করে যে, সে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যেই তাকে চাপা দিয়েছে, তাহলে তার উপর কৃতলে 'আমাদ'-এর বিধান আরোপিত হবে।

এ ধরনের হত্যাকান্ডের সাজা-

এ ধরনের হত্যাকান্ড ঘটলে যদি বাদী পক্ষ বদলা বা ক্ষতিপূরণ নিতে চায়, তাহলে সে নিম্নোক্ত দু'টির যেকোনো একটি নিতে পারবে। যথা-

ক. কিসাসঃ

কুরআনে হত্যার বদলায় কিসাসের বিধান রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ

"হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কিসাস (এর বিধান) ফরয করা হয়েছে।"[১০৩৯]

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول.

[১০৩৮] ই'লাউস সুনান: ১৮/৭৫

[১০৩৯] সূরা বাকারা: ১৭৮

"ইচ্ছাকৃত হত্যায় কিসাস ওয়াজিব হবে, তবে নিহতের ওলী মাফ করলে ভিন্ন কথা।"[১০৪০]
ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্যে এ ধরনের হত্যাকান্ডের মূল সাজা হলো কিসাস বা মৃত্যুদণ্ড। তবে মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিই এই কিসাস নিতে পারে।[১০৪১]
উল্লেখ্য, ক্বতলে 'আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান প্রয়োগ করা হবে যদি নিছক আগ্রাসীভাবে (عدوان محض) হত্যা করা হয়। আর যদি নিছক আগ্রাসীভাবে না হয়, অন্য কোনো কারণে হয়, যেমন, কাযীর নির্দেশ পালনার্থে হত্যা করলো (এবং পরে প্রমাণিত হলো যে, তার নির্দেশটির ভিত্তি ছিলো ভুল), তাহলে এক্ষেত্রে কিসাস জারী করা হবে না। হ্যাঁ, দিয়াত নেয়া হবে। আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. এ প্রসঙ্গে বলেন-

ويجب الدية في ماله؛ لأنه قتل عمدا، كما عرفت. والعواقل لا تعقل العمد، ولا يجب عليه القصاص؛ لأنه اعتمد على قضاء القاضي، وهو لا يعلم بكونه خطأ، فلم يكن القتل عدوانا محضا؛ فلا يجب القصاص؛ لأن القصاص إنما يجب إذا كان القتل عمدا وعدوانا محضا.

"দিয়াত হত্যাকারীর সম্পদের মাঝে ওয়াজিব হবে। কেননা এটা ইচ্ছাকৃত হত্যা। আকেলাগণ ইচ্ছাকৃত হত্যার দায় বহন করে না। এখানে হত্যাকারীর উপর কিসাসও ওয়াজিব হবে না। কেননা সে কাযীর ফয়সালার উপর ভিত্তি করে হত্যা করেছে। আর সে যে ভুলক্রমে হত্যা করছে, এটা তার জানা ছিলো না। ফলে হত্যাটির ক্ষেত্রে পুরোপুরি সীমালঙ্ঘন বা আগ্রাসন পাওয়া যায় না। অতএব কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা কিসাস তখনই ওয়াজিব হবে যখন ইচ্ছা এবং অন্যায় সীমালঙ্ঘন উভয়টি পাওয়া যাবে।"[১০৪২]

খ. দিয়াত:

উভয়পক্ষের সম্মতিতে দিয়াত বা রক্তপণও আদায় করা যাবে। দিয়াতের শর'য়ী মি'য়ার হলো, ১০০ উট বা ১ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) অথবা ১০ হাজার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)। হাদীসে বিভিন্নভাবে এমন নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إن في النفس مائة من الإبل.

"প্রাণহাণির বদলায় একশ উট আবশ্যক হবে।"[১০৪৩]
ইমাম মুহাম্মদ রাহ. কিতাবুল আসারে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর নিম্নোক্ত আসার বর্ণনা করেছেন-

عن عمر أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف.

"হযরত উমর রাযি. দিয়াতের ক্ষেত্রে স্বর্ণের মালিকদের উপর ১ হাজার দীনার এবং রূপার

[১০৪০] সুনানুদ দারাকুতনী: হাদীস নং ৩১৩৬
[১০৪১] কিসাস একটি যৌক্তিক বিধান। সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য এটি সফল ও উপযুক্ত মাধ্যম। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কারণে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো না।
[১০৪২] ই'লাউস সুনান: ১৮/১২৫
[১০৪৩] সুনানুন নাসাঈ: হাদীস নং ৪৮৫৭

মালিকদের উপর ১০ হাজার দিরহাম আরোপ করেছেন।"[১০৪৪]

রূপার পরিমাপ হিসেবে দিয়াতের পরিমাণ হলো, ২৬২৫ তোলা রূপা তথা ৩০.৬১৮ কি.গ্রা. রূপা। উল্লেখ্য, মহিলাদের দিয়াত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। ইমাম ইবনুল মুনযির রাহ. বলেন-

أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

"নারীর দিয়াতের পরিমাণ পুরুষের অর্ধেক। এ ব্যাপার উলামায়ে কেরাম একমত।"[১০৪৫]

২. ক্বতলে শিবহে 'আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হত্যার সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যা

যদি হত্যা ইচ্ছাকৃত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি পাওয়া না যায় এবং একেবারে ভুলক্রমে ও অপ্রত্যাশিতভাবে হত্যা সংঘটিত হওয়ার প্রবল ধারণাও না হয়, তাহলে দেখতে হবে, হত্যার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি কী ধরনের মাধ্যম বা উপকরণ ব্যবহার করেছে। যদি এমন মাধ্যম দ্বারা হত্যা করা হয়, যা সাধারণত মানুষের প্রাণনাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহলে তো তা ক্বতলে 'আমাদ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যদি এমন কোনো মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, যা সাধারণত হত্যার কাজে ব্যবহৃত হয় না, তাহলে তা ক্বতলে শিবহে 'আমাদ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নিকট ধারালো অস্ত্র ছাড়া সবই এ প্রকারের মাঝে শামিল। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর নিকট ধারালো এবং ভারী বস্তু, যা দ্বারা সহজেই মানুষ হত্যা করা সম্ভব। এ দু'প্রকার মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস দ্বারা হত্যা করা হলে তাকে শিবহে 'আমাদ বলা হবে।

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

وأما شبه العمد: فهو ما تعمدت ضربه بالعصا أو السوط أو الحجر أو اليد فإن في هذا الفعل معنيين: العمد باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب، ومعنى الخطأ باعتبار انعدام القصد منه إلى القتل؛ لأن الآلة التي استعملها آلة الضرب للتأديب دون القتل، والعاقل إنما يقصد كل فعل بآلته فاستعماله آلة التأديب دليل على أنه غير قاصد إلى القتل فكان في ذلك خطأ يشبه العمد صورة من حيث إنه كان قاصدا إلى الضرب، وإلى ارتكاب ما هو محرم عليه.

"কাউকে ইচ্ছাকৃত লাঠি, চাবুক, পাথর বা হাত দিয়ে আঘাত করার কারণে (আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে তাকে ক্বতলে শিবহে আমাদ বলা হয়। (এ ধরনের হত্যাকে শিবহে আমাদ বা 'ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ' বলার কারণ হলো) এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় পাওয়া যায়-

এক. ইচ্ছা। অর্থাৎ, আঘাতকারী ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করেছে (তার উদ্দেশ্য যাই হোক)।

দুই. ভুল। কারণ, আঘাতকারী ইচ্ছাকৃত আঘাত করলেও বাহ্যিক আলামত থেকে তার হত্যা করার ইচ্ছা প্রমাণিত হয় না। কারণ, সে যে মাধ্যম বা উপকরণ ব্যবহার করেছে তা শাসন করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে; শুধু হত্যা করার জন্য নয়। আর বিবেকবান ব্যক্তি ইচ্ছানুযায়ী উপকরণ অবলম্বন করে থাকে। সুতরাং শাসন করার অস্ত্র ব্যবহার করাটাই এ কথার দলীল যে, তার হত্যার ইচ্ছা ছিল না। অতএব এক্ষেত্রে এমন ভুল পাওয়া যায় যা বাহ্যিকভাবে ইচ্ছার

[১০৪৪] কিতাবুল আসার: ৫৫৪, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ১৭২৬৩, মুসান্নাফে ইবনে আবী শয়বা: ২৭২৬৩

[১০৪৫] আল ইশরাফ: ৩/৯২, দারুল ফিকর

সাথে সাদৃশ্য রাখে এই হিসেবে যে, সে (হত্যার ইচ্ছা না করলেও) প্রহার করা এমন বিষয়ের ইচ্ছা করেছে যা তার জন্য হারাম।"[১০৪৬]

ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

وشبه العمد عند أبي حنيفة رحمه الله أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي رحمهم الله إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا لأنه يتقاصر معنى العمدية باستعمال آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا لما أنه يقصد بها غيره كالتأديب ونحوه فكان شبه العمد ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث لأنه لا يقصد به إلا القتل كالسيف فكان عمدا موجبا للقود.

"ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নিকট শিবহে আমাদ হলো অস্ত্র বা অস্ত্রের স্থলাভিষিক্ত নয় এমন জিনিস দিয়ে ইচ্ছাকৃত প্রহার করার ফলে প্রহারকৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটা। তবে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এবং ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর অভিমতও এটিই যে, যদি বড় পাথর বা বড় কাষ্ঠফলক দিয়ে প্রহার করে (ফলে প্রহারকৃত ব্যক্তি মারা যায়) তাহলে তা কতলে আমাদ গণ্য হবে (শিবহে আমাদ নয়)। তাদের মতে শিবহে আমাদ হলো, ইচ্ছাকৃতভবে এমন জিনিস দিয়ে প্রহার করা যা দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হত্যা করা উদ্দেশ্য হয় না। কারণ ছোট-খাট বস্তু যা দিয়ে সাধারণত হত্যা করা হয় না, তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে। কারণ তা দ্বারা প্রহার করার ক্ষেত্রে হত্যা ছাড়া অন্য কিছুও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া ইত্যাদি। সুতরাং তা শিবহে আমাদ হবে। আর যে জিনিস দ্বারা প্রহার করলে মৃত্যু বিলম্ব হয় না তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। কারণ, তরবারির মত তা দ্বারাও হত্যাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অতএব তা কতলে আমাদ বলে গণ্য হবে এবং এর কারণে কিসাস ওয়াজিব হবে।"[১০৪৭]

ক্বতলে শিবহে আমাদের সারকথা যা আমরা বুঝলাম তা হলো, হত্যার উদ্দেশ্য নয়; বরং শাস্তি বা অন্য উদ্দেশ্যে আঘাত করেছে, কিন্তু তাতে মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আঘাত ইচ্ছাকৃত; তবে মৃত্যু হয়েছে আকস্মিক, তাই ক্বতলে শিবহে 'আমাদ হয়েছে।

সাধারণ জিনিস দ্বারা যদি এ পরিমাণ আঘাত করা হয়, যা সাধারণত মৃত্যুর কারণ হয় না, তাহলে তাকে শিবহে 'আমাদই বলা হবে। হ্যাঁ, যদি উক্ত বস্তু দ্বারা এত বেশি আঘাত করা হয় যে, তা মারা যাওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং সে মারা যায়, তাহলে তাকে ক্বতলে 'আমাদ বলা হবে। শিবহে 'আমাদ বলা হবে না।

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. বলেন-

وإن كان القتل بآلة لا يستعمل في القتل عادة، كالسوط ونحوه، فهو ليس بعمد بالاتفاق، بل شبه العمد، إلا أن يتكرر الضرب بحيث تكون جملة الضربات قاتله غالبا فإن فيه قولين: الأول: أنه عمد محض عندهما. والثاني: أنه شبه عمد كقول أبى حنيفة، هذا تحقيق الأختلاف فيما بينهم، فاحفظه.

"যদি হত্যাকান্ড এমন বস্তু দ্বারা সংঘটিত হয়, যা সাধারণত হত্যার জন্য ব্যবহৃত হয় না যেমন,

---

[১০৪৬] আল মাবসূত: ২৬/৬৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১০৪৭] আল হিদায়া: ৪/৫৬০, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

বেত, কঞ্চি ইত্যাদি, তাহলে এটা সবার ঐকমত্যে কতলে আমাদ নয়; বরং তাকে শিবহে 'আমাদই বলা হবে। হ্যাঁ, যদি উক্ত বস্তু দ্বারা এত বেশি আঘাত করা হয় যে, তা মারা যাওয়ার যথেষ্ট কারণ হতে পারে, তাহলে এক্ষেত্রে দু'ধরনের বক্তব্য রয়েছে। এক. ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর নিকট এটা নিরেট কতলে আমাদ। দুই. ইমাম আবু হনিফা রাহ.-এর মতে এটা শিবহে আমাদ। তাদের মাঝে মতানৈক্যের আদ্যোপান্ত এটুকুই।"[১০৪৮]

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, যানবাহনের ক্ষেত্রে যদি চালক ইচ্ছা না থাকার দাবি করে, অর্থাৎ, যদি সে বলে যে, সে ইচ্ছা করে কাউকে চাপা দেয়নি বা দুর্ঘটনা ঘটায়নি; অন্য দিকে নিছক ভুলক্রমে বা আকস্মিকভাবে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ারও নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে তা ক্বতলে শিবহে আমাদের আওতায় পড়বে। এর নযির হিসেবে নিম্নের মাসআলাটি উল্লেখ করা যায়।

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

فإن سار الصبي على الدابة فأوطأ إنسانا فقتله، فإن كان هو ممن يستمسك عليها فديته على عاقلة الصبي؛ لأنه متلف للرجل بدابته حين أوطأها إياه ولا شيء على عاقلة الذي حمله عليها؛ لأنه أحدث السير باختياره.

"যদি শিশু আরোহীকে নিয়ে বাহনজন্তু চলে এবং কাউকে পদপিষ্ট করে মেরে ফেলে, তাহলে দেখা হবে বালকটি বাহন নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা রাখতো কিনা। যদি শিশুটি বাহন নিয়ন্ত্রন করতে পারে, এমন হয়, তাহলে দিয়াত শিশুটির আকেলার উপর আসবে। কেননা শিশুটি আরোহী অবস্থায় লোকটিকে তার বাহন দ্বারা পদপিষ্ট করে হত্যা করেছে। যে ব্যক্তি শিশুটিকে বাহনে আরোহণ করিয়েছে, তার আকেলার উপর কোনো কিছু আবশ্যক হবে না। কারণ, শিশুটি নিজ ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণে বাহন হাঁকিয়েছে।"[১০৪৯]

এ প্রকার হত্যার সাজা-

ক্বতলে শিবহে 'আমাদ'-এর ক্ষেত্রে কিসাসের কোনো সুযোগ নেই; বরং এতে দু'ধরনের সাজা আরোপিত হবে। **এক.** নিজের গুনাহের কাফ্ফারা। **দুই.** ক্ষতিপূরণ। ফুকাহায়ে কেরাম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে পেশ করা হলো।

ক. কাফফারা। অর্থাৎ, একজন গোলাম আযাদ করতে হবে। আর তা সম্ভব না হলে, লাগাতার দুই মাস রোজা রাখা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

[১০৪৮] ই'লাউস সুনান: ১৮/৭৬

[১০৪৯] আল মাবসূত: ২৬/১৮৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে ভুলবশত হত্যা করবে, (তার উপর ফরয) একজন মুসলিম গোলামকে আযাদ করা এবং নিহতের ওয়ারিশদেরকে দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করা, অবশ্য তারা ক্ষমা করে দিলে ভিন্ন কথা। নিহত ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের লোক হয়, কিন্তু সে নিজে মুসলিম, তবে (কেবল একজন মুসলিম গোলামকে আযাদ করা ফরয, দিয়াত বা রক্তপণ দিতে হবে না)। নিহত ব্যক্তি যদি এমন সম্প্রদায়ের লোক হয় (যারা মুসলিম নয় বটে, কিন্তু) যাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তবে (সেক্ষেত্রেও) তার ওয়ারিশদেরকে রক্তপণ দেওয়া ও একজন মুসলিম গোলাম আযাদ করা (ফরয)। অবশ্য কারো কাছে (গোলাম) না থাকলে সে অনবরত দু'মাস রোযা রাখবে।"[১০৫০]

ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগীনানী রাহ. বলেন-

والكفارة لشبهه بالخطاء.

"আর কাফফারা আসবে কতলে খাতার সাথে সাদৃশ্যতার কারণে।"[১০৫১]

খ. দিয়াতঃ দিয়াতের পরিমাণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ক্বতলে শিবহে 'আমাদ-এর ক্ষেত্রে দিয়াত বহন করবে হত্যাকারীর 'আক্বেলা। তিনবছরের মধ্যে 'আক্বেলা'র এই দিয়াত পরিশোধ করতে হবে। 'আক্বেলা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

৩. ক্বতলে খাতা বা ভুলবশত হত্যা

এখানে 'খাতা' অর্থ ভুল। সুতরাং ক্বতলে খাতা অর্থ- ভুলবশত হত্যা। ক্বতলে খাতা'র ক্ষেত্রে দু'টি দিক সবিশেষ লক্ষণীয় থাকবে-

এক. হত্যাকারী মুবাশির[১০৫২] হতে হবে। সুতরাং যদি সে মুবাশির না হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে ক্বতলে খাতা'র বিধান প্রযোজ্য হবে না।

দুই. ভুল ধারণার ভিত্তিতে প্রাণনাশ হতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো দখল থাকে না, তা ক্বতলে খাতার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. বলেন-

اعلم أن القتل الخطأ الموجب للكفارة على القاتل والدية على العاقلة، هو الذى يكون مباشرة لا تسببا، ويكون مبناه هو ظنه، ويكون ذلك الظن خطأ.

"জেনে রাখা দরকার, যে কতলে খতার করণে হত্যাকরীর উপর কাফফারা আসবে এবং আকেলার উপর দিয়াত আসবে, তা হলো, যা হত্যাকারী সরাসরি ঘটিয়েছে (এমন নয় যে, সে নিছক হত্যার কারণ হয়েছে) এবং সে তার নিজের ভুল ধারণার ভিত্তিতেই তা ঘটিয়েছে।"[১০৫৩]

ভুলবশত হত্যা দু'ধরনের হতে পারেঃ

১. লক্ষ্যের ক্ষেত্রে ভুল। যেমন, দূরে কোনো একজন মানুষকে প্রাণী মনে করে তার উপর গুলি চালালো।

[১০৫০] সূরা নিসাঃ ৯২

[১০৫১] আল হিদায়া: ৪/৫৬১, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[১০৫২] অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ জড়িত। বিস্তারিত আলোচনা সামনে 'দুর্ঘটনা ও ক্ষতির দায়ভার' শিরোনামের অধীনে আসছে।

[১০৫৩] ই'লাউস সুনান: ১৮/১২৫

২. কর্মের ক্ষেত্রে ভুল। যেমন, নির্দিষ্ট কোনো একটি টার্গেটে আঘাত হানতে গিয়ে ভুলক্রমে কোনো মানুষকে আঘাত করলো।

ক্বতলে খাতা'র সাজা ক্বতলে শিবহে 'আমাদ'-এর মতই- **দিয়াত** ও **কাফফারা**। ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেন-

والخطأ على نوعين: خطأ في القصد، وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي، أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم وخطأ في الفعل، وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدميا، وموجب ذلك الكفارة، والدية على العاقلة.

"ভুল দুই প্রকার:

এক. ইচ্ছার ক্ষেত্রে ভুল যেমন, কোনো ব্যক্তিকে ভুলে শিকার মনে করে তীর ছুড়ল। পরে স্পষ্ট হলো যে, সে মানুষ অথবা কোনো ব্যক্তিকে হারবী মনে করে হত্যা করলো। পরবর্তীতে জানা গেলো যে, সে মুসলমান।

দুই. কর্মের ক্ষেত্রে ভুল। যেমন, শিকার করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে তীর বা অন্য কিছু কোনো ব্যক্তির গায়ে গিয়ে পড়লো।"[১০৫৪]

যানবাহনের ক্ষেত্রে চালক যদি কুয়াশার কারণে বা ভুলক্রমে কোনো ব্যক্তি বা যানবাহনকে মেরে দেয়, তাহলে তা ক্বতলে খাতা'র অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রসঙ্গত, প্লেনের ক্ষেত্রেও ক্বতলে খাতা'র বিধান প্রযোজ্য হতে পারে। মধ্যাকাশে প্লেনের দুর্ঘটনা ও সংঘর্ষ যদিও বিরল, তবে ইতিহাসে এরও অনেক নযির রয়েছে।[১০৫৫] এমনিভাবে রানওয়েতে ভুলবশত কোনো মানুষ, গাড়ি বা প্লেনের সাথে আরেক প্লেনের সংঘর্ষ হতে পারে। এক্ষেত্রে ক্বতলে খাতার উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও উপাদান পাওয়া গেলে তা ক্বতলে খাতা পরিগণিত হবে।

৪. ক্বতলে জারী মাজরাল খাতা (ভুলবশত হত্যার অনুরূপ)

যদি প্রাণহানির ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো প্রভাব না থাকে, তাহলে এই ধরনের প্রাণহানিকে 'ক্বতলে জারী মাজরাল খাতা' বলে। যেমন, খাটের উপর থেকে কোনো ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় নিচে পড়ে গেলো। নিচে ঘুমন্ত কোনো বাচ্চা ছিলো। ঐ ব্যক্তির পড়ার কারণে সেই বাচ্চা মারা গেলো।

'ক্বতলে জারী মাজরাল খাতা' অর্থ হলো, ক্বতলে খাতা বা ভুলবশত প্রাণহানির অনুরূপ প্রাণহানি। কারণ, এটি সরাসরি ক্বতলে খাতা না হলেও তার বিধান ক্বতলে খাতা'র মতোই। এ ধরনের প্রাণনাশের ক্ষেত্রে ক্বতলে খাতা'র বিধান প্রয়োগ হওয়ার মৌলিক কারণ হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত সতর্কতার অভাব। অর্থাৎ, একে তো হত্যার ইচ্ছাও ছিলো না, আবার ভুল ধারণারও কোনো প্রভাব ছিলো না; কিন্তু দায়ী ব্যক্তির পক্ষ থেকে উপযুক্ত সতর্কতা পাওয়া যায়নি। এ অসতর্কতাই তাকে হত্যার দিকে নিয়ে গেছে। তাই এটি সরাসরি ভুল না হলেও ভুলের মতই। অন্যের ক্ষতির ক্ষেত্রে এ ধরনের ভুল অমার্জনীয়।

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

[১০৫৪] আল হিদায়া: ৪/৫৬১, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[১০৫৫] Mid-air-collision, Wikipedia.

فأما ما أجري مجرى الخطأ على ما ذكره الرازي فهو النائم إذا انقلب على إنسان فقتله، وهذا ليس بعمد، ولا خطأ؛ لأنه لا تصور للقصد من النائم حتى يتصور منه ترك القصد أو ترك التحرز، ولكن الانقلاب الموجب لتلف ما انقلب عليه يتحقق من النائم فيجري هذا مجرى الخطأ حتى تجب الدية على عاقلته، والكفارة ويثبت به حرمان الميراث؛ لتوهُّم[১০৫৬] أن يكون متهاونا، ولم يكن نائما قصدا منه إلى استعجال الميراث، وأظهر من نفسه القصد إلى محل آخر.

"....ইমাম রাযী রাহ. যা উল্লেখ করেছেন সে অনুযায়ী ভুলবশত প্রাণহানীর অনুরূপ প্রাণহানীর উদাহরণ হলো, কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি গড়িয়ে কোনো ব্যক্তির উপর পড়ে গেলো। ফলে সে মারা গেলো। এই প্রকারের প্রাণহানী ইচ্ছাকৃত প্রাণহানী বা ভুলবশত প্রাণহানী কোনোটাই নয়। কারণ, ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে ইচ্ছার কল্পনাও করা যায় না। তাহলে ইচ্ছা ত্যাগ করা বা সতর্কতা অবলম্বন না করা কোথা থেকে পাওয়া যাবে? তবে গড়িয়ে পড়াটা সরাসরি ঘুমন্ত ব্যাক্ত থেকেই পাওয়া গেছে। সুতরাং এটা ভুলেক্রমে হত্যার স্থলাভিষিক্ত হবে। ফলে হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে এবং তার আকেলার উপর রক্তপণ ওয়াজিব হবে। আর হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ এক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সে ঘুমন্ত ছিলো না; বরং জলদি মিরাছ লাভ করার উদ্দেশ্যে অবহেলা করে সে এ কাজ করেছে এবং বাহ্যত সে প্রকাশ করেছে যে, তার উদ্দেশ্য তা ছিলো না।"[১০৫৭]

যানবাহনের এক্সিডেন্টে প্রাণহানি যদি ভুলক্রমে হয় এবং ভুলের কারণ অসর্তকতা হয়, তাহলে এ ধরনের প্রাণহানির ক্ষেত্রে ক্বতলে জারী মাজরাল খাতা'র বিধান প্রযোজ্য হবে। পূর্বের আলোচনার আলোকে আমরা বুঝছি যে, মূলত দায়ী ব্যক্তির অসর্তকতার কারণেই এ বিধান আরোপিত হবে। যদি দুই গাড়ির মাঝে এমন হয়, তাহলে অবস্থা অনুযায়ী দু'জনই দায়ী হবে। ফুকাহায়ে কেরাম আরেকজনকে ধাক্কা প্রদানের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

لما روي عن علي – رضي الله عنه – أنه جعل دية كل واحد من المصطدمين على عاقلة صاحبه، والمعنى فيه أن كل واحد منهما موقع لصاحبه فكأنه أوقعه عن الدابة بيده

"হযরত আলী রাযি.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি ধাক্কা-ধাক্কিতে নিহত উভয় জনের দিয়াত তাদের 'আকেলার উপর ধার্য করেছিলেন। এমনিভবে বাহনের ক্ষেত্রে দুই আরোহী একে অপরের বাহনে আঘাত করে আরোহীকে ফেলে দিলে এবং উভয়জন মৃত্যুবরণ করলে, সেক্ষেত্রেও উভয়ের আক্বেলার উপর দিয়াত আসবে। কারণ, এখানে উভয়ই অপরের হত্যার ক্ষেত্রে সরাসরি সংশ্লিষ্টের মতোই। কারণ, তাদের কর্ম তথা বাহন চালনার মাধ্যমেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।"[১০৫৮]

শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. তখনকার বাহনের এক্সিডেন্টে সংঘটিত প্রাণনাশকে ক্বতলে জারী মাজরাল খাতা-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেন-

---

[১০৫৬] وفي النسخة الرائجة: ليوهم، والصحيح "لتوهُّم" إن شاء الله تعالى.

[১০৫৭] আল মাবসূত: ২৬/৬৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১০৫৮] আল মাবসূত: ২৬/১৯০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

وإذا سار الرجل على دابة – أي الدواب كانت – في طريق المسلمين، فوطئت إنسانا بيد أو رجل وهي تسير فقتلته، فديته على عاقلة الراكب... فأما الراكب والمرتدف فمباشران القتل بفعلها فعليهما الكفارة كالنائم إذا انقلب على إنسان فقتله.

"যদি কোনো ব্যক্তি কোনো চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহন করে রাস্তা দিয়ে চলাচল করে আর চলা অবস্থায় জন্তুর সামনের বা পিছনের পায়ে পিষ্ট হয়ে কোনো ব্যক্তি নিহত হয়, তাহলে তার রক্তপণ আরোহীর 'আক্বেলার উপর ওয়াজিব হবে।...
আরোহী ও পিছনের আরোহী হলো সরাসরি হত্যাকারী বা মুবাশির। সুতরাং তাদের উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। যেমনভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি গড়িয়ে কারো উপর পড়ে যাওয়ার কারণে সে মারা গেলে (কাফফারা ওয়াজিব হয়)।"[১০৫৯]

তিনি আরো বলেন-

وإذا حمل الرجل معه الصبي على الدابة ومثله لا يصرفها ولا يستمسك عليها فوطئت الدابة إنسانا فقتلته، فالدية على عاقلة الرجل خاصة؛ لأنه هو المسير للدابة، والصبي الذي لا يستمسك بمنزلة المتاع معه على الدابة، فالدية على عاقلته وعليه الكفارة؛ لأن الراكب يجعل متلفا لما أوطأ بدابته مباشرة فإنه إنما تلف بفعله، والكفارة جزاء مباشرة.

"কোনো ব্যক্তি বাহনে তার সাথে এমন বালককে সাথে নিলো যে বাহন পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অতঃপর সে বাহন কাউকে পায়ে মাড়িয়ে হত্যা করে ফেললো। এমতাবস্থায় দিয়াত শুধু ওই ব্যক্তির আকেলার উপর বর্তাবে। কেননা সেই বাহন হাঁকাচ্ছিলো। আর সাথের বালকটিকে বাহনের উপর একটি পণ্যের স্থানে ধরা হবে। অতএব দিয়াত লোকটির আকেলার উপর দিয়াত আসবে, আর তার নিজের উপর আসবে কাফফারা। ..."[১০৬০]

ইমাম সারাখসী রাহ. এক্ষেত্রে অপরাধের মূল কারণ নির্দিষ্ট করে বলেন-

التحرز عن الوطء على شيء في وسع الراكب إذا أمعن النظر في ذلك، فإذا لم يسلم كان جانيا وهذه جناية منه بطريق المباشرة.

"কাউকে পদদলিত করা থেকে বেঁচে থাকা আরোহীর সক্ষমতার ভেতরে আছে, যদি সে মনোযগী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। যেহেতু সে এটা করেনি সেহেতু সে মুবাশির (সরাসরি সংশ্লিষ্ট) হিসেবে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।"[১০৬১]

৫. ক্বতল বিত তাসাব্বুব (কোনো মাধ্যমের সংশ্লিষ্টতায় হত্যা)

উপরে প্রাণনাশের যেসব প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিলো সরাসরি সংশ্লিষ্টতায় হত্যার ক্ষেত্রে। চাই ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে। যদি সরাসরি কারো প্রাণসংহার করা না হয়; বরং অন্যের হকের ক্ষেত্রে এমন কোনো কাজ করা হয়, যার কারণে প্রাণনাশ ঘটে, তাহলে তা ক্বতল বিত তাসাব্বুব-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, রাস্তার মাঝে একটি কুয়া খুঁড়ে রাখলো। অন্ধকারে

[১০৫৯] আল মাবসূত: ২৬/১৮৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ
[১০৬০] আল মাবসূত: ২৬/১৮৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ
[১০৬১] আল মাবসূত: ২৬/১৮৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

কোনো ব্যক্তি এতে পতিত হয়ে মারা গেলে খননকারীর উপর তার হত্যার দায়ভার বর্তাবে এবং তার আক্বেলার উপর দিয়াত আসবে। ক্বতল বিত তাসাব্বুবের ক্ষেত্রে কোনো কাফফারা নেই। ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

فأما ما ليس بعمد، ولا خطأ، ولا أجري مجرى الخطأ فهو حافر البئر وواضع الحجر في الطريق فليس بمباشر للقتل؛ لأن مباشرة القتل بإيصال فعل من القاتل بالمقتول ولم يوجد، وإنما اتصل فعله بالأرض فعرفنا أنه ليس بقاتل عمد، ولا شبه عمد، ولا خطأ، ولا ما أجري مجرى الخطأ بل هو بسبب متعد فنوجب الدية على عاقلته للحاجة إلى صيانة النفس المتلفة عن الهدر، ولا يجب عليه الكفارة، ولا يحرم الميراث.

"যে হত্যা ইচ্ছাকৃতও নয়, নিছক ভুলও নয় অথবা ভুলবশত হত্যার স্থলাভিষিক্তও নয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি রাস্তায় কূপ খনন করলো বা কোনো পাথর রেখে দিলো। ফলে কূপে পতিত হয়ে বা পাথরে আঘাত লেগে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে। এক্ষেত্রে সে সরাসরি হত্যাকারী নয়। কারণ, সরাসরি হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর কর্ম নিহত ব্যক্তির দেহ পর্যন্ত পৌঁছে। আর এখানে হত্যাকারীর কর্ম জমিনের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারীও নয় এবং ভুলবশত হত্যাকারী বা তার স্থলাভিষিক্তও নয়; বরং মাধ্যমের সংশ্লিষ্টতায় হত্যাকারী। সুতরাং নিহত ব্যক্তির জীবন যাতে বৃথা না যায় সেজন্য হত্যাকারীর আক্বেলার উপর দিয়াত ওয়জিব হবে। তবে হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না এবং সে নিহত ব্যক্তির মিরাছ থেকেও বঞ্চিত হবে না।"[১০৬২]

সড়ক দুর্ঘটনা সাধারণত **ক্বতল বিত তাসাব্বুব**-এর আওতায় পড়ে না। কারণ, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সড়ক দুর্ঘটনা সাধারণত সরাসরি সংশ্লিষ্টতার মাধ্যমে হয়ে থাকে। কারণ, বর্তমান যানবাহনগুলো সম্পূর্ণ চালক নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র। এক্ষেত্রে যানবাহনের যেকোনো আঘাত সরাসরি চালকের আঘাত গণ্য হবে।

হ্যাঁ, কখনো কখনো কোনো কোনো ড্রাইভার রাস্তার বিপজ্জনক মোড় বা একেবারে রাস্তার মাঝে ব্যস্ত সড়কে কোনো ধরনের সিগন্যল বা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছাড়াই গাড়ি থামিয়ে রাখে। এমতাবস্থায় যদি অন্য কোনো গাড়ি-চালক আইন-শৃঙ্খলা মেনে নির্দিষ্ট গতিতে গাড়ি চালিয়ে আসে এবং অন্ধকারে পূর্বোক্ত গাড়ির সাথে তার সংঘর্ষ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার দায় বহন করবে যে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে রেখেছে সে। কারণ, এখানে সেই দোষী। এক্ষেত্রে কারো প্রাণনাশ হলে তা **ক্বতল বিত তাসাব্বুব**-এর অর্ন্তভুক্ত হবে। ফুকাহায়ে কেরাম বিনা অজুহাতে বাহন দাঁড় করিয়ে রাখার কারণে সংঘটিত প্রাণনাশকে ক্বতল বিত তাসাব্বুব-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

وإذا أوقف دابته في طريق المسلمين، أو في دار لا يملكها بغير إذن أهلها فما أصابت بيد، أو رجل، أو ذنب، أو كدمت، أو سال من عرقها، أو لعابها على الطريق فزلق به إنسان فضمان ذلك على عاقلته؛ لأنه متعد في هذا التسبيب فإنه ممنوع من إيقاف الدابة في ملك غيره بغير إذنه، وكذلك في طريق المسلمين هو ممنوع من إيقاف الدابة خصوصا إذا كان يضر بالمار، ولكن لا كفارة عليه لانعدام مباشرة القتل منه.

[১০৬২] আল মাবসূত: ২৬/৬৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

"যদি কোনো ব্যক্তি সাধারণের চলাচলের রাস্তায় বা অন্যের বাড়িতে বাড়িওয়ালার অনুমতি ব্যতীত নিজের সওয়ারিকে থামিয়ে রাখে। আর ঐ সওয়ারি যদি সামনের বা পিছনের পা বা লেজ দ্বারা কোনো ক্ষতি করে অথবা কাউকে কামড় দেয় অথবা তার ঘাম বা লালা ঝড়ে রাস্তায় পড়ে আর তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে কেউ মারা যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এসব কিছুর ক্ষতিপূরণ তার আকেলার উপর ওয়াজিব হবে (যে সওয়ারিটিকে থামিয়ে রেখেছে)। কারণ, এখানে সে সীমালঙ্ঘন করে ক্ষতির মাধ্যম হয়েছে। কেননা অন্যের মালিকানাধীন ভূমিতে তার অনুমতি ব্যতীত অথবা সাধারণের চলাচলের রাস্তায় সওয়ারি থামানোর অধিকার তার নেই, বিশেষ করে যখন তা যাত্রীদের ক্ষতি করে। তবে এক্ষেত্রে সে সরাসরি হত্যা না করার কারণে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না।"[১০৬৩]

ইমাম সারাখসী রাহ. এ মাসআলার সাথে আরেকটি মাসআলার পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

ولكنا نقول في الفرق بينهما هو ممنوع من إيقاف الدابة على الطريق؛ لأن ذلك مضر بالمارة ولأن الطريق ما أعد لإيقاف الدواب فيه فيكون هو في شغل الطريق بما لم يعد الطريق له متعديا، والمتعدي في التسبب يكون ضامنا؛ فلهذا يسوى فيه بين ما يمكن التحرز عنه وبين ما لا يمكن وهذا لأنه إن كان لا يمكن التحرز عن النفحة بالرجل، والذنب، فهو يمكنه التحرز عن إيقاف الدابة بخلاف الأول فإن السير على الدابة في الطريق مباح له؛ لأن الطريق معد لذلك ولأنه لا يضر بغيره، وهو محتاج إلى ذلك فربما لا يقدر على المشي فيستعين بالسير على الدابة، وإذا لم يكن نفس السير جناية قلنا لا يلزمه ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه. (ألا ترى) أن الماشي في الطريق لا يكون ضامنا لما ليس في وسعه الامتناع منه بخلاف الجالس، والنائم في الطريق.

"তবে দু'টির মাঝে পার্থক্যের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে, রাস্তার মাঝে বাহন থামিয়ে রাখার অনুমতি নেই। কারণ, তাতে পথিকের ক্ষতি হয়। দ্বিতীয়ত রাস্তা তো বাহন থামিয়ে রাখার জন্য নয়। সুতরাং সে রাস্তায় বাহন থামিয়ে সীমালঙ্ঘন করেছে। আর সীমালঙ্ঘন করে কোনো ক্ষতির মাধ্যম হলে সীমালঙ্ঘনকারী উক্ত ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে। এজন্যই এক্ষেত্রে ক্ষতি তার নিয়ন্ত্রণে থাকুক বা না থাকুক সর্বক্ষেত্রে সেই দায়ী হবে। কারণ, পা বা লেজ দ্বারা আঘাত করা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব না হলেও রাস্তায় বাহন থামানো থেকে বেঁচে থাকা তো সম্ভব ছিলো।

এর বিপরীত প্রথম অবস্থা (বাহন চলন্ত অবস্থায় কোনো ক্ষতি করা)। কারণ, রাস্তায় যানবাহন চালানো চালকের জন্য মুবাহ। রাস্তা এজন্যই তৈরী করা হয়েছে। তার প্রয়োজনও এর সাথে সম্পৃক্ত। কেননা অনেক সময় সে পায়ে হাঁটতে সক্ষম হয় না। ফলে তাকে বাহনের সাহায্য নিতে হয়। আর রাস্তায় যানবাহন চালানোটা কোনো অপরাধ না। তাই এমন ক্ষতি যা এড়ানো সম্ভব নয় তার দায় চালকের উপর বর্তাবে না।

যেমন, পথিকের দ্বারা যদি এমন কোনো ক্ষতি হয়ে যায় যা এড়ানো তার সাধ্যাতীত, তাহলে এর দায়ভার তার উপর বর্তাবে না। (কারণ, রাস্তায় চলাচল করা একটি মুবাহ বিষয়)। এর

[১০৬৩] আল মাবসূত: ২৬/১৯০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

ব্যতিক্রম হলো, রাস্তায় বসা বা ঘুমন্ত ব্যক্তি (তাদের বসা বা ঘুমানো কোনো মুবাহ বিষয় নয়। তাই তা সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে)।"[১০৬৪]

সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত দুর্ঘটনা

সড়ক দুর্ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো। আমরা লক্ষ করেছি যে, এখানে কোনো না কোনোভাবে প্রাণনাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির প্রভাব ছিলো। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, সবকিছু ঠিক আছে, কোনো অবহেলা নেই, তার পরও গাড়ি বা যানবাহন হঠাৎ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন হবে।[১০৬৫] অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুর্ঘটনা ও ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করবে না।[১০৬৬]

ইমাম সারাখসী রাহ. মৌলিক নীতির আন্দাজে বলেছেন-

والدابة المنفلتة إذا وطئت إنسانا فدمه هدر.

"ছুটে যাওয়া জন্তু কাউকে পদপিষ্ট করলে তার রক্ত দায়হীন ধরা হবে।"[১০৬৭]

নিম্নোক্ত হাদীস থেকেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.

"জন্তুর ক্ষয়ক্ষতি দায়হীন। কূপ এবং খনির ক্ষেত্রেও এই বিধান। আর রিকাযে এক পঞ্চমাংশ দিতে হবে।"[১০৬৮]

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ বলেন-

وإن نفحته برجلها وهي تسير فلا ضمان على الراكب لقوله – عليه السلام – «الرجل جبار» أي هدر.

والمراد نفحة الدابة بالرجل وهي تسير وهذا لأنه ليس في وسعه التحرز من ذلك؛ لأن وجه الراكب أمام الدابة لا خلفها، وكذلك النفحة بالذنب ليس في وسعه التحرز عن ذلك.

"যদি বাহন চলন্ত অবস্থায় পেছনের পা দিয়ে আঘাত করে, তাহলে আরোহীর উপর কোনো দায় আসবে না। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন, পায়ের ক্ষতি দায়হীন।... কারণ, পেছনের পায়ে কাকে লাথি মারছে বা আঘাত করছে এটা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কেননা তার দৃষ্টি তো সামনের দিকে থাকে, পেছনে নয়। অনুরূপভাবে লেজের আঘাতেরও একই বিধান।"[১০৬৯]

[১০৬৪] আল মাবসূত: ২৬/১৮৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১০৬৫] এ ব্যাপারে আরো আলোচনা ও মূলনীতি সামনে 'দুর্ঘটনা ও ক্ষতির দায়ভার' শিরোনামের অধীনে আসছে।

[১০৬৬] কারণ, প্রবন্ধের শুরুতে আমরা জেনেছি যে, মুবাহ হকের চর্চা করতে গিয়ে যদি এমন কোনো ক্ষতি হয়, যা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আসবে না। (দেখুন: 'সড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শর'য়ী মূলনীতি' শীর্ষক আলোচনা)

সামনে আমরা জানবো যে, ক্ষতির সাথে মুবাশারাত বা প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হলে ক্ষতিপূরণ আরোপের জন্য কোনো সীমালঙ্ঘন থাকা জরুরী নয়; কিন্তু ক্ষতি বা দুর্ঘটনার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এখতিয়ারাধীন হওয়া জরুরী। (দেখুন: দুর্ঘটনা ও ক্ষতির দায়ভার সংক্রান্ত প্রথম মূলনীতি)

[১০৬৭] আল মাবসূত: ২৬/১৮৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১০৬৮] সহীহ বুখারী: ২/১০২১, হাদীস নং ৬৬৪৫, মাকতাবাতুল ফাতাহ

[১০৬৯] আল মাবসূত: ২৬/১৮৯, দারুলা কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

ولو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه، فما أصابت في فورها ذلك فلا ضمان عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((العجماء جبار)) ، أي البهيمة جرحها جبار، لأنه لا صنع له في نفارها أو انفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز عن فعلها، فالمتولد منه لا يكون مضمونا.

"যদি জন্তু পালিয়ে যায় বা ছুটে যায় এমতাবস্থায় যেসব ক্ষয়ক্ষতি হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সেসবের যামিন হবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, অবুঝ জন্তুর ক্ষয়ক্ষতি দায়হীন। সুতরাং সে দায়ী হবে না। কেননা পালিয়ে যাওয়া ছুটে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিটির কোনো হাত নেই।..."[১০৭০]

প্রাণহানি সংক্রান্ত আলোচনার পর নিম্নে আমরা অঙ্গহানি ও আঘাত নিয়ে আলোচনা করবো। মূলত ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। প্রবন্ধের কলেবর বেড়ে যাওয়ায় দীর্ঘ আলোচনা করা হলো না। মোটামুটি প্রয়োজনীয় ও মৌলিক দিকগুলো তুলে ধরা হলো। অঙ্গহানি, আঘাত ও অন্যান্য ক্ষতি ও তার ক্ষতিপূরণের বিধান প্রায় কাছাকাছি। পূর্বের আলোচনার সাথে মিলিয়ে নিলেই চলবে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে। ফিকহের কিতাবাদির সংশ্লিষ্ট অধ্যায় দেখার অনুরোধ রইল।

অঙ্গহানি বা অঙ্গচ্ছেদ

প্রাণহানি ব্যতীত অন্যান্য সব ধরনের আঘাত বা ক্ষতিকে শুধু দুই প্রকারে ভাগ করা হয়। ক. আমাদ, খ. খাতা। শিবহুল আমাদ বা অন্য প্রকারগুলো এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

অঙ্গহানির ক্ষেত্রে দু'ধরনের সাজা হতে পারে। যথা-

ক. কিসাস

অর্থাৎ, হুবহু সমজাতীয় ও সমপরিমাণ ক্ষতির মাধ্যমে বদলা গ্রহণ। অঙ্গহানির ক্ষেত্রে কিসাসের জন্য দু'টি মৌলিক শর্ত পাওয়া যাওয়া জরুরী-

১. অপরাধ 'আমাদ বা ইচ্ছাকৃত হতে হবে।

২. কিসাসের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সমতা বজায় রাখার সুযোগ থাকতে হবে।

খ. দিয়াত

উপরোক্ত দুই শর্ত পাওয়া না গেলে দিয়াত আদায় করতে হবে। পূর্বে প্রাণনাশের ক্ষেত্রে দিয়াতের যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছিলো, তা এখানেও প্রযোজ্য হবে। দিয়াত প্রসঙ্গে ফিকহে ইসলামীতে বিশদ আলোচনা রয়েছে। বিস্তারিত ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য।

দিয়াতের পরিমাণের ব্যাপারে মূলনীতি হলো, যেসব অঙ্গ শরীরে শুধু একটিই আছে, তার হানি ঘটালে পুরো দিয়াত আসবে।

রাসূল ﷺ এভাবেই ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হাযম রাহ. তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন-

أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم،

[১০৭০] বাদায়েউস সানায়ে: ৬/৩৩২-৩৩৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد» ، وكان في كتابه «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار.

"রাসূল ﷺ ইয়ামানবাসির কাছে ফারায়েয, সুনান এবং দিয়াতের বিধিবিধান পত্র আকারে লিখে পাঠালেন।... সেখানে লেখা ছিলো-

....'কেউ কোনো মুসলিমকে হত্যা করেছে প্রমাণিত হলে তার উপর কিসাস আসবে। এর থেকে বাঁচতে হলে তাকে নিহতের পরিবারকে সন্তুষ্ট করতে হবে। জানের দিয়াত হলো একশ উট। অনুরূপভাবে নাকের ক্ষত যদি বড়ো ও গভীর হয়, তাহলে তাতে দিয়াত আসবে। জিহ্বা, ওষ্ঠদ্বয়, উভয় অন্ডকোষ, পুরুষাঙ্গ, মেরুদন্ড এবং দুই চোখ নষ্ট করে ফেললে পূর্ণ দিয়াত আসবে। মা'মুমা'তে (মাথায় গভীর ক্ষত, যা মগজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়) এবং জাইফা'তে (পেট, বুক বা পিঠে এমন ক্ষত, যা গভীরে পৌঁছে যায়) দিয়াতের এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। মুনাক্কিলা'তে (যে আঘাত হাড্ডি ভেঙ্গে দেয় অথবা ফাটিয়ে দেয়, যদ্দরুণ ভেতরের রস বেরিয়ে আসে) পনের উট দিতে হবে। হাতের হোক বা পায়ের যেকোনো আঙ্গুলের জন্য দশ উট করে দিতে হবে। দাঁত এবং মুযিহাতে (হাড্ডি দেখা যায় এমন আঘাতে) পাঁচ উট। নারী হত্যার বদলায় পুরুষকে হত্যা করা হবে। আর পূর্ণ দিয়াতের ক্ষেত্রে দিনারওয়ালারা এক হাজার দিনার আদায় করবে।"[১০৭১]

যেসব অঙ্গ শরীরে জোড়া হিসেবে আছে, তার ক্ষেত্রে পুরো জোড়ার হানি ঘটলে পুরো দিয়াত আসবে আর জোড়ার যেকোনো একটির হানি ঘটলে অর্ধেক দিয়াত আসবে।

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. কিতাবুল আসার-এ বলেন-

عن إبراهيم، قال: كل شيء من الإنسان إذا لم يكن فيه إلا شيء واحد فأصيب خطأ ففيه الدية كاملة: الأنف، والذكر، واصلب, وذهاب العقل، وأشباهه، وما كان في الإنسان اثنين ففي كل واحد منها نصف الدية: الثديين وأشباه ذلك، قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.

"ইবরাহীম রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেসব অঙ্গ শরীরে শুধু একটিই আছে, ভুলক্রমে তার হানি ঘটালে পুরো দিয়াত আসবে। যেমন, নাক, লজ্জাস্থান ইত্যাদি। আর যেসব অঙ্গ একাধিক থাকে সেগুলোতে অর্ধেক দিয়াত আসবে। যেমন, দুই স্তন, দুই চোখ। ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন, এটাই আমাদের মত এবং ইমাম আবু হানিফা রাহ.ও এ কথা বলেছেন।"[১০৭২]

বিস্তারিত আলোচনার জন্য ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য।

[১০৭১] সুনানুন নাসাঈ: হাদীস নং ৪৮৫৩

[১০৭২] কিতাবুল আসার: ৫৫৬

আঘাত বা ক্ষত

অনেক সময় পুরো অঙ্গ ছেদ না হলেও শরীরের বিভিন্ন স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ফুকাহায়ে কেরাম আঘাতকে মৌলিকভাবে দু'প্রকারে ভাগ করেছেন-

১. মাথায় আঘাত

মাথার আঘাতকে ফুকাহায়ে কেরাম বহুবিধ প্রকারে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রকারের ক্ষেত্রে যেহেতু সমতা রক্ষা করে কিসাস গ্রহণ সম্ভব, তাই সেক্ষেত্রে কিসাস গ্রহণের অবকাশ রয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিসাস গ্রহণ সম্ভব হয় না। এসবের ক্ষেত্রে [১০৭৩]حكومة عدل আরোপিত হবে। যেমন, আল্লামা মারগীনানী রাহ. বলেন-

قال: "ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدا" لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالقصاص في الموضحة ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم فيتساويان فيتحقق القصاص. قال: "ولا قصاص في بقية

[১০৭৩] حكومة عدل -এর শাব্দিক অর্থ হলো, একজন ন্যায়পরায়ণ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির ফয়সালা। যেসব ক্ষতির ব্যাপারে শরী‘আতে কোনো ক্ষতিপূরণ নির্দিষ্ট নেই, সেক্ষেত্রে সাধারণত একজন ন্যায়পরায়ণ বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুমান ধর্তব্য হয়। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বের করার বিভিন্ন পদ্ধতির কথা ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন। যেমন, কাছাকাছি কোনো ক্ষতির পরিমাণ শরী‘আতে থাকলে, তার সাথে তুলনা করা, শারীরিক ক্ষতি হলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে গোলাম হিসেব করে ক্ষতির পূর্বাপর তার মূল্যের মাঝে কেমন বেশকম হচ্ছে তা দেখা।
ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন:

وإيجاب حكومة العدل في هذه الشجاج مروي عن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله قالا ما دون الموضحة من الشجاج بمنزلة الخدوش ففيها حكومة عدل.

وقد جاء في الحديث أن عليا – رضي الله عنه – قضى في السمحاق بأربع من الإبل، وإنما يحمل على أن ذلك كان مقدار حكومة عدل ثم اختلف المتأخرون من مشايخنا – رحمهم الله – في معرفة حكومة العدل فقال الطحاوي السبيل في ذلك أن يقوم لو كان مملوكا بدون هذا الأثر ويقوم مع هذا الأثر ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين كم هو؟ فإن كان بقدر نصف العشر يجب نصف عشر الدية، وإن كان بقدر ربع العشر يجب ربع عشر الدية، وكان الكرخي يقول: هذا غير صحيح فربما يكون نقصان القيمة بالشجاج التي قبل الموضحة أكثر من نصف العشر، فيؤدي هذا القول إلى أن يوجب في هذه الشجاج من الدية فوق ما أوجبه الشرع في الموضحة، وذلك لا يجوز، ولكن الصحيح أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من نصف عشر الدية؟ لأن وجوب نصف عشر الدية ثابت بالنص وما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه باعتبار المعنى فيه.

উপরোক্ত দুই মতের মাঝে তারজীহ দিতে গিয়ে আল্লামা তাহের ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুর রশীদ বুখারী রাহ. বলেন:

ونقل الحصكفي عن الخلاصة: إنما يستقيم قول الكرخي لو كانت الجناية في وجه ورأس فحينئذ يفتى به، ولو في غيرهما أو تعسر على المفتي يفتي بقول الطحاوي – وهو قول الجمهور – مطلقا لأنه أيسر.

(খুলাসাতুল ফাতাওয়া, রদ্দুল মুহতার ৫/৩৭৩, আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ ২/২১৯)
আল্লামা সদরুশ শহীদ রাহ. বলেন:

وقال الصدر الشهيد: ينظر المفتي في هذا، إن أمكنه الفتوى بالثاني – وهو قول الكرخي – بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني. وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول – وهو قول الجمهور – لأنه أيسر. وكان المرغيناني يفتي به.

(তাকমিলাতুল বাহর ৮/৩৮২, গুনয়াতু যাবিল আহকাম ফী বুগয়াতি দুরারিল হুককাম লিশ শুরুম্বুলালী ২/১০৬)
তবে উপরোক্ত মতভেদ শরীরের ঐ সব অঙ্গের আঘাতের ক্ষেত্রে, যার ব্যাপারে শর‘য়ী পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর যেসব অঙ্গের ক্ষেত্রে কোনো শর‘য়ী পরিমাণই বর্ণিত নেই, যেমন, বুক, হাঁটু ইত্যাদি, তার ক্ষেত্রে সকলেই একমত যে, শরীর বা অঙ্গের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

الشجاج" لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لا حد ينتهي السكين إليه، ولأن فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه، وهذا رواية عن أبي حنيفة. وقال محمد في الأصل وهو ظاهر الرواية: يجب القصاص فيما قبل الموضحة لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه، إذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف هلاك غالب فيسبر غورها بمسبار ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص.

قال: "وفيما دون الموضحة حكومة عدل" لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن إهداره فوجب اعتباره بحكم العدل، وهو مأثور عن النخعي وعمر بن عبد العزيز رحمه الله.

"মুযিহা'তে যদি ইচ্ছাকৃত হয়ে থাকে, তাহলে তাতে কিসাস আসবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মুযিহা'তে কিসাসের ফয়সালা করেছেন। কেননা এক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করে কিসাস গ্রহণ সম্ভব। অর্থাৎ, ছুরি দ্বারা কেটে হাড্ডি পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

তবে অন্যান্য আঘাতে কিসাস বাস্তবায়ন করা সম্ভব না। কেননা এসব ক্ষেত্রে কোনো ধরাবাঁধা সীমা না থাকায় -যেখান পর্যন্ত ছুরি চালিয়ে থামবে- পরিপূর্ণ সমতা বস্তবায়ন সম্ভব নয়।

মুযিহা'র চেয়ে কিছুটা মারাত্মক হলো হাড্ডি ভাঙ্গা। এতেও কিসাস নাই। ইমাম আবু হানিফা রাহ. থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ রাহ. কিতাবুল আসলে বলেন, (আর এটাই যাহিরুর রিওয়ায়াহ) কিসাস ওয়াজিব হবে মুযিহা'র আগ পর্যন্ত, যেহেতু এক্ষেত্রে সমতা পরিমাপ করা যায়। হাড় ভাঙ্গার প্রয়োজন নেই বিধায় অতিরিক্ত হয়ে যাবার ভয় নেই; বরং ক্ষতের গভীরতা মেপে ওই পরিমাণ কেটে ফেললে কিসাসের সমতা হয়ে যাবে।

আঘাত বা ক্ষত মুযিহা'র কম হলে দ্বীনদার ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ফয়সালাকে গ্রহণ করা হবে। কেননা এর জন্য নির্ধারিত কোনো জরিমানার বিধান নেই। আবার এটাকে উপেক্ষাও করা যায় না। অতএব ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ফয়সালাকে গ্রহণ করা হবে। ইবরাহীম নাখয়ী এবং উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. থেকে এই মত বর্ণিত আছে।"[১০৭৪]

২. মাথা ব্যতীত শরীরের অন্যস্থানে আঘাত

হানাফী ফকীহগণের মতে চেহারা এবং মাথার আঘাত ব্যতীত অন্যান্য আঘাতের ক্ষেত্রে কিসাস আসবে না। কারণ, তাতে কিসাসের শর্ত পাওয়া যাওয়া দুষ্কর; বরং এতে حكومة عدل আরোপিত হবে। পূর্বে আল্লামা মারগীনানী রাহ. এর ভাষ্যে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

উপরে আমরা প্রাণহানি, অঙ্গহানি এবং আঘাত বা ক্ষত নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। এছাড়াও ফুকাহায়ে কেরাম শরীরের কোনো শক্তি বা ইন্দ্রিয় বিকল করা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। আলোচনার সংক্ষিপ্ততার জন্য এখানে সে প্রসঙ্গ আনা হলো না।

আর্থিক ক্ষতি

আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রে শরী'আতের মৌলিক বিধান হলো, উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। এক্ষেত্রে ক্ষতির উপযুক্ত প্রতিবিধানই মূল বিষয়। হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত,

أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة

[১০৭৪] আল হিদায়া: ৪/৫৯০, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কোনো এক স্ত্রী বর্তনে করে তাঁর জন্য কিছু খাবার হাদিয়া পাঠালেন। আয়েশা রাযি. বর্তনে আঘাত করে তা ভেঙে ফেললেন এবং খাবার ফেলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফয়সালা করলেন- বর্তনের বিনিময়ে বর্তন, খাবারের বিনিময়ে খাবার।"[১০৭৫]

আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রে এটাই শরী'আতের বিধান। এক্ষেত্রে শারীরিক ক্ষতির মতো নির্দিষ্ট কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। শামসুল আইম্মা আল্লামা সারাখসী রাহ. বলেন-

وضمان الجناية إنما يفارق ضمان المتلفات في كونه مقدرا شرعا، وأدنى ذلك أرش الموضحة فما دون ذلك بمنزلة ضمان المتلفات.

"(শারীরিক ক্ষতির সাথে সম্পৃক্ত) অপরাধের জরিমানা ও কোনো কিছু (বস্তু, অর্থ-সম্পদ) নষ্ট করার জরিমানার মাঝে পার্থক্য হলো একটি শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত অন্যটি নয়। (শারীরিক ক্ষতির সাথে সম্পৃক্ত) অপরাধের জরিমানার সর্বনিম্ন পর্যায় হলো মুযিহা'র ক্ষতিপূরণ। এর কম যা হবে তা সাধারণ ক্ষয়ক্ষতির জরিমানা (যা নির্দিষ্ট নয়) বলে গণ্য হবে।"[১০৭৬]

দুর্ঘটনা ও ক্ষতির দায়ভার সংক্রান্ত শর'য়ী মূলনীতি ও তার প্রয়োগ

ব্যস্ত সড়কে একটি দুর্ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে বিভিন্নজনের সংশ্লিষ্টতা থাকে। এক্ষেত্রে অনেকসময় দায়ভার কার হবে এ বিষয়টিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। ফুকাহায়ে কেরাম (আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জাযায়ে খায়ের দান করেন) কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবা-তাবেঈনের ফাতওয়া ও ফয়সালাসমূহের আলোকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করেছেন।

আমরা এখানে দুর্ঘটনা সংঘটনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতার বিভিন্ন ধরন আলোচনা করে এ সংক্রান্ত শর'য়ী মূলনীতি উল্লেখ করবো। এরপর তার আলোকে বর্তমানে সড়ক দুর্ঘটনার বিভিন্ন রূপ ও ধরন উল্লেখ করে তার শর'য়ী হুকুম বর্ণনা করবো।

দুর্ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতার বিভিন্ন দিক ও তার ব্যাখ্যা

দুর্ঘটনা সংঘটনের ক্ষেত্রে কারো সংশ্লিষ্টতা মৌলিকভাবে দু'ধরনের হতে পারে। যথা-

১. প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সংশ্লিষ্টতা, যাকে আরবীতে المباشرة বলা হয়।

২. নিছক দুর্ঘটনার কারণ, মাধ্যম বা উপায় হিসেবে সংশ্লিষ্টতা। আরবীতে বলা হয়, التسبب।

এখানে মুবাশারাত বা প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার অর্থ ভালোভাবে বোঝা জরুরী। কারণ, তার উপর অনেকক্ষেত্রে শর'য়ী বিধান নির্ভর করে। ফকীহগণ প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার দু'টি উপাদান বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন-

(ক) ক্ষতি বা দুর্ঘটনা সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তির কাজ বা তার এখতিয়ারাধীন মাধ্যম দ্বারাই সংঘটিত হওয়া।

(খ) এবং এর মাঝে অন্য কোনো ব্যক্তি বা কার্যকারণের শক্তিশালী প্রভাব বা দখল না থাকা।

আল্লামা আব্দুর রশীদ ওয়ালওয়ালজি রাহ. (৪৬৭-৫৪০ হি.) বলেন-

[১০৭৫] সহীহ বুখারী: ৫২২৫, সুনানুত তিরমিযী: ১৩৫৯

[১০৭৬] আল মাবসূত: ২৬/৮৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

حد المباشر أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار.

"মুবাশির হবে যদি ক্ষতিটা সরাসরি তার কাজের দ্বারা সংঘটিত হয় এবং মাঝখানে তৃতীয় কোনো ঐচ্ছিক কাজের উপস্থিতি না থাকে।"[১০৭৭]

যদি বাহ্যত সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা মুবাশির ও ক্ষতির মাঝে তৃতীয় কোনো প্রভাবক বা কারণ সক্রিয় থাকে, তাহলে ক্ষতির দায়ভার ঐ তৃতীয় প্রভাবকের উপরই বর্তাবে। জিনায়াতের অধ্যায়ে ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত কিছু মাসাইল থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়।[১০৭৮] যেমন, আরোহী ছাড়া অন্য কেউ সওয়ারিকে উত্তেজিত করলে তার দায় আরোহীর উপর বর্তাবে না। আল্লামা আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

(ومن سار على دابة في الطريق، فضربها رجل أو نخسها، فنفحت رجلا، أو ضربته بيدها، أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب) وهو المروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما[١٠٧٩]، ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس، فأضيف فعل الدابة إليه، كأنه فعله بيده، ولأن الناخس متعد في تسبيبه، والراكب في فعله غير متعد، فيترجح جانبه في التغريم للتعدي حتى لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب والناخس نصفين لأنه متعد في الإيقاف أيضا (وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا) لأنه بمنزلة الجاني على نفسه ... (ولو وثبت بنخسة على رجل أو وطئته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب) لما بيناه.

"একজন স্বীয় বাহনে চড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় কেউ তার বাহনকে আঘাত করলো বা খোঁচা দিলো যদ্দরুণ সেটি সামনের বা পেছনের পায়ে কাউকে আঘাত করলো অথবা ছুট দিলো এবং এর ফলে কেউ নিহত হলো। এসবের দায়ভার ওই খোঁচাদানকারীর উপর বর্তাবে, আরোহীর উপর নয়। এরূপ বিধান হযরত উমর ও ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত। কেননা বাহন ও আরোহী উভয়ে খোঁচাদানকরীর কারণে ধাবিত হয়েছে। ফলে বাহনজন্তুর সব কাজ

[১০৭৭] আল ফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ, শারহুল আশবাহ লিল হামাভী: ১/৪০৪, ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান

[১০৭৮] আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন (বাদায়েউস সানায়ে ৭/২৭৩):

ولو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه، فما أصابت في فورها ذلك فلا ضمان عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((العجماء جبار))، أي البهيمة جرحها جبار، لأنه لا صنع له في نفارها أو انفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز عن فعلها، فالمتولد منه لا يكون مضمونا.

আল্লামা খালেদ আতাসী রাহ. বলেন (শারহুল মাজাল্লা ১/২৬০, ধারা নং ৯৪):

"إن الدابة إذا وطئت بيدها أو رجلها، وهو راكبها يضمن ولو في ملكه؛ لأن هذا مباشرة يضاف التلف إلى تسييره وعدم ضبطه، إلا إذا جمحت بحيث ليس في إمكانه ردها".

[১০৭৯] আল্লামা যাইলাঈ রাহ. বলেন (নাসবুর রায়াহ):

قوله : روي عن عمر وابن مسعود في رجل نخس دابة عليها راكب فصدمت آخر فقتلته أنه على الناخس لا على الراكب قلت: غريب وروى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أقبل رجل بجارية من القادسية فمر على رجل واقف على دابة فنخس رجل الدابة فرفعت رجلها فلم يخط عين الجارية فرفع إلى سلمان بن أبي ربيعة الباهلي فضمن الراكب فبلغ ذلك ابن مسعود فقال : على الرجل إنما يضمن الناخس انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع ثنا المسعودي به وأخرج نحوه عن شريح والشعبي.

তার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। এছাড়াও খোঁচাদানকারী দুর্ঘটনার মাধ্যম বা কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারী। আর আরোহী তার আরোহণে (ড্রাইভিংয়ে) সীমালঙ্ঘনকারী নয়। ফলে জরিমানার ক্ষেত্রে খোঁচাদানকারীর দায়টা প্রাধান্য পাবে। এজন্যই যদি আরোহী তার বাহনকে রাস্তার উপর দাঁড় করিয়ে রাখে, তাহলে জরিমানা উভয়ের উপর অর্ধেক অর্ধেক হবে। কেননা রাস্তার উপর বাহন দাঁড় করানোর কারণে সেও সীমালঙ্ঘনকারী। তবে যদি খোঁচাদানকারী নিজেই পদাঘাতের শিকার হয়, তাহলে কোনো জরিমানা আসবে না। যেন সে নিজেই নিজেকে আঘাত করেছে। ... যদি লাফিয়ে উঠে এবং তাকে পদদলিত করে মেরেই ফেলে, তাহলেও তা খোঁচাদানকারীর উপরই বর্তাবে।"[১০৮০]

এসব ফিকহী ভাষ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বাহ্যিকভাবে মুবাশির বা দুর্ঘটনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাঝে যদি অন্য কারো ইচ্ছাধীন কাজ বা প্রাকৃতিক কোনো কারণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে দুর্ঘটনার জন্য বাহ্যিক মুবাশির দায়ী হবে না। কারণ, এ অবস্থায় বাস্তবে সে মুবাশির বা সরাসরি সম্পৃক্ত হিসেবে বাকি থাকেনি।

প্রকাশ থাকে যে, মুবাশির একাধিক ব্যক্তি হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'পক্ষের উভয় জনই মুবাশির হতে পারে।

সংশ্লিষ্টতার বিভিন্ন রূপের হুকুম প্রসঙ্গে শর'য়ী মূলনীতি

আমরা 'সরাসরি সম্পৃক্ততা' (المباشرة) ও নিছক সংশ্লিষ্টতার (التسبب) মাঝে পার্থক্য সম্পর্কে অবগত হলাম। এখন এ পার্থক্যের কারণে শর'য়ী হুকুমে কী প্রভাব পড়ে তা জানবো। প্রথমেই এ প্রসঙ্গে ফুকাহায়ে কেরাম যেসব মূলনীতি উল্লেখ করেছেন তা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

১নং মূলনীতি: মুবাশির সীমালঙ্ঘন না করলেও ক্ষতির দায় বহন করবে

মুবাশির বা সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একাই বিদ্যমান থাকলে সেই দুর্ঘটনার দায়ভার বহন করবে। তার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘনের কারণে বা যথাযথ সর্তকতা না থাকার কারণে। ফকীহগণ এ মূলনীতিটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন-

المباشر ضامن، وإن لم يكن متعديا.[১০৮১]

অর্থাৎ, মুবাশির (তার এখতিয়ারাধীন থাকাবস্থায়)[১০৮২] সীমালঙ্ঘন না করলেও ক্ষতির দায় বহন করবে।

আল্লামা ফখরুদ্দীন যাঈলাঈ রাহ. বলেন-

وغيره تسبيب، وفيه يشترط التعدي، فصار كحفر البئر في ملكه وفي المباشرة لا يشترط.

"তাসবীব বা মাধ্যম হওয়ার ক্ষেত্রে তা'আদ্দী তথা সীমালঙ্ঘন শর্ত। ..... কিন্তু মুবাশারাত বা সরাসরি সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে এটা শর্ত নয়।"[১০৮৩]

[১০৮০] আল হিদায়া: ৪/৬১৫-৬১৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[১০৮১] মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, ৯ নং সংখ্যা, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসিরা: ১/২৯৬। আরো দেখুন: আল মাদখালুল ফিকহিয়্যুল আম, কাওয়ায়েদ-এর অধ্যায়

[১০৮২] ফিকহের কিতাবে এ কায়েদা বা মূলনীতিটি সাধারণত ব্যাপকভবেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ের অন্যান্য দলীল ও নযীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এখানে এখতিয়ারাধীন হওয়ার শর্ত উহ্য আছে।

[১০৮৩] তাবয়ীনুল হাকায়িক: ৭/৩১১, এইচ. এম. সাঈদ

আল্লামা ইবনু গানেম বাগদাদী রাহ. বলেন-

المباشر ضامن، وإن لم يتعمد، ولم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدي.[১০৮৪]

এখানে 'সীমালঙ্ঘন' বলতে যেকোনো ধরনের জুলুম বা শর'য়ী ভাবে নিষিদ্ধকাজ বোঝানো হয়েছে।[১০৮৫]

উল্লেখ্য, মুবাশিরের সাথে মুসাব্বিবও বিদ্যমান থাকলে তার হুকুম তৃতীয় মূলনীতিতে আসছে।

২নং মূলনীতি: মুতাসাব্বিব ক্ষতির দায় বহন করবে সীমালঙ্ঘন করলে

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন-

المسبب ضامن إن كان متعديا.

"মুসাব্বিব যামিন হবে যদি সে সীমালঙ্ঘনকারী হয়।"[১০৮৬]

আল্লামা ইবনু গানেম বাগদাদী রাহ. মূলনীতিটি এভাবে উল্লেখ করেছেন-

المتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى.

"মুসাব্বিব তাআদ্দি বা সীমলঙ্ঘন ছাড়া যামিন হবে না।"[১০৮৭]

উল্লেখ্য, যদি মুতাসাব্বিবের (বাহ্যিকভাবে) কাজের সম্পৃক্ততা বা প্রভাব মুবাশিরের মতো বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সে মুবাশিরের হুকুমেই হবে। যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে তাকে মুতাসাব্বিব মনে হয়। এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা তৃতীয় মূলনীতির অধীনে আসছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম যে, মুতাসাব্বিব বা নিছক উপায় বা মাধ্যম হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একাই থাকলে সে নিম্নোক্ত দুই অবস্থার দায়ভার গ্রহণ করবে-

ক. যদি সে তা'আদ্দি বা সীমালঙ্ঘন করে থাকে।

খ. যদি ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে তার কাজের প্রভাব সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মতো বা তার চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। অন্যথায় সে দায়ী হবে না।

৩নং মূলনীতি: মুবাশির ও মুতাসাব্বিব উভয়ে বিদ্যমান থাকলে, সাধারণ অবস্থায় মুবাশির দায়ী হবে

কোনো ক্ষেত্রে মুবাশির ও মুতাসাব্বিব উভয়ে বিদ্যমান থাকলে, সে অবস্থায় মুবাশির ক্ষতির দায় বহন করবে। এ মূলনীতিটি আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. এভাবে উল্লেখ করেছেন-

إذا اجتمع المباشر والمسبب، أضيف الحكم إلى المباشر.

"কোনো ঘটনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পাওয়া গেলে দায় বর্তাবে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর।"[১০৮৮]

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

[১০৮৪] মাজমাউয যামানাত: ১৬৫, (অধ্যায়: ১২, পরিচ্ছেদ: ১)

[১০৮৫] আল ফি'লুয যার ওয়ায যামানু ফীহি: ৭৮-৭৯

[১০৮৬] মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, ৯ নং সংখ্যা, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসিয়া ১/২৯৬। আরো দেখুন: আল মাদখালুল ফিকহিয়্যুল আম, কাওয়ায়েদ-এর অধ্যায়

[১০৮৭] মাজমাউয যামানাত: ১৬৫

[১০৮৮] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/৪০৪, ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান

فلا ضمان على حافر البئر تعديا بما أتلف بإلقاء غيره.

"অতএব কেউ কাউকে কূপে ফেলে মেরে ফেললে এর জন্য নিজ জমিতে কূপ খননকারী দায়ী হবে না।"[১০৮৯]

এখানে কূপ খননকারী মুতাসাব্বিব আর নিক্ষেপকারী মুবাশির। অতএব মূলনীতি অনুসারে মুবাশিরের উপরই ক্ষতির দায় আসবে।

তবে দু'টি ক্ষেত্র উপরোক্ত মূলনীতির ব্যতিক্রম। যথা-

ক. ক্ষতিসাধনে মুতাসাব্বিবের প্রভাব মুবাশিরের চেয়ে বেশি হলে সেই দায়ভার গ্রহণ করবে। যেমনটি দ্বিতীয় মূলনীতির আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। ৩ নং মূলনীতির হুকুম বহির্ভুত বা ব্যতিক্রম মাসআলাসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে ফকীহগণ যেসব মাসাইল ও উদাহরণ পেশ করেছেন, তা থেকে বিষয়টি অনুমেয়। আল্লামা আলী হায়দার রাহ.[১০৯০] বলেন-

"أما إذا كان السبب مما يفضي مباشرة إلى التلف، فيترتب الحكم على المتسبب، مثال ذلك لو تماسك شخصان، فأمسك أحدهما بلباس الآخر، فسقط منه شيء، كساعة مثلا، فكسرت، فيترتب الضمان على الشخص الذي أمسك بلباس الرجل رغما من كونه متسببا، والرجل الذي سقطت منه الساعة مباشر. لأن المسبب هنا قد أفضى إلى التلف مباشرة، دون أن يتوسط بينهما فعل فاعل آخر."

"আর যদি সবব এমন হয় যা ক্ষতির সরাসরি কারণ হয়, তাহলে মুতাসাব্বিব দায় বহন করবে। এর উদাহরণ হলো, দুই ব্যক্তি একে অপরের কাপড় নিয়ে টানাটানি করছে। একপর্যায়ে একজন অপরজনের কাপড় ধরে এমন টান দিলো যাতে- (উদাহরণস্বরূপ) তার ঘড়ি পড়ে ভেঙে গেলো। এর জরিমানা যে ব্যক্তি কাপড় টান দিয়েছে তার উপরই আসবে। যদিও সে মুতাসাব্বিব বা পরোক্ষভাবে জড়িত, আর প্রত্যক্ষ জড়িত হলো যার থেকে ঘড়ি পড়েছে সে। কেননা মুসাব্বিব এখানে পরিণতিতে সরাসরি ক্ষতির কারণ হয়েছে এবং সে ছাড়া অন্য কোনো কিছুর সংশ্লিষ্টতাও পাওয়া যায়নি।"[১০৯১]

আরেকটি ফিকহী মাসআলা থেকে বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হয়। তা হলো, কেউ কোনো ব্যক্তিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে বাধ্য করলো আরেকজনকে হত্যা করার জন্য। এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকর হবে বাধ্যকারীর উপর।

শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. বলেন-

وإذا بعث الخليفة عاملا على كورة، فقال لرجل لتقتلن هذا الرجل عمدا بالسيف، أو لأقتلنك، فقتله المأمور، فالقود على الآمر المكره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

[১০৮৯] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/৪০৪, ইদারাতুল কুরআন, পাকিস্তান

[১০৯০] আলী হায়দার পাশা ইবনে জাবের ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে গালিব ইবনে মুসাইদ আলহাসানী। ১৮৬৬ ঈসায়ীর ডিসেম্বরে বর্তমানে কাযাখাস্তানের রাজধানী আস্তানা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ মে ১৯৩৫ মোতাবেক ১৩৫৩ হিজরীতে লেবাননের বৈরুতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মক্কায় গভর্নর ছিলেন। তিনি উসমানী শাসনামলে আওকাফের মন্ত্রী ছিলেন। 'মাজাল্লাতু আহকামিল আদলিয়া'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাঁর অমর রচনা। (আল আ'লাম লিযযিরিকলী: ৪/২৮৪)

[১০৯১] দুরারুল হুককাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম: ১/৮১

"যদি খলীফা কোনো কর্মচারীকে কোনো এলাকায় এই নির্দেশ দিয়ে পাঠায় যে, তুমি অমুক ব্যক্তিকে তরাবারি দ্বারা স্বেচ্ছায় হত্যা করবে, আর না হয় তোমাকে আমি হত্যা করবো। অতঃপর আদিষ্ট ব্যক্তি ওই লোককে হত্যা করলো। ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রাহ.-এর মতে বাধ্যকারী আদেশ দানকারীর উপর কিসাস আসবে।"[১০৯২]

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

فأما المكرَه على القتل فإن كان الإكراه تاما، فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن يعزر، ويجب على المكرِه.

যদি কাউকে চূড়ান্তভাবে বাধ্য করা হয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ রাহ.-এর মতে যাকে বাধ্য করা হয়েছে তার উপর কেসাস আসবে না। তবে তাকে তা'জির করা হবে। আর কিসাস আসবে বাধ্যকারীর উপর।"[১০৯৩]

কারণ, এখানে হত্যার পেছনে হত্যাকারীর চেয়ে বাধ্যকারীর সংশ্লিষ্টতা বেশি এবং তার অপরাধ বেশি শক্তিশালী।

খ. যদি মুসাব্বিব সীমালঙ্ঘনকারী হয় আর মুবাশির সীমালঙ্ঘন না করে, সেক্ষেত্রেও মুবাশির উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও দায়ভার গ্রহণ করবে মুসাব্বিব। হেদায়ার এক মাসআলায় এর স্পষ্ট নমুনা পাওয়া যায়। ইমাম মারগীনানী রাহ. বলেন-

ولأن الناخس متعد في تسبيبه، والراكب في فعله غير متعد، فيترجح جانبه في التغريم للتعدي.

"কেউ বাহন জন্তুকে উত্তেজিত করতে খোঁচা দিল অতঃপর তা আরোহীসহ ছুটে গিয়ে কাউকে আঘাত করলো। এ অবস্থায় উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দায়ী হবে।"[১০৯৪]

এখানে যদিও আরোহী মুবাশির কিন্তু উত্তেজিতকারীই মুসাব্বিবের সীমালঙ্ঘন পাওয়া যাওয়াতে সে ই দায়ী হবে।

হ্যাঁ, মুবাশির মুসাব্বিব উভয়ের তা'আদ্দি পাওয়া গেলে হুকুম মুবাশিরের উপরই হবে। বিষয়টি খোলাসা করার জন্য আরেকটি মাসআলা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা আল্লামা ইবনু গানেম বাগদাদী রাহ. (১০৩০ হি.) 'মাজমাউয যামানাত'-এ লিখেছেন। তিনি বলেন-

"قصار أوقف دابة في الطريق، وعليها ثياب، فصدمها راكب ومزق بعض الثياب التي كانت على الدابة، قال الشيخ أبو بكر البلخي: إن رأى الراكب الدابة الواقفة ضمن، وإن لم يبصر لم يضمن. ولو مر رجل على ثوب موضوع في الطريق وهو لا يبصره فتخرق، لا يضمن"

"ধুপি রাস্তার মাঝখানে কাপড় বোঝাই সওয়ারি দাঁড় করিয়ে রাখলো। অতঃপর সেটাতে অন্য এক আরোহীর আঘাত লাগলো এবং কাপড় ছিঁড়ে গেলো। শাইখ আবু বকর বলখী রাহ. বলেন, যদি আরোহী দাঁড়িয়ে থাকা সওয়ারি দেখেও আঘাত করে, তাহলে সে যামিন হবে। আর যদি সে লক্ষ না করে থাকে, তাহলে যামিন হবে না।"[১০৯৫]

[১০৯২] আল মাবসূত: ২৪/৭২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১০৯৩] বাদায়েউস সানায়ে: ৬/১৯০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১০৯৪] আল হিদায়া: ৪/৬১৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[১০৯৫] দুরারুল হুককাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম: ১/৮১

উপরোক্ত সূরতে মবাশির ও মুতাসাব্বিব উভয়ই রয়েছে এবং মুতাসাব্বিবের তা'আদ্দি পাওয়া গেছে। কারণ, সে রাস্তার মাঝখানে সওয়ারি দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তবুও প্রথম সূরতে মুবাশিরের তা'আদ্দি থাকায় মুবাশির দায়ী হবে। দ্বিতীয় সূরতে মুবাশিরের তা'আদ্দি না থাকায় মুতাসাব্বিব দায়ী হবে- যেন সে নিজের কাপড় নিজেই ছিঁড়ে ফেললো।

উপরের মূলনীতিগুলো থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়াবলী পাই:

১. মুবাশির ও মুতাসাব্বিব নির্ণয়ে শুধু বাহ্যিক সংশ্লিষ্টতা দেখলেই হবে না; বরং অন্তর্নিহিত ভূমিকা ও প্রভাব দেখতে হবে।

২. মুবাশির সর্বাবস্থায় দায়ী হবে। চাই সে কোনো অন্যায় বা সীমালঙ্ঘন করুক বা না করুক। পক্ষান্তরে মুতাসাব্বিব দায়ী হবে কোনো অন্যায়মূলক কাজ করে থাকলে।

৩. মুবাশির ও মুতাসাব্বিব উভয়ে বিদ্যমান থাকলে মুবাশির দায়ী হবে; তবে নিম্নোক্ত দুই অবস্থা ছাড়া:

(ক) মুবাশির কোনো অন্যায়মূলক কাজ করেনি; মুতাসাব্বিব করেছে।

(খ) ঘটনা সংঘটনে মুতাসাব্বিবের ভূমিকা মুবাশিরের তুলনায় আরো শক্তিশালী হলে।

সড়ক দুর্ঘটনায় ড্রাইভারের দায়িত্বের সীমারেখা

সাধারণ অবস্থায় গাড়ির চালক বা ড্রাইভার মুবাশির ধর্তব্য হবে এবং দুর্ঘটনার দায়ভার তার উপর বর্তাবে। কেননা গাড়িটি তার হাতে কেবল একটি যন্ত্র। সে যেভাবে চালায় সেভাবে চলে। ফুকাহায়ে কেরাম সওয়ারি পশু নিয়ে আলোচনা করেছেন। কারণ, তাদের যুগে ইঞ্জিন চালিত যানবাহন ছিলো না। সওয়ারি পশুর মাঝে ইখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও দায়ভার বর্তানো হয়েছে আরোহীর উপর। সে হিসেবে গাড়ির দায়ভার চালকের উপর হওয়াটা আরো পরিষ্কার। কেননা গাড়ি পুরোপুরি ড্রাইভারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। গাড়ি নিজে নিজে ছুটতে পারে না। এর প্রত্যেকটি অংশ ড্রাইভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অতএব গাড়ি দ্বারা যে ক্ষতিই হোক, সামনের চাকায় হোক বা পেছনের, সম্মুখ অংশ বা পশ্চাত অংশ দ্বারা বা ডান বাম যে কোনো পার্শ দ্বারা, ক্ষতির দায় ড্রাইভারের হবে। এক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত বিধান প্রযোজ্য হবে।

এজন্য উল্লিখিত মূলনীতি মোতাবেক ড্রাইভার সংশ্লিষ্ট ক্ষতির যামিন হবে। যদিও তার পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত সীমালঙ্ঘন না থাকে।

তবে যদি সে সীমালঙ্ঘন বা অন্যায় না করে, তাহলে নিম্নোক্ত দুই ক্ষেত্রে দায়ী হবে না-

১. যদি দুর্ঘটনা এমন কোনো কারণে ঘটে থাকে, যাতে তার কোনো দখল ছিলো না বা তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিলো না। কারণ, এক্ষেত্রে তার সংশ্লিষ্টতা (المباشرة) না থাকার মতোই।

২. যদি দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা বিষয় দুর্ঘটনার শক্তিশালী কারণ হয়ে থাকে।

উপরে আমরা উল্লেখ করেছি যে, মুবাশির হিসেবে ড্রাইভারই সাধারণ অবস্থায় সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতির দায়ভার বহন করবে। তবে ক্ষতিতে তার সংশ্লিষ্টতা উল্লিখিত সকল কায়দার আলোকে নিশ্চিত, পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী হতে হবে। অন্যথায় দায় ড্রাইভারের উপর বর্তাবে না। এছাড়াও মাঝে অন্য কারো দখল থাকলে সে অবস্থার হুকুম ভিন্ন হবে, যেমনটি আমরা পূর্বে জেনেছি। সুতরাং নিম্নোক্ত সূরতসমূহে ড্রাইভার দায়ী হবে না:

১. ড্রাইভার রাস্তার যাবতীয় নিয়ম কানুন রক্ষা করে গাড়ি চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় কোনো এক ব্যক্তি হঠাৎ করে অপর এক ব্যক্তিকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির নিচে ফেলে দিলো। ড্রাইভারের কোনো সুযোগ ছিলো না যে, সে গাড়ি থামাবে। এক্ষেত্রে ড্রাইভার দায়ী হবে না।

২. ট্রাফিক সিগনালে অথবা অনুমোদিত কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িকে যদি পেছন থেকে কোনো গাড়ি ধাক্কা দেয় এবং এর কারণে প্রথম গাড়ি যদি কাউকে হতাহত করে, এমতাবস্থায় প্রথম গাড়ির চালক দায়ী হবে না। যদিও সে প্রত্যক্ষ জড়িত। কারণ, এখানে দুর্ঘটনা সংঘটনে পেছনের গাড়ির প্রভাব বেশি। মূলত তার মাধ্যমেই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

৩. গাড়ি নিয়ে বের হবার আগে গাড়িতে কোনো ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি ছিলো না। স্বাভাবিক নিয়মে ড্রাইভার সেটার যত্ন নিয়েছে এবং দেখেশুনে বের করেছে। কিন্তু চলন্ত অবস্থায় এমন কোন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলো যে, গাড়ি ড্রাইভারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো। এ অবস্থায়ও ড্রাইভার দায়ী হবে না।

৪. একজন ব্যক্তি রাস্তাপারাপার দাগ (জেব্রা ক্রসিং), গতিমাত্রা সহ রোডের সকল নিয়ম কানুন মেনে গাড়ি চালাচ্ছে। এমতাবস্থায় হঠাৎ এক ব্যক্তি নিজেকে গাড়ির সামনে ঠেলে দিলো। এক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য বক্তব্য অনুযায়ী ড্রাইভার দায়ী হবে না।

আমরা জানি, সড়ক দুর্ঘটনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই মুবাশির হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উভয়ই ক্ষতির জন্য দায়ী হবে। যেমন, দু'টি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে এবং উভয় চালকেরই ত্রুটি প্রকাশ পেলে এক্ষেত্রে উভয়ই পূর্ববর্ণিত মূলনীতিসমূহের আলোকে ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করবে। ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বলেন-

وإذا اصطدم الفارسان فوقعا جميعا فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه عندنا استحسانا وفي القياس على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وهو قول زفر والشافعي وجه القياس: أن كل واحد منهما إنما مات بفعله وفعل صاحبه؛ لأن الاصطدام فعل منهما جميعا فإنما وقع كل واحد منهما بقوته وقوة صاحبه فيكون هذا بمنزلة ما لو جرح نفسه وجرحه غيره، ولكنا استحسناه لما روي عن علي – رضي الله عنه – أنه جعل دية كل واحد من المصطدمين على عاقلة صاحبه، والمعنى فيه أن كل واحد منهما موقع لصاحبه فكأنه أوقعه عن الدابة بيده وهذا لأن دفع صاحبه إياه علة معتبرة لإتلافه في الحكم فأما قوة المصطدم فلا تصلح أن تكون علة معارضة لدفع الصادم، فهو بمنزلة من وقع في بئر حفرها رجل في الطريق يجب الضمان على الحافر، وإن كان لولا مشيه وثقله في نفسه لما هوى في البئر.

"দুই আরোহী মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হলে ইস্তিহসানের আলোকে উভয়ের আকেলার উপর দিয়াত আসবে।....."[১০৯৬]

সড়ক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' জিদ্দাহ-এর সিদ্ধান্তের একটি অংশ প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছিলো। এখানে বাকি অংশ উল্লেখ করা হলো-

الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة السلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار سواء في البدن أو المال إذا

[১০৯৬] আল মাবসূত: ২৬/১৯০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة.

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

٣- ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.

٤- إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل أحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

٥- أ - مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعديا أو مفرطا.

ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر غير متعد.

ج- إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء.

"রাস্তায় যাববাহন চলাচলকালে ঘটিত দূর্ঘটনার ক্ষেত্রে হতাহত ও অপরাধ মামলায় শরী'আতের নির্ধারিত নীতিমালার আলোকেই ফয়সালা করা হবে। অধিকাংশ সড়ক দূর্ঘটনা ভুলবশতইঃ হয়ে থাকে। এক্সিডেন্টের কারণে জান-মালের যে ক্ষতি হবে মূলত চালকই তার দায় বহন করবে। তবে নিম্নোক্ত অবস্থায় সে অভিযুক্ত হবে না-

১. যদি দুর্ঘটনা কোনো প্রবল শক্তি বা নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে হয়।

২. যদি দুর্ঘটনা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কারণে হয়ে থাকে এবং তার প্রভাব যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে থাকে।

৩. যদি অন্যকারো ভুল বা অনিয়মের কারণে দূর্ঘটনা ঘটে থাকে। এমতাবস্থায় এর জন্য দায়ী সেই হবে। চালক নয়।

৪. উট, গরু বা অন্য কোনো জীবজন্তুর কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতির যামিন হবে প্রাণীর মালিক, যদি সে এর সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে কোনো ধরনের ত্রুটি করে থাকে।

৫. যদি ক্ষতিসাধনে ড্রাইভার ও ক্ষতিগ্রস্ত উভয়ে অংশীদার হয়, তাহলে একে অপরের ক্ষতির দায়ভার গ্রহণ করবে।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো-

প্রত্যক্ষ জড়িত তথা মুবাশির দায়ী হবে (যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে থাকে) যদিও তার পক্ষ থেকে বিশেষ অনিয়ম না পাওয়া যায়। আর মুতাসাব্বিব তথা পরোক্ষ জড়িত ব্যক্তি

শুধুমাত্র অনিয়ম ও সীমালঙ্ঘন পাওয়া গেলেই দায়ী হবে।
উভয়ে সম্পৃক্ত হলে মুবাশিরই দায়ী হবে। হ্যাঁ, যদি মুবাশির অনিয়মকারী না হয় আর মুসাব্বিব হয়, তাহলে মুসাব্বিবই দায়ী হবে।
যদি কোনো ঘটনায় দুই জনের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়, তাহলে প্রত্যেকে তাদের সম্পৃক্ততার পরিমাণ অনুসারে দায়ভার গ্রহণ করবে। আর যদি সম্পৃক্ততার পরিমাণ জানা না যায় অথবা সমান হয়, তাহলে উভয়ের উপর সমানভাবে বর্তাবে।"

'আক্বেলা'র পরিচয় ও বিধান

আমরা জানলাম, সাধারণত সড়ক দুর্ঘটনায় কৃতলে 'আমাদ ছাড়া অন্যান্য প্রাণহানির ক্ষেত্রে দিয়াত ওয়াজিব হয় হত্যাকারীর আক্বেলার উপর।[১০৯৭]

'আক্বেলার পরিচয় ও তাৎপর্য:

আরবী 'আক্বল শব্দের একটি অর্থ হলো দিয়াত বা রক্তপণ। উক্ত শব্দের কর্তাবাচক রূপ হলো 'আক্বেলা। সুতরাং 'আক্বেলা শব্দের অর্থ হলো, দিয়াত আদায়কারী।[১০৯৮]
আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলী ইবনুল মুতাররিয রাহ. (৬১০ হি.) বলেন-

العقل والمعقلة الدية (وعقلت) القتيل أعطيت ديته وعقلت عن القاتل لزمته دية فأديتها عنه (ومنه) الدية على العاقلة وهي الجماعة التي تغرم الدية وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه أي الذين يرتزقون من ديوان على حدة.[১০৯৯]

দিয়াত আদায় করার ক্ষেত্রে 'আক্বেলার বিধান হাদীস ও ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত।
হযরত আবু হুরাইরা রাযি. হতে বর্ণিত-

اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها.

"হুজাইল গোত্রের দুই নারী ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে এক পর্যায়ে একজন অপরজনকে পাথর ছুড়ে মারে। পাথরের আঘাতে ওই মহিলা ও তার গর্ভের সন্তান উভয়ের মৃত্যু ঘটে। বিবাদটি রাসূল ﷺ-এর দরবারে উত্থাপিত করা হয়। রাসূল ﷺ ফয়সালা করলেন, গর্ভের বাচ্চার দিয়াত হিসেবে একটি গোলাম বা বাঁদী আজাদ করতে হবে। আর মহিলার দিয়াত আদায় করবে তার আক্বেলাগণ।"[১১০০]

[১০৯৭] প্রাণহানির পাশাপাশি অন্যান্য আহতের ক্ষেত্রে যেসব সূরতে দিয়াতের ২০ ভাগের এক ভাগ বা তার বেশি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়, সে ক্ষেত্রেও 'আক্বেলা দিয়াত আদায় করে।

[১০৯৮] আরবী العاقلة শব্দের উৎপত্তি العقل থেকে। العقل শব্দের অর্থ, কোনো কিছু রশি দ্বারা বাঁধা। প্রাচীন আরবে দিয়াতের উট সাধারণত নিহত ব্যক্তির বাড়ির আঙ্গিনায় রশিতে বাঁধা থাকতো। এ প্রাসঙ্গিকতায় দিয়াতকেই العقل বলা শুরু হয়। যারা দিয়াত প্রদান করে তাদেরকে বলা হয় العاقلة। এ শব্দের তাৎপর্যের বিবরণে আরো বিভিন্ন মত রয়েছে। দেখুন: আল মিসবাহুল মুনীর: ৩/১৫৭

[১০৯৯] আল মুগরিব ফী তারতীবিল মু'রিব: ১/৩২৩

[১১০০] সহীহ মুসলিম: ১/৬২, হাদীস নং ১৬৮১, মাকতাবাতুল ফাতাহ

হযরত আবু জুহাইফা রাহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

عن أبي جحيفة قال: سألت عليا: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن؟ . فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر.

"আবু জুহাইফাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আলী রাযি. কে জিজ্ঞেস করলাম, কোরআন ব্যতীত আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে আপনার কাছে কোনো কিছু সংরক্ষিত আছে? তিনি বললেন, ঐ সত্তার শপথ যিনি শস্যদানা বিদীর্ণ করেন এবং সকল সৃষ্টির স্রষ্টা- রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে কোরআন এবং এই সহীফা বা চিরকুট ছাড়া আর কিছু নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম এই সহীফাতে কি আছে? তিনি বলেন, আক্বল এবং বন্দী মুক্তির বিধান এবং এই কথা আছে যে, কাফেরের বিনিময়ে মুসলিমকে হত্যা করা হবে না।"[১১০১]

ইমাম ইবনুল মুনযির রাহ. বলেন-

أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.

"উলামায়ে কেরাম একমত যে, দিয়াতুল খাতা (অনিচ্ছাকৃত খুনের দিয়াত) আক্বেলাগণই বহন করবে।"[১১০২]

ক্বতলে 'আমাদ ছাড়া প্রাণহানির অন্যান্য প্রকারের ক্ষেত্রে 'আক্বেলাই দিয়াত বহন করবে। এ প্রসঙ্গে মূলনীতি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা আবু বকর মারগীনানী রাহ. বলেন-

والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطأ.

"মূলনীতি হলো, যে রক্তপণ মূলত হত্যার কারণেই ওয়াজিব হয়েছে, হত্যা পরবর্তী অন্য কোনো কারণে নয়, তা ভুলক্রমে হত্যার সাথে তুল্য হওয়ার কারণে আক্বেলারা বহন করবে।"[১১০৩]

যেহেতু অনিচ্ছাকৃত প্রাণনাশ বা আঘাতের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে, তাই শরী'আতে এসব ক্ষেত্রে দিয়াত পরিশোধের দায়িত্ব রেখেছে হত্যাকারীর 'আক্বেলা তথা তার সাহায্যকারী গোষ্ঠীর উপর। কারণ-

ক. হত্যাকারীর একার পক্ষে সাধারণত এত বড় অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। শুধু তার উপর এ অর্থ পরিশোধের দায় চাপিয়ে দেয়া হলে তা অনাদায়ী থেকে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

وشيء من المعقول يدل عليه، وهو أن الخاطئ معذور وعذره لا يعدم حرمة نفس المقتول ولكن يمنع وجوب العقوبة عليه، فأوجب الشرع الدية صيانة لنفس المقتول عن الهدر، وفي إيجاب الكل على القاتل إجحاف به واستئصال فيكون بمنزلة العقوبة، وقد سقطت العقوبة عنه للعذر فضم الشرع إليه العاقلة لدفع معنى العقوبة عنه، وكذلك في شبه العمد باعتبار أن الآلة آلة التأديب ولم يكن فعله محظورا محضا ولهذا لا يجب عليه

[১১০১] শারহু মা'আনিল আসার ২/১০৬, হাদীস নং ৪৯৩৩, মাকতাবাতুল ফাতাহ

[১১০২] আল ইশরাফ, ইবনুল মুনযির ৩/১২৮, দারুল ফিকর

[১১০৩] আল হিদায়া: ৪/৫৬১, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

القصاص، فلا يكون جميع الدية عليه في ماله لدفع معنى العقوبة عنه، ولكن الشرع أوجب الدية هاهنا مغلظة ليظهر تأثير معنى العمد وأوجبها على العاقلة لدفع منع العقوبة عن القاتل.

"যুক্তির বিচারও এটা দাবি করে। কেননা ভুলকারী তো ইচ্ছায় ভুল করেনি। সে এ ক্ষেত্রে অপারগ। আবার তার অপারগতার কারণে নিহতের পরিবার মাহরূম হতে পারে না। অন্যদিকে ভুলে হওয়ায় তাকেও শাস্তি দেয়া যাচ্ছে না। আবার দিয়াত বা রক্তপণের সবটুকু তার উপর আবশ্যক করলে এটা তাকে নিঃস্ব করে দিবে এবং তার উপর জুলুম হয়ে যাবে। তখন এটাই তার উপর বড় শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে। অথচ অপরাগতার কারণে তাকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। এজন্য শরী'আত তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে দিয়াতকে আক্বেলার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। একই কথা শিবহে আমাদ-এর ক্ষেত্রে। যেহেতু হত্যা সংঘটিত হয়েছে এমন জিনিস দ্বারা যা দিয়ে উত্তম-মাধ্যমও দেয়া যায়, সেহেতু অন্যায় পরিষ্কার ও গুরুতর না হওয়ায় কিসাস আবশ্যক হবে না। কিন্তু পুরোপুরি ভুলের কারণে হয়নি বিধায় এক্ষেত্রে দিয়াতে মুগাল্লাজা (বড় পরিমাণের দিয়ত) আসবে। তবে তাও আক্বেলাদের সাথেই সম্পৃক্ত হবে, যাতে তার উপর গুরুদন্ড হয়ে না দাঁড়ায়, যেমনটা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।"[১১০৪]

খ. হত্যাকারী সাধারণত 'আক্বেলার মাধ্যমেই শক্তি ও সাহস লাভ করে থাকে। এজন্য তার অপরাধের দায় বহনে 'আক্বেলার অংশীদার হওয়াটা স্বাভাবিক। এছাড়াও হত্যাকারীকে এ ধরনের অপরাধ বা অসতর্কতা থেকে নিবৃত রাখার দায়িত্বও তার 'আক্বেলার উপর বর্তায়। এসব কারণে শরী'আতে ইচ্ছাকৃত হত্যা ছাড়া অন্যান্য হত্যার ক্ষেত্রে 'আক্বেলার বিধান রাখা হয়েছে।

ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

ثم هذا الفصل لا يحصل إلا بضرب استهانة وقلة مبالاة وتقصير في التحرز وإنما يكون ذلك بقوة يجدها المرء في نفسه وذلك بكثرة أعوانه وأنصاره وإنما ينصره عاقلته فضموا إليه في إيجاب الدية عليهم، وإن لم يجب لهذا المعنى، وكل أحد لا يأمن على نفسه أن يبتلي بمثله وعند ذلك يحتاج إلى إعانة غيره فينبغي أن يعين من ابتلي ليعينه غيره إذا ابتلي بمثله كما هو العادة بين الناس في التعاون والتواد فهذا هو صورة أمة متناصرة وجبلة قوم قوامين بالقسط شهداء لله متعاونين على البر والتقوى وبه أمر الله – تعالى – الأمة هذه.

"খাতা বা শিবহে আমাদ সাধারণত হয়ে থাকে অসতর্কতা ও গাফলতির কারণে। এই গাফলত ও অসাবধানতার কারণ হয়ে থাকে খুঁটির জোর। যে জোর সে পেয়ে থাকে সহযোগী সাঙ্গপাঙ্গ এবং গোষ্ঠী তথা আক্বেলা থেকে। সুতরাং দিয়াতকে তাদের সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে। আর কোনো মানুষই এ ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ নয়। গোষ্ঠীর অন্য যেকোনো সদস্যও। যেকোনো সময় এই মুসিবতে পড়তে পারে। এটা ভেবে তার একে অপরকে সাহায্য করবে। যাতে সে এমন মুসিবতে পড়লে সবাই তাকে সাহায্য করে। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার এই রীতি মানুষের মাঝে চর্চিত হয়ে আসছে...।"[১১০৫]

তবে শরী'আত 'আক্বেলার উপর দিয়াতের দায় সমর্পণ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সহজতা অবলম্বন

[১১০৪] আল মাবসূত: ২৭/১২৫, দারুর কুতুবিল ইলমিয়্যাহ
[১১০৫] আল মাবসূত: ২৭/১২৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

করেছে। ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. ‘আক্বেলার বিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন-

الإيجاب عليهم للتخفيف على القاتل، وإنما يجب على وجه لا يتعسر ذلك عليهم، وذلك في إيجاب القليل دون الكثير، ثم هذه يؤمرون بأدائها **على وجه التبرع** فلا يبلغ مقدارها مقدار الواجب من الزكاة بل ينقص من ذلك.

(ألا ترى) أنه لا تجب هذه الصلة في أصول أموالهم، وإنما تجب **فيما هو صلة لهم**، وهو العطاء فعرفنا أنه مبني على التخفيف من كل وجه، وقد ظن بعض أصحابنا - رحمهم الله - أن التقدير بثلاثة دراهم فيما يؤخذ منهم في كل سنة وذلك غلط، فقد فسرها هنا فقال: حتى يصيب الرجل في عطائه من الدية كلها أربعة دراهم أو ثلاثة دراهم فعرفنا أنه لا يؤخذ في كل سنة من كل واحد منهم إلا درهم أو درهم وثلث، فإن قلت العاقلة فكان يصيب الرجل أكثر من ثلاثة دراهم أو أربعة ضم إليهم أقرب القبائل في النسب من أهل الديوان حتى يصيب الرجل في عطائه ما وصفنا.

“দিয়াত আক্বেলার উপর আরোপিত হয়, হত্যাকারীর জন্য সহজকরণার্থে। তবে তাদের উপর এভাবে আবশ্যক হয় যাতে তাদের জন্যও কষ্টকর না হয়। প্রত্যেককে ছোট্ট একটা অংক আদায় করতে হয়। আবার এই অংশটাও দান হিসেবে আদায় করার জন্য বলা হয় এবং এই অংকের পরিমাণ যাকাতের পরিমাণসমও হয় না। এজন্য এটা তাদের মূল সম্পত্তির উপর আবশ্যক হয় না; বরং তাদের ভাতার উপর আবশ্যক হয়। অতএব আমরা দেখতে পেলাম, এখানে সবদিক দিয়ে সহজতা করা হয়েছে। ...”[১১০৬]

‘আক্বেলা’ কে হবে?

যেমনটি আমরা জেনেছি, ‘আক্বেলার বিধানের ক্ষেত্রে কোনো মাযহাবের দ্বিমত নেই। তবে ‘আক্বেলার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে কিছু দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়।

রাসূল ﷺ-এর যামানায় ‘আক্বেলা কে হতো সে বিষয়ে একাধিক বর্ণনা এসেছে। যার সারসংক্ষেপ হলো, সে সময় ‘আসাবাকেই[১১০৭] আক্বেলা ধরা হতো।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

“কোনো এক ঘটনায় বনু লিহইয়ানের এক নারীর গর্ভের বাচ্চা নিহত হলে রাসূল ﷺ একটি গোলাম অথবা বাদি আদায় করার ফয়সালা করেন। কিন্তু দেখা গেলো, এটা আদায়ের আগেই যার উপর ফয়সালা করা হয়েছে সেই নারী মারা গেলো। অতঃপর রাসূল ﷺ ফয়সালা করলেন, মিরাছ তার সন্তান-সন্তুতি ও স্বামীর মাঝেই বন্টিত হবে। আর আক্বল (দিয়াত) তার

[১১০৬] আল মাবসূত: ২৭/১২৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ
[১১০৭]

আসবারাই আদায় করবে।"[১১০৮]

এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইমামগণ কিছুটা ইখতিলাফ করেছেন। অর্থাৎ, বিধানটি কি শুধু 'আসাবার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি প্রয়োজনে অন্যদেরকেও যোগ করা যাবে। হানাফী ইমামগণ তাঁদের স্বীকৃত ও শক্তিশালী নীতি [১১০৯]'الحديث على مناطه'-এর আলোকে স্থির করেছেন যে, এখানে 'আসাবা শব্দের সাথে শর'য়ী বিধান সম্পৃক্ত নয়; বরং এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও মানাতের সাথেই সম্পৃক্ত। আর তা হলো, التناصر في الدماء বা রক্তপণ আদায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক ঐক্য। ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

لا شك أن المعتبر النصرة ففي حق كل قاتل يعتبر ما به تتحقق النصرة، وتناصر أهل الديوان يكون بالديوان، فإن كان القاتل من قوم يتناصرون بالحلف فذلك هو المعتبر؛ لأن المعنى متى عقل في الحكم الشرعي تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفروع.

"আক্বেলার ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো নুসরাত বা সহযোগিতা। সুরতাং প্রত্যেক হত্যাকারীর ক্ষেত্রে তার সহযোগীদের বিবেচনা করা হবে। সমপেশার লোকদের সহযোগিতার ভিত্তি হয়ে থাকে একই পেশার অন্তর্ভুক্ত হওয়া। আর যদি হত্যাকারী এমন গোষ্ঠীর লোক হয় যাদের মাঝে গোষ্ঠীয় মৈত্রীর প্রথা আছে, তাদের ক্ষেত্রে সেটাই ধর্তব্য হবে। কেননা শর'য়ী কোনো বিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যখন স্পষ্ট থাকে তখন সে বিধান ওই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথ ধরে বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিস্তৃতি লাভ করে।"[১১১০]

আল্লামা আব্দুর রহমান শাইখী যাদাহ রাহ. (১০৭৮ হি.) বলেন-

الأصل في الباب التناصر فالعاقلة في زماننا من تناصروا في الحوادث.

"এই অধ্যায়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো তানাসুর। সুতরাং বর্তমানে আক্বেলা হবে যাদের মাঝে তানাসুর আছে। অর্থাৎ, যারা বিপদে-মুসিবতে সাথে থাকে তারাই।"[১১১১]

'আসাবার মাঝে এই মানাত থাকার কারণে রাসূল ﷺ 'আসাবা'কে 'আক্বেলা সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং التناصر في الدماء -ই হলো এক্ষেত্রে মূল মানাত। এই মানাত অন্য কোনো জামাতের মাঝে পাওয়া গেলেও তারা 'আক্বেলা হতে পারবে।

এ কারণেই হযরত উমর ফারুক রাযি. নিজ খেলাফতের যুগে ঐ মানাতের আলোকে আহলে দেওয়ানকে 'আক্বেলা সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, তখন 'আসাবার তুলনায় আহলে দিওয়ানের মাঝেই التناصر في الدماء পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যেত।

ইমাম ইবনু আবী শাইবা রাহ. হযরত ইব্রাহীম নাখ'য়ী রাহ., শা'বী রাহ. এবং আরো অনেক তাবে'য়ী থেকে বর্ণনা করেন-

---

[১১০৮] মুসনাদে আহমাদ: ২/২৭৪, সহীহ বুখারী: ২/৯৯৮, হাদীস নং ৬৪৮৩, সহীহ মুসলিম: ১৮৬১

[১১০৯] হানাফী ইমামগণের স্বীকৃত এ নীতির দলীল এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা জানতে দ্রষ্টব্য- 'কুরআন সুন্নাহ'র আলোকে আপনার নামায'।

[১১১০] আল মাবসূত: ২৭/১২৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১১১১] মাজমাউল আনহুর: ৬৮৯

أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب ، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين.

"সর্বপ্রথম হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. ভাতা প্রদানের পদ্ধতি চালু করেন। তিনি ফয়সালা করেন যে, পূর্ণ দিয়াত তিন বছরে উক্ত ভাতা থেকে আদায় করা হবে।"[১১১২]

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. এ প্রসঙ্গে বলেন-

ثم كانت للعرب في الجاهلية أسباب للتناصر منها القرابة، ومنها الولاء، ومنها الحلف، ومنها مماحلة العدو، وقد بقي ذلك إلى زمن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ليكونوا حلفاء له كما كانوا حلفاء لجده عبد المطلب.

ودخل بنو بكر في عهد قريش ليكونوا حلفاء لهم الحديث فكانوا يضلون عن حليفهم وعديدهم ويعقل عنهم حليفهم وعديدهم ومولاهم باعتبار التناصر كما يعقلون عن أنفسهم باعتبار التناصر.

فلما كان في زمن عمر – رضي الله عنه – ودون الدواوين صار التناصر بينهم بالديوان فكان أهل ديوان واحد ينصر بعضهم بعضا وإن كانوا من قبائل شتى فجعل عمر العاقلة أهل الديوان. بيانه في الحديث الذي بدأ به الكتاب فقال: بلغنا أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فرض العقل على أهل الديوان؛ لأنه أول من وسع الديوان فجعل العقل فيه، وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم وبهذا أخذ علماؤنا – رحمهم الله – فقالوا: العقل على أهل الديوان من العاقلة.

قد قضى به عمر – رضي الله عنه – على أهل الديوان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر فكان ذلك إجماعا منهم، فإن قيل: كيف يظن بهم الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قلنا: هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، فإنهم علموا أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قضى به على العشيرة باعتبار النصرة وكان قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته، ثم لما دون عمر – رضي الله عنه – الدواوين صارت القوة والنصرة بالديوان، فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه على ما روي عن علي – رضي الله عنه – أن يوم الجمل وصفين جعل بإزاء كل قبيلة من كان من أهل تلك القبيلة ليكونوا هم الذين يقاتلون قومهم فلهذا قضوا بالدية على أهل الديوان.

"ইসলামপূর্ব আরবে তানাসুর বিভিন্ন সূত্র ধরে গড়ে উঠত। যেমন, আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক, অভিভাবকত্ব, মৈত্রী চুক্তি, শত্রু প্রতিরোধমূলক চুক্তি। এগুলো রাসূল ﷺ-এর যুগেও ছিলো।....

হযরত উমর রাযি.-এর খেলাফতকালে রেজিষ্ট্রার বা নথিপত্র তৈরী করা হলো, যেখানে সব মানুষকে বিভিন্ন স্তরে নথিভুক্ত করা হতো। ফলে তানাসুর গড়ে উঠে রেজিষ্ট্রার অনুসারে। এক দল বা পেশাভুক্ত লোকজন পরস্পরের সময়ে অসময়ের মিত্রে পরিণত হয়। যদিও তারা ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের। যার ফলশ্রুতিতে তিনি একই রেজিষ্ট্রারের লোকদের আক্বেলা সাব্যস্ত করেন। উল্লিখিত হাদীসে একথা পরিষ্কারভাবে এসেছে। তিনি বলেন- আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, উমর রাযি দিয়াতকে আহলে দিওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনিই প্রথম দিওয়ান বা

[১১১২] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ২৮০০৮

রেজিষ্টারকে বিস্তৃত করেন এবং দিয়্যতকে এর সাথে সম্পৃক্ত করেন। এর আগে এটা আত্মীয়-স্বজনদের উপর ছিলো। আমাদের উলামায়ে কেরাম তাঁর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, দিয়াত আহলে দিওয়ানদের সাথে সম্পৃক্ত হবে।

হযরত উমর রাযি. সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে এই ফয়সালা করেছিলেন। তাদের কেউই এতে আপত্তি করেননি। যার ফলে এটা ইজমার রূপ পরিগ্রহ করেছে। যদি আপত্তি তোলা হয়, রাসূল ﷺ-এর ফয়সালার বিপরীতে কিভাবে ইজমার কথা ভাবা যায়? উত্তরে বলা হবে, এই ইজমা রাসূল ﷺ-এর ফয়সালার বিপরীতে নয়; বরং এর সমার্থক। কেননা তারা বুঝতে পেরেছেন যে, রাসূল ﷺ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন সহযোগী হবার ভিত্তিতে। ঐ সময় এই রক্তের বন্ধনই ছিলো তার শক্তির ভিত্তি। পরবর্তীতে হযরত উমর রাযি. যখন দিওয়ান প্রস্তুত করলেন তখন এটাই শক্তি ও সাহায্যের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ালো।..."[১১১৩]

আমরা জানলাম, হযরত উমর রাযি. أهل الديوان বা সরকারিভাবে এক রেজিস্ট্রারভুক্ত এক পেশার লোকদেরকে[১১১৪] 'আক্বেলা নির্ধারণ করেছিলেন। সাধারণত ঐ সময় তাদের মাঝে রক্তপণ আদায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতার চুক্তি থাকতো। তাদের ভাতা থেকে সে পণ কেটে নেয়াও ছিলো সহজ।

আমরা আরো জানলাম যে, 'তানাসুর ফিদ দিমা' বা রক্তপণ আদায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক ঐক্য হলো 'আক্বেলার ক্ষেত্রে মূল বিষয়। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্য কোনো গোষ্ঠী বা জামাতের মাঝে পাওয়া গেলে তার আক্বেলা হতে পারবে।

এ সকল দিক বিবেচনা করে ইমামগণ 'আক্বেলার স্তরবিন্যাস করেছেন এভাবে-

প্রথমত: আহলে দিওয়ান;

দ্বিতীয়ত: 'আসাবা;

তৃতীয়ত: বাইতুল মাল।

প্রকাশ থাকে যে, মহিলা ও নাবালেগ বাচ্চারা 'আক্বেলার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

বর্তমানে 'আক্বেলার বিধান

আমরা জানি, বর্তমানে আহলে দিওয়ানের বিষয়টি বেশ শিথিল হয়ে পড়েছে। তবে এখন বিভিন্ন পেশাকে কেন্দ্র করে কর্মজীবীদের বিভিন্ন সংঘটন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, যানবাহন শ্রমিকদের সমিতি বা সংঘটন। এ সকল সংঘটনকে আক্বেলা ধরা যাবে কিনা- এ ব্যাপারে মুফতিয়ানে কেরামের মাঝে দ্বিমত থাকলেও সঠিক বিবেচনায় অগ্রগণ্য মত হলো, যদি উল্লিখিত মানাত বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাদেরকে 'আক্বেলা বলা যাবে।

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-[১১১৫]

[১১১৩] আল মাবসূত ২৮/১২৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১১১৪] দিওয়ান শুধু সৈন্যবাহিনীর নয়; বরং বিশেষ বিশেষ পেশার ভিন্ন ভিন্ন দিওয়ান ছিলো। আল্লামা আব্দুল কাদের রাফেঈ রাহ. (১৩২৩ হি.) বলেন:

قال في غرر الأفكار: فإن كان غازيا فعاقلته من يرزق من ديوان الغزاة، وإن كان كاتبا فعاقلته من يرزق من ديوان الكتاب اهـ.

[১১১৫] আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন:

(قوله وتمامه فيه) حيث قال: وإن كان له متناصرون من أهل الديوان والعشيرة والمحلة والسوق، فالعاقلة أهل الديوان ثم العشيرة

(ولا عاقلة للعجم) وبه جزم في الدرر قاله المصنف لعدم تناصرهم وقيل لهم عواقل لأنهم يتناصرون كالأساكفة والصيادين والصرافين والسراجين فأهل محلة القاتل وصنعته عاقلته وكذلك طلبة العلم.

قلت: وبه أفتى الحلواني وغيره خانية زاد في المجتبى: والحاصل أن التناصر أصل في هذا الباب ومعنى التناصر أنه إذا حزبه أمر قاموا معه في كفايته. وتمامه فيه.

وفي تنوير البصائر معزيا للحافظية والحق أن التناصر فيهم بالحرف فهم عاقلته إلى آخره فليحفظ وأقره القهستاني لكن حرر شيخ مشايخنا الحانوتي أن التناصر منتف الآن لغلبة الحسد والبغض وتمني كل واحد المكروه لصاحبه فتنبه. قلت: وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في ماله أو بيت المال.

"...অনারবীদের মাঝে সহযোগিতার প্রথা না থাকার কারণে তাদের আক্বেলা নেই। আবার কেউ কেউ বলেন, তাদেরও আক্বেলা আছে। যেহেতু তারা একে অপরের সহযোগী হয়, যেমন মুচি, শিকারী, মুদ্রা ব্যবসায়ী, প্রদীপ তৈরীকারী ইত্যাদি পেশার লোকজন (তখনকার সময়ে এমন ভিন্ন ভিন্ন পেশার লোকদের মাঝে সমপেশার কারণে এক ধরনের সহযোগিতামূলক ঐক্য তৈরী হতো)। সে হিসেবে হত্যাকারীর মহল্লাবাসী এবং একই পেশার লোকদের আক্বেলা ধরা হবে। অনুরূপভাবে ছাত্র সমাজকে পরস্পরে 'আক্বেলা গণ্য করা হবে।

এটার উপরই হুলওয়ানী রাহ. এবং অন্যান্যরা ফাতওয়া দেন (এটা ফাতাওয়ায়ে খানিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে)।... এ ব্যাপারে মুদ্দাকথা হলো, তানাসুরের প্রতিই লক্ষ করা হবে। আর তানাসুর এর ব্যাখ্যা হলো- সে কোনো মুসিবত বা সমস্যায় পতিত হলে, মুসিবতগ্রসস্থের সাহায্যে এবং তার পক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

তানবীরুল বাসায়েরে হাফিযিয়্যাহর বরাতে বলা হয়েছে, বাস্তব কথা হলো, অনারবীদের মাঝে সহযোগিতামূলক শক্তি সৃষ্টি হয় পেশার মাধ্যমে। তাই তারাই আক্বেলা হবে।... কুহিস্তানী রাহ.ও এই মত ব্যক্ত করেছেন। ...

যেখানে গোত্র, গোষ্ঠী বা অন্য কোনো কিছুর ভিত্তিতে তানাসুরের অস্তিত্ব থাকবে না, সেখানে দিয়াত হত্যাকারীর সম্পদ অথবা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আদায় করা হবে।"[১১১৬]

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা-এ আল মুহীত-এর উদ্ধৃতিতে এসেছে-

وإن لم يكن له ديوان، ولا لقرابته ينظر: فإن كان يتناصر بأهل الحرف، فعقله عليهم، والفضل في ماله، وإن كان يتناصر بأهل المحلة، فعقله على أهل المحلة، والفضل عليه، وإن كان يتناصر بالمصر، فهو على أهل المصر كذا في المحيط.

"যদি তার কোনো দিওয়ান না থাকে এবং উল্লেখযোগ্য আত্মীয়-স্বজনও না থাকে, তাহলে দেখা হবে তার সমপেশার কোনো সহযোগিতামূলক শক্তি আছে কিনা? থাকলে তাদের উপরই আক্বল

ثم أهل المحلة وبه قال الناطفي ط (قوله والحق إلخ) قلت: المدار على التناصر كما ذكروه فمتى وجد بطائفة فهم عاقلته وإلا فلا ط (قوله لكن حرر إلخ) هو تأييد لما جزم به في الدرر (قوله فالدية في ماله) أي عند عدم وجود بيت المال أو عدم انتظامه كما قدمناه والله تعالى أعلم. (رد المحتار ٣٥١/١٠ مكتبة الأزهر)

[১১১৬] আদ্দুররুল মুখতার: ১০৩৫১, মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা

বা দিয়াত আসবে। তাদের দ্বারা পূর্ণ না হলে অবশিষ্ট অংশ তার সম্পত্তি থেকে নেয়া হবে। অনুরূপভাবে যদি তার সহযোগীশক্তি হয়ে থাকে মহল্লাবাসী অথবা নগরবাসী, তাহলে তারা আক্বেলা হবে।”[১১১৭]

→ যদি এ ধরনের 'আক্বেলা পাওয়া না যায়, তাহলে হত্যাকারীর 'আসাবা দিয়াত আদায় করবে। নিকটবর্তী 'আসাবা তার দ্বারা সংকুলান না হলে দূরবর্তী 'আসাবাকেও যুক্ত করবে। তাও যদি না হয়, তাহলে পরবর্তী স্তরের আসাবাকেও যুক্ত করবে।

→ আর যদি 'আসাবা না থাকে, তাহলে বাইতুল মাল থেকে আদায়ের ব্যবস্থা থাকলে, বাইতুল মাল থেকে আদায় করা হবে।

→ যদি বাইতুল মাল থেকেও আদায়ের ব্যবস্থা না হয়, তাহলে হত্যাকারীকেই পুরো দিয়াত আদায় করতে হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. এ প্রসঙ্গে 'তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ-এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন-

وإن لم تكن له عشيرة ولا ديوان فعاقلته بيت المال في ظاهر الرواية وعليه الفتوى ومن وجب عليه شيء لا يؤخذ من غيره هذا ما وقفت عليه من كلامهم والله تعالى أعلم. اهـ.كلام العلامة الحانوتي ثم إن وجوبها في بيت المال إنما هو حيث كان **منتظما** وإلا ففي مال الجاني قال في المجتبى ما نصه: قلت وفي زماننا بخوارزم لا يكون إلا في مال الجاني إلا إذا كان من أهل قرية أو محلة يتناصرون؛ لأن العشائر فيها قد وهت ورحمة التناصر من بينهم قد رفعت وبيت المال قد انهدم نعم أسامي أهلها مكتوبة في الديوان ألوفا ومئات لكن لا يتناصرون به فتعين أن تجب في ماله. اهـ. وفي النقاية وشرحها للقهستاني ومن لا عاقلة له أي من العرب والعجم يعطي الدية من بيت المال إن كان موجودا أو مضبوطا وإلا أي إلا يكن كذلك فعلى الجاني. اهـ.[১১১৮]

এক্ষেত্রে 'আক্বেলার মতো তিন বছরে দিয়াত পরিশোধ করতে হবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

وقد مر أن الدية حيث وجبت على العاقلة تؤخذ في ثلاث سنين وأنه لا يؤخذ من كل واحد منهم أكثر من ثلاثة دراهم وبقي ما إذا لم تكن له عاقلة ووجبت في ماله فكيف تؤخذ؟ نص في المجتبى عن الناطفي أنه يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة وقال صاحب المجتبى قلت وهذا أحسن لا بد من حفظه فقد رأيت في كثير من المواضع أنه تجب الدية في ماله في ثلاث سنين. اهـ. وارتضاه العلائي في شرح التنوير وقال وأقره المصنف. اهـ. لكن هذا مشكل جدا؛ لأن قوله يؤدي في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة إن كان المراد في ثلاث سنين يلزم أن يكون الواجب عليه تسعة دراهم أو اثني عشر درهما، وإن كان المراد في كل سنة من مدة عمره فمتى تنقضي الدية، وإذا مات الجاني فممن يؤخذ الباقي وكيف يؤخذ فتعين المصير إلى ما

[১১১৭] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ৬/৯৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১১১৮] আল উকুদুদ দুররিয়্যাহ তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ: কদিমী কুতুবখানা, দেওবন্দ

نقله عن أكثر المواضع من وجوبها في ماله في ثلاث سنين، فإنه لا إشكال فيه.

وقد صرح في غاية البيان بأن الذمي الذي لا عاقلة له تجب الدية في ماله في ثلاث سنين من يوم القضاء كما في المسلم. اهـ. لأن الذمي لا حق له في بيت المال فتجب الدية في ماله ابتداء، وإذا فقد بيت المال ووجبت الدية على المسلم في ماله صار كالذمي فتجب عليه في ثلاث سنين ابتداؤها من يوم القضاء لا من يوم الجناية.[১১১৯]

বর্তমানে যদি পূর্বের আহলুদ দিওয়ানের মতো (রক্তপণের ক্ষেত্রে) সহযোগিতামূলক সমিতি, সংঘ, এসোসিয়েশন বা কর্পোরেশন থাকে, তাহলে তারা ‘আক্বেলা হবে। তবে এই সাহায্যের সম্পর্ক রক্তপণ আদায়ের ক্ষেত্রেও থাকবে এমন শক্তিশালী হতে হবে। রাজনৈতিক দল বা সংঘটনের মতো শুধু বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের দিক থেকে অভিন্নতা থাকলে হবে না।

এমনিভাবে সুদ ও ক্বিমারমুক্ত ‘সহযোগিতা ফান্ড’ থাকলে এবং তাদের মাঝে রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের চুক্তি থাকলে, তারাও বর্তমানে ‘আক্বেলার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

সত্যায়নে

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৬ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আ'যম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৬ রজব ১৪৩৯ হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১৫ রজব ১৪৩৯ হি.

[১১১৯] আল উকুদুদ দুররিয়্যাহ ফী তানকীহিল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ: ৬/৪৩৪, কদিমী কুতুবখানা, দেওবন্দ

যৌথ উত্তরাধিকার সম্পদে হস্তক্ষেপ : সংশ্লিষ্ট ফিকহী ইবারতের ব্যাখ্যা ও সমন্বয়

বরাবর,
ফাতওয়া বিভাগ, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

প্রসঙ্গঃ পিতার রেখে যাওয়া সম্পদ ও তাতে অর্জিত মুনাফা বন্টন

জনাব, আসসালামু আলাইকুম। আমার পিতা ২০০১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা মোট পাঁচ ভাই ও পাঁচ বোন। সকলই আল্লাহর রহমতে জীবিত। কাজের সুবাদে আমি (বড় ভাই) বগুড়ায় থাকি। সবার ছোট ভাই থাকে ঢাকায়। **মাঝের তিন ভাই** শিবগঞ্জে পিতার জীবিতাবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত পিতার সকল জমি-জমা ও ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। তারা মীরাছের সঠিক বন্টন না করে পিতার রেখে যাওয়া ব্যবসা ও সম্পদ থেকে উপার্জিত মুনাফা দ্বারা নিজ নিজ নামে সম্পদ বৃদ্ধি করছে। পিতার মৃত্যুর পর থেকেই তাদেরকে মিরাছ বন্টনের কথা বলে আসছি। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত না করে অযথা মিরাছ বন্টনে বিলম্ব করছে।
এখন আমার প্রশ্ন হলো, তারা পিতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ থেকে মুনাফা অর্জন করে নিজ নিজ নামে যে সম্পদ বৃদ্ধি করছে, সে সম্পদ কি মিরাছ বলে গণ্য হবে? সঠিক হিসাব না করে মনগড়াভাবে যেমন তেমন করে মিরাছ বন্টন করা বৈধ হবে কি?

প্রশ্নকারী
মোহাম্মদ মোজাহারুল ইসলাম

আমার আবেদন

মুহতারাম মুফতিয়ানে কেরাম দামাত বারাকাতুহুম!
উল্লিখিত ইস্তিফতার সমাধান খুঁজতে গিয়ে নিম্নে বর্ণিত ফিকহী ইবারতগুলো[১১২০] পাওয়া যায়। আমাদের দৃষ্টিতে এ ইবারতগুলোর মাঝে তা'আরুয[১১২১] আছে বলে মনে হচ্ছে। আশা করি, তা'আরুযের সমাধান এবং উপরোক্ত ইস্তিফতার জবাব কী হবে তা দলীলসহ জানিয়ে উপকৃত করবেন।

নিবেদক
মাওলানা মাকছুদুর রহমান,
বগুড়া

[১১২০] ভাষ্য।
[১১২১] পরস্পর বিরোধ।

النصوص:[১১২২]

(١) دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك، فمات الأب، إن أعطاه هبة فالكل له وإلاّ فميراث. وتمامه في جواهر الفتاوى.[১১২৩]

(٢) قوله: (وإلاّ فميراث) بأن دفع إليه ليعمل للأب.[১১২৪]

(٣) قال في خزانة الفتاوى: إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالةُ التمليك. بيري.[১১২৫]

(٤) ومن غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح، وهذا عندهما، أصله أن الغاصب أو المودع إذا تصرف فى المغصوب أو الوديعة وربح لا يطيب له الربح عندهما خلافا لأبي يوسف.[১১২৬]

(٥) ... مثلا لو أخذ أحد الورثة من تركة مورثه بدون إذنه مائة دينار وباع واشترى بها، فربح خمسين دينارا فتكون الخمسون دينارا له، وليس للورثة الآخرين الاشتراك فى هذا الربح، ويكون ذلك الوارث ضامنا للورثة حصصهم في رأس المال، كما أنّه لو خسر في البيع والشراء تلك المائة الدينار كلا أو بعضا فيعود الخسار المذكور عليه ويضمن حصص الورثة الآخرين.[১১২৭]

(٦) لو تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة وربح، فالربح للمتصرف وحده.[১১২৮]

رجل مات وترك الورثة فتصرف أحد الورثة في المال بالتجارة فتزايد المال فالقاضي يقسم أصل المال على فرائض الله تعالى، لا فرعه.[১১২৯]

(٧) ما لا يكون ملكا لا يصير ميراثا لورثته. قاضي خان في العتابي.[১১৩০]

(٨) مشترکہ مال میں کسی ایک شریک کی محنت سے ہونے والی زیادتی سب شرکاء کو ملے گی۔[১১৩১]

(٩) اگر یہ کام سب حصہ داروں کی رضامندی سے تھا تو نفع میں بھی سب شریک ہوں گے، اور اگر بعض ورثہ راضی نہ تھے تو نفع میں شریک نہ ہوں گے، البتہ یہ نفع بوجہ اس کہ مال غیر میں تصرف بلا اذن تھا جائز نہ ہو گا، بلکہ اس کا تصدق واجب

[১১২২] بعد المراجعة والتصحيح.

[১১২৩] আদ্দুররুল মুখতার: ৫/৭০৯, এইচ. এম. সাঈদ

[১১২৪] রদ্দুল মুহতার: ৫/৭০৯, এইচ. এম. সাঈদ

[১১২৫] রদ্দুল মুহতার: ৮/৪২৬, এইচ. এম. সাঈদ

[১১২৬] আল হিদায়া: ৩/৩৫৯, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান

[১১২৭] দুরারুল হুককাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম: ১০/৫০, ধারা নং ১০৯০

[১১২৮] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ২/৩৪৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১১২৯] 'যখীরা'র উদ্ধৃতিতে আহসানুল ফাতাওয়া: ৯/২৮৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১১৩০] ফাতাওয়া নুরুল হুদা: (ফাতাওয়া জামিউল ফাওয়াইদ) ১৫৩

[১১৩১] কিফায়াতুল মুফতী: ৮/২৬৯

ہو گا۔[১১৩২]

(١٠) سوال: ایک شخص کے فوت ہونے کے بعد ترکہ پر صرف ایک وارث متصرف رہا، اس نے اس کے مدت دراز تک منافع لئے اور کافی جائداد بنالی، اب دوسرے ورثہ تقسیم ترکہ کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس حالت میں محض اصل ترکہ تقسیم ہو گا یا اس سے حاصل کردہ منافع اور اس سے خرید کردہ جائداد بھی تقسیم ہو گی؟...

جواب: صرف اصل ترکہ تقسیم ہو گا اور منافع کا مالک وہی ہے جو متصرف رہا، مگر اس کا تصرف اگر بلا رضائے دیگر ورثہ ہے تو یہ ارباح فاسدہ ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ مالک پر رد کئے جائیں، اگر مالک کا علم نہ ہو سکے تو تصدق علی الفقراء کیا جائے، حاصل یہ کہ دیانۃً جمیع ورثہ کو دینا واجب ہو گا قضاءً نہیں۔[১১৩৩]

(١١) منافع بھی ترکہ میں شامل ہے۔ [১১৩৪]

(١٢) تقسیم میراث سے پہلے جو منافع ہوئے اس کا حکم....جواب: جو کچھ نفع کی شکل میں زیادتی ہوئی اسے اصل ترکہ ہی کا (ایک جز) سمجھا جاوے اور اس نفع کو ترکہ میں شامل کرکے میراث تقسیم کی جاوے۔ [১১৩৫]

(١٣) جو جائیداد 1960ء میں ایک لاکھ کی تھی اور وہ 1991ء میں تیس لاکھ تو تیس لاکھ ہی کی تقسیم ہو گی یعنی بڑے بھائی کی اولاد کو تیس لاکھ میں سے پانچواں حصہ دینا پڑے گا۔ [১১৩৬]

(١٤) مرنے کے بعد اضافہ شدہ مال کی تقسیم ہو گا "ماترکہ" میں اضافہ شدہ مال بھی شامل ہے اگر وہ میت کے مال سے ہوا ہے لہذا لامحالہ اس کی تقسیم ہو گی۔[১১৩৭]

উত্তর:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى اله وأصحابه أجمعين. وبعد:
ওয়া ‘আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।
আপনারা প্রশ্নে দু’টি বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন-
এক. উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টনের পূর্বে কোনো একজন বা একাধিক ওয়ারিছ তা দিয়ে কারবার করে লাভবান হলে, অন্য ওয়ারিছগণ তাতে লভ্যাংশ পাবে কিনা?
দুই. উক্ত মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত কিছু ফিকহী দলীলের ব্যাখ্যা।
মূল মাসআলার সমাধানের পূর্বে দ্বিতীয় বিষয় তথা মুহতারাম মাওলানা সাহেবের পক্ষ থেকে প্রশ্নে উল্লিখিত দলীলগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করাই সমীচীন মনে হচ্ছে। এতে মূল

[১১৩২] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৪/৩৪৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[১১৩৩] আহসানুল ফাতাওয়া: ৯/২৮৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[১১৩৪] ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়্যাহ: ৬/৫৫১
[১১৩৫] ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ: ১০/২৪৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[১১৩৬] আপকে মাসাইল আওর উনকা হল: ৬/২৯৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[১১৩৭] আপকে মাসাইল আওর উনকা হল: ৬/২২১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

মাসআলা অনুধাবন করতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

ফিকহী দলীলগুলোর মাঝে সমন্বয় ও ব্যাখ্যা

মুহতারাম মাওলানা সাহেব! আপনি আলোচ্য মাসআলার সাথে সম্পর্কিত কিছু ফিকহী দলীল ও ফাতাওয়া উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমাদের দৃষ্টিতে এসব ইবারতগুলোর মাঝে তা'আরুয মনে হচ্ছে'। প্রকৃতপক্ষে আপনার উল্লিখিত দলীল ও ফাতওয়াগুলোর বিষয় ও ক্ষেত্র এক নয়। সম্ভবত, এক মনে করায় তা'আরুয অনুভূত হয়েছে। দলীল ও ফাতওয়াগুলোর বিষয় ও ক্ষেত্র যথাযথভাবে অনুধাবন করলে তা'আরুয মনে হবে না বলে আশা রাখি। সহজে বোঝার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা আপনার খেদমতে পেশ করছি। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সঠিক বুঝ দান করুন। বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থাপন করার তাওফীক দিন।

প্রশ্নে উল্লিখিত দলীলগুলো মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত-

১. পিতা কর্তৃক ছেলেকে নিজ ব্যবসা বা কাজে ব্যবহার করা এবং তা হতে অর্জিত মুনাফা সংক্রান্ত।

২. পিতা ছেলে বা অন্য কাউকে সম্পদের মালিক বানালে তা মিরাছ না হওয়া সংক্রান্ত।

৩. মিরাছ বন্টনের পূর্বে কোনো একজন ওয়ারিছের তাসাররুফের (হস্তক্ষেপের) মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা সংক্রান্ত।

পিতা কর্তৃক পুত্রকে ব্যবহার করা এবং তা থেকে অর্জিত মুনাফা

ইসলামী শরী'আতে পুত্রের প্রতি পিতার বিশেষ অধিকার রয়েছে। পিতা নিজের ছেলে ও তার সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি 'বির' (সদ্ব্যবহার) ও ইহসানের নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছেলে ও তার সম্পদে পিতার অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এ অধিকার সম্পর্কে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মাঝে একটি সহীহ হাদীস নিম্নরূপ-

হযরত আমর ইবনে শু'আইব রাহ. এর সূত্রে বর্ণিত,

إن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن لي مالا و ولدا، وإن والدي يحتاج مالي، قال: "أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسبكم".

"এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার সম্পদ এবং সন্তান রয়েছে। আর আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতারই। তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের উপার্জন ভক্ষণ করো।"[১১৩৮]

এ হাদীস থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, পিতা ছেলের সম্পদ থেকে যেকোনোভাবে উপকৃত হতে পারেন। সুতরাং তিনি ছেলেকে ব্যবসা বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার অধিকার রাখেন। প্রয়োজনে তিনি পূর্ণ ব্যবসা বা নির্দিষ্ট অংশের দেখাশোনার দায়িত্বও তাকে দিতে পারেন।

পিতার কাজে ছেলের এভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে ইহসান ও তাবাররু' বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে ছেলে নিজ শ্রমের বিনিময়ে কোনো সম্পদ দাবি করতে পারবে না। এভাবে শ্রম দিয়ে সে যতই মুনাফা অর্জন করুক না কেন সে তার মালিক বা হকদার

[১১৩৮] (হাদীস সহীহ) সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৫৩০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৬৭৮

হবে না; বরং সমুদয় সম্পদের মালিক পিতাই হবেন। পিতা মারা যাওয়ার পর তা মিরাছ গণ্য হবে এবং তাতে সকল ওয়ারিছের হক প্রতিষ্ঠিত হবে। ছেলেও একজন ওয়ারিছ হিসেবে অংশ পাবে এবং শ্রমের প্রতিদান আখেরাতে পাবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২ হি.) আলোচনা প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম জালালুদ্দীন রাহ. এর ফাতওয়া এভাবে উল্লেখ করেছেন-

ذكر شيخ الإسلام جلال الدين في أب وابن اكتسبا ولم يكن لهما مال، فاجتمع لهما من الكسب أموال، الكل للأب؛ لأن الابن إذا كان في عياله فهو معين له، ألا ترى أنه لو غرس شجرة فهي للأب، وكذا الحكم في الزوجين.هـ.

"শাইখুল ইসলাম জালালুদ্দীন এমন পিতা এবং সন্তানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যারা এক সাথে উপার্জন করে আর তাদের অতিরিক্ত সম্পদ নেই। তারা উভয়ে মিলে যে সম্পদ উপার্জন করবে পিতা একাই তার মালিক হবে। কেননা সন্তান যদি পিতার অধিনস্থ পরিবারে থাকে, তাহলে সে (এ ধরনের কাজে ক্ষেত্রে) পিতার সহযোগী হিসেবে বিবেচিত হয় (অর্থাৎ, উপার্জিত সম্পদ বা মুনাফার মালিক পিতাই হয়ে থাকে। যেমন, সন্তান যদি কোনো গাছ বপন করে, তাহলে তার মালিক পিতা হয়। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।"[১১৩৯]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২ হি.) অন্যত্র এভাবে বলেছেন-

ثم هذا في غير الابن مع أبيه، لما في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معينا له، ألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب.

"কুনয়া গন্থে আছে- সন্তান এবং পিতা একই কাজ করে সম্পদ উপার্জন করে, তাদের আলাদা কোনো সম্পদ নেই। যদি সন্তান পিতার পরিবারে তার সহযোগী হিসেবে থাকে, তাহলে সমস্ত আয়ের মালিক পিতা একাই হবে। কারণ, এক্ষেত্রে সে পিতার সহযোগী বলে বিবেচিত হয়।"[১১৪০]

এসকল নস থেকে বোঝা গেলো যে, পিতা ছেলে থেকে যে কাজ নিয়ে থাকে তা ছেলের পক্ষ থেকে তাবাররু' ও সহযোগীতা হিসেবে বিবেচিত হবে। এর কারণে পিতার সম্পদে ছেলের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে না।

এটা হলো পিতা ও ছেলের মাঝে অন্য কোনো বিশেষ চুক্তি না হলে তার হুকুম। তবে পিতা প্রয়োজনে ছেলেকে ইজারা চুক্তির মাধ্যমেও স্বীয় কাজে লাগাতে পারেন। তখন সে নির্ধারিত পারিশ্রমিকই পাবে; অন্য কোনো সম্পদে তার হক প্রতিষ্ঠিত হবে না। এছাড়াও ছেলে পিতার সাথে শিরকাত বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো ব্যবসা করলে শিরকাতের নীতি অনুযায়ী তার হুকুম স্থির হবে, যা আমাদের এখানে আলোচ্যবিষয় নয়।

পিতাকর্তৃক মালিকানা হস্তান্তর

পিতা ছেলে বা অন্য কাউকে পুরো বা আংশিক ব্যবসার মালিক বানাতে পারেন। মালিক বানালে তাতে ছেলের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে পিতা মারা গেলে তা মিরাছ হবে না। এখানে

[১১৩৯] তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ: ১/৯৫, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান

[১১৪০] রদ্দুল মুহতার: ৪/৩৫৬, এইচ. এম. সাঈদ

স্মরণ রাখতে হবে যে, শরী'আতে মালিক বানানো বা মালিকানা হস্তান্তরের নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি রয়েছে।[১১৪১] তা পাওয়া গেলেই ছেলে মালিক হবে। আর মালিকানা হস্তান্তরের উক্ত নিয়ম-নীতি না পাওয়া গেলে ছেলে মালিক হবে না এবং তার মালিকানার দাবিও গ্রহণযোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে পিতা মারা গেলে উক্ত সম্পদ মিরাছ হয়ে যাবে এবং তাতে সকল ওয়ারিছের হক প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপরোক্ত দু'টি বিষয়ের আলোচনা বুঝে থাকলে প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম দলীলের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় দলীল পিতা কর্তৃক ছেলেকে ব্যবহার ও তাকে মালিক বানানোর সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম দলীলে আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. (১০৮৮ হি.) জাওয়াহিরুল ফাতাওয়ার উদ্ধৃতিতে বলেছেন-

دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك، فمات الأب، إن أعطاه هبة فالكل له وإلاّ فميراث. وتمامه في جواهر الفتاوى.

"যদি কোনো পিতা তার পুত্রকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে নিজের সম্পদ দেয় এবং পুত্র তাতে কারবার করে সম্পদ বৃদ্ধি করে, এমতাবস্থায় পিতা যদি পুত্রকে সম্পদ হেবা হিসেবে দিয়ে থাকে, তাহলে পিতার ইন্তেকালের পর পুত্র সমস্ত সম্পদের মালিক সন্তান হবে। যদি পিতা হেবা না করে থাকে, তাহলে তা মিরাছ হিসেবে গণ্য হবে।...."[১১৪২]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২ হি.) এর ব্যাখ্যায় (দ্বিতীয় দলীল) বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন-

قوله: (وإلاّ فميراث) بأن دفع إليه ليعمل للأب.[১১৪৩]

তৃতীয় দলীলে আল্লামা ইব্রাহীম ইবনে হুসাইন বীরী রাহ. (১০৩৩ হি.)[১১৪৪] বলেছেন-

إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالةُ التّمليك.

"পিতা যদি পুত্রকে কোনো সম্পদ দেয় এবং সে তাতে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে পুত্রকে মালিক বানানোর কোনো প্রমাণ না পাওয়া গেলে পিতাই তার মালিক হবে।"[১১৪৫]

এই তিন নস থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ছেলে যদি পিতার সাথে কাজ করে এবং পিতার পক্ষ থেকে মালিকানা হস্তান্তরের কোনো দলীল না থাকে, তাহলে সব সম্পদ পিতারই থাকবে। ছেলের শ্রম শুধু সহযোগীতা ও ইকরাম বলে বিবেচিত হবে। পিতার মৃত্যুর পর সকল ওয়ারিছ

[১১৪১] ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত হেবার অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন।

[১১৪২] আদ্দুররুল মুখতার: ৫/৭০৯, এইচ. এম. সাঈদ

[১১৪৩] রদ্দুল মুহতার: ৫/৭০৯, (এইচ. এম. সাঈদ)। আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ.-এর পুত্র আল্লামা আলাউদ্দীন আফেন্দী রাহ. 'তাকমিলা'তে হাসকাফী রাহ.-এর ভাষ্যের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন (৮/৪৯৯), তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

[১১৪৪] ইব্রাহীম ইবনে হুসাইন ইবনে আহমাদ ইবনে বীরী, আলমাক্কী, আল মুফতী, আলহানাফী। ১০২৩ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৯৯ হিজরীতে মক্কা মুকাররামায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল মু'আল্লাতে হযরত খাদিজা রাযি.-এর কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তিনি দীর্ঘদিন যাবত হারামাইন শরীফাইনে ফাতওয়া ও দরস প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'উমদাতু যাবীল বাছায়ের বি-হাল্লি মুহিম্মাতিল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের' অন্যতম। (আল আ'লাম লিয যিরিকলী: ১/৩৬)

[১১৪৫] রদ্দুল মুহতার: ৮/৪২৬, (এইচ. এম. সাঈদ)

তাতে অংশ পাবে। আর যদি পিতা ছেলেকে মালিক বানিয়ে দেয়, তাহলে তা পিতার সম্পদ হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে না; বরং ছেলের সম্পদ গণ্য হবে। এক্ষেত্রে পিতার মৃত্যুর পর তা মিরাছও হবে না। এ সম্পর্কে প্রশ্নে উল্লিখিত (সপ্তম দলীলে) ফাতাওয়া নুরুল হুদা'য় উল্লেখ করা হয়েছে-

ما لا يكون ملكا[১১৪৬] لا يصير ميراثا لورثته. قاضي خان في العتابي.

"যে সম্পদ মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন নয় তা ওয়ারিছদের মিরাছ হিসেবে গণ্য হবে না।"[১১৪৭]
উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, এ তিন দলীলের সাথে মূল মাসআলার সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।

পৈত্রিক সম্পদে কোনো একজন ওয়ারিছের হস্তক্ষেপ

আমরা জানি, কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার সাথে সম্পৃক্ত সব হক আদায় করার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা মিরাছ হিসেবে গণ্য হয়। চাই সে সম্পদ তার দখলে থাক বা অন্য কারো। এমনকি ওয়ারিছদের মধ্য থেকে কেউ যদি মৃত ব্যক্তির কোনো সম্পদ তার অনুমতিতে বা অনুমতি ছাড়াই পূর্ব থেকে দখল করে ভোগ করে এবং এক্ষেত্রে মৃতব্যক্তি কর্তৃক মালিকানা হস্তান্তরের কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে মৃত্যুর সাথে সাথে ঐ ওয়ারিছের দখলের আর কোনো মূল্য থাকবে না; বরং সে সম্পদ সাধারণ মীরাছের মতোই হয়ে যাবে। আর মিরাছ হিসেবে এর উপর সকল ওয়ারিছের হক প্রতিষ্ঠিত হবে।
ইসলামী শরী'আতে এটি একটি স্বীকৃত বিষয় যে, মিরাছ সম্পত্তি বন্টনের পূর্ব পর্যন্ত সকল ওয়ারিছের শরীকী বা এজমালি সম্পদ হিসেবে থাকে। শরীকী সম্পত্তির সাধারণ নিয়মানুযায়ী ওয়ারিছগণ তা থেকে শরীকানা ভিত্তিতে উপকৃত হতে পারে। ফিকহী পরিভাষায় এই শিরকাত বা অংশীদারিত্বকে 'শারিকাতুল মিলক' বলা হয়।
'শারিকাতুল মিলক' এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এক্ষেত্রে অংশীদারগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ হক্কের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বিবেচিত হয়। একে অন্যের অংশের ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির মতো। অর্থাৎ, কেউ কারো পক্ষ থেকে ওয়াকীল সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং অন্যদের অনুমতি ব্যতীত কোনো শরীক তাদের অংশকে ব্যবসা বা অন্য কোনো ঝুঁকিপূর্ণ (লাভ-ক্ষতি উভয়টির আশঙ্কা রাখে এমন) কারবারে লাগাতে পারবে না।
ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়টি বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন, ইমাম আবুল হুসাইন কুদূরী রাহ. (৪২৮ হি.) বলেন-

فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه.

"শারিকাতুল মিলক বা মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব: যেমন, দুইজনে কোনো কিছু মিরাছ হিসেবে পেলো অথবা একসাথে ক্রয় করলো। এক্ষেত্রে একজনের জন্য অপর জনের অংশে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে না।"[১১৪৮]
ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) বলেন-

[১১৪৬] أي للأب

[১১৪৭] ফাতাওয়া নুরুল হুদা: (ফাতাওয়া জামিউল ফাওয়াইদ) ১৫৩

[১১৪৮] মুখতাসারুল কুদূরী: ১৬৭, মাকতাবাতুদ দাওয়াহ, ঢাকা

وهو أن ما يتولد من الزيادة يكون مشتركا بينهما بقدر الملك، وكل واحد منهما بمنزلة الأجنبي في التصرف في نصيب صاحبه.[১১৪৯]

"অর্জিত মুনাফায় তারা মালিকানার অংশ হিসেবে অংশীদার হবে। প্রত্যেকে অপরের অংশে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে অপরিচিত (যে অংশীদার নয়) ব্যক্তির ন্যায়।"

আল্লামা আবু বকর কাসানী রাহ. বলেন-

فأما شركة الأملاك فحكمها في النوعين جميعاً واحد، وهو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه لأن المطلق للتصرف، الملك أو الولاية ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة ; ولم يوجد شيء من ذلك وسواء كانت الشركة في العين أو الدين لما قلنا.

"শিরকাতুল আমলাক (মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্ব)-এর উভয় প্রকারের হুকুম একই। তা হলো, প্রত্যেকে তার শরীকের অংশে অপরিচিত ব্যক্তির মতো বিবেচিত হবে। অনুমতি ব্যতীত অপরের অংশে হস্তক্ষেপ করা বৈধ হবে না। কোনো বস্তুতে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা অর্জিত হয় মালিকানা বা অভিভাবকত্বের (ওয়ালায়াহ) ভিত্তিতে। আর এখানে এক শরীকের অপরের অংশের ক্ষেত্রে না মালিকানা আছে, আর না আছে কোনো ধরনের অভিভাবকত্ব বা দায়িত্বশীলতা। যা ওয়াকালাত বা আত্মীয়তার ভিত্তিতে পাওয়া যায়। শারিকাতুল মিলক-এর ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো কিছু থাকে না। চাই শারিকাহ عين বা বস্তুর ক্ষেত্রে হোক অথবা دين বা ঋণের ক্ষেত্রে হোক।" [১১৫০]

মাজাল্লাতুল আহকামে উল্লেখ আছে-

كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر، ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر، فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في حصة الآخر بدون إذنه.

"মালিকানাভিত্তিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদার অপরের অংশে অপরিচিত ব্যক্তির মতো। একজনকে অপরের ওয়াকীল হিসেবে গণ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং একজন অপরের অংশে অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করা জায়েয হবে না।"[১১৫১]

'শারিকাতুল মিলক' এর এ বৈশিষ্ট্য চারো মাযহাবেই স্বীকৃত।[১১৫২] আলোচ্য অধ্যায়ে এটি একটি মৌলিক উসূল পর্যায়ের বিধান। এ 'আসল' (মূলনীতি) স্মরণ রাখলে নিম্নের আলোচনা বুঝতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

পূর্বে আমরা জেনেছি যে, মিরাছ বন্টনের পূর্বে শরীকী সম্পদ হিসেবে থাকে। তাহলে শরীকী সম্পদের বিধান অনুযায়ী মীরাছের ক্ষেত্রেও ওয়ারিছগণ একে অন্যের অংশের ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ তাদের মাঝে কোনো অংশীদারমূলক চুক্তি না থাকার কারণে

[১১৪৯] আল মাবসূত: ১১/১৫১, দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী

[১১৫০] বাদায়েউস সানায়ে: ৫/৮৭, মাকতাবয়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১১৫১] শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, খালেদ আতাসী, ধারা নং ১০৭৫, দুরারুল হুক্কাম, ৩/২৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[১১৫২] আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যা: ২৬/২২

বিনা অনুমতিতে একজন অপরের অংশে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। একজন অন্যের অংশে অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করলে তা 'অপরিচিত ব্যক্তির হস্তক্ষেপ' পরিগণিত হবে। সুতরাং ফিকহী পরিভাষায় 'অপরিচিত ব্যক্তির হস্তক্ষেপ' সংক্রান্ত বিধানাবলি এ অধ্যায়ের মূল 'নযির'। এর আলোকেই ফুকাহায়ে কেরাম আলোচ্যবিষয়ে সমাধান দিয়েছেন। মিরাছী সম্পদের জন্য ভিন্ন কোনো উসূল বা দলীল নেই।

আমরা জানি, 'অপরিচিত ব্যক্তির হস্তক্ষেপ' দু'ভাবে হয়ে থাকে- (ক) অনুমতি সহকারে (খ) অনুমতি ছাড়া। বলা বাহুল্য, উভয় অবস্থার উসূল ও আহকাম এক নয়; বরং এতে ভিন্নতা ও পার্থক্য রয়েছে। উত্তরাধিকার সম্পদেও এ পার্থক্য প্রযোজ্য হবে। কোনো একজন ওয়ারিছের হস্তক্ষেপ এবং তা থেকে অর্জিত মুনাফার বিধান সবক্ষেত্রে একই হবে না। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

ক. কোনো একজন ওয়ারিছ কর্তৃক অন্যদের অনুমতি সহকারে মিরাছ সম্পদ ব্যবহার করা

'শারিকাতুল মিলক'-এর ক্ষেত্রে কোনো একজন অংশীদার অন্যদের অনুমতি নিয়ে শরীকী সম্পদকে অংশীদারীর ভিত্তিতে ব্যবসা বা লাভজনক কোনো কাজে লাগাতে পারবে। অন্যরা অনুমতি দিলে বা তাদের মৌন সমর্থন থাকলে সে সবার পক্ষ থেকে ওয়াকীল সাব্যস্ত হবে।[১১৫৩] এ ব্যবসার লাভ-ক্ষতিতে সবাই অংশীদার হবে। অর্জিত মুনাফা মূল সম্পদের সাথে যোগ হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ হিস্যা অনুযায়ী লভ্যাংশ পাবে। শুধু একজনের পূর্ণ মুনাফা ভোগ করা জায়েয হবে না। কারণ, আমরা পূর্বেই বলেছি, মিরাছ শারিকাতুল মিলক' এর একটি প্রকার। সুতরাং মীরাছের ক্ষেত্রেও 'শারিকাতুল মিলক' এর উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে।

ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়্যার ভাষ্য থেকে প্রমাণ হয় যে, এ ধরনের মুনাফাতে অন্যরা অংশ পাওয়ার বিষয়ে মুফতীদের ঐকমত্য রয়েছে। ভাষ্যটি নিম্নরূপ-

وإذا مات الرجل وترك أولادا صغارا وكبارا وامرأة، والأولاد الكبار من هذه المرأة أو من امرأة أخرى لهذا الميت، فعمل الأولاد الكبار عمل الحراثة، وزرعوا في أرض مشتركة، أو في أرض الغير بطريق الكديوري كما هو المعتاد بين الناس، وهولاء الأولاد كلهم في عيال المرأة تتعاهد أحوالهم وهم يزرعون، يجمعون الغلات في بيت واحد وينفقون من ذلك جملة، فهذه الغلات تكون مشتركة بين المرأة والأولاد، أو يكون خاصة للمزارعين؟

فهذه المسألة صارت واقعة الفتوى، واتفقت الأجوبة أنهم إن زرعوا من بذر مشترك بينهم بإذن الباقين، إن كانوا كبارا، أو بإذن الوصي إن كان الباقون صغارا كانت الغلات كلها على الشركة.

وإن زرعوا من بذر أنفسهم كانت الغلات للمزارعين، وإن زرعوا من بذر مشترك بغير إذنهم أو بغير إذن الوصي فالغلات للمزارعين.

"এক ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় তার ছোট-বড় সন্তান এবং এক স্ত্রী ছিলো। বড় সন্তানরা এই স্ত্রীর হোক অথবা মৃত ব্যক্তির অন্য স্ত্রীর। বড় সন্তানরা পরিবারের যৌথ জমিতে অথবা ইজারা চুক্তির মাধ্যমে অন্যের জমিতে চাষাবাদ করলো। সকলেই ঐ মহিলার অধীনে এক পরিবারে

[১১৫৩] দুরারুল হুককাম: ১০/ ১৯-২০, ৫০

বসবাস করে এবং ফসল এক জায়গায় জমা করে সেখান থেকে খরচ করে। এখন এই ফসল কি সবার মাঝে যৌথ হবে নাকি শুধু চাষাবাদকারীদের হবে?
এটি একটি নবঘটিত মাসআলা। এ মাসআলার ক্ষেত্রে মুফতিয়ানে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে- যদি তারা যৌথ বীজ থেকে বড়দের অনুমতি আর ছোটদের অছির অনুমতিতে চাষাবাদ করে, তাহলে তা সকলের মাঝে যৌথ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি ব্যক্তিগত বীজের মাধ্যমে করে, তাহলে তা চাষাবাদকারীদের হবে। আর যদি বড়দের অনুমতি অথবা ছোটদের অছির অনুমতি ব্যতীত চাষাবাদ করে, তাহলেও তা চাষাবাদকরীদেরই হবে।"[১১৫৪]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. এর ভাষ্য মতে উল্লিখিত ফাতওয়াটি তাতারখানিয়্যা ছাড়া অন্য কিতাবেও আছে। তিনি রদ্দুল মুহতার-এ এ ফাতওয়াটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এভাবে উল্লেখ করেন-

(خاتمة بفرع مهم) يقع كثيرا ذكره في التتارخانية وغيرها...

"একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। যা তাতারখানিয়্যাহ ও অন্যান্য কিতাবে প্রায়শ উল্লেখ হয়ে থাকে।"[১১৫৫]

আল্লামা শামী রাহ. এ ফাতওয়াটিকে 'তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যা'তেও 'বিশেষ ফায়েদা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফাতওয়াটি উল্লেখের পর তিনি বলেন-

فاغتنم هذه الفائدة...

"এ ফায়েদাকে সবিশেষ গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করো।"[১১৫৬]

পরবর্তী মুফতিয়ানে কেরামও এ ফাতওয়ার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফাতাওয়ার কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে তা বুঝে আসে।

মাজাল্লাতুল আহকামেও মাসআলাটির উল্লেখ আছে-

إذا بذر بعض الورثة الحبوب المشتركة في الأراضي الموروثة بإذن الورثة الآخرين أو إذن وصيهم إذا كانوا صغارا فتكون الحاصلات مشتركة بينهم جميعا ولو بذر أحدهم حبوب نفسه فحاصلاتها له إلا أنه يكون ضامنا حصة الورثة في نقصان الأرض الناشئ عن زراعتها.

"যদি কোনো ওয়ারিছ যৌথ মীরাছি জমিতে অন্য ওয়ারিছদের অনুমতিক্রমে অথবা অন্য ওয়ারিছ ছোট হওয়ার কারণে তার অছির (অভিবাবকের) অনুমতিতে যৌথ বীজ বপন করে, তাহলে উৎপাদিত ফসল সকলের মাঝে বন্টন করতে হবে। আর যদি কোনো ওয়ারিছ ব্যক্তিগত তথা নিজস্ব বীজ বপন করে, তাহলে উৎপাদিত ফসল তারই হবে। তবে চাষাবাদের কারণে অন্যের অংশে যে ক্ষতি হলে, তার জরিমানা চাষাবাদকারীকেই বহন করতে হবে।"[১১৫৭]

প্রশ্নে উল্লিখিত হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ. (১৩৬২ হি:) এর ফাতওয়াতেও বিষয়টি এভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন-

---

[১১৫৪] ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়্যা: ১৭/৩৭৩-৩৭৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১১৫৫] রদ্দুল মুহতার: ৮/৪৫৯ كتاب المزارعة এর শেষে, এইচ. এম. সাঈদ, পাকিস্তান

[১১৫৬] তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ: ১/৯৪, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান

[১১৫৭] দুরারুল হুককাম, ধারা নং ১০৮৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

(৭) اگر یہ کام سب حصہ داروں کی رضامندی سے تھا تو نفع میں بھی سب شریک ہوں گے، اور اگر بعض ورثہ راضی نہ تھے تو نفع میں شریک نہ ہوں گے، البتہ یہ نفع بوجہ اس کہ مال غیر میں تصرف بلا اذن تھا جائز نہ ہو گا، بلکہ اس کا تصدق واجب ہو گا۔

"যদি এই কাজ সকল অংশীদারের অনুমতিতে হয়, তাহলে সবাই এর অংশ পাবে। আর যদি কোনো ওয়ারিছ রাজি না থাকে, তাহলে সে তাতে শরীক হবে না। তবে এই লাভ যেহেতু অনুমতি ব্যতীত অন্যের অংশে হস্তক্ষেপ ছিল, তাই তা বৈধ হবে না; বরং সাদকা করা ওয়াজিব।"[১১৫৮]

মোটকথা, আমরা বুঝতে পারলাম যে, অন্য ওয়ারিছদের অনুমতিতে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন হলে তাতে সবাই নিজ নিজ হিস্যা অনুযায়ী অংশ পাবে।[১১৫৯]

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মারা যাওয়ার পর সকল ওয়ারিছ একইসাথে ত্যাজ্য সম্পদে কারবার করে। এক্ষেত্রে যদিও সকলেই কাজে অংশগ্রহণ করে; তবে কাজের পরিমাণ কমবেশি হয়ে থাকে। এ অবস্থায় সবাই কাজে শরীক থাকায় অনুমতি এমনিতেই থাকে। তাই মুনাফার মাঝে সবাই অংশীদার হবে। যেমন, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

تنبيه: يؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت ولا التساوي ولا التمييز.

فأجاب بأنه بينهما سوية، وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا في العمل والرأي.

"... একজন মহিলার স্বামী ও তার সন্তান উভয়ে একই বাড়িতে থাকে। তারা প্রত্যেকে আলাদাভাবে রোজগার করে; তবে উভয়ই তাদের উপার্জিত অর্থ-সম্পদ এমনভাবে মিশ্রিত করে রাখে যে, কোনটি কার তাও জানা নেই এবং কার সম্পদ কী পরিমাণ তাও জানা নেই। ফাতওয়া খাইরিয়্যাহ-এর লেখক এ মাসআলার সমাধানে লিখেন- 'এক্ষেত্রে উপার্জিত সম্পদ উভয়ের মাঝে সমানভাবে ভাগ করা হবে। এমনিভাবে যদি কয়েকজন ভাই তাদের পিতার মিরাছ সম্পদে একসাথে কারবার করে তা বৃদ্ধি করে, তাহলে উক্ত সম্পদ তাদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করা হবে। যদিও তাদের কাজ এবং বিচক্ষণতার মাঝে পার্থক্য থাকে।"[১১৬০]

তিনি আরো বলেন-

يقع كثيرا في الفلاحين ونحوهم أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته بلا قسمة ويعملون فيها من حرث وزراعة وبيع وشراء واستدانة ونحو ذلك، وتارة يكون كبيرهم هو الذي يتولى مهماتهم ويعملون عنده بأمره، وكل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض، لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضياتها مع كون التركة أغلبها أو كلها عروضا لا تصح فيها شركة العقد، ولا شك أن هذه ليست شركة مفاوضة، خلافا لما

[১১৫৮] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৪/৩৪৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[১১৫৯] মাজাল্লাতুল আহকাম, ধারা নং ১০৭৩, ১৪০২, ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ: ১৩/ ৮০-৮১
[১১৬০] রদ্দুল মুহতার: ৬/৫০২, এইচ. এম. সাঈদ

أفتى به في زماننا من لا خبرة له، بل هي شركة ملك كما حررته في تنقيح الحامدية.

ثم رأيت التصريح به بعينه في فتاوى الحانوتي، فإذا كان سعيهم واحدا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم بعمله يكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا.

"কৃষক এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে অনেকক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে যে, কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তি বন্টন করা ব্যতীত সন্তানরা তাতে চাষাবাদ, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণের লেনদেন বা এ ধরনের অন্যান্য কাজ-কারবার করে থাকে। আবার কখনো কখনো বড় সন্তান তাদের কারবার তত্ত্বাবধান করে এবং অন্য সন্তানরা তার সাথে তার আদেশেই কাজ করে। এগুলো সবই পরস্পর অনুমতি ও দায়িত্ব প্রদানের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তারা (সন্তানরা) শারিকাতুল মুফাওয়াযাহ-এর কথা বলে না এবং তার শর্তসমূহও উল্লেখ করে না। আর এখানে ত্যাজ্য সম্পদ এমন ধরনের হয় যে, তাতে শারিকাতুল আকদ হওয়াও সম্ভব নয়।... বাস্তবে এটা শারিকাতুল, যেমনটি আমি 'তানকীহুল হামিদিয়্যাহ'-এ বিশ্লেষণ করেছি।

আমি 'ফাতাওয়ায়ে হানূতি'তে দেখেছি যে, হুবহু এ মাসআলার ক্ষেত্রে উক্ত সমাধানই প্রদান করা হয়েছে।

যদি তারা একসাথেই কাজ করে থাকে এবং তাদের আয় পৃথক পৃথক না থাকে, তাহলে সবাই যৌথভাবে উপার্জিত সম্পদের সমানভাবে অধিকারী হবে। যদিও কাজ এবং বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়।"[১১৬১]

এই মাসআলাগুলো থেকে উল্লিখিত মাসআলা সহজেই প্রতীয়মান হয়। এখানে سوية শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ سوية في الاستحقاق হবে; سوية في قدر الاستحقاق নয়। এ অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট উসূলের দাবিও এমন। মুফতী আজিজুর রহমান উসমানী রাহ. (১৩৪৭ হি.)[১১৬২] এর এক ফাতওয়াতেও এ ব্যাখ্যার উল্লেখ রয়েছে। (দ্র. ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ: ১৩/৬৪)[১১৬৩]

[১১৬১] রদ্দুল মুহতার: ৬/৪৭৭-৭৮, (এইচ. এম. সাঈদ)

[১১৬২] মুফতী আযীযুর রহমান ইবনে মাওলানা ফযলুর রহমান উসমানী, দেওবন্দী। ১২৭৫ হিজরীতে ভারতের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৪৭ হিজরীর জুমাদাল উখরায় দেওবন্দে ইন্তেকাল করেন। মাকবারায়ে কাসেমীতে তাকে সমাহিত করা হয়েছে। তিনি ১২৯৫ সালে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হন। হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতভী, শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রাহ. তাঁর উস্তাদ। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম মুফতী ছিলেন। প্রায় ৪০ বছর যাবত দারুল উলূম দেওবন্দের ইফতা বিভাগের প্রধান মুফতীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তার অনন্য দক্ষতা ছিল। তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রাহ.-এর খলীফা ছিলেন। (তারিখে দারুল উলূম দেওবন্দ: ২/৪৫-৪৮)

[১১৬৩] سوال: میرے والد مرحوم نے کسی قدر روپیہ میرے بھائی مرحوم کو دیا تھا، اور وہ اس سے روز گار کرتے تھے، اور میرے والد کوئی کام نہیں کرتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا عرض یہ ہے کہ جس قدر روپیہ میرے والد کا ہے، اور جس قدر میرے بھائی نے اس میں بڑھایا ہے ترکہ والد ہی کا شمار ہو گا یا اصل ان کا اور نفع میرے بھائی کا ہو گا؟ اور میرے والد نے اپنی حیات میں بار ہا میرے بھائی سے اپنا روپیہ طلب کیا تھا۔(۱۲۰۵ / ۳۲-۱۳۳۳ ھ)

الجواب: والد کے روپے سے جو کاروبار تجارت تمہارے بھائی نے کیا تھا وہ سب اصل مع نفع تمہارے والد کا ہے، سب ورثہ پر بقدر حصص تقسیم ہو گا۔

খ. অন্যান্য ওয়ারিছের অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা।

'শারিকাতুল মিলক' এর ক্ষেত্রে অনুমতি ব্যতীত অন্যের সম্পদে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে হস্তক্ষেপ করা ফিকহের পরিভাষায় 'গসব'[১১৬৪]-এর অন্তর্ভুক্ত, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। কুরআন ও হাদীসে এ ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[১১৬৫]

আল্লামা খাইরুদ্দীন রমলী রাহ. (১০৮১ হি.)[১১৬৬] আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن الآخر وإن كان مشتركا وهو حرام.

"কেননা এটা অন্যের মালিকানায় তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ। যদিও সম্পত্তি যৌথ হয়, তবুও তা নাজায়েয।"[১১৬৭]

আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, আলোচ্যবিষয়টি ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে গছবের অন্তর্ভুক্ত। গছবের বিধানাবলি এখানে অন্যতম 'নযির' হিসেবে বিবেচিত হবে। ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, গসবকৃত সম্পদ থেকে গসবকারীর চুক্তি ও শ্রমের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জন হবে তার বাহ্যিক মালিক সেই হবে। ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) বলেন,

رجل غصب عبدا أو دابة فآجره، وأصاب من غلته فالغلة للغاصب؛ لأن وجوبها بعقده، وقد بيناه في كتاب اللقطة، ولأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد، والعاقد هو الغاصب، فإذا هو الذي جعل منافع العبد بعقده مالا فكان بدله له. وفي الأصل قال: قلت: ولم لا يكون لصاحب العبد؟ قال: لأنه كان في ضمان غيره، وكأنه أشار بهذا التعليل إلى قوله ﷺ: «الخراج بالضمان» فحين كان في ضمان الغاصب فهو الذي التزم تسليمه بالعقد دون المالك فكان الأجر له دون المالك، ويؤمر أن يتصدق بها؛ لأنها حصلت له بكسب خبيث، فإن مات العبد فالغاصب ضامن بقيمته، وله أن يستعين بتلك الغلة في ضمان القيمة؛ لأنها ملكه، وما فضل بعد ذلك تصدق به اعتبارا للجزء بالكل.

"যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গোলাম অথবা সওয়ারি অপহরণ করে এবং তা ভাড়া দিয়ে লাভ করে, তাহলে লাভের মালিক অপহরণকারী হবে। কেননা সে এখানে লাভের মালিক হয়েছে ইজারা চুক্তির ভিত্তিতে। ... কিতাবুল আসলে উল্লেখ আছে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, গোলামের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদের মালিক গোলামের মালিক কেন হবে না? তিনি উত্তরে বললেন, যেহেতু গোলাম তার মালিক ব্যতীত অন্য ব্যক্তির (অপহরণকারীর) হেফাযত এবং রিস্কে ছিলো, তাই মুনাফার মালিক অপহরণকারীই হবে, মূল মালিক নয়। ইমাম মুহাম্মদ রাহ. উল্লিখিত বিধানের যে কারণ বর্ণনা করলেন তা হাদীস থেকে প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো বস্তুর লাভের অধিকারী সেই হবে যে তার রিস্ক বা ক্ষতির দায়ভার বহন করবে। সুতরাং

[১১৬৪] আত্মসাৎ ও জবরদখল।

[১১৬৫] সূরা নিসা: ২৯

[১১৬৬] খয়রুদ্দীন ইবনে আহমদ ইবনে আলী আল আইয়ুবী, আলফারুকী, আররামালী, আলহানাফী। তিনি ৯৯৩ হিজরীর রমযান মাসে ফিলিস্তিনের রমলা শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭শে রমজান ১০৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ফিলিস্তিনের প্রসিদ্ধ ফকীহ ছিলেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে 'আল ফাতাওয়াল খায়রিয়্যাহ', 'নুযহাতুন্নওয়াযির আলাল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের' অন্যতম। (আল আ'লাম লিযযিরিকলী: ২/৩২৭)

[১১৬৭] তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ: ১/৯২, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান

গোলামটি যেহেতু অপহরণকারীর রিস্কে ছিলো এবং ইজারা চুক্তির কারণে গোলামটি ভাড়াটিয়ার কাছে হস্তান্তর করার দায়িত্বও ছিলো তার উপর, তাই এর ভাড়াও সেই পাবে; মালিক পাবে না। তবে সে ভাড়া থেকে উপার্জিত অর্থ সাদকা করবে। কারণ, সে তা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে...।[১১৬৮]

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা'তে উল্লেখ করা হয়েছে-

عن شريكين جنّ أحدهما وعمل الآخر بالمال حتى ربح أو وضع قال الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون عليه فإذا قضى ذلك يتفسخ الشركة بينهما، فإذا عمل بالمال بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب بمال المجنون، فيتطيب له من الربح حصة ماله ولا يتطيب له من مال المجنون فيتصدق به كذا في المحيط. قال الشامي: وفي القهستاني وله ان يؤديه إلى المالك ويحل له التناول لزوال الخبث.

"দুইজন শরীকের একজন পাগল হওয়ার পর অপর জন যৌথ সম্পদ দ্বারা ব্যবসা করে লাভবান হলো অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এক্ষেত্রে সে পরিপূর্ণ মাত্রায় পাগল না হওয়া পর্যন্ত তাদের মাঝে চুক্তি বহাল থাকবে। সুতরাং যদি তাকে পাগল হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়, তাহলে তাদের শেয়ার চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এর পর যদি অপর অংশীদার উক্ত সম্পদে ব্যবসায়িক কারবার করে তাহলে এর লাভ-ক্ষতি পুরোটাই তার হবে এবং সে পাগলের সম্পদের ক্ষেত্রে আত্মসাৎকারী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তার অংশের লাভ তার জন্য বৈধ হবে; কিন্তু তবে পাগলের অংশের লাভ তার জন্য বৈধ হবে না। তাই তা সাদকা করতে হবে।"[১১৬৯]

উত্তরাধিকার সম্পদের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য। অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করে মুনাফা অর্জন করলে হস্তক্ষেপকারী অন্যদের অংশের মুনাফার বাহ্যিক মালিক হবে। তবে **সে তা ভোগ করতে পারবে না।**[১১৭০] অবশ্য নিজের অংশের পরিমাণ মুনাফার সে প্রকৃত মালিক হবে এবং তা ভোগও করতে পারবে। কারণ সে তার অংশের ক্ষেত্রে গাসিব[১১৭১] সাব্যস্ত হবে না। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

সে অন্যদের অংশের মুনাফার মালিক হবে এ মর্মে সিদ্ধান্ত প্রশ্নে বর্ণিত ৫নং দলীলে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা-

(৫) ... مثلا لو أخذ أحد الورثة من تركة مورثه بدون إذنه مائة دينار وباع واشترى بها، فربح خمسين دينارا فتكون الخمسون دينارا له، وليس للورثة الآخرين الاشتراك فى هذا الربح، ويكون ذلك الوارث ضامنا للورثة حصصهم في رأس المال، كما أنّه لو خسر في البيع والشراء تلك المائة الدينار كلا أو بعضا فيعود الخسار المذكور عليه ويضمن حصص الورثة الآخرين.

"...যদি কোনো ওয়ারিছ মীরাছি সম্পদ থেকে অনুমতি ব্যতীত একশ দিনার নেয় এবং তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করে পাঁচশ দিনার লাভ করে, তাহলে পাঁচশ দিনারের মালিক সেই হবে। অন্যান্য ওয়ারিছরা এই লাভের মধ্যে শরীক হবে না। তবে ঐ ওয়ারিছ মূল সম্পদের ক্ষেত্রে অন্যদের

[১১৬৮] আল মাবসূত ১১/৭৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ
[১১৬৯] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ২/৩৪৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[১১৭০] কারণ, সে প্রকৃত মালিক নয়। বিস্তারিত সামনে আসছে।
[১১৭১] আত্মসাৎকারী।

অংশের যামিন হবে। যেমন, সে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঐ একশ দিনার পুরোটা বা কিছু ক্ষতি করলে তার পুরো দায় তাকেই বহন করতে হতো।"[১১৭২]

উপরোল্লিখিত বিধান ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়্যা ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মাজাল্লাতুল আহকামেও একই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। আল্লামা মুহাম্মদ খালেদ আল আতাসী রাহ. (১৩২৬ হি.)[১১৭৩] মাজাল্লার 'শারিকাতুল মিলক' সংক্রান্ত ১০৭৭ নং মাদ্দা (ধারা)-র ব্যাখ্যায় সুন্দরই বলেছেন। মাদ্দা ও তার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

(أحد الشريكين إذا آجر لآخر المال المشترك وقبض الأجرة يعطي الآخر حصته منها) – قال المفتي الأتاسي – يعني ديانة، وإن كانت الأجرة المسماة تجب قضاء للعاقد، لأن المنفعة قد تقومت بعقده فكانت له.

"(মাজাল্লা'র ভাষ্য) দুই শরীকের কোনো একজন যদি যৌথ সম্পদ অন্য কাউকে ভাড়া দিয়ে দেয় এবং ভাড়ার অর্থ হস্তগত করে, তাহলে অপর শরীককে তার অংশ পরিমাণ ভাড়া দিয়ে দিতে হবে।

মুফতী আতাসী রাহ. ব্যাখ্যায় বলেন, এটা দিয়ানাত তথা ঔচিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে চুক্তিকারীই ঐ ভাড়ার মালিক হবে। কারণ, ভাড়া-চুক্তির মাধ্যমেই সম্পদের উপযোগ বা উপকারিতার মূল্য সৃষ্টি হয়।"[১১৭৪]

এখানে এ কয়েকটি দলীল উল্লেখ করা হলো। এছাড়া আরো অনেক দলীল ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে রয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, অনুমতি ছাড়া শরীকী মিরাছ সম্পত্তি ব্যবসায়িক কাজে লাগালে অর্জিত মুনাফার বাহ্যিক মালিক সেই হবে। তবে সে তা ভোগ করতে পারবে কিনা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

পূর্বের আলোচনা স্মরণ থাকলে প্রশ্নে উল্লিখিত ছয় নং দলীলের ব্যাখ্যা বোঝা আমাদের জন্য সহজ হবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে প্রয়োজনীয় আলোচনা তুলে ধরা হলো। ব্যাখ্যার আলোচনার পূর্বে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়:

এক. ফিকহ ও ফাতওয়ার সাথে সম্পৃক্ত আলেমের কাছে অজানা নয় যে, ফুকাহায়ে কেরাম মাসআলা বর্ণনা করার সময় কখনো আলোচ্য মাসআলার সব দিক ও সকল শর্ত এক স্থানেই উল্লেখ করেন, আবার কখনো উল্লেখ করেন না; বরং এক দিক এক স্থানে উল্লেখ করলে অন্য স্থানে অন্য দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কখনো শর্তসহ উল্লেখ করেন, কখনো শর্ত উহ্য রেখে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করলেও ব্যাপকতা উদ্দেশ্য হয় না; বরং শর্ত উহ্য থাকে। বিশেষ করে মুখতাসার কিতাবগুলোতে। এক্ষেত্রে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত শর্তসহই দিতে হয়। উসূলে ইফতার কিতাবেও এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সুতরাং কোনো বিষয়ে শর্তসহ বিস্তারিত নস থাকলে সেটাই অগ্রগণ্য হবে। এর বিপরীত ব্যাপকার্থবোধক নস

[১১৭২] দুরারুল হুককাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম: ১০/৫০, ধারা নং ১০৯০

[১১৭৩] খালেদ আফেন্দী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সাত্তার আলআতাসী, আশশামী, আলহানাফী। তিনি ১২৫৩ হিজরীতে সিরিয়ার হিমস শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৬ হিজরীর শাবান মাসে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি হিমসের বিখ্যাত 'আতাসী' বংশধর ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ যুগ যুগ ধরে হিমসের গ্রান্ড মুফতীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ১৮৭৯ ঈসায়ীতে হিমসের গ্রান্ড মুফতী নিযুক্ত হন। রচনা জগতে 'শরহু মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ' তাঁর অমর কীর্তি। (আল আ'লাম লিয যিরিকলী: ২/২৯৮)

[১১৭৪] শারহু মাজাল্লাতুল আহকাম, খালেদ আতাসী: ৪/২০

দিয়ে ফাতওয়া দেয়া যাবে না।
আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. (৯৭০ হি.) আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত উসূলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন-

ومن هنا يعلم أن فهم المسائل على وجه التحقيق يحتاج إلى معرفة أصلين:

أحدهما: أن إطلاقات الفقهاء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم المستقيم الممارس للأصول والفروع، وإنما يسكتون عنها اعتمادا على صحة فهم الطالب.

والثاني: أن هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنى لا يعرف الحكم فيها على الوجه التام إلا بمعرفة وجه الحكم الذي بني عليه وتفرع عنه، وإلا فتشتبه المسائل على الطالب ويحار ذهنه فيها لعدم معرفة الوجه والمبنى. ومن أهمل ما ذكرناه حار في الخطأ والغلط، وإذا عرفت هذا ظهر لك ضعف من يقول في عصرنا....

"এখান থেকে জানা যায় যে, যথাযথভাবে মাসআলা বোঝার জন্য দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী। তা হলো-

এক. ফুকাহায়ে কেরামের ব্যাপকার্থবোধক নসগুলোর অধিকাংশই শর্তযুক্ত হয়ে থাকে (অর্থাৎ, তা বাহ্যিকভাবে ব্যাপক হলেও তাতে শর্ত বা অনুষঙ্গ উহ্য থাকে, যার ভিত্তিতে তার ব্যাপকতা কমে যায়)। যা মৌলিক ও শাখাগত মাসাইলে পারদর্শী সঠিক বুঝমান ব্যক্তিই অনুধাবন করতে সক্ষম। ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত তালিবে ইলমের বুঝের উপর নির্ভর করে এ সকল অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন না।

দুই. এ সকল ইজতেহাদী মাসআলা মূলত মানাত বা কারণ নির্ভশীল হয়ে থাকে। মানাতের উপর মাসআলার বিধানের ভিত্তি বা যে মূল থেকে মাসআলাটি উৎপত্তি লাভ করেছে, তা সামনে না রাখলে যথাযথভাবে হুকুম/বিধান বোঝা সম্ভব হবে না। মানাত না জানার কারণে তালিবে ইলমের নিকট মাসআলা অস্পষ্ট থেকে যায় এবং তারা মাসআলাগুলো অনুধাবন করতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যায়। বিষয়টি যে উপেক্ষা করবে সে ভুল-ভ্রান্তিতে পতিত হয়ে দিশেহারা হবে।..."[১১৭৫]

এমনকি 'মুতুন' পর্যায়ের কিতাবগুলোতেও অনেকক্ষেত্রে শর্ত ও কুয়দ উহ্য থাকে। অথচ মুতুনের ক্ষেত্রে ফকীহগণ শর্ত ও কুয়দ উল্লেখের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন।
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. এক প্রসঙ্গে বলেন-

(قوله ولتحفظ هذه القيود) أي المذكورة في قوله: ولا يسهم لغير فرس واحد صحيح كبير صالح للقتال، كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى، وأصل ذلك للمصنف، فإنه بعد أن قيد المتن بقوله: صالح للقتال قال: إن صاحب الكنز وغيره من أصحاب المتون أخل بما ذكرنا من القيد، وإن العجب من أصحاب المتون! فإنهم يتركون في متونهم قيودا لا بد منها، وهي موضوعة لنقل المذهب، فيظن من يقف على مسائله الإطلاق، فيجري الحكم على إطلاقه وهو مقيد، فيرتكب الخطأ في كثير من الأحكام في الإفتاء والقضاء. اهـ.

[১১৭৫] আল বাহরুর রায়িক: ১/১৩৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

فافهم.[১১৭৬]

"এ ক্বয়দগুলো মুখস্ত রাখা জরুরী।.... কানযুদ্দাকায়েক এবং অন্যান্য মুতুনের লেখক এ ক্বয়দ উল্লেখ করেননি। মুতুন গ্রন্থকারদের প্রতি আশ্চর্য হয়! তারা অনেক অপরিহার্য ক্বয়দ বা অনুষঙ্গ উপেক্ষা করেন। অথচ মুতুনের কিতাব মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফাতওয়া সংকলনের জন্যই। তাঁদের এ নীতির (প্রয়োজনীয় ক্বয়দ অনেক ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া) কারণে অনেকে মনে করে, মাসআলা ব্যাপক (তাতে শর্ত ইত্যাদি উহ্য নেই)। এভাবে অনেকে ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এবং ফয়সালা করার ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে পতিত হয়।"

দুই. এ অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত ফিকহী দলীলগুলোতে নিম্নের তিনটি বিষয় উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দেখা দিতে পারে।

১. অনুমতিবিহীন হস্তক্ষেপের পর অর্জিত মুনাফার মালিক কে হবে?

২. এভাবে মালিক হওয়া সম্পদ কি ভোগ করা যায়?

৩. অনুমতি উল্লেখ থাকা বা না থাকা।

ফিকহী ভাষ্যগুলোতে এই তিনটি বিষয় উল্লেখ করার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। কখনো বিষয়গুলি এক সাথে উল্লেখ হয়েছে, কখনোবা ভিন ভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। উপরে উল্লিখিত দলীলগুলো দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

কোনো কোনো ইবারতে তৃতীয় বিষয়টি উল্লেখ হয়নি। অথচ এটি এ অধ্যায়ের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। ফিকহের কিতাবে এমনটি আশ্চর্যের কিছু না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সাধারণত এরকম হয়েই থাকে। তাই উল্লেখ করা না হলেও ফুকাহায়ে কেরাম উহ্য মেনেই ব্যাখ্যা করে থাকেন। যেমন, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২ হি.) বলেন-

ونقل المؤلف عن الفتاوى الرحيمية: سئل عن مال مشترك بين أيتام وأمهم، استربحه الوصي للأيتام هل تستحق الأم ربح نصيبها أو لا؟ أجاب: لا تستحق الأم شيئا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال مشترك لنفسه فقط، ويكون ربح نصيبها كسبا خبيثا ومثله سبيله التصدق على الفقراء.

"ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ থেকে গ্রন্থকার (আল্লামা হাসকাফী) উল্লেখ কারেন- তাঁকে এ মাসআলার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, এতিম সন্তান এবং তাদের মায়ের মাঝে যৌথ সম্পদ আছে। এতিমদের অছি (অভিবাবক) কারবার করে সে সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। এক্ষেত্রে মা তার অংশের লভ্যাংশ পাবে কি? তিনি উত্তর দিলেন, এতিমদের অংশে জন্য অছি যে লাভ করবে মা তাতে কোনো অংশ পাবে না। যেমন, দুইজন অংশীদারের কেউ যৌথ সম্পদ থেকে নিজের জন্য কিছু লাভ করলো, তাহলে অপর অংশীদার এই লাভের ভাগী হবে না। আর মায়ের অংশে অছি যা লাভ করেছে, তা হারাম উপার্জন বলে বিবেচিত হবে।[১১৭৭] এ ধরনের সম্পদ সাদকা করা আবশ্যক।"[১১৭৮]

[১১৭৬] রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল জিহাদ: فصل في كيفية القسمة

[১১৭৭] কারণ, এতিমদের অছি তাদের মা থেকে অনুমতি নেয়নি।

[১১৭৮] তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ: ১/৯৪, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান

লক্ষ করুন, এ ফাতওয়ার কোথাও অনুমতি না নেয়ার কথা উল্লেখ নেই; কিন্তু উহ্য আছে। তাই আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২ হি.) এ ফাতওয়া উল্লেখ করে বলেছেন-

ويظهر من هذا ومما قبله حكم ما لو كان المباشر للعمل والسعي بعض الورثة بلا وصاية أو وكالة من الباقين.

"কোনো ওয়ারিছ নিজেই যদি অন্য ওয়ারিছদের পক্ষ থেকে অভিবাবক বা ওয়াকীল হওয়া ব্যতীত ত্যাজ্য সম্পদে কোনো কারবার করে, তাহলে তার বিধান কী হবে- তা এখান থেকে এবং এর পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝে আসে। "[১১৭৯]

এরকম একটি বিধানের ক্ষেত্রে মাজাল্লাতুল আহকামেও অনুমতি না থাকার শর্ত উহ্য রাখা হয়েছে যেমন:

لو آجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة، يعطي الآخر حصته منها.

"দুইজন শরীকের কোনো একজন যদি যৌথ সম্পদ ভাড়া দিয়ে ভাড়া গ্রহণ করে, তাহলে ভাড়াদানকারী শরীককে তার অংশ দিয়ে দিবে।"[১১৮০]

লক্ষ করুন, এ মাদ্দা'য় অনুমতির বিষয়ে কোনো কথাই উল্লেখ করা হয়নি, অথচ অনুমতি না থাকার শর্ত এখানে উহ্য রয়েছে। তাই মাজাল্লার ব্যাখ্যাকার আল্লামা আলী হায়দার রাহ. (১৩৫৩ হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন-

لو آجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر بلا إذن الشريك، وقبض الأجرة فيعطى شريكه الآخر حصة من بدل الإيجار ويردها إليه، ويشارك الشريك الآخر المؤجر في بدل الإيجار بنسبة حصته في المال المشترك.

"যদি দুইজন শরীকের কোনো একজন যৌথ সম্পদ ভাড়া দিয়ে ভাড়া গ্রহণ করে, তাহলে অপর শরীককে তার অংশের পরিমাণ ভাড়া প্রদান করতে হবে। যৌথ সম্পদে শরীকের অংশ অনুপাতে ভাড়ায় সে অংশীদার হবে।"[১১৮১]

আমরা দেখলাম যে, অনুমতি থাকা না থাকার শর্তকে আলোচ্যমাসআলায় মূল 'মানাত' বা কেন্দ্রীয় বিষয় বলা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও ফুকাহায়ে কেরাম এ শর্ত উল্লেখ করা সর্বক্ষেত্রে আবশ্যক মনে করেননি; বরং পূর্বাপর আলোচনা ও উসূলের উপর ভিত্তি করে কখনো কখনো তা উহ্য রেখেছেন। এমন উদাহরণ ফিকহের কিতাবে কম নয়। প্রশ্নে বর্ণিত ৬ নং দলীলও এর একটি উদাহরণ। এখানেও অনুমতি না থাকার কথা উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন, হিন্দিয়্যার ইবারতে আছে-

(٦) لو تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة وربح، فالربح للمتصرف وحده.

"যদি কোনো ওয়ারিছ যৌথ ত্যাজ্য সম্পদে কারবার করে লাভবান হয়, তাহলে লাভ কারবারকারী একাই পাবে।"[১১৮২]

এ নসটিতেও বিষয়টি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১১৮৩] এখানেও অনুমতি না নেয়ার ক্বয়দ

[১১৭৯] তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ: ১/৯৪, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান

[১১৮০] মাজাল্লাতুল আহকাম, খালেদ আতাসী: ৩/৩০, ধারা নং ১০৭৭

[১১৮১] দুরারুল হুক্কাম: ৩/৩০, ধারা নং ১০৭৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[১১৮২] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ২/৩৪৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১১৮৩] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাতে এ ভাষ্যটি 'ফাতাওয়ায়ে গিয়াছিয়্যা' থেকে উল্লেখ করা হয়েছ। আমাদের কাছে

উহ্য আছে। বিভিন্ন আলামত থেকে এটাই প্রমাণিত হয়। যেমন-

১. এ দলীলটি মুতলাক বা ব্যাপকার্থবোধক। মুতলাক হিসেবেই যদি এর উদ্দেশ্য নেয়া হয় তাহলে উপরোল্লিখিত উসূল ও দলীলের সাথে সংঘর্ষ হয়ে যায়। এছাড়া মুফতিয়ানে কেরামের ইজমা'য়ী ফাতওয়ারও খেলাফ হয়। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, এখানে অনুমতি না নেয়ার শর্ত উহ্য রয়েছে।

২. টীকায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, ইবারতটি 'আল মুনতাক্বা' অথবা 'ফাতাওয়ায়ে ছা'ঈদ' থেকে নেয়া হয়েছে। তবে আমরা 'আল মুনতাক্বার উদ্ধৃতিতে ইবারতটি পাইনি; বরং 'ফাতাওয়ায়ে ছা'ঈদ'-এর উদ্ধৃতিতে পেয়েছি।

হাকেম শহীদ রাহ. (৩৩৪ হি.)[১১৮৪]-এর 'আল মুনতাক্বা' কিতাবটি ফিকহের একটি মুখতাসার কিতাব। তিনি এতে একাধিক কিতাব থেকে সংক্ষেপ করে মাসাইল উল্লেখ করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই সংক্ষেপ করতে গিয়ে অনেক কথা বিয়োজন করা হয়েছে। যেমন, আল্লামা মুস্তফা হাজী খলীফা রাহ. (১০৬৮ হি.)[১১৮৫] 'আল মুনতাক্বা' সম্বন্ধে বলেন-

---

'গিয়াছিয়্যা'র মাতবা'আয়ে আমীরিয়া থেকে প্রকাশিত নুসখা রয়েছে। তার ১২৭ নং পৃষ্ঠায় মাসআলাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা দাউদ ইবনে ইউসুফ আল খতীব রাহ. তার 'ফাতাওয়ায়ে গিয়াছিয়্যা'তে এ ইবারতের শুরুতে (م) লিখেছেন। এর অর্থ, তিনি আল মুনতাক্বা কিতাব থেকে উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করেছেন। যেমনটি তিনি ভূমিকায় বলেছেন। আমাদের কাছে আল মুনতাক্বার মূল নুসখা না থাকলেও আল্লামা আবু ইয়াকুব রাহ. এর 'খিযানাতুল আকমাল' কিতাব রয়েছে। আর 'খিযানাতুল আকমাল'-এ লেখক অন্যান্য কিতাবের সাথে 'আল মুনতাক্বা'ও সন্নিবেশিত করেছেন। 'খিযানাতুল আকমাল' এর 'আল মুনতাক্বা'র অংশটি আমরা দেখেছি। তাতে উক্ত আল মুনতাক্বার ইবারত পাওয়া যায়নি।

তবে 'খিযানাতুল আকমাল'-এ সন্নিবেশিত আরেকটি কিতাব فتاوی صاعد-এর উদ্ধৃতিতে 'খিযানা'র সংকলক ইবারতটি উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি আরেকটি নসের ক্ষেত্রেও এমন হয়েছে যে, তা 'গিয়াছিয়্যাহ'- এ আল মুনতাক্বার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু 'খিযানাতুল আকমাল-এ তা فتاوی صاعد-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ফাতাওয়া গিয়াছিয়্যাহ- এর উৎস গ্রন্থসমূহের তালিকায় فتاوی صاعد -ও রয়েছে। গিয়াছিয়্যা'র সংকলক فتاوی صاعد-র চিহ্ন হিসেবে উদ্ধৃতির পূর্বে (د) বর্ণ উল্লেখ করে থাকেন।

সার্বিক বিবেচনায় এখানে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে-

ক. 'আল মুনতাক্বা'র অন্য কোনো নুসখায় ইবারতটি রয়েছে; যদিও 'খিযানাতুল আকমাল'-এ যে নুসখা সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে ইবারতটি নেই।

খ. 'গিয়াছিয়্যা'র সংকলক মূলত ইবারতটি فتاوی صاعد -থেকে এনেছেন এবং চিহ্ন হিসেবে তার পূর্বে (د) বর্ণ উল্লেখ করেছেন। তবে কোনো লিপিকার দৃষ্টিভ্রমের কারণে (د) চিহ্নটিকে (م) ধারণা করে (د) এর স্থানে (م) লিখে দিয়েছেন। কারণ, (د) চিহ্নটি উল্টিয়ে দিলেই তা (م) সদৃশ হয়ে যায়। আর পরবর্তী লিপিকারগণ এ ভুলের অনুসরণ করেছেন।

[১১৮৪] আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আলমারওয়াযী, আলবলখী, আলকাযী, আলওয়াযীর, আলহানাফী। তিনি হাকেম শহীদ নামে প্রসিদ্ধ। ৩৩৪ হিজরীতে রবিউস সানীতে 'রায়' শহরে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি বুখারার বিচারপতি ও পরবর্তীতে খুরাসানের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। মুস্তাদরাকে হাকিমের গ্রন্থকার আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী রাহ. তাঁরই ছাত্র। ফিকহে হানাফীতে ইমাম মুহাম্মদ গ্রন্থের পর তাঁর গ্রন্থে 'আল কাফী' ও 'আল মুনতাকা'-এর অবদান সর্বজনস্বীকৃত। (আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ: ১৮৪, হাদিয়াতুল আরেফীন: ৬/৩৭)

[১১৮৫] মুস্তফা ইবনে আব্দুল্লাহ হাজী খলীফা, আররুমী, আল হানাফী। তিনি 'হাজী খলীফা' নামে ও 'মোল্লা কাতেব

وفيه نوادر من المذهب، ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصار. كذا قال بعض العلماء. وقال الحاكم: نظرت في ثلاث مأة جزء (مؤلف) مثل الأمالى والنوادر حتى انتقيت كتاب المنتقى...... أنه لما رأى في كتب محمد مكررات وتطويلات جنَّسها و حذف مكررها، فرأى محمدا في منامه، وقال: لم فعلتَ هذا بكتبي؟ فقال: لأن الفقهاء كسالى فحذفت المكرر وذكرت المقرر تشهيرا...[১১৮৬]

সাধারণত মুখতাসার কিতাবে এমনটিই হয়। সুতরাং এখানে কোনো শর্ত উহ্য থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

আর যদি ইবারতটি ফাতাওয়ায়ে ছাইদ- এর হয়ে থাকে, তাহলেও ইবারতটি মুখতাসার (সংক্ষেপিত) এবং উল্লিখিত দলীল ও উসূলের খেলাফ হওয়ার কারণে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ।

৩. ইমদাদুল আহকাম থেকেও বুঝা যায় যে, আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. (১৩৬৪ হি.) অনুমতি না থাকার শর্ত ধরেই দলীলটির ব্যাখ্যা করেছেন। তার সত্যায়িত একটি ফাতওয়ায় এমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

سوال: وراثت کا روپیہ قبل تقسیم ہونے کے کسی شریک نے بلا اطلاع دوسرے شریک کے کسی کو مضاربت پر دے دیا اور مضارب نے اس میں کچھ تصرف کیا۔ مال خرید کر بیچا اور نفع بھی ہو گیا تو یہ مضاربت صحیح ہوئی یا نہیں اور جو نفع ہوا ہے مضارب اس میں سے نصف نفع مقررہ لینے کا مستحق ہے یا نہیں؟

جواب: جس شریک نے مضاربت پر روپیہ دیا ہے نفع مقررہ اس کی ملک تو ہو گیا لیکن اس میں سے فقط اپنے حصہ وراثت کے مطابق اس کو حلال ہے اور باقی نفع خبیث ہے اس لئے دوسرے ورثاء کو بقدر ان کے حصص دے دے یا محتاجوں کو دے دے۔

كما في العالمكيرية: لو تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة وربح فالربح كله للمتصرف وحده، كذا في الغياثية.

وفيه أيضا بعد أسطر: سئل أبو بكر عن شريكين جن أحدهما وعمل الآخر بالمال حتى ربح أو وضع، قال: الشركة بينهما قائمة إلى أن يتم إطباق الجنون عليه، فإذا قضى ذلك تنفسخ الشركة بينهما، فإذا عمل بالمال بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه وهو كالغصب لمال المجنون فيطيب له من الربح حصة ماله، ولا يطيب له من مال المجنون، فيتصدق به، كذا في المحيط.

قال الشامي: وفي القهستاني وله أن يؤديه إلى المالك ويحل له التناول لزوال الخبث.(٢/ ٣٤٤)

اور مضارب کے لئے بھی یہی حکم ہو گا کہ کل نفع مقررہ اس کی ملک ہے لیکن جس شریک نے اس سے عقد مضاربت کیا ہے

চালাপী' নামে প্রসিদ্ধ। ১০১০ হিজরীতে কুস্তুন্তুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল)-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৬৭ হিজরীতে ইস্তাম্বুলে ইন্তেকাল করেন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ও ইতিহাসবেত্তা। তাঁর রচিত "কাশফুয যুনুন আন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনুন" গ্রন্থ তালিকা ও পরিচিতি সংক্রান্ত একটি অনন্য বিশ্বকোষ, যা এক্ষেত্রে রেফারেন্স বুক হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত। (আল আ'লাম লিয যিরিকলী: ৭/২৩৬)

[১১৮৬] কাশফুয যুনুন: ১:১৮৫১-১৮৫২

اس کے حصہ کے موافق حلال ہے اور زائد حلال نہیں بلکہ دوسرے شرکاء کو دے یا فقراء کو دے دے. وهذا هو مقتضى القواعد، ولم أره صريحا. والله أعلم.[১১৮৭]

এ সকল আলামত ও প্রমাণ থেকে মোটামোটি নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, ‘গিয়াছিয়্যা’র এ দলীলে অনুমতি না থাকার শর্ত উহ্য রয়েছে। ‘ফাতাওয়ায়ে যখীরা’র ইবারতের ব্যাখ্যাও হবে অনুরূপ। যখীরা’র ইবারতটি নিম্নরূপ-

رجل مات وترك الورثة فتصرف أحد الورثة في المال فتزايد المال فالقاضي يقسم أصل المال على فرائض الله تعالى، لا فرعه.

“একজন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার ওয়ারিছদের কেউ ত্যাজ্য সম্পদে হস্তক্ষেপ করলো এবং তা বৃদ্ধি করলো। এক্ষেত্রে লভ্যাংশ ব্যতীত মূল সম্পদ ফারায়েযের নিয়ম অনুযায়ী বন্টন করে দিবে।”[১১৮৮]

‘যখীরা’র এ নসটিও অনেক ব্যাপক। এখানেও অনুমতি না নেয়ার শর্ত উহ্য আছে। ‘গিয়াছিয়্যা’র নসের ক্ষেত্রে যে আলোচনা করা হয়েছে তা এখানেও প্রযোজ্য হবে।

মোটকথা, ‘গিয়াছিয়্যা’ ও ‘যখীরা’র উল্লিখিত দলীলদ্বয়ের ভাষ্য ব্যাপক। তাতে অনুমতি না নেয়ার শর্ত উহ্য রয়েছে। অন্যান্য দলীল ও ফাতওয়া থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য হবে না। (কাযীর জন্য এমন ফয়সালা দেয়ার সুযোগ রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে)

আশা করি, উপরোক্ত আলোচনা থেকে ‘গিয়াছিয়্যা’ ও ‘যখীরা’র ইবারতের সঠিক ব্যাখ্যা পরিষ্কার হয়েছে। কেউ কেউ ইবারতদ্বয়কে ব্যাপক মনে করে ব্যাপকভাবে ফাতওয়া দিয়েছেন। যারা এভাবে ফাতওয়া দিয়েছেন, তারা এ দুই ইবারত ছাড়া অন্য কোনো পরিষ্কার দলীলও উল্লেখ করেননি। অথচ এর বিপরীত ফিকহের কিতাবে একাধিক দলীল রয়েছে যার কিছু অংশ আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। এভাবে ব্যাপক অর্থ নিয়ে- অর্থাৎ, অনুমতি থাক বা না থাক উভয় অবস্থায় মুনাফার মালিক শুধু ব্যবহাকারী হবে- এমন ফাতওয়া উল্লিখিত দলীল ও উসূলের আলোকে আপত্তিকর এবং পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। যেমন মুফতী সালমান মানসূরপুরী সাহেব হাফিযাহুল্লাহর একটি ফাতওয়ায় এমনটি উল্লেখ রয়েছে:

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین وم فتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کا بڑا بیٹا کاروبار کے لئے زید کے ساتھ محنت کرتا تھا، زید کی چھوٹی اولاد اسکول میں تعلیم حاصل کرتی تھی، بعض اولاد سرکاری ملازمت[میں] لگ گئی، بعض نے کوئی ہنر سیکھا اور اپنا الگ کاروبار کیا، زید کی وفات کے وقت زید کا یہ کاروبار مختصر تھا، بڑا بیٹا محنت کرتا رہا، کاروبار میں ترقی ہوتی رہی اور کاروبار بہت بڑا ہو گیا۔ اس کاروبار سے بڑے بیٹے نے زید کے رہائشی کچے مکان کو پختہ بلڈنگ بنوایا، نیز اپنے نام پر کچھ زمین، کھیت مکان خریدا، زید کا ترکہ وارثوں میں تقسیم کرنا ہے، زید نے جس حالت میں مکان اور کاروبار چھوڑا تھا، اس کا اعتبار ہوگا یا موجودہ بلڈنگ اور جو کچھ جائداد بڑے بیٹے نے اپنے نام پر خریدا ہے۔ موجودہ کاروبار

[১১৮৭] ইমদাদুল আহকাম: ৩/৩৩৫, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান
[১১৮৮] যখীরা: আহসানুল ফাতাওয়া ৯/২৮৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

سمیت یہ سب جائداد زید کے ترکہ میں شامل ہوگی، اور دوسری اولاد نے اپنی ملازمت اور ہنر کے ذریعہ جو کچھ الگ جمع کیا ہے، اور جائیداد خریدی ہے، وہ بھی اس میں شامل کی جائے گی یا نہیں؟ آں محترم سے درخواست ہے کہ اس بارے میں چند کتب کی عبارتیں تفصیلی حوالہ کے ساتھ ارقام فرمائیں۔

جواب: زید کے انتقال کے وقت اس کی جو بھی منقولہ یا غیر منقولہ جائداد تھی اس میں سب ورثہ حسب حصص شرعیہ مستحق وراثت ہیں؛ لیکن زید کے انتقال کے بعد اس کے بڑے لڑکے نے اپنے طور پر دیگر بھائیوں کے اشتراک کے بغیر جو کاروبار بڑھائی، اس کے نفع میں بقیہ وارثین مستحق نہیں ہیں، اسی طرح دیگر بھائیوں نے جو کمایا ہے وہ بھی ان کا ذاتی حق ہے، اس میں دیگر وارثین حصہ دار نہیں ہے، اس کی تائید درج ذیل عبارت سے ہوتی ہے [১১৮৯]

প্রশ্নে উল্লিখিত ‘আহসানুল ফাতাওয়া’র ইবারতের প্রথমাংশ থেকে এমন ব্যাপক সিদ্ধান্ত বোঝা যায়। অবশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেছেন অনুমতি না নেয়ার সূরতকে। সর্বোপরি যারা এভাবে ফাতওয়া দিয়েছেন তাদের সর্বোচ্চ দলীল হলো, উল্লিখিত ব্যাপকার্থবোধক দলীলদ্বয়। আর এর বিপরীতে পরিষ্কার দলীল থাকা সত্ত্বেও এই মুতলাক দলীলের আলোকে এভাবে ফাতওয়া প্রদান পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

অনুমতিবিহীন হস্তক্ষেপের দ্বারা অর্জিত মুনাফার হুকুম

শরীকী উত্তরাধিকার সম্পদে কোনো একজন ওয়ারিছ অন্যদের অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করে মুনাফা অর্জন করলে সেই মুনাফার কি হুকুম হবে তা নিয়ে কিছু আলোচনা পিছনে গেলেও এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সমীচীন মনে হচ্ছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিনানুমতিতে লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি রাখে এমন কারবার থেকে অর্জিত মুনাফার হুকুম গসবকৃত সম্পদের মুনাফার বিধানের আলোকেই ব্যাখ্যা করতে হবে (এর কারণ পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে)। নিম্নে আমরা মূলত দু’টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো-

১. গসবকৃত সম্পদের মুনাফার (যা গসবকারীর চুক্তি বা শ্রমের মাধ্যমে অর্জন হয়েছে তার) মালিক সম্পর্কে।

২. উক্ত মুনাফা ভোগ করা সম্পর্কে।

প্রথমে আমরা মালিক সম্পর্কে আলোচনা করবো। ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবাদিতে গসবকৃত সম্পদ থেকে গসবকারীর চুক্তি ও শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা সম্পর্কে দু’ধরনের মত পাওয়া যায়।

ক. মুনাফার মালিক গসবকারী হবে। পিছনে একাধিক দলীলের মাঝে এ বিষয়টি উল্লেখ হয়েছে। উত্তরাধিকার যৌথসম্পদের ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। যেমনটি আমরা ‘ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যা’ ও ‘ইমদাদুল ফাতাওয়া’সহ অন্যান্য কিতাবের উদ্ধৃতিতে দেখে এসেছি। এখানে আর দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই।

খ. মূল সম্পদের মালিক যে, সেই মুনাফার মালিক হবে। গসবকারী মালিক হবে না।

[১১৮৯] কিতাবুন নাওয়াযিল, মুফতী সালমান মানসূরপুরী দা.বা. ১৮/১৮৮, আল মারকাজুল ইলমী

মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা'তে এ মতটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিছু ফাতওয়া বোর্ড থেকে এর ভিত্তিতে ফাতওয়াও দেয়া হয়েছে। আল্লামা মুহাম্মদ খালেদ আতাসী রাহ. (১৩২৬ হি.) আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

ثم رأيت في الفتاوى الأنقروية ناقلا عن القنية مانصه: (بم) دار بين اثنين وغاب أحدهما وآجر الآخر، وأخذ الأجرة، فللغائب أن يشاركه في الأجرة، قال رضي الله عنه : فهذا إشارة إلى أن العاقد لم يملك الأجرة.[১১৯০]

"ফাতওয়ায়ে আনকারাভিয়্যাহ-এ কুনয়া থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে- একটি বাড়ি দুইজনের যৌথ মালিকানায় রয়েছে। তাদের একজন অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় অপরজন সেই বাড়ি ভাড়া দিয়ে তার মূল্য গ্রহণ করলো। তাহলে অনুপস্থিত ব্যক্তিকেও তাতে শরীক করতে হবে।

খালেদ আতাসী রাহ. বলেন, এটা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, চুক্তিকারী একাই সমুদয় ভাড়ার মালিক হবে না।"

আল্লামা আলী হায়দার রাহ. (১৩৫৩ হি.) বলেন-

... عند بعض الفقهاء؛ فلا يملك الشريك المؤجر حصة شريكه الآخر، ويشارك الشريك الآخر الشريك المؤجر في بدل الإيجار بنسبة حصته، ويكون الشريك المؤجر على أداء ذلك لشريكه، وأن للشريك الآخر أن يستحصل على حقه هذا بواسطة الحكم والقضاء، (واقعات المفتيين في الإجارة والأنقروية فيها)

ويفهم من ظاهر عبارة هذه المادة أن المجلة قد اختارت القول الثاني، السابق آنفا — كما أن دائرة الفتاوى في الوقت الحالي تفتي بموجب هذا القول.

"...কোনো কোনো ফুকাহায়ে কেরামের নিকট ভাড়াদানকারী শরীক অপর শরীকের অংশের মালিক হবে না। ভাড়া দানকারী শরীক অপর অংশীদারকে তার অংশ অনুপাতে শরীক করবে এবং তা আদায় করবে। অপর অংশীদারের জন্যও তার নিজ অধিকার আদায় করে নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

এই ধারা থেকে বাহ্যত বুঝে আসে যে, মাজাল্লাতে দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করা হয়েছে যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে দায়েরাতুল ফাতাওয়াও এ মত অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করে থাকে।"[১১৯১]

এখানে আমরা দু'ধরনের মত দেখলাম। মতদ্বয়ের মাঝে বাহ্যিক তা'আরুয মনে হলেও আল্লামা মুহাম্মদ খালেদ আতাসী রাহ.-এর ব্যাখ্যা দ্বারা উভয়ের মাঝে সমন্বয় হয়ে যায়। তিনি এখানে 'কাযা ও দিয়ানাহ' এর আলোকে সমন্বয় করেছেন। যেসব দলীলে গসবকারীকে মালিক বলা হয়েছে তা থেকে উদ্দেশ্য, বাহ্যিক মালিক হওয়া, যা কাযার ভিত্তিতে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর যে দলীলগুলোতে মুনাফার মালিক মূল সম্পদের মালিককে বলা হয়েছে তা থেকে উদ্দেশ্য প্রকৃতভাবে মালিক হওয়া, যা দিয়ানাহ'র ভিত্তিতে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লামা মুহাম্মদ খালেদ আতাসী রাহ. এর সমন্বয়মূলক ভাষ্য পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আবারো উল্লেখ করা হলো-

---

[১১৯০] শারহুল মাজাল্লাহ, খালেদ আতাসী: ৪/২০, ধারা নং ১০৭৭

[১১৯১] দুরারুল হুককাম শারহু মাজাল্লাতিল আহকাম: ১০/৩০

أحد الشريكين إذا آجر لآخر المال المشترك وقبض الأجرة يعطي الآخر حصته منها)" – قال المفتي الأتاسي – يعني ديانة، وإن كانت الأجرة المسماة تجب قضاء للعاقد، لأن المنفعة قد تقومت بعقده فكانت له.[১১৯২]

তিনি আরো বলেন-

لو آجر أحد الشريكين من الدار المشتركة ثم حضر شريكه فله أن يطالبه بأجرة نصيبه من الجانب المأجور مستندا لما نقله أولا عن نور العين، فدل على أن مراده بقوله: فله أن يطالبه إلى آخره، أي ديانة لا قضاء وحينئذ فلا مخالفة بين ما هنا وبين ذكره في الخانية وغيرها من أنه لو آجر الغاصب المغصوب، فالأجرة المسمى له، ولا شيء للمالك. وكذا حكم الفضولي لو آجر ملك غيره، وذلك لأن المنافع لاتتقوم إلا بالعقد، فكانت الأجرة للعاقد لأن هذا في القضاء فافهم.

"দুইজনের যৌথ বাড়ি কোনো এক শরীক যদি ভাড়া দেয়, অতঃপর অন্য শরীক উপস্থিত হয়, তাহলে অনুপস্থিত শরীক ভাড়াদানকারীর নিকটে নিজের অংশ অনুপাতে ভাড়ার দাবি করতে পারবে। অন্য শরীক এসে ভাড়া দাবি করার বিধানটি দিয়ানাত বা ঔচিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে; আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। এ ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে যা উল্লেখ করা হলো এবং খানিয়্যাতে যা আছে দু'টির মাঝে সমন্বয় হয়ে গেলো। অর্থাৎ, যদি গসবকারী ভাড়া দেয়, তাহলে সম্পদ সেই পাবে। মূল মালিক কিছু পাবে না। ফুযুলী (অনধিকার চর্চাকারী) ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বিধান অনুরূপ। যদি সে অন্যের মালিকানাধীন কোনো সম্পদ ভাড়া দেয়, তাহলে সে চুক্তিকারী হওয়ার কারণে ভাড়ার মালিক সেই হবে। কারণ, কোনো বস্তুর উপকারিতা চুক্তির মাধ্যমেই মূল্য লাভ করে থাকে। সুতরাং আইনত ভাড়ার মালিক চুক্তিকারীই হবে।"[১১৯৩]

আল্লামা আতাসী রাহ. যে সমন্বয়মূলক আলোচনা করেছেন এর সমর্থন এ অধ্যায়ের মুনাফা ভোগ করা সংক্রান্ত দলীল থেকেও পাওয়া যায়। কারণ, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ. সহ পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, অর্জিত মুনাফা থেকে হস্তক্ষেপকারী ধনী হলে অন্যের অংশের মুনাফা ভোগ করতে পারবে না। সুতরাং বোঝা গেলো, সে প্রকৃত মালিক নয়। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। প্রশ্নোল্লিখিত মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রাহ. (১৪২২ হি.) এর ফাতওয়া থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন,

(۱۰) سوال: ایک شخص کے فوت ہونے کے بعد ترکہ پر صرف ایک وارث متصرف رہااس نے مدت دراز تک منافع لئے اور کافی جائداد بھی بنالی، اب دوسرے ورثہ تقسیم ترکہ کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس حالت میں محض اصل ترکہ تقسیم ہوگا یا اس سے حاصل منافع اور اس سے خرید کردہ جائداد بھی تقسیم ہوگی-

جواب: صرف اصل ترکہ تقسیم ہوگا اور منافع کا مالک وہی ہے جو متصرف رہا مگر اس کا تصرف اگر بلارضائے دیگر ورثہ ہے تو ارباح فاسدہ ہیں جن کا حکم یہ ہے کہ مالک پر رد کئے جائیں اگر مالک کا علم نہ ہوسکے تو تصدق علی الفقراء کیا جائے حاصل یہ ہے کہ دیانۃ جمیع ورثہ کو دینا واجب ہوگا قضاء نہیں.

[১১৯২] শারহুল মাজাল্লাহ, খালেদ আতাসী: ৪/২০, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, দেওবন্দ

[১১৯৩] শারহুল মাজাল্লাহ, খালেদ আতাসী: ৪/২০

"প্রশ্ন: এক ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর কোনো একজন ওয়ারিছ তার ত্যাজ্য সম্পদে হস্তক্ষেপ করেছে। সে দীর্ঘ সময় তাতে কারবার করে অনেক সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। এখন অন্যান্য ওয়ারিছরা সম্পদ বন্টন করতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায় শুধু মূল সম্পদ বন্টন করা হবে নাকি লভ্যাংশ এবং এর দ্বারা ক্রয়কৃত জমি-জমাও বন্টন করা হবে?

উত্তর: শুধু মূল সম্পদ বন্টন করা হবে। আর লভ্যাংশের মালিক কারবারকারী হবে; কিন্তু তার হস্তক্ষেপ যেহেতু অন্যান্য ওয়ারিছদের অনুমতি ব্যতীত হয়েছে, তাই তা অবৈধ মুনাফা বলে বিবেচিত হবে। আর এ ধরনের মুনাফার হুকুম হলো, মালিক জানা থাকলে তাকে ফেরত দিবে। আর তা সম্ভব না হলে দরিদ্রদেরকে সাদকা করে দিবে। মোটকথা, দিয়ানাত বা ধার্মিকতার দৃষ্টিতে সকল ওয়ারিছদের দেয়া ওয়াজিব; আইনগতভাবে নয়।"[১১৯৪]

এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, গাসিব কাযা'র দৃষ্টিতে গসবকৃত সম্পদের মুনাফার মালিক হলেও প্রকৃতপক্ষে সে মালিক নয়; বরং প্রকৃত মালিক হলো সম্পদের মূল মালিক। মিরাছ সম্পদের ক্ষেত্রেও একই বিধান। সুতরাং তাসাররুফকারী অন্যদের অংশের মুনাফার প্রকৃত অর্থে মালিক হবে না।

আমরা দেখলাম যে, তাসাররুফকারী উক্ত মুনাফার প্রকৃত মালিক হচ্ছে না। তাহলে এ পর্যায়ে তার কর্তব্য কী?- এটি আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় বিষয়।

পূর্বের মতো এ বিষয়টির সমাধানও গসবকৃত সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রেও ফিকহের কিতাবাদিতে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, একাধিক কিতাবে উল্লেখ হয়েছে যে, এ ধরনের মুনাফার ক্ষেত্রে তাকে দু'টির কোনো একটি করতে হবে।

ক. হয়তো মূল মালিককে দিয়ে দিতে হবে।

খ. অথবা সাদকা করতে হবে। যেমন ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যাতে উল্লেখ হয়েছে।

ذكر محمد – رحمه الله تعالى – في شروط الأصل في الدار إذا كانت مشتركة وأحد الشريكين غائب وأراد الحاضر أن يسكنها إنسانا أو يؤاجرها إنسانا قال أما فيما بينه وبين الله تعالى فلا ينبغي له ذلك وفي القضاء لا يمنع من ذلك فإن آجر وأخذ الأجر ينظر إلى حصة نصيب شريكه من الأجر ويرد ذلك عليه إن قدر وإلا يتصدق وكان كالغاصب إذا آجر وقبض الأجر يتصدق أو يرده على المغصوب منه أما ما يخص نصيبه يطيب له.

"মুহাম্মদ রাহ. কিতাবুল আসলের 'শুরূত' অধ্যায়ে উল্লেখ করেন- যৌথ বাড়ির একজন শরীকের অনুপস্থিতে অপর শরীক তাতে কাউকে বসবাস করার সুযোগ দিতে চাচ্ছে অথবা ভাড়া দিতে চাচ্ছে। তিনি বলেন, দিয়ানাত (ধার্মিকতা)-এর দৃষ্টিতে সে এটা করতে পারবে না; তবে কাযা বা আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে এ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা যাবে না। এখন যদি সে ভাড়া দেয় এবং ভাড়া গ্রহণ করে (তাহলে তার অংশ পরিমাণ গ্রহণ করবে)। আর শরীকের অংশ কতটুকু হয় সেটা নির্ধারণ করে যদি ফেরত দেয়া সম্ভব হয় ফেরত দিবে, অন্যথায় সাদকা করে দিবে। সে ভাড়া দেয়া এবং মূল্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অন্যের সম্পদে অবৈধ হস্তক্ষেপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং তা সাদকা করবে অথবা যার থেকে গসব করেছে তাকে ফেরত

[১১৯৪] আহসানুল ফাতাওয়া: ৯/২৮৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

দিবে। তবে তার অংশ পরিমাণ তার জন্য বৈধ হবে।”[১১৯৫]

পূর্বে উল্লিখিত হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী থানভী রাহ.-এর সত্যায়িত ফাতওয়াতেও এমনটি উল্লেখ রয়েছে। যথা-

جس شریک نے مضاربت پر روپیہ دیا ہے نفع مقررہ اس کی ملک تو ہو گیا لیکن اس میں سے فقط اپنے حصہ وراثت کے مطابق اس کو حلال ہے اور باقی نفع خبیث ہے اس لئے دوسرے ورثاء کو بقدر ان کے حصص دے دے یا محتاجوں کو دے دے ...

اور مضارب کے لئے بھی یہی حکم ہو گا کہ کل نفع مقررہ اس کی ملک ہے لیکن جس شریک نے اس سے عقد مضاربت کیا ہے اس کے حصہ کے موافق حلال ہے اور زائد حلال نہیں بلکہ دوسرے شرکاء کو دے یا فقراء کو دے دے . وهذا هو مقتضى القواعد ولم أره صريحا. والله أعلم.[১১৯৬]

কোনো কিতাবে শুধু সাদকার কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন প্রশ্নোল্লিখিত ৪নং দলীলে আল্লামা মারগীনানী রাহ. (৫৯৩ হি.) বলেন-

(٤) ومن غصب ألفا فاشترى بها جارية فباعها بألفين ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فإنه يتصدق بجميع الربح، وهذا عندهما، أصله أن الغاصب أو المودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح لا يطيب الربح عندهما خلافا لأبي يوسف.

“যদি কেউ একশত দিরহাম গসব করে তা দ্বারা একটি বাঁদী ক্রয় করে সেটা দুইশত দিরহামে বিক্রয় করে। অতঃপর দুইশত দিরহাম দ্বারা একটি বাঁদী ক্রয় করে তিনশত দিরহামে বিক্রয় করে, তাহলে সমুদয় মুনাফা (দুইশত দিরহাম) সাদকা করতে হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর অভিমত।”[১১৯৭]

আল্লামা কাসানী রাহ. (৫৮৭ হি.) তার বাদায়েউস সানায়ে কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন-

ولو غصب أرضا فزرعها كرا فنقصتها الزراعة، وأخرجت ثلاثة أكرار، يغرم النقصان ويأخذ رأس المال، ويتصدق بالفضل أما ضمان النقصان فلأن الغاصب نقص الأرض بالزراعة، وذلك إتلاف منه، والعقار مضمون بالإتلاف بلا خلاف.

وأما التصدق بالفضل فلحصوله بسبب خبيث، وهي الزراعة في أرض الغصب، وإن كان البذر ملكا له، ويطيب له قدر النقصان وقدر البذر لما ذكرنا أن النهي ورد عن الربح، وذا ليس بربح فلم يحرم والله سبحانه وتعالى أعلم.

وعلى هذا يخرج ما إذا غصب ألفا فاشترى جارية فباعها بألفين، ثم اشترى بالألفين جارية فباعها بثلاثة آلاف أنه يتصدق بجميع الربح في قولهما، وعند أبي يوسف – رحمه الله – لا يلزمه التصدق بشيء؛ لأنه

[১১৯৫] ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা: ২৯ নং অধ্যায়, ৫/৪২৬, কিতাবুল কারাহিয়াহ, মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, দেওবন্দ

[১১৯৬] ইমদাদুল আহকাম: ৩/৩৩৫, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[১১৯৭] আল হিদায়া: ৩/৩৫৯, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান

ربح مضمون مملوك؛ لأنه عند أداء الضمان يملكه مستندا إلى وقت الغصب ومجرد الضمان يكفي للطيب، فكيف إذا اجتمع الضمان والملك وهما يقولان الطيب، كما لا يثبت بدون الضمان لا يثبت بدون الملك من طريق الأولى، وفي هذا الملك شبهة العدم على ما بينا فيما تقدم، فلا يفيد الطيب.

"যদি কেউ কোনো জমি জবরদখল করে তাতে এক কুর পরিমাণ কোনো শস্যচাষ করে যার ফলে জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জমি থেকে তিন কুর পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়, তাহলে গসবকারী জমির ক্ষতি পরিমাণ জরিমানা আদায় করবে এবং তার মূল সম্পদ (এক কুর পরিমাণ শস্য) নিয়ে অতিরিক্ত (দুই কুর পরিমাণ শস্য) সাদকা করবে।

জরিমানা আদায় করার কারণ হলো গাসিব জমি চাষের দ্বারা জমিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এটা তার পক্ষ হতে ইতলাফ বা অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে নষ্ট বা ধ্বংস করার মতো। আর জমিকে নষ্ট করলে সর্বসম্মতিক্রমে তার জরিমানা আদায় করতে হয়।

আর অতিরিক্ত উৎপাদিত ফসল সাদকা করার কারণ হলো, তা খবীস (অবৈধ) পন্থায় অর্থাৎ, মালিকের অনুমতি ব্যতীত চাষাবাদের দ্বারা অর্জিত হয়েছে। যদি গসবকারী বীজের মালিক হয়, তাহলে যে পরিমাণ জরিমানা আদায় করেছে তা এবং বীজ হালাল হবে। কারণ, গসবকারীর জন্য গসবকৃত মুনাফা ভোগ করা হারাম; কিন্তু এখানে মূল বীজ এবং জরিমানা পরিমাণ শস্য মুনাফার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তা হারাম হবে না।

এই মাসআলার আলোকে আরেকটি মাসআলা বের হয়ে আসে। তা হলো- কেউ এক হাজার দিরহাম আত্মসাৎ করলো এবং তা দ্বারা একটি বাঁদী ক্রয় করলো। অতঃপর তা দুই হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলো এবং ঐ দুই হাজার দিরহাম দ্বারা আরেকটি বাঁদী ক্রয় করলো। তারপর সে শেষোক্ত বাঁদীকে তিন হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলো। এ অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা রাহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর মতানুযায়ী তাকে অর্জিত সকল মুনাফা সাদকা করে দিতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর মতে পরবর্তীতে যামান আদায় করে দিলে কোনো মুনাফা সাদকা করতে হবে না। কারণ, এই মুনাফার প্রায়শ্চিত্ত দেয়া হয়েছে এবং সে বর্তমানে এর মালিক। কারণ, যামান আদায়ের ক্ষেত্রে গসবের সময় থেকে নিয়েই যে বস্তুর যামান আদায় করা হয়েছে তা আদায়কারীর মালিকানাধীন বিবেচিত হয়। হালাল হওয়ার জন্য শুধু যামানই যথেষ্ট। আর এখানে তো এর সাথে মিলক (মালিকানা)-ও পাওয়া যাচ্ছে (কারণ, তাকে পূর্বে থেকেই মালিক ধরা হচ্ছে)।

তবে ইমাম আ'যম রাহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন, যামান ছাড়া যেমন কোনো বস্তু হালাল হয় না, তেমনি মিলক (মালিকানা) ছাড়াও হালাল হয় না। এখানে যে মিলকের বিবেচনা করা হচ্ছে তা এক হিসেবে না থাকার মতোই (কারণ, এই বিবেচনা করা হচ্ছে আলোচ্য অবস্থা অতিক্রান্ত হওয়ার পর)। পূর্বে এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে (শস্যের ক্ষেত্রে মুনাফা সাদকা করার প্রসঙ্গে)। সুতরাং এ মুনাফা হালাল হবে না।"[১১৯৮]

ইবারতগুলোতে শুধু সাদকার কথা উল্লেখ থাকলেও সাদকার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, গসবকারী মুনাফার মালিক হবে না। তবে তার জন্য কী করণীয়, তা উল্লেখ করতে গিয়ে সাদকার প্রসঙ্গ এসেছে। এর অর্থ এটা না যে, তার সাদকাই

[১১৯৮] বাদায়েউস সানায়ে: ১০/৩৮, দারুল হাদীস, কায়রো

করতে হবে। কারণ, এটি স্বীকৃত বিষয় যে, গসবকারী গরীব হলে তার জন্য সাদকা করা জরুরী নয়।

ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) এক প্রশ্নের উত্তরে আরো পরিষ্কার বলেছেন-

التصدق بهذا لم يكن حتما عليه، ألا ترى أنه لو سلم الغلة إلى المالك مع العبد كان للمالك أن يتناول ذلك، وليس على الغاصب شيء آخر فهو بما صنع يصير مسلما إلى المالك، ثم يصير المالك مبرئا له عن ذلك القدر من القيمة بما يقبضه فيزول الخبث بهذا الطريق، فلا يلزمه التصدق بعوضه.

"এগুলো সাদকা করা তার জন্য আবশ্যক নয়। তুমি কি দেখ না, যদি সে এই মুনাফা গোলামসহ মালিকের নিকট অর্পণ করে, তাহলে মালিক তা ভক্ষণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে অপহরণকারীর আর কোনো দায় থাকবে না। সে উক্ত মুনাফা মালিককে অর্পন করার দ্বারাই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, মালিক যেই পরিমাণ গ্রহণ করবে সেই পরিমাণ অপহরণকারী দায়মুক্ত হবে। এভাবে উক্ত সম্পদ থেকে অবৈধতা দূর হয়ে যাবে। সুতরাং তার বিনিময় সাদকা করা আবশ্যক নয়।"[১১৯৯]

সুতরাং বোঝা গেলো, সাদকা করাটাই আবশ্যক নয়; বরং মূল মালিককে দিয়ে দিলেও তার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। এখানে ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ.-এর কারণও উল্লেখ করেছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলাঈ রাহ.ও (৭৪৩ হি.) এমনটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

ولو هلك في يده بعد ما استغله فضمنه المالك كان له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان؛ لأن الخبث كان لأجل المالك فإذا أخذه المالك لا يظهر الخبث في حقه. ولهذا لو سلم الغلة إليه مع العبد يباح له التناول فيزول الخبث بالتسليم وتبرأ ذمته عن القيمة بقدره بخلاف ما إذا باعه الغاصب بعد ما استغله، وهلك في يد المشتري وضمن المالك المشتري قيمته ثم رجع المشتري على الغاصب بالثمن حيث لا يكون للغاصب أن يستعين بالغلة في أداء الثمن إلى المشتري؛ لأن الخبث كان لحق المالك والمشتري ليس بمالك فلا يزول الخبث بالأداء إليه فلا يؤديه إليه إلا إذا كان لا يجد غيره فترجح هو على غيره من الفقراء باعتبار أنه ملكه و هو محتاج إليه.

"যদি অপহৃত বস্তু থেকে আয় করার পর অপহরণকারীর নিকট উক্ত বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে উল্লিখিত আয় থেকে জরিমানা আদায় করতে পারবে। কেননা অপহৃত বস্তুর আয়ের অবৈধতা মূলত মালিকের হকের কারণে। যেহেতু এখানে মালিক নিজেই সেই আয়ের মালিক হয়ে যাচ্ছে তাই তার জন্য সেটা গ্রহণ করা অবৈধ হবে না। অপহরণকারী যদি অপহৃত গোলাম ও তার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ মালিককে হস্তান্তর করে, তাহলে মালিকের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হবে। মালিকের নিকট হস্তান্তর করার দ্বারা উক্ত আয়ের অবৈধতা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং অপহরণকারী দায়মুক্ত হয়ে যাবে।..."[১২০০]

সর্বোপরি এ দলীলগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত মালিককে দিয়ে দিলেও সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে; বরং সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মালিককে ফেরত দেয়াই অধিক উত্তম ও অগ্রগণ্য বলা

[১১৯৯] আল মাবসূত: ১১/৭৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১২০০] তাবয়ীনুল হাকায়েক: ৬/৩২২, এইচ. এম. সাঈদ

যেতে পারে। কারণ এই মুনাফার সম্পদটি মূলত লুকাতা (কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদ)-এর সম্পদের মতো। যেমন, ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) বলেন-

.. أن حق الفقراء في هذا المال بمنزلة حقهم في اللقطة على معنى أن له أن يتصدق، وله أن يردها على المالك إن شاء.

"এ সম্পদে দরিদ্রদের হক লুকাতার ক্ষেত্রে তাদের হকের মতো। অর্থাৎ, সে চাইলে তা সাদকা করতে পারবে অথবা মালিককে ফেরতও দিতে পারবে।"[১২০১]

আর লুকাতার ক্ষেত্রে স্বীকৃত হলো, মূল মালিককে পাওয়া গেলে তাকেই দিতে হবে। এছাড়া কুনয়া কিতাবে মূল মালিককে প্রদান করাকেই উত্তম বলা হয়েছে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বক্তব্যটি এভাবে উল্লেখ করেছেন-

عبارتها: ولو غصب دارا معدة للاستغلال أو موقوفة أو ليتيم وآجرها وسكنها المستأجر يلزمه المسمى لا أجر المثل قيل له: وهل يلزم الغاصب الأجر لمن له الدار؟ فكتب لا ولكن يرد ما قبض على المالك وهو الأولى.

"...যদি কেউ ভাড়া, ওয়াক্‌ফ অথবা এতিমদের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘর জবরদখল করে নেয় এবং তা ভাড়া হিসেবে প্রদান করে, আর সেখানে ভাড়া গ্রহণকারী বসবাস করে, তাহলে ভাড়াটিয়ার জন্য চুক্তিকৃত ভাড়া প্রদান করা আবশ্যক। আজরুল মিস্‌ল বা সমশ্রেণীর ভাড়া প্রদান করতে পারবে না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, জবরদখলকারীর জন্য কি মূল মালিককে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভাড়া দেয়া আবশ্যক? তিনি লিখিত উত্তরে বললেন, না। তবে সে ভাড়া গ্রহণকারী থেকে যা গ্রহণ করবে তা মালিককে ফেরত দিবে-এটাই উত্তম।"[১২০২]

সুতরাং মুনাফার সম্পদ প্রকৃত মালিককেই প্রদান করাই উত্তম ও অগ্রগণ্য বলা যেতে পারে। নাজায়েয মুনাফার ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. এর এক বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, মূল মালিককে দেয়া সম্ভব হলে তাকেই দিতে হবে, সাদকা করা যাবে না। খিযানাতুল আকমালে আল মুনতাক্বার উদ্ধিৃতিতে তাঁর এ বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। যথা-

وقال ابو يوسف رحمه الله فيمن باع درهما بدرهمين في نصراني ثم أسلم فإن عرف صاحبه يرده عليه من الفضل ولا يتصدق بالفضل. من المنتقى.

"ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলেন, যে নাসরানী থাকাবস্থায় এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম বিক্রয় করেছে, (অর্থাৎ, সুদী লেনদেন করেছে) অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেছে- যদি সে মূল মালিককে খুঁজে পায়, তাহলে তাকেই ফেরত দিবে; সাদকা করলে হবে না।"[১২০৩]

সম্ভবত এ সকল কারণেই মাজাল্লাতুল আহকামে এ মতটি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন,

لو آجر أحد الشريكين المال المشترك لآخر وقبض الأجرة يعطي الآخر حصته منها ويردها إليه.

"যদি দুইজন শরীকের কোনো একজন যৌথ সম্পদ ভাড়া দেয় এবং মূল্য গ্রহণ করে, তাহলে

[১২০১] আল মাবসূত: ১১/৭৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ
[১২০২] রদ্দুল মুহতার: ৬/২০৯, (এইচ. এম. সাঈদ)
[১২০৩] খিযানাতুল আকমাল: ২/৫২৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

অপর শরীককে তার অংশ পরিমাণ ফেরত দিবে।”[১২০৪]

আমরা পিছনে আল্লামা আলী হায়দার রাহ. এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছি যে, এ মাদ্দা মুতাবিক অনেক ফকীহ মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং দায়েরাতুল ফাতওয়াতেও এভাবেই ফাতওয়া দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি পরিষ্কার হয়েছে যে, যৌথ উত্তরাধিকার সম্পদে অন্যদের অনুমতি ছাড়াই হস্তক্ষেপ করে মুনাফা অর্জন করলে তার জন্য কর্তব্য হলো মুনাফা প্রত্যেকের অংশ অনুপাতে বন্টন করে দেয়া।

আমাদের পূর্ণ আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, ওয়ারিছদের মাঝে কোনো একজন হস্তক্ষেপ করে মুনাফা অর্জন করলে অন্যরাও তাতে অংশ পাবে। অনুমতি থাকলে তো পাবেই। অনুমতি না থাকলেও উল্লিখিত দলীলের আলোকে তারা পাবে। সুতরাং উভয় সূরতে পিতার রেখে যাওয়া ত্যাজ্য সম্পত্তি ও তার থেকে অর্জিত মুনাফা মিরাছ অনুযায়ী বন্টন করতে হবে। সম্ভবত একারণেই হিন্দুস্তানে একাধিক মুফতিয়ানে কেরাম ফাতওয়া দেয়ার জন্য অনুমতি আছে কিনা তা খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ উভয় অবস্থায় শেষ ফলাফল একই। যেমন, প্রশ্নে উল্লিখিত ৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪ নং ফাতাওয়াতে কোনো পার্থক্য না করেই ফাতওয়া দেয়া হয়েছে।

(8) مشترکہ مال میں کسی ایک شریک کی محنت سے ہونے والی زیادتی سب شرکاء کو ملے گی۔[১২০৫]

(11) منافع بھی ترکہ میں شامل ہے۔[১২০৬]

(12) تقسیم میراث سے پہلے جو منافع ہوئے اس کا حکم....جواب: جو کچھ نفع کی شکل میں زیادتی ہوئی اسے اصل ترکہ ہی کا (ایک جز) سمجھا جاوے اور اس نفع کو ترکہ میں شامل کرکے میراث تقسیم کی جاوے۔[১২০৭]

(13) جو جائیداد 1960 ء میں ایک لاکھ کی تھی اور وہ 1991ء میں تیس لاکھ تو تیس لاکھ ہی کی تقسیم ہو گی یعنی بڑے

[১২০৪] মাজাল্লাতুল আহকাম ধারা নং ১০৭৭

[১২০৫] কিফায়াতুল মুফতী: ৮/২৬৯। উল্লিখিত ইবারতটি মুরাত্তিব কর্তৃক প্রদত্ত শিরোনাম। মূল উত্তরটি নিম্নরূপ-
الجواب: عمرو نے مال مشترک میں تجارت وغیرہ کرکے جو نفع حاصل کیا ہے اور مال بڑھایا ہے وہ سب ورثہ زید پر بھی تقسیم ہوگا صرف عمرو کا ترکہ نہیں سمجھا جائے گا. وعمله وتصرفه يكون تبرعا ووجهه أنه شريك في بعضه وعامل بنت أخيه في بعضه وهي في عياله وليس ههنا عقد ولا غصب. واللہ اعلم.

[১২০৬] ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়্যাহ: ৬/৫৫১। এ ইবারতটিও উত্তরের শিরোনাম। মূল উত্তরটি নিম্নরূপ-
سوال: جناب مفتی صاحب! میرے والد صاحب کسی کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے جس میں والد صاحب کے چار لاکھ روپے تھے، مشترکہ کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا کہ اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب دس سال بعد ہم اس سرمایہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس چار لاکھ روپے کے ساتھ دو لاکھ منافع بھی ہو چکا ہے، تو کیا اب ہم تقسیم چار لاکھ کی کریں گے یا منافع کی رقم بھی شامل کرنی ہو گی؟
الجواب: منافع چونکہ شرعا اصل زر کا تابع ہوتا ہے، اس لیے منافع اور اصل رقم کو ملا کر تقسیم کیا جائے گا، یعنی آپ لوگ کل چھ لاکھ روپے آپس تقسیم کریں گے۔ قال العلامۃ محمد الطوری رح : تحت قوله (يبدأ من تركة الميت الخ) المراد من التركة ما تركه الميت خاليا من تعلق حق الغير بعينه الخ. (البحر الرائق ٤٨٩/٨ كتاب الفرائض)

[১২০৭] ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ: ১০/২৪৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

بھائی کی اولاد کو تیس لاکھ میں سے پانچواں حصہ دینا پڑے گا۔ [১২০৮]

(14) مرنے کے بعد اضافہ شدہ مال کی تقسیم ہو گا"ماترکہ" میں اضافہ شدہ مال بھی شامل ہے اگروہ میت کے مال سے ہوا ہے لہذا لامحالہ اس کی تقسیم ہو گی۔ [১২০৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। উল্লিখিত দলীলসমূহের ভিত্তিতে

নিম্নে মূল মাসআলার সমাধান তুলে ধরা হলো।

মূল মাসআলার সমাধানঃ

ক. হ্যাঁ, আপনার পিতার সাথে সম্পৃক্ত হক আদায়ের পর অবশিষ্ট সম্পদ ও তা থেকে অর্জিত মুনাফা মিরাছ হিসেবে গণ্য হবে। প্রশ্নে উল্লিখিত আপনার তিন ভাইয়ের জন্য উক্ত সম্পদ থেকে অর্জিত মুনাফা একাই ভোগ করা জায়েয হবে না।
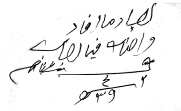
খ. মনগড়াভাবে মিরাছ বন্টন বৈধ হবে না। ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী মিরাছ বন্টন করতে হবে। প্রয়োজনে ওয়ারিছগণের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ করে কোনো নির্ভরযোগ্য মুফতী সাহেব থেকে বন্টন পদ্ধতি জেনে নিবেন।

সমাধানে
বান্দা আবদুল্লাহ নাজীব
দারুল উলূম হাটহাজারী
৯/২/১৪৩৯ হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২ রবিউল আখের ১৪৩৯ হি.

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১ রবিউল আখের ১৪৩৯ হি.

[১২০৮] আপকে মাসাইল আওর উনকা হল: ৬/২৯৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১২০৯] আপকে মাসাইল আওর উনকা হল: ৬/২৫২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

চেয়ারে বসে নামায : কিছু সংশয়ের নিরসন

দরসুল ফিকহের প্রথম খণ্ডে 'চেয়ারে বসে নামায' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রবন্ধটি সত্যায়ন করেছিলেন দারুল উলূম মুঈনুল ইসলামের একাধিক মুফতিয়ানে কেরাম। কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার অনেকদিন পর এক মসজিদের ইমাম সাহেব প্রবন্ধটির উপর কিছু আপত্তি উল্লেখ করে দারুল উলূম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগ বরাবর একটি চিঠি পাঠান। উক্ত চিঠিতে তিনি দাবি করেন যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় করা বৈধ নয়। দলীল হিসেবে ভারতের কিছু আলেম কর্তৃক প্রচারিত একটি ইশতেহারও সেই চিঠির সাথে যুক্ত করেন।

চিঠিটি দারুল ইফতায় আসার পর আসাতাযায়ে কেরাম বান্দাকে জবাব লিখতে নির্দেশ দেন। আসাতিযায়ে কেরামের নির্দেশে ইমাম সাহেবের আপত্তিগুলোকে মৌলিক শিরোনামের আকারে উল্লেখ করে দলীলভিত্তিক জবাব প্রস্তুত করা হয়। আসাতিযায়ে কেরাম তা সত্যায়ন করেন এবং ইমাম সাহেবের বরাবর সেটি প্রেরণ করার নির্দেশ দেন।

প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় দরসুল ফিকহ দ্বিতীয় খণ্ডে তা যুক্ত করে দেয়া হলো।

-সম্পাদক

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين.

দারুল উলূম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'দরসুল ফিকহ' কিতাবটি সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করার জন্য আপনার প্রতি শুকরিয়া জানাচ্ছি। 'চেয়ারে বসে নামায' বিষয়ক প্রবন্ধের উপর কিছু প্রশ্ন সম্বলিত আপনার চিঠি আমরা দেখেছি। চিঠির সাথে সংযুক্ত ইশতেহার, যা আমাদের সংগ্রহে পর্ব থেকেই ছিলো, তাও পুনরায় ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছি। সতর্কতাবশত সমষ্টিগতভাবে আলোচনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। প্রবন্ধের বক্তব্য ও প্রমাণাদি পুনঃবিবেচনায় আনার পর আমাদের সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, চেয়ারে বসে নামায সম্পর্কে প্রবন্ধে উল্লিখিত মাসআলাগুলো ফিকহী দৃষ্টিতে সঠিক এবং যথাযথই ছিলো।

দারুল উলূম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগ থেকে কিছু দিন পূর্বে 'চেয়ারে বসে নামায : মূলনীতি ও কিছু বিধান' শিরোনামে আরো একটি নাতিদীর্ঘ ফাতওয়া প্রকাশ করা হয়। এ ফাতওয়াতেও ওজরবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বৈধতা প্রমাণ করা হয়েছে। মসজিদে যাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে নতুন করে আর লেখার প্রয়োজন নেই। তাই এখনে শুধু আপনার চিঠিতে উল্লিখিত সংশয়গুলোকে মৌলিক শিরোনাম দিয়ে তার বিস্তারিত 'নিরসন' তুলে ধরা হলো।

এক.

চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান কি খায়রুল কুরুনে ছিলো?

চেয়ার খায়রুল কুরুনে ছিলো, অসুস্থতাও ছিলো; কিন্তু চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান খায়রুল কুরুন থেকে অনুসৃত হয়নি। সুতরাং চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয হবে না॥

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, চেয়ারে বসে নামায পড়া বৈধ-অবৈধ হওয়া সম্পর্কে খায়রুল কুরুনের পরিষ্কার ও অকাট্য কোনো বক্তব্য না থাকলেও আমল বিদ্যমান রয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবী আবু বারযাহ রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে,

كان لأبي برزة دكان يجلس عليه ويدلي رجليه ويصلي.

"হযরত আবু বারযাহ রাযি.-এর একটি উঁচু বসার স্থান ছিলো। তিনি সেখানে বসে পা ঝুলিয়ে নামায আদায় করতেন।"[১২১০]

এছাড়াও চেয়ারে বসে নামায পড়ার অন্যতম নযির হলো বাহনের উপর বসে নামায আদায় করা। যা রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

প্রকৃতপক্ষে এখানে প্রয়োজনীয়তার দিকটাই অধিক বিবেচ্য। আমরা জানি, প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই

[১২১০] মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল: ২০৬, ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে নসর মরওয়াযী রাহ. এ বর্ণনাটি من يصلي على دكان مدليا رجليه শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

মুফতিয়ানে কেরাম চেয়ারে বসে নামায আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজন একটি আপেক্ষিক বিষয়। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত। প্রযুক্তির নিরীক্ষণে আবিষ্কৃত হচ্ছে নানা রোগ ও তার নিরাময়ক। উন্মোচিত হচ্ছে বিভিন্ন পীড়ার রহস্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ডাক্তারগণ অনেক রোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এ ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চেয়ারে বসতে হবে। নিচে বসলে তার জন্য ক্ষতি হবে। বলা বাহুল্য, রোগের কোনো বয়স নেই। যে কোনো বয়সেই রোগ হতে পারে। তাই অনেক সময় কমবয়সী হয়েও চেয়ারে বসতে হয়। এ ছাড়াও দুর্ঘটনায় বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হয়েও চেয়ারে বসতে বাধ্য হচ্ছে অনেকেই।

প্রথম যুগে প্রয়োজন এভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি। প্রয়োজনের মাত্রাও হয়তো এমন প্রকট ছিলো না। আপনি কি এমন প্রমাণ দেখাতে পারবেন যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার চেয়ারেই বসার তাগিদ করেছেন। কিন্তু রাসূল ﷺ বা কোনো সাহাবী তাকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং সে যামানায় আমল না থাকা, বর্তমানে প্রয়োজনে আমল করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না।

ফকীহগণের নিকট স্বীকৃত যে, প্রথম যুগ থেকে অনুসৃত কিছু পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরবর্তী যামানায় প্রয়োজনের তাগিদে তারতম্য হতে পারে। যেমন, রাসূল ﷺ-এর যুগে মদীনায় ঈদের নামায হতো শুধু একস্থানে। তখনো অসুস্থরা ছিলো। তা সত্ত্বেও ঈদের নামায একস্থানেই আদায়ের নিয়ম ছিলো। হযরত আলী রাযি. প্রথমে অসুস্থদের অবস্থা বিবেচনা করে শরী'আতস্বীকৃত প্রয়োজনে দু'স্থানে নামাযের অনুমতি দিয়েছেন। পরবর্তীতে ইমাম মুহাম্মদ রাহ. সহ অন্যরা প্রয়োজনে এক শহরের ততোধিক স্থানেও নামাযের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাহ. বলেন-

قال الإمام الطحاوي: ولا بأس بأن يجمع الناس في المصر في مسجدين، ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك، هكذا روى محمد. (قال الجصاص:) لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء، والأول هو قول محمد، شبهه بصلاة العيدين في المسجد، والجبانة. وقد روي أن عليًا ﷺ كان يخلف رجلاً يصلي العيد بضعفة الناس في المسجد، ويخرج هو، فيصلي بهم في الجبانة.

"ইমাম তহাবী রাহ. বলেন, এক শহরে দুই মসজিদে নামায আদায় করতে কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এর চেয়ে বেশি মসজিদে বিভক্ত হয়ে জুমা পড়বে না। এভাবেই ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বর্ণনা করেছেন।

ইমাম জাস্সাস রাহ. বলেন, এক শহরে একাধিক মসজিদে জুম'আর নামায আদায়ের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর কোনো অভিমত বর্ণিত নেই। প্রথমটি ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর অভিমত। তিনি এক শহরে একাধিক স্থানে জুম'আর নামাযের বৈধতাকে হযরত আলী রাযি.-এর যামানায় মসজিদ এবং শহরের বাইরে ময়দানে দু'জায়গাতে ঈদের নামায আদায়ের সাথে তুলনা করেছেন। হযরত আলী রাযি.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদের দিন একজন ব্যক্তিকে দুর্বল মানুষদের নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করতেন। আর তিনি নিজে ময়দানে সবাইকে নিয়ে ঈদের নামায আদায় করতেন।"[১২১১]

[১২১১] শারহু মুখতাসারাতিত তাহাবী: ২/১৩৩-১৩৪

এর কাছাকাছি আরো একটি উদাহরণ হলো, 'তাছবীব' অর্থাৎ, আযানের পর একামতের পূর্বে নামাযের জন্য ডাকা। রাসূল ﷺ-এর যুগে এর কোনো প্রচলন ছিলো না; কিন্তু প্রয়োজনে ফুকাহায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেন-

وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رضي الله عنه لتغير أحوال الناس، وخصوا الفجر به لما ذكرنا، أى: لأنه وقت نوم وغفلة، والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية.

"কুফার উলামায়ে কেরাম মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের কারণে সাহাবা যুগের পর তাছবীব (আযানের পর ইকামাতের পূর্বে নামাযের জন্য ডাকার) প্রথাটি চালু করেছেন। তবে তাঁরা ফজরের নামায ঘুম ও অলসতার সময়ে হওয়ার কারণে শুধু ফজরের সময় তাছবীব করার কথা বলেছেন। তবে পরবর্তীতে উলামায়ে কেরাম দ্বীনি কাজে মানুষের শিথিল মনোভাব প্রকাশ পাওয়ার কারণে সকল নামাযের ওয়াক্তেই তাছবীব করাকে পছন্দ করেছেন।"[১২১২]

উল্লেখ্য, ফিকহে ইসলামী প্রয়োজনীয়তাকে কখনোই উপেক্ষা করে না; বরং সুন্দর ও সাবলিল ও যৌক্তিক সমাধান দেয়। এজন্য ফুকাহায়ে কেরামের নিকট নিম্নের মূলনীতিগুলো স্বীকৃত। যা চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতার প্রমাণ হিসেবে কার্যকর। যেমন,

الضرورات تبيح المحظورات، المشقة تجلب التيسير، يسروا ولا تعسروا، الطاعة بحسب الطاقة، حق الله تعالى مبنى على المسامحة.

"প্রয়োজনের খাতিরে নিষিদ্ধ কাজসমূহ বৈধ হয়ে যায়; জটিলতা সহজীকরণের দাবি রাখে, মানুষের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করো, কঠোরতা করো না; আনুগত্য সাধ্যানুযায়ী; বান্দার উপর আল্লাহর হক উদার প্রকৃতির।"[১২১৩]

এ ছাড়াও ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেছেন- الحكم يدار على دليل الحاجة। "শর'য়ী বিধান প্রয়োজনমাফিক আবর্তিত হয়।"[১২১৪]

আশা করি এতটুকু পরিষ্কার হয়েছে যে, চেয়ারের মতো অবস্থানে বসে নামায রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের যুগে ছিলো। এছাড়া প্রয়োজনীয়তার মূলনীতি অনুযায়ীও চেয়ারে বসে নামায আদায় বৈধ প্রমাণিত হয়। সুতরাং চেয়ারে বসে নামাযকে অবৈধ বলা অগ্রহণযোগ্য এবং একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

এসকল শর'য়ী দলীলের আলোকে এবং বাস্তবার্থেই প্রয়োজন অনুভব করে দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল উলূম করাচী ও দারুল উলূম হাটহাজারীসহ অনেক দারুল ইফতার বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছেন।[১২১৫] বিগত কিছু দিন পূর্বে ইসলামিক

[১২১২] ফাহহুল কাদীর: ১/২৪৯, মাকতাবাতু রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[১২১৩] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/২৫০, ২৫১, ২২৬, সহীহ বুখারী (৬৯), রদ্দুল মুহতার ১/৫৪৫ এইস, এম, সাঈদ, আল হিদায়া, ১/৮৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[১২১৪] আল হিদায়া, কিতাবুত তালাক ২/৩৫৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[১২১৫] উল্লেখ্য যে, কিছু বিধানের ক্ষেত্রে শরী'আত বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছে; মূল পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব না হলে বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করার সুবিধার্থে। এ সকল বিধানের ক্ষেত্রে শরী'আতের মেযাজ হলো, পীড়াক্রান্ত ব্যক্তি শতকষ্ট স্বীকার করে, মূল পদ্ধতি অনুযায়ী আমল না করে বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করাই উত্তম। বিষয়টি নিম্নের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট।

ফাউন্ডেশন থেকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয না হওয়ার ফাতওয়া দিলে আমাদের দেশের বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম তার বিরোধিতা করে জায়েয হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। অথচ আপনি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই উক্ত ফাতওয়াকে ভুল ইজতিহাদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ উক্তি কতটুকু ইনসাফপূর্ণ হয়েছে তা আশা করি ভেবে দেখবেন।

দুই.

চেয়ারে বসা কি নামাযের স্বীকৃত পদ্ধতি 'কু'উদ-এর অন্তর্ভুক্ত?

আপনি (قعود) কু'উদ বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় লম্বা আলোচনা করেছেন। সূরা আল ইমরানের **১৯১** নং আয়াত ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ উল্লেখ করে তাফসীরে কাবীর ও আদ-দুররুল মানছুর থেকে আমাদের মাযহাবের ইমামদের তুলনায় অন্য মাযহাবের বক্তব্যই বেশি উল্লেখ করেছেন। এতে যে সকল বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে তাতেও চেয়ারে বসে নামায আদায় নাজায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। এ থেকে আলোচ্যবিষয়কে প্রমাণ করা উসূলে ফিকহের দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন জবাব না দিয়ে মৌলিক আলোচনার মাধ্যমে সংশয় নিরসন করা হলো।

হাদীসে কোনো ব্যক্তি কিয়াম করতে অক্ষম হলে তাকে বসার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বসার পদ্ধতি অনেকটাই কিয়ামে অক্ষম ব্যক্তির অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর উস্তায বিশিষ্ট তাবেঈ ইমাম আতা রাহ. কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি উল্লেখ করেননি। অসুস্থ ব্যক্তির সাধ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন, হযরত ইবনে আবী লায়লা রাহ.[১২১৬] বর্ণনা করেন-

---

عن أبي طعمة قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر ، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم يقبل رخصة الله ، كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. قال العلامة الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد والطبراني في الكبير، واسناد أحمد حسن.

وعن ابن عمر أن النبى ﷺ قال: إن الله تبارك وتعالى يجب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال العلامة الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط، واسناده حسن.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ إن الله تبارك وتعالى يجب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه. قال العلامة الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار، ورجال البزار ثقات، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني. (أورد االأحاديث الثلاثة العلامة الهيثمى في "مجمع الزوائد" في باب الصوم في السفر)

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسر هما، ما لم يكن إنما. (رواه الإمام البخارى في صحيحه، في باب صفة النبى ﷺ)

[১২১৬] আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা আলফকীহ, আলকাযী, আলহানাফী, আলকূফী। তিনি ৭৬ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম আবু আমর আশশা'বী (১০০ হি.), নাফে' মাওলা ইবনে উমর (১১৭ হি.), আতা ইবনে আবী রাবাহ রাহ. (১১৪ হি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী রাহ. বলেন, তিনি ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর সমপর্যায়ের ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি.), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (১৯৮ হি.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুল কামাল: ১৭/৩৭২)

عن عطاء قال في صلاة القاعد يقعد كيف شاء.

"হযরত আতা রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন, যেভাবে বসলে তার সুবিধা হয়, সেভাবেই বসতে পারবে।"[১২১৭]

কোনো কোনো ইমাম প্রচলিত কিছু পদ্ধতির আলোচনা করলেও প্রয়োজনে অন্য পদ্ধতি অবলম্বনের সুযোগ রেখে দিয়েছেন। যেমন, ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বসার পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিয়ামে অক্ষম ব্যক্তি সাধ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যাপক কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

والمصلي قاعدا تطوعا أو فريضة بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة، إن شاء محتبيا، وإن شاء متربعا؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى.

"ওজরের কারণে যে ব্যক্তি বসে নামায আদায় করবে, ফরয নামায হোক বা নফল নামায, সে চারজানু হয়ে বা তার ইচ্ছামতো অন্যভাবে বসতে পারবে। এতে (তার নামায) মাকরূহ হবে না। সে উভয় হাঁটু উঠিয়েও বসতে পারবে। চারজানু হয়েও বসতে পারবে। কেননা দাঁড়ানোর বিধান পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়া তার জন্য বৈধ। সুতরাং বসার নিয়ম ছেড়ে দেওয়া তার জন্য অধিকতর বৈধ হবে।"[১২১৮]

এ নসের মাঝে মা'জুর ব্যক্তিকে বসার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়ার পর তিনি যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তা অনেক ব্যাপক। ওজরের কারণে যখন তার থেকে কিয়ামের ফরয মাফ হয়েছে তখন বসার পদ্ধতির মাঝে সীমাবদ্ধতা প্রদান না করাই উত্তম; আর স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, কোনো কোনো কিতাবে যে দু'একটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়।

যে ব্যক্তি বসে নামায পড়তে সক্ষম, যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন, তার জন্য শুয়ে নামায পড়ার অনুমতি নেই। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহ. উল্লেখ করেন-

ولو قدر على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة يقوم ذلك القدر وإن عجز عن ذلك قعد، وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته، هذا هو المذهب، ولا يروي عن أصحابنا خلافه، وكذا إذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء أو الاستناد إلى إنسان أو حائط أو وسادة لا يجزئه.

"ইমাম আবু জাফর তহাবী রাহ. থেকে বর্ণিত আছে- যদি মা'জুর ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য কিয়াম করতে সক্ষম হয়, যদিও তা এক আয়াত বা এক তাকবীর পরিমাণ হোক না কেন, তার জন্য সেই পরিমাণ কিয়াম করতে হবে। আর যদি এতেও অক্ষম হয়, তাহলে বসে নামায আদায় করবে। যদি সামান্য সময় কিয়াম করতে সক্ষম থাকার পরও তা ছেড়ে দেয়, তাহলে তার নামায ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটাই (হানাফী) মাযহাবের সিদ্ধান্ত। মাযহাবের কোনো ইমামের এই মতের বিপরীত অভিমত পাওয়া যায় না। এমনিভাবে কেউ যদি বসতে অক্ষম হয় তবে হেলান দিয়ে বা কোনো মানুষ, দেয়াল অথবা বালিশের সাথে টেক

[১২১৭] মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা: ৬/৬৬ হাদীস নং ৮৮৭৩ মুয়াস্সাসাতু উলূমিল কুরআন

[১২১৮] আল মাবসূত: ১/২১০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

লাগিয়ে বসতে সক্ষম হয়, তাহলে সেভাবেই বসে নামায আদায় করতে হবে। এমতাবস্থায় যদি সে চিত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করে, তাহলে তার নামায হবে না।"[১২১৯]

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে এটাও বোঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি বসে নামায পড়তে না পারলে যদ্দুর সম্ভব বসার কাছাকাছি কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে। যেমন, ইমাম আকমালুদ্দীন আল বাবীরতী রাহ. শুয়ে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও যথা সম্ভব বসার কাছাকাছি অবস্থা অবলম্বন করার কথা বলেছেন-

(فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل وسادة تحت رأسه) حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء والركوع والسجود، إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الأصحاء عن الإيماء.

"যদি মা'জুর ব্যক্তি বসতে অক্ষম হয়, তাহলে চিত হয়ে পিঠের উপর শুয়ে পড়বে এবং বসার সাদৃশ্যতা অবলম্বন করার জন্য মাথার নিচে বালিশ দিবে, যেন মাথা দ্বারা রুকু, সিজদার জন্য ইশারা করতে পারে।..."[১২২০]

কোনো ব্যক্তি যদি ওজরের কারণে পা নিচে রাখতে না পারে, ঝুলিয়ে রাখতে হয়, নিচে বসে নামায পড়ারও সাধ্য নেই, তার জন্য এভাবেই নামায পড়ার সুযোগ আছে। যেমন পূর্বে হযরত আবু বারযা রাযি.-এর আমল উল্লেখ করা হয়েছে; বরং তার বসার ক্ষেত্রেও জুলুস শব্দই ব্যবহার হয়েছে। খায়রুল কুরুনে প্রয়োজনে অশ্বারোহী ঘোড়ায় আরোহণ করা অবস্থায় নামায আদায় করার নযির বিদ্যমান আছে। হযরত ই'য়ালা ইবনে মুর্‌রা রাযি. বলেন-

أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة، فمطروا، السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، "فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، وأقام، فتقدم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء: يجعل السجود أخفض من الركوع".

"তারা (সাহাবায়ে কেরাম) একবার নবীজী ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলেন। তাঁরা একটি সংকীর্ণ ভূমিতে উপনীত হলেন এবং নামাযের সময় সমাগত হলো। এমতাবস্থায় তারা পানিতে বেষ্টিত হয়ে পড়লেন। আকাশ মাথার উপর থেকে বর্ষণ করছে। আর আদ্রতা নিচ থেকে জমে উঠছে। রাসূল ﷺ আযান-ইকামাত দিলেন এবং স্বীয় বাহন নিয়ে সবার সামনে এগিয়ে গিয়ে বাহনের উপর বসেই ইশারায় নামায পড়ালেন। সেজদার সময় মাথাকে রুকুর চেয়ে একটু বেশি ঝুঁকালেন।"[১২২১]

এ হাদীস থেকে রাসূল ﷺ-এর বাহনে আরোহণ করা অবস্থায় ফরয নামায আদায় করার প্রমাণ মেলে। এ হাদীসের সমর্থনে হযরত আনাছ রাযি.-এর আমলও এখানে উল্লেখযোগ্য। ইমাম ইবনে সিরীন রাহ.[১২২২] বলেন-

---

[১২১৯] আল বিনায়া: ২/৬৩৫, মাকতাবায়ে নাঈমিয়া

[১২২০] আল ইনায়া: ২/৪, ফাতহুল কাদীরের টীকা

[১২২১] জামে তিরমিযী: হাদীস নং ৪১১

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٢٢/١: قال عبد الحق: إسناده صحيح، والنووي إسناده حسن، وضعفه البيهقي وابن العربي وابن القطان لحال عمرو بن عثمان.

[১২২২] আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে সীরীন আলবসরী, আলআনছারী। ৩৩ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৭

أقبلنا مع أنس بن مالك من الكوفة حتى إذا كنا بأطيط (جبل بين البصرة والكوفة) أصبحنا والأرض طين وماء، فصلى المكتوبة على دابة ثم قال: ما صليت المكتوبة قط على دابتي قبل اليوم.

"আমরা আনাস ইবনে মালিকের সাথে কুফা থেকে ফিরছিলাম। আতীত (কুফা ও বসরার মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চল) নামক স্থানে উপনীত হয়ে আমরা কাদা পানিতে আটকে পড়লাম। তিনি ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করলেন এবং বললেন, আমি আজকের আগে কখনো ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করিনি।"[১২২৩]

ওজরের মৌলিক উসূল ও উল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতে পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামও বলেছেন যে, প্রয়োজনে কোনো অশ্বারোহী ঘোড়ায় আরোহণ করা অবস্থায় ফরয নামায আদায় করতে পারবে। নিম্নে দু'একটি নস উল্লেখ করা হলো। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আল মাওসিলী রাহ. বলেন-

مريض راكب لا يقدر على من ينزله يصلي المكتوبة راكبا بإيماء، وكذلك إذا لم يقدر على النزول لمرض أو مطر أو طين أو عدو.

"অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোহিত অবস্থায় থাকে এবং তাকে সওয়ারি থেকে নামানোর জন্য কেউ না থাকে, তাহলে সে বাহনের উপরই ফরয নামায ইশারায় আদায় করবে। অনুরূপ বিধান যদি আরোহী কোনো অসুস্থতা, বৃষ্টি, কাদা অথবা শত্রুর ভয়ের কারণে বাহন থেকে নামতে না পারে।"[১২২৪]

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে মুখতাসারুল কুদুরির ব্যাখ্যাকার আল্লামা হাদ্দাদী রাহ. বলেন-

المكتوبة لا تجوز على الدابة إلا من عذر وهو أن يخاف من النزول على نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان في طين أو ردغة لا يجد على الأرض مكانا جافا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه ولا يجد من يعينه فتجوز صلاة الفرض في هذه الأحوال كلها على الدابة ولا يلزمه الإعادة.

"ফরয নামায সওয়ারির উপর আদায় করা জায়েয হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি কোনো অপরাগতা থাকে যেমন, বাহন থেকে নামলে তার নিজের বা বাহনের কোনো হিংস্র জন্তু বা চোর ডাকাতের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথবা কাদা মাটির মাঝে, যেখানে নামায আদায় করার মতো কোনো শুকনো জায়গা নেই। অথবা সওয়ারি যদি এমন অবাধ্য হয় যে, তা থেকে

বছর বয়সে বসরাতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর পিতা সীরীন হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি.-এর আযাদকৃত গোলাম এবং তাঁর মাতা ছফিয়্যাহ হযরত আবু বকর রাযি.-এর আযাদকৃত বাঁদী ছিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত কাতাদাহ, হযরত আবু আইয়ুব সাখতিয়ানী, হযরত কুররাহ ইবনে খালিদ প্রমুখ তাঁর বিখ্যাত শাগরিদ। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও স্বপ্নের তাবীর ইত্যাদি শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। (তাহযীবুল কামাল: ৯/২৭, তাকরীবুত তাহযীব: ২/৮৫)

[১২২৩] قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. رواه ابن أبي شيبه وزاد: مستقبل القبلة وأو مأ أيماء وجعل السجود أخفض من الركوع.

[১২২৪] আল ইখতিয়ার লিতা'লিলিল মুখতার: ১/১৩৪, দারুল হাদীস, কায়রো

অবতরণ করার পর সাহয্যকারী ছাড়া আরোহনের সুযোগ নেই। অথবা সে যদি বৃদ্ধ হয় এবং অবতরণের পর আরোহনে সাহায্য করবে এমন কেউ না থাকে। এসব অবস্থায় ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করা যাবে এবং তার উপর নামায দোহরানো আবশ্যক হবে না।"[১২২৫]

ইমাম যাইলাঈ রাহ., আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ., আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. ও আল্লামা কাশ্মীরী রাহ. একই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।[১২২৬]

হাদীস, আছার ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হলো যে, সুনির্দিষ্ট ওজরের কারণে সওয়ারিতে বসে নামায আদায় করা যাবে। সওয়ারিতে বসা আর চেয়ারে বসার মাঝে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই; বরং সওয়ারিতে বসা চেয়ারে বসার তুলনায় আরো অস্বাভাবিক। তাই বাস্তবসম্মত ওজরের কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার অনুমোদন এখান থেকেও প্রমাণিত হয়।

তিন.

ইহুদী-খৃস্টানদের সাথে সাদৃশ্য বা একরূপতা

ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ একটি উসূল হলো, বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য বা একরূপতা অবলম্বন করা থেকে বেঁচে থাকা। এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কুরআনেও বিভিন্নভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, "ইসলাম বহু শাখা প্রশাখার সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো (আমাদের কল্যাণ সাধন ও সুফল প্রদানের ক্ষেত্রে) পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। অতএব ইসলামের যে কোনো শাখায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ইসলামকে সামগ্রিকভাবে অবলোকন করা আবশ্যক। বিশেষ করে তাহকীক ও গবেষণার ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য। কেননা খণ্ডদৃষ্টি দ্বারা কোনো বিষয় নির্ভুল ধারণা লাভ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।"

বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা এত ব্যাপক নয় যে, যেকোনো সাদৃশ্য বা একরূপতা এর আওতায় এসে যাবে। অন্যথায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ বাদ দিতে হবে। বলতে গেলে পুরো জীবনযাত্রার স্বভাবিকতা ব্যাহত হয়ে পড়বে। এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম সাদৃশ্য নিষেধের দলীল এবং শরী'আতের অন্যান্য দলীল বিবেচনা করে বিধানটিকে নির্দিষ্ট সীমায় এনে ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه، كما في البحر.

"সর্বক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন নিন্দনীয় নয়। এটা তখনই নিন্দনীয় হবে যখন তা হবে মন্দ কাজে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে সাদৃশ্যতা উদ্দেশ্য হয়।"[১২২৭]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضي خان، ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري. قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير، فقلت: أترى بهذا الحديد بأسا؟ قال

[১২২৫] আল জাওহারাতুন নায়্যিরা: ১/৯০, মাকতাবায়ে হাক্কানিয়্যা, মুলতান, পাকিস্তান

[১২২৬] রদ্দুল মুহতার: ২/৯৬, আল আরফুশ শাযী, দ্র. ফাতহুল মুলহিম: ৪/৪১৩

[১২২৭] আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪৬৪, মাকতাবায়ে আযহার

لا، قلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان؛ فقال «كان رسول الله ﷺ يلبس النعال التي لها شعر» وإنها من لباس الرهبان. فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر، فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع. اه

"আল বাহরুর রায়িকে কাযিখানের আল জামিউস সগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে নকল করা হয়েছে: (কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতা সব ক্ষেত্রেই যে মন্দ নয় এ প্রসঙ্গে) আমরাও তাদের মতোই পানাহার করি...।

এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় যখিরা গ্রন্থে- হিশাম রাহ. বলেন, আমি আবু ইউসুফ রাহ.-এর পায়ে লোহার খুঁটিযুক্ত এক পাটি জুতা দেখলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে লোহার ব্যবহারে আপনি কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, সুফিয়ান এবং সাওর ইবনে যায়দ এতে রুহবান বা বৈরাগীদের সাথে সাদৃশ্য হয় বিধায় এটাকে অপছন্দ করতেন। এর প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশমযুক্ত জুতা ব্যবহার করতেন। এটাও তো বৈরাগীদের পরিধেয়।" তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, উপকার ও সুবিধা রয়েছে এমন কাজে সাদৃশ্যতায় কোনো সমস্যা নেই...।"[১২২৮]

এখানে আল্লামা শামী রাহ. নিত্যপ্রয়োজন এবং ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর বক্তব্য থেকে এ মূলনীতি বের করেছেন যে, মানুষের প্রয়োজন মিটাতে বা কল্যাণসাধন করতে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য হলেও আপত্তির কিছু নেই। প্রয়োজনে বা কৌশলগত কারণে সাদৃশ্য অনুমোদিত। যেমন আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

و (يكفر) بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع الحر أو البرد وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين.

"বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী গরম ঠান্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অগ্নিপূজারীদের টুপি পরিধান করলে তাকফীর করা হবে। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানদের (বিশেষ) কোমরবন্ধনীর ক্ষেত্রেও একই কথা। হ্যাঁ, তবে যদি তা হয়ে থাকে শত্রুকে ধোঁকা দিতে এবং মুসলমানদের কল্যাণে, তাহলে সমস্যা নাই।"[১২২৯]

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহ. এক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

کفار کی وضع بلاضرورت قویہ حسیہ کدفع الحر والبرد یا شرعیہ کخدع اهل الحرب والتنجیس للمسلمین افعال کفر سے ہے۔[১২৩০]

চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতা নিয়ে যারা আপত্তি করেছেন তারা জোরেশোরে এ বিষয়টি সামনে আনতে চান। সাদৃশ্যের প্রশ্ন তুলেই মনে করেন যারা অনুমতি দিয়েছেন তাদের কথা দলীল নির্ভর নয়। অথচ যারা অনুমতি দিয়েছেন তারা প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করেই অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজন ব্যতিরেখে চেয়ারে নামায না হওয়ার কথাও স্পষ্টভাবেই বলেছেন। এ

[১২২৮] রদ্দুল মুহতার: ২/৪৬৪, মাকতাবায়ে আযহার
[১২২৯] আল বাহরুর রায়িক: ৫/২০৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[১২৩০] বাওয়াদিরুন নাওয়াদের: ৪৫৪, মাকতাবায়ে জায়েদ, দেওবন্দ

প্রসঙ্গে আমাদের ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় ফাতওয়ার অংশবিশেষ তুলে ধরছি-

"অপারগতা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য অবৈধতার কারণ নয়। অর্থাৎ, যা করতে মানুষ বাধ্য, যা না হলে মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হবে, এমন বিষয়ে সাদৃশ্যের বিধান প্রযোজ্য নয়। কারণ এ সকল বিষয় কারো সাদৃশ্যতা গ্রহণের জন্য করা হয় না; বরং প্রয়োজনে করা হয়। তাই কারণ বা রহস্য না বুঝে শুধু সাদৃশ্য দেখেই যদি ঢালাওভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলিকে হারাম বলে দেয়া হয়, তাহলে খাওয়া-দাওয়াসহ জীবন ধারণের অনেক মৌলিক বিষয়ও তার আওতায় চলে আসবে। কারণ, এসব বিষয় মৌলিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এ সব হারাম হয়ে গেলে মানব জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই যে সকল বিষয় আবশ্যক, প্রয়োজনীয় ও উপকারী নয় বা যে সকল মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর পথ ও পন্থা একাধিক হতে পারে সে সকল ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ রূপরেখা বর্জন করে সাদৃশ্যহীন পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ করা হয়।

এটি তখন শরী'আতের দৃষ্টিতে ওজরের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব চেয়ারের এই বৈধ ও প্রয়োজনীয় ব্যবহারকে সাদৃশ্যের অজুহাতে অবৈধ বলা যাবে না।"

উল্লেখ্য, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি প্রদান করা। অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার আমরাও নিষেধ বলি। অপব্যবহার বন্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহারের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সতর্কতা হিসেবে বিভিন্ন ফাতওয়ায় সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

চার.

চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি দিলে অপব্যবহারের দরজা খুলে যাবে

আপনি বলেছেন যে, চেয়ারে বসে নামায পড়ার অনুমতি দিলে সুযোগ সন্ধানীদের দরজা খুলে দেয়া হবে। অথচ শরী'আতে এক্ষেত্রে দরজা বন্ধ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে॥

এ বিষয়ের বিধানাবলি ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত سد الذرائع শিরোনামে উল্লেখ করে থাকেন। এর সরল ব্যাখ্যা হলো, নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা। যাতে ছিদ্রপথ না থাকে। নিষিদ্ধ কাজের পরিধি অনেক বড়। অন্য দিকে যে কাজকে নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম ধারণা করা হচ্ছে সেটিও বিভিন্ন পর্যায়ের। কোনো সময় ফরয পর্যায়ের বিধানকে কেউ হারাম কাজের মাধ্যম বানিয়ে থাকে। আবার কিছু ব্যবহৃত মাধ্যম আছে মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের। এছাড়াও প্রয়োজনের তাগিদে অবলম্বনকৃত মাধ্যমও আছে।

উল্লিখিত নীতি থেকে ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে অনেক বিধানই ব্যাহত হয়ে পড়বে। যেমন, মহিলাদের হিজাব ব্যবহার করা একটি শরী'আতস্বীকৃত বিষয়। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই এর অপব্যবহার করে থাকে। অন্যায় কাজ করে নিরাপদে সরে আসার জন্য হিজাব অবলম্বন করে থাকে। হিজাব পরিধান করে রাষ্ট্রীয় আসামী পলায়ন করার বিষয় অজানা থাকার কথা নয়। এ ধরনের আরো উদাহরণ পেশ করা যাবে; তবে বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। মূল কথা হলো, কোনো বিধানকে কেউ হারামের মাধ্যম বানালেই তা নিষেধ হয়ে যাবে না। এর বিভিন্ন স্তর ও প্রকার রয়েছে। ইমাম আবুল আব্বাস আল কারাফী রাহ.[১২৩১] বলেন-

---

[১২৩১] শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইদরীস ইবনে আব্দুর রহমান আলমিশরী, আলকারাফী আলমালেকী।

الذرائع ثلاثة أقسام

١. قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها.

٢. وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم يقل به أحد وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى.

٣. وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا.

"যরী'আসমূহ (কোনো জিনিসের যেটা কারণ বা মাধ্যম হয়) তিন প্রকার:

১. ঐ সমস্ত যরী'আ বা মাধ্যম যেগুলো নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নাই। যেমন, মুসলমানদের পথের উপর কূপ বা গর্ত খনন করা। এটা কখনো জায়েয হবে না। কারণ এটা যে কারো প্রাণহানির কারণ বা মাধ্যম হতে পারে। অনুরূপভাবে খাবারে বিষ মিশ্রিত করা। এমনিভাবে ঐ মূর্তিপূজারীর সামনে মূর্তিকে গালমন্দ করা, যার ব্যাপারে জানা আছে যে, মূর্তিকে গালমন্দ করলে সেও আল্লাহকে গালমন্দ করবে।

২. আরেক প্রকার হলো, যেটা নিষিদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। এ ধরনের মাধ্যম থেকে নিষেধ করা হবে না। যেমন, মদ তৈরী করা হবে এই সম্ভাবনার কারণে আঙ্গুর উৎপাদন থেকে নিষেধ করা হবে না...।

৩. আর কিছু যরী'আ বা মাধ্যম আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে- এসব মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা হবে কি হবে না। যেমন, বাকিতে বেচাকেনা।"[১২৩২]

ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত এ মূলনীতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন মাধ্যম যা মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের। যা পালন বা অবলম্বন করার ব্যাপারে শরী'আতের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র কোনো তলব নেই। এ ধরণের মাধ্যমগুলোই উক্ত মূলনীতি থেকে উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনে রুশদ রাহ. (৫৯৫ হি.)[১২৩৩] বলেন-

---

৬২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৮৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম (৬৬০ হি.), আবু আমর ইবনে হাজিব (৬৪৬ হি.) যকীউদ্দীন ইবনুল মুনযিরী (৬৫৬ হি.) তাঁর অন্যতম উস্তাদ। ফিকহ, উসূলে ফিকহ, লুগাহসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। আনওয়ারুল বুরূক ফী আনওয়া'ইল ফুরূক তাঁরই অমর কীর্তি। (তাবাকাতুস সুবকী: ৮/১৬১, হুসনুল মুহাযারাহ লিসসুয়ূতী: ১/৯০, আল আ'লাম লিযযিরিকলী ১/২১০)

[১২৩২] الفروق للقرافي (الفرق الثامن وخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل) (٦٢/٢ مؤسسة الرسالة)

[১২৩৩] আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ আলকুরতুবী, আলমালেকী। তিনি ইবনে রুশদ আল হাফীদ নামে প্রসিদ্ধ। ৫২০ হিজরীতে আন্দালুসের কুরতুবা (বর্তমান স্পেনের কর্ডোভা) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৯৫ হিজরীতে মরক্কোর মারাকেশ শহরে ইন্তেকাল করেন। তিনি ফিকহ, ইসলামী দর্শন, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। এসব শাস্ত্রে তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে। ফিকহশাস্ত্রে 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাছিদ' তাঁরই কালজয়ী রচনা। এছাড়াও 'উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে 'মুখতাসারুল মুস্তাস্ফা' এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে 'আল কুল্লিয়াত' রচনা করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ২১/৩০৭)

الذرائع هى الأشياء التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور.

"যারায়ে হচ্ছে ঐ সমস্ত কাজ যেগুলো বাহ্যত বৈধ; কিন্তু পরিণতিতে এগুলো অবৈধ কাজের দিকে নিয়ে যায়।"[১২৩৪]

ইমাম কুরতুবী রাহ.[১২৩৫] বলেন-

الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع في نفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع.

"যরী'আ বলা হয় এমন বিষয়কে যেটা সত্ত্বাগতভাবে বৈধ; কিন্তু এটা করার কারণে অবৈধ ও হারামে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।"[১২৩৬]

সুতরাং যে বিধানগুলো স্বতন্ত্র দলীল দ্বারা প্রতিপাদ্য ও প্রমাণিত, এমন বিধানকে কেউ গুনাহের মাধ্যম বানালেও তা নিষেধ হয়ে যাবে না। এমনিভাবে কোনো বিধান যদি উপকার ও অপকার উভয়ের মাধ্যম হয়; কিন্তু তার উপকারের দিকটা অধিক শক্তিশালী, তখনও তা অবলম্বন করার সুযোগ আছে। ইমাম আবুল আব্বাস কারাফী রাহ. বলেন-

(تنبيه) قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة...

"(সতর্কীকরণ) কখনো কখনো হারামের দিকে ধাবিত করে এমন জিনিস হারাম হয় না। যদি তাতে উপকার বা কল্যাণের পাল্লা ভারী থাকে।"[১২৩৭]

মোটকথা, ওজর বা প্রয়োজনে যে কাজগুলো করতে হয় তা কেউ গুনাহের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগালেও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে না। কারণ, এই কাজটি নিছক মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের নয়। এর পিছনে স্বতন্ত্র দলীল আছে।

ওজরের কারণে ঘরে নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেকে অলসতা করেই বাসায় একাকী নামায আদায় করে। মসজিদে আসে না। এদের কারণে কি প্রকৃত মা'জূরদের ঘরে নামায না হওয়ার ঘোষণা দেয়া যাবে?

আমাদের আলোচ্যবিষয়ে ওজর ও প্রয়োজনকে বিবেচনা করেই চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন কিছু ব্যক্তির অপব্যবহারের কারণে প্রকৃত মা'জূরদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নিষেধ করলে তাদের উপর অসাধ্য জিনিস চাপানো হবে যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

[১২৩৪] আল মুকাদ্দিমাতুল মুমাহহাদাত লি-ইবনে রুশদ: ২/৩৯, (কিতাবুল বুয়ূ)

[১২৩৫] আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল কুরতবী আলমালেকী। ৬০০ হিজরীতে আন্দালুসের কুরতুবা (বর্তমান স্পেনের কর্ডোভা) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩৩ হিজরীতে আন্দলুসের পতনের পর মিশরে হিজরত করেন। ৬৭১ হিজরীর শাওয়াল মাসে মিশরেই ইন্তেকাল করেন। তিনি তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। 'আল জামে লিআহকামিল কুরআনিল কারীম' তাঁরই রচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ। (শাযারাতুয যাহাব ৫/৩৩৫, আল আ'লাম লিযযিরিকলী ১/২১০)

[১২৩৬] আল জামে লি-আহকামিল কুরআন: (সূরা বাকারা: ১০৪)

[১২৩৭] الفروق للقرافي (الفرق الثامن وخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل) (٦٤/٢ مؤسسة الرسالة)

পাঁচ.

মা'জূর ব্যক্তিরা কি মসজিদে যাবে না?

আপনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, ওজরবিশিষ্ট ব্যক্তি কি মসজিদে যেতে পারে? এরপর আশ্চর্যবোধ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তি মসজিদে আসবে কীভাবে?

হতে পারে আপনার ধারণা হলো, প্যারালাইসিসে যার পা বিকল হয়ে গেছে, শুধু সেই ব্যক্তিই ওজরবিশিষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা মোটেও এরূপ নয়। অনেকেই আছেন যাদেরকে ডাক্তার নিচে বসতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তারা যাবতীয় কাজ চেয়ারে বসেই সম্পাদন করে। চলা ফেরাও করে হুইল চেয়ারে বসে। জমিনে বসা তাদের জন্য ক্ষতিকর, কারো জন্য অশঙ্কাজনকও। এ ধরনের ব্যক্তিরা কি মসজিদে যেতে পারবে না?

রাসূল ﷺ-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং মসজিদে যেতে অপরের সহযোগিতা গ্রহণ করা, এছাড়া মসজিদে আসার প্রতি জোর তাগিদ আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয়? হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب»

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি এসে আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, (আমি অন্ধ) আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসবে। অতএব আমাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি নামাযের আহবান (আযান) শুনতে পাও? সে বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে সাড়া দিও (অর্থাৎ, মসজিদে যাবে)।"[১২৩৮]

এ হাদীসে রাসূল ﷺ অন্ধ ব্যক্তিকেও ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দেননি। আপনার যুক্তির দৃষ্টিতে দেখলে তো এখানেও প্রশ্ন হয়, অন্ধ ব্যক্তি কি মসজিদে আসতে পারে? কিন্তু কার হিম্মত আছে যে, রাসূল ﷺ-এর ফয়সালার উপর প্রশ্ন করবে?

মোটকথা, কুরআন-হাদীসে পুরুষদেরকে মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করার জোর তাগিদ করা হয়েছে। একাগ্রচিত্তে নামায আদায়ের উত্তম স্থান মসজিদই। সুতরাং কোনো ব্যক্তি মা'জূর হলেও যদ্দুর সম্ভব মসজিদে এসে নামায পড়ার চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়।

ছয়.

ইমামের পিছনে চেয়ারে বসে নামায পড়া কি 'মুনকার'?

ওজরবিশিষ্ট ব্যক্তিও ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়তে পারবেন। তবে তাদের জন্য কাতারের কিনারায় গিয়ে সুস্থ ও আলেমদের জন্য ইমামের পিছনে নামায পড়ার সুযোগ করে দেয়াই উত্তম। ইমামের পিছনে দাঁড়ানো একটি উত্তম কাজ। ইমাম আবু দাউদ রাহ.[১২৩৯] উলূল

[১২৩৮] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৬৫৩, বাইতুল আফকারিদ দাউলিয়্যা

[১২৩৯] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর আলআযদী

আহলামি ওয়ান-নুহা' বিষয়ক হাদীস এই শিরোনামে উল্লেখ করেছেন-

باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف، وكراهية التأخير.

"ইমামের পিছনে সামনের কাতারে কে দাঁড়াবে এবং সেখানে দাঁড়ানো থেকে পিছিয়ে থাকা অপছন্দনীয় এ বিষয়ক অধ্যায়।"[১২৪০]

ইমাম আব্দুর রায্যাক রাহ.[১২৪১]ও এ ধরনের হাদীসের জন্য কাছাকাছি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب من ينبغي أن يكون في الوصف الأول.

"কার জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানো উচিত এ বিষয়ক অধ্যায়।"[১২৪২]

সুতরাং ওজর বিশিষ্ট ব্যক্তির ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়া 'মুনকার'-এর আওতায় আসে না। তাই সর্বসাধারণের জন্য 'নাহী আনিল মুনকার'-এর বিধান হিসেবে তাকে পিছনে যাওয়ার হুকুম জারি করার সুযোগ নেই। উপরন্তু এতে ফেতনা হওয়ার আশংকা রয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর শেষ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে গমন করার হাদীস সুপ্রসিদ্ধ। রাসূল ﷺ কাতারের কিনারায় না গিয়ে ইমামের পাশেই অবস্থান নিয়ে ছিলেন।[১২৪৩] মা'জুর ব্যক্তির জন্য কিনারায় দাঁড়ানো আবশ্যক হলে তিনি মাঝের দিকে আসতেন না।

এছাড়াও রাসূল ﷺ 'উলূল আহলামি ওয়ান-নুহা' কে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে বলেছেন এর বিভিন্ন উদ্দশ্যই ছিলো। আপনার উদ্ধৃত কিতাব 'দরসে তিরমিযী'তেও একাধিক উদ্দেশ্যের আলোচনা আছে।

আপনি বলেছেন ইমামের পিছনে কেবল যোগ্য ব্যক্তিরাই দাঁড়াবে। আপনি যোগ্য ব্যক্তির ব্যাখ্যা করেননি। যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় রাসূল ﷺ-এর নামায সঠিকভাবে বোঝা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্য অর্জন করা; যা উল্লিখিত হাদীসের অন্যতম ব্যাখ্যা। তাহলে চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী অযোগ্য নয়। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, প্রয়োজনে নায়েব বা খলীফা হওয়ার যোগ্যতা থাকা, তাহলে আমরা বলবো হাদীসের এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাই এ কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না যে, রাসূল ﷺ শুধু নায়েব হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই পিছনে দাঁড়াতে বলেছেন। সুতরাং এ হাদীসের ভিত্তিতে মা'জুর ব্যক্তির জন্য মসজিদের পিছনের কাতার বা একপাশে নামায পড়া, অথবা ইমামের পিছনে বসে গেলে তাকে পিছনে যেতে বাধ্য করা অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় না।

আসসিজিস্তানী। তিনি ২০২ হিজরীতে ইরানের সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৫ হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। কুতুবে ছিত্তা'র অন্যতম হাদীস গ্রন্থ 'সুনানে আবী দাউদ' তাঁরই রচনা। এছাড়াও 'মারাসিলে আবী দাউদ' রচনা করেছেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালাঃ ১৩/২০৫-২২১, তাহযীবুল কামালঃ ৪/৩৪৩)

[১২৪০] বাজলুল মাজহুদঃ ৩/৬২৩, দারুল বাশায়ের

[১২৪১]

[১২৪২] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকঃ ২/৫২

[১২৪৩] সহীহ বুখারীঃ হাদীস নং ৬৮৭, ফতহুল বারীঃ ২/২১৪-২১৫

রাসূল ﷺ শুধু নিজের পিছনেই দাঁড়াতে বলেননি; বরং নিজের কাছাকাছি প্রথম কাতারে দাঁড়াতে বলেছেন। একজনকে নয় একাধিক ব্যক্তিকেই দাঁড়াতে বলেছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে মুহাজির ও আনছার শব্দও এসেছে।[১২৪৪] একজন নায়েব হতে অপারগ হলে অন্যজন নায়েব হবে। সুতরাং কোনো মা'জুর ব্যক্তির ইমামের পিছনে নামায পড়া উল্লিখিত হাদীস পরিপন্থী হবে না। সর্বসাধারণের জন্য তাকে পিছনের কাতারে বা একপাশে যাওয়ার হুকুম জারি করারও সুযোগ নেই। সর্বোপরি একটি উত্তম কাজ যা নিয়ে বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। হাদীসের মৌলিক উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য নিম্নে প্রসিদ্ধ হাদীস ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু সুলাইমান আল খাত্তাবী রাহ. (৩৮৮ হি.)-এর বক্তব্য তুলে ধরা হলো। তিনি বলেন-

إنما أمر صلى الله عليه وسلم أن يليه ذوو الأحلام والنهى ليعقلوا عنه صلاته، ولكي يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته وليرجع إلى قولهم إن أصابه سهو أو عرض في صلاته عارض في نحو ذلك من الأمور.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন যাতে নামাযের সময় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তার পেছনে দাঁড়ায়। যাতে তারা তার থেকে নামায পরিপূর্ণরূপে বুঝে নিতে পারে। এছাড়াও নামাযে ইমামের কোনো সমস্যা হলে তারা যেন ইমামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, অথবা ইমামের কোনো ভুল হয়ে গেলে তাদের থেকে যেন শুধরে নিতে পারে।"[১২৪৫]

পূর্বের আলোচনার দ্বারা আশা করি আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়েছেন। পুরো আলোচনার ভিত্তি প্রয়োজনীয় অবস্থার উপর। আর প্রয়োজনে গৃহীত বিধান প্রয়োজনের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে চেয়ার ব্যবহার করার অনুমতি নেই। মসজিদের ইমাম সাহেবগণ মাঝে মাঝে মসজিদে আলোচনা করলে চেয়ারের অপব্যবহার কমে যাবে। একপর্যায়ে বন্ধও হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

চেয়ারে বসে নামায আদায় সম্পর্কে একটি ইশতেহার : কিছু পর্যালোচনা

আপনি ভারতের উলামায়ে তামিলনাড়ুর পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি ইশতেহার পাঠিয়েছেন। আমরা ইশতেহারের দাবি ও দলীল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনার পূর্বে বলবো যে, চেয়ারের অপব্যবহার অবশ্যই দোষণীয়। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

তবে ইশতেহারের ব্যাপকার্থবোধক শিরোনাম (کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا قطعا جائز نہیں)-এর সাথে আমরা একমত নই। ইশতেহারের প্রকাশক ভারতের হওয়ায় দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতায় এ ইশতেহার সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত তলব করলে তাঁরাও এ শিরোনামের সাথে একমত পোষণ করেননি।

১ম.

ইশতেহারের শিরোনাম দেয়া হয়েছে کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا قطعا جائز نہیں। শিরোনাম থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এতে ফিকহী বিচক্ষণতার তুলনায় মানসিক জযবা প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বস্বীকৃত

[১২৪৪] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ২/৫৩, হাদীস নং ২৪৫৭

[১২৪৫] মা'আলিমুস সুনান: ১/১৫৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

কথা হলো, শরী'আতে কিছু বিষয় এমন আছে যা কাত'য়ী বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর কিছু বিধান রয়েছে যন্নী বা ইজতিহাদী। প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে قطعا 'অকাট্য' শব্দ ব্যবহার হতে পারে। এসব বিধান সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট; এতে অন্য ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে ইজতিহাদী বিষয়ে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ নয়। অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়ের পক্ষে-বিপক্ষে না কোনো অকাট্য ও সুস্পষ্ট আয়াত আছে, না কোনো হাদীস। বরং এমন হাদীস ও শরী'আহ-এর মূলনীতি রয়েছে যা বৈধ হওয়ার প্রবল দাবি রাখে।

২য়.

ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কুরআনের খেলাফ। প্রকৃতপক্ষে ইশতেহারে নামাযে খুশু-খুজু'র তারগীব বিষয়ক উল্লিখিত আয়াত দ্বারা চেয়ারে বসে নামায অকাট্যভাবে নাজায়েয হওয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ, খশু-খুজু সম্পর্কে দু'টি আয়াত উল্লেখ করে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় খুশু-খুজু'র খেলাফ। লক্ষণীয় বিষয় হলো, চেয়ারে বসে নামায খুশু-খুজু'র খেলাফ বা চেয়ারে বসে নামায আদায় খুশু-খুজু'র আওতায় আসে না- এ সিদ্ধান্তটি কুরআনের ভাষ্য নাকি তাদের নিজেদের বুঝ ও ইজতিহাদ? নিশ্চিত জবাব হলো, এটি তাদের ইজতিহাদ বা বুঝ।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করার দ্বারা তাতে খুশু-খুজু না থাকায় তা জায়েয না হয়, তাহলে রাসূল ﷺ চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহন করে নফল নামায কীভাবে আদায় করার অনুমতি দিলেন? নিজেও আমল করলেন? প্রয়োজনে ফরয নামায পড়ার প্রমাণ কীভাবে হাদীস, আসার এবং ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবে পাওয়া যায়? অথচ চেয়ারে বসা আর ঘোড়ায় বসার মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহন করে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে তারা যে জবাব দিবেন আমরাও তাই বলবো।

৩য়.

ইশতেহারে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্বিতীয় সংশয় নিরসনে করা হয়েছে। এখানে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ-এর কাছে চেয়ার ছিলো। এরপরও তিনি চেয়ারে বসে নামায পড়েননি। এ বিষয়েও পিছনে আলোচনা হয়েছে।

এখানে একটি দিক তুলে ধরছি। তাদের আলোচনার ধরন থেকে বোঝা যায়, তারা মনে করেন, কোনো কিছু ব্যবহারের সুযোগ থাকার পরও রাসূল ﷺ তা ব্যবহার না করা সর্বাবস্থায় তা অবৈধ হওয়ার দলীল। অথচ বিষয়টি এমন নয়। ইমাম আবু ইসহাক শাতেবী রাহ. যিনি উসূলে শরী'আতের একজন সর্বস্বীকৃত ইমাম, তিনি রাসূল ﷺ যে কাজগুলো করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দিয়েছেন তা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সবগুলোকে এক পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত করেননি। শ্রেণীবিন্যাস করে তিনি বলেন-

وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم:

ومنها: ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل؛ فإن القسم لم يكن لازما لأزواجه في حقه، وهو معنى قوله

تعالى: ﴿تُرۡجِي مَن تَشَآءُ مِنۡهُنَّ وَتُـٔۡوِيٓ إِلَيۡكَ مَن تَشَآءُۖ﴾[১২৪৬] عند جماعة المفسرين، ومع ذلك؛ فترك ما أبيح له إلى القسم الذي هو أخلق بمكارم أخلاقه، وترك الانتصار ممن قال له: اعدل؛ فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ونهى من أراد قتله، وترك قتل المرأة التي سمت له الشاة، ولم يعاقب عروة بن الحارث إذ أراد الفتك به، وقال: من يمنعك مني؟ الحديث.

"পূর্বোল্লিখিত কারণ ছাড়াও আরো বিভিন্ন কারণে কোনো বৈধ কাজ বর্জন করা হতে পারে। যেমন, মুবাহকে ত্যাগ করে তার চেয়ে উত্তমকে গ্রহণ করা। মুফাসসিরীনদের এক জামাতের বক্তব্য অনুযায়ী (এই আয়াত)-এর ভিত্তিতে নবী কারীম ﷺ-এর উপর স্ত্রীদের জন্য সম-সময় বন্টন আবশ্যক ছিলো না। তার পরও তিনি সময় বন্টন করতেন। তাঁর উন্নত চরিত্রের সাথে মানানসই হিসেবে। তাঁর জন্য সময় বন্টন না করা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন...(আরো কিছু উদাহরণ)।"[১২৪৭]

এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ কোনো কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করা কাজটি অবৈধ হওয়ারই দাবি করে না; বরং এক্ষেত্রে অন্য কারণও বিদ্যমান থাকতে পারে। যেমন, উত্তম আখলাক অবলম্বন, আবদিয়্যাত প্রকাশ করা ইত্যাদি।

মোটকথা, যে কাজের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে- একটি উত্তম আরেকটি মুবাহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি এর মধ্য হতে উত্তম পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন, তাহলে এর দ্বারা মুবাহ পদ্ধতিটি নাজায়েয সাব্যস্ত হবে না। এ নীতিটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন, 'দ্বব' (এক ধরনের প্রাণী) খাওয়া সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, لا آكله ولا أحرّمه[১২৪৮]। এতে তিনি না খাওয়ার দিক গ্রহণ করলেও অন্যদের বারণও করেননি। এছাড়া মুবাহ পর্যায়ের অনেক বিধান সুনির্দিষ্টভাবে রাসূল ﷺ বলে যাননি; বরং মৌলিক দিকনির্দেশনা দিয়ে উম্মতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বিষয়টি ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহ.-এর বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয়। তিনি বলেন-

ليس على النبي ﷺ بيان كل شيء مباح، ولا توقيف الناس عليه بنص يذكره.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য প্রত্যেক বৈধ বিষয় বর্ণনা করা বা নির্দিষ্টভাবে মানুষকে তা জানিয়ে দেয়া জরুরী নয়।"[১২৪৯]

ইশতেহারে জমিনে নামায পড়ার প্রতি প্রবল তাগিদ বোঝানোর জন্য তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হাদীস আহমদ বুসীরী রাহ.-এর কিতাব 'ইতহাফুল-খিয়ারা' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। বুসীরী রাহ. হাদীসটি উল্লেখ করেছেন 'সুনানে বাইহাকী' থেকে। তিনি বলেন-

رواه البيهقي في سننه من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ عاد مريضا فرآه يصلي

[১২৪৬] সূরা আহযাব: ৫১
[১২৪৭] আল মওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শারইয়্যাহ: ৪/৩৪৩, দারুল হাদীস, কায়রো
[১২৪৮] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৯৪৩
[১২৪৯] আল ফুসূল ফিল উসূল: ১০/২

على وسادة، فأخذها فرمى بها، وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال ﷺ: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومىء.

"ইমাম বাইহাকী রাহ. স্বীয় সুনানে সুফিয়ান সাওরীর সনদে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তির যিয়ারতে গিয়ে তাকে দেখতে পান, একটি বালিশের উপর নামায পড়ছে। তিনি বালিশ সরিয়ে ফেললেন। এবার অসুস্থ সাহাবীটি একটি কাষ্ঠখণ্ড নিলেন। এটাও তিনি সরিয়ে ফেললেন এবং বললেন, যদি পারো জমিনে সিজদা করো, অন্যথায় ইশারায় আদায় করো।"

দ্বিতীয় হাদীসটি দু'একটি শব্দ ছাড়া হুবহু প্রথম হাদীস। যা সরাসরি 'সুনানে বাইহাকী' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

عن جابر، أن النبي ﷺ قال لمريض: صل على وسادة، فرمى بها، وقال ﷺ: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومىء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك.

মূল বক্তব্য আগের বর্ণনার অনুরূপ। তবে এখানে শেষে ইশারার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, রুকুর তুলনায় সেজাদার সময় মাথা একটু বেশি ঝোঁকাবে।

তৃতীয় হাদীস মূলত হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর ফাতওয়া; যা 'সুনানে বাইহাকী' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

عن جبلة قال سئل بن عمر وأنا أسمع عن الصلاة على المروحة فقال لا تتخذ مع الله إلها آخر وقال لا تتخذ لله أندادا صل قاعدا واسجد على الأرض فإن لم تستطع فأوم إيماء وإجعل السجود أخفض من الركوع.

"হযরত জাবালা রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ কানে শুনেছি, হযরত উমর রাযি. -কে (সেজদায় অক্ষম ব্যক্তি) পাখা জানালার খাঁজে মাথা রেখে নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে গ্রহণ করো না। কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক বানিয়ো না; বরং বসে বসে নামায আদায় করো এবং জমিনে সেজদা করো। যদি সক্ষম না হও, ইশারা করো। সিজদার সময় মাথা রুকুর চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকাবে।"

ইশতেহারে প্রত্যেক হাদীসে চিহ্নিত বাক্যগুলোর অর্থ করা হয়েছে এভাবে-

تکیہ پر نماز ادا کر رہا ہے۔۔۔ پھر اس نے نماز کے لئے ایک لکڑی کا انتخاب کر لیا، تاکہ اس پر نماز پڑھے۔۔۔ پنکھے پر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا۔

এভাবে অনুবাদ করার পর লেখা হয়েছে *مذکورہ احادیث میں زمین پر پڑھنے کا لفظ جو بار بار آیا ہے غور طلب ہے۔* এ সকল ইবারত থেকে বোঝা যায় যে, তারা হাদীসের মতলব বুঝেছেন যে, "জনৈক ব্যক্তি বালিশ বা পাখার উপর নামায পড়তে ছিলো। রাসূল ﷺ এবং ইবনে উমর রাযি. তা থেকে বারণ করেছেন এবং জমিনেই নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় ইশারা করে নামায পড়তে বলেছেন।" অথচ এ হাদীসগুলোতে নামায পড়া নয়; বরং সিজদা করা উদ্দেশ্য ছিলো। যেমন, প্রথম হাদীসটি ইমাম আবু ইয়া'লা রাহ.[১২৫০]ও বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার

[১২৫০] আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুছান্না ইবনে ইয়াহইয়া আততামীমী, আলমাওসিলী। তিনি ইমাম আবু ইয়ালা নামে

শব্দ হলো-

عن جابر بن عبد الله قال: «عاد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مريضا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال: "إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع»

"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তির যিয়ারতে গেলেন। আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তাকে বালিশের উপর সিজদা করতে দেখে তা থেকে বারণ করলেন এবং বললেন, যদি সক্ষম হও তাহলে জমিনের উপর সেজদা করো। আর না হয় ইশারায় আদায় করো। সিজদার সময় মাথাকে রুকুর চেয়ে বেশি ঝোঁকাবে।"[১২৫১]

এখানে 'সিজদা' শব্দটি উল্লেখ হওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, বাইহাকীর রেওয়ায়াতে 'সিজদা' শব্দটি উহ্য ছিলো অথবা ওখানে 'সালাত' সিজদার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

তৃতীয় হাদীসে 'সালাত' সিজদার অর্থে ব্যবহার হওয়ার বিষয়টি আরো পরিষ্কার। প্রশ্ন-উত্তরের আন্দায থেকেও তা বোঝা যায়। সুতরাং বালিশে সিজদা নিষেধ করা এক বিষয়, আর প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়া অন্য বিষয়। উপরন্তু উঁচু স্থানে সিজদা নিষেধ হওয়ার বিশেষ কারণও আছে, যা চেয়ারে বসার মাঝে বিদ্যমান নেই। হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর ফাতওয়ার মাঝে কারণের উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, সিজদার সময় কোনো উঁচু স্থান বা জিনিস থাকলে এর উপর সিজদা করলে এক রকম মূর্তিপুজার সাদৃশ্য হয়ে যায়। এ জন্যই ইবনে উমর রাযি. ফাতওয়ায় শিরকের দিকে ইশারা করেছেন।

৪র্থ.

ইশতেহারে ইজমার দাবিও করা হয়েছে; কিন্তু দলীল বা ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। সুতরাং আমরাও লম্বা আলোচনা করছি না। তবে আমরা তাদের এ দাবি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। ইজমা প্রমাণিত না হওয়ার পক্ষে অনেক ফিকহী দলীল ও নযির রয়েছে। এ ছাড়া উসূলে ফিকহের 'ইজমা' অধ্যায় বুঝে পাঠ করলে যেকোনো বিজ্ঞ আলেম উক্ত ইজমার অসারতা সহজেই বুঝতে পারবেন।

ফিকহী দলীল যা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুফতিয়ানে কেরামের ভাষ্য বুঝতে খুবই তাড়াহুড়া করা হয়েছে। ভাসাভাসা দৃষ্টিই এক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, আল্লামা শামী রাহ.-এর বক্তব্য ও উল্লিখিত ফাতওয়াগুলো গভীর দৃষ্টিতে পড়লেই চেয়ারে বসে নামাযের বৈধতার দিক বের হয়ে আসে।

দারুল উলূম দেওবন্দের মুখপত্র 'মাহনামা দারুল উলূম'-এর ১৪৩৩-১৪৩৪ হি.-এর জিলহজ্জ-

---

প্রসিদ্ধ। ২১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হাদীসশাস্ত্রে তিনি বড় ইমাম ছিলেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (২৩৩ হি.), ইমাম আলী ইবনুল মাদীনি (২৩৪ হি.), ইমাম আহমদ বিল হাম্বল (২৪১ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আবু হাতেম ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.), ইমাম সুলায়মান ইবনে আহমাদ আততাবরানী (৮২১ হি.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার রচিত 'মুসনাদে আবু ইয়ালা', 'মু'জামে আবু ই'য়ালা' হাদীসশাস্ত্রে ইলমের বিশাল ভান্ডার। (সিয়ারু আলমিন নুবালা: ১৪/১৮০)

[১২৫১] اتحاف الخيرة المهرة بزوائد العشرة (باب الإيماء) ٢٠٦/٢ رقم الحديث: ١٣٤٨، دار الوطن للنشر.

মুহার্‌রম সংখ্যায় চেয়ারে বসে নামাযের বিধান সম্পর্কে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। এ প্রবন্ধে একাধিক প্রমাণাদির দ্বারা প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

এছাড়া দারুল উলূমের ফাতওয়া বিভাগ থেকে একটি আধুনিক মাসাইলের সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে ১৪৩৩ হি. মুতাবেক ২০১২ খৃ.। এতে ফাতওয়া বিভাগের মুফতিয়ানে কেরামের সত্যায়ন রয়েছে। সংকলনটি মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা.-এর সম্পাদনার পর মজলিসে শুরার অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা হয়। এ কিতাবে প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের সুস্পষ্টভাবে অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেমন-

البتہ اگر زمین پر کسی بھی ہیئت میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا دشوار ہو جائے تو پھر کرسیوں پر ضرورت کی وجہ سے نماز ادا کی جاسکتی ہے؛ لیکن زمین پر بیٹھ کر رکوع وسجدہ کی قدرت ہونے کی صورت میں کرسی پر اشارے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔

البتہ اگر زمین پر کسی بھی ہیئت میں بیٹھنا دشوار ہو، تب کرسی پر نماز ادا کی جاسکتی ہے۔

"তবে যদি জমিনে বসে নামায আদায় করা সর্বাবস্থায় কষ্টকর হয়, তাহলে প্রয়োজনের খাতিরে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু জমিনে বসে রুকু এবং সিজদা করতে সক্ষমতা হওয়ার পরও চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয নয়। তবে যদি জমিনে বসে নামায আদায় করা সর্বাবস্থায় কষ্টকর হয় তখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যাবে।"[১২৫২]

ইশতেহারে দারুল উলূমের যে ফাতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে এর শব্দগুলো ভালোভাবে পড়লেই বৈধতার দিকে বের হয়ে আসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফাতওয়ার নাম্বার অনুযায়ী কিছু ইবারত উল্লেখ করা হলো-

۲-کرسیوں کے بلاضرورت استعمال سے صفوں میں بہت خلل ہوتا ہے۔

۳-بلاضرورت کرسیوں کو مساجد میں لانے سے اغیار کی مشابہت ہوتی ہے۔

۴-بلاضرورت کرسی پر بیٹھ کر ادا کرنے کے مقابلہ میں زمین پہ انکساری بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔

"(২) বিনা প্রয়োজনে (মসজিদের মধ্যে নামাযের জন্য) চেয়ার ব্যবহার করার ফলে কাতারের মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

(৩) বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ার আনার কারণে বিধর্মীদের (উপাসনালয়ের) সাথে সাদৃশ্যতা সৃষ্টি হয়।

(৪) বিনা প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার তুলনায় জমিনে বসে নামায আদায় করার দ্বারা (আল্লাহর সামনে) সর্বাধিক নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।"

ফাতওয়ার শব্দগুলো অনেকটাই পরিষ্কার। এরপরও এ ফাতওয়াকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা একদম নাজায়েয হওয়ার পক্ষে কীভাবে উল্লেখ করলেন- তা আমাদের বোধগম্য নয়। কিফায়াতুল মুফতী এবং আহসানুল ফাতাওয়া থেকে যে ফাতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও

[১২৫২] چند اہم عصری مسائل پر دار الافتاء دار العلوم دیوبند سے صادر کئے گئے فتاوی: ۱/۱۲۹-۱۳۲

বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কমপক্ষে বলা যায় অবৈধ হওয়ার পক্ষে পরিষ্কার কোনো কথা নেই।

মোটকথা, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনো বাস্তবতাকে শর'য়ী বিধানের সাথে সমন্বয় করে সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অনেক ইলমী আয়োজন, উপকরণ ও গবেষণা প্রয়োজন। অন্যথায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আর শর'য়ী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে 'শায' বা বিচ্ছিন্ন চিন্তা অবলম্বন করে তা জনসাধারণের মাঝে প্রচার করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। اللهم اهدنا وسدّدنا

বিনীত
বান্দা আব্দুল্লাহ নাজীব
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৩ সফর ১৪৩৭ হি. ১৬ নভেম্বর ২০১৫ খৃ.

<u>সত্যায়নে</u>

أصاب فيما أجاب وأجاد فيما أفاد
العبد الضعيف كفاية الله
٢١/٣/١٤٣٧هـ

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২১ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হি.

نعم ما أجاد فيما أفاد
نور احمد عفي عنه

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

لقد سعى المجيب وكان سعيه مشكورا
٢٣/٤/١٤٣٧هـ

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ রবিউল আখের ১৪৩৭ হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
৩০ রবিউল আখের ১৪৩৭ হি.

গ্রন্থপঞ্জি

১ **আল কুরআনুল কারীম** القرآن الكريم

তাফসীর ও উলূমুল কুরআন

২ **রুহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল কারীম ওয়াস সাবইল মাছানী** روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني
আল্লামা আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহমুদ আল আলুসী আল বাগদাদী রাহ. (১২৭০ হি.)
মাকতাবায়ে এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান

৩ **আল জামে' লিআহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী)** الجامع لأحكام القرآن
আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী রাহ. (৬৭১ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

৪ **জামিউল বয়ান আন তাবীলি আয়িল কুরআন (তাফসীরে তাবারী)** جامع البيان في تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)
আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর ইবনে ইয়াযিদ আত তাবারী রাহ. (৩১০ হি.)
আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো, মিসর

৫ **তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (তাফসীরে ইবনে কাসীর)** التفسير القرآن العظيم
হাফেয ইমামুদ্দীন আবুল ফেদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর আদ দিমাশকী রাহ. (৭৭৪ হি.) দারুল কুরআনিল কারীম, বৈরুত, লেবানন

৬ **তাফসীরে মাযহারী** التفسير المظهري
কাযী সানাউল্লাহ পানিপতী রাহ. (১২২৫ হি.)
মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

৭ **আহকামুল কুরআন (১-২)** أحكام القرآن
যফর আহমদ ইবনে লতীফ আল উসমানী আত-থানভী রাহ. (১৩৯৪ হি.)
ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান
প্রকাশকাল ১৪১৩ হি.

৮ **আহকামুল কুরআন (৩-৪)** أحكام القرآن
মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহ. (১৩৯৬ হি.)
ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান
প্রথম প্রকাশঃ ১৪১৩ হি.

৯ **আহকামুল কুরআন (৫)** أحكام القرآن
শাইখুত তাফসীর মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলবী রাহ. (১৩৯৪ হি.)
ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান

প্রথম প্রকাশ ১৪১৩ হি.

১০ **মা'আরিফুল কুরআন** — معارف القرآن
মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহ. (১৩৯৬ হি.)
ফরিদ বুক ডিপো, দিল্লী, ভারত

১১ **মা'আরিফুল কুরআন** — معارف القرآن
শাইখুত তাফসীর মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলবী রাহ. (১৩৯৪ হি.)
ফরিদ বুক ডিপো, দিল্লী, ভারত
প্রকাশকাল: ১৪২১ হি. ২০০০ ইং

১২ **আহকামুল কুরআন** — أحكام القران للطحاوى
আল্লামা আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তাহাবী রাহ. (৩২১ হি.)

হাদীস ও উলূমুল হাদীস

১৩ **সহীহ বুখারী** — صحيح البخاري
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল রাহ. (২৫৬ হি.)
কুতুবখানা রশিদিয়া দিল্লী; আশরাফিয়া বুক ডিপো
হাদীস নাম্বার ফুআদ আব্দুল বাকী রাহ. এর সংখ্যানুক্রমে

১৪ **সহীহ মুসলিম** — صحيح مسلم
ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জায ইবনে মুসলিম কুরাইশী রাহ. (২৬১ হি.)
আশরাফিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ, ভারত
হাদীস নাম্বার ফুআদ আব্দুল বাকী রাহ. এর সংখ্যানুক্রমে

১৫ **সুনানে আবু দাউদ** — سنن أبي داود
সুলাইমান ইবনে আশ'আস আবী দাউদ রাহ. (২৭৫ হি.)
আশরাফী বুক ডিপো দেওবন্দ, ভারত
হাদীস নাম্বার ফুআদ আব্দুল বাকী রাহ. এর সংখ্যানুক্রমে

১৬ **সুনানুত তিরমিযী** — جامع الترمذي
ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী রাহ. (২৭৯ হি.)
আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত

১৭ **সহীহ ইবনে খুজাইমাহ** — صحيح ابن خزيمة
আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুজাইমাহ সালামী নিশাপুরী রাহ. (২২৩-৩১১ হি.)
আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১২ হি. ১৯৯২ ইং

১৮ **মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক** — مصنف عبد الرزاق
হাফেয আবু বকর আব্দুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম আস সানআনী রাহ. (২১১ হি.)
মজলিসে ইলমী করাচী, পাকিস্তান

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৬ হি. ১৯৯৬ ইং

১৯ **মাজমাউয যাওয়ায়েদ ও মাম্বাউল ফাওয়াইদ** مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
আবুল হাসান নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবী বকর হাইছামী রাহ. (৮০৭ হি.)
দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন ১৪১৪ হি. ১৯৯৪ ইং

২০ **আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী** السنن الكبرى للبيهقي
আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল খুরাসানী আল বাইহাকী রাহ. (৪৫৮ হি.)

আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন المستدرك
ইমাম হাফেয আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী রাহ. (৪০৫ হি.)
দারুল মা'রেফা, বৈরুত, লেবানন

২১ **মুসনাদে আহমদ** مسند أحمد
আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে হাম্বল আশ শাইবানী রাহ. (২৪১ হি.)
মুআস্সাসাতুর রিসালাহ

২২ **আল-মুসনাদুস সহীহ আলাত তাকাসীম ওয়াল আনওয়া' (সহীহ ইবনে হিব্বান)** المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع (صحيح ابن حبان)
ইমাম আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান আত তামীমী আদ দারিমী আল খুরাসানী রাহ. (৩৫৪ হি.)
দারুল মা'আরিফাহ, বৈরুত, লেবানন
প্রথম সংস্করণ ১৪২৫ হি. ২০০৪ ইং

২৩ **ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী** فتح الباري شرح صحيح البخاري
হাফেয শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী রাহ. (৮৫২ হি.)
দারুল কুতুবিল ইসমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন
প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. ১৯৮৯ ইং

২৪ **ফাতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম** فتح الملهم شرح صحيح الإمام مسلم
আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী রাহ. (১৩৬৯ হি.)
মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান
প্রকাশকাল ১৪১৯ হি.

২৫ **ই'লাউস সুনান** إعلاء السنن
আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. (১৩৯৪ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন
প্রকাশকাল ১৪১৮ হি. ১৯৯৭ ইং
ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়াহ, করাচী, পাকিস্তান

২৬ **আওজাযুল মাসালেক ইলা মুআত্তায়ে মালেক** أوجز المسالك إلى موطأ مالك
শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ইসমাঈল কান্ধলবী রাহ. (১৪০২ হি.)
দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

প্রকাশকাল ১৪১০ হি. ১৯৮৯ ইং

২৭ **আল মুজামুল আওসাত** — المعجم الأوسط
ইমাম হাফেয আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ূব তবারানী রাহ. (৩৬০ হি.)
প্রকাশকাল: ১৪২০ হি. ১৯৯৯ ইং, দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন

২৮ **শরহুল বেকায়া ফী মাসাইলিল হিদায়া** — شرح الوقاية في مسائل الهداية
সদরুশ শরীআহ উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে তাজুশ শরীআহ আল মাহবুবী আল বুখারী রাহ. (৭৪৭ হি.)
মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

২৯ **আন নাহরুল ফায়েক** — النهر الفائق شرح كنز الدقائق
সিরাজুদ্দীন উমর ইবনে ইবরাহীম ইবনে নুজাইম আল হানাফী রাহ. (১০০৫ হি.)
কদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান

৩০ **আল বিনায়াহ শরহুল হিদায়া** — البناية شرح الهداية
আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আহমদ ইবনে হুসাইন বদরুদ্দীন আইনী রাহ. (৮৫৫ হি.)
মাকতাবায়ে নাঈমিয়া, দেওবন্দ, ভারত
প্রকাশকাল: ১৪২৭ হি. ২০০৬ ইং

৩১ **আস সিয়ারুল কাবীর** — السير الكبير
মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ শাইবানী রাহ. (১৮৯ হি.)
আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ

৩২ **ফায়যুল বারী আলা সহীহিল বুখারী** — فيض الباري على صحيح البخاري
আল্লামা আনওয়ার শাহ ইবনে মুআযযম শাহ কাশ্মীরি রাহ. (১৩৫৩ হি.)
আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, সাহারানপুর, দেওবন্দ

৩৩ **উমদাতুল কারী** — عمدة القاري
আল্লামা বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আল-আইনী রাহ. (৮৫৫ হি.)
দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

৩৪ **আল-মুসনাদুল কাবীর** — المسند الكبير
আল্লামা আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আশ-শাইবানী রাহ. (২৮৭ হি.)

৩৫ **নাসবুর রায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়াহ** — نصب الرأيه في تخريج أحاديث الهداية
আল্লামা জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে ইউসুফ আয যাইলায়ী রাহ. (৭৬২ হি.)
দারুল হাদীস, কায়রো
প্রকাশকাল: ১৪১৫ হি.

৩৬ **আস সুনানুস সুগরা** — السنن الصغرى
আল্লামা আহমদ ইবনে হুসাইন আল বাইহাকী রাহ. (৪৫৮ হি.)

দারুদ দিরাসাহ আল ইলমিয়্যা
প্রকাশকাল: ১৪১০ হি.

৩৭ **আল মুজামুল কাবীর লিততাবারানী** — المعجم الكبير للطبراني
আল্লামা আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমদ আশ শামী রাহ. (৩৬০ হি.)
মাকতাবায়ে ইবনে তাইমিয়া

৩৮ **আল-ইহসান ফী তাকরীরি সহীহি ইবনে হিব্বান বি-তারতীবি ইবনে বিলবান** — الإحسان في تقرير صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
আবু হাতিম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান
মুরাত্তিব: আলাউদ্দীন ইবনে আলী বিলবান
(৭৩৯ হি.)

৩৯ **শারহুস সিয়ারিল কাবীর** — شرح السير الكبير
শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ **ইবনে** আহমদ আস সারাখসী রাহ. (৪৩৮ হি.)

৪০ **ফিকহুস সুনানি ওয়াল-আসার** — فقه السنن والآثار
আল্লামা মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-হুসাইনি আল-মুজাদ্দেদী রাহ. (১৩৯৫ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

৪১ **তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম** — تكملة فتح الملهم
আল্লামা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ (জন্ম: ১৩৬২ হি.)

৪২ **আওনুল মা'বুদ আলা সুনানি আবী দাউদ** — عون المعبود على سنن أبي داود
আল্লামা আশরাফ ইবনে আমীর আজীমাবাদী রাহ. (১৩২৯ হি.)
দারুল হাদীস, কায়রো

৪৩ **আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী** — السنن الكبرى للبيهقي
আল্লামা আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাকী (৪৫৮ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন
প্রকাশকাল: ১৪২৪ হি.

৪৪ **কিতাবুল আছার** — كتاب الآثار
ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (১৮৯ হি.)

৪৫ **মুয়াত্তা মুহাম্মদ** — الموطأ للإمام محمد
ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (১৮৯ হি.)

৪৬ **মুশকিলুল আসার** — مشكل الآثار
আল্লামা আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তহাবী রাহ. (৩২১ হি.)
মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন

৪৭ **নুখাবুল আফকার** — نخب الأفكار
আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী রাহ. (৮৫৫ হি.)

৪৮ **বাজলুল মাজহুদ ফী হাল্লি সুনানি আবী দাউদ** — بذل المجهود في حل سنن أبي داود
আল্লামা খলীল আহমদ ইবনে মাজীদ আলী ইবনে আহমদ আলী সাহারানপুরী রাহ. (১৩৪৬ হি.)

৪৯	**আস সুনানুল কুবরা** আল্লামা আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব আন-নাসায়ী রাহ. (৩০৩ হি.) মুয়াসসাসুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন	السنن الكبرى للنسائي
৫০	**ইতহাফুল খিয়ারাতিল মাহারাহ বিযাওয়াইদিল মাসানীদিল আশারাহ** আল্লামা আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ইসমাঈল আল-বূসীরী আশ-শাফেয়ী রাহ. (৮৩৯ হি.) দারুল ওতন	إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة
৫১	**আল আহাদীসুল মুখতারাহ** হাফিজ জিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী রাহ. (৬৪৩ হি.) দারুল খিযির, প্রকাশকাল: ১৪২১ হি.	الأحاديث المختارة
৫২	**আল আযকার** ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন-নববী রাহ. (৬৭৬ হি.) দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. ২০০৩ ইং	الأذكار
৫৩	**আল ইসতিযকার** ইমাম আবু উমর ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ (ইবনে আব্দুল বার) রাহ. (৪৬৩ হি.) দারু কুতাইবা	الاستذكار
৫৪	**বুলুগুল আমানী মিন আসরারিল ফাতহির-রাব্বানী** আল্লামা আহমদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ আল-বান্না আস-সা'আতী রাহ. (১৩৭৮ হি.) দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন প্রথম/দ্বিতীয় প্রকাশ	بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني
৫৫	**ফাইযুল কাদীর শরহু জামিউস সগীর** আল্লামা যাইনুদ্দীন আব্দুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফীন আল মুনাবী আল কাহেরী রাহ. (১০৩১ হি.) দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন	فيض القدير شرح جامع الصغير
৫৬	**মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল মাসাবীহ** নুরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ আল-কারী আল-মাক্কী রাহ. (১০১৪ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন প্রকাশকাল: ১৪২২ হি.	مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
৫৭	**মুসনাদে আবু ই'য়ালা আল মাওসিলী** ইমাম আবু ই'য়ালা আহমদ ইবনে আলী আত তামীমী আল মাওসিলী রাহ. (৩০৭ হি.) দারুস-সাকাফতিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত	مسند أبي يعلى الموصلي
৫৮	**মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল**	مسند الإمام أحمد بن

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. (২৪১ হি.)
মু'আসসাসাতুর-রিসালাহ, বৈরুত
প্রকাশকাল: ১৪১৬ হি.

حنبل

৫৯ **মুসনাদুল বাযযার**
ইমাম আবু যফর আহমদ আল-বাযযার (২৯২ হি.)
মাকতাবাতুল উলূমি ওয়াল হিকাম, মদিনা মুনাওয়ারাহ
প্রকাশকাল: ১৪১৪ হি.

مسند البزار

৬০ **মুসনাদে হুমাইদী**
ইমাম যফর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর আল-হুমাইদী রাহ. (২১৯ হি.)
আল-মাজলিসুল ইলমী করাচী, পাকিস্তান
প্রকাশকাল: ১৩৮২ হি.

المسند للإمام الحميدي

৬১ **আল মুসাফফা শরহুল মুআত্তা**
আল্লামা শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রাহ. (১১৭৬ হি.)
কুতুবখানায়ে রহীমিয়্যাহ

المصفّى شرح الموطأ

৬২ **মিসবাহুয যুজাজাহ আলা সুনানি ইবনে মাজাহ**
আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ূতী রাহ. (৯১১ হি.)
দারুল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন
প্রকাশকাল: ১৪০৩ হি.

مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة

৬৩ **মা'আরিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার**
ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বাইহাকী রাহ. (৪৫৮ হি.)
জামিয়াতুদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ করাচী, পাকিস্তান
দারুল ওয়াফা মানসূরা, কায়রো
প্রকাশকাল: ১৪২২ হি.

معرفة السنن والآثار

৬৪ **আল-মুনতাকা মিনাস-সুনানিল মুসনাদাতি আন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম**
হাফেয আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আলী ইবনুল-জারূদ রাহ. (৩০৭ হি)
মুআসসাসাতুল কুতুবিস-সাকাফিয়্যাহ, দারুল জানান
প্রকাশকাল: ১৪০৮ হি.

المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

৬৫ **আন নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আসার**
আল্লামা ইযযুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-জাযারী (ইবনুল আসীর) রাহ. (৬৩০ হি.)
মুআসসাসাতুত-তারীখিল আরাবী, দারু ইহ্ইয়াইত-তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

النهاية في غريب الحديث والآثار

ফিকহ ও উলূমুল ফিকহ

৬৬ **বাদায়েউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে'**
ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল কাসানী রাহ. (৫৮৭হি.)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

দারুল হাদীস কায়রো, মিসর
প্রকাশকাল: ১৪২৬হি. ২০০৫ইং

৬৭	**বাদায়েউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে'** ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল কাসানী রাহ. (৫৮৭ হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহরানপুর, ভারত প্রথম প্রকাশ ১৪১৯হি. ১৯৯৮ইং	بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
৬৮	**বাদায়েউস সানায়ে ফী তারতীবিশ শারায়ে'** ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল কাসানী রাহ. (৫৮৭ হি.) এইচ. এম. সাঈদ করাচী, পাকিস্তান	بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
৬৯	**মাজমাউল আনহুর ফী শরহি মুলতাকাল আবহুর** আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল কালয়ুবী (শাইখী যাদাহ, দামাদ আফেন্দী) রাহ. (১০৭৮ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন প্রকাশকাল ১৪১৯ হি. ১৯৯৮ ইং	مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
৭০	**আল বাহরুর রায়েক শরহু কানযুদ দাকায়েক** যায়নুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নুজাইম আল মিসরী রাহ. (৯৭০ হি.) যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহরানপুর, ভারত প্রথম প্রকাশ: ১৪১৯ হি. ১৯৯৮ ইং	البحر الرائق شرح كنز الدقائق
৭১	**ফাতহুল কাদীর লিল আজিযিল ফকীর** আল্লামা কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ আস সিওয়াসী আল ইস্কেনদারী (ইবনুল হুমাম) রাহ. (৮৬১ হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত প্রথম প্রকাশ: ১৪২১ হি. ২০০০ ইং	فتح القدير للعاجز الفقير
৭২	**তাবঈনুল হাকায়েক শরহু কানযুদ দাকায়েক** ইমাম ফখরুদ্দীন উসমান ইবনে আলী আয যাঈলায়ী রাহ. (৭৪৩ হি.) এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি, করাচী, পাকিস্তান প্রকাশকাল: ১৪২১ হি. ২০০১ ইং	تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
৭৩	**শরহু মুখতাসারিত তহাবী** আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর রাজী আল জাস্‌সাস রাহ. (৩৭০ হি.) মাকতাবাতুল কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান	شرح مختصر الطحاوي
৭৪	**আল মুহিতুল বুরহানী ফিল ফিকহিন নু'মানী** আবু মাআলী বুরহানুদ্দীন মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে উমর ইবনে মাযাহ আল বুখারী রাহ. (৫৫১-৬১৬ হি.) দারু ইহ্‌ইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন	المحيط البرهاني في الفقه النعماني

প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হি. ২০০৩ ইং

৭৫	**আল-মাবসূত লিসসারাখসী** শামসুল আইম্মাহ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস-সারাখসী রাহ. (৪৯০ হি.) দারু ইহ্ইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন প্রথম প্রকাশ: ১৪২২ হি. ২০০১ ইং	المبسوط للسرخسي
৭৬	**মিনহাতুল খালেক আলাল বাহরির রায়েক** মুহাম্মদ আমিন ইবনে উমর ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২ হি.) যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত প্রকাশকাল: ১৪১৯ হি. ১৯৯৮ ইং	منحة الخالق على البحر الرائق
৭৭	**ফাতাওয়ায়ে ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ** আবুল ফাত্হ যহীরুদ্দীন আব্দুর রশীদ ইবনে আবু হানীফা ইবনে আব্দুর রায্যাক আল ওয়ালওয়ালিজী রাহ. (৫৪০ হি.) মাকতাবায়ে দারুল ঈমান, মুবারক শাহ, উর্দু বাজার, সাহারানপুর, ভারত প্রকাশ: ১৪২৭ হি. ২০০৬ ইং	الفتاوى الولوالجية
৭৮	**গুনয়াতুল মুতামাল্লী ফী শরহি মুনয়াতিল মুসল্লী (হালাবী কাবীর)** ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল হালাবী রাহ. (৯৫৬ হি.) প্রকাশকাল: ২০০২ ইং দারুল কিতাব, দেওবন্দ	غنية المتملي في منية المصلى (حلبى كبير)
৭৯	**রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী)** মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২ হি.) যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত প্রথমকাল: ১৪১৭ হি. ১৯৯৬ ইং	رد المحتار (الفتاوى الشامية)
৮০	**রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী)** মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২ হি.) মাকাবায়ে রশিদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান	رد المحتار (الفتاوى الشامية)
৮১	**রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী)** মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২ হি.) এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি, করাচী, পাকিস্তান	رد المحتار (الفتاوى الشامية)
৮২	**ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)** আল্লামা শায়খ নিজাম রাহ.-সহ মুফতিয়ানে কেরামের একটি বড় জামাত কর্তৃক লিখিত দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন প্রথম প্রকাশ: ১৪২৯-১৪৩০ হি. ২০০৯ ইং	الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمگيرية)

৮৩	**ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)** আল্লামা শায়খ নিজাম রাহ.-সহ মুফতিয়ানে কেরামের একটি বড় জামাত কর্তৃক লিখিত মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত	الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمگيرية)
৮৪	**ফাতাওয়ায়ে কাযীখান** হাসান মানসূর ইবনে আবুল কাসিম আল উযাজান্দী (কাযীখান) রাহ. (৫৯২ হি.) দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন প্রথম প্রকাশ: ১৪৩১-১৪৩২ হি. ২০১০ ইং	الفتاوى الخانية (فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان)
৮৫	**ফাতাওয়ায়ে কাযীখান** হাসান মানসূর ইবনে আবুল কাসিম আল উযাজান্দী (কাযীখান) রাহ. (৫৯২ হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত	الفتاوى الخانية (فتاوى قاضيخان في مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان)
৮৬	**ফাতাওয়ায়ে বায্যাযিয়া** মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব ইবনে ইউসুফ আল-বায্যায আল-কারদারী রাহ. (৮২৭ হি.) দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন প্রথম প্রকাশ: ১৪৩১-১৪৩২ হি. ২০১০ইং	الجامع الوجيز (الفتاوى البزازية)
৮৭	**ফাতাওয়ায়ে বায্যাযিয়া** মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব ইবনে ইউসুফ আল-বায্যায আল-কারদারী রাহ. (৮২৭ হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত	الجامع الوجيز (الفتاوى البزازية)
৮৮	**ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া** ফরিদুদ্দীন আলম ইবনে আলা আদ-দেহলভী আল-আনসারী রাহ. (৭৮৬হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত	الفتاوى التاتارخانية
৮৯	**কুররাতু উয়ূনিল আখয়ার** আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আবেদীন আল আফেন্দী রাহ. (১২৯০ হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহরানপুর, ভারত	قرة عيون الأخيار (تكملة رد المحتار)
৯০	**আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া** কাযিল কুযাত আবুল হাসান আলী ইবনুল হুসাইন আস সুগদী রাহ. (৪৬১ হি.) এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি করাচী, পাকিস্তান	النُّتف في الفتاوى
৯১	**খুলাসাতুল ফাতাওয়া** তাহের ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুর রশীদ আল-বুখারী রাহ. (৫৪২ হি.) মাকতাবাতে হক্কানিয়া	خلاصة الفتاوى
৯২	**মাজমু‘আতুল ফাতাওয়া** তকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল হালিম	مجموعة الفتاوى لابن تيمية

ইবনে আব্দুস সালাম ইবনে তাইমিয়া আল-হাররানী রাহ.
(৭২৮ হি.)
দারুল ওফা
প্রকাশকাল: ১৪২১ হি. ২০০১ ইং

৯৩ **রওযাতুল নাযির ওয়া জুন্নাতুল মুনাযির** روضة الناظر وجنة المناظر
ইমাম ইবনে কুদামা রাহ.

৯৪ **আল-মুগনী লি ইবনি কুদামাহ** المغني لابن قدامة
ইমাম আবু মুহাম্মদ মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে
মুহাম্মদ ইবনে কুদামা রাহ. (৬২০ হি.)
দারুল কিতাবিল আরাবী বৈরুত, লেবানন

৯৫ **আল মুগনী লি ইবনে কুদামাহ** المغني لابن قدامة
ইমাম আবু মুহাম্মদ মুওয়াফ্‌ফাকুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে
মুহাম্মদ ইবনে কুদামা রাহ. (৬২০ হি.)
দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. ১৯৮৪ ইং

৯৬ **আল মাজমু শরহুল মুহায্‌যাব** المجموع شرح المهذب
ইমাম আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনে শরফ
আন-নববী আশ-শাফেয়ী রাহ. (৬৭৬ হি.)
দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন

৯৭ **আল-উকুদুদ্দর্‌রিয়্যাহ ফী তানকীহিল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাহ** العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
মুহাম্মদ আমীন ইবনে উমর ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২
হি.)
মাকতাবায়ে হক্কানিয়া, কঙ্গি মহল্লা, পেশোয়ার, পাকিস্তান
মাকতায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান

৯৮ **আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ** الأحكام السلطانية
আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবিব আল-
বসরী আল-মাওয়ারদী রাহ. (৪৫০ হি.)
দারুল হাদীস, কায়রো
প্রকাশকাল: ১৪২৭ হি. ২০০৬ ইং

৯৯ **বুগয়াতুল আরীব ফী আহকামিল কিবলাতি ওয়াল মাহারীব** بغية الأريب في أحكام القبلة والمحاريب
আল্লামা সায়্যিদ ইউসুফ বান্নুরী রাহ.

১০০ **তাকরীরাতুর রাফে‘য়ী** تقريرات الرافعي
শাইখ আব্দুল কাদের ইবনে মুস্তফা ইবনে আব্দুল কাদের
আর-রাফে‘য়ী আল-হানাফী রাহ. (১৩২৩ হি.)
যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত
প্রকাশকাল: ১৪১৭ হি. ১৯৯৬ ইং
মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

১০১ **হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ** حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح
আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আত-তাহতাবী
আল-হানাফী রাহ. (১২৩১ হি.)

মাকতাবায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান

১০২	**বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মু'আসিরাহ** শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ (জন্ম:১৩৬২ হি.) প্রকাশকাল: ১৪৩০ হি. দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান	بحوث في قضايا فقهية معاصرة
১০৩	**আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ** ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত পঞ্চম প্রকাশ: ১৪২৪ হি. ২০০৪ ইং	الموسوعة الفقهية الكويتية
১০৪	**মাওয়াহিবুল জালীল ফী শরহি মুখতাসারিশ শাইখ খলীল** আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-মাগরিবী আল-মালেকী রাহ. (৯৫৪ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত, লেবানন প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬ হি. ১৯৯৫ ইং	مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل
১০৫	**শরহু মিনাহিল জালীল** আল্লামা আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ উলাইশ রাহ. (১২৯৯ হি.) দারু সাদির, বৈরুত, লেবানন	شرح منح الجليل
১০৬	**আহকামুল আওকাফ** ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে আমর আল-খাসসাফ রাহ. (২৬১ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন	أحكام الأوقاف
১০৭	**শরহুল মাজাল্লা** মুহাম্মদ খালেদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সাত্তার আল-আতাসী (১২৪৩-১৩২৬ হি.) মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান	شرح المجلة
১০৮	**দুরারুল হুককাম শরহু গুরারিল আহকাম** আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ফারামুরয মোল্লা খসরু (৮৮৫ হি.) দারু ইহইয়াইত-তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন	درر الحكام شرح غرر الأحكام
১০৯	**মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ** খেলাফতে উসমানিয়ার তত্ত্বাবধানে গঠিত তুর্কি উলামা পরিষদ	مجلة الأحكام العدلية
১১০	**ফাতাওয়ায়ে গিয়াছিয়া** আল্লামা দাউদ ইবনে ইউসুফ আল খতীব মাকতাবায়ে আমীরিয়্যাহ, বোলাক, মিসর প্রকাশকাল: ১৩২১ হিজরী	الفتاوى الغياثية
১১১	**খিযানাতুল আকমাল** আল্লামা আবু ইয়াকুব ইউসুফ ইবনে আলী আল জুরজানী (৫২২ হিজরীর পর) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন	خزانة الأكمل
১১২	**আল ইখতিয়ার লিতা'লীলিল মুখতার**	الاختيار لتعليل المختار

আল্লামা আবুল ফযল মাজদুদ্দীন আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাহমুদ আল-মাওসিলী রাহ. (৬৮৩ হি.)
দারুল হাদীস কায়রো, মিসর
প্রকাশকাল: ১৩৫৬ হি.

১১৩ আহকামুল আওকাফ — أحكام الأوقاف
শাইখ মুস্তফা আহমদ যারকা রাহ. (১৪২০ হি.)

১১৪ আত তালখীসুল হাবীর — التلخيص الحبير
হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (৮৫২ হি.)
দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন
প্রকাশকাল: ১৪১৮ হি.

১১৫ আহকামুল ওয়াক্‌ফ — أحكام الأوقاف
ইমাম হিলাল ইবনে ইয়াহ্‌য়া আল বসরী রাহ. (২৪৫ হি.)
মাজলিসু দাইরাতিল মা'আরিফিল উসমানিয়্যাহ, হায়দারাবাদ
প্রকাশকাল: ১৩৫৫ হি.

১১৬ আল ইস'আফ ফি আহকামুল আওকাফ — الإسعاف في أحكام الأوقاف
আল্লামা বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম ইবনে মূসা আত-তারাবুলুসী রাহ. (৯২২ হি.)
দারুর রায়েদ আল আরাবী, বৈরুত, লেবানন
দ্বিতীয় সংস্কার: ১৩২০ হি.

১১৭ আল ফাতওয়াল মাহদিয়্যাহ — الفتاوى المهدية
মুফতী মুহাম্মদ আব্বাসী আল-মাহদী রাহ. (১৩১৫ হি.)
কদিমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান

১১৮ আল মাআঈরুশ শারঈয়্যাহ লিল মুআসসাতিল মালিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ — المعائير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية
হাইয়াতুল মুহাসাবাহ ওয়াল-মুরাজাআ লিল-মুআসসাসাতিল ইসলামিয়্যাহ (AAOIFI) বাহরাইন
প্রকাশ: ১৪৩৭ হি. ২০১৫ ইং

১১৯ ফিকহুল বুয়ু' — فقه البيوع
মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ (জন্ম: ১৩৬২ হি.)
মাকতাবায়ে মা'আরিফুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান

১২০ আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের লিস-সুয়ূতী — الأشباه والنظائر للسيوطي
আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর জালালুদ্দীন সুয়ূতী (৯১১ হি.)

১২১ আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের লি-ইবনে নুজাইম — الأشباه والنظائر لابن نجيم
আল্লামা যাইনুদ্দীন ইবনে ইব্রাহীম আল-মিসরী ইবনে নুজাইম রাহ. (৯৭০ হি.)
মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, বাংলাবাজার, ঢাকা

১২২ আল-আসল — الأصل
ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী রাহ. (১৮৯ হি.)

দারু ইবনে হাযাম, বৈরুত, লেবানন

১২৩	**মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী** মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জিদ্দাহ, সৌদি আরব	مجلة مجمع الفقه الإسلامي
১২৪	**আল-হিদায়া** আল্লামা বুরহানুদ্দীন আলী আল মারগীনানী রাহ. (৫৯৩ হি.)	الهداية
১২৫	**মা'আলিমুস সুনান শরহু সুনানি আবী দাউদ** আবু সুলাইমান হামদ ইবনে মুহাম্মদ আল-খাত্তাবী রাহ. (৩৮৮ হি.)	معالم السنن شرح سنن أبى داود
১২৬	**আল-মুহাল্লা বিল-আসার** আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে আহমদ ইবনে হাযম আল-আন্দুলুসী আয যাহেরী রাহ. (৪৫৬ হি.) আল মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, জামেয়াতুল আযহার প্রকাশকাল: ১৪৫১ হি.	المحلى بالآثار
১২৭	**লিসানুল হুককাম ফী মা'রিফাতিল আহকাম** আবুল ওয়ালীদ লিসানুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহনাহ (৮২২ হি.)	لسان الحكام في معرفة الأحكام
১২৮	**গমযু উয়ূনুল বাসায়ের শরহু আসবাহ ওয়ান নাজায়ের** সায়্যেদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-হামাভী আল-মিসরী রাহ. (১০৯৮ হি.) মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, বাংলাবাজার, ঢাকা	غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر
১২৯	**জামেউল ফুসুলাইন** বদরুদ্দীন মাহমুদ ইবনে ইসরাঈল আল হানাফী (ইবনে কাযী সামাওনাহ) রাহ. (৮২৩ হি.) আমির হামযাহ কুতুবখানা, কোয়েটা, পাকিস্তান	جامع الفصولين
১৩০	**তুহফাতুল ফুকাহা** আল্লামা আলাউদ্দীন আবু বকর সামারকান্দী রাহ. (৪৫০ হি.) দারুল কতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন	تحفة الفقهاء
১৩১	**আল ইশরাফ আলা মাযাহিবি আহলিল ইলম** আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আন নিশাপুরী রাহ. (৩০৯ হি.) দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন	الإشراف على مذاهب أهل العلم
১৩২	**আল–গারারু ওয়া আসারুহু ফিল উকুদ** ড. সিদ্দিক আমীন আয যরীর আস–সুদানী রাহ. (১৪৩৬ হি.)	الغرر وأثره في العقود
১৩৩	**মাওসুআতুল কাওয়াইদি ওয়ায যাওয়াবিতিল ফিকহিয়্যাহ** ড. আলী আহমদ নদভী হাফিযাহুল্লাহ (জন্ম: ১৯৫৪ ঈসায়ী) **প্রকাশ: ১৯৯৯ ইং**	موسوعة القواعد والضوابط الفقهية

১৩৪	**মুহাযারাত ফিল ওয়াক্ফ** শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আবু যাহরাহ রাহ. (১৩৯৪ হি.)	محاضرات في الوقف
১৩৫	**ইরশাদুস সারী ইলা মানাসিকিল মোল্লা আলী আল-কারী** হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ সাঈদ আল-মাক্কী আল-হানাফী মক্কাতুল মুকাররামাহ	إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري
১৩৬	**আল-ফিকহুন নাফে'** আল্লামা নাসিরুদ্দীন আবুল কাসিম মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আস-সামারকান্দী আল-হানাফী রাহ. (৫৫৬ হি.)	الفقه النافع
১৩৭	**আল-ওয়াফী** আল্লামা আবুল বারাকাত হাফিজুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মাহমুদ আন-নাসাফী আল-হানাফী রাহ. (৭১০ হি.)	الوافي
১৩৮	**আন-নুকায়াহ মুখতাসারু শরহিল বেকায়াহ** আল্লামা উবাইদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আল-মাহবুবী রাহ. (৭৪৭ হি.) আল-মাকতাবাতুল কারীমিয়্যাহ প্রকাশকাল: **১৩২৯** হি.	النقاية مختصر شرح الوقاية
১৩৯	**উয়ূনুল মাযাহিবিল কামিলাহ** আল্লামা কিওয়ামুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাকী আল-হানাফী রাহ. (৭৪৯ হি.)	عيون المذاهب الكاملة
১৪০	**লাম'আতুল বদর নযমুল জামিইস সগীর** আল্লামা আবু নসর মাসউদ ইবনে আবু বকর আল-ফারাহী আল-হানাফী রাহ. (৬৪০ হি.)	لمعة البدر نظم الجامع الصغير
১৪১	**খুলাসাতুদ দালায়েল ওয়া তানকীহুল মাসাইল** আল্লামা হুসামুদ্দীন আলী ইবনে আহমদ আল-মাক্কী আর-রাযী রাহ. (৫৯৮ হি.) মাকতাবাতুর রুশদ	خلاصة الدلائل وتنقيح المسائل
১৪২	**আল-জাওহারাতুন নায়্যিরাহ** আল্লামা আবু বকর আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-হাদ্দাদী আল-হানাফী রাহ. (৮০০ হি.) মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ, ঢাকা, বাংলাদেশ	الجوهرة النيرة
১৪৩	**যাখীরাতুল উকবা** আল্লামা ইউসুফ ইবনে জুনাইদ আত-তাওকানী রাহ. (৯০৫ হি.)	ذخيرة العقبى
১৪৪	**হাশিয়াতু সা'দী চালাপী** আল্লামা সা'দুল্লাহ ইবনে ঈসা ইবনে আমীর খান (৯৪৫ হি.)	حاشية سعدى جلبى على شرح العناية
১৪৫	**আন-নাহরুল ফায়েক শরহু কানযিদ্দাকায়েক** আল্লামা সিরাজুদ্দীন উমর ইবনে ইরবাহীম ইবনু নুজাইম আল-মিশরী আল-হানাফী রাহ. (১০০৫ হি.)	النهر الفائق شرح كنز الدقائق

মাকতাবায়ে দারুল ইমান, সাহারানপুর, ভারত

১৪৬ **আল-লুবাব ফিল জামই বাইনাস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব** — اللباب في الجمع بين السنة والكتاب
আল্লামা জামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে যাকারিয়া আল-আনসারী আল-খযরজী রাহ. (৬৮৬ হি.)

১৪৭ **খুলাসাতুল ফাতাওয়া** — خلاصة الفتاوى
আল্লামা তাহির ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুর রশীদ আল-বুখারী (তাহির বুখারী) রাহ. (৫৪২ হি.)
মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

১৪৮ **আল-ফাতাওয়াল আনকারাভিয়্যাহ** — الفتاوى الأنقروية
আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল আন কারাভী আল-হানাফী (১০৯৮ হি.)

১৪৯ **কিতাবুল খারাজ** — كتاب الخراج
ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম আল আনসারী আল-কূফী রাহ. (১৮২ হি.)

১৫০ **শারহুল কাওয়াইদিল ফিকহিয়্যা** — شرح القواعد الفقهية
আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আয-যারকা (১৩৫৭ হি.)

১৫১ **আল-ফুসূল ফিল উসূল** — الفصول في الأصول
আল্লামা আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল-জাস্‌সাস আল-হানাফী রাহ. (৩৭০ হি.)

১৫২ **তাকবীমুল আদিল্লাহ ফী উসূলিল ফিকহ** — تقويم الأدلة في اصول الفقه
আল্লামা আবু যায়েদ আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আল-বুখারী রাহ. (৪৩০ হি.)

১৫৩ **কানযুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল (উসূলুল বাযদাবি)** — كنز الأصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي)
আবুল হাসান ফখরুল ইসলাম আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-বাযদাভী আল-হানাফী রাহ. (১০৮৯ হি.)

১৫৪ **উসূলুস সারাখসী** — أصول السرخسي
আল্লামা শামসুল আইম্মা আবু সুহাইল মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস-সারাখসী আল-খযরজী আল-আনসারী রাহ. (৪৯০ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

১৫৫ **আল-মুনতাখাব ফি উসূলিল মাযহাব (আল মুনতাখাবুল হুসামী)** — المنتخب في أصول المذهب (المنتخب الحسامى)
আল্লামা হুসামুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-আকসীকাছী রাহ. (৬৪৪ হি.)

১৫৬ **আল-মানার** — المنار
আল্লামা আবুল বারাকাত হাফেযুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আন-নাসাফী আল-হানাফী (৭১০ হি.)

১৫৭ **মাজামিউল হাকায়েক** — مجامع الحقائق
আল্লামা আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে মুস্তফা ইবনে উসমান আল-খাদেমী আল-হানাফী রাহ. (১১৭৬ হি.)

১৫৮ **তাইসিরুত তাহরীর** — تيسير التحرير شرح التحرير

	আল্লামা মুহাম্মদ আমিন ইবনে মাহমুদ আল-বুখারী আল-হানাফী (আমীর বাদশাহ) (৯৭২ হি.)	
১৫৯	**উকুদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা ফী আদিল্লাতি মাযহাবিল ইমাম আবি হানীফা** আল্লামা আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আয যাবীদী আল হানাফী রাহ. (১২০৫ হি.)	عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة
১৬০	**মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মুলতাকান নায়্যিরাইন** আল্লামা মুজাফ্ফরুদ্দীন আহমদ ইবনে আলী ইবনে ছা‘লাব (ইবনুস সা‘আতী) রাহ. (৬৯৪ হি.)	مجمع البحرين وملتقى النيرين
১৬১	**মাওয়াহিবুর রাহমান ফী মাযহিবি আবী হানীফা আন-নু‘মান** আল্লামা বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ইবনে মূসা আত–তারাবলুসী রাহ. (৯২২ হি.)	مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان
১৬২	**মুলতাকাল আবহুর লিল হালাবী** আল্লামা ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল-হালাবী রাহ. (৯৫৬ হি.) মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন	ملتقى الأبحر للحلبي
১৬৩	**শারহু মুখতাসারিত তাহাবী** আল্লামা আবু বকর আহমদ ইবনে আলী আর-রাযী আল-জাস্সাস রাহ. (৩৭০ হি.) দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ প্রকাশকাল: ১৪৩১ হি.	شرح مختصر الطحاوي للجصاص
১৬৪	**আল-লুবাব ফী শরহিল কিতাব** আল্লামা আব্দুল গনী ইবনে তালিব আদ দিমাশকী রাহ. (১২৯৮ হি.)	اللباب في شرح الكتاب
১৬৫	**যুবদাতুল আহকাম ফী ইখতিলাফিল আইম্মাতিল আরবা‘আতিল আ‘লাম** সিরাজুদ্দীন আবু হাফস উমর ইবনে ইসহাক আল-হিন্দী আল-গযনভী (৭৭৩ হি.)	زبدة الأحكام في اختلاف الأئمة الأربعة الأعلام
১৬৬	**আল-ফাতাওয়াল খাইরিয়্যাহ** খাইরুদ্দীন আহমদ ইবনে নূরুদ্দীন আর রমলী রাহ. (১০৮১ হি.)	الفتاوى الخيرية لنفع البرية
১৬৭	**মুসইফাতুল হুককাম আলাল আহকাম** আবু সালেহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তামারতাশী আল-হানাফী (১০০৪ হি.)	مسعفة الحكام على الأحكام للتمرتاشي
১৬৮	**মিজানুল উসূল ফী নাতাইজিল উকূল** আল্লামা আলাউদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস-সামারকান্দী রাহ. (৫৩৯ হি.)	ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي
১৬৯	**কাশফুল আসরার আলাল মানার**	كشف الأسرار على المنار

আল্লামা আবুল বারাকাত হাফিজুদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ রাহ. (৭১০ হি.)

১৭০	**নূরুল আনওয়ার শারহুল মানার** আল্লামা আহমদ ইবনে আবু সাঈদ মোল্লা জিওয়ান রাহ. (১১৩০ হি.)	نور الأنوار شرح المنار لملا جيون
১৭১	**ফাওয়াতিহুর রাহামুত বি-শরহি মুসাল্লামুছ ছুবূত** আল্লামা নিযামুদ্দীন ইবনে মোল্লা কুতুবুদ্দীন আস-সিহালভী আল-হিন্দী রাহ. **(১১৬১ হি.)**	فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
১৭২	**আবহাসু হাইআতি কিবারিল উলামা** লি-ইদারাতিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা ওয়াদ্দাওয়াতি ওয়াল ইরশাদ, রিয়াদ প্রকাশকাল: ১৪০৯ হি.	أبحاث هيئة كبار العلماء
১৭৩	**আল-ইশরাফ আলা মাযাহিবি আহলিল ইলম** ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনুল মুনযির রাহ. (৩১৯ হি.) ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ূনিল ইসলামিয়া, কাতার, প্রকাশকাল: ১৪১১ হি.	الإشراف على مذاهب أهل العلم
১৭৪	**উসূলুল ইফতা ওয়া আ'দাবুহু** মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ (জন্ম: ১৩৬২ হি.) মাকতাবায়ে মা'আরেফুল কোরআন, করাচী প্রকাশকাল: ১৪৩৫ হি.	أصول الإفتاء وآدابه
১৭৫	**উসূলুল কারখী** আল্লামা আবুল হাসান উবাইদুল্লাহ ইবনে হুসাইন আল-কারখী রাহ. (৩৪০ হি.) মুহাম্মদ সাঈদ এডিশন, করাচী, পাকিস্তান	أصول الكرخي
১৭৬	**ইকমালু ইকমালিল মু'লিম** আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খলফাহ ইবনে উমর আল-উব্বী আল মালেকী রাহ. (৮২৭ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ	إكمال إكمال المعلم
১৭৭	**আল ইয়াওয়াকীত ফী আহকামিল মাওয়াকীত** মুফতী মুহাম্মদ শফী রাহ. (১৩৯৬ হি.)	اليواقيت في أحكام المواقيت (أردو)
১৭৮	**বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ** আল্লামা ইবনে রুশদ আল-হাফীদ রাহ. (৫৯৫ হি.) দারুল মা'আরিফা প্রকাশকাল: ১৪০২ হি.	بداية المجتهد ونهاية المقتصد
১৭৯	**তাহযীরুল ইখওয়ান অনির-রিবা ফিল হিন্দুস্তান** হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. (১৩৬২ হি.) আশরাফুল মাতাবি, থানা ভবন, ভারত	تحذير الإخوان عن الربا في الهندوستان

১৮০ **আত-তাহরীর ওয়াত-তানভীর** — التحرير والتنوير
আল্লামা তাহের ইবনে আশুর রাহ. (১৩৯৩ হি.)
আদ-দারুত তিওনিসিয়্যাহ লিন-নাশরি ওযাত-তাওযী, তিওনিস
প্রকাশকাল: **১৯৯৮** ইং

১৯০ **মাজমু'আতু রাসাইলি ইবনে আবেদীন** — مجموعة رسائل ابن عابدين
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২ হি.)
মাকতাবায়ে ফারুকিয়্যাহ কোয়েটা

১৯১ **মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা** — مختصر اختلاف العلماء
ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবী রাহ. (৩২১ হি.)
দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন
প্রকাশকাল: **১৪১৬** হি.

১৯২ **আল-মুদাওওয়ানাতুল কুবরা** — المدونة الكبرى
ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাহ. (১৭৯ হি.)
দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন
প্রকাশকাল: **১৪১১** হি.

১৯৩ **মাসাইলুল ইমাম আহমদ ওয়া ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াই** — مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
ইমাদাতুল বাহসিল ইলমী, জামিয়া ইসলামিয়া মদিনা মুনাওয়ারা

১৯৪ **তাসিসুন নযর** — تأسيس النظر
ইমাম আবু যায়দ উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে ঈসা আদ-দাবুসী আল-বুখারী রাহ. (৪৩০ হি.)

১৯৫ **আল-মিলকিয়্যাহ ফিশ-শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ** — الملكية في الشريعة الإسلامية
ড. আব্দুস সালাম আল আব্বাদী (জন্ম: **১৯৪৩** ঈসায়ী.)
মাকতাবাতুল আকসা
প্রকাশকাল: **১৩৯৪** হি.

১৯৬ **আল মানসূর ফিল-কাওয়ায়েদ** — المنثور في القوعد الفقهية
আল্লামা বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আয-যারকাশী রাহ. (৭৯৪ হি)
ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত
প্রকাশকাল: **১৪০৫** হি.

১৯৭ **আল-ইজমা'** — الإجماع لإبن المنذر
আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনুল মুনযির (৩১৯ হি.)

১৯৮ **আনওয়ারুল বুরুক ফী আনওয়াইল ফুরুক** — أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي
আল্লামা শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আল-কারাফী আল-মালেকী রাহ. (৬৮৪ হি.)
মুয়াসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, লেবানন

১৯৯ **নাযরিয়্যাতুজ-জরুবাতিশ-শারইয়্যাহ** — نظرية الضرورة الشرعية
ড. ওয়াহবা যুহাইলী হাফিযাহুল্লাহ
মুআসসাসাতুর রিসালাহ বৈরুত, লেবানন

প্রকাশকাল: **১৪০২** হি.

২০০	**নিহায়াতুল-মুহতাজ** আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হামযাহ আর-রমলী রাহ. (১০০৪ হি.) দারু ইহ্ইয়াইত তুরাসিল আরাবী বৈরুত, লেবানন	نهاية المحتاج
২০১	**নিহায়াতুল মাতলাব ফী দিরায়াতিল মাযহাব** ইমামুল হারামাইন আল্লামা আবুল মা'আলী আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুওয়াইনী রাহ. (৪৭৮ হি.) দারুল মিনহাজ বৈরুত, লেবানন	نهاية المطلب في دراية المذهب
২০২	**আল-ওয়াসীত ফিল মাযহাব** ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালী রাহ. (৫০৫ হি.) দারুস-সালাম প্রকাশকাল: **১৪১৭** হি.	الوسيط في المذهب
২০৩	**আল মুসায়ির লিঈকযিল হিমামি ওয়াল বাসাইর (পান্ডুলিপি)** মুফতী আব্দুল্লাহ নাজীব, মুহাম্মদ তাকি	المساير لإيقاظ الهمم والبصائر
২০৪	**জাদীদ ফিকহী মাবাহিছ** ইসলামী ফিকহ একাডেমী ইন্ডিয়া মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসিমী রাহ. (১৪২৩হি.) ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান	جدید فقہی مباحث
২০৫	**ফিকহী মাকালাত** মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ (জন্ম: **১৯৬২** ঈসায়ী) জমজম বুক ডিপো প্রকাশকাল: **১৯৯৭** ইং ও নভেম্বর **২০০৪** ইং	فقہی مقالات
২০৬	**আল মীযানুল কুবরা** ইমাম শা'রানী রাহ.	الميزان الكبرى
২০৭	**ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়্যা** শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক রাহ. জামেয়া দারুল উলূম হক্কানিয়া ৬ষ্ঠ প্রকাশ: **১৪৩০** হি. **২০০৯** ইং	فتاوی حقانیہ
২০৮	**ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া** হযরত মাওলানা হাফেয কারী মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী রাহ. (১৪২২ হি.) যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত	فتاوی رحیمیہ
২০৯	**জাওয়াহিরুল ফিকহ** হযরত মাওলানা মুফতী শফী রাহ. (১৩৯৬ হি.) মাকাতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান প্রকাশকাল: সফর **১৪৩৩** হি. জানুয়ারি **২০১২** ইং	جواہر الفقہ
২১০	**ইহকাকুল হক** আল্লামা যাহেদ কাওসারী রাহ.	إحقاق الحق

২১১ ফিকহে ওয়ালিউল্লাহী فقہ ولی اللہ
মাওলানা উবাইদুল্লাহ আস'আদী

২১২ হুরমাতে মুসাহারাত حرمت مصاہر
মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা.

২১৩ ইসলাম আওর জাদীদ মা'আশী মাসাইল اسلام اور جدید معاشی مسائل
মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ (জন্ম: ১৩৬২ হি.)
ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল, দিল্লী, ভারত
প্রকাশকাল: ২০১০ ইং

২১৪ আহসানুল ফাতাওয়া احسن الفتاوی
মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রাহ. (১৪২২ হি.)
এইচ. এম. সাঈদ করাচী, পাকিস্তান

২১৫ কিফায়াতুল মুফতী کفایۃ المفتی
মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী রাহ. (১৩৭২ হি.)
দারুল ইশাআত

২১৬ ইমদাদুল ফাতাওয়া امداد الفتاوی
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. (১৩৬২ হি.)
যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত

২১৭ আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল آپ کے مسائل اور ان کا حل
মুফতী ইউসুফ লুধিয়ানভী রাহ. (১৪২১ হি.)
যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত

২১৮ ফাতাওয়ায়ে উসমানী فتاوی عثمانی
মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ (জন্ম:১৩৬২ হি.)
যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত

২১৯ আদালতী ফয়সালে عدالتی فیصلے (اردو)
মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ (জন্ম: ১৩৬২ হি.)
ইদারায়ে ইসলামীয়্যাহ, লাহোর, করাচী

২২০ আনওয়ারে মানাসেক انوار مناسک
মুফতী শিব্বীর আহমদ কাসেমী হাফিযাহুল্লাহ

২২১ মাজমু'আয়ে ফাতাওয়ায়ে আব্দুল হাই লাখনভী مجموعۂ فتاوی لکھنوی
আবুল হাসানাত মাওলানা আব্দুল হাই লাখনভী রাহ.
(১৩০৩ হি.)
এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি করাচী পাকিস্তান

২২২ নিযামুল ফাতাওয়া نظام الفتاوی
আল্লামা মুফতী নেজামুদ্দীন রাহ. (১৪২৫ হি.)
ইসলাহী কুতুবখানা দেওবন্দ, হিন্দ

২২৩ ইমদাদুল আহকাম امداد الاحکام
মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রাহ. (১৩৬৪ হি.)
মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

২২৪ কিতাবুল নাওয়াযিল کتاب النوازل
মুফতী সালমান মানসূরপুরী হাফিযাহুল্লাহ
আল মারকাজুল ইলমী, লালবাগ, মুরাদাবাদ, ভারত

বিবিধ

২২৫	**আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ ফিস-সিয়াসাতিশ-শরইয়্যাহ** আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ (৬৯১-৭৫১ হি.)	الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
২২৬	**আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ** আল্লামা আব্দুল হাই ইবনে আব্দুল হালীম লাখনভী রাহ. (১৩০৪ হি.) মাকতাবায়ে খায়রে কাছির, করাচী, পাকিস্তান	الفوائد البهية في تراجم الحنفية
২২৭	**আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ফী তবাকাতিল হানাফিয়্যাহ** আল্লামা মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদের ইবনে মুহাম্মদ আল-কুরাশী আল-মিসরী রাহ. (৭৭৫ হি.) মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী	الجواهر المضية في طبقات الحنفية
২২৮	**তাহযীবুল কামাল** হাফিজ জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে আব্দুর রহমান আল-মিযযী আল-কলবী রাহ. (৭৪২ হি.)	تهذيب الكمال في أسماء الرجال
২২৯	**ইদরারুশ শুরুক আলা আনওয়াইল ফুরুক** কাসিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুশ-শাত আল-মালেকী (৭২৩ হি.) (হাশিয়াতু ইবনিশ-শাত রাহ. আলাল ফুরুক)	إدرار الشروق على أنواء الفروق
২৩০	**ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন-রাব্বিল আলামীন** আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবনে কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ (৬৯১-৭৫১ হি.)	إعلام الموقعين عن رب العالمين
২৩১	**আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস-সাহাবা** ইমাম শিহাবুদ্দীন আবুল ফজল আহমদ ইবনে আলী (হাফিজ ইবনে হাজার) আল আসকালানী রাহ. (৮৫২ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন প্রকাশকাল: ১৪১৫ হি.	الإصابة في تمييز الصحابة
২৩২	**তাজুল-আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস** মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রায্যাক আল-মুরতাযা আয-যুবাইদী রাহ. রাহ. (১০৫০ হি.) হুকুমাতুল কুয়েত, ওয়াযারাতুল ইরশাদ ওয়াল আম্বা প্রকাশকাল: ১৩৮৫ হি.	تاج العروس من جواهر القاموس
২৩৩	**তারীখুল উমামি ওয়াল মুলুক (তারীখুত তাবারী)** ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারী রাহ. (৩১০ হি.) দারুল মা'আরিফ, মিশর, দ্বিতীয় প্রকাশ	تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري
২৩৪	**তারীখে দিমাশক আল-কাবীর** ইমাম আবুল কাসিম আলী ইবনে হাসান ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির রাহ. (৫৭১ হি.) দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন	تاريخ دمشق الكبير

প্রকাশকাল: ১৪১৫ হি.

২৩৫ **ফতাওয়ায়ে খলীলিয়্যাহ** — فتاوی خلیلیہ
হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহ.

২৩৬ **মাসাদিরুল হক ফিল ফিকহিল ইসলামী** — مصادر الحق في الفقه الإسلامي
ড. আব্দুর রাজ্জাক আস-সানহুরী আল-ফুরুকমিশরী রাহ. (১৯৭১ ঈসায়ী.)
দারু ইহইয়াইত-তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

২৩৭ **নাফহাতুল আম্বর** — نفحة العنبر
আল্লামা সায়্যিদ ইউসুফ বান্নুরী রাহ.

২৩৮ **মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির-রিজাল** — ميزان الاعتدال في نقد الرجال
হাফেয শামছুদ্দীন যাহাবী রাহ. (৭৪৮ হি.)
দারু ইহ্ইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ
প্রকাশকাল: ১৩৮২ হি.

২৩৯ **মাকায়ীসুল লুগাহ** — مقاييس اللغة
আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে ফারিস ইবনে যাকারিয়া (৩৯৫ হি.)
দারুল হাদীস,কায়রো, মিশর
প্রকাশকাল:১৪২৯হি.

২৪০ **হিন্দুস্তান কা নেসাবে দরস আওর উনকা তাগাইয়ুরাত** — ہندوستان کا نصاب درس اور ان کا تغیرات
মাওলানা হাকীম সাইয়েদ আব্দুল হাই
শো'বায়ে তা'মীর ওয়া তারাক্কী, দারূল উলূম নদওয়াতুল উলামা, লাখনৌ

২৪১ **হিন্দুস্তান মেঁ মুসলমানু কা নিযামে তা'লীম ওয়া তারবিয়্যাত** — ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت
সাইয়েদ মানাযির আহসান গিলানী (১৩৭৫ হি.)

২৪২ **আল-ওয়াসীত ফী শরহিল কানূনিল মাদানী** — الوسيط في شرح القانون المدني
আব্দুর রায্যাক আস-সানহুরী আল-মিশরী (১৮৯৪-১৯৭১ ঈসায়ী.)
দারু ইহ্ইয়াইত তুরাসিল আরাবী বৈরুত, লেবানন

২৪৩ Wikipedia

২৪৪ Investopedia

২৪৫ Techopedia

২৪৬ BBC

২৪৭ The early days of IVF (Article in Human Reproduction. Update: August 2005)

২৪৮ IN-VITRO FERTILIZATION : STUDY MATERIAL AND GUIDELINES (A Social Document from the Lutheran Council in the U.S.A.)

২৪৯ A BRIEF REVIEW ON *IN-VITRO* FERTILIZATION (IVF): AN ADVANCED

AND MIRACULOUS GATEWAY FOR INFERTILITY TREATMENTS, WORLD JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES.

২৫০ Present Financial Crisis: Causes and Remedies, p.,

২৫১ Speculation between Proponents and Opponents.

২৫২ Foreign Exchange Markets (A book published by Pondicherry University, India)

২৫৩ The Theory of Money And Credit, Ludwing Von Mises, Liberty Classic ladiana polis

২৫৪ Client Agreement Terms and Conditions of Business (XM)

২৫৫ Customar Agreement, Forex.com (Gain Capital UK)

২৫৬ Currency trading for DUMMIS (a book from Forex.com)

২৫৭ Oxford Advanced Learner's Dictionary

২৫৮ Algorithmic trading with Python Tutorial, Harrison Kinsley (Understanding Leverage - Python for Finance 18), Harrison Kinsley

২৫৯ Shariah Standards (AAOIFI)

২৬০ Software piracy in Bangladesh: the student perceptions study on two selected public universities in Dhaka city (Manarat

সংকলন ও প্রকাশনা

কিসমুত তাখাসসুস ফিল ফিকহিল ইসলামী

(সমাপনী বর্ষের ছাত্রবৃন্দ-১৪৩৯ হিজরী)